

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

প্রকাশ করেছেন :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ এঁকেছেন :
আবুল বারক আলভী
ছেপেছেন :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।

কৃষণ চন্দরের সঙ্গী
প্রগতি শিবিরের লেখকদের

সূচি

দ্বিতীয় পর্ব

'এবং জলার্ক' সংক্রান্ত ব্যাপারে যোগাযোগ

স্বপন দাসাধিকারী
১১৫/২৯ পলাশ সরণি
ভদ্রকালী, হুগলী ৭১২ ২৩২

দিলীপন ভট্টাচার্য
১১৬ উত্তর বাকসাড়া গভর্নমেন্ট কলোনী
বাকসাড়া, হাওড়া ৭১১ ৩০৬

সুজিৎ ঘোষ
ডব্লু ২/১৪ দীপান্বিতা
৭৮ চেতলা রোড ৭০০ ০২৭

পার্থসারথি চৌধুরী
অব. আশিস গুপ্ত
মোহন্তপাড়া, জলপাইগুড়ি

কুমার ভট্টাচার্য
শীতলাতলা বৌবাজার
খলিসানি, হুগলী ৭১২ ১৩৮

দিলীপ চক্রবর্তী
১, ঝিলপাড় ওয়েস্ট
পুরাতন বাজার, নিউ ব্যারাকপুর

দিলীপ কুমার বসু
'শুভেচ্ছা'
৭৭/৩ বোসপাড়া, কামডহরি
গড়িয়া ৭০০ ০৮৪

সুবীর চক্রবর্তী
৯১, প্রফুল্ল নগর
বেলঘোরিয়া ৭০০ ০৫৬

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়
শিলিগুড়ি ফায়ার ব্রিগেড

অমিতাভ মিত্র
৮, নৃত্যগোপাল চ্যাটার্জী লেন
কলকাতা ৭০০ ০৩৭

আমাদের কথা

অবশেষে কৃষণ চন্দর সম্পর্কিত পুস্তকটি প্রকাশিত হচ্ছে। বিগত কয়েক বছর ধরে ঘোষণা করে গেলেও এ কাজে হাত দেবার সাহস পাচ্ছিলাম না আমরা। প্রথম সমস্যা ভাষার দূরত্ব, দ্বিতীয় সমস্যা কৃষণ চন্দরের আত্মীয়স্বজনরা থাকেন অনেক দূরে ; তাঁর জীবন ও কর্ম বিস্তৃত ছিল লাহোর, পুঞ্ছ, পুনা, দিল্লী, মুম্বাই, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি জায়গায়। কিন্তু আমাদের সভাপতি দিলীপন ভট্টাচার্য বিষয়টি নিয়ে ক্রমাগত তাড়া দিয়েছেন। মূলত তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে কৃষণ চন্দর সংখ্যাটির কাজে হাত দিতে বাধ্য হই আমরা।

প্রথমে আমরা যোগাযোগ করি রেবতীজী ও 'জনসংসার' পত্রিকার গীতেশ শর্মার সঙ্গে। রেবতীজী জানান আলি সর্দার জাফরি কিছুদিনের মধ্যেই আসবেন এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে কৃষণ চন্দর বিষয়ে বিস্তৃত সূচী তৈরী করা সহজ হবে। সর্দার জাফরি আসার সময় পেরোতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর আর কলকাতা আসাই হয় না ; তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯১৯-র নভেম্বরে 'রিফ্লেকসনস অফ অ্যানাদার ডে' সংস্থার একটি সম্মেলন হয় কলকাতায়। পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলেন অধ্যাপক ডক্টর ফকির হোসেন সাগা এবং তারিক আজিম। তাঁরা আমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারনে পরবর্তীকালে চিঠি বা ই-মেলের উত্তর দেননি।

আমরা প্রথম উৎসাহব্যঞ্জক চিঠিটি পাই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরালের কাছ থেকে। তবে প্রস্তাবিত লেখাটি শেষ পর্যন্ত এলো না।

কাজ শুরুর জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় সাহায্য আসে রেবতী শরন শর্মার কাছ থেকে। তিনি কৃষণ চন্দরের ছোট বোন সরলা দেবীর স্বামী, ভারতীয় নাট্য সংঘের সাধারণ সম্পাদক, থাকেন দিল্লীতে। তিনি বই ও লেখা পাঠান এবং অবশ্যই উর্দুতে।

অন্যদিকে আমরা সন্ধান করছিলাম, কৃষণ চন্দরের দ্বিতীয় স্ত্রী সলমা সিদ্দিকির। দেখা গেল, কলকাতার কোন প্রকাশক তাঁর ঠিকানা রাখেন না। বোঝা গেল, একমাত্র 'রক্তকরবী' পত্রিকা জয়া মিত্র অনূদিত কৃষণ চন্দরের

'আত্মকথা' ছাপার সময় সলমা সিদ্দিকীর অনুমতি নিয়েছিল। সলমা তখন দিল্লীতে চাকরী করতেন। তারপর অনেক দিন গেছে।

প্রথমে আমরা মুম্বাই-এর টেলিফোন গাইড দেখলাম। সলমা সিদ্দিকী নামে কেউ নেই। এস সিদ্দিকী নামের সবকটা টেলিফোন নম্বরে ফোন করে উদ্দিষ্ট মানুষটিকে পাওয়া গেল না। কৃষণ চন্দরের নামের টেলিফোনও বেজে যায়, বেজে যায় সর্দার আলি জাফরির বাড়ির টেলিফোন নম্বর। কৃষণ চন্দরের বাড়ির ঠিকানায় চিঠি যায়, উত্তর আসে না। আমরা হতাশ হয়ে পড়ি। একজন মুম্বাই গেলেন। তিনি জানালেন, কৃষণ চন্দরের বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে এক প্রমোটারের কাছে। প্রমোটারের লোকজন সলমার নতুন ঠিকানা দিতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ একদিন যোগাযোগ হয় ড. শাহনাজ নবির সঙ্গে। তিনি মুম্বাইয়ে সাজিদ রসিদের টেলিফোন নম্বর দেন। সাজিদ বললেন অল ইন্ডিয়া রেডিও মুম্বাই-এর উর্দু শাখার সঙ্গে কথা বলতে। সেখানে পাওয়া গেল শহীদ রাহী, হরিশ মীরচন্দানীকে। তাঁরা বললেন চেষ্টা করবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিকানা দিতে পারলেন না, কেননা সলমা দীর্ঘদিন রেডিও স্টেশনে আসেন না। এবার পাওয়া গেল উর্দু অ্যাকাডেমীর টেলিফোন নম্বর। তাঁরাও ঠিক ঠিকানা দিতে পারলেন না ; তবে অন্য একজনের টেলিফোন নম্বর দিলেন তাঁরা। এইভাবে আমরা রফিয়া শবনম, নিদা ফজলি, জাভেদ আখতার—টেলিফোন থেকে টেলিফোনে দিন রাত্তির ঘুরতে লাগলাম এবং শেষ পর্যন্ত শাবানা আজমীর টেলিফোনে পৌঁছলাম। তিনি দিল্লীতে। দিল্লীতে টেলিফোন করা হলো। শাবানা বললেন, সলমা সিদ্দিকীর ঠিকানা তিনি জানেন না, কিন্তু তিনি সলমার ভাইকে জানেন ; তিনি থাকেন আলিগড়ে। আলিগড়ে ফোনে অবশেষে পাওয়া গেল সলমা সিদ্দিকীকে। যত সহজে লিখলাম তত সহজে হয়নি কাজটি। প্রত্যেককে তাঁর সময় মত ফোন করতে হবে, কেন না তাঁরা ব্যস্ত। এতগুলি ফোন করায় পত্রিকার তহবিলে টান পড়ল যথেষ্টই।

এবার মুম্বাই যাত্রার প্রস্তুতি। সলমার সঙ্গে কথা বলে টিকিট কাটা হল ৬ই ডিসেম্বর। শেষ পর্যন্ত সলমা জানালেন তিনি ফিরবেন ডিসেম্বরের শেষে। এবারের টিকিট ১লা জানুয়ারী। এবারও সলমা বাতিল করলেন যাত্রা—আবার টিকিট কাটা হল ১৩ই জানুয়ারীর। আবার টিকিট ফেরৎ। আসলে কৃষণ চন্দরের সব জিনিষপত্র আছে মুম্বাইতে।

ঠিকানা সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতায় সম্ভাব্য তথ্য সূত্রের সন্ধান করে চলেছিলাম। জাতীয় গ্রন্থাগার সংগৃহীত বইগুলির সন্ধান দিলেন। এ কাজ হলো কুমার ভট্টাচার্যের সৌজন্যে। কিন্তু সেখানে ইংরেজী বা হিন্দীতে লেখা কৃষণ চন্দর সম্পর্কিত কোন পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গেল না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থাও তথৈবচ। পশ্চিমবঙ্গ উর্দু অ্যাকাডেমীতে কৃষণ চন্দর সম্পর্কিত বই আছে একটি। তবে কৃষণ চন্দর সম্পর্কিত বিশেষ সংখ্যা 'শায়ের' দিয়ে তাঁরা সাহায্য করলেন আমাদের এবং সেই সাহায্যের মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল, তা ভোলার নয়।

যেসব রচনা প্রকাশিত হলো তা তিন ধরনের। একটি অংশ হলো স্মৃতিকথামূলক রচনা। এই অংশের মধ্যে পড়বে কৃষণ চন্দরের ভাই মহীন্দরনাথ, বোন সরলা দেবীর রচনা ও খাজা অহম্মদ অব্বাস, সলমা সিদ্দিকী, সুলতানা জাফরি ইত্যাদিদের স্মৃতিচারণা। এছাড়া কৃষণ চন্দরের কলকাতার স্মৃতি নিয়ে আছে একটি লেখা—মজহর ইমামের 'কলকাতায় কৃষণ চন্দর'। সুবিমল বসাকও জানিয়েছেন কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলে কৃষণ চন্দরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ। এই সব তথ্যসূত্রকে একত্রিত করে সঞ্চারী দাশগুপ্ত জীবনী রচনার প্রয়াস করেছেন 'পাকদন্ডী ঃ পূর্বখণ্ড' ও কৃষণ চন্দর ঃ উত্তর খণ্ড।

দ্বিতীয় অংশ, সমালোচনামূলক লেখা। দীননাথ সেন দেখিয়েছেন অন্যদের সঙ্গে কৃষণ চন্দরের শিশু সাহিত্যের তফাৎ। তিনি নজর করেছেন কৃষণ চন্দরের গল্পে কোনো রাজপুত্রের রাজকন্যা লাভের কাহিনী নেই, অর্থাৎ রাজ্য-রাজা-মন্ত্রিত্ব এবং পুরো সমাজ কাঠামোটা অটুট রেখে, কেবল রাজপুত্রের অ্যাডভেঞ্চার দিয়ে ভরে দেওয়া হয়নি শিশুর গল্প শোনার অসীম কৌতূহলের আকাশ পাতাল। কৃষণ চন্দর তাঁর কাহিনীতে নিপুণ হাতে মিলিয়ে দিয়েছেন লৌকিক অলৌকিক, কিন্তু উপসংহারে তীর চিহ্ন এঁকে দেখিয়ে দিয়েছেন সমাজতান্ত্রিক চেতনার পথ কোন দিকে। এই পথ ধরেই বিশ্লেষণ করেছেন জয়ন্ত মজুমদার ও রুদ্রদেব মিত্র। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ করেছেন, 'চাই না হিংসা, বন্ধ হোক বর্বরতা—এই কথাটা সোচ্চারে বলার মত লোক তখন বেশি ছিল না। এই কথাটা কৃষণ চন্দর শুনিয়েছেন একটা যন্ত্রের মুখ দিয়ে। একটা ভয়ানক যন্ত্রণার সময়ে লেখা এই গল্পের গঠনশৈলী আমাদের বিস্মিত করে দেয়।' গঠনশৈলী নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখেছেন জাহির আনোয়ার। রাজনীতি নিয়ে একটি প্রবন্ধ আছে জগদীশ চন্দ্র ওয়ার্ধানের। এটি তাঁর

'সাকসিয়ৎ ঔর ফান' গ্রন্থ থেকে নেওয়া। প্রত্যেকেই বলেছেন কৃষণ চন্দরের সাম্যবাদী চিন্তার কথা, মানবিকতার কথা। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার এক প্রায় অবিশ্বাস্য, দুর্বল পদচারনায় কৃষণ চন্দরকে হাঁটতে দেখা গিয়েছিল জরুরী অবস্থার সমর্থনের মিছিলে—উল্লেখ করেছেন সঞ্চারী দাশগুপ্ত। সেই সীমাবদ্ধতা শেষের কথা, লক্ষ্য করেছেন সঞ্চারী ; তার আগে বহু বছর ধরে একটি সম্ভাবনা ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করেছিল। আমরা কি করে ভুলব সেই কৃষণ চন্দরকে যিনি বিধান রায়ের পুলিশের হাতে বৌবাজারে গুলি খাওয়া গীতা-অমিয়-মনোরমা-প্রতিভাকে অমর করে রেখেছেন তাঁর 'ব্রহ্মপুত্র' গল্পে, কি করে ভুলব ভগৎ সিংহের দলে যোগ দেবার জন্যে তার গৃহত্যাগ, কি করে ভুলব প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ?

কৃষণ চন্দরের কয়েকটি লেখা সংকলনে রাখা হচ্ছে। একটি ব্রহ্মপুত্র—বৌবাজারের মিছিলে হত্যার কাহিনী, দ্বিতীয়টি পৌদেঁ বা কচিপাতা—হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত উর্দু প্রগতি লেখকদের সম্মেলনের কথা।

'যখন ক্ষেত জাগে' কৃষণ চন্দরের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এই প্রসঙ্গে কৃষণ চন্দরের নিজস্ব বক্তব্যও ছাপা হয়েছে 'যব খেত জাগে' রচনায়, পৃষ্ঠা ২৬৮। এই রচনাটি আমাদের হাতে আসে অনেক পরে। কৃষণ চন্দর নায়কের নাম দিয়েছিলেন 'রাঘব রাও'। গোলামদের নাম দেবতার নামে হবে একথা মানতে কিছুতেই রাজী ছিলো না উচ্চবর্ণ জমিদার সমাজ। অনবধানতাবশত আমরা 'যখন ক্ষেত জাগে' রচনায় নায়কের নাম রেখেছি রঘু রাও।

বাংলায় এই প্রথম অনূদিত হলো কৃষণ চন্দরের দ্বিতীয় রিপোর্টাজও—'ভোর ভয়ি'। কৃষণ চন্দরের অন্যান্য ধরনের রচনার সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করার জন্য এই প্রথম অনুবাদ করা হলো রম্য রচনা—'হাওয়ার কেল্লা', ব্যঙ্গ গল্প—'একটি অন্তিম হাসি' ও নাটক—'সরাই কে বাহর'। নাটকটি চলচ্চিত্রেও রূপান্তরিত করেছিলেন কৃষণ চন্দর। সেকথা জানিয়েছেন সেই চলচ্চিত্রের অভিনেতা শিবরাজ ও কৃষণ চন্দর সম্পর্কিত সরকারী তথ্যচিত্রের পরিচালক মধুসূদন। সুলতানা জাফরি শুনিয়েছেন কৃষণ চন্দরদের তুমুল হৈ-হল্লার-দিনগুলির কথা। সলমা সিদ্দিকী জানিয়েছেন কৃষণ চন্দরের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, প্রণয়, জীবনযাপনের কথা এবং আঠারো বছর বয়সের ফারাক সত্ত্বেও কোন মন্ত্র তাঁদের এক করে রেখেছিলো। সলমার সন্তান মুনিরও জানিয়েছেন সলমা-কৃষণের মিলন তাঁকে অসুখী করেনি।

কিছু কিছু প্রসঙ্গ তাঁরা এড়িয়ে যাবারও চেষ্টা করেছেন, যেমন কৃষণ চন্দরের প্রথম স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে আসার সময়কার অশান্তি, কারাবাস বা কৃষণ চন্দরের জরুরী অবস্থাকে সমর্থন করা। সেই সব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন সঞ্চারী দাশগুপ্ত। তাঁর জীবনী এবং কৃষণ চন্দর সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্য এক নজরে কৃষণ চন্দরকে স্পষ্ট করে তুলবে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে সলমা তাঁকে লেখা কৃষণ চন্দরের চিঠিগুলি দিতে একদমই রাজী হননি। অবশ্য পত্রিকা সম্পাদকদের বা বন্ধুদের লেখা কিছু চিঠি আমরা এখানে ছাপতে পারলাম। চিঠিগুলির সূত্রে কৃষণ চন্দরের জন্মদিন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা সহজ হলো। সঞ্চারী জগদীশ চন্দ্র ওয়ার্ধানের সূত্র ধরে জানিয়েছেন কৃষণ চন্দরের জন্ম ১৯১৩ সালে। কিন্তু সব বাংলা বইতেই তা করা হয়েছে ১৯১৪। একটি চিঠিতে কৃষণ চন্দর নিজেই জানিয়েছেন ওটি হবে ১৯১৩। কিন্তু কৃষণ চন্দর নিজের জন্মের তারিখটি ভুল দিয়েছিলেন। ওটি হবে ২৩শে নভেম্বর।

'ভোর ভয়ি' কৃষণ চন্দরের ত্রিচুর সম্মেলনে যাত্রার কাহিনী এবং সেই উপলক্ষে তিনি দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জন জাগরণের ইতিহাস ছুঁয়ে গেছেন এবং সেই সব বিদ্রোহকে দেখেছেন বিশ্বের বিপ্লবী ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। এই রচনারই পরিপূরক হিসাবে কৃষণ চন্দরের 'যখন ক্ষেত জাগে' ছাপা হলো এবং সেই সঙ্গে কমলেশ সেনের অনুবাদে 'যব খেত জাগে' সম্বন্ধে কৃষণ চন্দরের নিজের প্রতিবেদন। এই সঙ্গে থাকছে প্রগতি আন্দোলনে কৃষণ চন্দরের ভূমিকা; লিখেছেন জাহিরুল হাসান, তাঁর প্রবন্ধ —'কৃষণ চন্দর : সাহিত্যে ও ইতিহাসে।'

সঞ্চারী কৃষণ চন্দরের জীবনের আর একটি দিক নিয়ে আপত্তি করেছেন। তাঁর মতে কৃষণ চন্দর মহিলাদের বিনোদনের উপকরণ ভাবতেন। একথা ঠিক, কৃষণ চন্দরের মধ্যে ছিলো রোমান্টিকতা, নীহাররঞ্জন বাগ যাকে বলেছেন 'আবেগতপ্ত ভাবপ্রবণতা', যা হয়তো কখনো তাকে নিয়ে যায় নিহিলিজমের দিকে। কিন্তু কেমন করে আমরা ভুলবো সেই কৃষণ চন্দরকে, যিনি এসে দাঁড়ান সমাজতন্ত্রী সাজ্জাদের সঙ্গে, প্রগতি লেখক শিবিরে যার অবস্থান ছিলো স্পষ্ট। নীহাররঞ্জন বাগ তাঁর 'কৃষণ চঁদরের ছোটগল্পে মানবতাবাদের স্বরূপ' প্রবন্ধে কৃষণের মানবতাবাদকে বলেছেন প্রলেতারিয় মানবতাবাদ। কৃষণ বুঝতে ভুল করেননি যে উঠে আসতে হবে শ্রমিকশ্রেণীকে, আঘাত করতে হবে মূলধনের উপর, রাষ্ট্রের নিয়ন্তা হতে হবে তাদের। এই কৃষণকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন স্বয়ং মাও সে তুঙ, বইয়ের পাতায় নিজের নাম দস্তখৎ করে। আমাদের দুর্ভাগ্য সলমা সিদ্দিকির কাছ থেকে সেটি আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি।

রাজীব চৌধুরী লক্ষ করেছেন কেমন করে কৃষণ চন্দর উন্মোচন করে চলেন শ্রেণী কাঠামোর ওপর সামাজিক অভ্যেসে ঢেকে রাখা নানান পর্দাগুলোকে। গর্তে পড়ে যাওয়া মানুষটিকে, অথবা বলা যায় গর্তে আবদ্ধ মানবতাকে কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে না। গর্তে পড়ে যাওয়া লোকটি সাহায্য চাইলে কবি বলে, "আমার দ্বারা ও কাজ হবে না, ও সব করলে আমার সাহিত্যে সংযমের অভাব ঘটতে পারে, এমনকি সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক হয়ে যেতেও পারে।' লোকটি আর গর্ত থেকে উঠতে পারে না। সেখানেই সংসার শুরু করে দেয়। কিন্তু একদিন সাম্যবাদীদের এক মিছিল থেকে অনেক হাত এগিয়ে যায় গর্তের দিকে। কিন্তু এক শ্রেণীর প্রতিভূ সেই গর্তের মানুষটি চীৎকার করে বলে 'তোমরা যাও। আমার জন্যে এখন এই গর্তই যথেষ্ট। আমরা তোমাদের সঙ্গে যাবো না, এই গর্তের মধ্যেই বেশ আছি।'

আজ আমরা কি এই গর্তের মধ্যেই বেশ আছি বলে জীবনের ডাক উপেক্ষা করছি না? একথা মনে করিয়ে দেন বলেই কৃষণ চন্দরের প্রাসঙ্গিকতা। কিন্তু গর্তের মানুষটি উঠতে চাইলো না কেন? জঞ্জাল বুড়ো, রাজীব লক্ষ করেছেন, কথা বলে আবর্জনার টবের সঙ্গে—'এ জগতে যা কিছু কথাবার্তা হয়, মানুষের মাঝখানে হয় না, নিজেদের শ্রেণীর মধ্যেই হয়। আর কোন স্বার্থকে কেন্দ্র করেই হয়।'

গর্তে পড়া মানুষটি সম্ভবত বুঝেছে মিছিলের হাত তার শ্রেণীর নয়। ভারতের যাবতীয় প্রগতি আন্দোলন কি নিজের শ্রেণীস্বার্থের বাইরে গিয়ে নিজেকে উন্মোচন করেছে? কৃষণ চন্দর কিন্তু এখানেই শেষ করেননি। তিনি নিজেকে, নিজের শ্রেণীকে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেছেন, উন্মোচন করেছেন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রতি উন্নত দেশের মনোভাবও। আর এখানেই কৃষণ চন্দরের প্রাসঙ্গিকতা।

কয়েকটি রচনা আমরা প্রকাশ করতে পারলাম না। নিদা ফজলির মুম্বাই-এর বাড়িতে গিয়ে, কয়েকবার লোক পাঠিয়েও তার প্রকাশিত রচনাটি যোগাড় করতে পারিনি আমরা। ব্যস্ত 'ইনকিলাব' সম্পাদক দেখা করার সৌজন্যও দেখাননি। নৌসাদ মোমিনের লেখাটি ছাপা গেল না শুধুমাত্র অনুবাদকদের সময় না থাকায়।

এই সংখ্যায় কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে গেল আমাদের। কৃষণ চন্দর ও বিদ্যাপতির ছেলে রঞ্জনের সন্ধান আমরা মুম্বাইতে পাইনি; দিল্লী গিয়ে

রেবতীশরণ শর্মা ও কৃষণ চন্দরের অন্য আত্মীয়দের সঙ্গেও আমরা যোগাযোগ করতে পারিনি। পাঠকরা ছোটো পত্রিকার আর্থিক সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে, আশা করি, আমাদের মার্জনা করবেন। তবে পাঠকদের এ বিষয়ে আশ্বস্ত করতে পারি যে কৃষণ চন্দর সম্পর্কে একটি সামগ্রিক রূপরেখা আমরা বইটি দিতে পারলাম।

বলা বাহুল্য, বহু মানুষ আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। মুম্বাইতে আমাদের নিজের আত্মীয়ের মতো বাড়িতে স্থান দিয়েছিলেন বিশ্বনাথ মালিক। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকেছেন সন্দীপ মান্না। মুম্বাই প্রবাসী প্রদীপ কুণ্ডু ও অসিত দাশের নাম উল্লেখ না করলে অপরাধ করা হবে। এই সঙ্গে আমাদের অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে এঁদের পরিবারবর্গকে। তাঁরা আমাদের মুম্বাই প্রবাস সুখকর করে তুলেছিলেন।

উর্দু থেকে অনুবাদের কাজে সাহায্য করেছেন ফহিম আনোয়ার ও শওকত আজিম। সাক্ষাৎকারগুলি শ্রুতিধর যন্ত্র থেকে তুলে আনার শ্রমসাধ্য কাজ করেছেন দিলীপন ভট্টাচার্য। 'সুবহ হোতী হৈ' রিপোর্তাজটি অনুবাদ করা হয়েছে জাতীয় গ্রন্থাগারে বসেই—কাঞ্চন কুমার তাঁর শ্রম ও সময় দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন। ভোলা যাবে না ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাকাডেমীর সহযোগিতা, চেয়ারম্যান সুলেখক শালিক নখনভি, সেক্রেটারী শায়ক আহমদ, ডেপুটি সেক্রেটারী নিশাত আলম ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন, খোঁজখবর করেছেন। এই বইয়ের কাজে যাঁরা নিয়মিত উৎসাহ দিয়ে গেছেন তাঁরা হলেন দিলীপন ভট্টাচার্য, দিলীপ চক্রবর্তী, দিলীপ কুমার বসু, সুবীর চক্রবর্তী, সুজিৎ ঘোষ, কুমার ভট্টাচার্য, নিত্যানন্দ দাস, নীহাররঞ্জন বাগ, অমিতাভ মিত্র, কিশোর কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকৃতিশ বাগচী, দেবদর্শন দত্ত, রূপায়ন মণ্ডল, কৃষ্ণা দাস অধিকারী, গৌতম দত্ত, সুজিত সাহা, দীপঙ্কর ঘোষ, মেহেতাবউদ্দীন আহমদ, রুদ্রদেব মিত্র, জহিরুল হাসান, কৌশিক জানা, পল্লব মিত্র ও শাহযাদ ফিরদৌস। লেখক, পাঠক, ছাপাখানার কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রকৃতি সমাজ প্রগতি ঃ কৃষণ চন্দর

প্রথম পর্ব

উর্দু থেকে অনুবাদ : ফহিম আনোয়ার
স্বপন দাসাধিকারী

কৃষণ চন্দর

চারাগাছ

পৌদেঁ—কোন বিবরণী নয়, লেখক নিজেই এখানে চরিত্র হিসেবে আছেন। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত প্রগতিশীল লেখক সম্মেলনের একটি চলন্ত চিত্র এখানে আঁকা হয়েছে। ঘটনা স্থান কাল পাত্র সবই বাস্তব, লেখক শুধু ধারাবাহিকতা ও সংকলনের দায়িত্ব নিয়েছেন।

ভূমিকা

কত শক্ত সেই জমি যেখানে দশ বছর অবিরাম কঠিন পরিশ্রমের পর চারাগাছগুলি জন্ম নেয়, আবার ঐ বীজের জীবনীশক্তিও কত প্রবল যে দশ বছর ধরে মাটি, ধুলো, কাদায় মাখামাখি হয়েও নিজেকে অটুট রেখে জীবনের দিকে এগিয়েছে। এইবার তাতে অঙ্কুর গজাল এবং তা থেকে জীবনের নতুন নরম রেশমী সবুজ প্রথম পাতাগুলি ফুটে বেরোল। প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলন দশ বছর হলো শুরু হয়েছে। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৬ হতে চললো; আজ এই চারাগাছগুলি দেখতে পাচ্ছি। কৃষণ চন্দর এদের ছবিই মনোমোহিনী সুন্দর অনুভবে তুলে ধরেছেন। অবশ্য যত আকর্ষণীয় ভাবেই আমি তুলে ধরি না কেন এদের ছবির ব্যক্তিত্ব ও কার্যকলাপ খুব বড়ো নয়, তাদের চেহারা ও চরিত্র সাধারণের চেয়ে উল্লেখযোগ্য নয়, এমন কি ভুলভ্রান্তিও থাকতে পারে তাদের, তবু সেই সমষ্টির আবেগ, কল্পনা, সংগীতময়তার প্রভাবে সভা উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিলো। তাদের জানার প্রবল আগ্রহ পরিবেশের মধ্যে লাল ভাবধারার কম্পন সঞ্চারিত করেছিল। 'প্রগতিশীল' শব্দটি খুবই সাধারণ, গদ্যময়, শীতল—কিন্তু দশ বছরে শব্দটি অভিধান থেকে উঠে এসে এক সংগঠনের আকার নিলো। আমার সেদিনের কথা ভালোভাবে মনে আছে যেদিন দু-তিন জন যুবা একটি বিজ্ঞপ্তির মুসাবিদা নিয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছিল। প্রেমচন্দ, যোশ ও আবদুল হক যখন দস্তখৎ করলেন, আমি বুঝলাম, খুব বড়ো একটা সাফল্য লাভ করা গেছে। এরপর যখন প্রথম লক্ষ্মৌ সম্মেলন হলো 'রফা-হে-আম' প্রেক্ষাগৃহে, খুব ঘটা করে আমরা দু-আড়াইশো টাকা সংগ্রহ করেছিলাম। সারা রাত শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে সম্মেলনের পোস্টার সেঁটে ক্লান্ত হয়েও তবু খুব সকালে প্রেক্ষাগৃহে পৌঁছে গিয়েছিলাম, কেননা পনেরো বিশজন অন্তত সেখানে থাকা দরকার। ঘন্টা দু ঘন্টা টিকিট দেখার পর সম্মেলন সবার জন্যে উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো, যাতে দরিদ্র ছাত্ররা সম্মেলনের শরিক হতে পারে। সেই সময় আমরা খুব হতাশাতে ভুগছিলাম। সারা ভারত থেকে মোটে পনেরো কুড়িজন প্রতিনিধি এসেছিলেন। মঞ্চ ছিলো খুব ছোটো। সভাপতির চেয়ার ও ডেস্ক ছিলো খুব পুরনো এবং দীর্ণ। দুটি চেয়ার ছিলো মঞ্চে—একটিতে বসে ছিলেন প্রেমচন্দ, অন্যটিতে হসরত মোহানি। ধীরে ধীরে হল ভরে গেল—আনুমানিক দেড় দু শো মানুষ এসেছিলেন। অবশ্য তাদের বেশির ভাগই সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত নন। তাই লোকেরা ব্যঙ্গ করে বলত, সাহিত্য সম্মেলনে প্রগতিশীলদের সংখ্যা বেশি, লেখকের সংখ্যা কম। একথা শুনলে আমাদের কষ্ট হতো, যদিও অভিযোগ সঠিকই ছিলো। যারা ব্যঙ্গ করত তারা সত্যতার অন্য দিকটা বুঝত না। দশ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর সত্যতার উল্টো পিঠটিকে তখন আমরা কিছুটা অনুভব করতে পেরেছি, অনুভব করতে পেরেছি প্রগতিশীলতার অর্থ। প্রগতিশীলতার অর্থ নিজের জীবনে প্রগতিশীল হওয়া, নিজের জ্ঞান ও অনুভবকে প্রগতিশীল করা এবং নিজের চরিত্রকে প্রগতিমুখী করা, নিজের ব্যক্তিত্বকে পরিবর্তন, নিরন্তর পরিবর্তিত করতে থাকা। এই কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়,

অত্যন্ত কঠিন। জীবনে প্রগতিশীল না হয়ে কারও পক্ষে প্রগতিশীল লেখক হওয়া শুধু কঠিনই নয়, অসম্ভবই। আমরা আমাদের উদ্দেশ্যকে গুরুত্ব না দিয়ে গণস্বাক্ষর, জমায়েত বা ধনীদের সমর্থনকে বড়ো করে দেখতাম, আমাদের ম্যানিফেস্টোর কাজকে গুরুত্ব দিতাম না। ম্যানিফেস্টো গুরুত্বপূর্ণ শুধু এই কারণে নয় যে তা বড়ো মানুষদের স্বাক্ষর বহন করছে, বরং তা গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু তা ধারণ করছে এক নতুন বিবেক ও জীবন্ত সত্যকে। এতে একটি নতুন উৎসাহ ও নতুন সংকল্প ঝলসে উঠছিলো, যা শুধু ভারতবর্ষের মানুষকে নয়, সারা দুনিয়ার মেহনতী মজদুর বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাজে উৎসাহ এনে দিলো। আমরা বললাম- -

'আমবা চাই ভারতবর্ষের নতুন সাহিত্য আমাদের জীবনের মূল সমস্যাগুলিকে বিষয়বস্তু করুক। এই সমস্যাগুলি হলো ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক অবনতি ও পরাধীনতা। আমরা সেই সব কিছুর বিরোধিতা করব যা আমাদের নিষ্ক্রিয়তা, অলসতা, কুসংস্কারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা সেই সব বচনাকে পবিবর্তন ও প্রগতির উৎস হিসেবে গ্রহণ করব; যা আমাদের সমালোচনা শক্তিকে সজাগ করে, সংস্কার ও সংস্থাগুলিকে জ্ঞানের কষ্টিপাথরে পরখ করে।' (প্রগতিশীল লেখকদের বিজ্ঞপ্তি)

প্রগতিশীলদের এই কামনা আর উদ্দেশ্য কোন বায়বীয় স্তরে ছিলো না, আমাদের সমাজ ও জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা ছিলো। যেহেতু প্রগতিশীলদের কাছে এই কথা শোনা যেতো সেইজন্য দেশের স্বাধীনতা ও সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনও ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। সাংগঠনিক ত্রুটি সত্ত্বেও ভারতের বড়ো বড়ো ভাষার সবচেয়ে সম্ভাবনাময় লেখকেরা এই সংগঠনের মধ্যে চলে এলেন। হায়দ্রাবাদে (দক্ষিণভারত) গত বছর (সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) উর্দুর প্রগতিশীল লেখকদের প্রথম নিখিল ভারতীয় সম্মেলন হয়। একে নিয়েই কৃষণ চন্দর পৌদেঁ লেখেন। আমার মতে এই সম্মেলন আমাদের আন্দোলনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সাহিত্য আন্দোলনের প্রথম পর্ব পার করতে দশ বছর কেটে গেল। আমাদের আন্দোলন মজবুত হলো। এবার আমরা চাই এ চারাগাছগুলি বেড়ে উঠুক, বেড়ে মজবুত হয়ে ফুল ও ফলে ভরা বৃক্ষে পরিণত হোক। যদি কেউ মনে করে এই নতুন যুগে আমাদের কাজ আগের তুলনায় সহজ তবে সে খুবই ভুল করবে। দশ বছরে বিপ্লবী শক্তি যেমন বেড়েছে, তেমনি সমস্যাও জটিলতর হয়েছে।

ভারতবর্ষে গণআন্দোলনের তীব্রতা বেড়েছে। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টি—এই তিনটি দল যুদ্ধচলাকালীন নিজেদের প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তৃত করে এবং ফলে তিনটি দল দেশের প্রত্যেক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও রাজনৈতিক মঞ্চে তাদের ঐক্যের সম্ভাবনা তেমন উজ্জ্বল নয়, তবু আমরা কৃতজ্ঞ এইজন্যে যে এই তিনটি দলেরই প্রগতিশীলেরা সাহিত্যিক মোর্চায় দুধের মধ্যে জলের মতো মিশে আছেন। যাঁরা এর মধ্যে নেই, তাঁদের বেশির ভাগই এদের দ্বারা প্রভাবিত। আর যাঁরা বিরোধী তাঁদের মাথার মধ্যেও প্রগতিশীলদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি ধারণা আছে। আমার মতে, আমাদের দেশের সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য প্রগতিশীল লেখকদের এ ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ঐক্য একটি ভালো লক্ষণ। প্রতিটি পরিস্থিতিতে আমাদের এই ঐক্যকে সমর্থন করা উচিত। সম্ভাবনা প্রবল যে আমাদের

তরুণ লেখকদের কাজগুলি বয়স্ক লেখকদেরও অনুপ্রাণিত করবে এবং সবাই একত্র হয়ে দেশের স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানের জন্য কাজ শুরু করবেন। আমাদের জাতি শুধু এশিয়া নয়, বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে নিশ্চয় বিশেষ স্থান করে নেবে। এই মুহূর্তে দেশের পরিবেশ হয়তো এই কাজের জন্য বেশি উপযোগী নয়, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আলাদা আলাদা দলের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, এসবের মধ্যে কাপট্যও হয়তো আছে, কিন্তু স্পষ্ট এবং আশার যে কথা আমি না বলে পারছি না, তা হলো, দলগুলির মধ্যে লড়াই যতোই তীব্র হোক, এ নিয়ে মাথা খারাপ করার দরকার নেই। এ কথা মনে রাখা দরকার একদিন এর নিষ্পত্তি হবেই, একদিন ঐক্য হবেই, একদিন ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক সংগঠন এবং গণআন্দোলনগুলিকে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মোর্চা গড়তে হবেই। সেই উদ্দেশ্যে সংযোগ বিকাশের জন্য আমাদের সব ঐতিহাসিক কৌশল ও প্রয়াসকে কাজে লাগানো উচিত। এই দেশের সাহিত্যিকদের এর চেয়ে বড়ো কৃতিত্ব আর কি হতে পারে যে তাঁরা জনগণের কল্যাণে এক পরিস্থিতি গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। এই দেশের চল্লিশ কোটি মানুষের জন্য এই পরিস্থিতি গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেউ কেউ বলতে পারেন, আমরা সাহিত্যের সাময়িক মূল্যবোধের উপর বিতর্ক করছি ; আমাদের বরং সাহিত্যের চিরন্তন মূল্যবোধ নিয়ে ভাবিত হওয়া উচিত।

আমার জানা নেই, সাহিত্যের চিরন্তন মূল্যবোধ কি? আমি শুধু একটি চিরন্তন মূল্যবোধের কথা জানি যার অর্থ পরিবর্তন ও বিকাশ। মানুষের সামাজিক জীবনের পরিবর্তন আমাকে তার বিকাশের একটি প্রয়োজনীয় মূল্যবোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই একটি চিরন্তন, যার মূল্যবোধের অস্তিত্বের কথা আমি মানতে পারি। তাছাড়া যত মূল্যবোধ আছে তা মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়ের বোধে বা অনুভবের বৃত্তে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। সেই কারণে চিরন্তনতা বলে কিছু নেই। কিছু কিছু লোক ভালবাসাকে একটি চিরন্তন মূল্যবোধ ভাবেন, কিন্তু আমি এর সঙ্গে একমত নই। পুরুষ এবং নারীর প্রেমেও পরিবর্তন হয়ে থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীর ভালবাসা এবং বিংশ শতাব্দীর ভালবাসা এক নয়। পাথর এবং ধাতুর যুগ থেকে বর্তমানে যান্ত্রিক যুগ পর্যন্ত নারী এবং পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে পর্যালোচনা করলে সবসময় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। এখন বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে মানুষের ভালবাসার বিভিন্ন মূল্যবোধ লক্ষ্য করা যায়। বিয়ের আগে, বিয়ের পরে, বিয়ের প্রচলিত পদ্ধতিতে, ঘরে বাইরে, শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণে, সম্পত্তিতে, এমনকি পারস্পরিক বোঝাপড়া ও একত্র কাজের মধ্যে, জীবনের সব মুহূর্তগুলিতে নারী ও পুরুষের পরস্পর ভালবাসার নিরন্তর পরিবর্তন ঘটে চলেছে। ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে এক সমাজে নারীরা পুরুষের দাসী, অন্য সমাজে পুরুষরা নারীর দাশ. এক সমাজে পুরুষ মহিলাদের দিয়ে হারেম সাজায়, অন্য সমাজে নারী নিজের ঘর পুরুষ দিয়ে সাজায়। বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি ভালবাসার পর আর একটি ভালবাসা জন্ম নেয়। প্রেমের জন্য আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হবার পরও নারী বেঁচে থাকে; আবার কারো সঙ্গে প্রেম করে, পাঁচটি সন্তানের জন্ম দেয়। এই জন্য আমি বলি, ভালবাসার মূল্যবোধও ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়। জীবনে সব নারী লায়লা নয়, সব পুরুষও মজনু নয়। লায়লা মজনুর সংখ্যা সীমিত, ব্যতিক্রম মাত্র। এইজন্যই ভালবাসা ও চিরন্তন মূল্যবোধ সমার্থক বললে

সত্যের প্রতি সুবিচার করা হবে না। শুধু বিপ্লব এবং পরিবর্তন এই দুটিই দুনিয়ায় চিরন্তন। মানুষের এই সমাজ, সাহিত্য, কল্পনা যদি এই পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে না চলে তাহলে তাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এদের অবস্থা হবে সেই সব হাজার হাজার বছর আগেকার প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো, বিকাশের সঙ্গে সংগতি রেখে চলতে না পারায় যারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমি একথা মেনে নিতে এতটুকু ইতস্তত করিনা যে আমরা চিরন্তনতা বা চিরন্তন মূল্যবোধের উপাসক নই, বরং আমরা এই সময়ের কবি, এই সময়ের গল্পকার। আমরা সেই জীবনের উপাসনা করি যা জড় নয়, কর্মনিয়, মৃত নয়, জীবিত, যা মৃত্যুর মতো অচল নয় বরং নিয়ত পরিবর্তনশীল। মাটিতে জন্মায় পদ্ম, পদ্ম থেকে মেলে মধু। এই জগৎ এসেছে পরিবর্তন থেকে---প্রথম থেকে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়---প্রতিটি পরিবর্তনই কিন্তু এক ধরনের পূর্ণতা। লোকে যাকে সুন্দর বলে তা পরিবর্তনের একটা চেহারা মাত্র এবং সৌন্দর্য রচনা যদি সাহিত্যের লক্ষ্য হয়, তাহলে এই রচনা তারা করতে পারবে না, যারা চিরন্তনতা নিয়ে ভাবিত। যারা শ্বেত পাথরের মহলে বসে অবাস্তব দর্শন গড়তে চায়, তারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চায়। তারা জানে না মানুষ কি চিন্তা করছে, তারা কি খাচ্ছে বা পরছে, কেমন করে তারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে, কেমন করে ভালবাসছে। এই সব জীবন্ত সত্য থেকে সরে গিয়ে ফাঁকা অন্ধকার মন নিয়ে কেমন করে সাহিত্য রচনা সম্ভব তা আমি বুঝতে পারি না। অন্তহীন এবং সদা পরিবর্তনীয় জীবনের টানের মধ্য থেকেই আমরা সত্য, সৌন্দর্য ধারাবাহিক জীবনকে জানতে পারি। বাস্তব সাহিত্য, সৌন্দর্যের সাহিত্য, সুন্দর ও মজবুত সাহিত্য গড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে সম্ভব নয়।

আরও একটি সম্ভাবনা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। হিরোশিমার বোমাবর্ষণ থেকে এক পরমানু যুগের সূচনা হয়েছে। পরবর্তী পঁচিশ বছরে পরমানু নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা সম্ভাবনাময় হতে চলেছে, সেখানে অবশ্যই আমাদের ধ্বংসাত্মক দিকটি নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানীরা যদি ধ্বংসাত্মক দিকটি নিয়ে যুদ্ধঘোষণা না করেন তাহলে তারা আগামী কুড়ি পঁচিশ বছরের মধ্যে মানবজাতির অবশেষ ডেকে আনবেন। বিজ্ঞানের উন্নতির নামে যুদ্ধের অস্ত্র যদি এই সংখ্যায় বাড়তে থাকে এবং তার ভয়াবহতাও বেড়ে যায়, তাহলে মানুষ আর তার সাহিত্য শেষ বিচারে কিছুই বাঁচবে না। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা নিজেদের সংস্থা গড়ে ধ্বংশের প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করেছেন। প্রগতিশীল লেখকদের উচিত এই প্রস্তাবগুলিকে সমর্থন করা। পরমাণু শক্তিকে সংযত করতে এর নিয়ন্ত্রণ কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য এই সমস্যার সমাধান এত সহজ নয়। আমার সন্দেহ হয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা পরমানু শক্তির ব্যবহার ইতোমধ্যে জানতে পেরেছে; না পারলেও দু এক বছরের মধ্যে জেনে যাবে। কিছুতেই লুকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। আন্তর্জাতিক সংস্থা হয়তো সাময়িক কোন প্রতিরোধ তৈরী করতে পারে। আসল কথা হলো, যুদ্ধের প্রতিরোধ ততদিন সম্ভব নয় যতদিন এই দুনিয়ায় ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ থাকবে, যা মানুষকে মানুষের গোলাম করে রাখে, যতদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, যতদিন সাহিত্য ধনতন্ত্রের প্রশংসা করে যাবে, যতদিন সংবাদপত্রের উপর থাকবে অর্থের দখল। যতদিন না আমাদের সব উৎপাদন গণতান্ত্রিক সাম্যবাদের নিয়মে ভাগ করা যাবে ততদিন এই দুনিয়ায়

শান্তিস্থাপন সম্ভব নয়; ততদিন দুনিয়ায় সত্যিকারের স্বাধীনতা আসবে না।

মানব সভ্যতা এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁচেছে যেখানে শ্রেণীভেদের সমস্যা প্রবল বা তীব্র আকার নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হয় আমাদের অগ্রসর হতে হবে নয় লুপ্ত হতে হবে, যেমন করে হাজার হাজার বছর আগের জন্তুরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একইভাবে ইতিহাসের অগ্রগতি এবং তার বৈপ্লবিক গুরুত্ব অনুভব করতে না পারলে এই মানবসভ্যতা আত্মহত্যার পথেই এগোবে। আজ থেকে হাজার বছর পর নতুন জীব এসে প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে এই নির্বোধ আত্মঘাতী জীবন প্রণালীর সূত্র সন্ধান করবে। সন্ধান করবে সেই সূত্রের যা সভ্যতা সাহিত্য সমাজ জাতিকে অগ্রসর হতে দেয়নি। সে ভাববে মানুষ 'যদি' এই সিদ্ধান্ত না নিতো তাহলে কিভাবে এগোতো? এই 'যদি' মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো 'যদি' হয়, তাহলে আমি মানুষের ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশাবাদী। আমি বিশ্বাস করি আমরা সঠিক বিচার করব এবং দেশের ও বিশ্বের নেতাদের এই ব্যাপারে বাধ্য করব, তারা যেন সাংগঠনিক বা কূটনৈতিক লাভের জন্য মানবতাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য না করে। মানবতা এমন এক ভঙ্গুর মোড়ে পৌঁচেছে যে প্রত্যেক প্রগতিশীল লেখকের অত্যন্ত তীব্রতার সঙ্গে সাম্যবাদী ব্যবস্থাকে সমর্থন করা উচিত। আমরা তা না করলে, তা হবে এক অমানবিক গাফিলতি যার সাজা আমাদের প্রত্যেককে পেতেই হবে, সে আমরা বুঝি বা না বুঝি।

উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই কথা বলে আমি ভাষার সমস্যার মধ্যে চলে যেতে চাই, যেহেতু এটি উর্দু সাহিত্যিকদের প্রতিনিধিদের সম্মেলন। আমি স্পষ্ট ভাবে একথা বলতে চাই, আমি উর্দুকে শুধু মুসলমানদের ভাষা বলে মনে করিনা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই ভাষার সিংহভাগের উপর মুসলিম সভ্যতার ছাপ আছে; হিন্দুরা এর প্রচলন ও প্রসারে মুসলমানদের চেয়ে কম অংশ নিয়েছে। এই ঐতিহাসিক সত্যকে যেমন অসত্য বলা যাবে না, তেমনি একথাও অস্বীকার করা যাবে না হিন্দু এবং এই দেশের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও উর্দুর প্রসার ও বিকাশে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। এই দুর্ভাগা দেশের সীমাবদ্ধ রাজনীতি সত্ত্বেও, সাম্প্রদায়িকতার ধারা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও, মুসলমান, হিন্দু, শিখ ও অন্যরাও সবাই মিলে এই ভাষার বিকাশের জন্য রক্ত দিয়েছে। কাপট্যের এই দুনিয়াতে সেও একটি চারাগাছ যার জলসিঞ্চন আমরা সবাই মিলে করেছি, তাকে ফুলের মতো, নিষ্পাপ হাসির মতো, পবিত্র গানের মতো প্রিয় করে রেখেছি। তাই এটি একটি এমন ভাষা যাকে ভারতের বিভিন্ন জাতি মিলে একযোগে তৈরী করেছে। একে একটি জাতির প্রতি উৎসর্গ করা প্রবল সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ভুল হবে, এবং এই পৃথিবীতে সেই ভুল থেকে উদ্ধার পাবার কোন উপায় নেই। যদি আমেরিকা ও ইংল্যান্ড দুটি ভিন্ন জাতি হয়েও, দুদেশের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের তফাৎ সত্ত্বেও একটি ভাষাকে গ্রহণ করতে পারে এবং একটি ভাষাকেই সাংস্কৃতিক ভরকেন্দ্র করতে পারে, তাহলে ভারত ও পাকিস্থান পাশাপাশি থেকেও কেন এই ভাষাকে গ্রহণ করতে পারবে না, যে ভাষা তারা রচনা করেছে, বিস্তৃত করেছে, এগিয়ে নিয়ে এসেছে। আমি মনে করি, ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সম্মান বজায় রেখে, অন্যভাষা বিকশিত করেও, এমন ভাষার প্রয়োজন থেকে যায় যা এই দেশের সব গোষ্ঠীর ভাষা হতে পারে। আমার মতে উর্দু পুরোপুরি এই প্রয়োজন মেটায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক কাপট্য সত্ত্বেও এর প্রচলন ও প্রসারে কোন ত্রুটি রাখলে চলবে না। এটিকে

সীমাবদ্ধ না রেখে, আমাদের উচিত এমন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া যাতে এটি ভারতের সব গোষ্ঠীর পারস্পরিক ভাষা হয়ে যায়। এই জন্য যদি অন্য গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ধারাকে স্থান দিতে হয় তাহলে তাও দেওয়া উচিত। আমি এতে উর্দুর বিকাশ দেখি এবং এতেই ভারতীয় সংস্কৃতির বনিয়াদ দেখতে পাই যা ভবিষ্যতে এশীয় সংস্কৃতির বিকাশে সমান ভূমিকা নিতে পারে।

প্রগতিশীল উদ্দেশ্যের প্রসারের জন্য আমাদের নিজেদের ভাষার ও কর্মের বৃত্তকে বিস্তৃত করতে হবে। আমাদের নিজেদের সাহিত্যের সেই দিকগুলি নিয়েও চিন্তাভাবনা করতে হবে যেগুলি নিয়ে কোন কাজ হয়নি। অথবা আমাদের ত্রুটির জন্য অসম্পূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি—এই সব বিষয়ের উপর শিক্ষামূলক পুস্তকের অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রগতিশীলদের এই বুনিয়াদী অনুশীলনের ব্যাপারে এখন পর্যন্ত আমরা কোন কাজ করিনি। মজুর ও কিষাণের কাছে পৌঁছানোর জন্যেও সহজ সরল ভাষায় লেখা দরকার, সস্তার বইয়ের দরকার এবং দরকার সেই দৃষ্টিভঙ্গীর যা মজুর ও কিষাণদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, তাদের জীবনের সমস্যা সম্পর্কে অবগত করতে পারে, তাদের আনন্দ দিতে পারে। আমাদের সাহিত্য এই পরিস্থিতিতে ফলদায়ী হবে না কেননা তার উৎস মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সাহিত্যের বেশিরভাগ বিষয়ই মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে নেওয়া হয়েছে। হয়তো বা তা এই মুহূর্তে অনিবার্য, কিন্তু আমাদের এই বাধা ভেঙ্গে দেওয়ার* চেষ্টা করা উচিত, মজদুর কিষাণের স্বরে কথা বলা উচিত। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য, সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য হবার জন্য, যদি সাংবাদিকতার সাহায্য নিতে হয়, সাহিত্যের মানকে নীচু করতে হয়, তাহলেও আমি একে নিজের উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক বলে মনে করব, কারণ সাহিত্যের স্রোত ও উৎস হলো সাধারণ মানুষ। সেই স্রোতমুখে আমরা আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করাব। এই সেই স্রোত যা আমাদের শক্তি দেয়, জীবনীশক্তি বাড়ায়। আমরা যদি এই স্রোতের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই এবং একে গুরুত্ব না দিই, তাহলে আমাদের সাহিত্য শুকিয়ে যাবে, বসন্ত ঋতুতে হেমন্তের রিক্ততা নেমে আসবে ; আমাদের উদ্দেশ্য কখনো পূরণ হবে না।

বোরিবন্দর

কৃষণ চন্দর বোরিবন্দর স্টেশনে পৌঁছে দেখল সৈয়দ সাজ্জাদ জহির, যিনি কমিউনিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নিজের নামের আগে সৈয়দ ব্যবহার করেন, বিরক্ত হয়ে এগারো নম্বর প্লাটফর্মের বাইরে তাঁরই জন্যে প্রতীক্ষা করছেন। স্বল্প উচ্চতার লেখক, যার চওড়া কপাল থেকে চুল দ্রুত উঠে যাচ্ছিলো এবং যে নিজের চঞ্চল চোখ মোটা কাচের চশমায় ঢেকে রাখে, সে সৈয়দ সাজ্জাদ জহিরের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি করল।

'ভাই', সৈয়দ সাজ্জাদ জহির বলা শুরু করতেই কৃষণ চন্দর সেই মুহূর্তে বলে উঠল—'ভাই মাফ করুন, দেরী হয়ে গেছে।' ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে রেখে বলল, 'এটা

সৈয়দ ঃ হজরত মহম্মদ সল্লম-এর সন্তান থেকে যে বংশের উদ্ভব তাঁদের সৈয়দ বলা হয়। সৈয়দ শব্দের অর্থ সর্দার।

তো ভাববে সেই মালাড থেকে আসছি। এখান থেকে আঠারো মাইলের দূরত্ব। স্ত্রী বাচ্চাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। বোকা রোকা বাক্স প্যাটরা সঙ্গে নিতে হবে, ঠিক সময়ে চাকরবাকরেরা কোথায় যে পালালো ; আর ...... কৃষণ চন্দর এইভাবে অসংবদ্ধ বাক্য বলতে থাকেন। প্রাথমিকভাবে এটা অসংবদ্ধ মনে হতে পারে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তা অত্যন্ত উদ্দেশ্যপূর্ণ। সত্যি কথা বলতে কি ওর উপন্যাস,, ছোটগল্পে এমনকি ওর জীবনে এই ধরনের অসংবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই ভানটুকু লোকেদের প্রতিটি পরিস্থিতিতে বোকা বানিয়ে দেয়। বেচারা। ও মজা করে হাসছিল। সৈয়দ সাজ্জাদ জহিরের ঠোঁটেও হাসি এলো --- স্বতস্ফূর্ত, পবিত্র, উজ্জ্বল। কথায়, ব্যবহারে, তাকে একেবারে চামড়ার ব্যবসায়ী মনে হতো ; তার প্রশান্তি এবং পাকাপোক্ত চেহারা দেখে কেউ তার ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা আন্দাজ করতে পারবে না। কিন্তু যখন তিনি হাসেন তখন তার বুদ্ধিমত্তা বোঝা যায় ; জহিরের হাসি এমন যে মনে হয় পদ্মফুল ফুটে উঠছে --- চঞ্চল সুন্দর আকর্ষনীয় আলোর ফোয়ারার মতো ; বিদ্যুৎঝলকের মতো বুদ্ধিমত্তার লহর সর্পিল গতিতে এঁকেবেঁকে এগিয়ে যায় ; আর বন্যার মতো, ঝড়ের মতো এক মুহূর্তে সরল সাধারণ শুকনো চেহারাকে সতেজ করে দেয়। মাঝে মাঝে এমন বোধ হয় যে সৈয়দ সাজ্জাদ জহিরের হাসি ছাড়া আর কিছুই নেই (হয়তো উনি প্রতিদিন আয়না দেখে শুধু হাসবেন), হে আল্লা এসব সত্ত্বেও সত্যি কথা বলতে কি---মুঝে মালুম না থা এ তবসসুম সচমুচ....ব খোদা। সৈয়দ সাজ্জাদ জহির হেসে সব চিন্তা অস্পষ্ট করে দিলেন---'ব্যাস, চলো ভাই, এই নাও তোমার টিকিট, গাড়ি ছাড়তে কয়েক মিনিট বাকি। এই কথা বলেই উনি ঘাবড়ে গিয়ে প্ল্যাফফর্মের দিকে তাকালেন। আর তখনই হঠাৎ আলি সর্দার জাফরি প্রায় ঘাড়ে এসে পড়লেন। তার ক্রিজ ছাড়া প্যান্ট, অগোছালো বড়ো চুল, রুক্ষ চেহারা মহাপণ্ডিত লেখকদের মধ্যেও কাঁপুনি এনে দিতো। ওকে দুএক পলকে নজর করে কৃষণ চন্দর এদিক ওদিক দেখতে শুরু করল। সর্দার জোরে ওর কাঁধ ধরে বললেন, 'এখন আসছো? এগারোটায় সময় দিয়েছিলাম না? এখন দেখো একটা বাজছে। তাড়াতাড়ি করে মালপত্র .... অকস্মাৎ সৈয়দ সাজ্জাদ জহির বলে উঠলো, 'হ্যা ভাই চলো'। খোদা জানেন এতক্ষন সে কি ভাবছিলো!

ট্রেনে

থার্ডক্লাসের কামরায় সেকেন্দ্রাবাদ লেখা ছিলো। সেকেন্দ্রাবাদ বা হায়দ্রাবাদ দক্ষিণ ভারতে। বোরিবন্দর স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা থার্ড ক্লাশের কামরাটি নিজামের সম্পত্তি। ভরে যাওয়া কামরায় যাত্রীরা গুড়ের মন্ডের মতো চাক বেধে ছিলো। নিজামের থার্ড ক্লাসেও দুটি বিজলী পাখা লাগানো। সেই বিজলী পাখা দুটির নীচেই প্রগতিশীল লেখকেরা নিজেদের জায়গা জুটিয়ে নিয়েছিলো। দুটি পাখার নীচে মুখোমুখি দুটি দল। গাড়ি যাচ্ছে হায়দ্রাবাদ ডেকান। সেখানে উর্দুর প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের সারা ভারত সম্মেলন।

একটা দলে সৈয়দ সাজ্জাদ জহির, ড.মুলক্‌রাজ আনন্দ, মদন গোপাল, সিবতে হাসান এবং উপেন্দ্রনাথ ছিলেন, অন্য দলে আলি সর্দার জাফরি, রফত সংরোস, কুদ্দুস সাহেবাই, আদিল রসিদ, কৃষণ চন্দর ও কৈফী আজমী। ট্রেনে কৈফী আজমী ফকিরের

মতো একটা পুরনো কম্বল গায়ে দিয়ে জানালায় পিঠ লাগিয়ে ঝিমোচ্ছি...। কখনও কখনও চোখ খুলে নিজের সাথীদের আশ্চর্যজনকভাবে দেখছিলো। দেখলে মনে হবে চরসের নেশা করে। তার দৃষ্টি যেন বলছিলো, হ্যা তোমরা কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ছো না কেন? ওর চোখের বিষন্নতা সাহিত্যিকদের কাছে মনে হচ্ছিল মরসিয়া* লোকগীত। আদিল রসিদ এমনভাবে বসেছিলো যে মনে হচ্ছিলো সে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমন করছে। দুনিয়ার অনিত্যতা ও বর্তমান যুগের গোঁড়ামি ইত্যাদি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে শিফতে হাসান এবং মহেন্দ্রনাথ দাবা বিছিয়ে বসেছিলো; তারা দাবাতেই রাজাদের মাৎ করতে ব্যস্ত, কেননা ধনীদের এরা কখনো মারতে পারবে না। রফত সরোসের শ্যামবর্ণ চেহারা, নিস্কলুষ মুখ, প্রতারক সরলতার সৌন্দর্য কবুতরের সুরমা রঙের আভা এনে দিচ্ছিলো ; সে যেন পায়রার খুপরির উপর বসে খাবারের জন্য অসহনীয়ভাবে প্রতীক্ষা করছে। মনে হচ্ছিলো কেউ যদি ওর কানে চুপি চুপি বলত— গুটুর গু, বোল কবুতর বোল।

গাড়ি ছাড়তে তখনও দু মিনিট বাকি। কৃষণ চন্দর তখন সদ্য ফিল্ম কোম্পানীর কাজে ঢুকেছে। নিজের বড়লোকি চাল দেখাবার জন্যে চার টাকার কমলালেবু কিনে ফেলল সে। বিশ্বের সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে ক্ষুধার্ত কিছু মানুষকে সে খুব বিনয়ের সঙ্গে বলতে লাগল—'লো ভাই, খাও না, আরে ইয়ার বহুৎ মিঠে হ্যায় ইয়ে সান্তারে'।

তার চেহারায় সেই প্রতারক হাসি—'খুব হ্যায় ইয়ে সান্তারে, রংতারে, রসভরে— আরে ভাই ইসমে ভিটামিন ভি হ্যায়। আমা ইয়ার এক তো চাখো।'

নিজেকে রকফেলারের শালা সম্বোধন করে পলক ফেলে ফেলে কমলালেবুগুলো বিলি করছিল সে। সাহিত্যিকদের কাহিণ* মুল্‌ক রাজ আনন্দ এবং সৈয়দ সাজ্জাদ জহির মুখোমুখি বসে ছিলো। দুজনের গায়েই খদ্দরের ঝলমলে জামা। জহিরের খদ্দরের রঙ সাদা, আর মুল্‌করাজের যোগীদের মতো গেরুয়া। কিন্তু দুজনেরই মাথায় একই ধরনের টুপি। গায়ে একই ধরনের জহরকোট, আর পরনে পাজামা। মুল্‌করাজের মুখে পাইপ, আর জহিরের ঠোঁটে হাসি। মুল্‌করাজের নরম লাল গালপাট্টা, ভরা ভরা মোটা ঠোঁট— ইংল্যান্ডবাসের আরামের কথা মনে করিয়ে দেয়। তার পাইপের ধোঁয়া ছাদের দিকে উঠে পাখার হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছিলো। মুল্‌করাজ আনন্দ ও সৈয়দ সাজ্জাদ জহির দুজনে ঐতিহাসিক সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচী তৈরী করছিলেন। মদন গোপাল, যিনি মুন্সী প্রেমচন্দের সাহিত্যকৃতির উপর ইংরেজীতে একটি বই লিখেছেন, তিনি ওদের কাছে বসে মন দিয়ে কথাবার্তা শুনছিলেন, যেন কোন স্বর্গীয় বিষয়ে বিস্তারিত অবগত হচ্ছিলেন তিনি।

মদন গোপালের বৈশিষ্ট্য এটাই যে সে তার নীরবতা দিয়ে মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলতে পারত। মহেন্দ্রনাথ ও শিফতে হাসান কখনো কখনো দাবা থেকে মুখ তুলে কামরার চারদিক দেখে নিচ্ছিলো, আবার গুটিতেই ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছিলো। কুদ্দুস সাহবাই, মোদির নেজাম মুখে ইউক্যালিপটাসের বড়ি নিয়ে দুটি পা গুটিয়ে বালিশে ঠেস দিয়ে এমনভাবে বসেছিলো যে মনে হচ্ছিলো তারা পুরনো অর্শে আক্রান্ত। কৃষন

মরসিয়া ঃ একটি কবিতা যাতে মৃতের গুণের বিবরণ দেওয়া হয়; কারবালার শহীদদের কষ্টের বিবরণ।
কাহিণ ঃ জিনদের কাছ থেকে পাওয়া অজানা খবর দেয় যে?

চন্দর সহানুভূতির সঙ্গে ওদের বলল। —'লিজিয়ে, আপাভ খাইয়ে না।'

'সুক্রিয়া'—কুদ্দুস সাহবাই বলল। 'আমি নিজে সাইনাসের রোগী'।

এরপর তিনি নিজেই সিগারেট এগিয়ে দিলেন, 'লিজিয়ে, সুক্রিয়া'।

কৃষণ চন্দর প্রত্যাখান করে বললেন, 'আমি পেটের অসুখের রোগী। পেটের অসুখে তামাক। আপনি নিজেই জানেন......

'আমি ভালোভাবেই জানি', কুদ্দুস সাহাবাই শহীদদের মতো হাসিমুখে বললেন, 'আমি দশ বছর এই রোগে ভুগছি'।

'আমি পনেরো বছর'। কৃষণ চন্দর সৌজন্য করে বললে, 'আমার গলার শিরা ফুলেছে'। কুদ্দুস সাহাবাই উত্তর দিলে, 'আমার আন্ত্রিক রোগ আছে, বুক ধড়ফড় করে, কিডনিতে পাথর'। কৃষণ চন্দর হতাশার স্বরে মিষ্টি করে বলল, 'ডাক্তার বলছে আমি আর তিন বছর বাঁচব। খোদা করে আমার উপন্যাসটি শেষ হয়ে যায়।'

'কোন উপন্যাস'—কুদ্দুস সাহাবাই জিজ্ঞেস করলেন। 'কোন নতুন উপন্যাস লিখছেন? মন দিয়ে লিখবেন, আপনার সেই উপন্যাস—'শিকস্ত' তো এক্কেবারে — ক্ষমা করবেন — ভাই, ফ্লপ হ্যায় বিলকুল...'

কৃষণ চন্দর কোয়ার সাথে তেতো বীজও গিলে বিষম খেল—বলতে লাগল, 'এই একটু—এই পাখার মুখ এই দিকে ঘুরিয়ে দিন—ওঃ কী গরম, দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

কুদ্দুস সাহাবাই হেসে বললেন, 'এই ইউক্যালিপ্টাসের বড়ি নিন, উপকারী'

'ও মারা—ও মারা দোস্ত।' মহেন্দ্রনাথও খুব জোর গলায় গর্জন করে উঠল—'কেয়াবাৎ হ্যায়। কেয়াবাৎ হ্যায়। '

কৈফী আজমী ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠলো, 'দোস্ত আমি কিছু বলিনা। এই শিফতে হাসানকে জিজ্ঞেস কর একে মাৎ করলাম কিনা—মন্ত্রী গজ বোড়ে সব নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।' শিফতে হাসান তার কোঁকড়া চুলে আঙুল বুলিয়ে সুন্দর করে বলল, 'ছাড় এসব, কিঁউ শোর মচাতে হো বেকার। তুমি তো পাঞ্জাবী। তবে এসো, এবার যদি তোমাকে মাৎ না করি।'

গার্ড বা খোদা জানে, কে বাঁশি বাজাল। গাড়ি চলতে লাগল। সাহিত্যিকরা বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল। কিন্তু ওই বেচারাদের বিদায় জানাবার কেউ ছিলো না। এক পার্শী মেয়ে রামধনু রঙের শাড়ি পরে দ্বিতীয় শ্রেণীর দরজায় দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়ছিল—তার প্রেমিক মোহমুগ্ধ চোখে তাকে দেখতে থাকল, গাড়ি আস্তে আস্তে চলতে লাগল। এক মারাঠী নিজের ছেলেকে বলল, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই ; শোলাপুরে ভাইসাব তোমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নেবে, ভয় পেও না কিন্তু।' সাহিত্যিকদের বিদায় জানাবার জন্যে কেউ ছিল না—না বাবা, না প্রেমিক, না কোন উৎসাহী ভক্ত, বেচারারা শুধু নিজেরাই হাত নাড়তে লাগল; গাড়ি যখন প্ল্যাটফর্মের বাইরে চলে গেল তখন নিজের জায়গায় এসে বসল, আর অসহায়ভাবে ঝিমোতে লাগল। কৃষণ চন্দর যখন উদাস হয়ে যায় তখন সিগারেট খায়, কিন্তু কখনোই নিজে কিনে খায় না। হামেশাই অন্যের কাছ থেকে চেয়ে খায়। ওর এই অভ্যাসের কথা বন্ধুরা সবাই ভালভাবে জানে। কৃষণ চন্দর ভাবলেন, এই সময়ে সিগারেট পেলে ভালো হয়, কিন্তু কেউ তাকে সিগারেট দিল না। বোঝাই গেল না সিগারেট তাদের কাছে ছিলো না, না ওকে ক্ষুব্ধ করাই তাদের উদ্দেশ্য

ছিলো। যাই হোক, সিগারেট না পেয়ে হতাশ হয়ে নিজের জায়গায় বসে পড়ল। হঠাৎ পাশে বসা লোকটি কনুই দিয়ে ধাক্কা দিয়ে তার মনোযোগ আকর্ষণ করল। কৃষণ চন্দর দেখল ভূযো কালো, কদাকার, ঝকঝকে সাদা দাঁতের এক যুবককে। তার দাঁতের কাছে মুক্তাও লজ্জা পাবে। ওই যুবকটি কৃষণ চন্দরকে সিগারেট দিল; কৃষণ চন্দর ধন্যবাদের সঙ্গে সেটি গ্রহণ করল। কথায় কথায় জানা গেল, সেই যুবক নিজাম স্টেটের রেল মজদুর। হায়দ্রাবাদ ডেকান যাচ্ছে। কৃষণ চন্দরের মনে পড়ল লেবুগুলি বিলি করার সময় সে সহযাত্রীটিকে লেবু দেয়নি কেননা যুবকটির পরনে নীল, নোংরা কাপড়; তার গায়ের রঙ কালো, সে দেখতে বিচ্ছিরি, বেঢপ, দেখলে ভয় লাগে। তাছাড়া সে একজন মজদুর। কৃষণ চন্দর সিগারেট টানতে টানতে ভাবল সে এখনও বুর্জোয়া ব্যবহারে আক্রান্ত। সর্দার কৃষণ চন্দরের মানসিক টানাটানি আন্দাজ করে বললে, 'দেখলে তুমি, একজন প্রোলেতারিয়েতের ব্যবহার'। এই কথা বলে দ্রুত চুপ করে গেল।

রফোদ সরোস আদিল রসিদকে বলল, 'ভাই, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।' সিটের তলায় এক টুকরিতে খাবার ছিলো। আদিল রসিদ ঝুড়ি তুলে নিজের উরুর উপর রাখল। মাখন বন্ধ টিনের কৌটোয়। কারও কাছে ছুরি নেই। সেই সময় সেই মজুরই কাজে লাগল। সবাই খেতে ব্যস্ত হল। দ্রুত ডিম রুটি মাখন ফল খেয়ে ফেলল সবাই। এবারও কৃষণ চন্দর তার সহযাত্রীকে ভুলে গেল। অনেকক্ষণ পর কৃষণ চন্দরের হঠাৎ খেয়াল হলো, আর আশ্চর্যভাবে বলেও ফেলল, 'আরে ভাই, ওকে কিছু দিলে হতো, ওতো আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। মজদুর হাসল, সে ওদের সাথী ছিলো—কিন্তু ডিম রুটি মাখন ফল খাওয়ার সাথী নয়, ও তো নীচে বসে বক্তব্য শোনার সাথী। মজদুরটি নিজের ছুরি থেকে মাখন মুছে নিল ; ছুরি বন্ধ করে নিজের পকেটে রেখে চারমিনার ধরাল।

প্রগতিশীল সাহিত্যিক ছাড়া এই কামরায় আরও একশো দেড়শো লোক। দুজন মৌলবী ছিলেন, চারজন সুদ ব্যবসায়ী কাবুলী পাঠান, আট দশজন বেনিয়া। তাদের সেকেন্ড ক্লাসে যাবার ক্ষমতা ছিলো, কিন্তু পয়সা বাঁচাবার জন্যে থার্ড ক্লাসে অসংকোচে জায়গা করে বসে ছিলো তারা। পনেরো বিশজন রেলের মজুর ছিলো। এক চানাওয়ালা 'জোর গরম' চানা বিক্রি করছিল। এক গ্রামীণ খ্রীষ্টান নিজের স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছিল, বউটি তার তিনটি বাচ্চাকে বসার জায়গায় শুইয়ে রেখেছিল। নিজে নীল রঙের স্কার্ট পরে অসংকোচে বসেছিলো। ওর হাঁটু পর্যন্ত খালি পায়ে ভর্তি চুল। উঁচু হিলের সাদা জুতোর ফিতে বাঁধা। এই কামরায় চারটি দরজা ছিল। প্রতিটি দরজায় হতদরিদ্র চাষীরা পুরনো ছেঁড়াফাটা কাপড় গায়ে দাঁড়িয়েছিল। জোর গলায় অবিশ্রাম কথা বলে যাচ্ছিল তারা। বিস্ময়কর সে সব কথা—জমি, পাটোয়ারী, খতোয়ালী, হাল বলদ, দুর্ভিক্ষ, বিয়ের জন্যে বেনিয়ার কাছে সুদে টাকা ধার বা জমি বন্দক দেবার কথা। বিস্ময়কর সব কথাবার্তা—না, ভালবাসা বা প্রেমের কথা নয়, না, সংসার ভাসানো সৌন্দর্যের কথা নয়, না, আঙুর থেকে বানানো সরাব বা সাকীর কথা নয়, না, ধর্মের কথাও নয়, স্বর্গের কথাও নয়; খুব চেঁচামেচি হচ্ছিলো, অবিরাম একটা হাঙ্গামা, যেন একটা দোজখ। আগুন, বিভিন্ন রকমের গন্ধ, দুর্গন্ধ নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর পুরো

কামরাটিকে মনে হচ্ছিলো মানবতার সান্ডাস* ; তার মধ্যে প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা বসেছিলেন যেন আবর্জনা স্তূপের উপর আপেলের লাল শাদা একটি ফালি।

ড. মুল্‌করাজ আনন্দ বললেন, 'সাহিত্যের চিরন্তন মূল্যবোধ আছে'।

'নিঃসন্দেহে, নিঃসন্দেহে'—তোতাপাখির মতো আউড়ে গেল মদন গোপাল।

'কি চিরন্তন মূল্যবোধ, মশায়? —আলি সর্দার জাফরি যেন ঘুষি পাকিয়ে তেড়ে এলেন। সর্দারের চেহারায় ছিলো রাজনৈতিক অপরাধীদের কষ্টের চিহ্ন, ওর কপালে এমন এক ভবিষ্যৎ সাহসের কথা লেখা যার সম্ভাব্যতা নিয়ে সন্দিহান হতে হয়। ও যখন দাঁত চেপে কথা বলে, তখন মনে হয় যন্ত্রনাদগ্ধ এক ব্যক্তিত্ব বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তার চেহারার যে বিশালত্ব তাই যেন তার চরিত্রে, কথাবার্তার সময় মনে হয় সেটাই এক মজবুত ঘুষি বাগিয়ে আছে। সেই শরীরের উপর যেন পোতা আছে একটা অচল কাস্তে হাতুড়ি তারার লাল পতাকা ; আর সর্দারের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব কম হতে হতে শূন্য হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে কথা বললে মনে হবে, আপনি একটা বই পড়ছেন, একটি আন্দোলনের মুখোমুখি হয়েছেন, দর্শনের একটি অনুশীলনী অভ্যাস করছেন, একটি নতুন চিন্তার মুখোমুখি হচ্ছেন, বোঝা যায় কে ওর মনকে কবি বানিয়ে দিয়েছে, কিভাবে মনের চাহিদা মিটেছে.. ..

মুল্‌করাজ পাইপের ছাই ঝেড়ে, কূটনীতিকদের বিশেষ কায়দায় বলল, 'আমার দুঃখ হয়, ভারতীয় সাহিত্যিকদের জন্যে। সামাজিক বিষয়বস্তু সংগ্রহে তারা এত তৎপর কিন্তু ফর্ম তারা জানে না। বিষয়বস্তুকে সুন্দরভাবে পেশ করাই সত্যিকারের সৌন্দর্যের প্রকাশ। যুদ্ধের সময় ভারতের প্রগতিশীল লেখকেরা কি 'এমন কাজ করেছে যার জন্যে আমরা গর্ব করি!'

কৃষণ চন্দর রাগত স্বরে বলল, 'আপনার ইংরেজ সাহিত্যিকরা কি এমন কামাল করে দেখিয়েছে? আপনার অডেন......'

'অডেন মস্ত বড কবি, মশাই', আনন্দ উত্তর দিল। 'ওর কবিতাতে শেক্সপীয়রের বিশালত্ব আছে'।

কৃষণ চন্দর ওর কথায় গুরুত্ব দিলে না, কর্ণপাত না করে বলল, 'আপনার অডেন, স্যান্ডাস, লেকমেন্স, হাক্সলে কবিতা ছেড়ে যোগ 'অভ্যেস করছে, কেউ কেউ স্টান্ট ছবির ডায়ালগ লিখছে। ব্রিস্টলে সরাসরি প্রোপাগান্ডা করে। ইংরেজ কলোনিয়ালিজমের পক্ষে থেকে নিকলস ভারতীয়দের গালাগালি করে। কিছু লোক এ.আর.পির উপর বই লেখে।'

'বা বা, সৌন্দর্যের কথা, ...আমি মানি যে এখন পর্যন্ত অধিকাংশ আমেরিকান ও ইংরেজ লেখকরা এই আধাগণতান্ত্রিক ঔপনিবেশিকতার ভক্ত। তারা মনে করে ওদের সভ্যতা সমাজ অর্থনীতি এখনও আরও বিশ বছর চলবে। তাই ওরা কেন খামোকা ওদের সঙ্গে শত্রুতা করবে? নিজেদের জীবনযাত্রাকে কেন বিপদের মধ্যে ফেলবে? তারা এত বোকা নয়। ইউরোপীয় লেখকদের উদাহরণ নেওয়া যায়। আধুনিক ইউরোপে ভালো কবিতা লেখা হচ্ছে।'

সান্ডাস ঃ শৌচালয়।

'ভালো কবিতা', সর্দার সংশয় প্রকাশ করলেন। দু-একজনকে ছেড়ে দিন, বাকি কবিরা, এমনকি নিজেকে ও নিজেদের আর্টকে নাৎসীদের দিয়ে দিয়েছিলো না? ফরাসী বিধ্বংসী মনোভাবের কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। একটা কেন, এক ডজন উদাহরণ দেব। সুবিধাবাদিতার জন্য আদর্শকে বলিদান দিলে কখনও আর্ট বা আর্টিস্ট বড়ো হতে পারে না।'

'Apocalyptics' আনন্দ বলতে আরম্ভ করল ; কিন্তু এবার ওর উপর চারদিক থেকে হামলা হতে লাগল। কৈফী রেগে গিয়ে বলল, 'গ্রুপের কথা কি বলছ, একটাই তো সংকলন বেরিয়েছে। "ওটা একটা বোগাস ব্যাপার। ভিমেস দে মালা জাতিকে সংস্কার করার জন্যে বেরিয়েছিল, কিন্তু তাতে মানুষের কিস্‌সা আছে'।

'ভিমেস দে মালা? যেখানে বন্ধুর স্ত্রীকে বিভ্রান্ত করা দেবতার কাজ? এটা কি সাহিত্যের চিরন্তন মূল্যবোধ? এর উপর কি সুন্দর, সম্পূর্ণ সমাজের ভিত্তি রাখা যাবে?'

'আরে, কাদের কথা বলছ', সর্দার বলল 'এখন কবিতা ছেড়ে পেটের ধান্দা করছে।

'নিঃসন্দেহে, নিঃসন্দেহে', মদনগোপাল দুবার আওড়াল।

আদিল রসিদ হেসে ফেলল, মদনগোপাল রেগে গেল। মদনগোপাল আদিল রসিদের দিকে তাকিয়ে থাকল। 'ভাই আমিও অনেক পড়েছি', আনন্দ বলল, 'ইকবাল পড়েছি, জোস পড়েছি, লন্ডনে বসে বসে আড্ডা দিতাম না। আমাকে ক্ষমা কর, আমি বলতে বাধ্য, ওতে বড় কিছু নেই। ইকবাল বড়ো কবি কিন্তু তার দর্শন হলো বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী কল্পনার সংকলন। আর জোস উর্দুতে অনেক চেঁচামেচি করেছেন। ইংরেজীতে অনুবাদ করলে সেসব বিলকুল ঘাস বোধ হয়।'

'আপনি নিজেই ঘাস খেয়েছেন', সর্দার রেগে উঠল, 'আনন্দ সাহেব, আগে আপনি এই দেশের পরিস্থিতি বিচার করুন, এর সাহিত্য আন্দোলনের কথা ভাবুন, এর রাজনৈতিক ঝোঁকগুলোর সমীক্ষা ...., —'দোস্তো' মহেন্দ্রনাথ জোর গলায় বলল, 'দোস্তো, মার ডালা। যুদ্ধের ময়দান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'কি হয়েছে ভাই', সাজ্জাদ জহির অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল ; শিফতেও বিরক্ত হয়ে বলল, 'ব্যাস একবার হারিয়েছে। তখন থেকে গলা চিরে যাবার মতো চেঁচামেচি করছে। পাঞ্জাবীদের এই এক ধরন। তারা আর সভ্য হল না। সরিয়ে দাও এই দাবা। আমি আর খেলব না।'

'এসো আমি তোমাকে সাহায্য করি', আলি সর্দার জাফরি ঝগড়া মেটাবার জন্যে বলল।

'বহুৎ খুব, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন? আপনি?' শিফতে আঘাত করল।

'কেন আমি হলে কি হয়েছে'? সর্দার বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আপ?' শিফতে হাসল।

'হ্যা, আমি'

'আপনি'?

'হ্যা, হ্যা, আমি' এবার সর্দার সত্যিই রেগে গেল।

'তুমি'?

'আমি'।

'তুমি'?

'নিঃসন্দেহে, নিঃসন্দেহে'—মদনগোপাল মাথা নেড়ে বলল। সবাই হেসে উঠল।

কথাবার্তা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে রইল দীর্ঘক্ষণ। সাজ্জাদ জহির, রফত সরোস, আদিল রসিদ এবং মহেন্দ্রনাথ যে যেমন পারল শুয়ে পড়ল। তখন চরস খাওয়া ফকির কৈফী আজমী নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে গুনগুন করে গান গাইতে লাগল। কুদ্দুস সাহবাই শব্দ করে করে ইউক্যালিপটাসের মিষ্টি গুলি চুষছিল। আনন্দ আলেক্সি টলস্টয়ের Road to Calveny পড়তে লাগল। মদনগোপাল প্রেমচন্দ সম্পর্কে লেখা তার মাস্টারপীস আবার পড়তে শুরু করল, আর পেনসিল দিয়ে দাগ দিতে থাকল, যেন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের নতুন নতুন চিন্তা তখনই মাথায় এসেছে।

কৃষণ চন্দরের মনে পান খাবার বাসনা হল। কিন্তু গাড়ি থামার কোন লক্ষণ নেই। সিফতে হাসানকে বলল, 'দমবন্ধ হয়ে আসছে'।

'সামনের স্টেশনে নেমে ডাইনিং কারে যাবো', সিফতে প্রস্তাব করল।

'আমিও যাবো', সর্দার সিদ্ধান্ত দিল। আবার নীরবতা নেমে এলো। অর্থাৎ কামরার সেই জায়গাটুকুতে নীরবতা ছিলো। কিন্তু চারদিকে চেঁচামেচি। কিষাণ, মজুর, গরীব বিশ্রী চেহারার দুস্থরা চেঁচিয়ে কথা বলছিল। সেই ক্ষুধার্ত ছোটলোকেরা চেঁচামেচি না করলেই অবশ্য পাগল হয়ে যেত। সংসারের অন্ধকার, পাপ সব নীরবে ঘটে যেত। তারা চেঁচিয়ে নিজেদের দুঃখের কথা, শোকের কথা বলে চলেছিলো। তারা স্মিত হাসছিল, জোরে হাসছিল, কথা বলছিল, খুশী হচ্ছিল, রেগে গিয়ে চেঁচাচ্ছিল, কিন্তু কথা একটাই — 'নওহা' 'মরশিয়া', 'কবর দেওয়া', 'কফন দেওয়া'—মৃদু হাসি', উচ্চকিত হাসি, প্রত্যেক ধরনের কথাবার্তার কেন্দ্রে এসে দাঁড়াচ্ছিল উন্মুক্ত কবর, যেন নিজের বুক খুলে বলছিল, 'আমাকে দেখে নাও'।

নিরক্ষর, বন্য, অত্যাচারী জন্তুর মতো দেবতা বা শয়তান ছিঁড়ে খেয়ে নেবে— 'আহা আহা', আমাদের পাশে এসে দেখে নাও...'

কৃষণ চন্দর মুখ ঘুরিয়ে নিল। সিফতের বুদ্ধিমান চেহারায় হতাশার এক লহর উঠে এলো। সে আস্তে আস্তে বলল— 'দেখলে তুমি' ....

সিফতের চেহারায় যন্ত্রনার অসংখ্য রেখা, যেমন সমুদ্রের ফেণা তীরে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে মজবুত হয়ে যায়, তেমনি মানসিক অনুভবের স্রোতও অনেক বছর ধরে নম্র চেহারায় মধ্যে বরফ হয়ে গেছে। ওর চেহারা ছোট হলেও তাতে মানবিক অনুভবের দীপ্তি পাওয়া যায়। প্রায়ই একথা মনে হয় শিফতে জীবন থেকে যন্ত্রনাই পেয়েছে। জীবনের অন্তহীন কষ্ট ও গভীর আনন্দ থেকে সে যন্ত্রনাই সংগ্রহ করেছে। সম্ভবত তার চিন্তাধারায় এমন একটা নরমভাব আছে এবং তার অনুভব এত প্রবল যে প্রত্যেক জয়ে তার মধ্যে এক বিশেষ যন্ত্রনাবোধ জন্মায়। একটা সুন্দর কুঁড়ি দেখলে বা দারিদ্র্য পীড়িত ভিক্ষুক দেখলে ওর চেহারায় একই ধরণের যন্ত্রনাবোধের জন্ম হয়। সৌন্দর্য এবং দারিদ্র্য' ওর মধ্যে একই ধরণের যন্ত্রনাবোধ বয়ে আনে। যদিও এখন তার যৌবন, তবু মনে হয় কয়েক শতাব্দীর যন্ত্রনা সে বহন করছে তার কপালের বলিরেখায়। এ বলিরেখাগুলি দুনিয়ার সব দুঃখকে ধারণ করছে। দিগন্তের হালকা রঙগুলি শিফতের চেহারায় যন্ত্রনাবোধের মধ্যে সান্ত্বনা এনে দিচ্ছিলো। সে আস্তে আস্তে বলল—'ও

দেখো, ও দেখো'।

কৃষণ চন্দর দূরে দেখল দিগন্তে সর্ষের কেয়ারি, কাশ্মীরী জাফরানের ক্ষেত। সে দিগন্ত খুব পছন্দ করে ; অথচ এই দিগন্তের কথা তার মনে ছিলো না—এই হলুদ সোনালী যাদু, বাসন্তিক এই রঙের বাহার তার মনে ছিল না; এই সৌন্দর্যের জন্যে ওর প্রতিটি রোমকূপ ক্ষুধার্ত হয়ে ছিলো ... দিগন্ত এখন আর সোনালী নেই, জাফরানও নেই, গুল্মোরের ফুলের মতো আগুন হয়ে তার পোষাকে ছড়িয়ে পড়লো। সে যেন আগুনের জামা পরে আছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশে মেঘের প্রতিটি জানালায় প্রস্ফুটিত ফুল। সিফতে বললো, 'ও দেখো, ও দেখো...'

কালো মেঘের পেছনে সোনা জ্বলছিলো, কালো মেঘের খোলা জানালা দিয়ে নীল আকাশ দেখা গেল যেন জানালায় উঠে এসেছে সমুদ্র, আর সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। সে জানালায় বসে অস্তগামী সূর্যকে দেখছিল, দেখছিল আলোর স্রোত মরুভূমিকে চুমু খেয়ে ফিরে যাচ্ছে। এই আলোর স্রোত হলো সূর্যের সমুদ্র। ঐ হলো খোদার মহিমার প্রকাশ।

—ও দেখো, ও দেখো'

ছায়া এগিয়ে এলো, দিগন্ত হারিয়ে যেতে লাগল। সোনালী রঙ হারিয়ে গেল। মর্মরের সাদা থেকে গোলাপী, গোলাপী থেকে নক্ষত্রের সাদা, নক্ষত্রের সাদা থেকে লাল, হর্ম্য রূপান্তরিত হলো হাতীতে, তারপর সব অন্ধকার। সেই গোলাপী তাজমহল নক্ষত্র হয়ে ঝরে পড়ল। আলোর শেষ রশ্মি দিকচক্রবালে ধাক্কা খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ডুবে গেল। চারিদিকে অন্ধকার। আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

সিফতে বিষণ্ন হয়ে গেল। তার ডাইনিংকারের কথা মনে পড়ল। 'সামনের স্টেশনে ওখানে যাবো।'

— 'এখন কিছু নজরে আসছে না', কৃষণ চন্দর বলল, 'বিজলীর থাম, সবুজ খেত, খড়ের ঝুপড়ি, মেয়েদের মজুরদের'।

'মেয়ে মানুষের কথা তুমি বলবেই বলবে,' সর্দার রাগ করে বলল, 'মিয়াঁ, তুমি ডাক্তার দেখাও। দিগন্ত দেখে তোমার মেয়েছেলের কথা মনে পড়ে। লাল রক্তের মতো আকাশ দেখে তোমার যুদ্ধক্ষেত্রের কথা মনে পড়ছে না....।'

গাড়ির গতি কমে আসছিল, আস্তে আস্তে চলতে লাগল। চলতে চলতে থেমে গেল। সর্দার, শিফতে ও কৃষণ চন্দর নেমে ডাইনিং কারে গিয়ে বসল।

ডাইনিংকারে সুন্দর ঝাড়ের বাতি ঝোলানো। ছিলো ঝকঝকে পরিস্কার আলোর মতো স্বচ্ছ টেবিল, হাসিমুখের মানুষজন, গোলাপের মতো মেয়েরা, উচ্চতা কম হলেও তাদের সৌন্দর্য কম নয়, রূপোর মতো সাদা তাদের হাসি, শরীরে তাদের যৌবন, তারা যেন চঞ্চল রক্তের রেশমী জামা পরে আছে। সেই রঙ ও আলো এমনভাবে বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো যে তার মনে হলো অন্ধ হয়ে যাবো। তারা বসছে হাসছে চলছে, থামছে, যেন কোন কাচের কলসে রঙ বেরঙের মাছ সাঁতরে বেড়াচ্ছে। এগুলি সব ডাইনিং কারের মাছ, সমুদ্রের মাছ নয় যে জেলেরা ধরবে।

শিফতে, সর্দার ও কৃষণ চন্দর বুঝতে পারল তারা কোন নতুন দুনিয়ায় ঢুকে পড়েছে। বেয়ারারা সাদা ইস্ত্রি করা পোষাক পরে বিনত হয়ে দাঁড়িয়ে। তিন কোর্স ইংরেজী খানা, কফি, শেষে আখরোট খাওয়া শুরু করল। সাহেবরা আখরোট ভাঙার জন্যে হাতুড়ি ব্যবহার করছিল। ওরা নিজেদের দাঁত দিয়েই কাজ সারল। মুখোমুখি তিনজন ইংরেজ সৈনিক বসে ছিলো। পরস্পরের অপরিচিত বলে কথাবার্তা বলছিলো না। তবে তারা সাহিত্যিকদের এই ঠাট্টা, হাসি, দুষ্টুমি বিস্মিত হয়ে দেখছিল। তিনজন ইংরেজের সঙ্গে চতুর্থ চেয়ারে এক মোটা পার্সীও বসেছিলো। সে বারে বারে বলে উঠছিল—'আমি বিরক্ত, খুব বিরক্ত'।

'ঠিক আছে', একজন ইংরেজ সৈনিক হেসে বলল।

'তুমি জানো না, আমি জীবনে উত্যক্ত হয়ে গেছি। বেয়ারা, একটা বড়ো ব্রান্ডি নিয়ে এসো। আপ পিয়েঙ্গে?'

'নো থ্যাঙ্কস', দ্বিতীয় সৈনিক ধন্যবাদ দিয়ে বলল।

'তুমহারি মর্জি। লেকিন ম্যয় বহুৎ পরেশান হুঁ। আমি তোমাদের বোঝাতে পারব না আমি কি কষ্টে আছি।'

সৈনিক অফিসারেরা উঠে গেল। মোটা পার্সী শিফতের দিকে দেখল, বলল—'ভাই, ম্যয় বহুৎ পরেশান হুঁ।'

'আপনি বিরক্ত হবেন না', শিফতে সান্ত্বনা দিল।

'বিরক্ত না হয়ে উপায় কি? ম্যয় তো পরেশান হুঁ। আমি জীবন, দুনিয়াকে নিয়ে আর পারছি না, এসব ধোঁকা, মরীচিকা। সে গেলাস শেষ করে বলল 'বেয়ারা আর একটা বড়ো ব্রান্ডি নিয়ে এসো। আপ পিয়েঙ্গে?'

'নহী, সুক্রিয়া,' কৃষণ চন্দর তার শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলোতে বুলোতে বলল।

'আপ কি মর্জি, মগর ম্যয় বহুত পরেশান হুঁ।'

তৎক্ষনাৎ আর একটি মোটা পার্সী চেয়ার ছেড়ে উঠে এলো। দুজন পার্সী পরস্পরকে চিনে নিলো। বড়লোকদের কায়দায় সায়েবজী* হলো। দুজনে একে অপরের মুখোমুখি বসল।

'কেয়া হাল হ্যায়?' নবাগত জিজ্ঞেস করল।

'দোস্ত, কি জিজ্ঞেস করছ? এই দুনিয়া একটি ধোঁকা, মরীচিকা, মায়া—ম্যয় তো বহুৎ পরেশান হুঁ।'

'হয়েছেটা কি'?

'আরে ভাই, এই বছরে এক কোটি ইনকাম ট্যাক্সে যাচ্ছে। বলো, এরপর কি আয় করা—আশি ভাগ লাভই সরকার নিয়ে যাবে। I tell you, it is a swindle. ম্যয় বহুৎ পরেশান হুঁ। বয়, দো লার্জ ব্রান্ডি লাও'—এই বলে সেই মোটা পার্সী টেবিলে হেলান দিয়ে কাঁদতে লাগল।

সায়েবজী : সম্ভাষণ বিনিময়ের পদ্ধতি।

হায়দ্রাবাদ স্টেশন

পরের দিন সকালে চোখ খুললাম, তো গাড়ি নিজাম স্টেটের সীমানায় ঢুকে পড়েছে। একটি অন্ধ ছেলে খঞ্জনি নিয়ে যন্ত্রনাভরা স্বরে দুনিয়ার অনিত্যতার কথা গেয়ে গেয়ে জানাচ্ছিলো। বাইরে মাইল মাইল জুড়ে মকাই-এর ক্ষেত—কোথায় মাইল জুড়ে ছোট ছোট ঝোপঝাড় জংগল, খরগোস আর তিতির গাড়ির শব্দে ভয় পেয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক পালাচ্ছিল। আল পেরিয়ে রাখাল এক পাল জন্তু নিয়ে চলেছে। বলদের পায়ে পায়ে ওড়া ধূলোতে আর সূর্যের আলোতে যে আলোধূলোর আড়াল তৈরী হলো তাতে সূর্য হারিয়ে গেল। দিকচক্রবালে দেখা গেল সূর্য লাল চাদর থেকে মাথা বের করে নতুন দিনকে দেখছে, চলন্ত গাড়িকে দেখছে, প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের চেহারা দেখছে। অন্যদিকে খঞ্জনির গান জীবনকে বরফের মতো মৃত্যুর বার্তা শোনাচ্ছিলো। যাত্রীরা মৃত্যুর ভয়ে অন্ধকে ভিক্ষা দিচ্ছিলো। হাজার হাজার বছর ধরে এই আশার সুর এবং এই মৃত্যুর গান ভারতবর্ষে প্রতিটি সকালে বেজে ওঠে। ছোড় দো দুনিয়া। চারদিন কে চাঁদনী হ্যায়, ফির আন্ধেরী রাত হ্যায়, মায়াকা জঞ্জাল হ্যায়, মুসাফির কোন্ বিভ্রান্তিতে আছো? এই গানে আছে মরীচিকা, অন্ধকার, মৃত্যু, জীবন নেই, অগ্রগতি নেই, আনন্দ নেই, আত্মশক্তির ঝকমকে প্রকাশ নেই, যেন দুনিয়ার কষ্টকর চিন্তাই মানুষের কাছে আনন্দের। তাই এখানে সকলে ক্ষুধার্ত হলেও খুশী। প্রত্যেকের চেহারা বিমর্ষ যেন এক্ষুনি তার বাবার মৃত্যুর খবর পেয়েছে। তাই এখানে হাসি ঠোঁট থেকে গায়েব হয়ে গেছে। এই গ্রহের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই হাসিকে বেয়াদবি বলে ধরা হয়। কান্না এখানে পুণ্যকর্ম। কান্না আমাদের গানে, আমাদের দর্শনে, আমাদের শিল্পে, আমাদের ধর্মে, কান্না আমাদের সভ্যতার শিখরে। 'সব ঠাট পড়া রহে যায়েগা*[১]...

খঞ্জনিওলা অন্ধ অন্য একটা কান্না শুরু করে দিল। সর্দার বিরক্ত হয়ে ওকে দু আনা দিয়ে বলল, 'থামো। গাইতে হলে কোন কাজ করার গান গাও।' অন্ধ বেচারা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তার সঙ্গী এদিক ওদিক দেখল। আন্দাজ করল, কামরায় মুসলমান যাত্রীদের সংখ্যা বেশি। সে অন্ধের কানে কানে কিছু বলল। অন্ধ খঞ্জনি বাজিয়ে একটি নাত*[২] শুরু করল। নাত গাওয়া শেষ করে শুধুমাত্র মুসলমান যাত্রীদের কাছ থেকে পয়সা সংগ্রহ করল। তারপর সে শুরু করল—মুরলীওয়ালে ঘনশ্যাম'...। এবার শুধু হিন্দু যাত্রীরা তাকে পয়সা দিল। সেই সময় গাড়িতে হিন্দু ও মুসলমান যাত্রীরা একে অন্যের দিকে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকাচ্ছিলো, যেন কাঁচাই খেয়ে ফেলবে। কৃষণ চন্দর অনুভব করল গাড়ির কামরায় দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে, দুটি চিন্তাধারার মধ্যে, দুটি জীবনের মধ্যে দুরতিক্রম্য ব্যবধান তৈরী হয়ে যাচ্ছে ; কোনো ঘুমন্ত ঘৃণার অনুভব হঠাৎ জেগে

---

*[১] কবিতাটির নাম বনজারনামা, ওয়ালি মহম্মদ নাজির আকবর আবাদীর লেখা। কবির জন্ম ১৭৩৫-৩৬ সালে, মৃত্যু ১৫ই আগষ্ট ১৮৩০।

*[২] নাত : আল্লার অবতার হজরত মহম্মদ সাল্লালাহ আলায়হে ওয় সল্লমের প্রশংসায় লেখা কবিতাকে নাত বলে - অনুবাদক।

উঠেছে এবং সাপের ফণার মতো মাথা তুলে লোকেদের মনে এঁকে বেঁকে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি মানুষের চেহারা বিষাক্ত, ক্ষুধার্ত এবং ইতরতায় ভরা। লোকেরা নিজেদের জীবনের সব কষ্ট, অসফলতার জন্য বিপরীত গোষ্ঠীকে দায়ী করতে চাইছিল। নিজের ক্ষুধা, ক্ষয়, দুর্বলতা, অসফলতার জন্য বদলা নিতে চাইছিল।

হঠাৎ গাড়ি থেমে গেল। অন্ধ নেমে অন্য কামরায় চলে গেল। সেখান থেকে একই সুর শোনা গেল—'সব ঠাট পড়া রহে যায়েগা'... কমলিওয়ালে*.... 'মুরলীবালে ঘনশ্যাম...' কৈফী আজমী এমন মুখ করল যেন কেউ জোর করে ওর গলায় বিষ ঢেলে দিয়েছে। মদন গোপাল মাথা নেড়ে বলল, 'জালিমনে ক্যায়সা আচ্ছা গলা পায়া হ্যায়'।

'হাঁই', হঠাৎ সব প্রগতিশীল লেখকরা রাগ করে ওর পেছনে লেগে গেল। যদি তাদের ক্ষমতা হত তাহলে তারা তাকে সেই সময় গাড়ি থেকে নামিয়ে দিত। কিন্তু তারা চুপ করে থাকল এই ভেবে যে লোকটি মুন্সী প্রেমচন্দের উপর একটি বই লিখেছে।

চারিদিকের আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেল। আদিল রসিদের টক ঢেকুর উঠছিল। মুল্‌করাজ মুখে হাত চাপা দিয়ে সভ্যভাবে হাই তুলছিল। মহেন্দ্র নাথ তার বড়ো দাড়িতে হাত বুলাচ্ছিল। রফদ সরোস এমনিই হাসছিল। কৃষণ চন্দর সিটের উপর দু পা তুলে পায়ের কাছের প্যান্টের ভাঁজে হাত দিয়ে বসেছিল। কুদ্দুস তার মুখে ইউক্যালিপটাসের বড়ি রাখছিল, শিফতে চোখ ঘষছিল, আর সাজ্জাদ ঝিমোচ্ছিল। আলি সর্দার জাফরি লোটা নিয়ে বাথরুমের দিকে এমনভাবে এগোচ্ছিল যেন কোন বৈপ্লবিক প্রচারে রওনা হচ্ছে।

'মুশ্লিম চায়ে, মুশ্লিম চায়ে' —কেউ হাঁকল। এখানে অনেকে একসঙ্গে বলল, 'লাও'।

'কেতনী চায়ে'—বলল আবার।

'পনরো বিশ তিশ চাল্লিশ, যেতনী ভি হো লে আও'। আদিল রশিদ আদেশ দিল।

চা-ওয়ালা বলল সামনের স্টেশনে পাওয়া যাবে; এ কথা বলে সে চলে গেল।

পরের স্টেশন বেগমপুর। এদের চা শেষ করতে করতে হায়দ্রাবাদ স্টেশন এসে গেল। স্টেশনে অভ্যর্থনা সমিতির দশ পনেরো জন উপস্থিত ছিল। সাত সকালে এভাবে চলে আসার জন্য তাদের ক্রুদ্ধ মনে হচ্ছিলো। তারা স্বাগত জানাবার জন্যে ব্যস্ত ছিল, যদিও চেহারা থেকে কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো, মিয়াঁ যদি তোমরা মানুষ হও তো এখনই ফিরে যাও, সাত সকালে আমাদের ঘুম থেকে তুললে, এটা কোন সভ্যতা নয়; নিপাত যাক তোমার প্রগতিশীলতা। এখানে হায়দ্রাবাদে আমরা বেলা দশটার আগে উঠিনা। দোকানের দরজা এগারোটায় খোলে; আর বারোটা নাগাদ কোথাও কোথাও এক দুজন ক্রেতা শীতে কাঁপতে কাঁপতে শেরওয়ানীর বোতাম কলার পর্যন্ত আটকে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে দোকানে ঢোকে। আর আপনারা নটার সময় স্টেশনে চলে এসেছেন। ধিক আপনাদের।

কমলিওয়ালে ঃ এটি নাতের একটি পংক্তির টুকরো।

কিছুক্ষনের জন্য অতিথিরা অভ্যর্থনাকারীদের আর অভ্যর্থনাকারীরা অতিথিদের দেখলে। তারপর ঠোটে হাসি আসতে লাগল। এই হাসিও খুবই ভালো—কারো ব্যবসায়িক, কারো ক্ষমা চাওয়া বোকামি—এইরকম ভেবে হাসি। সব ধরণের হাসি ছিলো সেখানে—দুঃখের হাসি, প্রতারণার হাসি, ভালবাসার হাসি, নোংরা হাসি, যোগ্যতার হাসি, অযোগ্যের হাসি, যেন আমরা সবকিছু জানি, আর আপনি এক্কেবারে বোকা, যেন মিয়াঁ বল, এবার কি করবে? আমি তো তোমার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেছি। হাসির মধ্যে অসফল*আকাঙ্খার ধুলো ভরা থাকে — ইব্রাহিম জলিসের* চেহারায় এই হাসি ছিল।

আর একজনের হাসিতে ছিল আজব এক ধরণের অনুরোধ, মাটির রঙের বিষন্ন হাসি, সে যেন বলছে—আমাকে দেখ, তুমি এমন চোখে চোখ রাখ যাতে তুমি কিছু শিখতে পারো। তার উচ্চতা ছ' ফুটেরও বেশি। তাছাড়া একফুটের উঁচু রোম দেশীয় টুপি পরায় মনে হচ্ছিলো যেন এইমাত্র কোন সার্কাস থেকে পালিয়ে এসেছে।

'ইয়ে সাহাব হ্যায়', বেঁটে, গোধূম রঙের গোল চেহারা, সহজ সাধারণ, কিন্তু চোখ অনেক বুদ্ধিমান, যে বলছে, আমরা তোমাকে চিনে নিলাম, এক মুহূর্তের মধ্যে।

ইনি হলেন নজর হায়দ্রাবাদী, চওড়া কালো চেহারা—চওড়া মাথা, চওড়া মুখ, বড় বড় ঝাঁপিয়ে পড়া চুল, শরীরের সর্বত্রই বিস্তারের অনুভব। ইনি দক্ষিণের আদর্শ বাসিন্দা, এমন এক ভাস্কর্য যাকে ডেকান নিজেই তার বিস্তৃত দীর্ঘ বড়ো বড়ো পাথরের টুকরোর মধ্যে থেকে কেটে বের করেছে। নির্লজ্জ নিঃসংকোচ তার হাসি, যা আপনা থেকেই ঠোটে চলে আসে।

ইনি মুসলিম জিয়াই... বেঁটে, শ্যামবর্ণ, টাকমাথা, চোখে চশমা, ঠোটে লজ্জিত কুমারীর হাসি'—হারিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসবো। হাসি এগিয়ে আসে, পিছিয়ে যায়, যেন সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না যে বাইরের লোকগুলো তার বন্ধু না শত্রু, প্রিয় না অপ্রিয়। হাসি বলছিল, আমি একা, একাই।

আমি অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছি, সব কিছু হারিয়ে ফেলেছি, তবু আমি নির্দোষ। আমি একা, আমাকে ছেড়ো না। আমি তোমাকে আপন করতে চাইছি। কিন্তু তোমার উপর আমার বিশ্বাস নেই, তুমি আমার বন্ধু হতে পার, হ্যা..... নহী নহী .... আমাকে ছুঁয়ো না, আমার নিজের কিছু নেই। একটি নাম ছিল, তাও আমার নিজস্ব নয়। জিয়াই নামে এক বন্ধু ছিল, সেও মারা গেছে। তার নামই আমি নিয়েছি, সে আমার মধ্যে জীবিত। তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করতে চাও? আমি চললাম, না, তুমি আমাকে বুঝতে পারবে না। সেই বন্ধু মরার সময় আমাকে বলেছিল, 'মদ খেয়োনা'। সেই দিন থেকে আমি কখনো মদ খাইনা .... তুমি আবার হাসছ, এই দেখ, আমি কেমন গায়েব হয়ে যাই। তুমি আমাকে বুঝবে না। আমার সরলতার এক ঐতিহ্য আছে। সেই সরলতা স্নেহ, অশ্রু থেকে জন্ম নেয় এবং অসফলতার অশ্রু লুকিয়ে মুক্তো হয়ে যায়। মুসলিম জিয়াই ও মহেন্দ্রনাথ গলাগলি করল।

'আপ্‌সে মিলিয়ে'—কেউ কৃষণ চন্দরকে বলল। কৃষণ চন্দর মাথা ঘুরিয়ে দেখল,

---

* ইব্রাহিম জলিস ঃ উর্দুভাষার একজন ভালো গদ্য লেখক।

সাধারণ উচ্চতার বেঢপ মানুষ, চেহারায় একটা অর্থহীনতা, হাসিও উদ্দেশ্যহীন, তাতে গোপনতা নেই, যাকে মানুষ বুঝতে পারেনা, বরং সেই মৃদু হাসি নিজের বিস্তারিত বিবরণ এমনভাবে তুলে ধরে যাতে কেউ কোনরকম ভুল না বোঝে। শুকনো চেহারা, ঠোঁটে না আছে চমক, না চোখে বুদ্ধির ছাপ, না কপালে উজ্জ্বলতা, নীরব, চুপচাপ মাটির মানুষ, চেহারার রঙ হলুদ, না, মাটির রঙের না মাটির মতো নয়, ধুলোর মতো, কিছুটা সবুজ, একেবারে ব্যাঙের মতো লাহলওয়ালা*। কৃষণ চন্দর মনে মনে বলল, ওকে দেখে বমি আসছিল... সকালে কার মুখ দেখে উঠেছি।

'আপ জিগর হায়দ্রাবাদী হ্যাঁয়, ইব্রাহিম জলিশের বড়ো ভাই।'

'ও ইনি জিগর হায়দ্রাবাদী?* আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম।' কৃষণ চন্দর হাতে হাত মিলিয়ে নিজের নোংরা হলুদ দাঁতগুলি বের করে বলল। এর পর আবার মাথা ঘুরিয়ে শিফতের কানে, 'জিগরকে যেখানেই দেখো, একই রকম জ্বালানো পোড়ানো। 'দুর্ভাগ্য', শিফতে হেসে বলল, 'হ্যাঁ হায়দ্রাবাদে হোক বা মুরাদাবাদে বা উর্দু কবিতাতে - এর রঙ একই।* সর্দার শিফতে ও কৃষণ চন্দর দুজনকেই তিরস্কার করল, 'আয়নার নিজের চেহারা দেখো একবার, তারপর অন্যের নিন্দে করবে।'

'যাই হোক না কেন, আমি ওকে ঘেন্না করা শুরু করেছি', কৃষণ চন্দর সিদ্ধান্ত দেবার মত করে ঘোষণা করল।

'দুভার্গ্য তোমার, থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থার দায়িত্ব জিগরেরই', সর্দার প্রতিটি শব্দের উপর জোর দিয়ে দিয়ে বলল।

'বাপরে', কৃষণ চন্দর হঠাৎ করে লাফিয়ে উঠল।

হায়দরগোড়া

মেহমান সাহিত্যিকদের রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল হায়দর গোড়ায়। যাবার পথে রাস্তায় একটি বড়ো বাড়ির দিকে আঙুল তুলে সর্দার জাফরি কৃষণ চন্দরকে বলল, 'গতবার উর্দু কংগ্রেসের সময় ঐ বাড়িতে রেখেছিল আমাদের। থাকার ব্যবস্থা, খাবার খুব ভালো ছিল, প্রয়োজনের থেকে বেশি ভালো ছিল। প্রত্যেক অতিথির জন্যে ছিল দুজন চাকর, তারা সবসময় ঘরের বাইরে বসে থাকত। তখন জমিদারি ব্যবস্থার জাঁকজমক ছিল খুব।' কৃষণ চন্দর ভাবল, এবার প্রোলেতারিয়েতের বাড়াবাড়ি হচ্ছে। অকারণে জিগরের সঙ্গে শত্রুতা হয়ে গেল। তাই এবারকার থাকার বাড়িটিও পছন্দ হল না। নতুন তৈরী বাড়ি এবং পুরোটিই তাদের দখলে ছিল। কৃষণ চন্দর মনে মনে ব্যবস্থাপকদের গালাগালি দিতে দিতে সবচেয়ে ভালো কামরাটি নিজের দখলে নিল। বাকি তিন কামরায় ছ'-সাত জন করে গোলাকার জায়গা নিয়ে থাকল, বিছানা ছাড়াই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

'উঁ, খাট পর্যন্ত নেই, বাথরুমের খিল গায়েব, স্নানের বালতিও নেই।'

---

*১ জিগর হায়দ্রাবাদী ঃ মুরাদাবাদে জিগর মুরাদাবাদী এক বিখ্যাত উর্দু কবি ছিলেন। তাঁর চেহারা সুন্দর ছিলো না, রঙ ছিলো কালো। জিগর অর্থ মেটে। — অনুবাদক

*২ লাহলওয়ালা ঃ শয়তানকে তাড়াবার জন্য ব্যবহৃত শব্দ ঃ কোরাণে আছে। — অনুবাদক

জিগর ওদের সঙ্গে সঙ্গেই আসছিল। তার মনের একাকীত্ব বেড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে থেমে জিগর সাহবেকে সম্বোধন করল, 'বহুৎ আচ্ছা মকান লিয়া হ্যায় আপনে।'

'আজি সাহেব আভি আভি বনায়া,' জিগর সরলভাবে বলতে লাগল, 'ও দেতা নেহি থা। বড়ি মুস্কিলসে ইসে হাসিল কিয়া হ্যায় আপলোগোকে লিয়ে। বিল্‌কুল নয়া হ্যায়, ডেপুটি জালালাউদ্দিন...... যো হ্যায় না ..... কৃষণ চন্দর মনে মনে বলল, এখন আপনি এই বাড়ির গল্প শোনাবেন। এর বংশলতিকা শোনাবেন। ঠিক হ্যায় সাব, আপ কহিয়ে, হাম শুনেঙ্গে। আপনার অতিথি হয়েছি তো।

তৎক্ষণাৎ একটি লোক ছুটে এল—'জিগর সাহেব, সাজ্জাদ জহির সাহেব খাট চাইছেন, ওঁর ঘরে খাট পাঠিয়ে দিন'।

'খাট তো এখানে নেই, দাঁড়ান, আমি ব্যবস্থা করছি', এইটুকু বলে সে নিজের কাহিনী অসম্পূর্ণ রেখে চলে গেল। কৃষণ চন্দর ভাবলো, এ কি আজব লোক, ভাই, তুমি গল্পটা তো শেষ করে যাবে। এ কি অসভ্যতা, কথা বলতে বলতে উঠে চলে গেল। এ কি রকম অভব্যতা! একে ভদ্র ব্যবহার বলা চলে না, 'ওয়া, এখন ওর সাজ্জাদ জহিরের খাটের খেয়াল হল। বন্নে*, খাটে ছাড়া শুতে পারে না। ওর জন্যে খাট কেন আনা হবে। ও খাটে শোবে, আমরা কেন খাটে শোব না? এ কোন কাজের কথা হল! কৃষণ চন্দর ভাবল, বন্নে খাটে শোবে, তাহলে আমিও খাটে শোব। বন্নের জন্যে যদি খাট আসে তাহলে আমার জন্যেও আসবে, আমি কারও চেয়ে কম নয়। জিগর সাহেব, কি সুন্দরভাবে, আমাকে একা ফেলে বন্নের জন্যে খাটের ব্যবস্থা করতে চলে গেল। আমিও তো তার অতিথি, মেহমান হুঁ। খাক মেহমান হুঁ। এক ঘন্টা ধরে এই খালি কামরায় দাঁড়িয়ে আছি। কেউ খবরও নিচ্ছে না, আর বন্নের জন্য খাট আনা হচ্ছে ; আর আমি এখানে মাটিতে শোব। জিগরকে স্টেশনে দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। ওর মন নোংরায় ভর্তি। খাট আনতে গেছে, সাজ্জাদ জহিরের আত্মীয় হয় নাকি। আমি এখানে মাটিতে শোব—হার্গিস নেই, হার্গিস নেই। লেকিন, আমি যখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, কোন চাকরও এই ঘর ঝাঁট দিতে এলোনা, আর অন্য কামরায় খাট দেওয়া হচ্ছে। কে আমার খবর নিচ্ছে! আমি কে, কেউ আমার খবর নেবে! এই সব চক্রান্ত, আমাকে অপদস্থ করার জন্যে এখানে আনা হয়েছে। বেচারা আহমদ আলি ঠিক বলেছিল। কৃষণ চন্দের নিজের উপর নিজের দয়া হল। তার চোখ রাগে দুঃখে জলে ভরে এল। তৎক্ষণাৎ অভ্যর্থনা সমিতির এক সদস্য এলেন—'চলিয়ে চায়ে পি লিজিয়ে'

'নেই, ম্যয় চায়ে নেই পিয়ুঙ্গা' - কৃষণ চন্দর বলল।

'আপ চায়ে নেই পীতে?'

'পীতা হুঁ, মগর ইস ওয়ক্ত নেই পিউঙ্গা'

কিঁউ, কোই খাস বাত হ্যায়'

'জী নহী, আমার আন্ত্রিক হয়েছে।'

'পেটের অসুখে চা উপকারী'।

---

* বন্নে ঃ সাজ্জাদের ডাক নাম।

'হতে পারে, কিন্তু আমার জন্যে নয়।'

'আচ্ছা, তাহলে চলুন, নাস্তা করে নিন।'

'নাস্তা? ম্যয় নাস্তা ভি নেই করুঙ্গা'

'চলুন ভাই, সংকোচ করবেন না। যদি আপনি নাস্তা না করেন, তাহলে জিগর সাহেব রেগে যাবেন।'

'জিগর সাব কাঁহা হ্যায়? উনে মেরে পাশ ভেজ দিজীয়ে'।

'উনি এখনই আসছেন। সাজ্জাদ জহিরের জন্য খাটের ব্যবস্থা করতে গিয়েছেন'।

'না সাহেব', হঠাৎ কৃষণ চন্দর চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার পেটের অসুখ, মাথায় যন্ত্রনা, হালকা জ্বর আছে।'

— 'জ্বর, পেটের অসুখ, মাথার যন্ত্রনা—অপেক্ষা করুন, আমি ডাক্তার ডেকে আনছি।'

— 'ঠাহরিয়ে, ঠাহরিয়ে', কৃষণ চন্দর বলল, কিন্তু সে দাঁড়াল না। ডাক্তার ডাকতে চলে গেল। তৎক্ষণাৎ সর্দার এলো। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছ কৃষণ, চলো নাস্তা নিয়ে অপেক্ষা করছে। দুজনে হাত ধরাধরি করে চলল। জলখাবার খেয়ে নিজের কামরায় এসে দেখল, জিগর দাঁড়িয়ে। তার ঘরে খাটপাতা হচ্ছে। জিগর বলল, 'ডাক্তার এখনই আসবে। খাট পেতে দিচ্ছি। আপনি বিশ্রাম করুন।'

এজলাস

সম্মেলনের প্রথম সভা। উদ্বোধন উপলক্ষে সরোজিনী নাইডুর সাহিবার বক্তৃতায় আগুন ঝরছিলো। কি নারী! বয়স হয়েছে, তবু তার চোখের যৌবন হারায়নি, আত্মানুসন্ধানের অবিরাম প্রয়াস হারায়নি। যুগবদলের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতিরও বদল হয়। আর এই মহিলা কবি এই পরিস্থিতিতেও এমনভাবে অভ্যর্থনা করছেন যেন সে যুগ যুগ ধবে এর প্রতীক্ষা করছিল। বহতা ঢেউ বারবার তীরভূমিতে ধাক্কা খায়। আপনি এই নারীকে উঁচু উঁচু ঢেউয়ের মাথায় দেখবেন, যিনি এই ভারতের রাজনীতি ও ইতিহাসের সব বং দেখেছেন—শিল্প থেকে জীবন এবং হোমরুল থেকে সোস্যালিজম পর্যন্ত। সে কখনও পেছনে পড়ে থাকেনি, তার পা কখনো এলোমেলো পড়েনি ; সে যুগের চেয়ে সবসময় দুপা এগিয়ে থেকেছে। এই সম্ভাবনা প্রবল সে নিজের বিদ্রোহী সত্ত্বার জন্যে এখন থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতেও জায়গা পাবে না। সর্দার শিফতেকে বলল, 'স্ স্। শিফতে ঠোঁটের উপর হাতি রেখে, 'শুনো কৃষণ শুনো'। কৃষণ নিজের লেখা পড়তে যাচ্ছিল। প্রেক্ষাগৃহ নীরব। পাঁচহাজার মানুষ চুপচাপ এক সাহিত্যিকের লেখা শুনছিল। আগে এরকম কখনো হয়নি। এখানে মুশায়েরা ছিল না, বক্তাদের কায়দাকানুন ছিল না, গভীর দর্শনের ব্যাপার ছিল না, কিন্তু লোকেরা চুপচাপ বসে শুনছিল। পাঁচ হাজার কলেজের ছাত্র, স্কুলের মেয়েরা, সরকারী কর্মচারী, দোকানদার, রেলওয়ে মজদুর, বেকার—সব শ্রেণীর লোক সামিল ছিল; চুপচাপ শুনছিল। লেখক যখন মরক্কো থেকে জাভা পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা বলল, তখন প্রেক্ষাগৃহে জোর শ্লোগান উঠল। যখন সাহিত্যে সোস্যালিজমের উল্লেখ করা হল, মানবতার উল্লেখ করা হল, জীবনের একটা সুব্যবস্থার উল্লেখ করা হল, প্রেমের

বিপ্লবী ধারণার উল্লেখ করা হল এবং সেই শ্রেণীদের কথা উচ্চারণ করা হল, যাদের জন্য আমাদের সাহিত্যের দরজা এখন পর্যন্ত বন্ধ আছে, তখন লেখকের কণ্ঠ ও শ্রোতাদের মনের তার কেঁপে উঠল, যেন তারা বলছিল সেই লেখা তাঁদের নিজস্ব।

প্রথম দিন এই হল, দ্বিতীয় দিনেও একই হল, তৃতীয় চতুর্থ দিনেও একই রকম হল। সত্যকে পাবার এই পবিত্র প্রয়াস প্রত্যেক চেহারায় স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। বিগত দশ বছরে লোকে সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক রচনার দিকে মনোযোগ দেওয়া শুরু করেছে, নিজেকে জাতীয় জীবনের একজন ভাবতে শুরু করেছে, গঠনমূলক সমালোচনার কথা ভাবতে শুরু করেছে। শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবি সমাজে অবশ্য এসবের নিয়মিত চর্চা ছিলো, নতুন লেখা নিয়েও আলোচনা হতো: বিস্তারিত আলোচনা হতো প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়, প্রগতিশীল বা পশ্চাৎগামী চিন্তাধারা নিয়ে। বিভিন্ন মানসিকতা ছিল, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, কিন্তু প্রত্যেকেরই সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে সত্যিকারের উৎসাহ ছিল। আর ছিল দেশীয় সাহিত্যকে এমন এক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবার আকাঙ্খা যাতে তা চলমান জীবনের মুখপত্র হয়ে ওঠে। ভারতের যুবকদের হৃদয় জেগে উঠেছিল এবং সাহিত্যের প্রতিটি ব্যাখ্যায় আকাঙ্খার কল্পনার ফানুসগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। এই বেড়ে-ওঠা-আলো অন্ধকারের উপর প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়াস চালাচ্ছিল। বেজে উঠছে এমন এক গান যার প্রতিটি পংক্তিতে নতুন সুরের চমক, সুরের প্রত্যেক স্তরে কোটি কোটি মানুষের আকাঙ্খার প্রতিধ্বনি। এই তার নতুন গান প্রতিটি সাহিত্যিকের মনে উদ্দীপনা বয়ে আনল, তার বুকের স্পন্দন হাজার হাজার স্পন্দনে হারিয়ে গেল। প্রেক্ষাগৃহের চেহারাগুলি হয়ে উঠল উজ্জ্বল, চোখে এল বুদ্ধির ছায়া, চারিদিকে তালির শব্দ, নতুন জীবন, নতুন সাহিত্য, বিপ্লবের নতুন শ্লোগান। কয়েকজন লেখক একে অপরের দিকে তাকালো, যেন সবাই অনুভব করতে লাগল, সাহিত্য কল্পনার চার দেওয়ালে শুধু সীমাবদ্ধ নয়। সাহিত্যের এ অসহায়তা আর উল্টোদিকে এগিয়ে যাওয়া জীবনের টানাপোড়েন সমস্যার দিনগুলিতে ধাক্কা খেতে খেতে সাহিত্য এবং সাহিত্যিককে নতুন অনুভবে পৌঁছে দিচ্ছে।

প্রথম সম্মেলন শেষ হবার পর গভীর রাত পর্যন্ত সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে কথাবার্তা হতে থাকল। কলেজের ছাত্ররা খুব মন দিয়ে সাহিত্যিকদের কথাবার্তা শুনেছিল, অটোগ্রাফ নিয়েছিল। অটোগ্রাফের নতুন প্রচলনও খুব উৎসাহব্যঞ্জক! সাহিত্যিকরা তাড়াতাড়ি করে স্বাক্ষর করছিল, যেন তারা বলছিল, এরা বড্ড উত্যক্ত করছে! কত আর সই করব! কখনো কখনো কোন মেয়ের খাতা কলম নিয়ে ভাবতাম কি করে একটি বাক্যে লায়লা মজনুর পুরো কাহিনী ধরিয়ে দেওয়া যায়। কেউ কেউ কুকুরের মতো চালাক হবার চেষ্টা করত। হুঁ, এ এমন কি, শেষ পর্যন্ত নারীই তো, সোপেনহাওয়ারের নারী! যা তোকে ক্ষমা করলাম! মদন গোপালকে কেউ অটোগ্রাফ চাইল না। সে বত্রিশপাটি দাঁত বের করে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'ভাই খুবসুরৎ মেয়েটির বিচ্ছিরি অটোগ্রাফ খাতায় তুমি কি লিখলে? হিঃ হিঃ হিঃ। ওকে জিজ্ঞেস করা উচিত, এতে হাসির কি হল। মুসলিম জাই-এর অটোগ্রাফ খাতা ছিল

রুবাই ঃ একটি খেয়ালকে চার লাইনের কবিতায় বলা। এর একটি বিশেষ ছন্দ আছে — aaba

আকর্ষণীয় ; সাজ্জাদ জহির লিখেছিলেন, 'সোস্যালিজম জিন্দাবাদ'! কৃষণ চন্দর লিখেছিল, 'মানবিকতা জিন্দাবাদ'! জোস লিখেছিল, 'এখনও তোমরা দুজন ছোট'। আগে সাগর লিখেছিলেন, 'তু বড়া চারশো বিশ হ্যায়' এখানে এসে আলোচনা ঘুরে গেল। যোশ ও সাগরের ঝগড়া নিয়ে কথাবার্তা হতে লাগল। যোশের রুবাইয়ের* কথা এল। ফিরাকও রুবাই লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। দুজনের তুলনা হল। এই ঝগড়ায় রাত দুটো বেজে গেল। সকালেই সর্দারের নিজাম কলেজে বক্তৃতা দেওয়ার কথা। সে ভাবল, এখনই দাড়ি কামিয়ে নিই।

'কৃষণ তোমার দাড়ি কাটার সরঞ্জাম কোথায়?' কৃষণ চন্দরের সরঞ্জাম উধাও ; সে অনেক খুঁজল। কোথাও পাওয়া গেল না। সে অনুসন্ধিৎসু মুখে জিগর সাহেবের দিকে তাকাল। জিগর নজরই করল না। কৃষণ চন্দরের মনে আরও ঘৃণা বেড়ে গেল। ভালো, একবার জিজ্ঞেসও করল না, ভাই আপনার দাড়ি কাটার সরঞ্জাম কিভাবে হারাল? এখানেই কোথাও হবে। আমি কাউকে দিয়ে খোঁজ করাচ্ছি।

'আমি চললাম', জিগর হাই তুলতে তুলতে বলল, 'সকালে ফিরাক, এহতেশাম, ডা. আবদুল আলিম আসবেন। আমাকে কলেজেও যেতে হবে।'

'গাড়ির ব্যবস্থা করে দিন', কৃষণ চন্দর বলল,

'আমি দেখছি', জিগর কোন গুরুত্ব না দিয়েই বলল।

কৃষণ চন্দরের মন কাবাবের মতো ফুটতে লাগত। সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সেই মুহূর্তেই, সে সিদ্ধান্ত নিল কাল সকালে নিজাম কলেজে কিছুতেই যাবে না, যে যাই বলুক। ভারি বয়ে গেল তার।

সে সকালে উঠে দেখল দাড়ি কাটার সরঞ্জাম তখনও গায়েব। বেচারা সর্দার এক কামরা থেকে আর এক কামরায় ঘুরে বেড়াতে লাগল—কিন্তু কারও দাড়ি কাটার সরঞ্জাম পাওয়া গেল না। আনন্দ দাড়ি কাটছিল, শিফতে ঘুমোতে ঘুমোতে যন্ত্রনার শব্দ করছিল। সাজ্জাদ জহির দাড়ি কাটাব সরঞ্জাম কাউকে ধার দেয় না। দুজনকে নিজাম কলেজে যাবার উদ্যোগ নিতে দেখে বললে, 'দাড়ি কামিয়ে নিলে ভালো হত। শুনেছি নিজাম কলেজে মেয়েরাও পড়ে। সর্দারের চেহারায় বিষন্নতার আভাস ছিল। কৃষণ চন্দরের চেহারা ক্ষুধার্ত ভেড়ার মত। অকস্মাৎ জিগর গাড়ি নিয়ে এল। তার চেহারায় না ছিল দুঃখ, না অসফল আকাঙ্খা, না ভয়, না বিরক্তি, যেন সাহিত্যিকদের বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই, কিন্তু আবার এমন কোন মনোভাবও নয় যাতে অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় —এ এক আজব ধরনের নিস্পৃহতা। এ দেখে কৃষণ চন্দর আরও রেগে উঠল। বেড়ে ওঠা দাড়ির উপর এমনভাবে হাত বুলোতে লাগল যেন জিগরই দাড়িকাটার সরঞ্জাম চুরি করেছে।

সর্দার ও কৃষণ চন্দর নিজাম কলেজ থেকে ফিরে দেখল ফিরাক, এহতেসাম ও ড. আবদুল আলিম লক্ষ্ণৌ থেকে এসে গেছেন। খাবার সময় বিতর্ক চলছিল নগ্নতার উপর। সর্দার কলম নিয়ে এ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব লিখতে আরম্ভ করল এবং বিতর্ক দীর্ঘতর হতে থাকল। ফিরাক সৌন্দর্যের কারিগর। তাই সে নগ্নতাকে অত ঘৃণা করেনা ; এহতেসামের যৌবনের সজীবতা আছে, সে নগ্নতাকে খারাপ মনে করে না, রেগে যায় না, গালাগালি করতে রাজী হয় না। ড. আবদুল আলিমের স্টাইল এরকম

ছিল, 'মিয়াঁ, আভি তুম বাচ্চে হো'। তার তাজা চেহারায় স্মিত হাসির ঢেউ হঠাৎ করে উধাও হয়ে যাচ্ছিল। দাড়ি আর কায়দাকানুনে সে হয়ে যাচ্ছিল ফরাসী। রেগে গিয়ে সে এমন তিক্তভাবে কথা বলত যেন একজন হেডমাস্টার, আর খুব রেগে গেলে মনে হত শতকরা একশো ভাগ কমিউনিস্ট। প্রায়শই লোকে ভুল কথা বলে, ভুল সময়ে বলে বা ভুল কথা ঠিক সময়ে বলে। কিন্তু ড. আলিমের সম্পর্কে সবাই জানে যে সে সবসময় ঠিক কথা বলে এবং সবসময়ই ভুল সময়ে। চাদরঘাট কলেজে ভাষণ দিতে গিয়ে সে ছাত্রদের সামনে অধ্যাপকদের এমন বকুনি দিল যে বেচারারা এখনও তাকে মনে রেখেছে। পি.ই.এন কনফারেন্স উপলক্ষে মুল্‌করাজ আনন্দ প্রস্তাব পেশ করল, ভারতেও ফরাসীদের মতো এনসাইক্লোপিডিয়া নিয়ে একটি আন্দোলন শুরু করা যাক। অনেকেই এই বৈপ্লবিক প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। ওদের মধ্যে বিকানীর রাজ্যের মন্ত্রী সর্দার পাণিকারও ছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র একজনের বিরোধিতায় এই আন্দোলন আরম্ভ হল না। এই বিরোধী কে ছিলেন জানেন? এই আমাদের ড. আবদুল আলিম সাহেব। তিনি উঠে বললেন, প্রস্তাব সময়ের সঙ্গে খুবই সংগতিপূর্ণ; ফ্রান্সে এই আন্দোলনকারীদের মধ্যে বড় বড় মানুষ ছিলেন—রুশো, ভলতেয়ার। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই এখানে এরকম কোন সাহিত্যিক আছেন? কোন্ চিন্তাবিদ আছেন? তিনি পুরো জমায়েতের দিকে নজর করে বললেন, আমি আপনাদের মধ্যে একজনও ওই উচ্চতার মানুষ দেখতে পাচ্ছি না। চারদিকে হাসির তুফান উঠল। জমায়েতের মধ্যে থেকে একজন কোনরকম চিন্তাভাবনা না করেই বলল, মঞ্চে এরকম কাউকে চেখতে পাচ্ছেন না? মঞ্চে স্বয়ং সরোজিনী নাইডু বসেছিলেন, জওহরলাল নেহেরু ছিলেন... দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন, হারমেন ওলড এবং ... ফরেস্টার, মুলক রাজ আনন্দ, আহম্মদ শা বোখারী পুত্রস এবং অন্যান্যরা। ডাক্তার সাহেব মঞ্চের দিকে তাকালেন, সবাইকে দেখলেন এবং ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, আমি এখানে কাউকে দেখছি না... আন্দোলনের প্রস্তাব থেমে গেল। `

সন্দেহ নেই, ডাক্তার সাহেব সৎভাবেই তাঁর অনুভব প্রকাশ করেন এবং নীতিনিষ্ঠভাবে তা মেনে চলেন, কিন্তু তাতে প্রায়ই তার সমর্থকও বিরোধী হয়ে যায়। তাতে অবশ্য উনি কোনরকম পরোয়া করেন না। তিনি সাহিত্যিককুলের মহাত্মা গান্ধী, তবে তিনি অহিংসা মানেন না। যদি কখনো ভারতে এমন কানুন বলবৎ হয় যে সাহিত্যিকদের মানসিক, বৌদ্ধিক বা বহিরঙ্গের ভুলের জন্যে শাস্তি দেওয়া হবে, তবে সেই শাস্তি নির্ধারণের দায়িত্ব ড. সাহেবকে দেওয়া হবে। ওর সরাসরি কথার জন্য লোকেরা তাকে ভয় পায়। কিন্তু এটাই তাঁর মহত্ব। এই কাজে যদি কেউ ওর সঙ্গে টক্কর দিতে পারে তবে, সে হসরৎ মোহানি। ভাগ্য ভালো যে তিনি সম্মেলনে হাজির ছিলেন। তাই যখন প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের তরফ থেকে নগ্নতার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ করা হল, মৌলানা হসরৎ মোহানি, কাজী আবদুল গফফর এর বিরোধিতা করল। মজার কথা হল যুবকেরা নগ্নতার বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনল ; বয়স্ক লোকেরা এর পক্ষে বলল, কেননা তারা জানত এভাবেই যৌবনমনস্ক জাতিগুলিকে ক্রশবিদ্ধ করা হবে, এভাবেই চিন্তাস্রোত থেমে যাবে। মৌলানা হসরৎ মোহানির প্রবল ভাষণে প্রস্তাব নাকচ হল। শিফতে অত্যন্ত অখুশী হয়ে বলতে লাগল, 'মৌলানার প্রায়শই এরকম ভূমিকা থাকে। সে সবসময়েই মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়। কংগ্রেসে থাকাকালীন

হোমরুলের সময় স্বাধীনতার দাবি করে কংগ্রেসে হাই কম্যান্ডকে ভয় দেখাত। আবার লাহোর কংগ্রেস যখন পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব পাশ করল, তখন তিনি সমাজবাদের ত্রুটি বের করলেন। তিনি এমন অখুশী হলেন যে মুসলিম লীগে চলে গেলেন; সেখানে গিয়ে খানবাহাদুরদের বিদ্রোহে উস্কানি দিলেন এবং সম্পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব পাশ করাবার উদ্যোগ নিলেন। প্রত্যেক জায়গায় লোকেদের অসুবিধেয় ফেলে দেয়। কত ভালভাবে রেজলিউশন পাশ হচ্ছিল ... ছাড় .... হঠাও এই কিস্‌সাকে।' এই বলে সে থেমে গেল। তার চেহারায় হাজার হাজার যন্ত্রণার রেখা হঠাৎ মিলিয়ে গেল, আবার সে খিল খিল করে হেসে উঠল, 'কিন্তু ভাই, এই মৌলানা আচ্ছা লোক। ভারি পাথরের মতো—জায়গা থেকে সরবে না, কারও কোন কথা শুনবে না।'

দুপুরে প্রেমচন্দ সোসাইটির উদ্বোধন ছিল, হোসেন সাগরের ক্লাবে। সেখানে আমন্ত্রণও ছিল। সাহিত্যিকদের নৌকায় করে ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে পৌঁছোবার ডাঙা পথও ছিল। সম্ভবত মোটরবোট দেখানোও তাদের উদ্দেশ্য ছিল। ক্লাবের বাড়িটি ছিল ঝিলের মধ্যে। সেখানে জনা পঞ্চাশেক কর্মচারী—আট কোর্সের খাওয়া দাওয়া। এই আমন্ত্রণে এত ব্যয় হয়েছিল যা প্রেমচন্দ নিজের জীবনে, সম্ভবত রয়েলটি হিসাবে পাননি। ইউরোপে একজন সাহিত্যিক জীবিত অবস্থাতে সম্মান পান, ভারতে মৃত্যুর পর তার খোঁজখবর হয়। তাই আজ প্রেমচন্দ সোসাইটির উদ্বোধন ছিল। কাজী আবদুল গফফর খান বক্তব্য রাখছিলেন এবং নিমন্ত্রিতদের দামী খাবারের ব্যবস্থা ছিল, ঝিলের দৃশ্যে সাহিত্যিকরা আনন্দবোধ করছিলেন। কাজী আবদুল গফ্‌ফর খানের ব্যক্তিত্বে কর্তব্যের একটা মোটা পর্দা আছে। এই পর্দা এত মোটা নয় যে স্বতঃস্ফূর্ততা আন্তরিকতা হারিয়ে যাবে, তার হাসিখুশি ভাব কিন্তু প্রকাশ্যে দেখা যাবে না। এমন মনে হয় কোন বিশেষ ঘটনা, বিশেষ পরিস্থিতি, বিশেষ পরিবেশ তার মনকে, তার চিন্তাকে, তার স্বাভাবিক মেধাকে দু টুকরো করে দিয়েছে—সে এতেও বাধ্য ওতেও বাধ্য। দুটি রঙ একটি ব্যক্তিত্বে ঝলসে ওঠে—একটিতে আছে প্যারিসের ঝলমলে রঙ, অন্যটিতে জ্ঞানীদের প্রার্থনার অভ্যেস। ভালো লেখার শিল্পগুণ আর মানসিক স্থৈর্য, একদিকে পোশাকে দৌলতের প্রদর্শনী, কিন্তু আলাপে সৌজন্যের আকর্ষণ, ব্যবহার জমিদারের, মন কিন্তু বিদ্রোহীর। কাজী সাহেব এমন একজন যুবক যাকে অনেক দিন কেউ কাতুকুতু দেয়নি কিন্তু নিজে থেকেই তার মুখে হাসি ফুটছিল। আমার ভাবতে ইচ্ছে করে লাখ লাখ লোকের সভায় লায়লাকে কেউ কাতুকুতু দিচ্ছে, অথচ লায়লা ভাবছে সে নির্জনতায় একা খিল খিল করে হাসছে—এই হাস্যরস খুব বড়ো শিল্পের আভাষ দেয়।

পুরনো মহল

'ভাই, তুমি বিয়ে করছ না কেন? কৃষণ চন্দর মুসলিম জাইকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন তো তোমাকে চশমাও নিতে হয়েছে'। মুসলিম জাই তার চশমার কাচ মুছতে মুছতে বলল, 'তুমি জানো না, আঃ।' 'কোন হ্যায় ও জালিম'? কৃষণ চন্দর জিজ্ঞেস করল। 'ও হররোজ কনফারেন্স মে আতী হ্যায়, আঃ'। গাড়ি চারমিনারের আশেপাশে ঘুরে একটি ফুলওয়ালার দোকানে দাঁড়ালো। মুসলিম জাই নেমে মালা কিনতে লাগল।

'এ মালা কি হবে?'

'আমি তাকে পাঠিয়ে দেব, সে এই মালা খুব পছন্দ করে আঃ!' 'আঃ ! আমি আমার বিবির জন্যে চুড়ি কিনব, আর একটা মোরাদাবাদী পানের বাটা', কৃষণ চন্দর বলল। এসব জিনিস খরিদ করে গাড়ি চারমিনারের একদিকে দাঁড়াল। মিনারের ঘড়িতে তখন পাঁচটা বাজে। সাইরেন বাজছিল। সাইকেল যাত্রীরা সাইকেল থেকে নেমে গেল। ঘোড়ার গাড়ির সহিস।

গাড়ি থামাল, চালকেরা গাড়ি একদিকে রাখল, পথিকেরা যেখানে ছিল সেখানেই থেমে, অচল অনড় হয়ে গেল। চারিদিকে যেখানেই চোখ যাচ্ছিল, শান্তি, নীরবতা আর মাথা নীচু করা মানুষ, শেরওয়ানীর বোতাম গলা পর্যন্ত বন্ধ ছ ; মাথা নীচু করে সবাই পাথুরে জমির দিকে তাকিয়ে আছে। ঘামভরা কপালগুলি তারা অদৃশ্য কোন দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে মুছে নিচ্ছিল। হঠাৎ একটি কালো গাড়ি পথ দিয়ে চলে গেল। মিনারের সামনে দাঁড়ানো সেপাইরা সেলাম দিল। গাড়ি পথ দিয়ে চলে গেল। মিনারের বড়ো ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। হঠাৎ চারিদিকের নীরবতা ছন করে ভেঙে গেল। নীচু মাথাগুলি উঁচু হয়ে গেল। মোটর সাইকেল, ঘোড়ার গাড়ি চলতে লাগল। দোকানদার মালপত্র বিক্রি শুরু করল। আবার ঐ শোরগোল শুরু হল — ঐ হাও - হু, একই জীবন। 'কেয়া হুয়া থা ভৈ'? কৃষণ চন্দর এক সান্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল। সান্ত্রী ওকে ঘুরে দেখল, আর নিজের তরোয়ালের হাতল ধরে বলল, 'এখন সরকারের এক সওয়ারী এখান দিয়ে গেল। তুমি অন্ধ নাকি! এটুকুও জানো না।' 'চলো চলো গাড়ি বাড়াও'—মুসলিম জাই ট্যাক্সি চালককে বলল। তারপর ঘুরে কৃষণ চন্দরকে বলতে লাগল, 'এই সান্ত্রীরা স্বাধীন আরবের লোক। এদের সঙ্গে 'ইয়া চাওস' সম্বোধনে কথা বলা উচিত। ভাই বলে নয়। এ তো ভালো সান্ত্রী, বদমেজাজী হলে তোমার পেটে ছুরি বসিয়ে দিত'।

'ইয়া চাওস' কৃষণ চন্দর ভয় পেয়ে বলল, 'এখন কোথায় যাব? রাজার বাড়িতে ছ'টার সময় নিমন্ত্রণ।'

রাজার মহল। পুরনো মহল। শহরের মধ্যে উঁচু দেওয়ালে ঘেরা। সুন্দর বাগিচা, বাগিচায় একটি ময়ূর নাচছে। সাহিত্যিকরা যখন পৌঁছল দশ-বারোটা গাড়ি অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে। রাজাসাহেব উপস্থিত ছিলেন না। গাড়ির ড্রাইভাররা, সিপাইরা, রাজার মোসাহেবরা মাথা নীচু করে সাহিত্যিকদের নমস্কার করল। লেখক বেচারারা খানিকটা হয়রাণ, খানিকটা লজ্জিত, খানিকটা কষ্টে মহলের সিঁড়িগুলিতে দাঁড়িয়ে গেল, দাঁড়িয়েই থাকল। এই সময় কেউ বলল, 'উপরে আসুন, এই দিকে, লাইব্রেরীর দিকে।' সেখানে রাজা সাহেবের সঙ্গে আলাপ হল!

বাইরে থেকে তাঁকে মনে হয় সত্য এবং স্বচ্ছতার প্রতিমূর্তি। রোগা রোগা চেহারা, মাথায় তিলক। বড় এবং ভাল লাইব্রেরী। প্রতিটি বিষয়ে বই আছে। সম্ভবত বইগুলি কেউ সব খুলে পড়েনি। অনেক বইয়ের সব পাতা কাটাও হয়নি। পুরো লাইব্রেরীতে দুটি বাচ্ছা পড়ছিল। একটি শ্বেত পাথরের স্ট্যাচু। আর একটি মর্মরের বই খুলে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জানা নেই কত বছর এইভাবে ও ঝাঁপিয়ে এই পাতা পড়ছে। এই শ্বেত পাথরের পাতা, এই পাথরের বই, এই পাথরের মহল— কিন্তু তোমরা এখানে কি করছ? পরের ঘরে অজানা অচেনার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছো? এ বাড়ি

তো তাদের আপন নয়। পাথরের শিরার রক্ত সাদা হয়ে গেছে। এখানে ময়ূর নাচছে। একটি ঘর সমাজবাদ সম্পর্কিত বইতে ভর্তি। হাজার হাজার বই জড়ো করা। মোসাহেবরা এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন আমরাই তামাসার বস্তু, আর তারা তামাসা দেখছে।

তাদের চোখ বলছে, তোমাদের মত শত শত লোক এখানে আসে, নেমন্তন্ন খেয়ে বিদায় নেয়। এখানে আমরা সাহিত্যিকদের ডাকি, সার্কাসওয়ালা, মাদারি আর জোকারদের ডাকি; ভ্রমনার্থীরা আসে, আসে রাজনীতিবিদেরা। আমাদের রাজাসাহেব সবাইকে নিমন্ত্রণ করেন। আমাদের রাজা খুবই ভালো, কিন্তু উনি ভালো হলে কি হবে, আপনারা ভালো হতে পারলেন না। সর্দার সাহেব আপনার কামিজ ছেঁড়া, সিফতে মিয়া, আপনার শেরওয়ানীর বোতাম নেই, কুদ্দুস সাহেব, এই ঝোলা কিভাবে ঝুলিয়ে রেখেছেন, মহীন্দরনাথ, আপনার কি হলো যে মাথায় জঙ্গল করে রেখেছেন, কৃষণ সাব আপনার পকেট দশটি তালি দেওয়া। এখানে আপনারা কি ভোজ খেয়ে প্রগতিশীলতার দাবি করবেন? সামনে ময়ূর নাচছিল। একজন যাকে রাজার মন্ত্রী মনে হচ্ছিল, বলল, 'সরকারের যাদুঘরও দেখবেন।' 'সরকারের যাদুঘর!' এই পুরো মহলটি যাদুঘর মনে হচ্ছিল! প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা ছিল বিভিন্ন কামরায়। এই ব্যালকনিতে সাজ্জাদ জহির, ডাক্তার তারাচাঁদ বন্দী। ওই কামরায় সর্দার, আদিল রসিদ, সিফতে হাসান এবং রফোদ সরোস বন্দী, এই কাচের আলমারির কাছে কৃষণ চন্দর, মদনগোপাল, ফিরাক গোরখপুরীকে দাঁড় করানো হয়েছিল। ফিরাক সাহেবের চেহারায় ভীষণ রাগের ছায়া, ওঁর গোল গোল চোখের মণি এই আশ্চর্যের মধ্যে ডুবে গিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল, যেন আল্লাহকে চেয়ে বেঁহুশ হয়ে গেছেন।

হুঁ, আমরা এখানে কি করছি? আমরা নিমন্ত্রণ খেতে এসেছি না নিজেদের রক্ত খেতে এসেছি? ফিরক জোর গলায় বললেন, 'ভাই আমি চলে যাচ্ছি।' এই বলে সে এগোল। 'ঠাহরিয়ে, ঠাহরিয়ে', মন্ত্রী বলল, 'ঐ রাজা সাহেবের যাদুঘর।'

'আচ্ছা সাহেব', ফিরক সাহেব থমকে গিয়ে বললেন, 'তাও দেখে নিচ্ছি'। এক কামরায় পাথরের স্থাপত্য, অন্য কামরায় দেবতাদের মূর্তি, পাথরের নয় ধাতুর, আর একটি কামরায় আসিফিয়া খানদানের* চিঠিগুলি সংরক্ষিত। এগুলি রাজাসাহেবের আত্মীয়দের কাছে লেখা হয়েছিল। রাজাসাহেবের ছেলেদের উর্দুতে লেখা চিঠিগুলি বোধহয় তাদের উর্দুকে ভালবাসার চিহ্ন। এক কামরায় হাতে আঁকা ছবি ছিল। মন্ত্রী বললেন, 'আমার এই সব ছবি খুব পছন্দ'। ছবিতে যে খুব আকর্ষণ ছিল তেমন নয়। এক সুন্দরী মেয়ের ছবি। এমন এক শাদা শাড়ী সে পরেছিল যাতে তাকে নগ্নই দেখাচ্ছিল, কোমরের খাঁজে কলস নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। উজিরের খুব প্রিয় ছিল এ ছবি। মন্ত্রীর ঠোঁট খোলা ছিল। হায়, ও মোটে মোটে খুলে খুলে বদসুরৎ ঠোঁট। সামনে মোর নাচ রহা থা।

'ম্যয় যা রঁহা হুঁ, ভাই কৃষণ', ফিরক বিরক্ত হয়ে বলল।

'ঠাহরিয়ে, ঠাহরিয়ে', মন্ত্রী ঘাবড়ে গিয়ে বলল।

'চা খেয়ে যান'।

---

* আসিফ একজন রাজার নাম। তাঁর বংশকে আসিফিয়া খানদান বলা হয়।

'হুঁ', ফিরাক সাহেব খরজের স্বরে বলল, আর বাগানে গিয়ে চা খেতে লাগল।

চা খাবার পর রাজা সাহেবের সঙ্গে প্রগতিশীল লেখকদের ছবি তোলার ব্যবস্থা। রাজাসাহেবের ডানদিকে সাজ্জাদ জহির, বাঁদিকে কৃষণ চন্দর, চেয়ারের উপর অন্যান্য লেখকরা। মোসাহেবদের মত পেছনে দাঁড়িয়েছিল সর্দার, শিফতে ও অন্যান্য বিপ্লবী সাহিত্যিক। 'ম্যয় হাজির হো সরকার' ফটোগ্রাফার বলল। রাজাসাহেব ইশারা করলেন, ছবি তুলে নেওয়া হল। ফিরাকের গায়ে শূল বিঁধছিলো; তবুও ছবি তোলা হল। ছবি খুব জরুরী। 'ছবিতে রাজা সাহেবের প্রগতিশীলতা স্পষ্ট হবে না, বরং এ তার অসম্মানই', সর্দার বলল। 'যদি আমি জানতাম..' শিফতে বলল, 'বিপ্লবের সময় জায়গীরদার এসব কয়েকটা ছবি দেখাবে আব নিজেকে সমাজবাদের বাহক বলে প্রমাণ করবে।' 'উঃ, কথাতে কি আর প্রমাণ হয়', কুদ্দুস সাহবাই বললেন, 'তাতে তাড়াতাড়ি শাস্তি পাবে'। 'কিন্তু এমন হলই বা কেন'? মদন গোপাল চেঁচিয়ে উঠল, 'আমরা এখানে এলাম কেন'? ফিরাক বললে, 'যদি কেউ আমাব সাথে যেতে চায় চলুক, নইলে আমি এখনই চলে যাচ্ছি'। 'ঠাহরিয়ে, ঠাহরিয়ে', মন্ত্রী চেঁচিয়ে উঠল, 'পান, আতর হাজির আছে।' সোনার আতরদান আর রূপোর পানদান এলো। পান খাইয়ে, আতর লাগিয়ে, হাতে ফুলের স্তবক দিয়ে লেখকদের বিদায় দেওয়া হল। বিদায়ের সময় মনে হচ্ছিল কেউ যেন মুখে থুতু ফেলেছে, কপালের উপর কাদা লেপে দিয়েছে, আত্মা নোংরায় ভরে গেছে। প্রত্যেকেরই বোকা বোকা মনে হচ্ছিল। 'সামনে মোর নাচ রহা থা।'

আবার নিজেদের জায়গায় ফিরে গিয়ে দেখলাম জিগর হায়দ্রাবাদী উঠোনে দাঁড়িয়ে হাসছে।

'বলুন সাহেব, রাজা সাহেবের নিমন্ত্রন থেকে ছুটি পেলেন?' এরপর হাসল ; ঠোঁট লাল, মাড়ি লাল, জাফরানের রঙের চেহাবার ঘা থেকে পুঁজ বয়ে যাচ্ছে, ইচ্ছে হল গলা টিপে মেরে দিই।

সর্দার দু হাত মুঠো করল। নিজের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, 'বন্দে খোদা, বতা তো দিয়া হোতা কাঁহা দাওযাত হ্যায়। হাম কেয়া মালুম এ সম্রাজ কে?

'আমি তো ভাবলাম কোন সাহিত্যপ্রেমী হবে।'

'সাহিত্যপ্রেমী তো বটেই, নইলে আপনাদের ডাকবে কেন?'

'এ তো ঠিক কথা, কিন্তু—কিন্তু এই রাজা, এই নবাব, এই ইয়ারজঙ্গ বাহাদুর, তুমি কি বুঝতে চাইছো না.... .' জিগর মুখ ঘুবিয়ে নিল। রান্নাঘবেব দিকে যেতে যেতে বলল, 'আপনার জন্য রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। রাতে খাবার আগে উর্দু মজলিস থেকে সব প্রতিনিধিদের ডাকা হযেছে; যেতে হবে। ও অন্যদিকে মুখ করে চলে গেল। ফিবাক তাকে ক্ষমা করল না। নিজের চোখের মণি ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, 'ইয়ারোঁ আজব আদমি হ্যায়, চব্বিশ ঘন্টা ঘাড়ের উপর আছে। যখন দেখবে তখনই উপস্থিত। এই ব্যক্তি খায় না, ঘুমোয় না, যখনই দেখবে এদিক থেকে ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর হয়েছেটা কি? তারপর নিজেই মাথা নীচু করে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কিছুক্ষণ পরে শিফতেকে বলল, 'কুছ সমঝমে নেহি আতা, আও ভাই, তোমাকে কিছু রুবাই শোনাই।'

শিফতে কৃষণকেও দলে টানতে চাইল, 'চলো, তুমিও রুবাই শুনবে, খুব ভালো রুবাই বচনা করে,'

আদিল রসিদ প্যান্টের ক্রিজ ঠিক করতে করতে বলল, 'মস্ত বড় কবি'।

শিফতে বলল, এর কবিতা ভারতীয়দের মধ্যে সেবা।'

কৃষণ চন্দর বলল, 'আমি এখন রুবাই শুনতে যাবো না।' তার স্বরে অপ্রয়োজনীয় তিক্ততা, ঈর্ষা ; তার নিজের গর্ববোধ ঈর্ষা নিয়ে এল তার মনে, আমি কেন কবি হলাম না। এই কবিগুলো প্রত্যেক সভায় মুগ্ধ করে দেয কিভাবে। আর কাহিনী শুরু হলেই লোকেবা হাই তুলবে। আমাব প্রত্যেকটা গল্প যদি ফিরাকের রুবাইযেব মত সুন্দব হত।

হাঁসেদের সঙ্গে এক সন্ধ্যা

গোধুলি প্রদোষেব মুখোমুখি দাঁড়িযে, আলো আঁধাবের বিষন্নতা, লেখকদের শুকনো ক্লান্ত মুখ, বৈচিত্র্যহীন সময়—মীর্জা ফাবাতুল্লাবেগের লম্বা চওড়া বারান্দার বাইরে হাঁসগুলো এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। উর্দু মজলিসে চা এবং মুশায়েরার ব্যবস্থা হয়েছে। কবিদের স্বর, চীনেমাটির কাপ, চামচের শব্দ, আর কাঠির পর্দার পেছন থেকে পর্দানসীন মহিলাদের ভাষণ, সমালোচনা ঃ 'হাঁই, এই কি কৃষণ চন্দর?'

'কে? সেই বেঁটে মত আবে ও কৃষণ চন্দব নয বোকাচন্দব মনে হচ্ছে।'

হাসির শব্দ। কৃষণ চন্দরের কাশি। সেই কাশি যেন বলছিল, দেখুন আমিও শুনছি। আদিল রসিদ এমনভাবে বসেছিল যেন সে সেই মুশায়েরার মীর* কুদ্দুস সাহ্‌বাই যেন এখন চতুর্থ দরবেশের* কাহিনী শুনিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আলোর উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও পরিবেশ থম মেরে আছে। বর্তমানের ওই উজ্জ্বলতায় মিশে যাচ্ছে অতীতের আলো আঁধার, সংকোচ, ভরন্ত প্রেমের মধ্যেও সংগুপ্ত হয়ে থাকছে একটি মানসিক টানাটানি, যেন শিরাগুলি ছিঁড়ে পড়বে, যেন দুটি যুগ, দুটি বংশ পরম্পবা আব দুটি চিন্তাধারা একে অপরেব কাছে আসার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যেন অন্ধকার উজ্জ্বলতায়, অতীত ভবিষ্যতে, মৃত্যু জীবনে তাঁর প্রতিফলন খুঁজছে। কৈফী তার কবিতা এমনভাবে শোনাল যেন কোন শোকগীত, নীরবতা—গভীর নীরবতা, একজন পীর ও মুর্শেদ নিজের দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল—আপনি কবি? আবার নীরবতা। লোকেরা এই ভারিক্কি বাক্যটি নিয়ে ভেবে যাচ্ছিল, সবাই আদবের সঙ্গে বসেছিল, যেন কোন অ্যাটম বোমের অপেক্ষা কবছে। আবাব কেউ বলল, 'মীর্জা সাহেব, আপনি কিছু শোনান'। মীর্জা সাহেব শোনাতে লাগলেন—'যমুনাকে কিনারা'। রেশমের পর্দার পেছন থেকে কেউ বলল—'কিনারা নহী কানারা কহিয়ে'। সভ্যতা সংস্কৃতি ধ্বংশ হতে পারে, কিন্তু ব্যাকরণ বদলানো চলবে না; জীবন বদলাতে পারে, কিন্তু ভাষার ফর্মে যেন রদবদল না হয়, সময় ও মহাকাশ পরিবর্তিত হতে পারে, দেশ-জাতি, ব্যক্তি—'চরিত্রে আকারে স্বভাবে ব্যবহারে সামাজিক, রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তায় জীবনে বিপ্লবে ঘটতে

মীর ঃ সর্বশ্রেষ্ঠ

চতুর্থ দরবেশ ঃ মীর আম্মান দহলবীর লেখা কাহিনীর একটি অংশ।

পারে, কিন্তু ভাষায় কোন পরিবর্তন নৈব নৈব চ, সেটি মৃতের মত এবং খোদার শেষ আদেশের মত অটল পরিকরবদ্ধ। হে ভাষা মার্জারের পূজারীর আজ্ঞাবাহী, মাথা নীচু করে ভদ্র হয়ে বসে থাক, ভাবনাতেও এনোনা কেন মাথার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, কাইজারের দামী ফুটন্ত চা কাপে ঢেলে দাও, উঠোনে ঘুরে বেড়ানো কুৎসিৎ এই হাঁসগুলোকে দেখ এবং শোন 'যমুনাকা কিনারা'—নেহি নেহি যমুনাকা কানারা, মাফ কিজীয়ে গা ..

কৃষণ চন্দর মাথা নীচু করে নজরের কানে কানে বলল, 'আত্মহত্যার জন্যে কোন্ জায়গাটা ভালো হবে?'

নজর অনেক চিন্তাভাবনার পর বলল, 'কাজীর হোটেল, ওখানেই আবার চলো।'

অবশেষে সম্মেলন শেষ হল। শিফতে সাংবাদিকতার শৈলী বিষয়ে লেখাটি পড়ল, কেউ কোন ভুল ধরল না, সর্দার ইকবালের গোঁড়া সমালোচকদের এক হাত নিলেন, কেউ তার পেটে ছোরা বসিয়ে দিল না, ড. তারাচাঁদ ধারাবাহিক দুহাজার বছরের পুরনো ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে উর্দুর সম্পর্ক দেখিয়ে দিলেন, হিন্দু মহাসভার কেউ কিছুই বলল না। কিন্তু সম্মেলন শেষ হবার পর মকদুম* আস্তে করে বলল, 'ভাই রেলওয়ের সেই মজুররা তোমাদের নিজেদের সভায় ডাকতে চাইছে। তবে অনেকে সর্দি, পেটের রোগ, জ্বরে অসুস্থ।

জিগর সাহেব তৎপরতার সঙ্গে বিছানা বাঁধতে শুরু করে দিলেন। কিছু লোক বাজারে কেনাকাটা করতে গেল, কিছু লোক পি.ই.এন কনফারেন্সে যাবার জন্যে স্টেশন থেকে জয়পুরের টিকিট কাটতে চলে গেল। কিছু লোক অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে রইল। মজদুরদের সভার জন্যে বেঁচে রইল কৈফী, সর্দার, শাহির*।

মকদুম আলাপ করিয়ে দিলেন। 'এ কৈফী হ্যায়, ইনক্লাব জিন্দাবাদ'; ইয়ে সর্দার হ্যায়, ইনক্লাব জিন্দাবাদ; ইয়ে শাহির লুধধ্যানউই হ্যায়, ইনক্লাব জিন্দাবাদ। সেখানে ছিল সব মেশিনে কাজ করার লোকেরা, শ্যামবর্ণ বা কালো রঙের লোকেরা, মোটা মোটা চোয়াল, অমসৃন হাত পা-ওলা লোকেরা, কুদর্শন লোকেরা, নোংরা জামা পরা লোকেরা, খারাপ খাবার খাওযা লোকেরা, এমন লোক যারা ভালোমন্দ বলতে পারে না, বলতে পারে না 'হ্যায়, কেয়া শের হুঁয়া হ্যায়'। এসব লোকের কায়দাকানুন ওদের জীবনের মতো রুগ্ন, তাদের পোষাকের মতই অসংস্কৃত। কিন্তু তারা তাদের বিশ্বাসের মতোই মজবুত।

আহা, আহা শব্দে কবিদের প্রশংসা না করে তারা চুপচাপ ছিল। আবার আর একবার, না বললেও তাদের চোখের উজ্জ্বলতা এবং স্মিত হাসি যেন বলছিল, আমরা খুশী, কেননা তোমরা আমাদের আপনজন, তোমরা আমাদেরই একজন, আমাদের দুঃখ এবং আনন্দের গান গাও। সুন্দর সুন্দর শব্দে আমাদের দুঃখের নিদান দাও। তোমরা মানুষের সেই ভ্রাতৃত্বের কথা বলো যেখানে একজন মানুষের অধিকার অন্যের উপর চেপে বসে না। এসো, এসো আমরা তোমাদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছি। উজ্জ্বল চোখে,

কেঁপে যাওয়া ঠোঁটে, মজবুত বদ্ধ মুঠিতে স্বাগত জানিয়ে যেন বলছে, 'বন্ধুগণ, তোমরা মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে। আজ তোমরা ঘরে ফিরলে। আমাদের কাছে রেশমী পর্দা নেই, সোনার খাট নেই, আছে পাথরের মেঝে, আমাদের পকেট খালি। কিন্তু দেখ আমাদের চোখে ভালবাসার অশ্রু, বড়োদের প্রতি ছোটদের ভালবাসার অশ্রু, বন্ধুত্বের অশ্রু ...... আও ...... আও...... সাথী।'

শাহিরের চোখে জল এল। সে কবিতা পড়তে পড়তে থেমে গেল, যেন তার জলভরা চোখে সব ভিড় ঘন হয়ে আসছে, মনে হল যেন সে নিজের ঘরে বসে নিজের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে গলাগলি করছে। এই তার মা, এ ভাই, এই বোন, এই ছোটবেলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আও... আও.... সাথিয়োঁ।

প্রত্যাবর্তন

এবার তারা সব মিটিয়ে হায়দ্রাবাদ স্টেশনে পৌঁছে গেল। রেলওয়ে মজুররা থার্ড ক্লাশের একটি ছোট কামরায় ওদের ব্যবস্থা করে রেখেছিল, যাতে কষ্ট না হয়। এখন ওই কামরায় ওদের মালপত্র রাখা ছিল। স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থার্ড ক্লাসের যাত্রীতে ভর্তি। তাদের নোংরা বিছানা, জংধরা কালো বাক্স, ছোট বড়ো টুকরিতে প্ল্যাটফর্ম মাল গুদামের আকার নিয়েছিল। জালঘেরা টুকরিতে মুরগী ডাকছিল। কালো রঙের পাহাড়ী মেয়েরা নিজেদেব শাড়ীর আঁচল খুলে উকুন বাছতে ব্যস্ত। তৎক্ষণাৎ জোরালো এক হর্ণের আওয়াজ কানে এলো আর কালো রঙের শেডান, স্টেশনের প্লাটফর্মে যেখানে মোটরগাড়ি আসা নিষেধ, সেখানেই চলছে দেখা গেল—পোঁ পোঁ, আগেসে হঠ যাও, পোঁ পোঁ.... পুলিশের লোকে হান্টার দিয়ে লোকেদের সরিয়ে দিতে লাগল। কুলিরা রাস্তা থেকে আসবাব তুলতে লাগল। রাস্তা পরিস্কার হতে লাগল। ... পোঁ পোঁ .... মোটর প্ল্যাটফর্মের উপর চলতে লাগল। অবশেষে এমন একটা কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়াল যে মনে হচ্ছিল কোন বড়ো লোকের স্পেশ্যাল সেলুন, গাড়ি থেকে প্রথমে সোনালী উর্দি পরা এক আর্দালী নামল। সে গাড়ির আর একটি দরজা খুলল এবং —

পুলিশের লোকেরা চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। কেউ কিছু দেখতে পেল না কি হচ্ছে না হচ্ছে।

'কেয়া হ্যায়', একজন জিজ্ঞেস করল।

'স্যার সুলতান বিল কাবা কা স্পেশ্যাল সেলুন'।

'স্যার সুলতান আহমদ? ভাইসরয়ের কাউন্সিলের সদস্য?'

'জী হ্যা, ওহি।'

'এখানে হায়দ্রাবাদে কি করতে এসেছিলেন?'

'এখানে কোন আত্মীয়ের বিয়ে করাতে এসেছিলেন। এই কম্পার্টম্যান্ট কনের জন্যে। বাইরের জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছ না? দুর্গন্ধভরা মুর্গীদের টুকরি, নোংরা জামে ভরা ছোট টুকরি, জংধরা ট্রাঙ্ক থেকে চোখ সরিয়ে নজর পড়ল অন্যদিকে। সেখানে রূপোর-বাসন, আখরোট কাঠের জিনিসপত্র, রূপোর পায়ার খাট, সোনালী রঙের ঝলমলে কলসী, আবার দৃষ্টি সরে গিয়ে মাটির মতো কালো সুন্দর নোংরা উকুন বাছা পাহাড়ী মেয়ের গা ঘৃণার সঙ্গে দেখে জানালার বাইরে গিয়ে থেমে গেল, সেখানে

রেশমী পর্দা নড়ছে। 'সামনে যেও না', রেশমী পর্দা বলছে, 'আগে মৎ যাও, এটা রেশমের দেওয়াল। এই পর্দার এদিকে তোমার দুনিয়া। একদিকে দারিদ্র্যে, দুর্গন্ধ কাদায় কিলবিল করছে প্রাণীর দল, অন্যদিকে রেশমের দেওয়ালের অন্য দুনিয়ার নিশ্বাসে ভোগের, আভিজাত্যের সুগন্ধ, মৃদু হাসিতে সফল আকাঙ্খার মাদকতা, প্রতিটি সুরে লয়ে জয়যাত্রার গান। এই দুই দুনিয়ার মাঝে একটা পাতলা রেশমের স্বচ্ছ দেওয়াল। এতই পাতলা ও স্বচ্ছ যে লোকে এদিক ওদিক দেখতে পারে। এই দুনিয়ার লোক ঐ দুনিয়ার লোককে, ঐ দুনিয়ার লোক এই দুনিয়াব লোককে অজানা দৃষ্টিতে, শত্রুতার দৃষ্টিতে, ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখছে, তাকিয়ে থাকছে, ভয় পাচ্ছে, কিন্তু কেউ এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক আসছে না। কেউ এই পাতলা স্বচ্ছ পর্দাকে, হাতের এক ঝটকায় সরিয়ে দেওয়ার সাহস করছে না।

আও আও সাথিয়ো, দেখো ইয়ে স্যর সুলতান আহমেদের স্পেশ্যাল সেলুন। তুমহারা থার্ড ক্লাসকা ডাব্বা হ্যায়। এই ওর সবুজ উর্দি পরা বেয়ারা। ওই ছেঁড়া কলারের আলি সর্দার জাফরি, এই আখরোটের টেবিল—কাশ্মীরের কারিগররা চিত্রিত করেছে। ওটা রফদ সরোসের বাদামী বিছানা—কয়েক ডজন তালি দেওয়া আছে, এটি সোনার কলসী, ওটা তামার লোটা, ওই কিংখাবের লেপ, ওটি খদ্দরের ওড়না, এই মৃত্যু, ওই জীবন। এটা অতীত, সেটা ভবিষ্যৎ।

এই অন্ধকার, ওই উজ্জ্বলতা, দেখো দেখো দেওয়াল ভেঙে গেল ·· মৃত্যু জীবন, অতীত-ভবিষ্যৎ, রাত্রি-সকাল গলাগলি করছে। কিন্তু আছে—দেওয়াল ভাঙল কোথায়? এ তো গাড়ি চলছে। লোকেরা বিদায় জানাচ্ছে। মুসলিম জিয়াইয়ের চোখে জল, ইব্রাহিম জলিসের গালের ছোট ছোট দাগ গভীর হয়ে যাচ্ছে, নজবের চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, বসির হাতমির লাজুক দৃষ্টি বলছে, লজ্জিত, অত্যন্ত লজ্জিত, জানি না কেন। গাড়ি চলছে।

জিগর সাহেব জলিসকে বলছেন, 'আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। চিন্তা কোরো না, ভাল আছে সে। মেহমানদের সঙ্গে যাচ্ছি। কিছুদূর একসঙ্গে যাবো.... আমার মনে হয়, এখন সে ভালো হয়ে গেছে, ছোট বোন .. গাড়ি চলছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

সূর্য ডুবে গেল।

হায়দ্রাবাদ উধাও হয়ে গেল।

গাড়ি অত্যন্ত আস্তে আস্তে চলছিল, ভিখিরিদের ভেংচি কাটতে কাটতে। তারা প্ল্যাটফর্ম ধরে, রেল লাইন ধরে গাড়িব সঙ্গে ছুটছিল। সিগন্যালম্যানদের কেবিন। গাড়ি এগোচ্ছে। কিন্তু ইঞ্জিনের গতি -- বাড়েনি, কেননা সে এইমাত্র গুদাম থেকে কয়লা, পাইপ থেকে জল নিয়ে বেরিয়েছে। তার তাজা দম হুঁকোর মত গুড়গুড় করছিল। ভিখিরিরা চেঁচাচ্ছিল, 'বাবু সাহেব পয়সা, বাবুসাহেব পয়সা'। গাড়ি শহরের বাইরে ময়দানে চলে এল। স্টেশনের বাড়িঘর অনেক পেছনে থেকে গিয়েছিল। এখানে মাটি থেকে কিছুটা উঁচুতে সুরকি মাটির তৈরী ঝুপড়ি দেখা যাচ্ছিল। তার উপর খাপরেলের ছাদ। রিকেট আক্রান্ত মহিষগুলি ময়দানে দাঁড়িয়ে জাবর কাটছিল। শূকর শূকরী আশেপাশে চরে বেড়াচ্ছিল। দূর থেকে তাদের মনে হচ্ছিল মোষের বাচ্চা। গর্তগুলিতে

বর্ষার জমা জল দুর্গন্ধে ভরা, ঘন সবুজ হয়ে গিয়েছিল। কোথাও কোথাও নীচু জায়গায় লোকেরা গাড়ির দিকে পিঠ ফিরিয়ে পায়খানা করছিল। ভিখিরিদের কলরোল বার বার কানে আসছিল—'বাবুসাহেব, পয়সা।' বুদ্ধের সময় এই ভারতই ছিল, এই নোংরা বর্ষার জলে ভরা গর্ত ছিল, এই সুরকি মাটির ঝুপড়ি, এই ভিক্ষুকেরা, অশোকের আমলেও এই ভারত ছিল, আকবরের সময়েও এই।

আর আজ দুশো বছর ইংরেজ শাসনের পরেও লোকে একই রকম গাড়ির দিকে পিঠ করে বসে আছে। আসুক আসুক কোথাও থেকে আসুক সেই জীবনের জেগে থাকা দিকচক্রবাল, এই অবিচল নিশ্চল অনুভূতিহীন দুনিয়ায়, এই গভীর অনন্ত অন্ধকারে আসুক, কোথাও থেকে আসুক সেই আলোর রশ্মি, সেই সকালের লালাভ আলো, প্রেমের পায়েলের চলন্ত শব্দ, আসুক কোথাও থেকে আসুক। তারা দিয়ে ভরা সিঁথির মতো ভারতবর্ষের মাথায় ঝলমল করে উঠুক।

গাড়ি জোরে চলতে লাগল। অন্ধকার বাড়তে লাগল। কুয়াশার জামা পরা অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে গেল। মন ভরে গেল কোন অজানা ভয় ও বিষন্নতায়। সবাই চুপ করে ছিল। জিগর শুধু মৃদু হাসি নিয়ে লেখকদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আমার গ্রামে যাচ্ছি'। সবাই স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। 'আমার বোনের অসুখ'। কেউ কিছু বলল না। 'আমি আমার বোনকে খুব ভালবাসি। আমার একটাই বোন। অনেক দিন ধরে সে অসুস্থ, কিন্তু নানান কারণে তাকে এখনও হায়দ্রাবাদ আনতে পারলাম না।' সবাই চুপ .... গাড়ি চলতে থাকল। 'আমি তাকে হায়দ্রাবাদ নিয়ে আসব। ডাক্তার আজনকিয়াকে দেখাব। ডাক্তার নাইডুকেও দেখাব। আমি চিকিৎসার জন্যে দুশো টাকা বাঁচিয়ে রেখেছি। আমরা কামড়াকামড়ি করে পেয়ারা খেতাম। আমি তার জন্যে লক্ষণের ঘর থেকে তেঁতুল চুরি করে নিয়ে আসতাম। সে মিষ্টি বয়ের কুল খুব পছন্দ করে.... সে তার স্মৃতিতে হারিয়ে গেল। সবাই চুপ করে থাকল।

কৈফী আস্তে আস্তে গুনগুন গুনগুন করে গান গাইতে লাগল, নিজের দুঃখের ভালবাসার গান, সেই গান যাতে সে নিজের শ্লেষ্মাভরা বুকের আকাঙ্খাগুলি, তার চলে যাওয়া চোখের আলো, তার হলুদ চেহারার আবেগ পুরোপুরি ভরে দিয়েছিল ; সে আস্তে আস্তে গান করছিল, যেন তার কল্পনার সন্তানকে ঘুম পাড়াচ্ছিল ; সে নিজের জন্যে গান করছিল, শুধু নিজের জন্যে। কিন্তু ঐ কামরায় এমন কেউ ছিল না যে ঐ গানকে নিজের মতো করে ভেবে নেয়নি, যাতে তার প্রত্যেক শেরের প্রত্যেক পংক্তি প্রত্যেক শব্দ নিজের ভালবাসার ঝলক, নিজের অসফলতার ছবি, নিজের প্রেমিকার আলো হয়ে দেখা দিল না, যেন কল্পনায় কেউ মৃদু হেসে উঠল, কেউ আড়মোড়া ভাঙল, কোথাও পায়েল বেজে উঠল, আর গানটি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। একটা ভারি বিষন্নতা, ভারি বাতাস নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেবার উপক্রম করল। শাহির তার বসন্তের দাগের উপর আস্তে আস্তে হাতে বুলোতে বুলোতে নিজের জায়গায় ঝুঁকে বসল। সে নিজের সেই গানের কথা বলতে লাগল যা সে তার প্রেমিকার জন্যে লিখেছে, সেই গান যার বিস্তার ওর জীবনের বসন্ত ঋতুর স্রোতে, যেখানে জাফরানী রঙের ক্ষেতে আনন্দিত আকাঙ্খার সুগন্ধি। আস্তে আস্তে লজ্জিতভাবে সে এমন একটা গান করছিল যেন সে একজন অপরাধী। গাড়ির গতি যত দ্রুত ছিল, গান ছিল তত

ধীর লয়ের, এত আস্তে পাছে কেউ শুনতে পায়, তার ভালবাসার গান, তার ভালবাসার পরাজয়ের গান, তার জীবনের, মৃত্যুর—কিন্তু কে সে সময় শাহির ছিল না? এই গানগুলি সবারই ভাবনায় ছিল। কে কৈফীর মত নিজের বুকে দুঃখের ভারি পাথর না বেঁধেছিল, যার ভারে বুক চুরচুর হয়ে যায়। প্রেমিকার দুঃখের মঞ্জিল কার জীবনে দুনিয়ার দুঃখ বয়ে আনেনি? এমন কে আছে যে জখম হয়নি? দুঃখ নেই কার? প্রেমে পরাজিত হয়নি এমন কে আছে?

হঠাৎ সিফতে আস্তে করে বলল, আস্তে করে যেন নিজের শব্দকে চুম্বন করছিল—'ও প্রতিদিন স্টেশনে দেখা করতে আসত।' ....চুপ করে গেল। সবাই স্মৃতিতে হারিয়ে গেল। কেউ কিছু বলল না। বোধ হচ্ছিল শত শত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ স্তব্ধতার যাদুতে মন্ত্রমুগ্ধ—তাদের মনে নিজের দুঃখের গান, নিজের অসফলতার ভাবনা, নিজের আকাঙ্খা, খুশী—যা ছিল, যা হতে চাইছিল, সেই স্বপ্ন—যা অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল, সৌন্দর্য—যাকে ঠোঁট চুম্বন করতে পারল না, কোন হারানো অতীতের অসফলতা, কোন অজানা ভবিষ্যতের ইচ্ছা এবং আবার জীবনের টানাটানির আগুন, যা বেড়ে ওঠে, যা একদা ছিল, আজ আর নেই। কব হোগা, জরুর হবে..... জরুর ....। সবাই স্মৃতিতে হারিয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে স্বপ্ন দেখতে লাগল।

মঞ্জিল

হঠাৎ কৃষণ চন্দর চোখ খুলল। গাড়ি একটি স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। জিগর সাহেব বিছানা গোছাচ্ছিল, বিছানা বেঁধে লেখকদের দিকে তাকাল। হঠাৎ কৃষণ চন্দরের দিকে তাঁর নজর গেল। জিগর তার মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিল। কৃষণ চন্দর জিগর কাঁদছে।

'জিগর'।

জিগর মুখ ঘুরিয়ে বলল, ছোট বোন মারা গেল। কেউ কৃষণ চন্দরের হৃদয় পাথর করে দিল, সে কিছু বলতে পারল না।

'মেরী ছোটা বহিন মর গয়ী হ্যায়। আমি তাকে গ্রাম থেকে আনতে যাচ্ছিলাম। আমি ওর চিকিৎসার জন্যে দুশো টাকা বাঁচিয়েছি'। জিগরের গলা বুজে এল, তার বলার ধরনে আধপাগলা মানুষের আদল। ও চুপচাপ স্টেশনে নেমে গেল। প্ল্যাটফর্মে ওর আত্মীয়রা দাঁড়িয়ে ছিল। একটি সোনালী উর্দিপরা আর্দালি যাচ্ছিল। তার হাতে দুধের গ্লাস। সে স্যর সুলতান আহমেদের স্পেশ্যাল সেলুনের দিকে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়িতে জিগবের সঙ্গে ওর ধাক্কা লাগল, কিছুটা দুধ ছলকে পড়ল।

'দেখে চলতে পারেন না আপনি?' আর্দালি গর্জে উঠল।

গার্ড বাঁশী বাজাল। জিগর চোখের জল মুছে বলল, 'খোদা হাফিজ'।

কৃষণ চন্দর ওকে 'খোদা হাফিজ' বলতে পারল না। গাড়ি চলতে লাগল। শাহির লুধধ্যানউই কৃষণ চন্দরের কাছের সিটে শুয়েছিল। কৃষন চন্দর আস্তে করে বলল, শাহির... শাহির ....। শাহির সেইভাবে শুয়েই বলল, 'আমি খুব জানি ওই লোকটিকে। ও ইব্রাহিম জলিসের ভাই। কৃষণ চন্দর ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি জানো ওর ছোট বোন মারা গেছে?'

--- 'হ্যা আমি শুনছিলাম', শাহির নিস্পৃহতার ভঙ্গিতে বলল, 'আমি জানি ওর বোন মারা গেছে। ওর একটিই বোন ছিল। বাড়ির মধ্যে ওকেই ও সবচেয়ে ভালবাসত। কিন্তু তবু তার চিকিৎসা হায়দ্রাবাদে করাতে পারল না। সে দুশো টাকা সংগ্রহ করতে পারছিল না।'

'কিন্তু', কৃষন চন্দর বলতে চাইল। শাহির তাকে বলতে দিল না। 'যখন সে দুশো টাকা জমাতে পারল, এই সম্মেলন এসে গেল। এই টাকা সে কনফারেন্সের জন্যে দিয়ে দিল। সে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে মকদুমের সঙ্গে সব জায়গায় চাঁদা তুলল—চাষীদের কাছ থেকে, মজদুরদের কাছ থেকে, বিদ্যার্থীদের কাছ থেকে, গরীব লোকেদের কাছ থেকে। তার বোন মরে যাক, লেকিন তহজিব জিন্দা রহে, সংস্কৃতি বেঁচে যাক, সভ্যতা বেঁচে থাক, শিল্পীদের কল্পনা বেঁচে থাক, বোন খাওয়ার না পেয়ে, ওষুধ না পেয়ে মরে যায় যাক। লেকিন কিতাব জিন্দা রহে, ভাষা বেঁচে যাক, জাতির আত্মা বেঁচে থাক, ওঁর খুব কাছের বোন, তেঁতুল খাবার সাথী, চুরি করে পেয়ারা খাবার সাথী, ওর ছোটবেলার সঙ্গী বোন মারা যাক —কিন্তু কালিদাস বেঁচে থাক, গালিব বেঁচে থাক, ইকবাল বেঁচে থাক, প্রেমচন্দ বেঁচে থাক। মৃত্যু তার বোনের ঠোটকে বরফের মতো শীতল করে দিক, তার চোখকে আরো হিম করে দিক, সাহিত্য তার নিজের আলো, নিজের উত্তাপ নিজের বিশ্বাসে লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে আলো জ্বেলে দেবে'।

---কিন্তু ...., কৃষণ চন্দর কিছু বলতে চাইল। শাহির তখনও জোর গলায় বলে চলেছে, অনেক লেখক জেগে উঠেছে। 'সম্মেলন সফল হল, কিন্তু তার বোন মারা গেল। সম্মেলনের সময় জিগরের কাছে তার বোনের খারাপ অবস্থা জানিয়ে তিনটি টেলিগ্রাম এসেছিল। প্রথম টেলিগ্রাম এল, তখন তুমি প্রবন্ধ পড়ছ, দ্বিতীয় টেলিগ্রাম এল—তুমি প্রেমচন্দ সোসাইটির ডিনার খাচ্ছ, তৃতীয় টেলিগ্রামের সময় তোমরা রাজাসাহেবের নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিলে।'

'শাহির', কৃষণ চন্দব চেঁচিয়ে উঠল, যেন কেউ ওর হৃদয়ে লোহার পেরেক বিঁধে দিয়েছে, আর যেন সেই পেরেক থেকে রক্তের লাল স্রোত বয়ে যাচ্ছে। কেউ তার জীবনের চেয়ে প্রিয় বোনের রক্ত দিয়ে সাহিত্যকে জীবিত করে তুলেছে। চারিদিকে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, আর তাতে সোনালী সুরাই, আখরোট কাঠের ডেস্ক, রুপোর খাট ভাসছে ; রেশমী পর্দা সরে গেছে, দেওয়াল ভেঙে গেছে। পর্দাটিই মানুষের মধ্যে তফাৎ তৈরী করে দিয়েছিল। মাথা নীচু হয়ে গেল। দ্রুত ছুটে যাওয়া সেডান কালো পাহাড়ী মেয়েদের কাছে মাথা নীচু করল। হীনমন্যতা, স্বার্থ সবাইকে ক্লান্ত করে দিয়েছিল। তবু সব মিলিয়ে তারা যেন অন্য কিছু হয়ে গেল—কোন নতুন সাহস,কোন নতুন শক্তি, কোন নতুন মহত্ত্বে ত্রুটিগুলি চাপা পড়ে গেল। শাহির চুপ করে গিয়েছিল। তবু এক অজানা তুফানে তাব বুক কেঁপে উঠল। সে উঁকি দিয়ে দিয়ে সহযাত্রীদের দেখছিল। এমন কেউ ছিল না, যার চোখে জল নেই। দূরে অনেক দূরে, যেন সে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ থেকে দূরে গিয়েও কিছু খুঁজছিল, কিছু পাচ্ছিল ..... ওয়ামিক* আস্তে আস্তে গাইতে লাগল ঃ

পূরব দেশমে ডিগি বাজে ভুখা হ্যায় বঙ্গাল রে সাথী
ভুখা হ্যায় বঙ্গাল রে সাথী

ওয়ামিক জৌনপুরী ঃ প্রগতিশীল কবি।

ভুখা হ্যায় বঙ্গাল

রে সাথী

ভুখা বাংলার গান, বিষন্ন মনের গান, মুমূর্ষু আত্মার গান, তবু তা এক ধরনের মানসিক শক্তি সঞ্চারিত করে দিচ্ছিল. যেন এই গান মৃত্যুর গান নয়, জীবনের উচ্চতর সংগীত। তার সুরের মধ্যে মৃদু হাসির ঝলক, সাফল্যের ভাব দেখা যাচ্ছিল। আশার উঁচু তারে বাঁধা প্রতিধ্বনি যেন বলছিল এই গানের মৃত্যু জীবনের জন্যে। তাই এক নির্ভয় বিদ্রোহ ঝড়ের মতো উলোট পালোট করে গেয়ে চলেছে।

পূরব দেশমে ডিগি বাজে ....

ডিগ ... ডিগ .... ডিগ ডিগী বাজরহী থী

পূরব দেশই নয়। পূর্ব উত্তর দক্ষিণ আর পশ্চিম ভারতে এই ডিগি বাজছিল। ভারতের এমন কোন কোণা নেই যা বাংলা হয়ে ওঠেনি। ওয়ামিকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হঠাৎ সবাই মিলে গলার জোরে গাইতে লাগল।

পূরব দেশমে ডিগি বাজে ভুখা হ্যায় বঙ্গাল রে সাথী

ভুখা হ্যায় বঙ্গাল।

রে সাথী--

এ ডিগি বিপদের গন্ধ বয়ে আনে, বিপদের বিরুদ্ধেই অনিঃশেষ যুদ্ধ, এ যুদ্ধ চলতেই থাকবে, আও আও রে সাথী।

সাথী, যারা ক্ষুধার্ত, সাথী, যারা ক্ষয় রোগে আক্রান্ত, সাথী, যাদের শরীরে জেলের অত্যাচারের চিহ্ন, সাথী, যারা পীড়িত, সাথী, যাদের জীবন ব্যর্থতায় ভরা, তারাই হঠাৎ নিজের জায়গায় উঠে বসল, আর হৃদয়ের পুরো শক্তি দিয়ে গান গাইতে লাগল; নিজেরাই গাইছিল, নিজেরাই শুনছিল এক নতুন গীত, এক নতুন ভাবনা, এক নতুন আওয়াজ, এক নবতর মৃদু হাসি যেন আধফোটা ফুল কি ভেবে হেসে ফেলেছে। বাইরে গাড়ির শব্দ ছিল জোরদার, কিন্তু ভিতরে স্তব্ধতা ছিল, বাইরে চারদিকে অন্ধকার, কিন্তু কামরার ভিতরে আলো, বাইরে অন্ধকার দুর্গম পথ, ভিতরে কিন্তু গন্তব্যস্থল ছিল নিশ্চিতভাবে জানা।

উর্দু থেকে অনুবাদ ঃ কমলেশ সেন

কৃষণ চন্দর

ব্রহ্মপুত্র

তোমার জ্বলে বাতি তোমার ঘরে সাথি।
তোমার তরে রাতি আমার তরে তারা॥
তোমার আছে ডাঙ্গা আমার আছে জল।
তোমার বসে থাকা আমার চলাচল।
(রবীন্দ্র-সঙ্গীত)

খোঁপায় সাদা গোলাপ লাগিয়ে এক গাঢ় বাসন্তী রঙের লাল আঁচলের শাড়ি পরে লতিকা সেন খোকনের দিকে হেসে এগিয়ে আসছিল। খোকন কাঠের ঘোড়ার ওপর বসেছিল, আর ঘোড়াকে চাবুক কশাতে কশাতে মনে মনে জোর ছুটে চলেছিল। মাকে যখন তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল তখন কাঠের ঘোড়ার লাগাম সে খুব জোরে টানল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া উল্টে গেল। খোকন নীচে আর ঘোড়া তার ওপরে গিয়ে পড়ল।

খোকন কাঁদতে লাগল। লতিকা হাসতে হাসতে খোকনকে কোলে তুলে নিল।

খোকন কাঁদতে কাঁদতে বলল, ঘোড়াটা ভীষণ পাজি। আমাকে নীচে ফেলে দিয়েছে।

লতিকা বলল, তুমি এতো জোরে বেচারীর লাগাম ধরে টেনেছ কেন?

খোকন বলল, আমি যে মাকে দেখছিলাম।

লতিকা ওকে চুমু খেয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল, আচ্ছা, দেখ আমি বাজারে যাচ্ছি, সোনামণির জন্যে কি নিয়ে আসব?

খোকন বলল, আমি বাঁশী নেব। ঘোড়ায় চড়ে বাঁশী বাজাব আর আমার ফৌজের আগে আগে যাব।

বলতে বলতে খোকনের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। ওর মাথায় চুল এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। ও কাঁদতে ভুলে গেল। চোখের জল এখনও ওর গালের ওপর ঝিকমিক করছিল। লতিকা রুমাল দিয়ে ওর চোখের জল মুছে দিল। দিয়ে ওর চুলের গুচ্ছে আঙুল চালিয়ে পেছনের দিকে ঠেলে দিল।

লতিকা তুই কোথায় যাচ্ছিস?

কাকিমা লতিকাকে জিজ্ঞেস করলেন। হাত মুছতে মুছতে কাকিমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কাকিমার অনেক বয়স হয়েছে। মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। মুখে ভাঁজ পড়েছে। দেখতে শুকনো শুকনো এবং রোগা। তার চেহারা যেন অনেক দুঃখের কথা জানান দিচ্ছিল। কিন্তু এ বয়সেও কাকিমার চেহারায় এক অদ্ভুত ধরনের সরলতা ছিল। অথচ যে বৃদ্ধ বয়সে মানুষ সব কিছু হারিয়ে বসে থাকে সেই বয়সেও তা কাকিমার মধ্যে অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল। আজকালকার ছেলেমেয়েদের চেহারায় এই সারল্য দেখা যায় না। কাকিমা কিভাবে এবং কি যত্নে এই সারল্যকে রক্ষা করেছেন সেই গোপনীয়তা ফাঁস করেন না। কাকিমার বয়স হয়েছে আটষট্টি। এই

বয়সে কাকিমা ব্রহ্মপুত্রের ধারে তাঁর যে গ্রাম, সেই গ্রামকে দু'দুবার ভেসে যেতে দেখেছেন। আবার দু'দুবার বসতি গড়ে উঠতে দেখেছেন। সাত সাতবার ছোটখাট আকাল আর তিনবার বড় আকাল দেখেছেন। আর শেষবারে আকালে কাকিমার গোটা পরিবারটাই উজাড় হয়ে গিয়েছিল। ফলে কাকিমাকে নিজের গ্রাম ছেড়ে লতিকাদের এখানে— এই কলকাতায় চলে আসতে হয়। রায়বাহাদুর মজুমদার লেনে লতিকাদের বাড়ি। কাকিমা প্রথম যেবার কলকাতায় আসেন সেবার অনেক কষ্টে তাঁকে এ বাড়ি খুঁজে বের করতে হয়। বাড়ি খুঁজে যখন তিনি ভেতরে ঢুকছিলেন তখন বাড়ির সামনের মন্দিরে আরতি হচ্ছিল। কিন্তু লতিকার ঘরে সেই আরতির সময়েও অন্ধকার ছিল আর লতিকার স্বামী নড়বড়ে সিঁড়িতে নিঃশব্দে পা ফেলে বাইরে বের হচ্ছিল। কাকিমাকে দেখে এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'কাকিমা আমি আবার আসব। এখন দেরি করতে পারছি না। একটা জরুরী কাজ আছে। লতিকা তোমার দেখাশোনা করবে।' বলে সে দ্রুত চলে গেল। আর কাকিমা দেখলেন, লতিকার স্বামী ক্ষণিকের জন্যে লতিকার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আবার ছেড়ে দিল এবং অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে পেছনের দরজার কাছে যে গলি আছে সেই গলি ধরে চলে গেল। কাকিমা দেখলেন, লতিকা খুব সাবধানে দরজা খুলল। আলোর একটা রেখা কাঁপতে কাঁপতে ভেতরে এসে পড়ল এবং আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আর সেই সময় কাকিমা লতিকাকে এক লহমা দেখলেন— লম্বা, শ্যামবর্ণা, আকর্ষণীয় এক মেয়ে। পরনে ছিল সাদা শাড়ি আর ওর চোখের কোণে জল ঝলমল করছিল। চোখের ঐ জল দেখে কাকিমা ক্ষণিকের জন্যে কেঁপে উঠেছিলেন। মানুষ ধান এবং গম বোনে, আর কাকিমা নিজের জীবনে শুধু অশ্রুই বুনেছেন। উনি ভাবলেন, এ যখন কলকাতা তখন নিশ্চয়ই এ অশ্রু নয়। অশ্রু তো শুধু ব্রহ্মপুত্রের কিনারেই থাকে। যেখানে কৃষকরা মুক্তোর মতো ধান বোনে আর অশ্রু কাটে। এই সংসারই কি এমনি দুঃখ ভরা? যে সুখ-শান্তির জন্যে কাকিমা এই কলকাতায় এসেছিলেন তা তিনি মুহূর্তের জন্যে ভুলে গেলেন। উনি আলতো ভাবে লতিকার হাত ধরে খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন 'কি ব্যাপার বৌমা!' লতিকা হেসে নিজের অশ্রু পান করে নিল। কাকিমার হাতে জোরে চাপ দিয়ে সে মৃদু কণ্ঠে বলল, কিচ্ছু না কাকিমা, ওপরে চলুন।'

লতিকা কাকিমার বোঁচকা তুলে তাঁকে ওপরে নিয়ে গিয়েছিল।

সেদিনের পর, আজ পর্যন্ত আর কোন দিন তিনি লতিকার স্বামীকে দেখেননি। এখানে কোন ব্রহ্মপুত্র নেই বলে কাকিমা নিজের গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এসেছিলেন। কিন্তু তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন ব্রহ্মপুত্র এখানেও আছে। আর লতিকার স্বামী এই নদী পার না হয়ে কোন দিন ঘরে ফিরতে পারবে না। তিনি প্রায়ই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ভেজা কাপড় মেলতে মেলতে ভাবেন আর তাঁর চোখের কাঁপা-কাঁপা মণি বিস্ময়ে নীচের গলিতে ছুটন্ত মানুষদের দেখে ব্যথিত হয়ে ওঠে। কোন্ ঝঞ্ঝার ভয়ে ওরা পালাচ্ছে? জল কতদূর বেড়েছে? কোথায় আগুন লেগেছে?

কিন্তু কাকিমা এ সব প্রশ্নের উত্তর ঠিক মতো জানেন না। তাঁর কাঁপা-কাঁপা চোখের মণি নীচের গলিতে ছুটন্ত মানুষদের বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছিল।

তিনি যখন এগিয়ে এসে লতিকাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কোথায় যাচ্ছিস লতিকা', তখন তাঁর চোখে সেই একই অদ্ভুত ধরনের ভয়-ভয় ভাব ছিল।

লতিকাকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনি আবার কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, মিটিং এ যাচ্ছিস?' লতিকার হাসি খুব সুন্দর ছিল। কাকিমার হাসিও ছিল খুব সুন্দর। কিন্তু কাকিমার হাসি ছিল এমন এক হাসি, যেন মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করতে চাইছে এবং হৃদয়ঙ্গম করে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসতে চাইছে। কাকিমার হাসিতে ছিল সেই অন্তরীক্ষের আকর্ষণ আর লতিকার হাসিতে ছিল ভোরের সেই ঔজ্জ্বল্য-- যে ঔজ্জ্বল্য বহু বহু দূর থেকে বা খুব, খুব কাছ থেকে এসেছিল, যেন সেই হাসি ঝলমল নক্ষত্রের মত ধীরে ধীরে অন্ধকারের পর্দা ধরে টানছিল আর সেই অসাধারণ মিষ্টি হাসি এক টুকরো হাসি যেন রেশমের ওপরে রেশম রেখে দিল। এই হাসি নিয়ে এসেছিল যেমন এক অদ্ভুত ঘনিষ্ঠতা তেমনি নিয়ে এসেছিল এক দৃঢ়তার অনুভব। এই হাসিতে ব্রহ্মপুত্রও ছিল, তুফানও ছিল-- আর ছিল এক নৌকো, যে নৌকো ওপারে নিয়ে যেতে পারে।

কাকিমার ঠোঁট কাঁপছিল। একগুচ্ছ সাদা চুল হাওয়ায় উড়ে তাঁর গালের ওপর এসে পড়েছিল। তিনি এক অদ্ভুত বিনয়ের সঙ্গে লতিকাকে বললেন, তুমি মিটিংএ কি যাবেই যাবে?

লতিকা হাসল। হেসে সেই সাদা চুলের গুচ্ছটা খুব স্নেহের সঙ্গে তুলে কাকিমার কানের পেছনে দিয়ে দিল। তারপর আবদারের সঙ্গে বলল, কাকিমা, আটটার আগেই আমি ফিরে আসব। এলেই কিন্তু খাবার চাই। তখন কিন্তু সত্যিই খুব খিদে লাগবে।

কাকিমাকে এটুকু বলে লতিকা অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে খুব তাড়াতাড়ি নিচে নামতে লাগল। কাকিমা খোকনের হাত ধরে অনেকক্ষণ সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে রইলেন। লতিকা দরজা খুলল, আলোর একটা ক্ষীণ রেখা এসে পড়ল। তারপর আবার অন্ধকারে ভরে গেল। খোকন বলল, কাকি চলো। আমাকে বিশ্বকবির ছোট্ট, চাঁদের গান শোনাও।

খোকনের কথায় কাকিমা সব কিছু ভুলে গেলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট চাঁদের গান তিনি নিজেও খুব ভালোবাসেন। খোকনকে আজ তিনি সেই গান শোনালেন। যে গানের কলিতে আছে, খোকা হারিয়ে গিয়েছে আর তার মা খোকনের নাম ধরে ডেকে ডেকে যখন খুঁজছে তখন খোকা জুঁই ফুল হয়ে মায়ের কোলে এসে লুকোচ্ছে।

গান গাইতে গাইতে কাকিমার মনে পড়ে যায় সুন্দর জুঁই ফুলের কথা। এক এক করে সমস্ত জুঁই ফুল ব্রহ্মপুত্রের উত্তাল তরঙ্গে হারিয়ে গিয়েছে-- আর অবশেষে কাকিমার কোল খালি হয়ে গিয়েছে। সবকিছু হারিয়ে গিয়েছে-- মুক্তোর মতো ছেলে আর মুক্তোর মতো ধান। শুধু থেকে গিয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদ আর জমিদারের প্রাসাদ। গান গাইতে গাইতে কাকিমা থেমে গেলেন, থেমে খোকাকে উঠিয়ে খুব জোরে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন।'

খোকন ছটফট করে উঠল, উহুঁ, কাকি একটা গান গাও! কাকিমা আবার একটা গান গাইলেন, সেই গানে চাঁদের নৌকো আকাশের নদীতে হেলে দুলে ভাসছিল। আর খোকন তাতে বসে দুলে দুলে বাইছিল, আর বাইতে বাইতে ঘুমিয়ে পড়ল।

রায় বাহাদুর মজুমদার লেন থেকে বেরিয়ে লতিকা ঘনশ্যাম দাস বাজারের দিকে এগুচ্ছিল। যেতে যেতে লতিকার একবার মনে হল কেউ যেন তার পিছু নিয়েছে। ও ঘুরে তাকাল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। বোধহয় এ তার মনের ভুল, কেউ তার পিছু নেয়নি। কিন্তু তবুও সাবধানে থাকা ভালো। লতিকার মনে পড়ল, শহরে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি হয়েছে, সুতরাং দেখেশুনে যাওয়া ভালো। লতিকা আর একবার চারদিকে তাকাল। বাজারে লোকজন যাওয়া-আসা করছে। দোকানপাট সব সাজানো-গোছানো। লোকজন জিনিসপত্র কেনাকাটা করছে। বাস এবং ট্রামও চলছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লতিকার মনে হল এই নিস্তব্ধতা এই শান্তির যেন কোন স্থায়িত্ব নেই, সব ওপর ওপর'। যেন সমস্ত পরিবেশ ধারালো ব্লেডের মতো উঁচিয়ে আছে, একটু হাত লাগলেই রক্ত ঝরবে। মানুষজন চলাফেরা করছে--কাজকর্মও করছে, বস্তা ওঠাচ্ছে আব এদিক-ওদিক হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু লতিকার মনে হচ্ছিল তার পিছনে ক্রোধের গর্জন হচ্ছে আর বহুদূর-দিগন্তে লাল আলো তার চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। যেন ধূ ধূ বালির প্রান্তে ধীরে ধীরে তরঙ্গ মালা এগিয়ে চলেছে। লতিকা চমকে উঠে তার সামনে এবং পিছনে দেখতে লাগল।

খেলনার এক দোকানে গিয়ে ও খোকনের জন্য একটা বাঁশী কিনল। কিনে ঠোঁটে চেপে ধরে বাজাল। দোকানদার হেসে বলল, আপনি তো খুব সুন্দর বাজাতে পারেন। লতিকা হেসে বাঁশী তার ব্যাগের ভেতর রেখে দোকানদারকে দাম দিতে লাগল। ঠিক সেই সময় সে আবার অনুভব করল কেউ তার পেছন দিয়ে চলে গেল। ও ঘুরে তাকাল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। একটু দুরে গান্ধী টুপি পরা দুজন লোক বেশ মশগুল হয়ে কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছে। লতিকা আরও সাবধান হয়ে গেল। সে ভেবেছিল মিটিংয়ে যাওয়ার আগে স্বামীর সঙ্গে দেখা করে যাবে। তার স্বামী এই শহরেই আত্মগোপন করে আছে। কিন্তু ও ঠিক করে ফেলল আজ ও তার সঙ্গে দেখা করবে না। খুব সম্ভব পুলিস পেছন নিয়েছে, আর ও নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে পুলিসের কাছে তার ডেরার ঠিকানা পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে না। লতিকার বুক খুব জোরে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। দোকান থেকে উঠে যেদিকে ওর স্বামী আত্মগোপন করে আছে সেইদিকে ও চোরা চোখে তাকাল। ও মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে গ্রে বাজারের বাস ধরল। আব বেশী কিছু ও চিন্তা করতে পারল না। হেঁটেই যাবে বলে ও ঠিক করেছিল, কিন্তু ভাবল হাঁটতে হাঁটতে আবার ওর মন পরিবর্তন না হয়ে যায়। তাই ও বাসে চড়াই ঠিক করল।

বাসে নীলিমা এবং প্রতিভার সঙ্গে ওর দেখা হয়ে গেল। নীলিমা খুব নরম স্বভাবের মেয়ে। খুব বড়লোক বা দেখতে খুব সুন্দর সে ছিল না, আর লেখাপড়াও সে খুব বেশী জানতো না। কিন্তু তাকে দেখে মনে হত সে খুব সুন্দরী, খুব বড়লোক আর খুব লেখাপড়া জানা মেয়ে। আসলে তার স্বভাবে আভিজাত্যের এমন এক ঠমক ছিল যে, সে তার ছোট্ট ঘরে কম আয়ে আর কম বিদ্যা-বুদ্ধিতে এমন এক জীবনযাপন করত যা দেখে মনে হত সে জীবন এপ্রিলের বর্ষার মতো নির্মল আর উজ্জ্বল। ভালো সেন্টের খুব শখ ছিল নীলিমার। কারণ হাসপাতালে সব সময় তাকে নোংরা আর দুর্গন্ধ নিয়ে কাজ করতে হত। নার্সের কাজ করতে করতে এই দুর্গন্ধের সঙ্গে তার একটা মনকষাকষিও হয়ে গিয়েছিল। তাই প্রায়ই ছুটির পর সন্ধ্যার সময় সে তীক্ষ্ণ গন্ধের

সেন্ট মাখত। কিন্তু যেদিন তার কমিউনিস্ট স্বামী বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্যে জেলে গেল, সেদিন থেকে সেন্টের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জাগল। এখন তাকে দেখলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং ভাবুক-ভাবুক মেয়ে বলে মনে হয়। এখনও তার ঘর-দুয়ার আয়নার মতো স্বচ্ছ আর তকতকে। কিন্তু তার চুলে তেলের কোন সুঘ্রাণ ছিল না। তাই লতিকা আজ তার চুলে কোন সুগন্ধ না পেয়ে অবাক হল।

লতিকা তাকে জিজ্ঞেস করল, কি খবর, স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ? নীলিমা হেসে বলল, না পাগলী, আমি তোর সঙ্গে মিটিংয়ে যাচ্ছি।

আর প্রতিভা তার টোপা-টোপা গালের ওপর চাটি মারতে মারতে বলল, আঃ! আজ যেন সুগন্ধের তুফান উঠেছে চারদিকে ; শুধু চামেলি আর চামেলির গন্ধ মো মো করছে। লতিকা আজ কি সাজাই না সেজেছে। বসন্ত আজ চরাচর ছেয়ে এসেছে, যেন চারদিকে লাল আবির উড়িয়ে দিয়েছে। সখিরা! তোমরা কি মিটিংয়ে যাওয়ার জন্যে এমন সাজে সেজেছ? সেখানে কাকে এমন সৌন্দর্য দেখাবে?

বলতে বলতে প্রতিভা হো হো করে হেসে উঠল। প্রতিভার স্বভাবই এমন, নিজেই কথা বলে যেত, আবার নিজেই হেসে উঠত। প্রতিভা দেখতে ছিল বেশ নাদুস নাদুস আর গোলগাল। তার একমাত্র ছেলে মার মতই নাদুস-নাদুস গাট্টা-গোট্টা আর খুব খোশ মেজাজের। কিন্তু স্বামী ছিল চিড়বিড়ে মেজাজের আর গম্ভীর প্রকৃতির। প্রতিভা আর তার স্বামীর বৈশিষ্ট্য তাদেব ছেলেব মধ্যে একত্রিত হয়েছিল। অর্থাৎ ছেলে মার মতো হৃষ্টপুষ্ট আর বাবার মতো গম্ভীর প্রকৃতির। একটু এদিক ওদিক হলেই চিৎকার করে গলা ফাটাত। প্রতিভা আজ ছেলে আর স্বামী — দুজনকে ঘরে ছেড়ে এসেছে। হাসতে হাসতে বন্ধুদের বলেছিল, আজ বাড়ীতে কিনা মজা হবে। ওরা দুজন পালা করে কাঁদবে, আর দুজনের দিকে বাসনপত্র ছুঁড়ে নিজেদের মনকে হালকা করবে।

লতিকা বলল, এভাবে ঘরদুয়ার রাখলে কাজকর্ম কেমন করে চলবে?

প্রতিভা বলল, তবে কি করব বন্ধু, আমার দ্বারা তো একসঙ্গে দু-দুটো কাজ হওয়া সম্ভব নয়। আজ সকালে মিটিংয়ের জন্যে যখন ভাষণ লিখছি তখন পতিমশায় চা চাইল, চা দিতে না দিতেই খাবার চাইল। খাওয়া হয়ে যেতেই টাই চাইল। খুঁজে পেতে টাই দিতে না দিতেই ছেলে কুকুরের মুখে হাত দিয়ে মল্লার রাগ শুরু করে দিল। আমি কুকরকে পেটাতে না পেটাতেই পতিমশায় শ্যাম কল্যাণ গাইতে শুরু করল। এখন চলে এসেছি, দুজনে মিলে ভৈরব রাগিনী গাইছে। এখন বল, আমি কি করি?

নীলিমা বলল, বাচ্চাটাকে কোন ভালো ডাক্তার দেখাও।

প্রতিভা গলা চড়িয়ে বলল, কেমন করে দেখাব? কলকাতার ভালো ডাক্তাররা যা ফিস নেন তাতে আমার পুরো রেশন হয়ে যাবে। ডাঃ বি. সি. রায়কে দেখাব নাকি? তুমিও দেখছি কখনও কখনও বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় মানুষদের মতো কথাবার্তা বল। এত টাকা খরচ করলে ছেলে আর ওকে কি খাওয়াব?

বলে প্রতিভা হো হো করে হেসে উঠে আবার বলল, আজ এক ডাক্তার বলল ওকে মাছের সঙ্গে শালগম রেঁধে খাওয়ালে মোটা হয়ে যাবে। আজকে তাই বাজার থেকে শালগম কিনেছি—এই দেখ।

প্রতিভা আঁচলের বাধন খুলে শালগম দেখালো। নীলিমা এবং লতিকা মনে মনে হাসল। সত্যিই প্রতিভা খুব সরল মেয়ে। ওর ওপর রাগ করা খুব কঠিন। নীলিমা খুব আন্তরিকতার সঙ্গে প্রতিভার কাঁধের ওর তার নরম হাত রাখল এবং লতিকা খুব আদরের সঙ্গে প্রতিভার কোমর জড়িয়ে ধরল। লতিকা প্রতিভাকে খুব ভালোবাসত। কারণ প্রতিভা মহিলা সমিতিতে খুব ভালো কাজ করে। আর বক্তা হিসেবে কোন মেয়েই তার সমকক্ষ নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও কত সরল আর সাদাসিধে প্রকৃতির মেয়ে! কি অবিশ্রান্ত কাজই না সে করতে পারে। বললে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে বা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একনাগাড়ে হাঁটতে পারে। গোয়ার্তুমি এবং অভিমান তাকে স্পর্শও করতে পারেনি। বান্ধবীদের কোন কথায় সে জ্বলে ওঠে না। কত দুঃসাধ্য কাজই না ওকে দেওয়া হয়েছে, ও সেসব কাজ হাসিমুখে সেরেছে। প্রতিভার এই হাসি তার হৃদয়ের অন্তরতম স্থান থেকে প্রস্ফুটিত হয়েছিল, আর ফোয়ারার জল-ধারার মতো তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। আকাশে মেঘের আড়ালে চাঁদ যেমন ঝলমল করে হাসে তেমনি ছিল লতিকার হাসি। আর প্রতিভার হাসি যেন সমুদ্রের অবিশ্রান্ত তরঙ্গের মতো সমস্ত তটভূমিতে আছড়িয়ে পড়ছিল।

লতিকা মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, আজ তুই মিটিংয়ে কি বলবি?

প্রতিভা বেশ আত্মবিশ্বাসে তার গোল-গোল চোখ ঘুরিয়ে বলল, বোনেরা দেখ, আজ তোমাদের পচা-গলা সমাজের আবর্জনায় এমন আগুন জ্বালিয়ে দেব যাতে সারা কলকাতা জ্বলে ওঠে। ব্যাস, তুমি শুধু তোমার এই সুন্দর শাড়ি আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিও।

এই কথা বলে প্রতিভা জোরে হেসে উঠল এবং লতিকার পিঠে জোর এক চাঁটি মারল। প্রতিভার দুষ্টুমিতে কমনীয় লতিকা তার সরু কোমর গুটিয়ে নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল আর ঠিক তখনই বাস বৌবাজারের মোড়ে এসে থামল। তিন বন্ধু বাস থেকে নেমে ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসন হলের দিকে পা বাড়াল। আর ঠিক তখনই অন্যদিক থেকে আর একটি বাস এসে থামল। সেই বাস থেকে নামল একটি সুন্দরী মেয়ে। তার খোঁপা খুব পরিপাটি করে বাঁধা, পরনের সিল্কের শাড়িতে জরির কাজ আর ঝলমল ব্লাউজ দেখে প্রতিভা চেঁচিয়ে উঠল, আরে অমিয়া...অমিয়া... মেরি জান অমিয়া! আজ তুই কি করেছিস। দু-দুটো বাচ্চার মা হয়ে তুই আজ নববধূর মতো সেজেছিস।

অমিয়া ঘোষ হেসে এগিয়ে আসতে লাগল। গাড়ি আসতে দেখে সে থেমে গেল। গাড়ি চলে গেলে সে বেশ কায়দা করে শাড়িটা সামলে নিয়ে যেন মৃদু-মন্দ বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে পাখনা মেলে, ঠমকে ঠমকে রাস্তা পার হয়ে প্রতিভা লতিকা এবং নীলিমার কাছে এল। অমিয়া ঘোষও মহিলা সমিতির কর্মী। আর তার স্বামী সিভিল্ সেক্রেটারিয়েটে চাকরি করত। তাই সে তার স্ত্রীকে মহিলা সমিতিতে কাজ করে মজদুর মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে এবং কমিউনিস্টদের মিটিংয়ে যেতে নিষেধ করত। অমিয়া ঘোষ কখনও হেসে কখনও বা ঝগড়া করে স্বামীর ওজোর-আপত্তিকে উড়িয়ে দিত। একদিন মিঃ ঘোষ বলল, 'সরকার আমার দু ছেলেকে চাকরি দেবে না। আমার কথা যদি না শোন তবে দেখবে একদিন আমারও চাকরি চলে

গিয়েছে। তা সত্ত্বেও অমিয়া ঘোষ যখন তার কথা শুনল না তখন সে রেগে গেল। এত রেগে গেল যে...

অমিয়ার কথা শুনে লতিকার মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। সে বলল, তুই কিছু বললি না, চুপচাপ মার খেলি।

অমিয়া ঘোষ বলল, আমি যা বললাম তা এখন ছেড়ে দে। প্রতিদিন তো ঝগড়া আর খিটিমিটি লেগেই আছে। ও বলে চলে আমি শুনে যাই।

অমিয়া ঘোষের কলসিব মতো ঘাড়েব উপর নীলিমা এক লম্বা কালশিটে দাগ দেখে উত্তেজিত হয়ে বলল, দেখেছ কি বেদম মেরেছে, জংলি কোথাকার!

অমিয়া ঘোষ হেসে বলল, না, খুব জোরে মারেনি, হাতে সোনার আংটি পরা ছিল তাতেই ছিলে গিয়েছে।

প্রতিভা জিজ্ঞেস করল, তুই আজকে কি বলে এলি?

অমিয়া ঘোষ বলল, দেখছিস না, বিয়েতে যাওয়ার জন্য শাড়ি পরে বেরিয়েছি। দিন দুই আগে আমার এক বড়লোক বান্ধবীব বিয়ের চিঠি চেয়ে নিয়েছিলাম। আর কিভাবে সে বান্ধবীব বিয়েতে যাওয়া বন্ধ করে?

প্রতিভা আর অমিয়া ঘোষ পরস্পর গায়ের ওপর ঢলে পড়ে হাসতে লাগল।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসন হল মেয়েদের ভীড়ে ঠাসাঠাসি। দেয়ালে ফেস্টুন টাঙানো, তাতে লেখা ঃ

"সিকিউরিটি অ্যাক্টে ধৃত বন্দীদের হয় মুক্তি দাও, না হয় মামলা দায়ের কর।"

"ধর্মঘটীদের দাবি পূরণ কর।"

"রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে মানবোচিত ব্যবহার কর।"

"রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাও।"

"বি. সি. রায়ের বাংলা, রবীন্দ্রনাথের বাংলা নয়। আমরা শ্রমিক-কৃষক রাজ চাই, পুলিস রাজ নয়।"

অমিয়া ঘোষ বলল, আর একটা পোস্টার চাই, তাতে লেখা থাকবে— পুলিস-রাজ আর রামরাজ্যের মধ্যে কি পার্থক্য? যে সঠিক উত্তর দিতে পারবে তাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে।

অমিয়ার কথা শুনে আশপাশের মেয়েরা হেসে উঠল। লতিকা একবার চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল। আজকের এই মিটিংয়ে বেশীর ভাগই ছিল মহিলা শ্রমিক। মিটিং এতক্ষণ শুরু হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। লতিকা এবং প্রতিভাকে আসতে দেখে স্টেজের ওপর থেকে এক দীর্ঘাঙ্গী মহিলা নেমে এল এবং ধীরে ধীরে পা ফেলে লতিকার কাছে এসে বেশ রুক্ষ স্বরে বলল, খুব দেরি করে দিয়েছো।

লতিকা দেরি করে আসার জন্যে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইল।

বৃদ্ধা মহিলাটি বলল, আমরা বাড়িতেও যাইনি, মিল বন্ধ হতেই সোজা এখানে চলে এসেছি। তোমাদের কোন্ মিলে যাওয়ার ছিল?

লতিকা এবং প্রতিভা তাঁর কাছে আবার ক্ষমা চাইল, রাজিয়া বহেনজী, ক্ষমা করে দাও না।

রাজিয়া হেসে বলল, চল, তাড়াতাড়ি শুরু করে দাও, আমি তোমাদের জন্যে দেরি করছিলাম।

রাজিয়াকে সভাপতি করা হল। লতিকা কমিউনিস্ট বন্দীদের মুক্তির দাবীতে একটা প্রস্তাব রেখে বেশ আস্তে ছোট একটা বক্তৃতা দিল। লতিকার প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে প্রতিভা খুব গরম এক ভাষণ দিল। আর হাততালির গুঞ্জনের ভেতর দিয়ে প্রস্তাব পাস হয়ে গেল।

সমস্ত মেয়েরা যখন দাঁড়িয়ে তালি বাজাচ্ছিল এবং স্লোগান দিচ্ছিল, তখন একজন রাজিয়ার কাছে এক টুকরো কাগজ পাঠাল।

যে এই কাগজ পাঠিয়েছিল রাজিয়া তাকে স্টেজের ওপর আহ্বান করল। মহিলাটি ছিল রোগা এবং পাংশুটে, গাল দুটি ভেতরে বসা। চেহারাতে একটা ভয়-ভয় ভাব, চুল আলুথালু--হাওয়ায় উড়ছিল। সে তার কালো ওড়না তাড়াতাড়ি সামলাতে সামলাতে স্টেজের দিকে ছুটে গেল এবং স্টেজের উপব উঠেই বলতে লাগল, বোনরা, আপনারা এটা পাস করে দিয়েছেন, খুব ভালো কথা। কিন্তু আমি একটা কথা আপনাদের বলার জন্যে এখানে এসেছি।

বলে সে থামল। হলের মধ্যে কথা বন্ধ হয়ে গেল। সবাই সেই মহিলাটিকে দেখতে লাগল। সে আবার বলতে লাগল, কিন্তু এখনও তাঁর কণ্ঠের ভয়ার্ত ভাব দূর হয়নি। 'আমার স্বামী একজন শ্রমিক। সে জুতোর কারখানায় কাজ করে। বেশ কয়েক বছর ধরে সে লাল কমরেড। কয়েকটা ধর্মঘটে সে যোগ দিয়েছে, কংগ্রেসীদের সঙ্গে জেলেও গিয়েছে। জেলে যাওয়া তার কাছে কোন নতুন ব্যাপার নয়। যেমন ভূখায় মরা গরীবদের কাছে তেমন কোন নতুন ব্যাপার নয়।'

সে আবার থামল। লতিকার মনে হল কেউ যেন তার হৃদয় চেপে ধরেছে। হলের মধ্য একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল।

সেই মহিলাটি আবার বলতে শুরু করল, আগে আমাদের নেতারা পুঁজি-পতিদের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করাকে অপবাধ বলে মনে করত না। আমি জিজ্ঞেস করি, তাঁরা এখন তা অপরাধ বলে কেন মনে করে? কেউ কেউ আজকাল হরবখত বলছেন পুঁজিপতিরাও আমাদের ভাই। আমি জিজ্ঞেস কবি তারা কি আগে আমাদের ভাই ছিল না? এখন কি হয়েছে?

একজন মহিলা চেঁচিয়ে বলল, এখন পুঁজিপতিরা তোমার ভাই নয়। এখন ওরা জামাই, বুঝলে, জামাই।

সারা হল তার কথায় হেসে উঠল। আর খুব জোরে তালি বাজতে লাগল। রাজিয়া অনেক কষ্টে সবাইকে চুপ করাল। সে মহিলাটি ক্রুদ্ধ স্বরে বলতে লাগল, ভাই হোক আর জামাই হোক, ওরা আগেও কারখানার মালিক ছিল, আর আমরাও আগে শ্রমিক ছিলাম। আজও ওরা কারখানার মালিক, আমরা আজও শ্রমিক। আমার স্বামী আগেও ধর্মঘট করাত, এখনও করাবে। ধর্মঘট করার আজ তার কেন অধিকার নেই? তাকে কেন জেলে বন্দী করা হয়েছে? কেন তার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি? ইংরেজদের আমলে তার দু-তিনবার সাজা হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবারই আদালত সাজা দিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী হাজির করা হয়েছিল। উকিলদের মধ্যে তর্ক হয়েছিল। আর এখন? না উকিল, না সাক্ষী, না মামলা, না আইন, না কানুন, শুধু জেলের গরাদ।

এক মুহূর্ত থেমে সে আবার বলতে লাগল, গত সাতদিন ধরে আমার ঘরে কোন খাবার নেই, কারণ ঘরে রোজগার করার লোক নেই। দু মাস ধরে আমার ঘন ঘন জ্বর হচ্ছে; তাই মিল মালিক আমাকে ছাঁটাই করেছে। ঘরে যা কিছু সম্বল ছিল তা এক এক করে আমি বিক্রি করে দিয়েছি। আমার কাছে এমন কীই বা ছিল? কালকে রাতে আমার ছেলে খিদেয় কাঁদতে কাঁদতে মারা গিয়েছে। ঘরে কিছু ছিল না। ক'দিন থেকেই কিছু ছিল না। এইমাত্র আমার ছেলেকে দফন করে আসছি। সোজা এখানে এজন্যে এসেছি, আমার কালো ওড়না আমার বোনদের সামনে মেলে ধরে তাদের জিজ্ঞেস করব, এই প্রস্তাবই কি যথেষ্ট? সত্যি সত্যিই যদি এই প্রস্তাব যথেষ্ট হয় তবে এই প্রস্তাবের এক নকল আমাকে দাও। আমি আমার খোকার কবরের ওপর লাগিয়ে দিই।

হলের নিস্তব্ধতা ভেঙে চৈচুর হয়ে গেল। যেন কেউ বাঁধন ছিঁড়ে দিল। একসঙ্গে বহু কণ্ঠস্বর গুঞ্জন করে উঠল ঃ

— না, না।

— না, এ যথেষ্ট নয়।

— নিশ্চয়ই, এ যথেষ্ট নয়।

অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিল। হঠাৎ এক তরুণী শ্রমিক লাফিয়ে স্টেজের ওপর উঠল। তার পরনে ছিল ঘাগরা আর তার বেণী ক্রুদ্ধ এক নাগিনীর মতো ফোঁস ফোঁস করছিল। সে স্টেজে উঠেই তার হাত দুটো প্রসারিত করে দিয়ে বলতে লাগল, যদি যথেষ্ট না হয়, তবে দাঁড়াও, এগিয়ে চলো...কলকাতার বাঘিনীরা, তোমরা কি তোমাদের ভাইদের স্বামীদের জেলখানায় ভুখা মরতে দেবে? উঠে দাঁড়াও! এখনি মিছিল করে জেলের দিকে চলো! আমরা আজ আমাদের দাবী পূরণ করে তবে ফিরব।

অনেকে একসঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠল, 'হাঁ, হাঁ ঠিক কথা।' তালি বাজাতে লাগল। মিছিল বের করার প্রস্তাব সবার ঠিক মনে হল। চারদিকে হৈচৈ পড়ে গেল। রাজিয়ার খুব রাগ হল। সে দু-তিনবার টেবিলের ওপর চাপড় মেরে চুপ করাল।

একজন মহিলা বলল, কমরেড প্রেসিডেন্ট!

রাজিয়া রেগে বলল, চুপ কর, না হলে উঠিয়ে হলের বাইরে ছুঁড়ে দেব।

আর একজন বলল, আমাকে কিছু বলতে দাও।

রাজিয়া জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? মহিলা সমিতির মেম্বার?

সেই মহিলাটি বলল, না, আমি মহিলা সমিতির মেম্বার নই।

লতিকা সেই মহিলাটির দিকে তাকাল। দেখল খুব দামী বাদামী রঙের একটা শাড়ি পরে আছে সে। মাঝারি বয়সের এবং হৃষ্টপুষ্ট। সিঁথিতে সিন্দুর। হাতে সোনার চুড়ি। সেই মহিলাটি বেশ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, আমি মেম্বার নই ঠিকই, কিন্তু এই জনসভায় কিছু বলার অধিকার আমারও আছে। আর যেহেতু আমি আপনাদের প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি সেজন্যে আমাকে বিশেষ ভাবে বলতে দেওয়া দরকার।

রাজিয়া দাঁড়িয়ে বলল, এক মহিলা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে চান।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' আর একবার চিৎকার চেঁচামেচি হল। পরক্ষণেই সমস্ত মহিলারা তার দিকে তাকাল। সে ঘাড় সামনের দিকে ঝুকিয়ে স্টেজের দিকে এগুচ্ছিল।

দেখ কেমন ধূর্ত শেয়ালের মতো যাচ্ছে। একজন মহিলা দাঁতে দাঁত চেপে বলল।

আর একজন বলল, দেখ কেমন তেল চুকচুকে।

চুপ কর, চুপ কর, রাজিয়া রাগে গর্জে উঠল। মহিলা দুজন লজ্জায় মাথা ঝুঁকিয়ে মাটির দিকে তাকাল।

সেই হৃষ্টপুষ্ট মহিলাটি স্টেজে উঠে বলতে লাগল, বোনরা, রাজনৈতিক বন্দী এবং কমিউনিস্ট বন্দীর মুক্তির দাবীতে যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে তার প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। [তালি বেজে উঠল] এই প্রস্তাবকে আপনারা সমর্থন জানিয়েছেন, আমিও সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। [তালি] আমি চাই কলকাতার সমস্ত মেয়েরা নিজেদের বাড়িতেও এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করুক। কিন্তু এই মিছিলের আমি বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা এই জন্যে করছি যে, কলকাতায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি আছে। আইন ভেঙে আমরা আইন থেকে বাঁচতে পারি না।

হলের পেছনে থেকে একজন চিৎকার করে উঠল, কে বাঁচতে চায়?

সেই মহিলাটি বলল, দেখুন, আমরা নারী, আমাদের নিজেদের সংসার দেখা-শোনা করতে হয়। নিজেদের কাচ্চাবাচ্চা, নিজেদের আত্মীয়স্বজন, নিজেদের স্বামীদের দেখতে হয়।

নীলিমা রাগে কাঁপতে লাগল। উঠে বলল, আমাব স্বামী জেলে ভুখা মরছে।

একজন মহিলা শ্রমিক বলল, সোনার চুড়ি খুলে কথা বল।

আর একজন বলল, ব্ল্যাক মার্কেটের সোনা নাকি?

আর একজন বলল, আরে বোন, এর স্বামী নিশ্চয়ই গান্ধী টুপি পরে।

এক একজন এক এক ধরনের কথা ছুঁড়ে মারতে লাগল। বড়সড় হাত-পা-ওয়ালা এক কালো ভুজঙ্গিনী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বোনরা, এই মহিলার স্বামীকে আমি চিনি। তিনি গান্ধী টুপি পরেন না, হ্যাট পরেন--হ্যাট!

একটি মেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি করে জানলে?

এই কালো মহিলাটি তার হাত দুটি কোমরে রেখে বেশ ক্রোধের সঙ্গে বলল, এর স্বামী আমাদের পাড়ায় থাকে। পুলিশ ইনসপেক্টর। গত মঙ্গলবার সে আমার ছেলেকে লাল ঝাণ্ডার লোক ভেবে অ্যারেস্ট করেছে।

হায়! প্রতিভা চিৎকার করে উঠল, 'পুলিস ইনসপেক্টরের স্ত্রী হয়ে ও এখানে সি. আই. ডি-র কাজ করতে এসেছে। বের হয়ে যাও এখান থেকে। প্রতিভা ইনসপেক্টরের স্ত্রীর ঘাড় ধরল।

মনোরমা ব্যঙ্গ করে বলল, ছেড়ে দাও দিদি, এই বেচারীর তো রাজবন্দীদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি আছে। এ তো শুধু মিছিলের বিরোধিতা করছে।

এক বৃদ্ধা বলল, আঃ, কি সহানুভূতিই না জানিয়েছে হারামজাদি। বৃদ্ধার মাথার চুল অর্ধেকেরও বেশী সাদা হয়ে গিয়েছে। আর তার মাথা সব সময় দুলছিল। তার কথা বলার ধরন দেখে লতিকার মনে হল সে উত্তর ভারতের বাসিন্দা।

এর মধ্যে অনেকেই পুলিস ইনসপেক্টরের স্ত্রীকে ঘিরে ফেলেছিল। হয়তো দু-চারবার ঘা লাগিয়েও দিত, কিন্তু রাজিয়া বেশ চতুরতার সঙ্গে সবাইকে ঠাণ্ডা করে

তাকে মিটিং-এর বাইরে বের করে দিল। মিটিং থেকে তাকে যখন বের করে দেওয়া হচ্ছি, তখন সে এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে তার শাড়ির তলা থেকে পিস্তল ছিটকে মাটিতে পড়ল।

আমিয়া ঘোষ পিস্তল উঠিয়ে বলল, দেখ, হারামজাদি বন্দীদের ভালোর জন্যে সম্পূর্ণ আয়োজন করে এসেছে।

অমিয়া ঘোষ তার ব্যাগে পিস্তলটি এমনভাবে রাখছিল যেন তা লিপস্টিক। কিন্তু লতিকা তার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়ে সেই গোয়েন্দা মহিলাটির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, এটা নিয়ে যা, না হলে কালকেই কাগজে বের হবে রাজনৈতিক বন্দীদের সমর্থকদের খানা-তল্লাশ করে পিস্তল পাওয়া গিয়েছে।

লতিকা আর অমিয়া ঘোষ ইনেসপেক্টরের স্ত্রীকে কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যখন ফিরল তখন তারা দেখল অনেকেই কোমরে আঁচল জড়াচ্ছে। কেউ কেউ ফেস্টুনগুলো নিচ্ছে। রাজিয়ার হাতে পতাকা। যে কালো ভুজঙ্গিনী পুলিস ইনসেপেক্টরের স্ত্রীকে চিনতে পেরেছিল তার হাতেও একটা পতাকা। কেউ কেউ আবার হলের কোণে যে কলসী ছিল তার থেকে জল নিয়ে আঁচল ভেজাচ্ছিল।

নীলিমা জিজ্ঞেস করল, এ কি করছ?

রাজিয়া বলল, টিয়ার গ্যাস ছুঁড়লে ভিজে শাড়ির আঁচল চোখে দেবে, তাতে কষ্ট কম হবে। চোখ কম জ্বালা করবে।

প্রতিভা বলল, যদি টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে গুলি ছোঁড়ে?

অমিয়া ঘোষ বলল, গুলি চলবে না। যদি চলে আমি সামনে এগিয়ে যাব। পুলিসরা আমার গয়না দেখে ভাববে আমি মিছিলের মেয়ে নই ; মনোরমার বিয়েতে বরযাত্রী যাচ্ছি। তাই না মনোরমা?

মনোরমা বলল, যা পাগলী।

নীলিমার মুখ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। বলল, গুলি তো চলতেও পারে।

অমিয়াও গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল, না, চলবে না, এ রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ। এখানে মেয়েদের ওপর গুলি চালানোর হিম্মত কার আছে?

লতিকা বলল, নীলিমা তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিস? নীলিমা বলল, পাগল হয়েছিস? আমি তো এত তাড়াতাড়ি মরার মেয়ে নই। উত্তর ভারতের সেই বৃদ্ধা মহিলা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে গেল। এই গেট দিয়েই মেয়েরা সব বের হচ্ছিল। তার হাতে ছোট্ট একটা সিঁদুরের কৌটো। সে তাদের থামিয়ে বলতে লাগল। আর তার মাথা ধীরে ধীরে দুলছিল, আমার মেয়েরা, এস তোমাদের সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিই। এ আমাদের বিজয়ের লাল নিশানা। আজ তোমাদের জিত হবে।

লতিকা তার মাথা নিচু করল। তার কপাল লাল টিপে ঝকমক করে উঠল।

কপালে লাল সিঁদুর ঝকমক করছিল, আর হাওয়ায় লাল পতাকা ফরফর করে উড়ছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভা 'ইন্টারন্যাশনাল' গাইতে আরম্ভ করল। ইন্টারন্যাশনাল গাইতে গাইতে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন হল ছেড়ে মেয়েদের এই মিছিল কখন যে গ্রে বাজারের কাছে এসে গিয়েছিল। আর তারা চারজন চারজন করে ভাগ হয়ে কলেজ স্ট্রীটের দিকে এগুতে লাগল। সামনে ছিল রাজিয়া আর সেই কালো ভুজঙ্গিনী। আর

তাদের পেছনে ছিল লতিকা আর নীলিমা, প্রতিভা আর মনোরমা। গীতা সরকার আর অমিয়া ঘোষ ওদের পেছনে পেছনে এগুচ্ছিল। লতিকা একবার পেছন ফিরে দেখল। মিছিল বেশ সুশৃঙ্খল ভাবে এগিয়ে চলেছে। তাদের বিপ্লবী স্লোগানগুলি চারদিকে গমগম করছিল। লতিকা দেখল বাজারের সমস্ত পরিবেশ যেন এক বিদ্যুতের ঝটকায় নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। অনেকে ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক পালাচ্ছিল। অনেকে মেয়েদের এই সাহস দেখে তারিফ করতে লাগল। কারণ তারা তাদের জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙে অনশন ধর্মঘটীদের সমর্থনে মিছিল বের করেছিল। বড় বড় দোকানদাররা দোকান বন্ধ করতে লাগল। অনেকে বড় রাস্তা ছেড়ে গলির পথ ধরল।

কেউ কেউ মিছিলের সঙ্গে যোগ দিল। বৌবাজারের উপরের উঁচু ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে মহিলারা মেকআপ করে হাসছিল। একটা ট্রাম ইলেকট্রিক তারে ছড় টানতে টানতে বেরিয়ে গেল। লতিকা এগিয়ে যেতে যেতে ট্রামের ইলেকট্রিক তার দেখছিল। জয়েন্টের জায়গায় বিদ্যুতের এক স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল। লতিকা শিউরে উঠল। যেন সমস্ত পরিবেশ তৈরি হয়ে উঠেছে। পা এগিয়ে চলেছে। কণ্ঠে ছিল টগবগে গান। কিন্তু গানের কলিগুলি ভেতর এবং বাইরে ভেঙেচুরে ওর সামনে এবং পেছনে ঝুঁকে অসংখ্য চিন্তা আগু-পিছু হতে লাগল আর তা যেন পরস্পরের সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল...কাকিমার মুখের ওপর বাদামী রঙের আঁচিল কি সুন্দরই না লাগে...আজকে আমার স্বামীর সঙ্গে কেন দেখা করিনি...ট্রামের ছড় কি ভাবে ছুটে যায়...নীলিমার নাক...আজ আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে ভালোই হত...গুলি চলতে পারে...না-ও চলতে পারে...চলতে পারে... নাও চলতে পারে... ঐ যে জিপ আসছে। লতিকার চিন্তা জিপ গাড়ির সঙ্গে চিপকে গেল। ওর মাথায় এখন আর কোন চিন্তাই নেই। সামনে থেকে জিপ গাড়ি আসছিল। জিপের ওপর ওয়ারলেস যন্ত্র লাগানো আর জিপে পুলিস অফিসার বসে। মিছিল সামনে এগিয়ে চলেছিল। আর সেদিক থেকেই জিপ ছুটে আসছিল। জিপ আরও সামনে এগিয়ে এল। জিপে পুলিস বসেছিল, তাদের হাতে ছিল রাইফেল। জিপ এগিয়ে আসছিল, মিছিলও এগুচ্ছিল। আর লতিকার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাবনা, হৃদয়, জিপের সঙ্গে চিপকে গিয়েছিল। মিছিলের সামনে এসে একটু দুরে জিপ থেমে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে লতিকা যেন ধাক্কা খেল। ওর এক এক করে মনে হল আজ খোকনের প্যান্ট ধুতে দেওয়া হয়নি। তারপর সে আর কিছু মনে করতে পারল না। যেন মস্তিষ্কের ওপরের উজ্জ্বল কাচের স্তর ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছে। আর যেন টুকরো টুকরো হয়ে-যাওয়া কাচের ছিদ্র দিয়ে বাইরে পৃথিবীকে দেখছে। পুলিস মিছিল আটকে দিয়েছিল। আর একজন অফিসার বলছিল...মিছিলকে সামনে যেতে দেওয়া হবে না।'

লতিকার পা আপনা থেকেই সামনে এগিয়ে গেল।

পা থামবে না, ঝাণ্ডা উড়বে।

'শহরে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি হয়েছে, মিছিল বের করা আইনবিরুদ্ধ।'

অনশন ধর্মঘটীরা জেলের গারদে পেছন থেকে ঝুঁকে দেখছে। মেয়েরা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

'আমি হুকুম দিচ্ছি, মিছিল ভেঙে দাও।'

এই হুকুম লতিকার কাছে কেমন নাকি-নাকি মনে হল, যেন উপরের তাকে রাখা কোন পুতুল কথা বলছে।

মিছিল সামনে এগিয়ে গেল, লাল সিঁদুরের টিপ সারবন্দী হয়ে এগিয়ে চলেছে।

'ছত্রভঙ্গ হয়ে যাও! না হলে...'

না হলে? লতিকার মস্তিষ্কের পেছনের চোখ দুটি জ্বলতে লাগল। আর একটি অদ্ভুত মুখ ভেসে উঠল।

এ কার চোখ? এ কার মুখ? হ্যাঁ! এ তার স্বামীর মুখ।

সিঁড়ির ওপর খোকন দাঁড়িয়ে, পাতলা পাতলা কাচ জায়গায় জায়গায় ভেঙে গিয়েছে।

লতিকার হঠাৎ মনে হল যেন আগুনের কণা ট্রামের বৈদ্যুতিক তারের মতো ওর পেটের মধ্যে ঘুরছে। আর ও যেন জয়েন্টের নিচে ছিটকে পড়েছে। খোকন সিঁড়ির নিচে ছিটকে পড়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে ছেয়ে গেল। এরই মাঝে যেন আলোর একটা রশ্মি চমকে উঠল, যেন আধখানা ভাবনা, চার ভাগের এক ভাগ ভাবনা, দুটো চোখ, একটি মুখ...আবার অন্ধকার...

গুডুম...গুডুম...গুডুম...

রাজিয়া চিৎকার করে বলল, মাটিতে শুয়ে পড়।

সন্‌সন্‌ শব্দে একটি গুলি রাজিয়ার পাশ দিয়ে ছুটে গেল। রাজিয়া মাটির ওপর শুয়ে পড়ল।

সমস্ত মিছিল মাটির ওপর শুয়ে পড়ল। বেশ্যাপট্টির দরজাগুলি বন্ধ হতে লাগল। চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। তারপর নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। হাওয়াতে শুধু গুলির সন্‌সন্‌ আওয়াজই শোনা যাচ্ছিল।

নীলিমা কাঁধ ঝুঁকিয়ে মাটির সঙ্গে একেবারে মিশে যাওয়া চোখ, মাথা আর কানকে হাত দিয়ে ঢেকে গলির দিকে ছেঁচড়িয়ে এগুতে লাগল। ওর হাত অমিয়া ঘোষের হাত ধরে ছিল। যে হাত আগে চলছিল সেই হাত থেমে গেল, যে হাত গরম ছিল সেই হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নীলিমা ওর হাত ছেড়ে দিল। কার বরযাত্রী চলে গেল! অমিয়া! নীলিমা ছেঁচড়িয়ে ছেঁচড়িয়ে এগুতে লাগল। কিছুটা এগুনোর পর ও পিছলে গেল, আর ওর হাত কারও রক্তের ওপর গিয়ে পড়ল। রক্তে হাত পড়তেই নীলিমা মৃদু চিৎকার করে উঠে দেখল, প্রতিভা মরে পড়ে আছে আর তার আঁচলে-বাঁধা শালগম খুলে গিয়ে রক্তে ভিজে গিয়েছে। শালগম আর মাছের ঝোল! প্রতিভা তুই আজকে স্বামীকে কি খাওয়াবি? নীলিমা ছেঁচড়িয়ে এগিয়ে চলল। একটা গুলি ডানদিক থেকে ছুটে এল, আর কে যেন তার পেছনে চিৎকার করে উঠল। মুহূর্তের এক তীক্ষ্ণ চিৎকার -- যেখানে জীবনের পরিসমাপ্তি হয় আর মৃত্যুর শুরু হয়, ও ছিল গীতা সরকার। মাথা ভেদ করে গুলি বেরিয়ে গিয়েছিল। কাছেই একজন তরুণ মরে পড়ে আছে। বুট পালিশের কৌটো আর বুরুশ ওর হাতের মুঠোয় ধরা। নীলিমার দাঁত ঠকঠক করে বাজতে লাগল, আর ও চিৎকার করছিল।

রাজিয়া ছুটতে ছুটতে ওর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে? তোমার কোথাও লেগেছে?

নীলিমা ঘাবড়ে গেল। মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। কয়েকটি লাশ মাটিতে মাটিতে পড়ে আছে। কেউ কেউ কাৎরাচ্ছিল আর একজন নর্দমার কাছে — দোকানের নীচে আশ্রয় নিয়েছিল।

পুলিসরা একটু পিছু হটে দূরে দাঁড়িয়েছিল। সমস্ত বাজার নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গিয়েছিল।

নীলিমা জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?

রাজিয়া বলল, যা কিছু হবার হয়ে গিয়েছে, চল লতিকার কাছে যাই।

নীলিমা নিজে নিজেকে দেখল। ওর কোন আঘাত লাগেনি, ও যেন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

রাজিয়ার হাতে একটা গুলি লেগে ছড়ে গিয়েছিল।

রাজিয়া আর নীলিমা লতিকার কাছে গেল, দেখল লতিকা খুব আস্তে আস্তে কাতরাচ্ছে। ওর পাশেই মনোরমা মুখ খুলে পড়ে আছে। আর ওর হাত দুটো কানের ওপর।

নীলিমা বলল, ওঠ, মনোরমা ওঠ। দেখ, লতিকা কাতরাচ্ছে। চল, ওকে উঠিয়ে নিয়ে যাই।

রাজিয়া বলল, কাকে ওঠাচ্ছ? মনোরমা তো আর উঠবে না। ও আর কারও কথা শুনবে না।

নীলিমা খুব আস্তে মনোরমার হাত তার কানের ওপর থেকে সরিয়ে দিল। একটা দুল ওর কান থেকে খুলে গিয়ে নীলিমার হাতে পড়ল। মনোরমা সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে ছিল। ওর বুকে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। ওর চোখ বন্ধ। ওর ঠোঁট শুকনো, ওর কুমারী বুকের সমস্ত মমতাকে কে যেন শুকিয়ে দিয়েছে।

লতিকা গুঙিয়ে উঠল, আঃ।

রাজিয়া এবং নীলিমা চারদিকে তাকালো। কেমন একটা স্তব্ধতা, বায়ুমণ্ডল যেন তার হাওয়াকে থামিয়ে দিয়েছে আর পৃথিবী যেন অক্ষরেখায় ঘোরা বন্ধ করে দিয়েছে।

এক জুতার দোকানের ওপর ঝুলন্ত বারান্দা থেকে একজন বৃদ্ধ চীনা ঝুঁকে দেখছিল। রাজিয়া তাকে নীচে নেমে আসার জন্যে ইশারা করল। বৃদ্ধ চীনা খুব মনোযোগ দিয়ে নীচে দেখল। তার দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। ভেতর দিয়ে বাইরে আসা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না! ঝুলন্ত বারান্দা থেকে রাস্তায় নামার জন্যে একটা সিঁড়ি ছিল, কিন্তু সেই সিঁড়ি বাইরের দেওয়ালে ঠেস দেওয়া ছিল। কিন্তু সেখানে সিঁড়ি নেই। সিঁড়ি পুলিসের জিম্মায়। আর কোন আশ্রয় ছিল না।

বৃদ্ধ চীনা সিঁড়ি দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে মাকড়সার মতো দেয়াল বেয়ে বেয়ে কোন মতে নীচে নেমে এল। নীচে নেমে সে খুব তাড়াতাড়ি দোকান খুলল এবং নীলিমা এবং রাজিয়ার সাহায্যে লতিকাকে উঠিয়ে দোকানে নিয়ে গেল।

দূরে দাঁড়িয়ে পুলিসরা মজা দেখছিল।

বৌবাজারের দালানের উঁচু বারান্দায় দাঁড়িয়ে মহিলারা কাঁদছিল।

মিছিল আবার জেগে উঠতে লাগল। মেয়েরা মাটি থেকে উঠে--যারা আহত হয়েছিল তাদের দেখতে লাগল--সাথীদের লাশ দেখতে লাগল।

গীতা সরকার

আমি গীতা সরকার। আমার বয়স আঠারো বৎসর। আমার মা-বাবা খুব গরীব। তাই আমি জানি দারিদ্র্য কি? আর. জি. কারমায়কল কলেজের আমি একজন নার্স। একজন ছেলেকে আমি ভালোবাসি। তার নাম অজিত বোস। সামনের বছর সে ডাক্তারি পাস করবে। পাস করার পর আমাদের বিয়ে হবে।

গুড়ুম্!

অমিয়া ঘোষ

আমি হাসিখুশি রঙিন পাখি, যে পাখি শ্রাবণের বৃষ্টি মাথায় নিয়ে উড়ে বেড়ায় আকাশে আর নীল ঝিলের স্বপ্ন দেখে। রাত্রে সে তার ছোট্ট বাসায় বসে নিজের ডানে আর বাঁয়ে দুটি বাচ্চাকে শুইয়ে তারপর নিজের দুটি ডানা মেলে শুয়ে পড়ে। বাচ্চারা একটা ছোট্ট গল্প শোনাবো। আর ওরা আমার নরম নরম বুকে লুকিয়ে তাদের সুন্দর চোখ মেলে আমার গল্প শুনবে। তারপর গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বে।

গুড়ুম্!

মনোরমা

মিটিং শেষ করে আমি ছটার সময় ওডিয়ন সিনেমার সামনে তোমার সঙ্গে দেখা করব। না, উলঙ্গ মেয়েদের সাঁতার-কাটা রঙিন ছবি আমি দেখব না। করুণা আর মানবতার প্রতিমূর্তি চার্লি চ্যাপলিনের ফিল্ম আমি দেখব। সামনের সপ্তাহে আমাদের বিয়ে হয়ে গেলে বিয়ের পরও এই ফিল্ম আমি দেখব। আর তারপর বর্ধমানে তোমাদের বাড়ি যাব, যেখানে উঠোনে তুলসীর গাছ আছে। পূর্ণিমার রাত্রে আমরা দুজন দুজনের হাতে হাত রেখে সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকব, আর আসন্ন সন্তানের কল্পনা করব। সেই আসন্ন শিশুর সুগন্ধে তুলসীর চারা মঞ্জরিত হয়ে উঠবে। মিটিং থেকে বেরিয়ে আমি ঠিক ছটার সময় ওডিয়ন সিনেমার গেটের কাছে পৌঁছে যাব। আমার জন্যে অপেক্ষা কর। গুড়ুম্!

প্রতিভা

কতদিন থেকে তোমার জন্যে প্রতীক্ষায় আছি, একবার তুমি এস।

ও আমাদের দুজনের সন্তান। আমরা দুজনই গরীব। ওর জন্যে কিছু করতে পারিনি। কিন্তু এই সন্তানের ভবিষ্যৎ খুব ঐশ্বর্যশীল। কারণ ও সেই যুগের সন্তান যে যুগে আমাদের আশায় উজ্জ্বলতা আছে। থরো থরো কম্পমান প্রসন্নতার কিরণ সামনে থেকে আসছে.., কতদিন থেকে তোমার প্রতীক্ষায় আছি, একবার তুমি এস।

গুড়ুম।

পালিশওয়ালা

আমার কোন নাম নেই। আমার বাবার কোন নাম নেই। আমার মার কোন নাম নেই। কলকাতার এক অন্ধকার গলিতে আমার জন্ম। দারিদ্র্য আর পুঁজিবাদের আমি মিলিত সন্তান। এই মিলনই আজও কলকাতার আত্মাকে এক জোঁকের মতো চুষছে। আমি জুতা পালিশ করি। মানুষ মুখকে ঝকঝকে করে তোলে আর আমি জুতো ঝকঝক করি। মানুষ মানুষের মুখ দেখে বুঝতে পারে, আমি জুতোর চেহারা দেখে

বুঝতে পারি। আমি অবহেলায় বেঁচে আছি। আমি ফুটপাতে শুই, আর হোটেলে উচ্ছিষ্ট খাই।

আমার কোন নাম নেই। আমি এই মেয়েদের বাঁচাতে এখানে এসেছিলাম। আমি জানি না এ কিসের মিছিল ছিল? শুধু এইটুকুই জানি, মেয়েদের ওপর গুলি চললে পুরুষদের সামনে যেতে হয়। কারণ মেয়েরা হচ্ছে পুরুষদের মা, আর মাকে বাঁচানো প্রতিটি সন্তানের কর্তব্য, সেই মা সন্তানকে নিজের বলে ডাকুক আর নাই ডাকুক।

আমার কোন নাম নেই। আমি সেই নামহীন একজন সাধারণ কবি, যে প্রতি শতাব্দীতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে মারা গিয়েছে। আমি সেই নামহীন সৈনিক যে প্রতিটি মোর্চায়, প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে অমর হয়ে রয়েছে। আমি সেই মহামানব, যাঁরা দেবতাদের মতো কৃপাবান আর যাঁদের কর্মিষ্ঠ হাতে বিপ্লবের পতাকা উড়ছে।

আমার কোন নাম নেই। আমি বোধহয় আমার মাকে খুঁজতে এসেছিলাম।

গুড়ুম্!

বৃদ্ধ চীনার দোকানে নীলিমা লতিকার মাথা তার কোলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, লতিকা এখন কেমন আছিস? লতিকার মুখে কাকিমার মতো এক হাসি খেলে গেল। বলল, ভালো আছি। পেটে সামান্য একটু ব্যথা।

রাজিয়া বলল, অ্যাম্বুলেন্স এখনই এসে যাবে হয়তো। বুড়ো চীনাকে ভগবান ভালো করুক, অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে ও এই মাত্র ফোন করেছে।

বৃদ্ধ চীনা ঠিক এই সময় দোকানের ভেতর থেকে একটা রুটি নিয়ে এসে বলল, 'এই রুটিটা পেটের ওপর রেখে দাও।' রাজিয়া জিজ্ঞেস করল, 'এ দিয়ে কি হবে?'

বৃদ্ধ হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'এতে কিছুই হবে না, কিন্তু আমি কি করব...বল, কি করব... কিছুই বুঝতে পারছি না।'

রাজিয়া বলল, চুপ করে বস, অ্যাম্বুলেন্স আসছে হয়তো।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলতে লাগল, 'এ চিয়াং, এসব চিয়াং -এর শয়তানি। আমি সব জানি।'

রাজিয়া বৃদ্ধকে বলল, 'কি বোকার মতো বলছ, এখানে কোথা থেকে চিয়াং আসবে?'

বৃদ্ধ চীনা হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'চিয়াং-ই হবে। তুমি জানো না। আমি সারা দুনিয়া ঘুরেছি। সমস্ত দেশেই চিয়াং আছে--ছোট চিয়াং, বড় চিয়াং, আর তার থেকেও বড় চিয়াং'... বৃদ্ধ চীনা তার হাত প্রসারিত করে এক বিরাট চিয়াং-এর চেহারার বর্ণনা দিতে দিতে বলল, 'আর এই চিয়াংরা এক হয়ে আমাদের লুট করছে, আমাদের ওপর গুলি চালাচ্ছে!'

বৃদ্ধ চুপ হয়ে গেল। লতিকা খুব আস্তে আস্তে কাতরাচ্ছিল--কানে ঘড়ি টিক টিক করে চলছিল।

বৃদ্ধ আবার বলল, 'সমস্ত চিয়াংদের খতম করতে হবে। আর কোন পথ নেই। শুধু পিকিং-এর রাস্তা আছে, সেখানে আমাদের ফৌজ আনন্দে বিউগল বাজাতে বাজাতে ঢুকছে।' বলতে বলতে বৃদ্ধের শোকাতুর মুখের ওপর আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। পিকিং-এর নাম শুনে লতিকার মুখের ওপর এক অদ্ভুত হাসি খেলে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'আর কত দূর?'

রাজিয়া বলল, 'আসছে...এই যে এসে গিয়েছে।'

দোকানের সামনে একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়াল।

রাজিয়া বলল, 'লতিকা ভয় পেয়ো না, তুমি বেঁচে যাবে।'

লতিকা খুব আনন্দের সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ আমি জানি, আমি মরব না।'

অ্যাম্বুলেন্স লতিকাকে নিয়ে চলে গেল।

রাজিয়া পড়ে-থাকা পতাকাটা তুলে নিল। এই পতাকা এত লাল কেন? কেন এত ঝলমল করছে? কেন এর ঝলমল এত ক্রোধে ভরা? কালো ভুজঙ্গিনী অমিয়া ঘোষের লাশ তার কাঁধে তুলে নিয়েছিল। বাকি লাশগুলি সব উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মিছিল আবার ধীরে ধীরে এগুতে লাগল। দোকানগুলি খুলতে লাগল। মানুষ রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে কথা বলছিল। মিছিল যতই এগুতে লাগল ততই বড় হতে লাগল। হাওয়ায় ঝাণ্ডা ক্রমশ খুলে যাচ্ছিল, যেন কলকাতার শৃঙ্খলিত হৃদয় তার শৃঙ্খল টুকরো টুকরো করে মিছিলে সামিল হচ্ছিল। দশ, বারো, পনেরো, বিশ, শ', হাজার হাজার মানুষ এসে ঐ মিছিলে সামিল হল আর স্লোগান দিতে লাগল-- ঘৃণা আর ক্রোধে ভরা স্লোগান দিতে লাগল। এখন আর গুলি বা একশো চুয়াল্লিশ ধারার ভয় কাউকে চেপে ধরল না। মেয়েরা শহীদের রক্ত তাদের কপালে লাগিয়ে নিল, আর বুক টান করে এগিয়ে যেতে লাগল। সিপাইরা পিছু হটতে লাগল। মিছিল সামনে কলকাতার বাজারে, কলকাতার অলিতে গলিতে এগিয়ে গেল। সিনেমার হল থেকে মানুষ বেরিয়ে এল। কারখানা থেকে বেরিয়ে এল। শ্রমিকদের নেতৃত্বে কেরানী-দোকানদার-ছাত্র সামনের দিকে এগিয়ে চলল। মিছিল জেলখানার দিকে এগিয়ে চলল। জনতা এখন ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছে আর জালিম মাটির নীচে গর্তে আশ্রয় নিয়েছে।

অ্যাম্বুলেন্স ছুটে চলছিল। তার হর্ণ সমানে বিরক্তিকর ভাবে বেজে চলেছিল, আর তার শব্দে লতিকার খুব কষ্ট হচ্ছিল। কেন এই শব্দ হচ্ছে। এই শব্দ আমার পেটের মধ্যে হাজার হাজার গুলির মত কেন পাক খাচ্ছে? এই ঘা দিয়ে কি ঢুকছে, যেন সারা শরীরে কেউ সুঁই ফুটিয়ে দিচ্ছে? পেটের মধ্যে ব্যথার ঢেউ উঠে ঘুর-পাক খাচ্ছে। ঘূর্ণিপাক, জ্বলন্ত অঙ্গার, ভূমিকম্প, জ্বলন্ত লাভা, আঃ! শরীরের প্রতিটি অঙ্গ জ্বলে যাওয়াকেই কি মৃত্যু বলে!

অ্যাম্বুলেন্স ছুটে চলেছিল। আর তার লোহার জালের বাইরে ছিল জীবন। লতিকা আশার চোখ নিয়ে বাইরে তাকাল। এক পাচতলা দালানের সামনে দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ছুটে চলেছে! লতিকা দেখল, জানলায় একটা রঙীন পর্দা উড়ছে। দুজন ছেলে সিগারেটে টান দিয়ে ব্যালকনি থেকে নীচের দিকে ঝুঁকে হাসছে। একজন দর্জি গোলাপি রঙের সাটিনের ব্লাউজ সেলাই করছে...মা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বাচ্চা লাফাচ্ছে আর হাসছে...ওপরের আকাশ গাঢ় নীল। লতিকা চোখ বন্ধ করে নিল। যেন তার মৃত্যুগামী শরীর আর হৃদয়ে শান্তির ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। মৃত্যু যেন তুচ্ছ ব্যাপার। জীবনই সব কিছু। মৃত্যু যেন কিছু নয়, শিশুর হাসিই সব। ও যেন দুরে জানলার কাছে দাঁড়ানো মার কোল থেকে শিশুকে ক্ষণেকের জন্যে নিজের কোলে তুলে নিল। আর তখনি তাকে চুমু খেয়ে আবার তার মার কোলে ফিরিয়ে দিল। জীবন থেকে মৃত্যু, আর মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে...।

লতিকা যেন তার জীবনের অন্তিমক্ষণেও উষার প্রথম কিরণের মতো হাসল।

মর্গ!

মর্গে ছ'টি লাশ পড়েছিল।

১ --লতিকা সেন!

২ --অমিয়া ঘোষ!

৩ --প্রতিভা গাঙ্গুলী!

৪ --গীতা সরকার!

৫ --মনোরমা!

৬ --এক নামহীন ছেলে!

ছ'টি লাশই মর্গে উলঙ্গ হয়ে পড়েছিল। ওদের দেহে কোন কাপড় ছিল না। মর্গের কর্মচারীরা যেন মানুষের বেশধারী চিল আর শকুন-এর মতো। তারা এই গলিত সমাজে গলিত মাংসের ব্যাপারি। তারা লাশ নিয়ে তাদের বিশেষ অশ্লীল, আর গা ঘিন ঘিন করে ওঠে এমন ঢং-এ কথা বলছিল--মজা করছিল। লাশগুলিকে তাদের অশ্লীল ব্যঙ্গের নিশানা করছিল।

'শালি বেশ দেখতে।'

Discovery of India

'কি সুন্দর গোলগোল আর নাদুসনুদুস।'

Bardoli

'ওর শরীরের দিকে একবার চেয়ে দেখ কি মাস্টারপিস লেডি!'

My Experience with truth

'এর মাংস এখনও গরম আর নরম আছে!'

Satyameva Jayate

নীলিমা এইমাত্র তার নার্সের ডিউটিতে এসেছে। ওপরের দিকে সে চোখ তুলে তাকাল। আকাশ ছিল উলঙ্গ। পৃথিবী উলঙ্গ, সূর্যের কিরণ উলঙ্গ, সতী আর সাবিত্রীর দেহ উলঙ্গ। আর মর্গ থেকে বহু বহু--হাজার হাজার মাইল দূরে ওয়ারল্ড রুফ এস্টোরিয়া হোটেলের জাঁকজমক লাউঞ্জে মিসেস বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র কোন দিন আসবে না, কারণ ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে সমাজতন্ত্রীদের একজনও প্রতিনিধি নেই।' হাঁ, সমাজতন্ত্রীদের প্রতিনিধি ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে নিশ্চয়ই নেই কিন্তু কলকাতার এই মর্গে অবশ্যই আছে। সমাজতন্ত্রীদের প্রতিনিধি কলকাতার জেলে বন্দী আছে, ফাঁসির দড়িতে ঝুলছে। ওয়ারল্ড রুফ এস্টোরিয়া হোটেলের মার্কিনী উত্তপ্ততা সত্যিই খুব সুন্দর। কিন্তু ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারণ এখন আর এই হোটেল আর এই বাড়ি করবে না। নীলিমার মনে হল, আজ ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারণ কলকাতার মর্গে হচ্ছে, কলকাতার জেলে হচ্ছে, কলকাতার রাস্তার ওপর হচ্ছে। নীলিমার ইচ্ছে করল, হাজার হাজার মাইল দূরে মিসেস বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে ডেকে বলে, ভারতবর্ষের এই উন্মুক্ত পার্লামেন্ট, পার্লামেন্ট ভারতবর্ষের রাস্তায়, কলে-কারখানায়, ঘরে আর আঙ্গিনায় বসেছে, এসে দেখে যাও সেখানে সমাজতন্ত্রীদের কোন প্রতিনিধি আছে কি নেই?

নীলিমা পাঁচটা লাশের দিকে আবার তাকাল।

পবিত্র উলঙ্গ লাশ--যেন উজ্জ্বল চকচকে নাঙ্গা স্ফুলিঙ্গ--যেন সৃষ্টির থরোথরো বিদ্যুৎ। ঠিক যেমন ইনক্লাব নিজের রক্তে হাসে আর জ্বলতে জ্বলতে পুড়তে পুড়তে অঙ্গারের ফুল হয়ে যায়।

অনেকক্ষণ ধরে এই লাশগুলি উলঙ্গ হয়ে পড়েছিল।

অনেকক্ষণ ধরে মর্গের কর্মচারীরা ঠাট্টা তামাশা করছিল।

অনেকক্ষণ ধরে নীলিমা, নারী নীলিমা, এই হাসপাতালের নার্স নীলিমা মর্গের কর্মচারীদের লাশ ঢেকে দেওয়ার জন্যে বলছিল।

অনেকক্ষণ ধরে তারা হাসি ঠাট্টা করছিল আর নীলিমার কথা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিচ্ছিল।

নরম মেজাজের নীলিমার মুখ হঠাৎ রাগে লাল হয়ে উঠল। ওর হাতের মুঠি খুলে গেল। ও দু'হাত দিয়ে তীব্র বেগে নিজের শাড়ি খুলে ফেলে লাশগুলি ঢেকে দিল।

ও সবার সামনে উলঙ্গ দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু কার এমন সাহস ছিল যে ওর দিকে চোখ তুলে তাকায়। এই সময় ও যেন শিবের তৃতীয় নেত্র হয়ে উঠেছিল। যার দিকে তাকাত সেই ভস্ম হয়ে যেত। সিপাইও লজ্জা পেয়ে সেখান থেকে উঠে চলে গেল। শুধু নীলিমা একা শহীদের লাশ পাহারা দিচ্ছিল।

এর মধ্যেই কয়েকজন সাদা চাদর নিয়ে এল।

রাত্রি অনেক গভীর হয়েছিল, কিন্তু আজকে কলকাতার চোখে ঘুম নেই। মানুষের বাজার আর অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউই রেহাই পায়নি। কেউ ক্রোধ আর ঘৃণার হাত থেকে পালিয়ে কোথাও আশ্রয় নিতে পারেনি। পুঁজিবাদের বিভেদের রূপ--তার ধোকা আর আত্ম-প্রবঞ্চনা সমস্ত মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নীলিমা তাড়াতাড়ি পা ফেলে হাঁটছিল, হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল, আর দেখছিল। যেন আজ কলকাতার মানুষ পাগল হয়ে তাদের ব্যগ্র হাতের মুঠো বারবার খুলছে আর ইনকিলাবি স্লোগান দিতে দিতে গলি-ঘুপচিতে জনতার শত্রুদের খুঁজছে।

কাকিমা বহুক্ষণ ধরে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মপুত্রের জলের বৃদ্ধি দেখছিলেন। খোকন এখন পর্যন্ত ঘুমোয়নি। ও আজ কেমন উদাস উদাস ছিল, ও বুঝতে পারছিল না, কি তাকে এমন উদাস করে দিয়েছে। অলিগলি আর বাজারে স্লোগান গুঞ্জরিত হচ্ছিল। কখনও কোথাও চাপা, আবার কখনও কোথাও জোর চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। কোথায় যেন দূরে বোমার শব্দের সঙ্গে চিৎকারের আওয়াজ ভেসে আসছিল। কখনও বা ছুটে পালিয়ে যাওয়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আবার পরমুহূর্তেই স্লোগানের ঝড় মিলিয়ে যেতে না যেতেই স্তব্ধতা ছেয়ে যাচ্ছিল

এমনই এক স্তব্ধতার মধ্যে নীলিমা লতিকার বাড়িতে এল। কাকিমা সিঁড়ির বাতি জ্বালিয়ে নীলিমার মুখ দেখেই সব বুঝে নিলেন। কারণ তিনি জীবনভর শুধু অশ্রু গুনেছেন আর অশ্রু কেটেছেন। আর তাই তিনি এই ফসল ভালোভাবেই চেনেন।

নীলিমা কাকিমাকে আলাদা নিয়ে গিয়ে কি যেন বলছিল। কাকিমা তাকে হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে দিলেন। বললেন, আর কিছু বলার দরকার নেই, তোমার মুখই আমাকে সব কিছু বলে দিয়েছে। বল ও এখন কোথায়?

নীলিমা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, শহর থেকে প্রায় আট-দশ মাইল দূরে এক প্রাচীন ঘাটের চিতায় আছে।

কাকিমার চোখের শোকার্ত মণি ক্ষণিকের জন্য কেঁপে উঠল। তারপর আবার থেমে গেল। সিঁড়ির জানলা তিনি জোরে চেপে ধরলেন।

খোকন জিজ্ঞেস করল, মা কোথায়?

নীলিমা বলল, মা আসবে না।

খোকন জিজ্ঞেস করল, মা কেন আসবে না?

নীলিমা বেশ কষ্টে বলল, মা অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

কাকিমা কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুমি কোথায় বিশ্বকবি? তুমি ছোট্ট চাঁদের কবিতা লিখেছিলে, সে কবিতায় বাচ্চা হারিয়ে যায়, আর মা তাকে জুঁই ফুলের মধ্যে খোঁজ করে। আজ কলকাতায় মা-রাই জুঁই ফুল হয়ে গিয়েছে। আর শিশুরা তাদের কলকাতার অলিতে গলিতে খুঁজে ফিরছে। বিশ্বকবি তুমি কোথায়? খোকন খুব আস্তে কাকিমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কাকিমা তুমি কাঁদছ কেন? আমি জানি মা কোথায় গিয়েছে?

--কোথায় গিয়েছে?

মা ইউ.জি. গিয়েছে। যেমন আমার বাবা ইউ.জি. গিয়েছে। আমিও একদিন বড় হয়ে ইউ.জি. যাব আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করব। কাকিমা কেঁদো না। নীলিমা তার চোখের জল না মুছেই খোকনের হাতে লতিকার কেনা বাঁশিটা দিল।

বাঁশি দেখে খোকনের মনে হল সে যেন তার মার হাসি হাসি মুখ দেখছে। আর ও যখন বাঁশি ঠোঁটে লাগাল তখন নীলিমার মনে হল লতিকা যেন তার মমতায় ভরপুর ঠোঁট দিয়ে তার আদরের সন্তানকে চুমু খাচ্ছে।

বাইরে ঝড়ের গর্জন হচ্ছিল।

ভেতরে খোকন বাঁশি বাজাচ্ছিল।

[২৭ এপ্রিল, ১৯৪৯ কলকাতায় কমিউনিষ্ট নারী সংগঠনের একটি মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালালে তিনজন নারী সংগঠক নিহত হন। এঁরা হলেন লতিকা সেন, প্রতিভা গঙ্গোপাধ্যায় এবং অমিয়া দত্ত। গুলিচালনার ঘটনাটি ঘটে বৌবাজার অঞ্চলে। নারী সংগঠন 'পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' সেদিন ওই মিছিল বের করেছিলেন কমিউনিষ্ট বন্দীদের মুক্তির দাবিতে। ওই দিনটি অবলম্বনেই কৃষণ চন্দর লেখেন 'ব্রহ্মপুত্র' গল্পটি। কনক মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে গল্পটি বাংলায় প্রকাশিত হয় 'মুখপত্র' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৫৯ সংখ্যায়। পরে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি প্রকাশিত 'সাতাশে এপ্রিল' (১৯৪৯) সংকলনেও গল্পটি অন্তর্ভুক্ত হয়] —সম্পাদক এবং জলার্ক।

হিন্দী থেকে অনুবাদ ঃ স্বপন দাসাধিকারী

আলি সর্দার জাফরি

কৃষণ চন্দরকে মনে রেখে

একথা বলো না
নেই আর সেই মিতা
ভালবাসবার দুঃখ লেখার
চলে গেছে রচয়িতা

সব হারাদের হারানো আশার
মনের কামনা জাগে
মহত্তর এ মানবজীবন
মালি শুধু নেই বাগে

আগুনের মতো দাউ দাউ জ্বলে
আলো হয়ে গেলে নিজে
বিদ্যুৎ ঝলে বাগানে আজকে
মালি শুধু নেই বাগে

কোনদিকে আজ মিছিল চলেছে
হরফের রাশি চেহারার মতো জাগে
কালো জঙ্গল, মিছিল চলেছে
নেতা শুধু নেই আগে।

হিন্দী থেকে অনুবাদ : সতীশ মণ্ডল

খাজা আহমেদ আব্বাস
কৃষণ চন্দর

কৃষণ চন্দর আমার অন্তরঙ্গ সঙ্গী, আমার বন্ধু? আচ্ছা বিপদে পড়া গেল টেকোটাকে নিয়ে (আমি অবশ্য ওর চেয়ে বেশী টেকো)। যখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল না, তাঁর নামটা দেখেই আমার মেজাজ বিগড়ে যেত। প্রথমত এই জন্য যে, ওর নামের সাথে ওর ডিগ্রীর একটা লেজুড় যোগ করা ছিল—কৃষণ চন্দর এম.এ.। আরে এটা কোন কথা হল? (আমি মনে মনে ভাবলাম) তুমি এম.এ. হয়েছ তাতে আমাদের কি আসে যায়? কালিদাস কখনও বিদ্যালঙ্কার হওয়ার দাবি করেনি। আর কেউ যদি বলে 'আর্মস্ এ্যান্ড দি ম্যান' নাটক বার্নাড শ বি.এ. লিখেছিল তাহলে সবাই কি না হেসে পারবে? তাই বলি কৃষণ চন্দর এম.এ. এটা আবার কোন আপদ?

তারপর একদিন দিল্লীর পুরনো রেডিও ষ্টেশনে এই আপদটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এবং আমি স্বীকার না করে পারলাম না যে আপদটি অত্যন্ত সুদর্শন। এর আগে অবশ্য কৃষণ চন্দরের ফটো পত্রিকায় ছাপা দেখেছিলাম—বড় বড় উজ্জ্বল চোখ, উঁচু মাথা, কালো, ঘন, কোঁকড়া চুল। কোট-প্যান্ট-টাই পরা অবস্থায় বেশ স্মার্ট লাগছিল। সেইজন্য কলেজের মেয়েরা ওর গল্প পড়ে ওর প্রেমে পড়ে যেত। আমি দেখলাম ওর প্রতি আমার ঈর্ষা আরও বেড়ে যাচ্ছিল। তখন আমি মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম যে, ওর ছবিটা নিশ্চয়ই ফটোগ্রাফারকে দিয়ে 'রিটাচ্' করানো হয়েছে। কেননা এটা কি করে সম্ভব যে এত সুন্দর ও রোমান্টিক গল্প যে লোকটি লেখে তার চেহারাও এত সুন্দর ও রোমান্টিক হবে!

তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। সত্যিই লোকটা এত সুন্দর দেখতে যে আমার ঈর্ষার মাত্রা বেড়ে গেল। হে ভগবান! এটা কেমন বিচার, একজন লোকের চেহারা এত সুন্দর হয় এবং তাঁর লেখায় এমন মোহিনী শক্তি থাকে যে পাঠক (পাঠকদের চেয়ে পাঠিকাদের সংখ্যা বেশী) শুধু তার গল্প পড়ে তার প্রেমে হাবুডুবু খায়। সেই সময় দিল্লীর রেডিও ষ্টেশন কাশ্মীরী গেটের বাইরে একটা ছোট বাংলো বাড়িতে ছিল। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। দিল্লীর ষ্টেশন ভাল রকম সাহিত্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল—কৃষণ চন্দর, সআদত হসন মন্টো, উপেন্দ্রনাথ আস্ক—এই তিন জন সেখানে কাজ করতেন। রেডিওর উর্দু পত্রিকা "আওয়াজ"-র সম্পাদক ছিলেন মজাজ। ফয়েজ আহমদ 'ফয়েজ' এবং চরাগ হসন "হসরত"—এই দুই শায়র-কবি মিলিটারী পোষাকে সেই সময় সেখানে প্রায়ই হাজির থাকতেন। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে আমি বুঝে গিয়াছিলাম যে এই সাহিত্যিক গোষ্ঠীর কেন্দ্রবিন্দু হলেন কৃষণ চন্দর এম. এ.। রসসিক্ত উজ্জ্বল চোখের অধিকারী কৃষণ চন্দরকে চেহারা আকৃতিতে তাঁর রোমান্টিক গল্পের

হীরো মনে হত। তাঁর সঙ্গে করমর্দন করার সময় এক নজরে আমার ও তাঁর উচ্চতার জরিপ করে নিলাম এবং এই ভেবে একটু স্বস্তি পেলাম যে তিনিও আমার মত বেঁটে, মুৎস্নবী ফরিদাবাদী বা রাহুল সাংকৃত্যায়নের মত লম্বা-চওড়া পালোয়ান নন।

আর এর মধ্যে দেখতে দেখতে পঁচিশটি বছর গড়িয়ে গেল। কৃষণ চন্দরের সেই ঘনকৃষ্ণ উজ্জ্বল চুল তাঁর মাথা থেকে আস্তে আস্তে কোথায় উবে গেল, রয়ে গেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দু'এক গুচ্ছ বিরল কেশ। চশমার মোটা কাঁচের আড়ালে তাঁর চোখ দুটি পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত এই দুনিয়ার আলো-আঁধারের খেলা দেখতে দেখতে ভিতরে ঢুকে গেছে।

আর সেই সংবেদনশীল, সদাহাস্যময় মুখের উপর চিন্তা-ভাবনা, হয়রানি গভীর বলিরেখা টেনে দিয়েছে। কিন্তু তবু এখনও আমার ঈর্ষায় এতটুকু ভাঁটা পড়েনি। ভিতরের দাহটা রয়ে গেছে। কেন? কারন, পঞ্চাশ বছর বয়সেও তাঁর কলমের মোহিনীশক্তি এতটুকু খর্ব হয়নি, সেটা আগের মত রয়ে গেছে। আজও তাঁর গল্প ও বই পড়ে কলেজের মেয়েরা না দেখেই তাঁকে ভালবেসে ফেলে এবং এটা শুধু আমাদের দেশে নয়, অন্যান্য দেশেও!

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমি এবং জাফরী দুই জনে মস্কোতে ছিলাম। সেখান থেকে আমরা কৃষণ চন্দরকে চিঠির পর চিঠি টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছিলাম, "এখানে কোনভাবে চলে আসুন, আমাদের ত্রিভুজটা সম্পূর্ণ হয়ে যাক্।" মস্কো ইউনিভার্সিটির এশিয়ান ল্যাংগুয়েজের কলেজ আমাদেরকে আমন্ত্রন জানিয়েছিল উর্দু সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য। কমবেশী শত খানেক যুবক-যুবতীরা যারা আমাদের বক্তব্য শুনতে এসেছিল তারা সবাই উর্দু বা হিন্দী নিয়ে পড়াশুনা করছিল। আমার ভাষণ শেষ হলে তারা আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করল। মেয়েরাই বেশীর ভাগ প্রশ্ন করছিল এবং তাদের বেশীর ভাগ প্রশ্ন ছিল কৃষণ চন্দর সম্পর্কে। তাঁর সমস্ত বইগুলি তারা পড়ে ফেলেছিল। তাঁর প্রতিটি কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর নাম মুখস্থ ছিল এবং যেভাবে তারা ওঁর সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করছিল তাতে নিঃসন্দেহভাবে বলা যায় যে উনি তাদের অন্যতম প্রিয় ভারতীয় লেখক। মেয়েরা তাঁর সম্বন্ধে সব কিছু জানতে চায়। তাঁর সম্প্রতি কোন বই প্রকাশিত হয়েছে? ইদানিং তিনি কি লিখছেন? ওঁর বিয়ে হয়েছে কিনা? ওঁর কয়টি ছেলেমেয়ে? এই সব প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে আমি পুড়ে ছাই হয়ে গেলাম।

একদিন আমরা মস্কোর এক লাইব্রেরীতে গেলাম, রিডিং রুমে বসে একটি তরুনী (সে কোন কারখানায় কাজ করত) কৃষণ চন্দরের বই পড়ছিল। সরদার জাফরী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কমরেড, তুমি কি এই লেখককে পছন্দ কর?" রাশিয়ান মেয়েটি সাগ্রহে জবাব দিল, "খুব পছন্দ।" আশেপাশের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীরা তাকে সমর্থন করল।

সরদার জাফরী একটু মজা করার জন্য সেই মেয়েদের বললেন, আমার কিন্তু কৃষণ চন্দরের গল্প তেমন পছন্দ না। লেখাটা ভাল, কিন্তু ওর দৃষ্টিকোনটা নিতান্ত রোমান্টিক।"

"সেইজন্যই তো আমাদের উনি পছন্দ"—একটা ছেলে ও একটি মেয়ে সমস্বরে বলল।

জাফরী আলোচনাটা জমানোর জন্য কৃষণ চন্দরের "ফুল মুর্খ হ্যায়" গল্পটির নাম করলেন। "আমার তো মনে হয় এই গল্পে ভারতীয় শ্রমিকদের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়নি।"

একজন তরুন শ্রমিক জবাব দিল, "আপনাব হিসাবে ভারতীয় শ্রমিকের বাহ্যিক রূপ যদি তাতে প্রতিফলিত না হয় তাহলে তা মানা যেতে পারে কিন্তু আমার মতে ঐ গল্পে একজন শ্রমিকের আত্মা, তার অন্তর বেদনার সত্যিকার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।"

আর এটা শুনে একটি মেয়ে কৃষণ চন্দরের একটি গল্প উদাহরণ হিসাবে পেশ করল—"পুরে চাঁদ কী রাত।" এটা কৃষণ চন্দরের একটা সুন্দর গল্প, যেখানে কোন রকম সামাজিক বা বর্ণসংঘর্ষের ছিঁটেফোটাও নেই। ভারতের কয়েকজন গোঁড়া রক্ষণশীল কমরেড কৃষণ চন্দরের গল্পগুলি পড়ে ওর গায়ে রোমান্টিক বুর্জোয়ার লেবেল সেঁটে দিলেন। কিন্তু সেই মেয়েটি বলল, "কি সুন্দর এই গল্পটি! আমি মনে করি এই গল্পে ভারতের সব সৌন্দর্যের ঠাস বুনন রয়েছে। কাশ্মীর উপত্যকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়া ভারতের জনগনের প্রেমপুরিত হৃদয়ের আন্তর মাধুর্য এতে বর্ণিত হয়েছে। এমন কাহিনী তিনিই লিখতে পারেন যিনি শুধু সৌন্দর্যকে নয় জীবনকেও ভালবাসেন। এই কাহিনীর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে কৃষণ চন্দর বাস্তবে একজন কবি যদিও তিনি কবিতা লেখেন না।

কৃষণ চন্দরের ছোটবেলা কাশ্মীরে কেটেছে এবং তাঁর গল্পে কাশ্মীরের সৌন্দর্যের গভীর ছাপ রয়েছে। কাশ্মীরের জীবনকাল তাঁকে গল্পগুলির জন্য শুধু বিষয়বস্তু দিয়েছে তা নয়, তাঁর নিজস্ব সাহিত্যিক ষ্টাইলের মধ্যে কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিরদিনের জন্য আবদ্ধ হয়ে আছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কাশ্মীর ও কাশ্মীরের স্মৃতি তাঁকে অনেক গল্পের জন্য অনুপ্রানিত করেছে। তবে কাশ্মীরের সৌন্দর্য ছাড়া যেটা ওঁকে গল্পলেখকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সাহায্য করেছে—সেটা হলো একটা অসুখ। যার ফলে তাঁকে কয়েকটা মাস বিছানায় পড়ে একটা ঘরে কয়েদ হয়ে থাকতে হয়েছিল। এমন নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিজেকে নিজের বন্ধু হতে হল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুর্বলতাবশত চোখ বন্ধ করে ঘন্টার পর ঘন্টা ভাবতে থাকতেন। নিজের সম্বন্ধে, নিজের মায়ের সম্বন্ধে, কাশ্মীর সম্বন্ধে, জীবন ও মৃত্যুর বিষয়ে, কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিষয়ে এবং সেই সব দীন-হীন কাশ্মীরবাসীদের জীবনের বিষয়ে। ভারতের নোংরা, জীর্ণ পোষাক পরে, ভারি বোঝা পিঠে নিয়ে পাহাড়ি পথে ধুঁকে ধুঁকে চলছে মানুষের ঘর। এইভাবে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে সমস্ত দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট সে অন্তরে সন্নিবদ্ধ করে রেখেছিল।

কয়েক বছর আগে একবার আমি গুলমার্গ গিয়েছিলাম সেখানে একটা হোটেলে উঠলাম। ম্যানেজার বললেন যে, কৃষণ চন্দর এই হোটেলের একটা কামরায় থেকে তাঁর "শিকস্ত" উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করেছিলেন। আমি বললাম, "তাহলে সেই কামরাটি আমাকে দিন।" ঐ কামরায় দুটি জানালা ছিল। আমি একটা জানালা খুললাম। সামনে ব্যালকনি (এই বালকনির গল্পও তিনি লিখেছেন)। এই ব্যালকনি থেকে গুলমার্গের সবুজ উপত্যকা এবং খ্লািনমার্গের বরফে ঢাকা শিখরগুলির মনোহর দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু অন্যদিকের জানালা যখন খুললাম, দেখলাম এ দিকটা হোটেলের

পিছনের ভাগ, সেখানে ময়লা-আবর্জনা পড়ে আছে। পায়খানার স্তূপ, মাছিগুলি তার উপর ভন ভন করছে। হোটেলের মেথর বাবুদের কমোড পরিষ্কার করছে। হোটেলের বেয়ারারা ছোট ছোট অন্ধকার কুঠুরিগুলিতে থাকে। এই সব দেখে আমি অনুভব করলাম যে, এই দুটি জানালা কৃষণ চন্দরের কামরায় শুধু খোলেনি তার হৃদয় ও মস্তিষ্কেও খুলেছে। একটা জানালা দিয়ে তিনি প্রকৃতি ও জীবনের সৌন্দর্য দর্শন করেন এবং তাঁর কবিত্ববোধ উদ্বেলিত হয় এবং অন্য জানালা দিয়ে তিনি মানুষের পরিস্থিতি পর্য্যবেক্ষণ করেন। চারিদিকে বিস্তৃত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মধ্যেও মানুষ কত অসহায়, দরিদ্র, ঘৃন্য ও অসুস্থ জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে, তাঁর সংবেদনশীল মন দুঃখে নয় ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই দুটি জানালা দিয়ে দেখা দৃশ্যগুলির আন্তর্বিরোধ কৃষণ চন্দরের ব্যক্তিত্ব, শৈলী ও সাহিত্যশিল্পের জন্ম দিয়েছে।

কৃষণ চন্দর কয়েক শ' গল্প লিখেছেন---কাশ্মীরের স্নিগ্ধ উপত্যকা থেকে বোম্বাইয়ের নোংরা বস্তি এবং "মহালক্ষ্মীর পুল" পর্যন্ত তাঁর গল্পগুলি বিকীর্ণ হয়ে আছে। এমনকি যখন তিনি দুনিয়ার সব জিনিসের গল্প লিখে ফেললেন তখন তিনি "কহানী কী কহানী" নামেও একটা গল্প লিখলেন। কৃষণ চন্দরের মস্তিষ্ক এমন একটা অটোমেটিক মেশিন যে যার ধরা-ছোঁয়ার মধ্য এসে সব অনুভর্ব ও পর্যবেক্ষণ তার সর্বপ্রকার সুখ-দুঃখ, সব মিত্রতা শত্রুতা কোন না কোন গল্পের রূপ নেয়।

কৃষণ চন্দর অনেক গল্প লিখেছেন সত্য। কিন্তু তাঁকে নিয়ে গল্প কেউ লেখেনি। তবে এক দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে তাঁর প্রতিটি গল্প তাঁর নিজেকে নিয়ে লেখা গল্প। তিনি প্রতিটি গল্পে স্বয়ং জন্মগ্রহন করেন এবং যখন তিনি কোন মূখ্য চরিত্রকে মারেন, সেই সাথে উনিও মারা যান। তারপর আবার নতুন কাহিনীতে নতুনভাবে জন্ম নেন। নিত্য নতুন গল্প লেখাও একটা জন্মান্তর চক্র,...।

কৃষণ চন্দরের জীবন-কাহিনী কেউ লেখেনি, স্বয়ং উনিও লেখেননি (কিন্তু "ইয়াদোঁ কী চিনার" গল্পে তিনি নিজের বাল্যকালের কিছু ঝলক দেখিয়েছেন। তার থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, যেদিন উনি নিজের অতীত অভিজ্ঞতা লেখার সিদ্ধান্ত নিলেন সেদিন ওর জীবনের সবচেয়ে শুভদিন ছিল)। যারা কৃষণ চন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে তারা এই গল্পটি পড়ে না থাকলেও স্বচক্ষে দেখেছে অবশ্যই। প্রকৃতি ও সময় কৃষণ চন্দরের মুখে প্রতিটি বছরের গভীর বলিরেখা দিয়ে এই গল্পটি লিখে দিয়েছে। আমার ধারনা কৃষণ চন্দরের কলম দিয়ে যতগুলি গল্প পেরিয়েছে তার মধ্যে এটা সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ও মাধুর্যমন্ডিত এবং নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ।

কৃষণ চন্দরের বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। (উনি আমাকে নিশ্চয়ই গালাগালি দেবেন কেন আমি এই রহস্যটি ফাঁস করলাম)। নিজের আয়ুষ্কালে উনি খান ত্রিশেক বই লিখেছেন, সম্ভবত পাঁচশ'র মত গল্প লিখেছেন (অনেক বন্ধুরা অভিযোগ করে থাকেন যে উনি খুব বেশী লেখেন কিন্তু আমি ওঁর সাংসারিক বাধ্যতা সম্বন্ধে ভালমত ওয়াকিবহাল। যার ফলে নিজের ও পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কৃশনকে এত বেশী লিখতে হয়েছিল। তিনি শুধু ভারতে নয় পাকিস্তানেও অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর হিন্দী-উর্দু উপন্যাসের না জানি কতগুলি সংস্করণ ছাপা হয়েছে। কোন ফিল্মস্টারের চেয়ে তাঁর কাছে "ফ্যানমেল" বেশী আসে। সোভিয়েত ইউনিয়নে তাঁকে কেবল সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় ভারতীয় লেখক হিসাবে গন্য করা হয় না, বরঞ্চ তাঁর সাহিত্য

সম্বন্ধে ডক্টরেট্ ডিগ্রীর জন্য থিসিসও লেখা হচ্ছে। কিন্তু কৃশন এখনও পর্যন্ত "মহান লেখক" তো দূরের কথা, "বড় লেখক"ও হতে পারেননি। বড় হওয়ার অহংকার তাঁর মধ্যে একদম নেই। তিনি তাঁর গল্পগুলিকে সেইরকম ভালবাসেন যেমন মা তার সন্তানকে ভালবাসে। সন্তানের পরিচর্যা মা করে আর গল্পের আদর যত্ন করে তাঁর পাঠককুল। কৃষণ চন্দরের কাছে তাঁর গল্পের একটা প্রশংসাসূচক শব্দও শুনতে পাবেন না। তিনি তাঁর এ যাবৎ নিজস্ব কৃতিত্বের উপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন। এইজন্য তাঁর লেখা কোথাও থেমে থাকেনি এবং তাঁর শিল্প সৌন্দর্য আরও বেশী মুখর হয়ে উঠেছে।

কৃষণ চন্দর আমার অন্তরঙ্গ সঙ্গী আমার বন্ধু—নিতান্ত সাধারন মানুষ। আমার আপনার মত ছাপোষা মানুষ যাকে জীবনে অনেক ঝকমারি পোহাতে হয়েছে— কোন সময় সংবাদদাতা, কোন সময় সম্পাদক; আবার কখনও কলেজের মেয়েদের পড়িয়েছেন, রেডিওতে চাকরী করেছেন, ফিল্মের ডায়লগ লিখেছেন, ফিল্মের ডাইরেক্টর এবং প্রডিউসারও হয়েছেন। একদিকে তাঁর ফিল্ম কোম্পানী দেউলিয়া হয়েছে, অপর দিকে অন্য প্রডিউসারদের জন্য "হিট" সিনেমা লিখেছেন। দারিদ্র ও বেকার জীবনের আস্বাদ পেয়েছেন, বলা ভাল, তাকে ভালবাসতে শিখেছেন। প্রেমে পড়েছেন, বিয়েও করেছেন, ভেঙেছেন, জোড়াও লাগিয়েছেন, বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করেছেন, আবার শায়রদের মহফিলেও সময় নষ্ট করেছেন। তিনি প্রতিটি প্রগতিশীল প্রচেষ্টা এবং বিপ্লবের সঙ্গে আছেন কিন্তু কোন পার্টিতে যোগ দেননি। তিনি মত, ধর্ম, জাত-পাতের বন্ধন থেকে মুক্ত, সাম্রাজ্য ও সাম্প্রদায়িকতার শত্রু, গনতন্ত্র ও সমাজবাদের সমর্থক। তিনি একাধারে সব কিছু, এইজন্য তিনি আমার বন্ধু যাকে অন্তরঙ্গ সঙ্গী বলা যেতে পারে নতুবা "বন্ধু" হাটে-বাজারে অনেক কিনতে পাওয়া যায়।

আমার এই বন্ধুটি লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছেন, কিন্তু খরচ করেছেন তার চেয়ে বেশী; ফলে তিনি সব সময় ঋণজালে আবদ্ধ থাকতেন। তবু প্রতিটি প্রগতিবাদী বা সাহিত্যিক পত্রিকার জন্য বিনা মূল্যে গল্প লিখতে সম্মত হতেন। তাঁর নাকের হাড় বেড়ে যাওয়ায় সব সময় সর্দি কাশিতে ভুগতেন। একবার কিড্নীর প্রচণ্ড ব্যথায়ও কষ্ট পেয়েছেন। তাঁর চারিদিকে দুই ধরনের লোকেরা ভিড় করে থাকত—এক যারা তাঁর কাছে টাকা-পয়সা পেত এবং অন্য যারা তাঁর কাছে ধার নিত। যদি আপনার পকেট ফাঁকা থাকে তবে কৃষণ চন্দরের সঙ্গে অবশ্যই দেখা করুন, খুব সম্ভব, আপনার চাওয়ার আগে আপনাকে তিনি টাকা দিয়ে দেবেন। তবে যদি আপনার পকেট ভর্তি থাকে তাহলে অবশ্যই তাঁর থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। নতুবা আপনাকে জিজ্ঞাসা না করে উনি আপনার পকেট, গড়ের মাঠ করে দিতে পারেন। ওঁকে সব সময় সাদা শার্ট ও পশমী প্যান্টে দেখা যেত। সেই পকেটে কোন সময় দেড়-দু' টাকার বেশী থাকে না, কিন্তু যদি থাকে তবে সঙ্গে সঙ্গেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেড়াতে শুরু করবেন এবং কোন বন্ধুর বাড়িতে খেয়ে তাকে টাকা পয়সা দিয়ে আসবেন। সন্ধ্যায় পর্যন্ত তাঁর কাছে বাসভাড়া মাত্র অবশিষ্ট থাকবে। এটা ঘটেছে যে ঘরে খাওয়ার নেই কিন্তু গল্প লেখার জন্য সবচেয়ে ভাল কাগজের "রাইটিং প্যাড" দরকার, কম দামের কাগজে তাঁর কলম চলে না। যেমন নীল, মসৃন, মোটা কাগজ লোকেরা প্রেমপত্র লেখার জন্য ব্যবহার করে তেমন কাগজ ওঁর গল্প লেখার জন্য দরকার হয়। বাস্তবে ওঁর প্রতিটি গল্প একটা প্রেমপত্র যা তিনি তাঁর পাঠকদের উদ্দেশ্যে লেখেন।

টাইমটেবিলের নিয়ম মেনে কোন সময় তিনি কাজ করেননি। লিখতে শুরু করলে একদিন নয় একটা বৈঠকেই পুরো গল্পটা লিখে ফেলতেন, নতুবা পনের দিন ধরেও একটা আক্ষরের আঁচড় দিতেন না, কথা যা বলার বলিয়ে নিন, দুনিয়ার সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে রাজনীতি, সাহিত্য, সিনেমা, নাটক, রোমান্স, স্ক্যান্ডাল বা খোস মেজাজে ঘরোয়া আড্ডা...।

যদি তিনি নিজেকে বড় মাপের লোক মনে করতেন আমি তাঁর থেকে একশ' গজ দূরে থাকতাম,কিন্তু সত্যি বলতে কি তাঁর মধ্যে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না—একজন সহজ, সরল, সাধারণ মানুষ। তবে মানতেই হবে তাঁর মধ্যে একটা জিনিস ছিল—লোকটার কলমে সাংঘাতিক মোহিনী শক্তি, আর এটাই আমার ঈর্ষার কারণ।

আমার অন্তরঙ্গ সঙ্গী ও বন্ধু? আচ্ছা, বিপদে পড়া গেল...!

সুবিমল বসাক

কৃষণ চন্দর (ওরফে কৃষ্ণ চন্দ্র)

১৯৩৫-এ সূচনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা মানুষের মনে বিভীষিকা এনে দিয়েছে, সমান্তরালভাবে রুশবিপ্লব প্রেরণা জুগিয়েছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্বপ্ন দেখা শুরু। রাজনীতিই শুধু নয়, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিতেও ব্যাপক আন্দোলনের প্রস্তুতি নিযে, লণ্ডনে বসে মুলক রাজ আনন্দ, ডঃ মোহম্মদ দিন তাসির, সাজ্জাদ জহির এবং আরও কয়েকজন মিলে প্রতিষ্ঠা করলেন প্রগতিশীল লেখক সংঘ। সাজ্জাদ্ জহির ছিলেন দক্ষ কর্মী, উৎসাহে-তৎপরতায়, প্রগতি ভাবনা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভারতের নানান প্রান্তে দৌড়ঝাঁপ করে, আন্দোলনের স্বপক্ষে কবি-লেখকদের সমর্থন আদায় করলেন। ১৯৩৬ এপ্রিলে, প্রথম প্রগতিশীল লেখক সম্মেলন, অনুষ্ঠিত হয় লখনউয়ে। সভাপতি প্রেমচন্দ্। উপস্থিত হযেছেন বহু লেখক-কবি, যুক্ত হযেছে বহু নাম। অল ইণ্ডিয়া প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সাজ্জাদ জাহির, প্রথম মুখপত্র—নয়া আদব। উর্দুতে। মুখপত্রেই, সাহিত্যভাবনা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ভাবনা ছড়িয়ে দেয়া হয়। লেখা হবে জীবনের মৌলিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক অনগ্রসরতা, পরাধীনতা—এই সকল সমস্যাকে তুলে ধরা এবং তা থেকে উত্তরণ। এও স্পষ্ট করে দেয়া হয় কোন লেখা প্রতিক্রিযাশীল এবং কোনটা প্রগতিশীল। প্রতিক্রিয়াশীল এলিমেন্টস্ অবধারিতভাবে পরিত্যজ্য।

ক্রমশ এই প্রোগ্রেসিভ এসোসিযেশনে যুক্ত হন, পরবর্তীকালে জেগে ওঠা, রথী-মহারথীরা। ফযেজ আহমদ ফযেজ, হসরত মোহনি, দয়ানারায়ন নিগম, ইসমত চুগতাই, রাজিন্দার সিং বেদী, খাজা আহমদ আব্বাস, আলি সরদার জাফরি, উপিন্দার নাথ অশক, আহমেদ নাসিম কাদরি, মজাজ, কৃষণ চন্দর, জিলানি বানো, আরও পরে কুয়রতুল-এন-হায়দার কাইফি আজমি, আরো অনেকে। অনেকেই কম্যুনিষ্ট ছিলেন, কিন্তু লেখার ব্যাপারে তত্ত্বের কচকচিতে না গিয়ে শিল্পের দাবী মেনে শিল্প-সম্মতভাবে সৃষ্টি করে গেছেন কবিতা-কাহিনী। শিল্পের দাবী ব্যাপক ও সর্বকালীন। রচনায় পাওয়া যেতে থাকে জীবনের বহুমুখী প্রকাশ। ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ কম্যুনিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নিছক ইজম্-কেন্দ্র করে কবিতা সৃষ্টি করেন নি। তিনি সংগ্রামী ছিলেন, বিশ্বাস করতেন মানুষের সম্মিলিত সংগ্রামকে পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করতে, এবং সেই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে। এই প্রচেষ্টায় যুক্ত থাকা অত্যন্ত জরুরি, প্রচেষ্টার ফসল কবিতা, কাহিনী, গান, সঙ্গীত শিল্প ইত্যাদি. ইত্যাদি।

২

উর্দু ও গুরুমুখীতে সম্ভবত যুক্তাক্ষর বর্জিত লিপির প্রচলন আছে, তাই দেখা যায়—রাজেন্দ্র'র স্থলে রাজিন্দার, উপেন্দ্র-উপিন্দার, ভীষ্ম-ভীষম, মুল্ক-মুলক, কৃষ্ণচন্দ্র-কৃষণ চন্দর। সরদার আলী জাফরি তাঁকে 'করেসন' বলে ডাকতেন। উপেন্দ্রনাথ 'অশক্' অভিহিত করতেন কৃষ্ণ নামে। কৃষণ চন্দরের খ্যাতি তখন মধ্য গগনে, প্রায়শ তাঁর গল্প প্রকাশিত হচ্ছে পত্র-পত্রিকায়, গল্প গ্রন্থও বেশ কয়েকটি। গদ্দার, হাম ওয়াসী হ্যায়, জব

জন্ম খেত জাগে, বা শিকস্ত উপন্যাসের জনক, হঠাৎ হিন্দী পত্রিকায়, এমন কি সংকলনে 'কৃষণচন্দ্র' নাম প্রকাশিত হতে অনেকে বিস্মিত। পাঠকেরা দ্বিধাগ্রস্ত, কৃষণচন্দ্র নামে কি নতুন কোনো, পাকা হাতের রচনায় সমৃদ্ধ, লেখক জেগে উঠলেন। চিঠি-চাপাটি, টেলিফোন, মৌখিক জিজ্ঞাসাবাদের চোটে পত্রিকার পরিচালকবৃন্দ জানাতে বাধ্য হলেন—কৃষণচন্দ্র নামে নতুন কোন লেখক নয়, বরং কৃষণ চন্দরই বানানভেদে উপস্থিত। এটা ছিল তখন, ষাটের গোড়ার দিকে, যখন উৎকট হিন্দীপ্রেমীরা ঐতিহ্য পরম্পরা জলাঞ্জলি দিয়ে মেতে উঠেছিলেন রোয়াব জমাতে। পাকিস্তানেও তাঁর অসংখ্য গুণগ্রাহী পাঠক-পাঠিকা ছিলেন। মস্কো য়ুনিভার্সিটির এশিয়ান লাঙ্গুয়েজ সেক্‌শানে বসে সরদার জাফরী কৃষণ চন্দরকে চিঠির পর চিঠি, টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন—শীগগীর চলে এসো। এখানে পাঠক-পাঠিকাদের অতি প্রিয় লেখক—উর্দু সাহিত্যে—কৃষণ চন্দর বড় বেশী উচ্চকিত। জাফরী পাঠক-পাঠিকাদের যাচাই করছিলেন নানান প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার মাধ্যমে।

'পুরে চাঁদ কী রাত'—কৃষণ চন্দরের এক সুন্দর গল্প, অথচ এতে কোন শ্রেণী সংগ্রামের ছিটে ফোঁটা নেই। ভারতে গোঁড়া মৌলবাদী ধরনের কমরেড-রা এই গল্প পাঠ করে, কৃষণ চন্দরকে রোমান্টিক বুর্জোয়া বলে ফতোয়া দিয়েছে। কৃষণ চন্দর এই ফোঁকর দালালিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি, পরবর্তীকালে রুশ-পাঠিকার বিশ্লেষণ—সুন্দর গল্প। এই গল্পে ভারতের সামগ্রিক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। শুধু যে কাশ্মীরের মন-মুগ্ধকারী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ধরা দিয়েছে তা নয়, বরং এই গল্পে বড় বেশী আক্রান্ত ভারতবাসীদের প্রেমময় হৃদয়ের আন্তরিক সৌন্দর্য। এমন গল্প তিনি সৃষ্টি করতে পারেন,যিনি শুধু সৌন্দর্য নয়, বরং জীবনকে গভীরভাবে ভালবাসেন।

৩

বিস্মিত হতে হয়, যখন দেখি প্রগতিশীল লেখক সংঘে প্রথমার্দ্ধে উর্দু লেখক-কবিদের ভিড়। এবং তা, উত্তরভারত অঞ্চলে। বাংলায় ফ্যাসী-বিরোধী মঞ্চে—এই সকল উর্দু লেখকদের কাছাকাছি পান। প্রগতিশীল লেখক সংঘের সুবাদে বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে এই সকল নাম বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। তখনও আমরা দক্ষিণ ভারতের সাহিত্যিক কবিদের সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল নই। হিন্দী বা উড়িয়া সাহিত্য সম্পর্কেও ছিল কম-বেশী একই ধারনা।

এই সব উর্দু সাহিত্যিকদের সর্বশেষ ঘাঁটি বোম্বাই। অনেকেই লাহোরের বাসিন্দা ছিলেন, দেশ ভাঙার পর ভারতে এসে লখনউ, দিল্লী বোম্বেতে মাটি খুঁজে পান। বোম্বেতে থাকার একটা জবরদস্ত কারন ছিল, চাকরী পেয়ে আর্থিক অনটনের সুরাহা করা। ফিল্মের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন অনেকে, পেশাদারী কাজে লিপ্ত, চিত্রনাট্য রচনা, সংলাপ, চলচ্চিত্র পরিচালনা, ইত্যাদি নানান বিভাগে কাজ করেছেন। কৃষণ চন্দর গল্প লিখেছেন প্রচুর, কাশ্মীরের সুন্দর এলাকা থেকে বোম্বাইয়ের নোংরা বস্তি—সর্বত্র তার যাতায়াত ছিল।

কৃষণ চন্দর ছাড়া চলচ্চিত্র জগতে যুক্ত ছিলেন ইসমত চুগতাই, রাজিন্দার সিং বেদী, শহাদত হসন মন্টো (কেন যে বাঙ্গালীরা তাঁকে সদাত হাসান মান্টো বলে অভিহিত করেন, কে জানে?) খ্বাজা আহমদ অব্বাস ও আরো অনেকে। পরে, প্রগতিশীল সংঘের সঙ্গে তাঁদের মানসিক দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে, তাঁরা ক্রমশ সরে আসেন।

কট্টর তাত্ত্বিক নেতাদের মনে হয়েছিল, তাঁরা বুর্জোয়া হয়ে উঠেছেন, জীবন-যাপন, লেখা, দৃষ্টিভঙ্গি---ইত্যাদি প্রগতির বৃত্তের বাইরে।

অথচ, এরা অনেকেই নানান বিধি নিষেধ উপেক্ষা করেছেন সহজভাবে। কৃষণ চন্দর সকল প্রগতিশীল ও বিপ্লবীদের 'সঙ্গে' ছিলেন, অথচ কোনও পার্টি দলভুক্ত নন। ধর্ম, ধার্মিক অনুশাসণ, জাত-পাত ইত্যাদি বন্ধন থেকে মুক্ত। প্রেম করেছেন, বিয়ে করেছেন, আবার প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটেছে, বিয়েও ভেঙেছে। সলমা সিদ্দিকীকে বিবাহ করেছেন। সাম্রাজ্য ও সম্প্রদায়বাদের জাগরুক শত্রু ছিলেন। মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর রচনায় মানুষের প্রতি ভালবাসাই মূখ্য হয়ে উঠেছে, তত্ত্বের কচকচানি বা রাজনৈতিক মতাদর্শ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি। মূলত শিল্পের শর্ত বজায় রেখে প্রতিবাদ বা ব্যঙ্গ-শ্লেষ উপস্থিত করেছেন। 'গদ্দার'—কৃষণ চন্দরের একটি শ্রেষ্ঠ, উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের অন্যতম, এবং অবশ্য পঠনীয়। পটভূমি ভারত দ্বিখণ্ডিত হবার ফলে দলে-দলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী চলে আসছে এপারে। এতদিনকার পরিচিত, প্রিয়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে একাত্ম, দেশ-গাঁ-পরিবেশ-মানুষজন চিরদিনের মত ত্যাগ করে আসছে লোকজন—কি ভয়াবহ অনুভূতি, বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা, রক্তক্ষয়ী জীবন, নরমেধের সার্কাস, প্রেমের ভগ্নস্তূপ, আর্তনাদ। সর্বস্ব হারানোর হাহাকার, অমানবিকতার ভয়ংকর পরিণতি—একেবারে খুঁতহীন ডকুমেন্টেশান। কৃষণ চন্দরকে, এই উপন্যাস সাহিত্যের স্থায়ী আসনে বসিয়ে দেয়। এরই সমগোত্রীয় ভীষম্ সাহনীর 'তমস' উপন্যাসটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। ভারত ভাগে, যে দুই প্রদেশের উপর সোজা-সাপটা খাঁড়া পড়েছিল, তার একটি পশ্চিম পাঞ্জাব-সিন্ধু প্রদেশ, অপরটি পূর্ববঙ্গ। পূর্ববঙ্গে ধর্ম, জাতি, নিয়ে রক্তের হোরি খেলা কম হয়নি, কিন্তু এ ধরনের ডকুমেন্টশনের লেখা খুব কম পাওয়া গেছে। অথচ, উর্দূ বা গুরুমূখীতে প্রচুর গল্পও রচিত হয়েছে। শহাদাত হসন মন্টো'র বহু গল্পে এর অনুরনন। রাজেন্দ্র যাদবের হিন্দিতে 'উখরে হুয়ে লোগ'— বাস্তুচ্যুত জনজীবনের দলিল।

'গদ্দার'—উর্দূ শব্দ : অর্থ অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন। বাংলায় যথার্থ প্রতিশব্দে সেই ভাব মূর্তি ফুটে ওঠে না, যা 'গদ্দারে' পাওয়া যায়। গদ্দারের আরেকটি অর্থ—দেশদ্রোহী। কৃষণ চন্দরের উপন্যাস 'গদ্দার' হলো দেশদ্রোহী, হ্যাঁ দেশদ্রোহী। রাজনীতি সচেতন ছিলেন বলেই, তাঁর কলম থেকে তেলেঙ্গানা বিপ্লব নিয়ে রচিত 'জব জব ক্ষেত জাগে' যা থেকে গৌতম ঘোষ 'মাভূমি' নামে একটি তেলুগু চলচ্চিত্র সৃষ্টি করেন। 'হাম ওয়াসী হ্যার'---তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। কিন্তু যে উপন্যাস নিয়ে প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের সঙ্গে মত-পার্থক্য ঘটল, তা হলো 'শিকস্ত'। শিকস্ত কাশ্মীর পটভূমিকায় রচিত, যেখানে তাঁর জীবনের অনেকটা বছর কেটেছে, ঘুরে ফিরে উঠে এসেছে কাশ্মীর। কাশ্মীরের মন-মাতানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে, নিজের সময়কে ধরে রেখেছেন। কাশ্মীরের গুলমার্গে অবস্থিত একটি হোটেলে, যার একটা জানালা পথে কাশ্মীরের অপূর্ব প্রকৃতি, বরফাচ্ছাদিত পাহাড়শীর্ষের সৌন্দর্য লক্ষিত হয়, অপর জানালা পথ হোটেলের পেছন দিকে যেখানে ময়লা আবর্জনার স্তূপ, ভন ভন মাছির অবস্থান, হোটেলের মেথর-মেথরানীরা কমোড পরিষ্কারে ব্যস্ত, পাশাপাশি ছোটছোট নোংরা-অন্ধকার ঘুপচি ঘরে বেয়ারাদের থাকার জায়গা—কৃষণ চন্দর শিকস্ত উপন্যাস সৃষ্টি করেন। 'এক গদহে কী আত্মকথা'—বোম্বাইয়ের

পটভূমিতে, গাধার মুখ বোম্বাইয়ের পশ এলাকা থেকে ভারাবি পর্যন্ত বিস্তৃত। গল্প লিখেছেন শতাধিক সিরিয়াস, সিরিও কমিক, ব্যঙ্গাত্মক, শ্লেষ-মিশ্রিত। একটি গল্পে বিশাল পার্টির অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় করাচ্ছেন এভাবে—ইনি হলেন অমুক অয়েল মিলের মালিক, কোটিপতি, স্পর্ধা কি আপনি এঁকে 'তেলী' বলবেন; উনি হলেন মডেল গার্ল, বেবুশ্যে বললে আপনাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে; উনি হলেন কাপড়ের মিল ওনার, তাঁতি বলা যাবে না তাকে, হেয়ার ড্রেসারকে নাপিত বলার সাহস নেই আপনার। মিলিওনীয়র, মাল্‌টি মিলিওনীয়র, বিলিওনীয়ার—ওদের সামাজিক মর্যাদাও পালটে যায়।

৪

'৬৪-র গোড়ার দিকে। জনৈক সম্পাদক জানালেন, কলকাতায় কৃষণ চন্দর এসেছেন। তাঁর পত্রিকার জন্য লেখার তাগাদা ; আমার প্রয়োজন ছিল তাঁর অনুমতির, কয়েক সংখ্যা আগে প্রকাশিত একটি গল্পের অনুবাদ শেষ করেছি। পত্রিকায় প্রকাশের পূর্বে লেখকের সম্মতির প্রয়োজন। সবে হাংরি জেনারেশনের বুলেটিন বার হচ্ছে, ইতঃস্তত ছড়িয়ে পড়েছে তার খবর। গ্রান্ড হোটেলের একটি স্যুটে তিনি, কৃষণ চন্দর, উঠেছিলেন, এসেছেন ফিল্মে সংলাপ লেখার ব্যাপারে।

গিয়ে দেখি শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং উৎপল কুমার বসু। কৃষণ চন্দর সর্দি কাসিতে সামান্য কাবু হওয়াব ফলে বিছানায় আধশোযা। সেই অবস্থায় আলোচনা, বরং বলা চলে আড্ডা চলছে, আড্ডাব হাংরি জেনারেশনেব কথা উঠলো, বাংলা জানেন না তিনি, উৎপল কুমার বসু ২/১টা কবিতা ও লেখা মৌখিক তর্জমা করে বুঝতে সহযোগিতা করলেন। কৃষণ চন্দরের অবশ্য ততদিনে প্রগতিশীল লেখক সংঘের সঙ্গে ক্ষীণ যোগাযোগ। ফিল্মের জন্য সংলাপ, কাহিনী নিয়েই মেতে আছেন এবং গল্প। অতিপ্রজ গল্প লেখক হিসেবেও সুনাম অর্জন করেছিলেন।

পরনে ছিল কালো প্যান্ট, সাদা শার্ট। ছোটখাটো, বিরল কেশ, এবং নাকের পাটা ছিল সামান্য চওড়া। সর্দির ধাত।

আপ্যায়ণের ত্রুটি ছিল না বিন্দুমাত্র, এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায় যথারীতি টেনশন মুক্ত, স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনালেন। ঘন্টা দুই-আড়াই আমরা কাটিয়েছিলাম এই লেখকের সাহচর্যে। নিজের লেখা, উপন্যাস সম্পর্কে উচ্ছ্বাস নয়, ৬২তে চীন ভারতের যুদ্ধের পটভূমিকায় খ্বাজা আহমদ আব্বাসের গল্প, 'লহু পুকারেগা'র উল্লেখ করছিলেন বার বার। কৃষণ চন্দবেব স্মৃতি বলতে এই একটা প্রাক্‌রাত্রির সঙ্গ, সেই সঙ্গে আনন্দ।

দীননাথ সেন

কৃষণ চন্দের জিনপরী দত্যিদানো

মোগলের বলবান অশ্ব কিংবা তীক্ষ্ণধার তরবারির রাজনীতি না এলেও এদেশে এসে যেত হাফেজ-ওমর খৈয়াম-আরব্য রজনী-গজল গান মোল্লা নাসিরুদ্দিন। কেননা কলমের ডগা দ্রুততম অশ্বের চেয়েও চিরকাল দ্রুতগামী, কেননা তীক্ষ্ণ তরবারির চেয়ে গল্প অনেক অনায়াসে দেশ জয়ে সক্ষম। কাজেই সেই সব গল্প কাহিনী বাতাসের বেগে উড়ে এল এবং জুড়ে বসল আমাদের সাহিত্যিক সাধ আহ্লাদের অন্নব্যঞ্জনে। মরু প্রান্তরের বেদুইন জীবনের গতির এই ঠিকানা পেয়ে উল্লসিত হল আমাদের লেখক ও পাঠক। খেত খামার ফল ফসল গৃহসুখ নিয়ে তৃপ্ত সীমাবদ্ধ আমাদের লোকজীবন কখনো বা নিজেকে ছড়িয়ে দেবার জন্য রূপকথা লোককথা বনিয়েছে। শব্দকে তালে লয়ে বেঁধে কখনো বা বানিয়েছে ছড়া। সমাজের একতলার সাহিত্য এরকমই ছিল।

সাহিত্যের দোতলায় রাজারাজড়াদের সভা। সেখানে পণ্ডিত ওস্তাদদের কাব্য চর্চা, সঙ্গীত সাধনার রাজকীয় আয়োজন। প্রধানত সংস্কৃত ভাষায় চর্চিত সাহিত্য-ব্যাকরণ-দর্শন-কাব্য-মহাকাব্য। সাহিত্য চর্চা শাস্ত্রচর্চার সামিল। সমাজের উলুখাগড়াদের জীবনে তার স্পর্শ লাগে না। এ রাজা যায়, ও রাজা আসে। দোতলায় কিছু এদিক ওদিক হলেও একতলায় বদল হয় না।

মোগল আমল যখন এল, সমাজে ও সংস্কৃতিতে অনেক ঢেউও এল। মানুষের মনলোক নিজের নিয়মেই নিজেকে যখন ভাঙতে ও গড়তে থাকল তখন তার প্রতিবিম্বও চিত্রিত হতে থাকল রূপে রসে। উপমা রূপকে সব সাহিত্য নিজের সঙ্গে মিল খুঁজে বেড়ায়। এই প্রক্রিয়ায় এক সময় রূপকথার বন্দিনী রাজকন্যা উদ্ধারের সঙ্গে সমান রোমাঞ্চকর মনে হতে থাকে আলাদিনের দৈত্য, আলিবাবার ডাকাত হত্যা, আলিফ লায়লার দুঃসাহস।

আমরা এরকম প্রত্যেকটি কল্পকাহিনীর গোড়ায় সমাজবাস্তবতার অনেক শেকড় বাকড়ের সন্ধান পাবো। নির্যাতিত নারীর অন্তর্বেদনা, পুরুষের প্রভুত্ববিলাস, বিত্ত ও বিত্তহীনতার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক উপাদান দিয়ে নির্মিত বলেই বাংলার গ্রাম ও আরবের মহল্লার মধ্যে সেতুবন্ধনের সময় লাগেনি। আমরা তার সবিস্তার বিশ্লেষণে যাবো না। আমরা কেবল বুঝতে চাই যে ফার্সি ও উর্দু সাহিত্যের বীজ এদেশে সযত্নে অঙ্কুরিত ও সাগ্রহে পল্লবিত হবার অবকাশ পেয়েছিল। গজল গানের ব্যাকুল আর্তি ভারতীয় সঙ্গীতকে অনন্য আবেগে শুধু প্লাবিত করল তা নয়, উর্দু ভাষা এদেশের সাহিত্যে ফোটাল জীবনের রক্তগোলাপ। কাঁটায় আহত কিন্তু জীবনাবেগে দীপ্ত যে মানুষ তার শিল্পরূপকে সম্ভব করে তুললেন পারঙ্গম সাহিত্যিকবৃন্দ। দেখা গেল সাদাৎ হোসেন মিন্টো, খাজা আহমদ আব্বাস, প্রেমচন্দ, সর্দার জাফরি ভারতীয় সাহিত্যে নতুন আলো হাওয়া নিয়ে এলেন। অনড় ঐতিহ্য ও সংস্কারের গোড়ায় ঘা বসালেন। সাহিত্যকে দাঁড় করিয়ে দিলেন কান্না ঘাম রক্তে ভেজা ভারতবর্ষের মুখোমুখি। সমাজে সুখ দুঃখের যে চাপা দোলাচল থাকে তার জায়গায় এঁরা এনে দিলেন সরাসরি রাজনৈতিক দর্শন ও সমাজ বাস্তবতা। এবং সারা দুনিয়ার যে অবিসংবাদী মানবিক

শক্তি সমাজতন্ত্র, তার আলোয় উদ্ভাসিত করলেন মানুষ ও তার সমাজকে। উর্দু সাহিত্যকে সহস্র ধন্যবাদ, সাহিত্যকে সে রণসজ্জায় সজ্জিত করে দিল। সজ্জাদ জহীর, মজীহ্ আবাদী, সাগির নিজামী, হফেজ় জলন্ধরী, আহমদ আলী, রশিদ জাহান প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ বুঝিয়ে দিলেন কেন পরাধীন দেশের মানুষের মতো পরাধীন দেশের সাহিত্যকেও সশস্ত্র সংগ্রামে নামতে হয়। প্রতারণা ও বঞ্চনার বেশে, বদমায়েসি ও দাসত্বের বেশে যে শত্রুরা সামনের ও পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, তাদের চিনতে যেমন চোখ লাগে, তাদের মোকাবেলা করতেও লাগে শব্দের বল্লম, অভ্রান্ত লক্ষ্য এবং মরিয়া তাগিদ। আমরা উর্দু সাহিত্যের (এবং হিন্দি সাহিত্যেরও) মহান কলাকার প্রেমচন্দের মুখে শুনি—

(১) যে নিপীড়িত, বঞ্চিত, পদদলিত—সে ব্যক্তিই হোক বা সমষ্টিই হোক—তার পক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলা তাঁর দায়িত্ব।

(২) এটা অবশ্য অবধারিত যে মহাজনী সভ্যতা আর তার স্তাবকেরা নিজেদের সমস্ত শক্তি দিয়ে এই নবীন সমাজ ব্যবস্থার বিরোধিতা করবে, এর সম্বন্ধে নানা মিথ্যা প্রচার চালিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবে, তাদের চোখে ধুলো দেবে, কিন্তু যা সত্য একদিন তার জয় হবেই।

আল্লাম ইকবালকে বলতে শুনি—

জীবন রহস্য যদি তুমি খোঁজ
পাবে না তা সংগ্রাম ছাড়া কোনোখানে।
একি লজ্জা! নদী বিশ্রাম নেয় সাগরের কোলে।

প্রেমচন্দ ১৯৩৬ সালে প্রগতিশীল লেখক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছেন। তখনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে নি, ফ্যাসিবাদের নখদন্তের হিংস্র আঁচড় তিনি দেখেন নি। কিন্তু এই কলমকা সিপাহী বুঝে নিয়েছেন মানুষের মৌলিক দুটি ভাগ। বুঝে নিয়েছেন প্রভুত্বের পদাঘাতকে প্রতিহত করার জন্য চাই যথেষ্ট প্রস্তুতি। নয়ত তিনি বলতে পারতেন না—

'যারা অর্থলোভী, সাহিত্যের মন্দিরে তাদের স্থান নেই। এখানে শুধুমাত্র সেই সব ভক্তের ঠাঁই হবে যাঁরা জনসেবাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে বিশ্বাস করেন, যাঁরা হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করার ক্ষমতা রাখেন আর প্রকৃত ভালোবাসার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠতে পারেন।

আমরাই অগ্রনী সৈনিক; আমরাই সমাজের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরি।' তিনি যতটা এগোলেন, উত্তরসূরী কৃষণ চন্দের উপর পড়ল আরও হাজার কদম এগিয়ে যাবার ভার। কৃষণ চন্দর তাঁর অকম্পিত পা বাড়ালেন তাঁর জীবনের পথে ও সাহিত্যের পথে।

ঠিক জায়গাটি খুঁজে নিতে দেরি হল না তাঁর। তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে নানা বিষয় জানার জন্য যোগাজনের নিবন্ধাবলী আছে। আমরা কেবল সেইটুকু উল্লেখ করব যেটুকু আমাদের আলোচনার পরিপুষ্টির জন্য দরকার।

২

পরাধীন ভারতে এই সাহিত্যিকের জন্ম। মৃত্যু কিন্তু স্বাধীন ভারতে। জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর বৃটিশ শাসনের বিস্বাদে ভরা, পরের পঁচিশ বছরেও মৌলিক তফাৎ কিছু

পান নি স্বাধীনতার স্বাদে। এ বিষয়ে বারো আনা ভারতবাসীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল আছে। বাকি অংশ অবশ্য পেয়েছেন স্বাধীনতার সার অংশ। একেবারে লাট বড়লাট থেকে মিনিস্টার ডিরেকটার ইস্তক ছোট বড় মাঝারিরা হামলে পড়েছিলেন বৃটিশ পরিত্যক্ত ভারতের উপর, ভাগাড়ে শকুন যেমন পড়ে। গান্ধীটুপি পরা, তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ওড়ানো, জনগণমন গাওয়ার উন্মাদনা থিতিয়ে গেলে দেখা গেল ভারত সত্যিই একটি অর্থনৈতিক ভাগাড়। হাতের হুঁকোটি নিয়ে সরে পড়েছে ইংরেজ। এখন ধোঁয়া শোঁকাতেই মনোনিবেশ করতে হচ্ছে। সাক্ষর শতকবা সতোরো, দারিদ্র্যসীমা লজ্জাজনক রেখায়। খিদে মেটাবার খাবারে টান। মাথা গোঁজার ঠাঁই এমনিতেই কম। তার উপর স্বাধীনতার খোঁজে উদ্বাস্তুদের নিজের দেশ ছেড়ে আসতে হল। একী স্বাধীনতা? ঘর থেকে উপড়ে এনে মানুষকে জড়ো করল রেলের প্ল্যাটফরমে, পথে ঘাটে, কবরে গোরস্থানে। নারীর ইজ্জত পুরুষের সম্ভ্রম নিয়ে শেয়াল শকুনে কাড়াকাড়ি। সদ্য স্বাধীন দেশ কোথায় খুশিতে ডগমগ হবে, তা না, মানব সভ্যতা সেদিন ভারতবাসীকে নিয়ে হাসাহাসি করছিল। (বস্তুত মানুষের সেই লাঞ্ছনা ও অপমানের নতুন নতুন উদ্বাস্তু অধ্যায় আকীর্ণ হয়ে উঠছে এশিয়া ও ইউরোপে আজও। কে সভ্য, কারা উন্নত? যারা মারছে তারা? নাকি যারা মরছে তারা? বিশ্বব্যাপী সাদা কালো সাকার নিরাকার কত ঈশ্বর ভগবানের ছড়াছড়ি। কেউ কিন্তু ঠেকাতে পারছে না গুণ্ডাব ছুরি কিংবা বৈজ্ঞানিকের বোমা)। কাঁদে পড়া বগা র মতো দশা ভারতমাতার। উঠগো ভারতলক্ষ্মী আদি জগজ্জনপূজ্যা---বলে গলা ফাটিয়ে গান গেয়েও দাঁড় করানো যাচ্ছে না কোমর ভাঙা রুক্ষকেশী ভারতমাতাকে।

ভারতসভ্যতার এই সংকটকে কাছ থেকে দেখতে হয়েছে কৃপণ চন্দরকে। হাড়ে হাড়ে টের পেতে হয়েছে স্বাধীন ভারতের ত্রিমাত্রিক সমস্যাকে। এক, ধনীর শোষণ। দেখা যাচ্ছে ভারতের ধনীদের শোষণ প্রক্রিয়ায় মাথায় গান্ধীটুপি ও পরনে খদ্দর ছাড়া নতুন কিছু চোখে পড়ে না। দেশপ্রেমের পতাকা গলায় জড়িয়ে গরীব মারার রণকৌশল আরও আধুনিক হয়েছে মাত্র। দুই, ভারতকে মাতা টাতা বলে যতই ভক্তিগদগদ হোক, ভারতের গড়পড়তা নারী গোমাতার সম্মানটুকুও পাচ্ছে না। ভারত যেন ধনীর ও সবলের সহজলভ্য হারেম। নারীর শিক্ষা কম, খাবার কম, অধিকার কম, মজুরি কম। দু-একজন ইন্দিরা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বাদ দিলে বাদবাকি নারীরা শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী, অভাগী অথবা রবীন্দ্রনাথের নিরুপমা। লক্ষ্মীবাঈ প্রীতিলতা মাতঙ্গিনীর জীবন ও সংগ্রাম এখন শুধু মূর্তি নির্মাণে ও প্রবন্ধ রচনায় সীমাবদ্ধ রইল, মাঠে মারা গেল নারীর সম্মান ও শৌর্য অধিকারের লড়াই। তিন, ভারত কেমন করে হিন্দুর ভারত আর মুসলমানের ভারতে ভাগ হয়ে গেল সেটা ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই এক ভূখণ্ডে দুই পতাকা উড়তে লাগল, সীমার বেড়া বরাবর পাহারাদার বসানো হল। তারা লাঠি উঁচিয়ে বলতে লাগল---খবরদার এপারে এলে ঠ্যাং ভেঙে দেব। মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে এও দেখতে হল---হিন্দু আকাশ, ওটা মুসলিম সমুদ্র। এ মাটিতে ফলবে হিন্দু গম ও মাটিতে মুসলিম ধান। এসব প্রহসন যারা দেখছে তারা এও দেখছে যে একই ভিক্ষার চাল নিয়ে দুই ভিখারি দেশের কাড়াকাড়ি। কেননা ভারত পাকিস্তান দুদেশের হাত পাতা থাকে ধনী দেশের দান খয়রাতির জন্য। স্বাধীনতার খেলনা যার যখন ইচ্ছে ভাঙছে জুড়ছে। এসব এক তরফা

খেলাই শুধু চলছিল তা নয়। তাদের প্রতিপক্ষও তৈরী হয়ে যাচ্ছিল: তারা সমাজতন্ত্রের পতাকা পুঁততে মরিয়া। জেলগুলিকে জলভাত করে ফেলেছে। তাদের কথাবার্তা চলাফেরাতে মনে হচ্ছিল ভারতের অসম্পূর্ণ স্বাধীনতাকে তারাই সম্পূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর।

পরে পরে ভারতের আরো যে সমস্ত রাজ্য ভাঙাভাঙি, কোটি কোটি টাকা ও জাতীয় সম্পত্তির লুটপাট, মসজিদ ভেঙে মন্দির গড়ার ধর্মীয় কোন্দলে স্বর্গকেও ভাগাভাগির চেষ্টা চলছে কৃষণ চন্দরকে সে সব দেখতে হয় নি। কিন্তু তিনি যা দেখেছিলেন তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ গভীরতাও কম নয়। তিনি তাঁর গল্পে উপন্যাসে নাটকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন নিজেকে এবং নিজের পরিপার্শ্বকে। দেখা যাচ্ছে ৩২টি সংকলন গ্রন্থে কয়েকশ গল্প, ৪৬টি উপন্যাস, ১১টি নাটক এবং ১১টি শিশুকাহিনী লিখে উর্দু সাহিত্যের শরীর ও সমৃদ্ধি দুটোকেই তিনি যথাসম্ভব স্ফীত করেছেন। তাঁর নির্মিত প্রায় সব চরিত্রই বিক্ষুব্ধ সময়ের প্রতিবাদ ও প্রত্যাশার বহুমাত্রিক অবয়ব।

৩

কৃষণ চন্দরের যে মৌলিকতা সবাইকে মুগ্ধ করবে সেটা এই যে তিনি তাঁর প্রগতিশীল দর্শন থেকে তাঁর শিশুদের একপাও নড়তে দেননি।

তাঁর প্রথম দেখা শিশু বুঝি তিনি নিজে। তাঁর জীবনী ও আত্মজীবনীর পাতা ওল্টালেই শৈশবের অনেক উল্লেখযোগ্য হাতছানি দেখতে পাই। জীবনের পথে চলতে চলতে পেরিয়ে যান অনেক গর্ত আর ঢিবি, অনেক প্রসন্ন সকাল আর বিষণ্ণ বিকাল।

গোড়াতে কবুল করে রাখি আমাদের আলোচনার অবলম্বন জীলানি বানুর লেখা (জ্যোতিভূষণ চাকী অনূদিত) জীবনীগ্রন্থ এবং ভারত ও বাংলাদেশের প্রকাশিত অনূদিত গল্প সংকলনগুলি।

আগা গোড়া খোলা চোখ খোলা মনের মানুষ কৃষণ চন্দরের সাহিত্যচিন্তা তাঁর অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত জীবনদর্শনের ছায়া। লাহোর কলেজে পড়তে পড়তে সোস্যালিষ্ট পার্টির আদর্শে অনুপ্রাণিত এই লেখক জেল খাটলেন রাজনৈতিক কারণে। ক্রমে নিশ্চিত হয়ে গেলেন সমাজতন্ত্রের পথই মানবমুক্তির পথ। আর আদর্শবোধ তাঁর সাহিত্যে স্বরলিপি রচনা করে দিল। 'এখন সময় এসেছে, সমস্ত সাহিত্যিক খোলাখুলিভাবে সাম্যবাদের প্রোপাগাণ্ডা শুরু করে দিন। কারণ আমাদের সামনে দুটো রাস্তা—একটি অগ্রগামী গতিশীল সমাজবাদ আর একটি নীরব ও আদিম মৃত্যু।' এবং একথা বলতেও তাঁর গলা কাঁপে নি—'যুদ্ধের নিবৃত্তি বা প্রতিরোধ ততদিন সম্ভব হবে না—কোনো দিক দিয়েই সম্ভব হবে না, যতদিন দুনিয়ার ফ্যাসিস্ত ও ঔপনিবেশিকবাদ থাকবে এবং এমন সামাজিক মতবাদ কায়েম থাকবে যা একজন মানুষকে অন্য মানুষের দাসত্ব শৃংখলে বাঁধবে।' বলতে পেরেছিলেন তাঁর 'গদ্দার' গল্পে—'আর যে ঘাতক, তার মুখেও ঈশ্বরের নাম ছিল। যদি নিহত ও হত্যাকারীর উপরে বহু দূরে কোনো ঈশ্বর থেকে থাকেন তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে নিষ্ঠুর নিপীড়ক।' আমরা লক্ষ্য করছি আমৃত্যু কোথাও তিনি থামছেন না। স্বাধীনতা-উত্তরকালেও আর একজন কলমকা সিপাহীকে দেখা গেল সমস্ত সংস্কার এবং প্রতিক্রিয়াকে ঠেলে সরিয়ে কদম কদম বাড়িয়ে যেতে। অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণিত সেই ঘটনাটিই বলে দিচ্ছে, 'একজন ছুরিটা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের পকেটে রেখে দিল। কৃষণ চন্দর তাঁর ছুরিটা ফেরৎ চাইলে

সে তা ফেরৎ দিল না। ...পরে আমার (কৃষণ চন্দরের) মনে হল এরা এরকমই করে। সাদা বাঁটের ছুরি, কোনো সুন্দরী মেয়ে, সোনা ফলানো ধানের জমি—সব এইভাবে হাতিয়ে নেয়, ফিরিয়ে দেয় না। এইভাবে ওরা জায়গিরদারি চালু করে। কিন্তু কাজটা ভালো করেনি ওরা। দু আনার ছুরির জন্য ওরা আমাকে শত্রু বানাল। সেই সাদা বাঁটের ছুরি আজও আমার মনের মধ্যে আছে। এইভাবে আমি আজ পর্যন্ত যা লিখেছি ওই সাদা ছুরি ফিরিয়ে নেবার জন্য লিখেছি।'

আর এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে তাঁর শৈশব জীবন যা 'ইয়াঁদো কে চিনার' ('স্মরণের রামধনু' নামে অনূদিত) নাম দিয়ে লিখেছেন। বাবা ডাক্তার। বর্ণে ধর্মে ভেদ বিরোধের বিরোধী। মা কিন্তু আর পাঁচটা গৃহবধূর মতো ধর্মভীরু, জাতপাত মেনে চলেন।

কৃষণের শৈশবের সাথী 'নিচু' জাতের 'তারা', 'দেশা'। ওরা বাবার প্রিয় কিন্তু মায়ের অপছন্দ। তাই লুকিয়ে চুরিয়ে ওদের নিয়ে কৃষণ আনন্দের আলো ছায়ায় যথেচ্ছ ঘুরে বেড়িয়েছে। যা নতুন তারই আকর্ষণ টেনেছে তাকে। শৈশবের মূল্যবান দিনগুলোকে শিশু কৃষণ চন্দর দেখেছেন ক্যামেরার চোখ দিয়ে। তাঁর অসাম্প্রদায়িক উদারচিত্ত বাবা আর হিন্দু সংকীর্ণতার জাত্ ধর্মে বিশ্বাসী মা—দুজনের টানাপোড়েনে বিহ্বল কৃষণের দুএকটি অসহায় মুহূর্তের দৃশ্যের রঙে রেখায় ফুটে ওঠে ভবিষ্যৎ কৃষণ চন্দের ভাবমূর্তি।

—তোমার ধর্ম আর নীতি ফিতি নিয়ে তুমি তোমার মত থাক। আমি আমার ছেলেকে কিছুতেই তোমার মতো নাস্তিক হতে দেব না। তাই না মানিক? থতমত খেয়ে বললাম—হ্যাঁ।

—তাহলে বল্, তুই কোন ধর্ম পছন্দ করিস? আমার না তোর বাবার?

বাবার দিকে তাকালাম—তারপর মার দিকে।

অবশেষে তারার দিকে। (তারা অচ্ছুৎ এক বালিকা, কৃষণের সর্বক্ষণের খেলার সঙ্গী। মা অচ্ছুৎ বলে দুর দুর করে তাড়িয়ে দেয়, বাবা তাকে কোলে তুলে নেন) তারার ঝুড়ি ভর্তি লাল আপেল। থেমে থেমে বললাম—আমি ওই আপেল পছন্দ করি।

বাবা উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলেন। মা রেগে জোরসে আমার গালে এক চড় কষালেন। বললেন—বল্, কোন ধর্ম?

বললাম, ওই আপেল।

আমরা ঠিক বুঝে নিতে পারি এই আপেলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক শাশ্বত শিশুচিত্ত যে ধর্ম জানে না, জাতবিচারের সংকীর্ণতার বহু উপরে যার বিচরণ। এই শিশু সমস্ত শিশুকে একই খেলার সাথী করে আনন্দ পায়, কাঁধে হাত দিয়ে খুশিতে একই সুরে হেসে উঠতে এবং কষ্টে একই যন্ত্রণায় কেঁদে উঠতে ভালবাসে। কৃষণ চন্দর চিরকাল তাঁর ব্যক্তিত্বকে এই মানবিক উদারতায় উজ্জ্বল রাখতে চেয়েছেন।

মা বাবাকে নিয়ে তাঁর আরও একটি শৈশব-চিত্র এভাবেই বর্ণিত। যেমন—কিছুক্ষণ পর খাবার ঘরে তিনি মাকে বললেন—খোকার মা, এই দুনিয়ায় সবচেয়ে দামী জিনিস কী বলতে পার?

—মা বললেন—সোনা।

—না। স্বাধীনতা। এই দুনিয়ায় সবচেয়ে মূল্যবান হল স্বাধীনতা—আজাদী।

আর, ইতিহাস বলে মানুষকে যুগে যুগে তার জন্য পুরো দাম দিতে হয়। ক্যামেরার ফ্রেমে ফুটে উঠছে কখনো বিদ্রোহিনী খাজম-এর অপরাহত প্রেম; কখনো বিধবা শানুর বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছা। ওই ফ্রেমেই ফুটেছে বেগার দিতে অস্বীকার করায় ভোল্লার পিঠে রাজাসাহেবের জুতো মারার দৃশ্য। শিশুর সমস্ত জিজ্ঞাসাকে স্তব্ধ করে দিয়ে ভোলাকে কাঁধে তুলে নিতে হয় বেগারের জোয়াল। আসলে ভোলারা জানেই না যে ভোলাদের আজাদী আর রাজাসাহেবদের আজাদীতে অনেক ফারাক। রাজাসাহেব-মন্ত্রীসাহেবদের স্বাধীনতা যে ভোলাদের জীবনকে কম দামে কেনার স্বাধীনতা সেটা স্বাধীন ভারতের কিশোর বেগার ভোলা ধরতেই পারে না।

উত্তরকালে কৃষণ চন্দরকে কেন সমাজতন্ত্রের পতাকার খোঁজ করতে হয়েছিল তার কারণগুলো শৈশবেই তৈরী হয়ে যাচ্ছিল।

কৃষণ চন্দের শিশুরা কেউ ইউসুফ, কেউ মোহন, গরিবের মেয়ে শাজাদী, চাষীর ছেলে মুন্না। এমন কি 'হামারা ঘর' কাহিনীর স্কুলের ছেলেদের মধ্যেও অধিক গুরুত্বে উঠে এসেছে মুচির ছেলে সুখো। সুতরাং লেখকের এই নির্বাচন থেকেই আমরা বুঝে যাই কোন শ্রেণীর প্রাণসত্তার পীড়নে কেঁদেছেন তিনি; বুঝেছেন কাদের উদ্ভাবন, চেষ্টা আর পরার্থপরতা পাকিয়ে চলেছে সমাজের সলতে।

এদের কথা পড়তে পড়তে আপনার মনে উঁকি দেবে কখনো আমিনা কাঙালী, কখনো ভোম্বল কিংবা অপু দুর্গা। আবার এদের সঙ্গে কৃষণ চন্দরের মুন্না, কহলা, সুখো, ইউসুফ, মোহন, শাজাদীদের মৌলিক তফাতও আছে। কোনো সন্দেহ অবশ্য নেই যে শিশু দরদী লেখকেরা সবাই অকৃত্রিম আন্তরিকতা নিয়ে শিশুদের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হয়েছেন। এবং চেয়েছেন নিপীড়িতের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি উদ্রেক করতে। করুণ ভাবালুতায় ভরা বাঙালী পাঠকের মন গলাতেও পেরেছেন। কখনো বা তাঁদের শিশু চরিত্ররা সমাজ থেকে খানিকটা আলগা হয়ে আপন গতিতে চলে পথযাত্রার সমাপ্তি ঘটিয়েছে। এক ধরণের রহস্য রোমাঞ্চে গড়া শিশুচরিত্র চিত্রণের অভ্যাস সেই যে তৈরী হয়েছিল সেটা এখনো চলছে। কৃষণ চন্দরে এ সবই আছে। এমন কি রূপকথার রাক্ষস খোক্কস দত্যি দানো বা অলৌকিক যাদুকৌশল সবই আছে। কিন্তু তাঁর গল্পে নেই কোনো রাজপুত্রের রাজকন্যা লাভের কাহিনী। অর্থাৎ রাজ্যরাজা-মন্ত্রিত্ব এবং পুরো সমাজ কাঠামোটা অটুট অক্ষত রইল, কেবল রাজপুত্রের অ্যাডভেঞ্চার দিয়ে ভরে দেওয়া হল শিশুর গল্প শোনার অসীম কৌতূহলের আকাশ পাতাল। আমরা দেখব কৃষণ চন্দর তাঁর কাহিনীতেও অতি নিপুণ হাতে মিলিয়ে দিয়েছেন লৌকিক অলৌকিকে, কিন্তু উপসংহারে তীর চিহ্ন এঁকে দেখিয়ে দিয়েছেন সমাজতান্ত্রিক চেতনার পথ কোন দিকে।

৪

'লালমুকুট' এর কাহিনী একটি কৃষক পরিবারের। বাবা ঠাকুর সিংহের সুখের সংসারকে ছারখার করে দিল মুন্নার মেসো আর মাসির জমির লোভ আর প্রতিহিংসা। ঠাকুর সিংয়ের জমি কেড়ে নেবার দুষ্ট ফন্দি পেকে উঠবার মুহূর্তে মুন্না পালিয়ে গেল তার কুকুর বুদ্ধুকে নিয়ে। তার আগে তার মা অপহৃত, বাবা মিথ্যা হত্যার দায়ে গ্রেপ্তারের ভয়ে পলাতক। তারপর থেকে কাহিনীর রুদ্ধশ্বাস টানাপোড়েন। ঘটনার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা।

লোকালয় পরিত্যক্ত মুন্না এখন বনে বাদাড়ে। সঙ্গী বৃদ্ধ আর এক কৃতজ্ঞ বানর যাকে সে বাঁচিয়েছে সাপের ছোবল থেকে। তারপর এক ডাকাত দলের সন্ধান এবং তাদের কবল থেকে ধনীর কন্যা কুনুলাকে উদ্ধার। পর্বত কন্দর থেকে পলাতক বাবাকে পেল। সর্বত্রই মুন্নার অসম সাহসী কান্ড। সঙ্গে আছে তার বনের বন্ধু বানর, ভল্লুক। লোকালয়েব ধারে কাছে যেতেই ঠাকুব সিং ধরা পড়ল। বিচারে ফাঁসির হুকুম হল। তাব অপবাধ সে নিজের স্ত্রীকে হত্যা কবেছে। এখানে কাহিনী চরম উত্তেজনায় পৌঁছে যায। বাবা ফাঁসির মঞ্চে। স্বপ্নে দেখা মায়ের সংকেত-কবিতা পড়ে মুন্না আর কুনুলা পৌঁছে যায এক পোড়ো মন্দিবেব গোপন কক্ষে। সেখানে বন্দিনী মা। তাকে উদ্ধার কবে নিযে হাজির করল ওই বধ্য ভূমিতে। প্রমাণ করল মা বেঁচে আছে, বাবা নির্দোষ। ঠাকুব সিং অভিযোগমুক্ত হল। নিজের বাড়িতে ফিবে এসে আগের মতো তার চাযের কাজে মন দিল। ঘটনাবহুল মুন্নার শিশুজীবন চিত্রিত করতে গিয়ে অরন্যপশুকে মানুষের বিশ্বস্ততম বন্ধুরূপে দেখিয়েছেন, অন্যদিকে সমাজের পরিচিত অন্ধকারকে আলোয এনেছেন, প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। মন্দিরের কক্ষে একজন নারীকে বন্দী করে রাখা ধর্মের আড়ালে নারী নির্যাতনেরই নমুনা। মুন্নাদের এভাবেচোখ ফুটে যায়।

'উল্টা দরখত' (উল্টো গাছের গল্প)-এর কাহিনী অনেক দত্যিদানব শ্বাপদ সঙ্কুল। কাহিনীর স্ট্রাকচারের সাথে রূপকথার মিল। কাহিনীর নায়ক এক মুচির ছেলে ইউসুফ। নির্ভীক এই কিশোব আগাগোড়া স্বচ্ছ, বলিষ্ঠ, অসম্ভব কৌতূহলী এক চরিত্র। দরিদ্র পরিবাবের ছেলে ইউসুফ বাদশাহেব সৈন্যদলে যোগ দিতে অস্বীকার করে। শুরুতেই বাদশাকে তার জেরা—

ইউ—তোমাব কি রোগ?

বাদশা—আমাব অত্যাচার করাব বোগ।

ইউ—আমি তোমার চাকরি করতে পারব না।

বাদশা—জান তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ? স্বযং বাদশা সালামতের সঙ্গে।

ইউ—জান, তুমি কথা বলছ একজন মুচির ছেলের সঙ্গে?

পাঠকের আর বুঝতে বাকি থাকেনা ইউসুফের কপালে এবার কী ঘটবে। সামান্য ভিটে মাটিটুকুও চলে গেল বাদশাহী আগ্রাসনে।

আর তখন থেকেই শুরু হল উল্টোগাছের কেরামতি। গাছটির মাথা নিচের দিকে। তার ডালে চড়ে পাতাল পুরী অভিযানের গল্প দারুন রোমহর্ষক। পাতালপুরী তো নয়, বন্দী প্রকান্ড এক বসতি। এখানে বিদ্রোহ আর প্রতিবাদের শব্দগুলোকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। (হয়ত লেখকের প্রতিবাদ-পরিকল্পনার বলিষ্ঠতম পরিচয়)

—চল বিদ্রোহ করি। লুঠেরাদের লুটে নাও।

—এটা শব্দের কবরখানাই বটে। যে শব্দগুলো এখানে শুনছ, তারা সবই বাদশার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুন হযেছে। ..খুন হবার পরেও তারা শান্ত হল না; তাদের বাণী সাধারণ লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। বাদশা আবার সে সব শব্দকে বন্দী করেছে।'

পড়ে কি মনে হচ্ছে না রূপকথার এই অভিজ্ঞতাব সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতার খুব অমিল নেই? শব্দও কারারুদ্ধ হয়, নির্বাসিত হয়? লেখক বন্দীশব্দের আর্তগর্জনই শুনিয়েছেন তাঁর গল্পে। এখানে আবাব দেখা যাচ্ছে ফিল্ম্ পরিচালকদের প্যাঁচা হয়ে

থাকার দৃশ্য। তাঁদের এ দশার কারণ তাঁরা গত ৫০ বছরে ছোটদের জন্য কোনো ছবি তৈরী করেন নি। এর পরের দৃশ্য ভাবীকালের যন্ত্রপুরী। সেখানে সবই চলে যন্ত্রে। মানুষের জীবন সম্পূর্ণত অটোমেশন নিয়ন্ত্রিত। সর্বত্রই যন্ত্র, মানুষ মাত্র একটি। তারই জবানবন্দী শুনিয়েছেন লেখক।

শহরের মালিক ঝুনঝুনওয়ালা। বিশাল ধনী শিল্পপতি। তিনি মেশিনের পর মেশিন বসিয়ে শ্রমিকের পর শ্রমিক ছাঁটাই করলেন। মেশিনের ফলে বাকি শ্রমিকের শ্রমও কমে গেল। মালিক ভাবল বারো ঘন্টা কাজ না করলে শ্রমিক কুঁড়ে হয়ে যাবে। কুঁড়েমি কাটিয়ে তাকে করিৎকর্মা বানানোব চেয়ে যন্ত্রাংশের মেরামতি অনেক সহজ। তাই যন্ত্রই মানুষের জায়গা দখল করতে থাকল। যন্ত্র-উৎপাদিত খাদ্য বাজারে অঢেল। খাবার লোক কিন্তু নেই। মুনাফায় ভাঁটা পড়ছিল বলে ঝুনঝুনওয়ালা আত্মহত্যা করল। সারা শহরে মানুষ বলতে রইল কেবল একটি ছেলে। যন্ত্রপুরীর এই ছেলেটির কোনো নাম নেই, সংখ্যাই পরিচয় তার। হাতের আঙ্গুল তার মাত্র একটি। একটি আঙ্গুল বোতাম টিপে সব কাজ হয়ে যায়, তাই বাকি ন'টা আঙ্গুল কাটা।

সমগ্র কাহিনীটির বিন্যাস যেন, রাজনীতি অর্থনীতির শিশুপাঠ্য সংস্করণ।

'লাভ তো মেশিন থেকে হয় না, লাভ হয় মানুষ থেকে।' স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে দুনিয়ার ভবিষ্যৎকে ঠেসে দেবে বলে ধনোম্মত্ত এবং যন্ত্রোম্মত্ত মানুষেরা যে পথ নিয়েছে তাদের প্রতি যেন চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি গল্পের এই অধ্যায়ের এক একটি বাক্য।

আমাদের ইউসুফ সংখ্যার পরিচয় মুছে দিয়ে যন্ত্রপুরীর ছেলেটির নাম দিল মোহন। তাকে নিয়ে কাহিনী চলল পরের অধ্যায়ে। এক দৈত্যের কবলে দেখা গেল এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে শাজাদীকে। তার একবিন্দু অশ্রুতে তৈরী হয় একটি মুক্তোদানা। (গরিবের কান্না ও যন্ত্রণাকেও বুঝি ভোগের সামগ্রী বা বাণিজ্যের পণ্য করে ধনীরা, পুঁজিপতিরা) তার অশ্রু-মুক্তোর লোভেই দৈত্য তাকে বন্দী করে রেখেছে। তারা এসে শাজাদীর মুখে হাসি ফোটাল। বন্দীদশা কাটল শাজাদীর। জানা গেল শাজাদী আসলে এক গরিব রুটিওয়ালার ছোট মেয়ে।

ওরা এবার দলে তিনজন। পরের আধ্যায় ভোট ভিক্ষার অধ্যায়। আলাদিনের বাতি, সোলেমানের টুপি আর কাগজের ভোজবাজি দেখিয়ে ভোটারদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চলছে। এভাবে রাজনীতির রূপকথা বলেছেন লেখক শিশুকাহিনীর আকর্ষণ অক্ষুন্ন রেখে। পরের অধ্যায়ে সর্পপুরী। এ সাপকে কেউ দেখে না, কিন্তু সর্পরাজ-বিরোধী প্রজারা সর্পদংশনেই মারা যায়। ইউসুফকেও সাপে কাটল। মোহন আর শাজাদী ভয়ংকর সব কান্ড করে ইউসুফের প্রাণ বাঁচায়। এ সাপকে আমাদেরও না চিনে উপায় নেই। এই সাপই তো পুঁজিবাদ হয়ে, মৌলবাদ হয়ে, ফ্যাসিবাদ হয়ে বারে বারে ছোবল মেরেছে মানুষের সভ্যতাকে। বিষে জর্জরিত করেছে বিশ্বের গরিবশ্রেণীকে। সাপের বংশকে ধ্বংস করলেন কৃষণ চন্দর তাঁর কাহিনীতে। উদ্ধার পেল সর্পপুরীর হাজার হাজার বন্দী নরনারী। সর্পরাজকে সসৈন্যে গর্তে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

আমরা এই কাহিনীতে একজন ফকিরকে পেলাম যিনি সব মুশকিলের আসানের পথ দেখিয়েছেন। উল্টো গাছের পরিচয় দিয়ে বললেন এ সাধারণ গাছ নয়, এ গাছের মাথার হদিস আজ অবধি কেউ পায় নি। এ হল মানুষের উন্নতির গাছ। কে

এই ফকির? তিনি জানিয়ে দিলেন তাঁর শাশ্বত পরিচয় ঃ আমি তো থামতে পারি না। আমার কাজ এগিয়ে যাওয়া, কেবলই এগিয়ে যাওয়া। আমি ইতিহাস। সভ্যতার প্রগতির ইতিহাসকে যে এভাবে রূপকথায় মণ্ডিত করা যায়, তাকে শিশু উপভোগ্য করা যায় সেটা হাতে কলমে দেখিয়ে দিলেন কথাশিল্পী কৃষণচন্দর।

আমরা 'হামারা ঘর' নামে আর একটি বই পাচ্ছি যা 'পিকনিক' নামে বাংলায় রূপান্তরিত। জাহাজডুবি হল। এবং একদল ছেলেমেয়ে রক্ষা পেয়ে উঠল এক নতুন দ্বীপে। তারা ভাবল—'সম্ভবত কোনো অজানা দ্বীপে এসে পড়েছি, সারা জীবন এখানেই কাটাতে হবে, সেই রবিনসন ক্রুশোর মতো, যার কথা আমরা বইতে পড়েছি।' অজানা দ্বীপে একদল ছেলেমেয়েকে নিয়ে গড়ে তোলা এই কাহিনী ভারতীয় পটভূমিকায় বেশ অভিনব। লেখক এই আয়োজনটি, মনে হয়, বেশ ভেবেচিন্তেই করেছেন। বড়দেব শাসন বাঁধন থেকে মুক্ত হতে পারলে শিশুরা নিজেরাই গড়ে তুলতে পারে একটি স্বতন্ত্র সমাজ। তখন তাদের সব দুঃখই সুখ, সব কষ্টই আনন্দ। এই কাহিনীতে শিশুদের তৈরী 'আমাদের ঘর' একটুকরো সাম্যের নমুনা। এখানে জীবনাচরণটাই শিক্ষা। শিক্ষার একটাই উদ্দেশ্য ঃ শেখো আর শেখাকে কাজে লাগাও। এখানে যার যতটুকু ক্ষমতা ততটাই খাটতে হয়, খাওয়া পরা যার যার প্রয়োজন মাফিক। পরের উপর প্রভুত্ব, পরের শ্রমে পাওয়া খাবারে ভাগ বসানো নয়। পরের মাথায় লাঠি ঘুরিযে লাটসাহেবি অচিরেই পবাভূত হল সংঘশক্তির কাছে। সাম্যবাদী সমাজের মুখবন্ধ হিসাবেই যেন এই কাহিনীব পরিকল্পনা, কিন্তু কোনোভাবেই আরোপিত মনে হয় না। সব জাতের সব শ্রেণীর শিশুদের নিয়েই কয়েকমাসের জন্য গড়ে তোলা এই শিশু সমাজের আদলে ভবিষ্যতের বিশ্বসমাজ গড়ার প্রগাঢ় প্রত্যাশা জাগিযে দিয়ে গেছেন কৃষণ চন্দর।

এখানে পাহাড়ে চড়া, জঙ্গলে ঘোরার এ্যাডভেঞ্চার আছে। আছে গুপ্তধন লাভেব ঘটনা। জলদস্যুদের লুকিয়ে রাখা গুপ্তধন পেয়ে, অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে ঘনশ্যাম, বসন্ত, রুস্তম দ্বীপের রাজা উজির সেজে বসল। বাকি ছেলেমেয়েদের গায়ের জোর আর অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাবেদার প্রজা বানাল। সমাজের শ্রেণীর উদ্ভব ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের উন্মেষ বুঝি এভাবেই হয়। কিন্তু শ্রেণীপ্রভুরা পারল না। 'সেদিন গভীর রাত্রে কাসেম, সুখো, গোপাল—ওরা উজিবের তলোয়ার, রাজার বন্দুক, সেনাপতির কুঠার সব নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিল। পরদিন তাদের পাতে খাবারের বদলে দেওয়া হল হীরা, মোতি, মোহর। সুধা মিষ্টি হেসে বলল—যে পাথরের জন্য তোমরা আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গিযে হামবড়া ভাব দেখাচ্ছ সেই পাথরই তোমরা খাবে।' খাবার পাবার শর্তটি শেষ পর্যন্ত সুখোই ঘোষণা করল—'যে কাজ করবে সে খেতে পাবে। কাজ বন্ধ, খাবার বন্ধ।' ওদের ভুল ভাঙল। একটু পরে সন্ধানী-হেলিকপ্টার এসে উদ্ধার করল সবাইকে। ওরা পেছনে রেখে গেল সভ্যতার উন্নততম মানুষের সংসার—'আমাদের ঘর'।

'চিড়িয়া কি আলিফ লায়লা' বা কালো পাখির হাজার রাত। আনোয়ারা বেগম তাঁর অনুবাদের ভূমিকায় বইয়ের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলছেন—'এই কাহিনীতে রয়েছে সাহসী ভীরু, কৌশলী, পরাশ্রয়ী, বুদ্ধিমান, নির্বোধ—নানা ধরনের চরিত্রের কার্যকলাপের বিবরণ।' আর বলছেন—শাসক ও শাসিত, শোষক ও শোষিত,

অত্যাচারী ও অত্যাচারিত—এই দুইশ্রেণীর বিরোধ ও বৈষম্য।

হয়ত বা শাদা কালোর বিরোধ বিদ্বেষে তিক্ত ইতিহাসের পাতাগুলো বার বার ভেসে উঠছিল লেখকের স্মৃতিতে। কেউ কি ভুলতে পারে কালো আফ্রিকার উপর সাদা মানুষের ধারাবাহিক লোভ ও বর্বর আচরণ? এখনো কি ভোলা যাচ্ছে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ মার্কিনীদের নিরন্তর ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতা? এর ভিত্তিতেই লেখক আলিফ লায়লার ছাঁচে গড়েছেন তাঁর পাখিকাহিনী।

সাদা পাখিরাজার রাণির কালো ছানা কেন? রূপকথার দুয়োরাণির মতো ক্রুদ্ধ রাজা নির্বাসনে দিল রাণি আর তার কালো বাচ্চাদের। নির্বাসনের দিনগুলোতে হল অজগরের উপদ্রব। তার সঙ্গে রফা হল প্রতিদিন দুটো করে পাখি স্বেচ্ছায় সাপের খাদ্য হতে আসবে। সেই নির্বাসিত রাণি পাখি আর তার মেয়ের পালা এল। অজগরের গল্প তৃষ্ণা মেটাবার জন্য শুরু হল আর এক আরব্যরজনী। গল্পের শাখা প্রশাখার বিস্তার ঘটতে থাকল অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে। কখনো প্যাঁচা, কখনো জলপরী, কখনো শাদা হাতি, মুনমুন মাছ, শেয়াল, বাঘ সবই আছে। ফাঁকে ফাঁকে লেখক সংলাপকে রূপকথার হালকা চালের বাইরে নিয়ে আসেন। দুটি শুনুন—

(১) যাদু হস্তিনী বলল—ক্যামেরায় একটা নেগেটিভে বাইরের চেহারার, আর একটা নেগেটিভে ভেতরের ছবি তোলা যায়। ...দুনিয়াওয়ালারা ভেতরের ছবি দেখতে পায় না, যদি পেত ক্যামেরা ভেঙে ফেলত।

হস্তিনী পেঁচাকে দেখাচ্ছে ঃ একটায়—আমরা দুজন ভাই। অন্যটায়--একে অন্যের দিকে ছুরি উঁচিয়ে আছে। একটায়—সাধু মালা জপছে। অন্যটায় সাধু স্নানরতা মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

(২) কাছিম দেখাল জঙ্গল আর শহরের পার্থক্য। আমাদের জন্য গাছের ছাল, ওদের জন্য রেশমি কাপড়। আমাদের জন্য মাটির খুপরি ঘর, ওদের জন্য ইটের অট্টালিকা। আমাদের জন্য গাছের মূল, ওদের জন্য পোলাও ফিরনি। গল্পে আছে তরুণী রাজকুমারীর সঙ্গে বনের রাজার বিবাহের উদ্যোগ—ভাবতীয় নারীর চিরকালের অসহায় আত্মসমর্পণের কাহিনী। এই প্রসঙ্গেই আছে মংলী মহারাজ আর জঙ্গল রাজকুমার যুদ্ধ। যুদ্ধ না হলে কোনো মজাই মজাদার হয় না ছোটদের কাছে। রাজকুমার আর রাজকুমারীর বিয়ে হল শেষ পর্যন্ত। জঙ্গল আর শহর বিবাহ বন্ধনে পরস্পরের কাছাকাছি এল। হয়ত সভ্যতার ভবিষ্যতের সমৃদ্ধি এই মেলবন্ধনের সাফল্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে—লেখক তারই ইঙ্গিত ও প্রত্যাশার ছবি এঁকে গেলেন ভাবীকালের মানুষের মনে।

কাহিনীর উপসংহারে দুটি বড় ঘটনা ঘটতে দেখা গেল। এক, আরব্য রজনীর গল্পের রাত্রিকে লেখক আনেকটাই পালটে দিলেন। বলতে গেলে কাহিনীর এটাই মৌলিকতা। মোহমুগ্ধ অন্যমনস্ক অজগরকে তীক্ষ্ণ নখে ঠোঁটে ঠুকরে ঠুকরে একেবারে অন্ধ করে দিল। এবং সেই সুযোগে সব পাখিরা একজোট হয়ে সংহার করল ভয়ঙ্কর বিশাল এই শত্রুর। জোট বাঁধতে পারলে কোনো শত্রুই বুঝি আর অপরাজেয় থাকে না। দুই, এই একই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে সাদা পাখি কালো পাখির রংয়ের তফাৎ সবাই ভুলে গেল। জোট এভাবেই সব বিভেদ ভুলিয়ে দেয়।

রামশংকর দ্বিবেদী-অনূদিত 'জঙ্গল কা রাজা' আর একটি জঙ্গলের বই যা

প্রচলিত জাংগল্ লোর নামক পরিচিত শিকার কাহিনী কিংবা অরণ্য প্রাণী জীবনের গল্পগাছা থেকে একেবারেই আলাদা। যদিও কাহিনী শুরু হয়েছে মুস্তাক, দলীপ আর হাম্বির-দের নীল হরিণ শিকারের অভিযান দিয়ে, তবু বনরাজ গর্জন সিং আর তাব বন্ধু পশুদলের সম্পর্ককে দেখাতে গিয়ে লেখক শিকার কাহিনীর রূপটাকেই বদলে দিয়েছেন। তার বদলে অরণ্যপ্রীতির অনন্য দৃষ্টান্ত কাহিনীতে এনে দিয়েছে অসাধারণ পরিবেশচেতনা। একদিক থেকে পূর্ববর্তী 'পাখিদের আলিফ লায়লা' কাহিনীটির সঙ্গে বেশ মিল খুঁজে পাবেন পাঠক।

গভীর অরণ্যে ওস্তাদ শিকারী দলের ক্যাম্প। এক দুর্লভ মুহূর্তে নীল হরিণের আর সোনালী ঘোড়ার দেখা পাওয়ার এবং মুহূর্তে তাদের মিলিয়ে যাওয়ার ঘটনায় আছে টান টান উত্তেজনা। কাহিনী যতই এগিয়ে যায় ততই গভীর রাত্রে এক এক করে শিকারী দলের মানুষ জন উধাও হতে থাকে। অদৃশ্য কোনো অরণ্য রহস্য শিকারীদের বিমূঢ় করে দেয়। অসম্ভব দুঃসাহস নিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য বাকি থাকে একমাত্র হাম্বির সিং। গভীর রাত্রে তার হাতে রহস্য-রমণীর সাক্ষাৎ এবং উপজাতি নরভুক মানুষের হাতে তাদের দুজনের ধরা পড়া ও বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে তাদের সেদ্ধ করে খাদ্য করার ঘটনাবলী রীতিমতো রোমাঞ্চ ও গা ছমছম শিহরণ জাগায়। কিন্তু বেঁচে গেল ওরা শেষ পর্যন্ত। এই উদ্ধারের দৃশ্যেই আমরা প্রথম দেখি একেবারে অন্যরকম একটি মানুষকে। তার নাম বনরাজ গর্জন সিং। তার অরণ্যবাস এবং প্রায় অবাক করা অভিজ্ঞতা শোনানো, সভ্য মানুষের অরণ্যধ্বংস ও হিংস্র আচরণের প্রতিবাদ দেখানো—এরই জন্য যেন লেখক বনরাজ গর্জনকে তুলে ধরেছেন। হাম্বির ও বনরাজের মধ্যে সংলাপের কিছু অংশ আজও আমদের কাছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে।

—'দু একটা হরিণ শিকার করলে কী হয়েছে? আর তা ছাড়া আমাদের কাছে শিকার করার সরকাবি অনুমতিপত্র রয়েছে।

—কী আশ্চর্যের কথা! অনুমতিপত্র দেখিয়ে তোমরা কাউকে হত্যা করবে? ..তোমাদের মতো লোকের অত্যাচারে পৃথিবীতে পশু পাখি গাছপালা শূন্য হয়ে পড়েছে। .. এরকম কিছু দিন চললে আর কিছুদিন পরে মানুষ ছাড়া পশুপাখি বলে পৃথিবীতে আর কিছুই থাকবে না।

কিন্তু পশুপাখি আর গাছপালা না থাকলে যে মানুষও বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এই নির্মম সিদ্ধান্তটি নিয়ে আজকে সারা দুনিয়া যে তোলপাড় হচ্ছে সেটা আজ থেকে দশ বছর আগেই বলে দিয়েছে কৃষণ চন্দরের জঙ্গল কা রাজা বনরাজ গর্জন সিং—

—প্রকৃতি বেঁচে রয়েছে পরস্পরের উপর নির্ভর করে; সমস্ত জীবজন্তু, পাখি, মাছ পোকামাকড় গাছপালা সবাইকে নিয়ে সে ভারসাম্য রক্ষা করে। মানুষ যদি আর সবাইকে ধ্বংস করে শুধু নিজে বেঁচে থাকতে চায়—তা কখনো তার পক্ষে সম্ভব হবে না। প্রকৃতির ভারসাম্য হারিয়ে গেলে মানুষও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

নীল হরিণ শিকারের বদলে হাম্বির দলীপ দুই ভাই বনরাজের দুই বোন মীনা ও নীনাকে বিয়ে করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চলল। কিন্তু শিশু পাঠকেরা একটি মোক্ষম কথা জেনে গেল বন না থাকলে শহরও থাকবে না।

এরকম ১১ খানা শিশু কাহিনীর রচয়িতা কৃষণ চন্দরকে সেই রকম শিশুসাহিত্যিক বলেই সম্মান ও স্বীকৃতি দিতে চাই যিনি তাঁর শিশু পাঠককে প্রতি মুহূর্তে নতুন সমাজ চেতনার মন্ত্রে সঞ্জীবিত করতে চান। তাঁর কাহিনীতে যারা বয়স্ক দুষ্কৃতিকারী তারা লেখকের ঘটনার চাপে পরাভূত ও ধ্বংস হয়েছে। আর যারা তাদের বন্ধু তারা শিশুকে নতুন করে দেখার চোখ ও চলার পথ বাৎলে দিয়েছে। ভাবীকালের মানুষের সমাজ তারা সেভাবেই তৈরী করে নিতে পারবে যেমনটি কৃষণ চন্দর নিজে চেয়েছেন, নিজে ভেবেছেন। বস্তুত এই লেখক ছোটদের জন্য লেখায় হাল্কা লঘু ন্যাকামি মাখা আলতো আলতো কোনো শব্দ, ভাষা কাঠামোর আশ্রয় নেন নি। নেহাতই রহস্য রোমাঞ্চ কিংবা ভ্রমণ অভিযানের আর দশটি গল্প সল্প বলার চেষ্টা করেন নি। স্থির লক্ষ্যে অবিচলিত তাঁর কাহিনীর গতি, ঘটনার বিন্যাস এবং চরিত্রের চিত্রণ। লেখকের বেগবান বলবান কলম সবাইকে নিজস্ব সাহিত্য ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অভিমুখে চালিয়ে নিয়ে গেছে। তার থেকে বাদ যায় নি কৃষণ চন্দরের জিনপরী দত্যিদানোরাও।

আমরা জীবনীকার জীলানি বানুর সঙ্গে একমত যে—'ছোটদের নিষ্পাপতা, সরলতা ও সততা কৃষণ চন্দরের অনুভব ও উপলব্ধিতে কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে গৃহীত হয়। শ্রেণী প্রধান সমাজ ও তার গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই ওই নিষ্পাপতা, সরলতা ও সততা রক্ষা করাব জন্যে। সম্ভবত এই জন্যই কৃষণ চন্দর ছোটদের জন্য লেখাকেও গুরুত্ব দিয়েছেন।' কিন্তু জীলানির মন্তব্যকে আমরা ছাড়িয়েও যেতে চাই। কেননা কৃষণ চন্দব তাঁব সাহিত্যকর্মকে উদ্দিষ্ট সমাজ নির্মানের হাতিয়ার বলেই বিবেচনা করেন। এই কাবণে তাঁর শিশুরা হয়ে ওঠে ভাবীকালের সমাজ প্রতিষ্ঠাব প্রস্তুতি পর্বের সৈনিক। অক্লান্ত। অভ্রান্ত। অকুতোভয় এবং অপরাজিত।

সঞ্চারী দাশগুপ্ত

পাকদণ্ডী ঃ পূর্বখণ্ড

রও মে হ্যায় রখ্‌শ এ উমর
কহাঁ দেখিয়ে থমে
ন হাথ বাগ পর হ্যায়
ন পাঁও হ্যায় রকাব মে।

ছুটে চলেছে জীবনের ঘোড়া
কে জানে কোথায় থামবে
না আছে হাতে লাগাম
না পা রয়েছে রেকাবে।

মির্জা গালিব

জীবন এক সফর। কারো ঘোড়ায় চড়ে, প্রচলিত নিয়মকানুন সব হটিয়ে দিয়ে, তফাত করে দিয়ে—যেসব মীর, গালিব, মান্টো। কারো বা রথে চড়ে আভিজাত্য ও ক্ষমতার মাখনটুকু তুলে নিয়ে—যেমন শ্রীরামচন্দ্র, যেমন লালকৃষ্ণ। কারো আবার পায়ে হেঁটে, পায়ে হেঁটে, পায়ে হেঁটে ।

কৃষণ চন্দরের জীবনের গতিও ছিল দ্রুত, পথ অনিশ্চিত। আদর্শগত ক্ষেত্রে তিনিও ছিলেন একজন যোদ্ধা। কিন্তু জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তাঁর পদক্ষেপ মন্থর হয়ে এসেছিল। এক প্রায় অবিশ্বাস্য, দুর্বল পদচারণায় তাঁকে হাঁটতে দেখা গিয়েছিল জরুরী অবস্থার সমর্থনে মিছিলে।

কিন্তু সে তো শেষের কথা। তার আগে বহু বছর ধরে একটি সম্ভাবনা ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করেছিল। এক বিখ্যাত লেখকের একটি বাল্যকাল ছিল। ছিল কৈশোর। যৌবন। সে কাহিনীও কম আকর্ষক নয়। এই আত্মপ্রকাশের প্রক্রিয়ার পাশাপাশি শতদ্রু ও যমুনায় অনেক স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। তার কিছু পরিচয় পাব এই খণ্ড রচনায়।

১

উত্তরাধিকার

শের শাহ্ সূরী রোড। ব্রিটিশরা নাম দিয়েছিল গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে দুটি দেশের বুক চিরে চলে গেছে পেশোয়ার পর্যন্ত। এই পথেরই এক পাশে পঞ্জাবের ওয়াজিরাবাদ শহরে ছিল কৃষণ চন্দরের পরিবারের আদি বাড়ি। ওয়াজিরাবাদ লাহোর থেকে আটষট্টি মাইল দূরে, এখনকার পাকিস্তানে। এ এক পরিহাস যে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের আদি বাসস্থান এখন ভারতবাসীর নাগালের বাইরে। বিভূতিভূষণের বাড়ির মত ইচ্ছে হলেই তা দেখে আসা যাবে না।

কৃষণ চন্দরের বাবা গৌরীশঙ্কর চোপড়া ছিলেন ডাক্তার। তিনি যখন রাজস্থানের ভরতপুরে মেডিকেল অফিসার ছিলেন, সেইসময়ে ১৯১৩ সালের ২৩শে নভেম্বর কৃষণ চন্দরের জন্ম হয়। গৌরীশঙ্কর ছিলেন মোটামুটি সৎ, আদর্শবান একজন মানুষ।

ন্যায় অন্যায় সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কিছু দৃঢ় ধারণা ছিল। কোনও কারণে ভরতপুরের বৃটিশ রেসিডেন্টের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় তাঁর চাকরি চলে যায়। বেশ কিছুদিন পরে অনেক চেষ্টা করে গৌরীশঙ্কর কাশ্মীরের পুঞ্চে একটি কাজ জোগাড় করেন। কৃষণ চন্দর তখন মা ও ভাই মহেন্দরের সঙ্গে লাহোরে পিতৃব্যের বাড়িতে। সেখান থেকে তিনজনে পুঞ্চ রওনা হলেন। কৃষণ চন্দরের কলমে এই ভ্রমণের একটি বিবরণ পাওয়া যায় —

'ঝ-ভদুর থেকে আমরা এসেছিলাম! লাহোরের গলি ছেড়ে, ওয়াজিরাবাদের নিজেদের বাড়ি পেছনে ফেলে চলে এসেছিলাম। ......আমার মা ছিলেন সম্পূর্ণ একা। তিনি ছিলেন অসম্ভব সাহসী। দুটি ছোট ছোট বাচ্চাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। অনেক মাইল রাস্তা পেরিয়ে তিনি যখন হাজি পীরের দরগায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন— তখন মনে হয়েছিল এরপর থেকে এখানেই আমাদের বাড়ি হবে—'

"হমারা অপ্‌না বতন্‌"

কৃষণ চন্দরের মায়ের নাম ছিল পরমেশ্বরী। তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় গৃহবধূর পক্ষে যতটা হওয়া সম্ভব ততটাই স্বাবলম্বী, তেজস্বিনী ও বুদ্ধিমতী। এবং সম্ভবত বাড়ির ডিক্টেটারও। সংসারের কোনও কিছুই তাঁর নজর এড়িয়ে যেতে পারত না। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো, তাদের লেখাপড়া, খাওয়াদাওয়া সবকিছুই পরমেশ্বরী একা সামলাতেন। আরো অনেক ভারতীয় মায়ের মতই।

কৃষণ চন্দররা ছিলেন পাঁচ ভাইবোন। চার ভাই—কৃষণ চন্দর, মহেন্দরনাথ, ভূষণ ও উপেন্দরনাথ। বোন সরলা। এর মধ্যে ভূষণ ছ বছর বয়সে মারা যান। কৃষণ চন্দরের বাবা মা ছেলেদের কাকা বলে ডাকতেন। যেমন কৃষণ চন্দর বড় কাকা, মহেন্দরনাথ ছোট কাকা ইত্যাদি। মায়ের সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন কৃষণ চন্দরই। একবার ভগত সিং-এর দলে যোগ দেবার জন্য তিনি হোস্টেল পালিয়েছিলেন। পরমেশ্বরীর তখনকার মানসিক অবস্থার কথা মহেন্দরনাথ লিখছেন এভাবে—

'মা তখন আর কিছুই ভাবতে পারতেন না। শুধু পাগলের মত বাড়িময় ঘুরে বেড়াতেন। অথবা হঠাৎ হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন।' বাবার সঙ্গে মায়ের মানসিকতার তফাৎ ছিল অনেক। বাবা ছিলেন আর্যসমাজী, অস্পৃশ্যতার ঘোর বিরোধী। মা কট্টর হিন্দু, জাতপাতে ভয়ানক বিশ্বাসী। প্রায়ই তাঁদের মধ্যে এ নিয়ে মতান্তর হত।

বাবা বা 'বাওজি' ছিলেন কৃষণ চন্দরের ছোটবেলার হিরো; এমনকি পরিণত বয়েসে বাবার বিবাহোত্তর প্রেম নিয়েও বেশ রোম্যান্টিক লেখা লিখেছেন তিনি। এক রোগিনী, তাঁর নাম শানু, এক মেট্রন, একজন বেদেনী—এই তিনজন প্রেমিকার কথা পাওয়া যায় কৃষণ চন্দরের লেখায়। তার মধ্যে বেদেনীর কাহিনীটি বেশ আকর্ষণীয়।

একদিন 'বাওজির' বাংলোয় এক বেদেনী এল।.সুন্দরী যুবতী, তামার মত গায়ের রং, গভীর সবুজ রঙের চোখ...দুধের মত সাদা আকর্ষণীয় দাঁত—'বাওজি' চিরকালই সৌন্দর্যপিপাসু, বেদেনীর রূপকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না, প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে গেলেন। বেদেনীও খুব সহজেই তাঁর দৃষ্টির আমন্ত্রণ পড়ে ফেলল। 'বাওজি' বললেন তাঁর বাংলোর আশেপাশে যে সাপ রয়েছে তা বেদেনী

নিশ্চিন্তে ধরতে পারে এবং যতদিন না তার কাজ শেষ হয় ততদিন মালির খালি ঘরটাতে তার থাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বেদেনী বাধিত হন।

পরমেশ্বরী এ খবর পেয়ে বুঝলেন কোথাও কিছু গোলমাল আছে। বেদেনীকে এক ঝলক দেখেই তাঁর মনে হয়েছিল---'এ সাপ কী ধরবে, এ নিজেই তো এক নাগিনী।'

রাতে শোবার ঘরে 'বাওজিকে' একা পেয়ে পরমেশ্বরী তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ডাক্তারসাহেব আর কী করেন, বাধ্য হয়ে স্ত্রীর কাছে হাজারবার প্রেমের শপথ করলেন, তাঁকে বারবার বোঝালেন যে বেদেনীর সঙ্গে তাঁর কোনও অন্যরকম সম্পর্ক নেই। পরমেশ্বরী তখনকার মত চুপ করলেন।

কিন্তু দু একদিনের মধ্যেই তিনি 'বাওজিকে' একটি টিলার পেছনে বেদেনীর সঙ্গে রসালাপ করতে দেখে ফেললেন। এবার আর তাঁকে সামলানো গেল না। তিনি স্বামীকে আল্টিমেটাম দিলেন---'হয় এখানে আমি থাকব, নাহলে ওই সবুজ চোখের সাপিনী।'

অতএব বেদেনীকে চলে যেতে হল। যাওয়ার সময় সে 'বাওজির' চোখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু সেখানে তখন আর আগের মত আবেগের কাঁপন দেখা যায়নি। বেদেনী তার বাঁশিতে এক অদ্ভুত সুর বাজাতে বাজাতে চলে গিয়েছিল। 'সে সুরে মাধুরী ছিল না, কামনা ছিল না, দুঃখ ছিল না, কষ্ট ছিল না, ছিল শুধু যন্ত্রণা আর ক্রোধ। সেই আশ্চর্য ঢেউ খেলানো সঙ্গীত শুনে মনে হচ্ছিল কোনও নিঃশেষ বিষনাগিনী মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে এককোঁটা গরল ভিক্ষে করছে।'

বাবার বিবাহ-অতিরিক্ত প্রেমকে সহজভাবে নিয়েছিলেন বলেই হয়ত কৃষণ চন্দরের নিজের জীবনেও পরবর্তীকালে এমন সম্পর্কের অভাব ঘটেনি। সবচেয়ে গভীর প্রেমে যাঁর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন, সেই সলমা সিদ্দিকিকে তিনি শেষ পর্যন্ত বিয়েও করেছিলেন। মানসিকভাবে খুব কাছে চলে আসা সলমাকে কৃষণচন্দর এক সময় লিখেছিলেন---

'সলমা, তুমি আমার সব আত্মীয়দের দেখেছো, শুধু বাবুজিকে দেখোনি। এটা আমার একটা বড় দুঃখ। ওঁর সঙ্গে আলাপ হলে তোমার খুব ভাল লাগত। খুব ভাল লোক ছিলেন। ছিলেন সততার প্রতিমূর্তি। কোনও অন্যায় কাজের সঙ্গে আপস করা তাঁর পক্ষে কোনও দিনই সম্ভব ছিল না।'

মায়ের এজাতীয় কোনও সম্পর্কের কথা কৃষণ চন্দর লেখেন নি। পরমেশ্বরী ছিলেন রক্ষণশীল ভারতীয় মহিলা। হয়ত তাঁর কোনও বিবাহোত্তর প্রেম ছিল না। কিন্তু থাকলেও কি কৃষণ চন্দর লিখতেন? অন্যথায় প্রগতিশীল কৃষণ চন্দর যে নারী বিষয়ে সনাতনপন্থী ছিলেন এ প্রমাণ তাঁর জীবনীকারের দেওয়া বিভিন্ন তথ্যে পাওয়া যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে পরে কোনও এক সময় আলোচনা করা যাবে।

তবে ডাক্তার গৌরীশঙ্কর যে সামাজিকভাবে সৎ, বিশ্বাসযোগ্য, স্থিতধী একজন মানুষ ছিলেন তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বৃটিশ আমলের দুর্নীতি, বিশেষ করে উৎকোচ প্রথা তাঁকে সারাজীবন তাড়া করে ফিরেছিল। কিন্তু একবার ছাড়া তিনি কখনও ঘুষ নেননি।

তখন পরমেশ্বরী খুব অসুস্থ। তাঁর অপারেশনের জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন ছিল। লাহোরের বিখ্যাত সার্জন ডঃ ভাটিয়ার কাছে অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা। অনন্যোপায় হয়ে গৌরীশঙ্কর ঘুষ নিলেন। এক রাত্তে কৃষণ চন্দর ঘুমিয়ে পড়েছেন ভেবে তিনি স্ত্রীকে বললেন--

'—এটা রাখ।

—কী?

—দু হাজার টাকা।

—কোথা থেকে পেলে?

বাবা কোন উত্তর দিলেন না।

—কোথায় পেলে বলছো না কেন? মা আবার জিজ্ঞেস করলেন।

—ঘুষ নিয়েছি।

মা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর দুর্বল হাতে নোটগুলো থরথর করে কাঁপতে লাগল।' দুই রাজপুত ভাই ঠাকুর চ্যায়েন সিং আর ঠাকুর নয়ন সিং নিজেদের মধ্যে মারামারি করে গৌরীশঙ্করের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। চ্যায়েন সিং-এর আঘাত ছিল গুরুতর। তাই নয়ন সিং দুহাজার টাকা ঘুষ দিয়েছিল গৌরীশঙ্করকে, যাতে তিনি এই ঘটনাটিকে কিছুটা লঘু করে দেখান।

২

বাল্যকাল

মায়ের হাত ধরে সুদূর লাহোর থেকে কৃষণ চন্দর যখন পুঞ্চের হাজি পীরের দরগায় এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর মনে হল—এখন থেকে এখানেই আমাদের ঘর হবে।

পাঁচ বছর বয়েসে কৃষণ চন্দর পুঞ্চের প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হন। অষ্টম শ্রেণী থেকে ভিক্টোরিয়া জুবিলী হাই স্কুলে পড়েন। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত তাঁর প্রথম ভাষা ছিল উর্দু। প্রত্যেকদিন ক্লাসে মার খেতেন, তাই তিতবিরক্ত হয়ে ক্লাস সিক্স থেকে সংস্কৃত নিলেন। কিন্তু সে কাজটাও খুব সহজ হল না। তখন ক্লাস এইটে উঠে ফারসী পড়া শুরু করলেন। সেখানেও মারের হাত থেকে অব্যাহতি মিলল না। ফারসী মাস্টারের কাছে মার খাওয়ার আরো একটা কারণ ছিল এই যে তিনি কৃষণ চন্দরের বাবার কাছে জানতে পেরেছিলেন কৃষণ চন্দর খবরের কাগজ পড়েন। এই মাস্টার মনে করতেন ছেলেদের খারাপ হবার মূলে রয়েছে খবরের কাগজ পড়া।

কৃষণ চন্দর সারাজীবন দুঃখ করতেন যে তিনি কোনও ভাষাই ভালভাবে শিখে উঠতে পারেননি। অথচ কলেজে পড়াকালীনই তিনি কাগজ ও ম্যাগাজিনে ইংরেজি ও উর্দুতে সাবলীলভাবে লিখতে শুরু করেন। স্কুলে দুজন উর্দু মুয়াল্লিম বা শিক্ষক ছিলেন। একজন মাস্টার কালুরাম। অন্যজন দীননাথ। দুজনেই জাতে ব্রাহ্মণ। এর মধ্যে দীননাথ কবিতা লিখতেন 'শৌক' ছদ্মনামে। স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির সম্মানে 'কসীদা' বা প্রশস্তিসূচক কাব্য লেখার ভার থাকত তাঁর ওপর। রাজা সাহেবের দরবারে কাব্যপাঠ করে, জন্মদিন বা বিয়ে উপলক্ষ্যে কবিতা লিখে 'শৌক' খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ সময়ে কৃষণ চন্দরও কবিতা লেখার দিকে ঝোঁকেন। এ নিয়ে একটি ট্র্যাজিক কাহিনী রয়েছে।

একদিন সাহস করে খানকয়েক স্বরচিত কবিতা নিয়ে কৃষণচন্দর মাস্টার দীননাথের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দীননাথ তাঁর বালক ছাত্রের কবিতা পড়লেন, দেখলেন, ওজন করলেন, তারপর তার দুগালে চড় কষিয়ে বললেন- -'এগুলো কবিতা হয়েছে? কবিতা? এর রদিফ্ কোথায়? কাফিয়া কোথায়? বহর কোনটা? ওজন কোথায়?

পরে ক্লাসে সেই কবিতা সকলাকে শুনিয়ে দীননাথ এমন হাসলেন যে সেদিন থেকে মনের দুঃখে কবিতা লেখা ছেড়ে দিলেন কৃষণ চন্দর। পরে কোন এক সময় তিনি লিখেছেন—'আমার এখনও ধারণা শওক ঈর্ষার বশবর্তী হয়েই এমনটা করেছিলেন। কারণ গোটা শহরে তিনিই ছিলেন একমাত্র কবি, তিনি চাননি তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরী হোক।'

কৃষণ চন্দর খুব মনোযোগী ছাত্র ছিলেন না। পরীক্ষার আগে একমাস শুধু মন দিয়ে পড়তেন। ছাত্র হিসেবে ছিলেন সাধারণ। বিশেষ করে অঙ্কে ছিলেন খুব কাঁচা। স্কুলজীবনে একজন মাত্র শিক্ষকের আনুকূল্যই তিনি পেয়েছিলেন। ক্লাস টেনে পড়ার সময় মাস্টার বিশ্বম্ভর নাথ, তিনি কৃষণ চন্দরের লেখার ভক্ত ছিলেন, গোটা ক্লাসের সামনে বলেছিলেন 'কৃষণ একদিন সাহিত্যে খুব নাম করবে।'

স্কুলে পড়তে পড়তেই কৃষণ চন্দর মুন্সী প্রেমচন্দের গল্প পড়েছিলেন। হিন্দী সাহিত্যিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের অনুবাদও পড়া হয়েছিল। বাবা গৌরীশঙ্করের বন্ধু ছিলেন সৈয়দ মজফ্ফর হুসেন শাহ্। তাঁর ছেলে হাসান ছিলেন কৃষণ চন্দরের বন্ধু। তাঁদের লাইব্রেরীতে প্রথম বাইবেল, কোরাণ, মজিদ, ঋকবেদ, ওল্ড টেস্টামেন্ট, কালিদাস, শেক্সপীয়রের হ্যামলেটের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। প্রকৃতপক্ষে হাসানের কাছেই বইয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়তে শেখেন কৃষণ চন্দর।

কৈশোরে কৃষণ চন্দরের হকি, ফুটবল, অশ্বারোহণ প্রিয় ছিল। সঙ্গীত ও শিল্পকলারও অনুরাগী ছিলেন। বেশ কিছু ছবিও এঁকেছিলেন, কিন্তু কেউ উৎসাহ না দেওয়ায় হতাশ হয়ে ছেড়ে দেন। নাটকেও অভিনয় করেছেন। সে সম্পর্কে লিখছেন—

'পুঞ্চের সাংস্কৃতিক জীবনে থিয়েটার ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আমরা প্রত্যেক বছর নাটক করতাম। বিভিন্ন উৎসবে রামায়ণ, মহাভারতের নির্বাচিত অংশ অভিনয় হত। তাতে সব ধর্মের মানুষ অংশগ্রহণ করত। ..'

উনিশশো উনত্রিশ সালে ষোল বছর বয়সে সেকেণ্ড ক্লাস পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন কৃষণ চন্দর। এরপর লাহোরে যান কলেজে পড়ার জন্য।

কিন্তু পুঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। কলেজ ছুটি হলেই কৃষণ চন্দর লাহোর থেকে চলে আসতেন এখানে। গরমের দিনগুলো ভাই মহেন্দরনাথের সঙ্গে পাহাড়ে, জঙ্গলে ঘুরে কাটত। ঝর্ণার ঠাণ্ডা, মিষ্টি জল পান করতেন। নদীতে স্নান করতেন। কোনও দিন দেরী হয়ে গেলে বাড়ি ফিরতেন না। কাছাকাছি গ্রামে কোনও দেহাতীর বাড়িতেই রাত কাটাতেন।

পুঞ্চের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল গভীর।

৩

লাহোর

১৯২৯ থেকে ১৯৪০

লাহোরে কৃষণ চন্দর থাকতেন তাঁর পিতৃব্যের বাড়িতে।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর লাহোর ক্রিশ্চান কলেজে এফ.এস.সি-তে ভর্তি হন। বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলে তাঁর মতই ডাক্তার হবে, তাই বিজ্ঞান নিয়ে পড়া শুরু হয়। কিন্তু খুব স্বাভাবিক কারণেই সায়েন্স কৃষণ চন্দরের ভাল লাগল না। ১৯৩১-এ এফ.এস.সি পাশ করার পর তিনি বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি কলাবিভাগের বিষয় নিয়ে। ১৯৩৩-এ বি.এ পাশ করার পর এম.এ পড়েন ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে। মায়ের ইচ্ছে ছিল ছেলে উকিল হব, তাই কৃষণ চন্দর ল কলেজ থেকে ১৯৩৭ সালে এল.এল বি পাশ করেন।

একাধিক ডিগ্রী অর্জন করা সত্ত্বেও কৃষণ চন্দর সাহিত্যের আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারেন না। তিনি ঠিক করলেন লেখাই হবে তাঁর বেঁচে থাকার উপজীব্য। কিন্তু এ কাজ খুব সহজ ছিল না। তাঁর পরিবার খুব সম্পন্ন ছিল না, তাই বেঁচে থাকার জন্য রুটির প্রয়োজন ছিল। আর রুটির জন্য প্রয়োজন ছিল পয়সার। কৃষণ চন্দর তখন বেকার, চাকরির জন্য দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

অবশেষে বন্ধু কানহাইয়ালাল কাপুরের চেষ্টায় একটা চাকবি জোগাড় হল। রোজ দশ ঘন্টা হাড়ভাঙ্গা খাটনির পারিশ্রমিক মাসে দেড়শো টাকা। সে কষ্টও কৃষণ চন্দরের মঞ্জুর ছিল কারণ ততদিনে তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন ইকবালের ওপর থিসিস লিখবেন, পি.এইচ.ডি করবেন। তাঁর সেই ইচ্ছার পরিণাম কী হল কানহাইয়ালালের জবানীতে শোনা যাক—

'তাকে (কৃষণ চন্দরকে) বলা হল লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজের ডঃ মহম্মদ ইকবাল (ইনি একই নামের অন্য ব্যক্তি) তার গাইড হতে পারেন।

একদিন কৃষণ চন্দর আমায় নিয়ে ডঃ মহম্মদ ইকবালের কাছে গেল। ডঃ ইকবালকে খুব অপ্রসন্ন দেখাচ্ছিল।

— রিসার্চ মানে কিছু আবিষ্কার করা। আপনি ইকবালের মধ্যে নতুন কী খুঁজতে চাইছেন? ..আপনার আগে তো এ নিয়ে অনেকে কাজ করেছেন?

— আমি আমার মত করে লিখব।

—সেটা কী রকম?

— ইকবাল একজন প্রগতিশীল কবি, এভাবে।

— ইকবাল নিজে কখনও এমন দাবী করেননি।

— তাতে কিছু যায় আসেনা। ...অনেক কবিই তাঁদের নিজেদের সেরা জিনিসটির বিষয়ে সচেতন থাকেননা। আপনি শেক্সপীয়রের কথাই ধরুন।

— আপনার এমন ধারণা হল কী করে যে ইকবাল নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সচেতন নন?

— ইকবাল নিজে বলেছেন।

— কী বলেছেন?

— ওঁর এই লাইনটা বোধহয় আপনার নজর এড়িয়ে গেছে—

ইকবাল ভি ইকবাল সে আগাহ্ নহী হ্যায়—
ইকবালও ইকবালকে জানে না।

আর এই শেরটা—

ঢুণ্ডতা ফিরতা হুঁ ম্যায় ইকবাল অপনে আপ কো
আপ হি গোয়া মুসাফির আপ হি মন্‌জিল্ হুঁ ম্যায়।

ইকবাল, খুঁজে ফিরি আমি নিজেকে
পথিক, আমি, গন্তব্যও আমি নিজেই।

— এতো কাব্য। সত্য নয়। যাই হোক, আপনার ফারসীতে দখল কীরকম?

— মোটামুটি।

— মোটামুটিতে হবে না।

— এটাই কি আপনার আপত্তির একমাত্র কারণ?

— এটা একটা। কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল ইকবাল এখনও বেঁচে। কোনও জীবিত ব্যক্তির ওপর আমরা থিসিস লেখার অনুমতি দিই না।

ডঃ ইকবালের কথায় কৃষণ চন্দরের খুব দুঃখ হল। বললেন, "আমরা কী অদ্ভুত মৃত্যুমুখী, যতদিন না একজন সাহিত্যিকের মৃত্যু হয়, ততদিন আমরা তাঁকে সাহিত্যিকই মনে করি না।" '

কৃষণ চন্দরের উর্দু জীবনীকার লিখছেন, কৃষণচন্দর যদি পি.এইচ ডি করতেন, তাহলে হয়ত কলেজে, সেমিনারে ইকবালের ওপর বক্তৃতা দিয়ে জীবন কেটে যেত, কিন্তু এমন কিছু অসাধারণ কাহিনী তাঁর বুকে জমে থাকত যাতে উর্দু সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যেত।

স্কুলে থাকতে কবিতা লেখা বন্ধ করলেও অন্যান্য লেখা চালু রেখেছিলেন কৃষণ চন্দর। রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন কারণ না লিখে তিনি পারতেন না। এম.এ পড়ার সময় কলেজ ম্যাগাজিনের ইংরেজি বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। এল.এল.বি পড়াকালীন এক অধ্যাপকের সঙ্গে মিলে 'দ্য নর্দার্ন রিভিউ' নামে একটি সাপ্তাহিকের প্রচলন করেন। কৃষণ চন্দর লিখছেন—'এতে প্রতি সপ্তাহে লাহোরের প্রগতিশীল শিবিরের সাহিত্যিক যেমন ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ, ডঃ মহম্মদ দীন তাশির ও অন্যান্যরা অংশ নিতেন।' এই কাগজটি প্রায় এক বছর চলেছিল। তারপর কৃষণ চন্দর এক ইংরেজ মহিলার সঙ্গে যুগ্ম প্রকাশনায় একটি ইরেজি মাসিক পত্রিকা, দ্য মডার্ণ গার্ল' বার করেন। পাশাপাশি লাহোরের বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক 'দ্য ট্রিবিউন'-এও কৃষণ চন্দরের লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৩৮ এ ইকবালের মৃত্যুতে ওই কাগজে কৃষণ চন্দরের স্মৃতিচারণা প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি ইকবালের কয়েকটি কবিতার ইংরেজি তরজমা করেন। ইংরেজি ভাষার ওপর কৃষণ চন্দরের উর্দুর মতই দখল ছিল।

কৃষণ চন্দর যখন লিখতে শুরু করেন তখন উর্দু সাহিত্যে পূর্ণ জোয়ার। রাজিন্দর সিং বেদী, উপেন্দরনাথ অশ্‌ক, সাদাত হাসান মান্টো—উর্দু সাহিত্যের এক একজন স্তম্ভ তখন তাঁদের সর্বোচ্চ ক্ষমতায়। কৃষণ চন্দর তাঁর প্রতিভার কারণে সহজেই তাঁদের মধ্যে জায়গা করে নিলেন। ১৯৪৩ এ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'শিকস্ত' (পরাজয়)

প্রকাশিত হয়। তারও আগে তাঁর ছটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সংকলনের নাম ছিল তিলিসিম-এ-খয়াল (স্বপ্নের মায়াজাল) এর প্রকাশ ১৯৩৯ সালে। এই সংকলনে গল্প ছিল বারোটি। পরের বছরই দ্বিতীয় গল্প সংকলন প্রকাশিত হয় 'নজারে' (দৃশ্যাবলী) এই নামে। এতেও গল্পের সংখ্যা ছিল বারো। কৃষণ চন্দরের বিখ্যাত কাহিনী 'দো ফার্লং লম্বী সড়ক' এই সংকলনের অন্তর্গত ছিল। এই সব গল্পে রোম্যান্টিকতা ও বাস্তবতার মিশেল ঘটেছিল।

কৃষণ চন্দর প্রবন্ধও লিখতেন। 'হাওয়াই কিল্লা', 'মাহ্‌নামা', 'হুমায়ুঁ' ইত্যাদি প্রবন্ধ ১৯৩৭ সালেই প্রকাশিত হয়েছিল। ওই সময়ই রুশ নাট্যকার আন্দ্রিয়েফের একটি নাটক অবলম্বনে 'হজামত' লেখেন কৃষণ চন্দর। তাঁর লেখা প্রথম মৌলিক নাটক 'বেকারী'। এই নাটকের ঘটনাস্থল লাহোর হিন্দু হোস্টেলের একটি ঘর।

১৯৩৮ সালে প্রগতিশীল লেখকগোষ্ঠীর প্রথম কন্‌ফারেন্স হয় কলকাতায়। এই কন্‌ফারেন্সে পঞ্জাবের প্রতিনিধিত্ব করেন কৃষণ চন্দর এবং ওই রাজ্যের সাহিত্য শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হন। সে সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে বামপন্থীরা প্রবলভাবে উঠে আসছিলেন। গান্ধীবাদ ও প্রগতিশীল শিবিরের মধ্যে এক অঘোষিত লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল। কৃষণ চন্দর এই লড়াইয়ে শামিল হলেন।

নভেম্বর ১৯৩৯ এ অল ইণ্ডিয়া রেডিও, লাহোরে চাকরি হল কৃষণ চন্দরের। একদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, অন্যদিকে সরকারী চাকরি ; সংবেদনশীল মানুষটির ভেতরে ভেতরে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে মধ্যবিত্তদের যা যা আপস করতে হয় তার থেকে কৃষণচন্দরও রেহাই পেলেন না। সবে বিয়ে করেছেন, পরিবারের দায়িত্ব ছিল। তাই যন্ত্রণা সত্ত্বেও হাতের বেড়ী, পায়ের শেকল মেনে নিলেন।

এক বছর লাহোর রেডিওতে কাজ করার পর কৃষণ চন্দর দিল্লী বদলি হলেন।

লাহোরে কৃষণ চন্দর তাঁর জীবনের সেরা সময়, তাঁর প্রথম যৌবন কাটিয়েছিলেন। লাহোরের মাল রোড, কফি হাউস, ইণ্ডিয়া টি হাউস, আরব হোটেল তাঁর স্মৃতিতে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিল। এইসব কফি হাউস, চায়ের দোকান, হোটেলে কত সন্ধ্যে সাহিত্য আলোচনা করে কেটেছে। জীবনের শেষ সময়েও এই দিনগুলোর কথা মনে করে তিনি শান্তি পেয়েছেন। সুন্দর মুহূর্তগুলোর কথা মনে করে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান থেকে কেউ এলে উৎসুক চোখে কৃষণ চন্দর জিজ্ঞেস করেছেন— 'লাহোর, মেরা লাহোর ক্যায়সা হ্যায়? দেশের বুক চিরে দুভাগ হয়ে গেলেও কৃষণ চন্দরের বুক থেকে 'যারাঁ-এ-রতন্' স্মৃতি কেউ মুছে ফেলতে পারেনি।

৪

দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ

১৯৪০-৪২

বদলী হবার পর কৃষণচন্দর দিল্লীর তিস্ হাজারী এলাকায় একটি বাড়ি নিয়েছিলেন। সেই বাড়িতে কৃষণ চন্দর ও তাঁর পরিবারের অনেক স্মৃতি সঞ্চিত রয়েছে। এই বাড়িতেই সাদাত হাসান মান্টো প্রথমবার বম্বে থেকে এসে পকেট থেকে

হুইস্কির বোতল বার করে বলেছিলেন—'যাও গেলাস নিয়ে এসো'। এখানেই সলমা সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর কৃষণ চন্দর তাঁকে বলেছিলেন 'আপনাকে বম্বে আসতেই হবে'। এই বাড়িতেই কৃষণ চন্দরের বাবা গৌরীশঙ্কর তাঁর শেষ দিনগুলো কাটিয়েছিলেন।

দিল্লির এই আপাত সাধারণ বাড়িটিতে অসাধারণ সব সাহিত্যের আড্ডা বসত। পানাহার চলত। তাতে অংশ নিতেন ফয়েজ, মান্টোর মত অনেক প্রথিতযশা সাহিত্যিক। তাঁদের কণ্ঠস্বর, হাসি, আবৃত্তির প্রতিধ্বনি এখনও গুঞ্জরিত হয় ওই বাড়ির দেওয়ালগুলোয়।

অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে কৃষণ চন্দর প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করতেন। তিনি চিরকালই মুখচোরা স্বভাবের, নিজের কাজটুকু ছাড়া আর কিছু বুঝতেন না। তাঁর চেয়ে কম কাজ করেও কিছু তোষামুদের পদোন্নতি হলেও তিনি যেমনকার তেমনই রয়ে গিয়েছিলেন। দিল্লি রেডিওর ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল তখন ছিলেন পত্‌রস। তিনি একদিন অফিস যাওয়ার পথে কৃষণ চন্দরকে গাড়িতে লিফ্‌ট দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লাজুক কৃষণ চন্দর সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। হয়ত ওপরওয়ালার কাছে নিজের হয়ে সুপারিশ করার সেটা একটা সুযোগ ছিল, কিন্তু সেটা কাজে লাগানো কৃষণ চন্দরের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

রেডিওতে কাজ করার কারণে একটা সুবিধে কৃষণ চন্দরের হয়েছিল। তিনি প্রচুর নাটক লিখতে পেরেছিলেন। নাট্য প্রযোজনার কাজ করার সময় মান্টো ও অশ্‌ক এর সঙ্গে মিলে তিনি অনেক নাটক লিখেছিলেন। সবই মৌলিক। তার মধ্যে 'সরাই কো বাহর', খুব বিখ্যাত হয়েছিল। এই নাটক থেকে পরে ফিল্মও হয়। এছাড়াও 'দরওয়াজহ্', 'নীলকণ্ঠ', 'কাংরা কী এক শাম'ও শ্রোতাদের অনুরাগ অর্জন করেছিল। এ সময়ের কথা কৃষণ চন্দর লিখছেন—

'সে বড় সুখের সময় ছিল। আমাদের তিনজনের ওপর যেন সাহিত্যের ভর হত। গল্প লেখা হত, নাটক লেখা হত। একের লেখা অন্যকে পড়ে শোনানো হত। কিছুদিনের জন্য বেদীও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল...'

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। কৃষণচন্দর দিল্লিতে একটি অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট কন্‌ভেনশনের আয়োজন করেছিলেন। তার আলোচ্য বিষয় ছিল—'বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় সাহিত্যের রূপরেখা কী হওয়া উচিত।' বিভিন্ন ভাষার প্রতিনিধিরা এতে যোগ দিয়েছিলেন। সরকারী কর্মচারী হওয়ার ফলে কৃষণ চন্দরের পক্ষে এমন একটি কন্‌ভেনশনে যোগ দেওয়া একটু কঠিন ছিল। কিন্তু ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল পত্‌রস একবাক্যে অনুমতি দেওয়ায় এই প্রায় অসম্ভব ঘটনাও ঘটতে পেরেছিল।

১৯৪১-এ কৃষণ চন্দর বদলী হলেন লক্ষ্ণৌ-এ। ততদিনে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্ণৌ এর নামজাদা সাহিত্যিকদের সঙ্গেও তাঁর আলাপ হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই। সেখানেও একটি বন্ধুমহল গড়ে উঠেছিল।

তারপর হঠাৎ একদিন কৃষণ চন্দরের কাছে পুণার শালিমার পিকচার্স থেকে

একটি চিঠি এল। চিঠিটি লিখেছেন প্রোডিউসর ডব্লিউ জেড আহমেদ। তিনি কৃষণ চন্দরকে তাঁর ফিল্ম কোম্পানীতে চিত্রনাট্যকারের চাকরি দিতে চান। কৃষণ চন্দরের বহুদিন ধরে, বিশেষ করে মান্টোর সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকেই ইচ্ছে ফিল্মে যোগ দেবার। রেডিওর চাকরি তাঁর আর ভাল লাগছিল না। সাহিত্যরচনার জন্য যে অবকাশ প্রয়োজন, তা পাচ্ছিলেন না। তিনি ইস্তফার চিঠি দিলেন।

তৎকালীন লক্ষ্ণৌ রেডিওর স্টেশন ডিরেক্টর কৃষণ চন্দরের অনুরাগী ছিলেন। তিনি ছিলেন কোনও এক সময়ে লাহোরের একটি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপকও। তিনি কৃষণ চন্দরকে অনুরোধ করলেন চাকরি না ছাড়ার জন্য। বললেন, রেডিওতে কৃষণ চন্দরের পদোন্নতির ব্যাপারটা তিনি নিজে দেখবেন।

কিন্তু কৃষণ চন্দর ততদিনে মনে মনে পুণা পৌঁছে গেছেন। শালিমার পিকচার্স এক সম্পূর্ণ আলাদা জগত। সেখানে তাঁর শিল্পবোধের পরিতৃপ্তি ঘটবে। প্রিয় বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে ইচ্ছেমত সময় কাটানো যাবে। তিনি ইস্তফা দিলেন।

এই সময় থেকে তাঁর জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। পাকদণ্ডী বেয়ে উঠতে উঠতে পৌঁছে গেলেন এক স্বপ্নের উপত্যকায়। পুণা ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি থেকে বম্বে। নতুন নতুন বন্ধু, নতুন নতুন প্রেমিকা। সলমা সিদ্দিকির সঙ্গে ক্রমশ তীব্রতর সম্পর্ক। আবার স্ত্রী বিদ্যাবতীর আদালতে নালিশ। হাজতবাস। পুরস্কার, উপাধিলাভ। রাশিয়া, হাঙ্গেরী ভ্রমণ। জরুরী অবস্থা সমর্থন।

কিন্তু সে আর এক কাহিনী।

তথ্যসূত্র ঃ কৃষণ চন্দর ঃ সাকসিয়ৎ ঔর ফান— জগদীশ চন্দ্র ওয়ার্ধান

উর্দু থেকে অনুবাদ ঃ খুরশিদ আলম
শাকিল আহমেদ খান

মহীন্দ্রনাথ

আমার ভাই — সবার লেখক

আমি ভাগ্যবান যে জীবনের একটা বড়ো অংশ কৃষণ চন্দরের সঙ্গে কাটিয়েছি। আমি কৃষণ চন্দরের বই পড়ে ওর জীবনের ছবি আঁকতে চাইছি না, আমি শুধু জানাতে চাইছি ওর সঙ্গে থাকার অনুভবটুকু। কৃষণ আমার চেয়ে ছ' বছরের বড়ো। ছোটবেলার স্মৃতি আমার কাছে ঝাপসা; বড়ো কিছু ঘটনা সে সময় ঘটেওনি।

আমার বাবা ভরতপুরের কাজ ছেড়ে পুঞ্ছ জেলায় ডাক্তারী করতে যান। রিয়াসৎ পুঞ্ছ কাশ্মীরের একটি অংশ ছিলো। এখন এর একটা বড়ো অংশ আজাদ কাশ্মীরের সামিল। পুঞ্ছ শহরটি শুধু কাশ্মীরের মধ্যে আছে। পুঞ্ছ কাশ্মীরের মতোই সুন্দর; উঁচু উঁচু পাহাড়, খুবসুরৎ বাগান, উপত্যকা, লম্বা লম্বা চির গাছ, চিনার, সবুজ ঘন জঙ্গল, স্বচ্ছ ঠাণ্ডা জলের নদী, শান্ত গভীর সরোবর, উঁচু পাহাড় থেকে লাফিয়ে নামা ঝরণা— এ সব নিয়েই ছিলো পুঞ্ছ। হাওয়া বয়ে যেত উঁচু চির গাছ আর ঝোপ ঝাড় ছুঁয়ে। উপত্যকা ছিলো নরম নরম ঘাসে ঢাকা। মানুষেরা সাহায্য করতে ভালবাসত। আমরা পুঞ্ছ হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরেছি, কেন না বাবা তিনবছর অন্তর এক তহশিল থেকে আর এক তহশিলে বদলি হয়ে যেতেন। শৈশবের সেই সময়ের মতো ভালো সময় আর জীবনে আসেনি। বাবা সুন্দর বাংলো পেতেন, তাতে থাকতো আকর্ষণীয় বাগান। দেখাশুনো করার চাকর বাকরের অভাব থাকত না। বাবা সরকারী হাসপাতালে কাজ করতেন। সেখানে বিনি পয়সায় ওষুধ দেওয়া হতো। যারা চিকিৎসার জন্যে আসতো তারা সবজি, ফল, ডিম ইত্যাদি উপহার নিয়ে আসতো। সে সময় এটাই রেওয়াজ ছিলো। লোকেরা ছিলো সৎ, কেউ কারও খারাপ চাইতো না, হিংসা ছিলো না, একে অন্য সম্মান করত। সুখ বা দুঃখ যাই হোক না কেন লোকেরা দেখা করতে আসতো। অসুস্থ হলেই শুধু গ্রাম থেকে শহরে আসতো না, বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান হলেও সাহায্য করতে আসতো। পুঞ্ছ শহরটি ছিলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ছিলো সুন্দর পাহাড়, সবুজ উপত্যকা, রূপোলী ঝর্ণা। বরফে ঢাকা পাহাড়ের চুড়োর পেছনে সূর্য উঠলে চারিদিক মায়াবী আলোয় ছেয়ে যেতো। দেখলে হৃদয় মন মোহিত হয়ে যেতো। এই পৃথিবী কি এতই সুন্দর! সম্ভবত এর প্রভাব পড়েছিলো কৃষণ চন্দরের হৃদয়ের উপর। এই জন্য তিনি কাশ্মীরের উপর এত সুন্দর ছোটগল্প লিখতে পেরেছিলেন।

কৃষণ চন্দরের সঙ্গে আমার কখনও ঝগড়া হয় নি। বাড়ির পরিবেশই এরকম ছিলো। আমার বাবা ছিলেন দয়ালু, স্নেহশীল। কম কথা বলতেন। তর্ক করার অভ্যেস ছিলো না। বাচ্চাদের উপর কখনও রাগ করতেন না; কখনও কিছু চাপিয়ে দিতেন না। প্রথম থেকেই তিনি বাড়ির লোকেদের সব কাজে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আমার মা ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির, তাঁর কথা সবাইকে শুনে চলতে বাধ্য করতেন। আমাদের

দেখাশুনো নিজেই করতেন। আমরা স্কুলে যাচ্ছি কিনা, ফিরে কি করছি, ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করছি কিনা সব কিছুর উপর মার নজর ছিলো।

আমরা দু'ভাই একসঙ্গে স্কুলে যেতাম। একই বন্ধুবান্ধব ছিলো আমাদের। কৃষণ আমার চেয়ে বেশি সামাজিক ছিলো, খুব কথা বলত, সবার সঙ্গে মিশে যেতো। স্কুলে আমাদের একটা ক্রিকেটের দল ছিলো। কৃষণ ছিলো ভালো ব্যাটস্‌ম্যান, আর আমি ফাস্ট বোলার। খেলাধূলায় কারো চেয়ে কম ছিলেন না কৃষণ; নিজেরা নিজেরা দল তৈরী করে প্রতিযোগিতা করতাম। কৃষণ চন্দর ইতিহাস ও প্রবন্ধ রচনায় সব সময় প্রথম হতেন। তবে অঙ্কে ছিলো খুব দুর্বল। দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় আমাদের শিক্ষক বিশ্বম্ভর নাথ প্রবন্ধ রচনায় মুগ্ধ হয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে একদিন এই ছেলে গদ্য লেখক হিসাবে বিখ্যাত হবে। পড়াশুনোর বইতে অবশ্য কৃষণের খুব উৎসাহ ছিলো না; পরীক্ষার সময়েই পড়তেন এবং ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করতেন। গানের আসরে তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী শ্রোতা, নাটকে অংশ নিতেন। সেই সময় পুঞ্ছে কোন সিনেমা হল ছিলো না। শহরে নাটক হতো ও রাসলীলা যাত্রা হতো। শহরে হৈ-চৈ পড়ে যেতো। মা এ সব পছন্দ করতেন না। উনি চাইতেন না ছেলে সারারাত নাচগান দেখুক। কিন্তু আমি ও কৃষণ পড়াশুনোর নামে বেরিয়ে এসব দেখতাম। একবার স্কুলে মহাভারত নাটক হয় — কৃষণ অর্জুনের ভূমিকায় অভিনয় করে। দর্শকরা খুব প্রশংসা করেছিলো তার। ছোটবেলায় কৃষণ ছবি আঁকতেও ভালোবাসত। কিছু কিছু ছবিও এঁকেছিলো---- বাড়িতে এসব কাজে কেউ উৎসাহ দিতো না, বাইরের লোকেরও শিল্প সম্পর্কে কোন ধারনা ছিলো না; ফলে আস্তে আস্তে ছবি আঁকা বন্ধ হয়ে যায়। অষ্টম শ্রেণী থেকে কৃষণ উপন্যাস পড়তে শুরু করে। যা পেতো তাই পড়তো। মা এই অভ্যেস পছন্দ করতেন না। হাতে উপন্যাস দেখলে কেড়ে নিতেন। তাঁর ধারনা ছিলো উপন্যাস পড়লে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এসব পড়লে মানুষ কোন কাজে উৎসাহ পাবে না। মা জানতেন না, যে কাজ করতে তিনি বারণ করছেন, সেই কাজেই ঐ ছেলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাবে।

কৃষণ চন্দর প্রথম জীবন থেকেই ভালো ভালো জামাকাপড় পছন্দ করত। কিন্তু বড়ো বড়ো লোকেদের মতো লম্বা চুল রাখার চেষ্টা করত না। প্রতিদিন স্নান করত, নিয়মিত চুল কাটত। সাবান দিয়ে বারবার মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে ভালো করে মুছত। ধোপদুরস্ত থাকতো, কিন্তু নিজেকে বড়ো করে দেখানো পছন্দ করত না। কিন্তু নিজেকে ভালো দেখাক, এটুকু চাইত। তাঁর চোখ ছিলো বড়ো, কপাল চওড়া, ঘন চুল, কালো মোটা ভুরু, মাঝারি উচ্চতা, খুব মোটাও নয়, খুব রোগাও নয়; শৈশবের মুখ ছিলো নিস্পাপ, মায়াময়।

দশ ক্লাস পর্যন্ত পুঞ্ছ হাইস্কুলে পড়েছিলো। তারপর বাবা তাকে লাহোর পাঠিয়ে দেন। সেখানে কৃষণ ফরম্যান ক্রীশ্চান কলেজে ভর্তি হয়। আমি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পুঞ্ছে পড়লাম। তারপর লাহোর গিয়ে ডি.এন.বি স্কুলে ভর্তি হলাম। আমাদের পরিবার খুব বড়ো ছিল না--- তিন ভাই, এক বোন। সরলা বড়ো হয়ে ছোট গল্পকার হিসেবে নাম করেছিল। কৃষণজী বড়ো হলেও, কোন সময় কোন আদেশ করত না। তবে একবার এক নির্দেশ দিয়েছিলো আমাকে। সে সময় আমি দশম শ্রেণীতে পড়ি। জানিনা কি কারণে আমি মাকে শক্ত কথা বলেছিলাম। মা কৃষণকে বললেন। বাবা

তখন পুঞ্ছে। আমরা সবাই তখন জ্যাঠামশায়ের বাড়ি, চোকমতী মহল্লাতে থাকতাম। বাড়ি ফিরলে কৃষণ চন্দর আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, এরকম বলেছি কি না।

'হ্যা'— আমি বললাম।

'তোমার লজ্জা বোধ হচ্ছে না?'

আমি রাগ করে বললাম, 'না'।

কৃষণ আমাকে দু'চড় মেরে বললে, 'মার কাছে মাপ চাও', আমি কাঁদতে কাঁদতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম, ক্ষমা চাইলাম না। কিন্তু সেই চড় আমি ভুলতে পারিনি। এর পর আমি অনেক ভুল করেছি, কিন্তু কৃষণ কখনো আমাকে শক্ত কথা বলেছে, মনে পড়ে না।

কলেজে ভর্তি হবার পর আমি তিন বছর আলাদা থাকতাম। কৃষণ সম্ভবত তখন এফ.এ পড়ত। সেই সময় ভগৎ সিংহের দলে যোগ দিয়েছিল। বাড়ি ফিরে আসার পর পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে লাহোরের কেল্লার মধ্যে নজরবন্দী করে রাখে। কোন প্রমান না পেয়ে দুমাসের মধ্যে নজরবন্দী দশা থেকে রেহাই দিল।

যখন কৃষণ চন্দর হোটেল থেকে পালাল, তখন আমার মা ছিলেন পুঞ্ছে। খবর পেয়ে লাহোর এলেন, ছেলের সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলেন। আমাদের মধ্যে কেউই জানতাম না যে কৃষণের সঙ্গে ভগৎ সিংহের দলের যোগ আছে। মা দিনরাত ভাবতেন ছেলে কোথায় গেছে, কেন গেছে, কোথায় খাচ্ছে, কোথায় শুচ্ছে। এসব ভাবতে ভাবতে পাগলের মতো চারদিকে ঘুরে বেড়াতেন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন। আমি আজও মনে করি, মা কৃষণকে যত ভালবাসতেন, অন্য কাউকে তত নয়।

কৃষণ চন্দর প্রথম প্রবন্ধ লেখে দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ হবার পর। এই হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ গুলজারিলাল নন্দের বাবা বুলকিরামকে নিয়ে। কৃষণ তাঁর কাছে ফারসী পড়তো। এটি ছাপা হয় 'রিয়াসৎ' নামক একটি কাগজে। সম্পাদক ছিলো দিওয়ান সিং মফতু। একসময় সে ফরম্যান ক্রীশ্চান কলেজ পত্রিকার সম্পাদকও ছিলো।

এল.এল.বি পাশ করার পর সে রায়ের গ্রুপে যোগ দেয়। দেশ স্বাধীন করার জন্য বিপ্লবী প্রবণতা তাঁর প্রথম থেকেই ছিল। সে সোস্যালিষ্ট সঙ্গীদের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগ দেয়। একসময় ঝাড়ুদার ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতিও হয়। সাম্যবাদ সংক্রান্ত প্রচুর বই পড়া ছিল তার। লাহোরের নাম করা সব স্যোসালিষ্টদের সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল। বিভিন্ন সময় তাঁদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কও করেছে। কিন্তু সে সময় লাহোরের সাহিত্যিক আবহাওয়া তার পক্ষে খুব অনুকূল ছিল না। কিন্তু তাঁর ছিল সাহিত্য রচনার ঝোঁক। তাই তরোয়াল ছেড়ে কলম ধরলো। উদ্দেশ্য কিন্তু রইল অভিন্ন।

কৃষণ চন্দরের মাথায় দুটি জিনিষ ঢুকেছিল -- এক, পুঞ্ছ ও কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী; দুই, ইংরেজের পরাধীনতা থেকে দেশের মুক্তি এবং সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা। তাই তার গল্পের মধ্যে সে সচেতনভাবে বিপ্লব ও সৌন্দর্য দুই চিন্তাধারার সমন্বয় করতো এবং অত্যন্ত সার্থকভাবেই।

কৃষণজীর প্রথম ছোট গল্প— ইয়ারকান (জন্ডিস)। জন্ডিস সারার পর সে গল্পটি লেখে। 'ইনসাহিয়া' ও 'হাওয়াইকিলে' প্রকাশিত হয় হুমায়ুণ ডাইজেস্টে সংকলনে।

সম্পাদক প্রশংসা করে লেখেন যে এই লেখক উর্দু ভাষাতে নাম করবেনই। 'আদবে লতিফ' ও 'আদবি দুনিয়াতে' কৃষণ চন্দরের লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। কৃষণ চন্দরের প্রথম ছোটগল্পের বই 'তিলসমা ই খয্যাল'; চৌধুরী নাজিম আহমদ এই বই ছাপেন। বই প্রকাশের পর কৃষণ চন্দরের সাহিত্যিক জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে গেল এবং তাঁর সঙ্গে শিল্পীদেরও যোগাযোগ হলো।

আমরা দুই ভাই হিন্দু হোস্টেলে থাকতাম। এখানে কানহাইয়া লাল কাপুর ও উপেন্দ্রনাথ আসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। সেই সময় কানহাইয়া লাল কাপুর ডি.এ.বি কলেজের অধ্যাপক ছিল। তিনি তখনো হাসির গল্প লেখা শুরু করেন নি। কিছুদিনের মধ্যে মা লাহোরে ফিরে এলেন, আমরা মোহিনী রোডে উঠে গেলাম। এখানে মৌলবী সালাউদ্দিন আহমদ, মীর্জা আদিব, মীরাজী, আহমদ নদিম কাশমি, আশিক হোসেন, বেদী, দেবীন্দর সত্যার্থী, মুমতাজ মুফতি, ফৈয়াজ মেহমুদ, চৌধুরী নাজির আহমেদ ও অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে উঠল। বড় বুখারি সেই সময় লাহোর রেডিও স্টেশন দেখাশুনা করতেন। কোন ভাল লেখক দেখলেই তিনি তাকে চাকরী দিতেন। তিনি কৃষণ চন্দরকে রেডিও স্টেশনে চাকরী দিলেন। মানসিকভাবে মেনে নিতে না পারলেও কৃষণ চন্দর চাকরীতে যোগ দিলেন। 'নজারে' রচনায় সে লিখলো ঃ 'সেই কৃষণ চন্দরের স্মরণে যাকে গত নভেম্বরের হিমেল উদাস সন্ধ্যায় হাতদুটো নিজে থেকে গলা টিপে চিরদিনের জন্যে মৃত্যুর খাটিয়ার নামিয়ে দিয়েছে।'

যে মানুষ প্রথম থেকে ইংরেজের গোলামির বিপক্ষে ছিল, এখন তাকে মেনে নিতে হল দ্বিবিধ শৃঙ্খলা— একটি দপ্তরের, অন্যটি ইংরেজের।

কৃষণজী লাহোর থেকে দিল্লী রেডিওতে এলো। সে সময় সব সময়ই লেখকরা বাড়িতে যাতায়াত করতেন। এখানে দেখা পাওয়া যেত নুন মীম রশিদ, ড. তাসির, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, রেবতী শরণ শর্মা, জগন্নাথ আজাদ, মন্টো, হংসরাজ রহেবায়, শহিদ আহমদ দেহলভি ও অন্যান্যদের। দিল্লীর সে সময় পরিচিত পত্রিকা ছিল 'সাকী'। সম্পাদক শাহেদ সাহেব সবসময় বিশুদ্ধ উর্দুতে কথা বলতেন। অত্যন্ত শৃঙ্খলা পরায়ণ, সামাজিক ও বন্ধুবৎসল মানুষ ছিলেন তিনি। মাসে তিনি এক দুবার নিমন্ত্রণ করতেন আমাদের। 'সাকী'-তে গল্প প্রকাশের সুবাদে আমারও নেমন্তন্ন হতো সেখানে। চমৎকার সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা থাকত। শাহিদ সাহেবের জোরদার হাসি সবার মধ্যে সংক্রামিত হত।

অল ইন্ডিয়া রেডিওতে লেখক শিল্পীদের আড্ডা জমেছিল খুব। কৃষণজী, মিন্টো, আসক, মীরাজী চাকরি করতেন সেখানে। বাকিদের ফীচার, নাটক, ছোটগল্প, হাসির গল্প এসব লিখতে বলা হত।

তাঁরা উচ্চস্তরের নাটক শ্রোতাদের কাছে পরিবেশন করেছিলেন। এই সময় কৃষণ চন্দর তাঁর বিখ্যাত রেডিও নাটক লেখেন 'সরাইকে বাহার'। মন্টো লেখেন একটি হিন্দীতে, অন্যটি উর্দুতে। আস্কও লিখেছিলেন।

মন্টো ও আস্কের মধ্যে খুব ঝগড়া লাগত। মন্টোর একটি উর্দু টাইপরাইটার ছিল। আস্ক দুটো কিনে আনল। তবে পরে ঝগড়া মিটেও যেত। সময়টা ছিল সাহিত্য রচনার পক্ষে খুব সুসময়; লেখকরা একে অপরের সাহিত্যগুণের প্রশংসা করত। কৃষণ চন্দর পেয়েছিলেন সবার অকুণ্ঠ প্রশংসা।

দিল্লী থেকে কৃষণ চন্দর বদলি হলেন লক্ষ্ণৌতে। আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। এর আগে আমার রেডিও নাটক দিল্লী থেকে প্রচারিত হয়েছে, গল্প বিভিন্ন সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা প্রায় দেড় বছর ছিলাম লক্ষ্ণৌতে। কৃষণ চন্দর রেডিও নাটকের দায়িত্বে ছিলেন। আমি চিত্রনাট্যও লিখতাম। লক্ষ্ণৌতে অনেকবার দেখা হয়েছে ফিরাক সাহেবের সঙ্গে। তিনি খাবার আগে বা পরে কৃষণজীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। নিজের শের বলতেন। ফিরাক সাহেবের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রশংসনীয়, তার কথাবার্তাও ছিল ভালো লাগার মতো। এই লক্ষ্ণৌতেই আমাদের দেখা হয়েছে জনাব এহতেসাম হোসেন,. মজাজ, শিফতে হাসান, হায়াতুল্লা আনসারী ও অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে।

শওকৎ থানভি লক্ষ্ণৌ রেডিও স্টেশন ছেড়ে চাকরী নিয়ে চলে যান পুনার পঞ্চোলী আর্ট প্রোডাকসন্‌সে। হঠাৎ একদিন ডব্লু.জেড. আহমদ কৃষণজীকে টেলিগ্রাম করলেন ঃ যদি কৃষণ চন্দর তাঁর কোম্পানীতে সংলাপ লেখক হিসেবে কাজ করতে চান তাহলে তিনি যে কোন দিন চলে যেতে পারেন।

ছবিতে কাজ করার খুব ইচ্ছে বা বাসনা কৃষণ চন্দরের ছিল না। কৃষণ আমাকে টেলিগ্রাম দেখিয়ে মতামত চাইলো। তবে কৃষণজী রেডিওর চাকরী ছাড়তে চাইছিল। কেন না প্রথম থেকেই এই চাকরীতে খুশী ছিলো না সে। তার মনে হয়েছিল কোন লেখক সরকারী চাকরী করে ভাল সাহিত্যের জন্ম দিতে পারে না, বিশেষত যে লেখক সাম্যবাদী ও বিপ্লবী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী, কৃষণ চন্দরের হাতে চাকরী ছাড়ার একটি লোভনীয় সুযোগ এল, আমিও সেই পরামর্শই দিলাম।

লক্ষ্ণৌ রেডিও স্টেশনের প্রধান সোমনাথ সাহেব বললেন, এই রেডিওতে তোমার উন্নতির বহু সুযোগ আছে। যে কোন দিন ডাইরেক্টর হয়ে যেতে পারো, কৃষণজী সে কথা মানলেন না। উনি স্বাধীনতা ভালবাসতেন। ইস্তফা দিলেন। সোমনাথ সাহেব বললেন, মহীন্দরকে এখানে থাকতে দিন। কৃষণ চন্দর রাজী হলেন না। আমরা পুনা চলে এলাম।

আমাদের জীবনে এলো নতুন দুনিয়া— নতুন মুখ, নতুন মূল্যবোধ, নতুন পরিবেশ, নতুন প্রশ্ন, নতুন অভিজ্ঞতা। এখানে না এলে কৃষণ চন্দরের জীবন সম্পূর্ণ হত না। এ জগতে একবার ঢুকলে বেরোবার পথ নেই। আমরা এই দুনিয়ায় বহু কিছু হারালাম, বহু কিছু পেলাম। এখানে লাখপতি আছে, আবার এমন লোক আছে চার পয়সার জন্যে যাকে প্রাণপাত করতে হয়। এখানে স্বার্থপর ও মহান দুরকম লোকই আছে। কিন্তু যা নেই তা হল আতিথেয়তা ও মহৎ মূল্যবোধ। আজ যে দরিদ্র কাল সে ভাল গাড়িতে চড়তে পারে; আবার যে গাড়িতে চড়ছে সে কাল হাঁটতে পারে। কিন্তু কেউ জিজ্ঞেসও করবে না কেন সে হাঁটছে। পুনা ও বোম্বের দিনযাপনের কথা ভোলা যাবে না। বোম্বেতে কৃষণ চন্দর দুটি ছবি করল— 'সরায় কে বাহর' ও 'দিল কী আওয়াজ'। দুটোতেই সে ছিল পরিচালক ও প্রযোজক। আমি ছিলাম নায়ক। টাকা জলের মতো খরচ হল। যতো এল গেল ততই। কৃষণ চন্দর টাকা আয়ের উপায় জানতো, কিন্তু খরচ করার পদ্ধতি জানতো না। যতক্ষণ না টাকা খরচ হত, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকতো না। এই সময় দেখা হল শাহির লুধিয়ানভী, সর্দার জাফরি, বিশ্বামিত্র, আদিল, মীরাজী, নিয়াজ হায়দর, আদিল রসিদ, কৈফী আজমী, খাজা আহমদ আব্বাস,

এজাজ সিদ্দিকি, ইসমত চুগতাই, আখতার-উল-ইমান ও অন্যান্য লেখকের সঙ্গে। ঘরে মাঝে মধ্যেই পার্টি হত। লেখকরা ছিলেন যুবক বয়সী। আকাশ ছিল উজ্জ্বল, বাতাস ছিল সুগন্ধে ভরা, হৃদয়,আনন্দ বাসনায় পূর্ণ। বিপ্লবের কথা শুনতে ভাল লাগত। সেই সময় সব কিছুই ছিল সম্ভব। দুটো ছবি চলল অনেক দিন। তবু ব্যবসায় ভাটা পড়ল। এর মধ্যে গাড়ি বিক্রি হয়ে গেল, চাকরদের বিদায় দেওয়া হল; সেই সময় কৃষণ চন্দরের সবচেয়ে খারাপ সময়। এই পরিস্থিতিতে যে কেউ হতাশ হয়ে যেতে পারতো, বেঠিক পথে চলে যেতে পারতো। কৃষণ চন্দর কোনদিন কাউকে দোষ দেয়নি, হাত পেতে সাহায্য চায় নি, সব কষ্ট নিজে সহ্য করেছে।

হাতে ছবির কাজ নেই। মন খারাপ। কৃষণ চন্দর কিন্তু লেখা বন্ধ করল না বরং বেশি পরিশ্রম করল। নিজের কলম, মেহনৎ আর বুদ্ধির উপর নির্ভর করে লাগাতর লিখে চললো, সব দেনা শোধ হল এবং এইভাবে চলচ্চিত্রের দুনিয়ায় সম্মান ফিরে এল।

ভারতবর্ষে বেশি লেখার সমস্যাও কম নয়। কেউ বেশী লিখলে লোকে বলবে, বেশি লিখবেন না, আপনার লেখার মান নেমে যাচ্ছে। যদি আপনি কম লেখেন তাহলে বলবে, হুজুর আপনি লিখছেন না, মানুষ আপনাকে ভুলে যাচ্ছে। কৃষণ চন্দরের বেশি লেখা নিয়ে কথা উঠত। যদি বিশ্ব সাহিত্যের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন বড়ো লেখকরা কত লিখতেন। বালজাক.দুশো উপন্যাস লিখেছিলেন. আলেকজান্ডার ডুমা বারোশো পঞ্চাশ, সমারসেট সম সারাজীবনই লিখলেন। নিশ্চয়, সব উপন্যাসই সমান ভালো হয় না; শেক্‌সপীয়রের 'হ্যামলেট' ও 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট'-র মধ্যে আসমান জমিন তফাৎ। ডস্টয়েভস্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিসমেন্ট' পড়ার পর 'ইডিয়ট' পড়া মুস্কিল। টলস্টয়ের 'ক্রয়েৎজার সোনাটা' মামুলি লেখা, কিন্তু 'ওয়ার এন্ড পীস' তুলনাহীন। পশ্চিমের শিল্পীরা সারা জীবন কাজ করেন, লেখেন, কিন্তু ভারতবর্ষে পরিশ্রমকে ভালো চোখে দেখা হয় না। আলস্যই প্রশংসা পায়। কৃষণ চন্দর প্রশংসা পাবার পর মেহনৎ করতে পিছপা হন নি এবং নিজেকে বড়ো লেখক হিসেবে জাহির করার চেষ্টাও করেন নি।

কৃষণ চন্দর অনেক লিখলেন, প্রেমচন্দের পর এরকম 'কলমকা সিপাহী' উর্দুতে দেখা যাবে না। উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে গল্পশৈলীর উপর দক্ষতা কৃষণ চন্দরের মতো কারো নেই। সাম্যবাদের উপর বিশ্বাস রেখে তিনি ধনীদের নৃশংসতা নির্দয়ভাবে এবং শিল্পগুণ সম্মতভাবে সামনে এনেছেন। এই জন্য ওঁকে ভারত ও পাকিস্তানের সবচেয়ে বড়ো গল্প লেখক বলা হয়।

কৃষণ চন্দর খুব বেশী আশাবাদী। কমিউনিজমের উপর তাঁর ভরসা ছিল অটুট। আমি ছিলাম উল্টো— খুব হতাশায় ভুগতাম। কৃষণ চন্দর কোনদিন আমাকে আমার মত বদলাতে বলে নি। সে কারও উপর কোনদিন নিজের মত চাপাতো না।

পারিবারিক জীবনে বয়সে ছোট হলেও আমাকে বড়ো ভাই বলত। বাড়িতে বিয়ে হলে সব টাকা পয়সা আমাকে দিয়ে দিতো ; সরলা বোনের বিয়ের সময় এই হল, রবীন্দরের বিয়ের সময়েও তাই। বাড়িতে ঝগড়া হলে আমাকে মিটিয়ে দিতে বলতো। এইভাবে আমার কিছু সুনাম হল, যদিও তা আমার প্রাপা ছিল না। একবার সবাই বসে মদ খাচ্ছে। কৃষণজী বললো, 'আমি চাই মহেন্দর, তুমি আমার আগে মরে

যাও।' কৃষণের এই কথা আমার খুব ভালো লাগল। এই একটি বাক্যে আমার প্রতি তার ভালোবাসা আমি অনুভব করতে পারলাম।

অনেকবারই বিপদে পড়লো; কিন্তু পরাজয় স্বীকার করলো না। আমি কখনো তাকে কারো নামে দোষারোপ করতে দেখিনি। আমার পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনে শুধু একবার তাঁকে কাঁদতে দেখেছিলাম। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় তার ছোট মেয়ে অলকা হঠাৎ পাগল হয়ে গেল। বহু চিকিৎসায় কোন ফল না হবার পর ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন তাকে রাঁচীর হাসপাতালে ভর্তি করতে। কৃষণজী আমার ঘরে এসে কান্নায় ভেঙে পড়লো। কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'জানি না কি পাপ করেছি যে আমার মেয়ের এই কঠিন শাস্তি হল।' আমি তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কৃষণজী দীর্ঘক্ষণ কেঁদেই চলল।

সাধারণভাবে কৃষণ চন্দর বন্ধুদের খারাপ কথা বলতেন না। বন্ধুরা ওঁকে আহত করলেও, শান্তভাবে তাঁর কথা শুনে যেতেন। গল্প নিয়ে কেউ সমালোচনা করলেও বলতেন, 'ভেবে দেখব।' দুচার বছরে এক দুবার রাগ করতেন না তা নয়, কিন্তু সবকিছুই দ্রুত মিটিয়ে নিতেন। প্রথমের দিকে সিগারেট খেতেন চেয়ে, পরের দিকে কিনে খেতেন, গলা খারাপ হবার পর সিগারেট ছেড়ে দেন। তিনটি প্রিয় সাধ ছিলো তাঁর— প্রথম, লেখা; দ্বিতীয়, পড়া; তৃতীয়, থুতু ফেলা। খুব ভালো কাগজে লিখতেন এবং সাধারণত রদবদল করতেন না। 'শিকাস্ত' কৃষণজী একুশ দিনে লিখেছিলেন। মনে হয় একটি শব্দও কাটেননি। ভালো জামাকাপড় ভালোবাসতেন, ভালোবাসতেন সুস্বাদু খাবার এবং অবশ্যই ভালো মদ। মদ খাবার পর খুব সিরিয়স হয়ে যেতেন। সবসময় ট্যাক্সি চাপতেন। নিজের গাড়ি কয়েকবার খারাপ হয়ে গেছে। কিছুতেই ঠিক করাননি। আজ গাড়ি হয় তো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে—সামান্য খারাপ। কালই হয়তো ঠিক করাবেন এবং বিক্রি করে দেবেন। আজ এখন উনি ট্যাক্সি চাপবেন।

কৃষণ চন্দরের বয়স এখন পঞ্চাশ বছর। উনি গল্প লিখছেন পঁচিশ বছর ধরে; ভারতবর্ষের চোদ্দটি ভাষায় ওঁর কাহিনী অনুবাদ হয়েছে। চেক, রুশ, চীন, জাপান, ইটালী, ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষাতেও তাঁর গল্প অনুবাদ হয়েছে। শুধু রাশিয়ায় তের লাখ বই বিক্রি হয়েছে। সম্ভবত সমকালীন লেখকদের মধ্যে এত সম্মান দেশে বা বিদেশে কেউ পাননি। এতেও কৃষণ চন্দরের মন বদলায় নি, যদিও একটু মোটা হয়েছেন, চুল পড়ে গেছে, কিন্তু মুখের হাসি এখনও অম্লান আছে।

উর্দু থেকে অনুবাদ ঃ শওকত আজিম

সরলা দেবী

কাকা—ভাই সাহেব—কৃষণচন্দ্র

কিছু লোক বলেন অতীতকে স্মরণ করার কি দরকার! কিন্তু আমার কাছে স্মৃতির থেকে প্রিয় খুব কম জিনিসই আছে। যখন অতীত বর্তমান ব্যথায় ভরা, ভবিষ্যত অজ্ঞাত, তখন স্মৃতিই জীবনের সম্বল হয়ে ওঠে। আমার পঁচিশ বছর আগেকার নিজের জীবনের কথা মনে পড়ে। সে সময় আমরা ভাবতেও পারিনি যে দিল্লীতে আমরা বসবাস করব। বাবা রইলেন না, কৃষণজী ও মহীন্দরজী বোম্বেতে—সব কিছু ছড়িয়ে গেল। কিন্তু স্মৃতির উত্তুঙ্গ তরঙ্গ আমার জীবনের দেওয়ালকে স্পর্শ করে; দুপুর বেলা ঘটে যাওয়া ঘটনার সুন্দর সুন্দর নৌকা এসে আমার মনের কিনারায় ভেড়ে।

পঁচিশ বছর আগেকার জমানা। কাশ্মীর রাজ্যে পুঞ্ছ একটি ছোট শহর। আমি শুনছি আমার বাবার বুটের শব্দ, মায়ের মেজাজী গলা। শহর থেকে দূরে একটি উঁচু টিলার উপর সুন্দর বাংলো, তার চারদিকে খুব বড়ো ফুলের বাগান। বাগ এই ছোট অঞ্চলের নাম। পূর্বদিকে নদী বইছে—নদীর গায়ে একটি পুরনো কেল্লা। লোকে বলে যখন রাজা গুলাব সিং এই কেল্লা জয় করেন, তখন বিদ্রোহীদের চামড়ার ভিতর কাঠের গুঁড়ো ভরে কেল্লার বাইরে টাঙিয়ে রাখা হয়েছিলো, যেন পরে কেউ মাথা তুলতে না পারে, নিজের মুখ না খোলে। আমার ওদিকে তাকাতে ভয় করত। কিন্তু আমি দেখেছি কৃষণজী যখন ওদিকে তাকাতেন, তখন তার চেহারার নরম ভাব কঠিন হয়ে যেত, ঠোঁটের মৃদু হাসি মুছে গিয়ে মুখ গম্ভীর হয়ে যেত। চোখে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিত। এই কেল্লা কৃষণ চন্দরের গল্পের উপর ছায়া ফেলেছে। এই কেল্লা তার মনের ভিতরে হিন্দু রাজাদের মত অহংকার আনেনি। কৃষণজী সবসময় বিষণ্ণ হয়েছেন, গম্ভীর হয়েছেন। সাধারণ আবেগের চাপ থেকে আলাদা হয়েছেন। ওঁর মুখ লাল হয়ে যেত, এই লালিমা বিদ্রোহের লালিমা।

আমাদের ঘরের একটি জানালা থেকে পাহাড়ের একটি চূড়া দেখা যেত। এই চূড়ায় সব সময় সাদা বরফ জমে থাকত। আমি শুনেছি আমাদের চাকর সর্দৌল সিং কৃষণজী ও মহীন্দরজীকে বলছে, 'জনাব, সত্যি বলছি ওখানে পরীরা থাকে। সেই গঙ্গার চূড়ার নীচে যে ঝিল আছে সেখানে ভোর চারটেয় এই পরীরা স্নান করতে নামে। রঙ তাদের গঙ্গার চূড়ার মত সাদা, চুল পাকা ভুট্টার মতো সোনালী। জনাব, চলুন, আমি আপনাকে দেখাব। জানি না ভাইসাব এই পরীদের দেখতে কোনদিন গিয়েছিলেন কিনা। কিন্তু আমি এই পরীদের ভাই সাহেবের গল্পে বিভিন্ন জায়গায় স্নান করতে দেখেছি। আমার স্মৃতির চিনার গাছে স্নানরত মেয়েরা—এরা কি সেই পরী নয়?—ফর্সা লম্বা লম্বা সোনালী চুলের মেয়েরা? এই বাগান—আমাদের বাড়ি—কত সবুজ—কত রঙ বেরঙ—গোলাপের শত শত ফুল—তরনারি—আড়ু —লাখপতি—আলু—আপেলের ফুল—আর গরু মহিষ, খরগোস, বটের, মোরগ — এ সব ছাড়াও চাকরদের একটি পুরো ফৌজ; মা চাকরদের হুকুম করছেন, চাকররা

দৌড়াদৌড়ি করছে। বাবুর্চিখানায় পায়েস রান্না হচ্ছে, কেক তৈরী হয়ে গেছে। অন্যদিকে বড়ো উনুনে গোলাপের আরক বের করার জন্য গোলাপের ফুল ফোটানো হচ্ছে। তহশীলদারের বউ মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। জিজ্ঞেস করছেন — কাকা* আসছেন? 'হ্যাঁ, দুজনেই আসছে — কলেজের ছুটি হয়ে গেছে। এখনই সব কাজ সেরে নিচ্ছি, ওরা যদি এসে পড়ে, তখন চাকরদের আর সময় থাকবে না। ওদের সব কাজই অদ্ভুত। আজকে ডিঙ্কি যেতে হবে, আজকে সন যেতে হবে — চাকরদের ছুটি দাও। ডিসপেনসারির বড়ো মাঠে আজকে নাটক, কালকে গানবাজনা। রোগীরাও দেখতে পায়। রোগীরা বলে ডাক্তার সাহেব, আপনার ওষুধ অতুলনীয়, কিন্তু আমাদের অর্ধেক ব্যাধি আপনার ছেলেরা এলে ঠিক হয়ে যায়। বহিনজী, দুটো অবধি সভা হয়। বাড়ি ফেরার নাম নেয় না।' তহশীলদারের বউ ফিরে যায়, সন্ধ্যায় ভাই সাহেব এসে যান—তখন সেই প্রোগ্রাম।

আমি পড়াশুনা করি না। খেলা করি। তখন মা আমাকে বোঝান — 'তোর দাদাদের আমি কোনদিন পড়তে বলিনি। কৃষণ তখন ক্লাস ফাইভে পড়ে। চাকরের সঙ্গে স্কুলে গেল। চারটের সময় চাকর স্কুলে গিয়ে দেখল কাকা [মা কৃষণকে কাকা ও মহীন্দরকে ছোট কাকা বলতেন] স্কুল থেকে উধাও। চাকর ছুটতে ছুটতে এল। পুরো শহরে চিরুনি তল্লাশি হল, কাকার কোন খোঁজ নেই। পুরো শহরে হাহাকার — ডাক্তার সাহেবের বড়ো ছেলে নিপাত্তা। সন্ধ্যা নেমে আসছে, আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি। কিছুক্ষণ পরে যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দেখলাম, কাকা আমার মাথার দিকে বসে রয়েছে। আমি একটা নতুন জীবন পেলাম, জোর করে চেঁচালাম — কোথায় পেলে আমার কাকাকে?

— গোয়াল থেকে?

— গোয়াল থেকে? ওখানে কি করছিল?

— আলিফ লায়লা পড়ছিল। তখন গোয়াল ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। চীৎকার করার পর কাকা ভিতর থেকে দরজা খুলল।

— না, না আমার সোনা। এ সব বই পড়তে নেই, তোকে উকিল হতে হবে। বড়ো জজ হতে হবে। হবি তো? সে আমার কথা মেনে নিল।"

উনি এম.এ., এল.এল.বি পাশ করলেন। কিন্তু উকিলও হলেন না, জজও হলেন না। কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন উঠত, কৃষণ কি মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করেন নি? তাহলে গল্পগুলো কি? সেগুলো তো কারো পক্ষে ওকালতি। একবার সে জজের চেয়ারে বসেছে, ট্যাক্সি ড্রাইভার হিসেবে ন্যায়ের ট্যাক্সির এক্সিলেটরে খুব জোরে চাপ দিয়েছে [কাচ কে টুকরে]।

কাকা লাহোর থেকে তার কলেজ ম্যাগাজিন পাঠিয়েছে। তাতে তার গল্প আছে। বাবা বললেন, গল্পটা খুব ভালো। মা বললেন, এই অভ্যেস ছাড়াতে হবে। কিন্তু আমার সমস্যা অন্য ধরনের। আমি উর্দু জানি না। আমি আমার ছোট ভাই ওমকে বলি আমাকে উর্দু শিখিয়ে দিতে। সে সময় হিন্দু মেয়েদের হিন্দী পড়ানো হত, আর

কাকা — পাঞ্জাবে জোয়ান ছেলেদের 'কাকা' বলে।

ছেলেদের উর্দু। কাকার লেখা গল্প পড়ার শখ কাকার ছোট বোন সরলাকে শুধু নয়, কাকার মাকেও উর্দু শিখিয়েছে।

আমাদের চৌকিদার জামালকে গানে পেল — সারা দিন গেয়ে ফেরে —

'বাঁগা দে উইচ বুলবুল বোলে
কিঁসিয়া দে উইচ বোলন পানি
জিন হা সাভে খজুন ও ছোড়ে
খবর উথাদি জানি।'

মা বাবাকে অভিযোগ করেন বাড়িতে জোয়ান ছেলেরা, তার উপর পড়াশুনোর সময় আপনার হাসপাতালের চাকররা সজ্জন বিছোড়ে গেয়ে ফেরে, নিজের জাত পর্যন্ত মানে না। মাজী একটি প্রবাদ বলেন — 'জাত দি কোড় কলি ছতরা না জানে।' কিন্তু বাবুজী প্রাণ খুলে হাসেন — 'ওয়া কাকের মা, যদি আমরা গাইতে না পারি, তাহলে অন্যরাও কি গান না গেয়ে থাকবে — এ কি কথা।' ঠিক ঐ সময়ই কাকা সেই গানের সুরেই শিস্ শিস্ দিতে দিতে বাড়ি ঢুকছিল। মাজীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মা কাকাকে বোঝালেন, 'বেটা ভজন গাও, জয় জগদীশ হরে। এই সব ফালতু লোকেদের সঙ্গে মেশা ভালো না।' — ঘটনা হলো পাহাড়ে মেয়েদের দাম লাগে। যে বাড়িতে ওর আশীর্বাদ হয়েছিল, সেই মেয়ের জন্যে পাঁচশো টাকা চেয়েছিল। হাকিম নুর আলির সঙ্গে সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। নূর আলির বয়স পঞ্চাশ হলে কি হবে সে মেয়ে সুখী — বড়ো জমি আছে তাদের। জামালের দুঃখ ভাইসাবকে বিষণ্ণ করেছিল। মিট্টি কা সনমে সেই গান আছে, জামালের গান — বাগাঁ উইচ বুলবুল বোলে।

কেন গেলি জামালের বাড়ি? কেন খেলি জামালের বাড়ির উগরা? [নুন মেশানো ভাতের মাড়]— মাজী আমার আর ছোট ভাইয়ের মুখে চড় কষালেন। এর মধ্যে ভাই সাহেব এসে পড়লেন।

'কি হয়েছে মাজী'?

'সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। এরা মুসলমান ঘরে উগরা খেয়ে এসেছে'।

'মাজী, চাল আর উগরা কোন ধর্ম হয়? চাল হিন্দুরও, মুসলমানেরও — চাল চালই হয়।'

কৃষণজী খুব কম কথা বলতেন। কিন্তু ওর কথা আমাদের পরিবর্তিত করেছে, মাজীও পরিবর্তিত হয়েছেন।

আমরা ভাই সাহেবকে ঘরের ভিতর কম, বাইরেই বেশি পেয়েছি। বাইরে থাকলেও ও আমাদের থেকে দূরে সরে যায় নি। তবে মহীন্দ্রজী ও কৃষণজীর ব্যাপারই আলাদা। একবার কৃষণজী পরীক্ষায় পাশ করে গেলেন আর মহীন্দ্রজী ফেল করলেন, শহরে রেওয়াজ ছিল পাশ করলে লাড্ডু বিতরণ করতে হবে। মহীন্দর ফেল করাতে লাড্ডু বিতরণে ইতস্তত করছিলেন বাবুজী, মাজী; কিন্তু মহীন্দ্রজী একথা শুনে কৃষণজীকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, আমার ভাই পাশ করেছে মানে হলো আমিও পাশ করেছি। মাজী; মিঠাই বিতরণ করুন।

তখন আমি লাহোরে ক্লাস ফোরে পড়ি। মাও থাকতেন সেখানে। আমার বাবুজী একাই পুঞ্ছ শহরে থাকতেন। আমরা পুঞ্ছের ঠাণ্ডা থেকে গেছি। তাই লাহোরের গরম

সহ্য করতে পারতাম না। তখনও গ্রীষ্মের ছুটি পড়েনি, কিন্তু আমার জ্বর এসে গেল। খুব জ্বর। গরমে নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। অনেক চিকিৎসা হল। লাভ হল না। দুর্বলতা খুব বেড়ে গেল। আমি বাবুজীকে খুব ভালবাসতাম ; আমার মনে হল পুঞ্ছে বাবুজীর কাছে গেলেই আমি ভালো হয়ে যাব। না হলে আমি মরে যাব। কিন্তু লাহোর থেকে পুঞ্ছে যাওয়া খুব সহজ নয়। চারদিনের যাত্রাপথ — রাওয়ালপিণ্ডি থেকে রেল, তার পর মোটর, তার পর খচ্চরের পিঠে চড়া। তবু আমি জেদ করলাম, মাজী আমার কান্নাকে একদম পাত্তা দিলেন না। কিন্তু ভাইসাহেব দুটো টিকিট নিয়ে কলেজ থেকে ফিরলেন। মাজী আমাদের বিরত করার খুব চেষ্টা করলেন। শেষে বললেন, 'যদি এর রাস্তায় কিছু হয়ে যায়?' ভাই সাহেব উত্তর দিলেন, আর যদি এর এখানে কিছু হয়ে যায়?

রাওযালপিণ্ডি অবধি আমার জ্ঞান ছিল। সারা শরীর আগুনের মত জ্বলছে। যখন জ্ঞান ফিরল তখন আমি বাবুজীর কাছে। বাবুজী বলেছিলেন ভাইসাহেব আমাকে কি ভাবে এনেছিলেন। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম বলে পালকিতে তুলে প্রায় কোলে করে এনেছিলেন। আমি ভালবাসা আর বিশ্বাসভরা চোখে ভাইসাহেবের দিকে তাকালাম। উনি মৃদু হেসে বললেন, 'আমি জানি তোর বাবুজীকে দরকার ছিল, ওষুধের নয়। তুই ভাল হয়ে যাবি।' সে জানত রাস্তায় আমার কিছু হবে না। যেখানে মানুষের মন পড়ে থাকে, সেখানে পৌঁছানোর সময় অসুস্থতা মানুষের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

ভাইসাহেব আমাদের ভাইবোনের সঙ্গে কোন দিন উঁচু স্বরে কথা বলেন নি। মাজী আমাদের নামে অভিযোগ বা নিন্দা করলে উনি উঁচু স্বরে বলতেন, 'মাজী, আগে আমাকে খেতে দাও, তার পর আমি সবাইকে ঠিক করে দেব।' খাবার পর সব রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যেত, আর মাজীও সব ভুলে যেতেন।

'মুঝে কিসীসে নফরৎ নেহী' [আমি কাউকে ঘৃণা করি না] — ভাইসাহেবের এই গল্প তার মাথা থেকে বেরোয়নি, ওঁর স্বভাব, ওঁর আস্থা থেকে বেরিয়েছে। ওঁর বিশ্বাস ছিল, মানুষ যদি রুটি পেয়ে যায়, তখন সে কাউকে ঘৃণা করে না, কারো উপর রাগ করে না। কিন্তু রুটি অত সহজে পাওয়া যায় না। মানুষের সামর্থ্যে রুটি হাতে এলেও আধা, একের চার বা শুকনো রুটি হাতে আসে। তাও কেড়ে নেবার জন্যে মানুষ, কুকুর, কাকেরা চার দিক ঘুরতে থাকে। বোধ হয় এই জিনিষই ভাই সাহেবের মনে অসন্তুষ্টির জন্ম দিয়েছিল।

আমি একবার ভাই সাহেবের সঙ্গে রাঁচী গেলাম। দিল্লী থেকেই ভাইসাহেব একটি টুকরিতে ফল আর বিস্কুট নিলেন। 'জানি না স্টেশনে খাবার পাবো কি না!' গাড়ি চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ভাইসাহেব আমাকে ফল আর বিস্কুট দেওয়া শুরু করলেন। 'নাও খেয়ে নাও, জানি না খাবার পাবে কি না!' নিজেও খেলেন আমাকেও খাওয়ালেন। তার পর বেয়ারা এলে খাবার অর্ডার দিলেন। সে জানাল যে অমুক স্টেশনে খাবার দেওয়া হবে। সে তার করে দিয়েছে। কিন্তু সেই স্টেশনের আগে যত স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াল, তত জায়গাতেই ভাইসাহেব কিছু না কিছু খাবার কিনে আনলেন। 'এদের কথায় ভরসা কোরো না, যা পাচ্ছ খেয়ে নাও। ওখানে গিয়ে যদি খেতে না পাও।'

সত্যি, ভাইসাহেবের এই দুনিয়ার ব্যবস্থার উপর ভরসা ছিল না। রেল গাড়ি দেরীতে চলে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এটা শোনা যায়নি যে গাড়ি সময়ের আগে ছুটেছে। কিন্তু ভাইসাহেবকে গাড়িতে যারা বিদায় জানাতে আসবে উনি তাদের অবিলম্বে জড়িয়ে ধরে বিদায় জানাবেন। যদি বলা যায় যে দশ মিনিট বাকি, সিগন্যাল দেয়নি — উনি বলবেন, কে জানে গার্ড সাহেব ভুল করে পতাকা নাড়ালে গাড়ি যদি ছেড়ে দেয়। রিস্ক নেওয়া উচিত নয়।

ভাইসাব কি সত্যি রিস্ক নিতে ভয় পান? না শুধু ভাইসাহেবের ভরসা চলে গেছে। উনি যাকে ভালবাসেন তাকে আলিঙ্গনও করতে পারেন না, পাছে সময় তাঁকে ধোঁকা দেয়, গাড়ি চলে যায়। তাই তিনি তাঁর গল্পে উপন্যাসে প্রকৃতিকে, মানুষকে আলিঙ্গন করেছেন, বাল্যকালে ও যৌবনে যাঁদের সঙ্গে তিনি গলাগলি করেছিলেন।

জয়ন্ত মজুমদার

জনৈক পাঠকের চোখে কৃষণ চন্দর

এই সময়ের নৈরাশ্য-পীড়িত দিনযাপনের ফাঁকে কৃষণ চন্দরের সাহিত্যকর্মের পুনঃপাঠ অবশ্যই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। দেশের লক্ষ-কোটির চোখে এখন বিজ্ঞাপনের অঞ্জন, সবরকম আদর্শবাদের নির্বাসন— আয়োজন বিশ্বজুড়ে, জাত-পাত-ধর্মীয় বহুস্তরী অসংখ্য বিভাজনের কুশ্রীতাকেই এখন অলঙ্কার বলে ভাবতে শেখানো হচ্ছে, জানা যাচ্ছে নিরন্তর পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার আর এক নাম অগ্রগতি, টিভির স্নিগ্ধ আলোয় তাই এখন জনপ্রিয়তম উপভোগ যুদ্ধ।

দিকে দিকে প্রচার 'রামনাম কেবলম্'-ই সেই মন্ত্রশক্তি যা দিয়ে আমরা নিরন্নকে যোগাতে পারি অন্ন, অশিক্ষার অন্ধকারে আলো। এই মন্ত্রের উচ্চারণ আরও সাবলীল, আরও নিখুঁত করার আয়োজনে প্রয়োজন অসংখ্য নরমেধ যজ্ঞের, সেই মন্ত্রের শক্তি এতটাই হওয়া উচিত যাতে যে কোন মুহূর্তে প্রতিবেশীকে করানো যায় কুর্নিশ, আবার একই সঙ্গে তা মেরুদণ্ডকে করবে ততটাই নমণীয় যাতে বুশবাবা বা ক্লিনটনবাবাকে সেলাম জানাতে তিলার্ধমাত্র দেরী না হয়।

নরমেধ যজ্ঞের সামাজিকীকরণ এখন সম্পূর্ণ। তবু সময়ের উপর এই অনচ্ছ আবরণই শেষ কথা নয়। শিল্পীকে লিখতেই হয়, ছবি আঁকতেই নয়, মূর্ত্তি গড়তেই হয়। কিছু কিছু স্বচ্ছতার পরিবেশ পুনরায় গড়ে ওঠে সেই আলোয়।

"মেয়েটি জঙ্গলের শুকনো ঘাসের উপরে মরে গেল, আর ওর হাতের বইখানা ওরই রক্তের দাগে নোংরা হলো। বইটা ছিল সমাজতন্ত্রের ওপর। হয়তো ও খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে ছিল, হয়তো দেশের ও জাতির সেবায় কাজ করবার এক জ্বলন্ত বাসনা ওর ছিল। হয়তো ভালোবাসার জন্য ওর আত্মা যন্ত্রণায় দীর্ণ ছিল, কারো ভালোবাসা পাবার জন্যও, আদরের আলিঙ্গনে মিলিত হবার জন্য, নিজের সন্তানকে চুমো দেবার জন্য। ও তো মেয়ে ছিল, কারো প্রিয়তমা, কারো জননী, সৃষ্টির অজানা রহস্য; আর এখন এই জঙ্গলে ও মরে পড়ে রইল এবং শেয়ালে ও শকুনে ওর শব খেয়ে যাবে। সমাজতন্ত্র, তত্ত্ব ও প্রয়োগ .... জন্তুরা এখন ও-সব খেয়ে ফেলেছে।

রাত্রির হতাশ অন্ধকারের মধ্যে আমি এগিয়ে চললাম, দিশি মদে মাতাল কিছু লোককে আমার গাড়ির মধ্যে বয়ে নিয়ে; তাদের গলায় চিৎকার; 'মহাত্মা গান্ধি কী জয়'। (পেশোয়ার এক্সপ্রেস)

১৯৪৭-এ কৃষণ চন্দর লিখেছিলেন 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস' গল্পটি। সেই সময়ই তিনি লিখেছেন 'উত্তরদায়' (মেবী ওয়াদী বিরান হো গঈ হ্যায়) ও 'কাফেলা'-র মত গল্প।

'উত্তরদায়' গল্পে আমরা পাই ফরমান আলিকে। ছোটবেলার বন্ধু গোপালের সঙ্গে জঙ্গলের মাঝখানে এক ফাঁকা তৃণক্ষেত্রে শুয়ে শুয়ে নীল আকাশ দেখত সে। ঘন দূর্বাঘাসে ঢাকা জায়গাটা যখন ওরা আবিষ্কার করে ওদের মনে হয়েছিল যেন পরীর দেশে এল। সেই বন্ধু গোপালকে মেরে ফেলেছে স্বাধীনতার আনন্দ উৎসব পালন

করতে আসা এলাকার লোক। ফরমান আলি তাকে বাঁচাতে গিয়ে মারাত্মক আহত। লোকেরা ওকে ছেড়ে দিয়েছে না মেরে, মুসলমান বলে। ফরমান আলি জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে সেই তৃণক্ষেত্রে তারা ভরা আকাশ দেখছে। তার সামনেই বন্ধুকে দু টুকরো করা হয়েছে। সে ভুলতে পারছে না এক আহত চোখের সকাতর চাহনি। দৌলতরাম মহাজনের বাড়ির বাইরে আম গাছের তলায় একটি মৃত শিশুকে পড়ে থাকতে দেখেছিল। চোখ মেলে ওপরের দিকে চেয়েছিল সে। তার চোখের ওপর সবুজ পাতার ভিড়ে নাখ ফল ঝুলছে। এমন দৃশ্য সে আজ পর্যন্ত দেখেনি।

শ্মশানের সেই স্তব্ধতায় ফরমান আলি মৃতদেহের সারি পেরিয়ে আবার গ্রামে আসে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য। প্রতিবেশী যাদের আত্মীয় পরিজনের মত দেখত, ফরমান তাদেরই এক বিধ্বস্ত শূন্য ঘর থেকে খাবার জোটায়। জঙ্গলে ফেরে। নিজের কান্নাকে রোধ করতে পারে না। সেই সময় অচেনা অজানা দুধের শিশু এক পেছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরেছে, 'আব্বা, আব্বা' বলে। বাচ্চাটা ক্রমাগত চিৎকার করছে। সেই শুনে আরও একটি ছোট্ট মেয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে খাবার চাইতে লাগল। জামাল পাটোয়ারীব মেয়ে। তারও বাবা-মা পালিয়ে গেছে। শিশু দুটি খিদে-তৃষ্ণায় ধুঁকছে। ফরমান আলি এদেরছেড়ে পালাতে পারে না, ওদের নিয়ে এগোতে থাকে।

তৃণক্ষেত্রে যাওয়ার পথে একটা কাপড়-চোপড় ভরা বাক্স দেখতে পেলো। পাশে বছর সাতেক বয়সের এক শিখ-শিশু চুপচাপ বসে আছে। বাবার অপেক্ষায়। বাবা ভালো প্রসাদ আনবে। ফরমান আলি তাকে বলে বাবা আর ফিরবে না। শিশুটি কেঁদে ফেলে। সে বলে তার ছোট ভাই ঝোপের অন্যদিকে শুয়ে রয়েছে, তাকেও নিতে হবে। সে কথা বলছে না, সাড়াও দিচ্ছে না। ফরমান আলি বুঝতে পারে ওর ছোট ভাই মৃত্যুর অগাধ ঘুমে আচ্ছন্ন। চোখ দুটো বন্ধ। চিবুকে একখানা ছোট্ট হাত। যেন কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

ফরমান আলি শিশু তিনটিকে নিয়ে আবার তৃণক্ষেত্রে আসে। গোপাল আর তার স্বপ্নের সেই অবকাশভূমিতে শিশুদের জন্য খাবার বানায়। ঘুম পাড়ায়। কিন্তু শিখ-শিশু হৃদ্যোৎ ঘুমোয় না।

'তুমি ঘুমোচ্ছ না কেন?'

হৃদ্যোৎ উত্তর দিল, 'তুমি আমাকে মেরে ফেলবে।'

'একথা কে বলল তোমায়?'

'বাপু বলতো। মুসলমানরা ভাল নয়।'

'ওরা আমাদের খুন করে। তুমি মুসলমান না?'

'হ্যাঁ, আমি মুসলমান, কিন্তু আমি তোমাকে মারব না।'

'কেন?'

'কারণ, আমি তোমাদের গুরুকে মানি।'

'আমাদের গুরুকে মানো তুমি?'

'হ্যাঁ, সারা পৃথিবীতে যত বড় বড় গুরু আছে সবাইকে মানি আমি।'

'তাহলে তুমি কেমন মুসলমান?'

'আমি একটু অন্য রকম মুসলমান।'

হৃদ্যোৎকে গল্প শুনিয়ে গভীর মমতায় ঘুম পাড়ায় ফরমান। গণরাজ্যে পৌঁছনর গল্প। সবুজ দূর্বাঘাসের উপর তিনটি নিষ্পাপ ঘুমন্ত শিশুকে ছেড়ে কোথাও যাবে না ফরমান। এখন তাকে এখানেই থাকতে হবে। এখানেই নিজের লড়াই লড়তে হবে। (উত্তরদায় ঃ অনুবাদ আশরফ চৌধুরী)

প্রতীকী গল্পটি কি অসম্ভব মমতায় গড়ে তুলেছেন কৃষণ চন্দর। যন্ত্রণার বোধ আন্তরিক বলেই তাকে সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। গল্পপাঠের শেষে তাই পাঠকও ফরমান আলির দায় থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে না।

এ গল্প আমাদের ক্রুদ্ধ করে না, বরং এক গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন করে। আবার আলোর দিশা খুঁজে পাওয়ার আকুতিও অনিবার্যভাবে বোধ করি।

এই গল্পটির সাথে সাথে কৃষণ চন্দরের ঘনিষ্ট বন্ধু উর্দু সাহিত্যের আর এক দিক্‌পাল সাহিত্যিক সাদাত হোসেন মন্টোর 'টোবা টেক সিং' গল্পটির কথা মনে আসে। একই রকম হৃদয়ের ছোঁয়া সেই গল্পে। দেশভাগের রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতাকে ব্যঙ্গ করে টোবা টেক সিং-এর মৃতদেহ পড়ে থাকে সেই জমিটুকুতে যা কোন দেশেরই নয়, যার একপাশে ভারতবর্ষ আর এক পাশে পাকিস্তান।

প্রেমচন্দ-পরবর্তী সময়ে উর্দু সাহিত্যে কৃষণ চন্দর ও সাদাত হোসেন মান্টোর পাশাপাশি ইস্মত চুগতাই, রাজিন্দর সিং বেদি, খাজা আহমদ আব্বাস, মাসুদ আশার দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী গল্প লিখেছেন, সৃজনশীল মানুষের অঙ্গীকার রেখে গেছেন তাঁদের সাহিত্যে।

আবার 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস' গল্পটির কাছে আসি। পেশোয়ার এক্সপ্রেস নিজেই কাহিনী শোনাচ্ছে এখানে। পেশোয়ার থেকে বওনা হয়েছে হিন্দু শরনার্থীদের নিয়ে। বিভিন্ন অঞ্চলে সে দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখছে।

"প্রথমে শুরু করলো বেলুচি সিপাইরা। পনের জন ফায়ারিং-এ লুটিয়ে পড়ল।

এই তক্ষশিলা স্টেশন।

আরো বিশজন পড়ে গেল।

একদিন এই তক্ষশিলাতে ছিল এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। লক্ষ লক্ষ বিদ্যার্থী সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই পীঠস্থানে বিদ্যার্জন করত।

পঞ্চাশজন আরো মারা পড়ল। তক্ষশিলার যাদুঘরে এত সব অনবদ্য মূর্তি, এত অপরূপ অলংকার, ভাস্কর্যের এমন অদ্বিতীয় নিদর্শন, প্রাচীন সভ্যতার উজ্জ্বল প্রদীপ।

ঐ যে পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে বিশাল নগরীর ধ্বংসাবশেষ। তক্ষশিলার অতীত বৈভব এবং শ্রেষ্ঠত্বের অনুপম প্রতীক। আরো ত্রিশজনকে হত্যা করা হল। এখানেই এককালে কনিষ্ক রাজত্ব করেছিলেন। প্রজাদের সুখে-শান্তিতে, সৌন্দর্যে, ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন।

আরো পঁচিশজন খতম। এখানে ভগবান বুদ্ধের অহিংসার বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শান্তির পথ দেখিয়েছিলেন।

এবারে বাকি ক'জনের জীবনে মৃত্যু নেমে এল। এই তক্ষশিলাতেই হিন্দুস্তানের সীমাপ্রান্তে একদিন সর্বপ্রকার ইস্‌লামের পতাকা আকাশে উড়েছিল। সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং মানবতার পতাকা।

সব শেষ। আল্লা হো আকবর। প্ল্যাটফর্ম রক্তে লাল। আমি যখন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে এলাম, আমার চাকাগুলো যেন রেললাইন থেকে পিছলে পিছলে পড়ে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আমি বুঝি টলে পড়ে যাব এবং পড়ে গিয়ে বাকি যে ক'জন বেঁচে আছে তাদেরও শেষ করে ফেলব।' (অনুবাদ ঃ ননী শূর)

লেখক বিলাপের ভঙ্গীতে দাঙ্গার চরম ও ব্যাপক বীভৎসতা এবং সভ্যতার সাংস্কৃতিক সম্পদের বৈপরীত্যকে রেখে মানুষের মনকে বিক্ষুব্ধ করতে চেয়েছেন এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। সাদাত হোসেন মন্টোর 'শরিফান' গল্পটির কথাও এখানে বলা যায়। এই পাশবিক হত্যালীলার বিবরণ সেখানেও আছে। আর্তনাদের শব্দটি 'শরিফান, শরিফান' থেকে বদলে যায় গল্পের শেষে 'বিমলা, বিমলা'-য়।

এক তীব্র গরল পান করার অনুভূতি হয় গল্পগুলি পাঠের শেষে। প্রকৃত অর্থে যা অমৃত। তীব্র বিরাগে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করে লেখকরা চেয়েছেন ঐ আগুনের বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজেদের নিরাপদ ভাবতে থাকা নির্বিকার, নির্লিপ্ত জনচেতনাকে জাগ্রত করতে, দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী শক্তির উজ্জীবন ঘটাতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর পর্বে যুদ্ধ, মন্বন্তর, গণ আন্দোলন ও দেশবিভাগ মুখ্যত এই চারটি মারাত্মক অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছিল ভারত উপমহাদেশের জীবন। রাজনৈতিক ঐ ক্রান্তিকালে ভারতীয় সাহিত্য বয়েছিল কিন্তু যথেষ্ট বেগবান ধারায়। বিশেষত সে সময়ের বাংলা, উর্দু, পাঞ্জাবী সাহিত্য এর সাক্ষ্য বহন করছে। যুদ্ধ, ক্ষমতার চিনি খুঁটে খাওয়া রাজনৈতিক নেতা-জমিদার-জোতদার-ব্যবসায়ী জোটের চরিত্রহীনতা, দুর্ভিক্ষ, রেশনিং ব্যবস্থা ও কালোবাজারীর উদ্ভব, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু আগমন, নতুন কলোনীর উদ্ভব, ছিন্নমূল মানুষের মূল্যবোধের বিপর্যয় সমস্ত ধারার শিল্পী-সাহিত্যিকদের করে তুলেছিল সামাজিক বাস্তবতার প্রতি দায়িত্বশীল। মানসিকভাবে টিকে থাকার তাগিদেই সেটা তাঁরা করতে পেরেছিলেন। কৃষণ চন্দরও এর ব্যতিক্রম নন।

কৃষণ চন্দরের ঘৃণার মূল লক্ষ্য ছিল ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ। যুদ্ধকে ঘৃণা করতেন। জীবনের প্রতি তাঁর ভালোবাসা স্পষ্ট ; তাই প্রকৃতির রূপ, নারীর রূপ, মানবিক সম্পর্কের বিভিন্ন রূপ ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি আন্তরিক ও সৎ। এর পাশাপাশি সুযোগ-সন্ধানী সুবিধাবাদী শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধি চরিত্রগুলিকে যে ভঙ্গিতে চিত্রিত করেছেন তা পাঠকের মনে তীব্র অভিঘাত সৃষ্টি করে। পাঠকের জন্য দিক্ নির্দেশে ভুল থাকে না যখন সে পড়ে :

'তোমার কি জমি আছে?'

'জমি তো নেই ঠাকুর। কিন্তু ল্যাঙোট বাকি রয়েছে এখনো। আমি এটা দান করতে চাই। একথা বলেই রামু ল্যাঙোটখানা খুলে ফেলে একেবারে উলঙ্গ হয়ে গেল। তারপর চীৎকার করে বলতে লাগল— আমার এই ল্যাঙোটখানা দানের মধ্যে নিয়ে নিন।

ভলান্টিয়াররা ওকে ধরে অনেক দূরে নিয়ে গেলো। অনেক দূর থেকে তার গলার আওয়াজ লোকজনের কাছে পৌঁছতে লাগল ... হা ... হা ... হা ... ভূমিদান ...

কন্যাদান। সম্পত্তিদান ... জীবনদান ... হা ... হা ...। (ভূমিদান ঃ অনুবাদ আশরফ চৌধুরী)

অথবা,

"শমশাদ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল— এই দুনিয়াটা কবে বদলাবে বলতে পারো?'

ইয়াসিন হেসে বলল— আরে খেপী! দুনিয়া নিজে কখনও বদলায় না। বদলাতে হয়। নতুন ঘাস জন্মানোর জন্য পুরনো ঘাস খুঁড়ে খুঁড়ে তুলে ফেলতে হয়।

কথাটা বলেই ইয়াসিন খুব জোরে খুরপির এক কোপ বসাল। পুরনো ঘাসের এক চাপড়া তুলে দারুণ ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। (নতুন ঘাস পুরনো ঘাস, অনুবাদ ঃ আশরফ চৌধুরী)

কৃষণ চন্দর বহু গল্প লিখেছেন আত্মকথনের ভঙ্গীতে। নির্মম বাস্তবতাকে ছুঁতে, সমাজ ব্যবস্থায় সুবিধাভোগীদের আধিপত্য ও শোষনের ছবি আঁকতে নির্দিষ্ট কাহিনীর অবয়ব ছাড়াই গল্পের আবহ গড়ে তুলেছেন। 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস' ছাড়াও এই ধারার গল্পের মধ্যে উল্লেখ করা যায় 'দু ফার্লং লম্বা সড়ক', 'কালু ঝাড়ুদার', 'মহালক্ষ্মী পুল', 'গালিচা', 'আসিরি জেঠিমা', 'ব্যালকনি', 'চৌরাস্তা কুয়ো'।

কৌতুকাভাসে গড়ে ওঠা— 'বেড়াল ও মন্ত্রী', 'বিধাতা যবে শিশু ছিল', 'গর্ত'— গল্প তিনটি প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের নির্লিপ্ততার উপর তীব্র ব্যঙ্গের চাবুক। একই কথা বলা যায় 'দাদর পুলের বাচ্চারা' ও 'গাধার জবানবন্দী' উপন্যাস দুটির ক্ষেত্রেও এবং শেষোক্ত দুটির জন্য আলাদা আলোচনা আবশ্যক।

কৃষণ চন্দরের মধ্যে একজন যথার্থ চিত্রশিল্পীকে খুঁজে পাওয়া যায়। রঙ-তুলির বদলে তুলে নিয়েছেন কলম। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার মর্যাদা তাঁর কাছে ছিল সর্বোচ্চ মাত্রার। এরই সমার্থক ছিল তাঁর কাছে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা। প্রকৃতির বর্ণনা তাই তাঁর লেখায় এত প্রাণবন্ত ও সজীব। যথার্থ মৈত্রেয়ীভাবনায় দীক্ষিত মানুষ যিনি পৃথিবীর সমস্ত অসাম্যের যথার্থ নিরসন চান তাঁর কাছে প্রকৃতি ও অন্যান্য সব শিল্পগুণান্বিত বস্তুর প্রতি অসীম মমতাই মুল প্রেরণার কাজ করে, তাঁর মনের ঐশ্বর্য তিনি বিলিয়ে দেন সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে।

কৃষণ চন্দরের কাছে তাই আমরা 'ড্যানি' বা 'রাজকুমার'-এর মত গল্প পেয়েছি। পেয়েছি 'পূরে চাঁদ কী রাত' (পূর্ণিমার রাত)। জীবনের প্রতি টান থেকেই আসে প্রতিবাদী ঔদ্ধত্য, প্রতিরোধের চেতনা। তাঁর ভাবনা জগতের এই দুই প্রান্তের কয়েকটি আঁচড়ে আলোচনায় আপাতত ইতি ঃ

"আমরা দুজন নীরব হলাম। বাচ্চারা খেলতে খেলতে আমাদের কাছে ফিরে এল। সে আমার নাতনীকে জড়িয়ে ধরল, আমি তার নাতিকে। সে চুমো খেল আমার নাতনীকে, আমি তার নাতিকে। আর আমরা দুজন খুশী হয়ে একে অন্যকে দেখতে লাগলাম। তার চোখের মণিতে চাঁদের চমক ছিল, আব ওই চাঁদই বিস্ময়ে ও আনন্দে বলছিল; মানুষ মরে যায়, কিন্তু জীবন মরে না। বসন্ত শেষ হয়, কিন্তু আবার অন্য বসন্ত এসে পড়ে। ছোটো ছোটো ভালোবাসাও শেষ হয়, কিন্তু জীবনের বড়, মহৎ ও যথার্থ প্রেম চিরন্তন হয়ে থাকে। এই বসন্ত তোমরা দেখলে। আগামী বসন্তে তোমরা থাকবে

না, কিন্তু জীবন তো থাকবে আর প্রেমও থাকবে, যৌবন থাকবে, আর সৌন্দর্য, সুষমা, সারল্যও ......

বাচ্চারা আমাদের কোল থেকে নেমে গেল। ওরা ছুটতে ছুটতে খুবানি গাছের কাছে চলে গেল, যেখানে নৌকা বাঁধা ছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কি সেই গাছ?' সে হেসে বলল, 'না, এটা অন্য গাছ।' ..." (পূর্ণিমার রাত ঃ অনুবাদ— জ্যোতিভূষণ চাকী)

......"দেখ, আমি একটা নতুন গল্প ফাঁদতে পারি, কিন্তু আমি তো নতুন মানুষ সৃষ্টি করতে পারি না। তার জন্য একা আমি যথেষ্ট নই। তার জন্য চাই লেখক আর পাঠক, ডাক্তার আর কম্পাউনডার আর বখ্তিয়ার, গাঁয়ের পাটোয়ার, আর নম্বরদার, দোকানদার আর শাসক আর রাজনীতিবিদ্ আর শ্রমিক আর ক্ষেতে কাজ করা কৃষক। চাই প্রতিটি মানুষের, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের সমবেত প্রচেষ্টা। একা আমি অসহায়, একা আমি কিছু করতে পারব না। যতদিন না আমরা হাতে হাত মিলিয়ে একে অপরকে সাহায্য করব, এ কাজ হবে না। ততদিন তুই এমনি করে ঝাড়ু হাতে আমার মস্তিষ্কের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকবি আর আমি কোনো মহৎ কাহিনী রচনা করতে পারব না যাতে মানব আত্মার পরিপূর্ণ উল্লাস ব্যক্ত হবে ...।"
(কালু ঝাড়ুদার, অনুবাদ ঃ ননী শূর)

রুদ্রদেব মিত্র

যা পেয়েছিলেন ফিরিয়ে দিয়েছেন তার বহুগুন

কৃষণ চন্দরকে নিয়ে কিছু ভাবতে গেলে, তাঁর সম্পর্কে কিছু জানাতে গেলেই একজন বুদ্ধিমান সচেতন মানুষের মন প্রশ্ন তুলবে, কেন হঠাৎ কৃষণ চন্দরই কেন? অবসর সময়ে তাঁর লেখা গল্পের অনুবাদ পড়ে স্বপ্নের ঘোরে বা দুঃস্বপ্নের ঘোরে থাকতে চাও তো ঠিক আছে, কিন্তু তাঁর সাহিত্য নিয়ে আবার টানাপোড়েন কেন? এ সব করতে গেলে তো বিপাকেও পড়তে পার। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়ে কৃষণ চন্দর পাঠ করে কতটুকুই বা তাঁকে বোঝা সম্ভব। উর্দু জানা নেই, বাংলাতে যাঁরা তাঁর গল্প উপন্যাস অনুবাদ করেছেন, তা পড়ে কৃষণ চন্দর সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখতে যাওয়ার মধ্যে হয়ত বিপদ রয়েছে।

উর্দু সাহিত্য যখন প্রেম আর না পাওয়ার দুঃখের কাব্যরসে মজে ছিল, তখন অসম্ভব রকমের তীক্ষ্ণতা নিয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারে কৃষণ চন্দরের আবির্ভাব ঘটেছিল, কৃষণ চন্দর গল্প কথকের সনাতন ভূমিকাটিকে নিয়েই সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন। শিক্ষিত পাঠককুলের যাঁদের গল্পের খিদে আছে তাঁদের তৃপ্ত করতে কৃষণ চন্দর পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক পরিণতমনস্ক পাঠক গল্পে উত্তেজনা খুঁজে বেড়ান, মজা চান, কষ্ট চান, সবচেয়ে বড় কথা তাঁরা রসের সন্ধান করেন। আর সে সব গল্প অবশ্যই মানুষের। কৃষণ চন্দরকে যাঁরা ভালোবেসেছেন, তাঁর গল্পে বুঁদ হয়ে থাকতে চেয়েছেন তাঁরা তাঁর গল্পে খুঁজে পেয়েছিলেন সেই রস। কৃষণ চন্দরের মস্ত সুবিধে ছিল তিনি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র এবং পরবর্তীকালে ইংরেজি সাহিত্যের মাষ্টারমশাই হয়েছিলেন। ফলত তিনি ইউরোপীয় সাহিত্যের ব্যাপারে যথেষ্ট খোঁজ-খবর রাখতেন। আর মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হিসেবে রাজনীতি তাঁর মনে আলোড়ন তুলেছিল।

নদনতত্ত্বের পণ্ডিত পাঠকেরা অসম্ভব রকমের গুরুগম্ভীর। ওই গাম্ভীর্যটার জন্যই তাঁদের খ্যাতি। তা সেই পণ্ডিতেরাও কৃষণ চন্দরকে এড়িয়ে থাকতে পারেন নি, পারবেন না। ক্লাসিক লিটারেচর, গ্রেট লিটারেচরের বহুবিধ বিচিত্র তত্ত্ব ঘেঁটে ঘেঁটে সাহিত্যের পণ্ডিত বিজ্ঞজনদের মনের চারপাশে যে গ্র্যানাইট পাথরের দেয়াল তৈরী হয়ে যায়, তাকে ভেদ করে কৃষণ চন্দর যেন কিভাবে সেই পণ্ডিতবর্গের মনে সেঁধিয়ে যেতে পারেন। তাঁর অমোঘ আকর্ষণকে কিছুতেই অমান্য করা যায় না, যেমন যেত না অনার দ্য বালজাকের সাহিত্যকে। অজস্র লেখা লিখেছিলেন বালজাক। রিপু তাড়িত হয়ে প্রকাশকদের থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে বালজাককে শুধুই লিখে যেতে হত। বালজাক যাই লিখতেন তাই পাঠক গোগ্রাসে গিলে চলত। ভালো মন্দ সব কিছু। রিপুর তাড়নায় কৃষণ চন্দরকে অস্থির হতে হয়নি। তাঁর অস্থিরতা ছিল স্রষ্টার অস্থিরতার মত। কিছুতেই তৃপ্ত হতে পারতেন না বলেই অজস্র লেখা লিখছিলেন। ভালো-মন্দ সব কিছুই। পাঠকেরা কিন্তু কোনটিকেই অবহেলাভরে দূরে সরিয়ে রাখতেন না।

লণ্ডনের নানকিং রেস্তোঁরাতে ভারতীয় বুদ্ধিজীবিরা যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন, কৃষণ চন্দর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেই বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে এসে নিজের বোধকে উদ্দীপিত করার চেষ্টা করেছিলেন। লণ্ডনের ডেনমার্ক স্ট্রিটের ওই রেস্তোঁরাতে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের ইস্তাহারের মূল খসড়া তৈরী করা হয়েছিল। পরে আরও সংশোধন করে খসড়াটি নিউ ইন্ডিয়ান লিটারেচর পত্রিকায় ১৯৩৫ সালে প্রকাশ করা হয়। ইস্তাহার রচনার প্রাণ পুরুষ ছিলেন সজ্জাদ জহির। এ ছাড়াও আরও অনেকে ছিলেন। সজ্জাদ জহির ছিলেন কৃষণ চন্দরের মননের গুরু। তিনি ১৯৩০-এর দশকের আগে থেকেই লণ্ডনে বসবাস করছিলেন। ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের বীজ বপন করা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের সেই সময়কার দুর্গ লণ্ডন শহরে। সে ক্ষেত্রে সজ্জাদ জহিরের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৃহৎ উন্নত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি পৃথিবীকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্যে যেভাবে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যুত্থান ঘটেছিল ফ্যাসিবাদের। আর সেই ফ্যাসিবাদের ভয়ঙ্কর রূপ তৈরী করেছিল এক নতুন পরিস্থিতিকে। ঠিক সেই পরিস্থিতিতেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভারতীয় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন নতুন ধারার একটি সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন। তার থেকেই জন্ম নিয়েছিল প্রগতি লেখক সঙ্ঘ।

প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই কৃষণ চন্দরের সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। লেখার বিষয় হিসেবে কৃষণ চন্দর মূলত বেছে নিতে শুরু করেন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সামাজিক নানান কুসংস্কারকে পোষন ও ব্যাধিকে আক্রমণ হানতে থাকেন। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ আজ প্রত্যেকের কাছেই অবশ্য স্মরণীয়। সব অর্থেই কৃষণ চন্দর প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের শরিক হয়ে ওঠেন।

এখানে অনেকেই তাঁদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কৃষণ চন্দরের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। বরঞ্চ এখন সাহিত্যিক কৃষণ চন্দরের সাহিত্য নিয়েই কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে।

বেনেদিত্তো ক্রোচে ছিলেন নন্দনতত্বের একজন প্রতিভাবান পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর কথাগুলি এখনও যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। কোন লেখাটি সঠিক তাকে বাঁধা বা কোন লেখাটি রসপর্যায়ে যেতে পেরেছে কি-না তা নিয়ে ভাবতে বারণ করেছেন ক্রোচে। তিনি বলেছেন ভুলতে হবে ঃ—(ক) লেখাটি দারুণ জনপ্রিয় কি-না, (খ) লেখাটির বক্তব্যে সামাজিক বা মানবিক বা আধ্যাত্মিক কোন দিক থেকে মহৎ কিনা, (গ) লেখাটির বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের মতামত মিলল কি না, (ঘ) প্রথানুগত সাহিত্য পাঠক যে সব উপাদান দেখে (ফুল, পাখি, চাঁদ, বসন্ত) সাহিত্য চেনে সেগুলি লেখাটিতে আছে কি না।

এই চারটি প্রসঙ্গ সম্পূর্ণভাবে ভুলতে না পারলে বিশুদ্ধ রূপ রসের ব্যাপার বোঝাই যাবে না। এ যুগে শিল্প সাহিত্যের রূপরসকে ভোগ করতে গেলে দুটি বড়সড় বাধা সামনে এসে দাঁড়ায়। আর তা হবে— ভাবগভীরতা এবং জীবনজিজ্ঞাসা রয়েছে

কি না এবং সামাজিক চেতনা ও দায়বদ্ধতা কতটা রয়েছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটিতে কৃষণ চন্দর সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বললেও, দুর্ভাগ্যবশত সুধী প্রধান কৃষণ চন্দর সম্পর্কে তাঁর মার্কসিষ্ট কালচারাল মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া নামক দুই খন্ডের বৃহৎ বইতে একটি কথাও উল্লেখ করেন নি। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে কৃষণ চন্দরের ভূমিকা, ভগৎ সিং-এর দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, লাহোর দুর্গে তাঁর বন্দী জীবন এই সব প্রসঙ্গে একেবারেই কিছু বলেন নি সুধী প্রধান। কৃষণ চন্দর যে ১৯৩৮ সালে কলকাতায় প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘের সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন, এবং তাঁকে যে পাঞ্জাব শাখার সেক্রেটারী করা হয়েছিল তা ওই মহাইতিহাস গ্রন্থের কোথাও নেই।

ভাবগভীরতা এবং জীবনজিজ্ঞাসার প্রশ্নে কৃষণ চন্দরের গল্প-উপন্যাস পড়তে গিয়ে গভীর সামাজিক দায়বদ্ধতার দর্শন মননে ভেসে ওঠে। অসংখ্য দামী মণি মুক্তোর সন্ধান পাওয়া যায়। আধুনিক বুদ্ধিজীবি মন যখন সাহিত্য উপভোগ করতে রসাস্বাদনের সন্ধান করে তখন তার চেতনা প্রখর থেকে প্রখরতর হয়ে ওঠে সেই আস্বাদনের সন্ধানে। বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সমাজবোধের চৈতন্য নিয়েই আজকের পাঠক গল্প পড়ে। এ কথা, বলা বাহুল্য, তাঁর লিখিত কাহিনীগুলি অপরিশীলিত মনের পাঠকদের জন্য নয়। স্বাভাবিকভাবেই পাঠক যা খুঁজে বেড়াচ্ছেন তার সবকিছুই সাহিত্য পাঠে থেকে যায়। আর এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কৃষণ চন্দরের গল্প পড়ার সময়েও আমরা পাঠকেরা তাই সমাজকে ও বাস্তব জীবনকে খুঁজে পাই। এ প্রসঙ্গে বারবার এক কথা না বলে পরিস্কারভাবে বলা যায় তাঁর লেখা আমাদের অস্তিত্বের গভীরে গিয়ে আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়। আমরা স্তম্ভিত হয়ে ক্ষণিকের জন্য হতবিহ্বল হয়ে পড়ি। আর সে কারণেই কৃষণ চন্দরের রাজনৈতিক বা সামাজিক গল্প সমালোচকদের কাছে কিছুটা অবহেলিত। শ্লোগানধর্মী গল্প তৈরীর সময়ে সোভিয়েত রুশের সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের যুগে কৃষণ চন্দর তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতাকে নিবেদন করেছিলেন বিনোদনের ছন্দে। কৃষণ চন্দর তাঁর সাহিত্যে সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, ভোগ-দুর্ভিক্ষ, দেশ-কাল সব কিছুকেই বিতরন করেছেন একটি সচেতনতার মাধ্যমে এবং সেখানে যেতে যেতে হঠাৎ হঠাৎ করে এমন কিছু সামাজিক দ্বন্দ্ব জুটে গিয়েছে যাকে তিনি সযত্নে গ্রহণ করে পাঠকদের কাছে সবিনয়ে তুলে দিয়েছেন।

উত্তর হিমালয়ের মাটির শিকড়ে প্রোথিত লোকসংস্কৃতি থেকে শুরু করে তার সামগ্রিক জীবনচর্যায় যা কিছু ক্লাসিক, সর্বজনীন এবং প্রগতিবাদী তার নির্যাস ধরা আছে কৃষণ চন্দরের সামগ্রিক সৃষ্টিতে। তিনি বাক্যালাপে এবং ব্যবহারিক জীবনে যেমন ছিলেন উচ্ছল, ঠিক তেমনই সৃষ্টির ক্ষেত্রে ছিলেন গম্ভীর, এক ছন্দরসিক। কাশ্মীরের প্রকৃতির রূপলাবণ্যের বর্ণবিভায় উজ্জ্বল ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। উর্দু সাহিত্যের যাবতীয় নিয়ম নীতিকে তিনি ভেঙে দিয়ে তাঁর মনের জমে থাকা কথা প্রকাশের প্রয়োজনবোধ করেছেন। এক সময়ে উর্দু কথাসাহিত্যিকদের যাত্রাপথে তাঁকে দিশারির ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল ভারত ইতিহাসের এমনই এক মুহূর্তে যাকে তিনি তাঁর স্বকীয়তার মধ্য দিয়ে গল্পে উপন্যাসে প্রকাশ করলেন। আর সে কারণেই তাঁর সৃষ্টি সম্পদ হয়ে গেল সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্য, সমাজ এবং রাজনীতির ইতিহাসে; আর সেই কারণেই তাঁর প্রতি নতুন করে আবার

ভারতীয় বুদ্ধিজীবী মহলে আগ্রহ তৈরী হয়ে তাঁকে আরও জীবন্ত করে তুলল। কৃষণ চন্দরের রচনা এব
কৃষণ চন্দরের সমগ্র সৃষ্টিই মানুষ কৃষণ চন্দরকে অতিক্রম করে যেতে চলেছে। ভাষা বা সংস্কৃতির সব বা
সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিকামী মানুষের চোখে তিনি নতুন রূপে মর্যাদা পেতে চলেছেন। মধ্যবিত্তসু
হিমালয়ের মিথ, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মতত্ত্ব, প্রাচীন লোকগাথা ও প্রচলিত বিশ্বাস দিয়ে কৃষণ চন্দর যে জগৎ
হয়ে উঠেছে এবং নিঃসন্দেহে তার কয়েকটি রচনা অসামান্য ও অনবদ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি
দিয়ে ভারতবাসীকে ঋণী করে গিয়েছেন।

জ্যোতিভূষণ চাকী

কৃষণ চন্দর : মন ও মনন

ইস আদম ফরসূদা কে জের তখরীব.
ইক আদম নও কী হো রহী হৈ তামীর।

-- জোশ মলিহাবাদী

--এই ফসিল মানুষের, ধ্বংশের আড়ালে
নতুন মানুষের নির্মিতি এগিয়ে চলেছে।

উর্দু কবিতায় যে নতুন ঢেউ এল, ইকবালের কবিতার পরপরই, তারই ছোঁয়ায় গদ্যের আঙিনাতেও এল উপন্যাস ও ছোটোগল্পের নবযুগ। কৃযন চন্দর এই নবযুগেরই গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। নূতন দিগন্তের দিকে তাকানো মুক্তমনের লেখক ছিলেন তিনি।

তাঁর মনের গঠনের উপাদানগুলোর দিকে একটু তাকানো যাক। বাবা গৌরীশংকর ডাক্তার ছিলেন। কৃযণ বাবার চিকিৎসায় রোগমুক্তির পর মানুষের মুখের হাসি দেখেছেন। দেখেছেন অসুস্থ গরিব মানুষের মুখের অসহায়তার ছবি। দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, নিপীড়নকে তিনি রোগ বলে মনে করতেন। রোগমুক্ত সমাজের একটা কাল্পনিক ছবি তাঁর চোখে ভেসে উঠত একটু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। ছোটো বেলায় একটি বিশেষ ঘটনা তার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। বাবার সঙ্গে এসেছেন রাজবাড়িতে। রাজার অসুখ করেছে। রাজার ছেলেরা কৃষণকে তাদের ভালো ভালো জিনিস দেখিয়ে বলল, 'দেখি তোর কাছে ভালো জিনিস কী আছে?'

-- কিছু নেই।

-- কিছু নেই? দেখি পকেট।

কৃষণের পকেট থেকে বেরোল একটি ছুরি। বোতাম টিপতেই বাঁট থেকে ফলাটা বেরিয়ে এল। রাজকুমারেরা মজা পেল। শেষ পর্যন্ত জিনিসটা তারা আত্মসাৎ করল।

কৃষণ চন্দর বলছেন, এইভাবেই ধনীরা গরিবের সম্বল কেড়ে নেয়। আমি অবশ্য একটা চড় মেরে ছিলাম একটি ছেলেকে। যার জন্য বাবার কাছে আমাকেও মার খেতে হয়েছিল। সোজাকথা তো নয়।

রাজপুত্রের গায়ে হাত তোলা?

যৌবনের শুরুতেই পুঁজিবাদকে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগলেন। মার্কসবাদ বুঝতে চেষ্টা করলেন কলেজে পড়বার সময়ে। বহু দেশের পরাধীনতা এবং যুদ্ধ প্রভৃতির কারণ যে পুঁজিবাদ তা তাঁর মনে স্পষ্ট হয়ে উঠল ক্রমশ।

পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভ্রমণকারী বহু মানুষ ও তাদের কর্মধারাকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। তাই লেখায় সেখানকার পটভূমি ও সেখানকার মানুষ বারবার এসেছে।

শুধু অভিজ্ঞতায় ভালো লেখক হওয়া যায় না, উপযুক্ত পরিবেশ ও চর্চা চাই। কৃষণ চন্দরের এক ভাই ও বোন ছোটোগল্পের ভালো লেখক ছিলেন। বাড়িতে সাহিত্যচর্চার একটা পরিমণ্ডল কৃষণ চন্দরকে সাহিত্যসাধনায় প্রেরণা দিয়েছে। তাই তিনি প্রথমপর্বের লেখাতেই সাড়া জাগাতে পারলেন।

১৯৩৬ সালে প্রগতিশীল শিল্পী ও লেখক সঙ্ঘ গড়ে উঠায় যে নূতন উদ্দীপনা দেখা দিল তা তাঁর সাহিত্যের গতি প্রকৃতিকে নির্দিষ্ট রূপ দিল। তার বিষয় হয়ে উঠল 'তরক্কী-পসন্দ্' অর্থাৎ প্রগতিশীল সাহিত্য এবং আদর্শ হয়ে উঠল সমাজতন্ত্রবাদ। কিন্তু প্রগতিশীল সাহিত্য তাঁর মূল লক্ষ্য হলেও রোমান্টিক স্কুলের প্রভাব তাঁর উপর ছিলই, ইংরেজিতে এম.এ. পড়বার সময় থেকেই। তাই তাঁর নূতন দিনের বক্তব্যেও রোমান্টিকতাকে তিনি পরিহার করেননি। রোমান্টিকতাকে প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে তিনি এমন করে মিশিয়েছিলেন যে তা একটি বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র সাহিত্যধারার জন্ম দিল। তাঁর সমসাময়িক সাদাৎ হাসান মান্টো, ইসমৎ চুখতাই, উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক্, অখতার হুসেন রায়পুরী, হযাৎউল্লা আনসারী, খাজা আহম্মদ আব্বাস, আহমদ নদীম কাসমী প্রমুখ শক্তিশালী লেখকদের মনে তিনি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছিলেন। জনপ্রিয়তায় যে তিনি শীর্ষস্থানীয় ছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর জনপ্রিয়তার একটি কারণ বাস্তবের মধ্যেও কল্পনা বা ফ্যান্টাসিকে আনা এবং Serious বিষয়েও কৌতুককে বাদী সুর করে তোলা। অতিসাধারণ একটি বিষয়ও কৌতুক-কল্পনায় অসাধারণ হয়ে ওঠে; একটি গল্পের নায়ক একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলেন তার ডান হাতটা নেই। কী আর করা যাবে। লোকে তো বাঁ হাত দিয়েও কাজ করে। একদিন উঠে দেখলেন একটি চোখ নেই। না থাক। আর-একটি তো আছে। এই মনোভাবের মানুষটি কিন্তু তার সামান্য অর্থের মানি ব্যাগ হারানোটা মেনে নিতে পারল না। চাকরটার চাকরি গেল। মানিব্যাগটা অবশ্য পরে খুঁজে পেলেন। অসাধারণ নৈপুণ্যে তিনি অবাস্তব দিয়ে একটি নিষ্ঠুর বাস্তবকে ব্যঙ্গ করেছেন।

বক্তৃতায় যা কখনোই সম্ভব নয় তা তিনি করতেন রঙ্গব্যঙ্গে। মুনাফাবাদকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছেন 'আওরাতোঁ কা ইৎর' গল্পে। শেঠজি একটি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা করলেন: যখন গোলাপের পাপড়ি থেকে আতর বের হতে পারে তখন মেয়েদের ঘাম থেকে আতর তৈরি করা যাবে না কেন? দশ কোটি টাকা খরচ করে একটা ব্যঙ্গ কারখানা খুলব, তাতে লক্ষ লক্ষ কুমারী মেয়েকে সেবিকা হিসেবে রাখব। এদের সারাদিন রোদে দাঁড় করিয়ে রেখে ঘাম জমাব। পাণ্ডিয়া বলল, কিন্তু যদি কোনদিন রোদ না ওঠে?

-- আমেরিকা থেকে বড়ো বড়ো আর্ক ল্যাম্প আনাব। তাদের তাপ আর জোরালো আলো এই মেয়েদের উপর ফেলব। এইভাবে তাদের ঘাম বের করে নেব।

-- আপনি আপনার ফিল্ম কোম্পানীতেও এই আর্ক ল্যাম্প লাগিয়ে নেবেন। সেখানে নার্গিশের আতর, মধুবালার আতর আর নলিনী জেবন্তের আতর বের করবেন। সেলও দারুণ হবে। বিশেষ করে যুবকেরা তা কিনবে।

এই ব্যঙ্গটি কী মোক্ষম!

প্রথম দিকের সাহিত্যে প্রবেশের সময় কৃষণ চন্দর কৌতুক নক্সাই লিখেছিলেন। তা ক্রমশ সুমার্জিত হয়ে ওঠে। আর এই কৌতুকের আড়ালে প্রায়ই একটি অশ্রুবিন্দু টলমল করে ওঠে।

শৈশব থেকে তিনি কাশ্মীরের নিসর্গ শোভার মধ্যেই বেড়ে উঠেছিলেন বলে প্রকৃতি প্রেম ছিল তাঁর সহজাত। বহু গল্প-উপন্যাসেই তিনি প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। আর হতদরিদ্র মানুষও প্রকৃতিরই অঙ্গ হয়ে উঠেছে, তাদের বর্ণনাও আশ্চর্য দক্ষতায় করেছেন তিনি।

'পল্লীবাসিনী তার নিজের কোলে খলবল করা শিশুটির দিকে তাকাল এবং ধীরে ধীরে জামার বোতাম খুলতে লাগল। ধীরে ধীরে সাদা দুধভরা স্তন ব্লাউজ থেকে এমনভাবে বের করল যেন ঘন মেঘ থেকে চাঁদ বেরিয়ে এল।' এখানে নারী ও প্রকৃতি যেন এক সুরে বাঁধা।

নারী কৃষণ চন্দরের চোখে ধরিত্রীর সঙ্গে অভিন্না--

'নারী ধরিত্রী, নারী জীবনের উৎস
নারী জীবনের গন্তব্য। .... নারী
অন্ধকারে থাকে, কিন্তু উজ্জ্বল
মোতির জন্ম দেয়। (শিকস্ত্)

নারী কৃষণ চন্দরের কাছে যেন চিরকালের নিপীড়িতের প্রতীক।

তাঁর কলকাতার অভিজ্ঞতা কয়েকটি মর্মস্পর্শী ছোটগল্পের জন্ম দিয়েছে। তাঁর 'অন্নদাতা' দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লেখা।

রাজদূত গাড়ি করে চলেছেন। গাড়ি থেমেছে। একটি মা তার কন্যাকে নিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে রাজদূতকে একটি আবেদন জানাল। ড্রাইভার তাঁকে পুলিশে দিল। মা মেয়েটাকে পাঁচশিকেয় বিক্রী করতে চায়। রাজদূত যেতে যেতে ভাবে, 'ইংরেজরা তাহলে হাবশিদের অত দামে (পঁচিশ ডলার) যে কেন কিনেছিল ভাবা যায় না! কী বোকামি!'

'অন্নদাতা' গল্পটি বড়ো, তিনটি পর্বে বিভক্ত। আদিবটি একেবারেই নূতন। সমসাময়িক সব লেখকই আদিবটির তারিফ করেছেন। খাজা আহমদ আব্বাস, এই গল্পটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। ছবি এঁকেছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী রথীন মৈত্র।

স্বাধীনতা যেভাবে এল তাতে হিন্দু-মুসলমান কেউ-ই উপকৃত হবে না। জাতির কোনো উন্নতিই সম্ভব হয়ে উঠবে না, কারণ স্বাধীনতা দান সাম্রাজ্যবাদী চাল বিশেষ। এই ধারণার ভিত্তিতেই তাঁর ছোটো গল্প 'মহালক্ষ্মীকা পুল' রচিত।

বহু গল্পেই আছে তার অন্তরের রক্তক্ষরণের স্বাক্ষর।

'জুতা পহনুঙ্গা' সাধারণ একটি গল্প। কিন্তু রূপকার্থে তা এক মহা-উপন্যাস। ফজল জুতো পরতে শিখেছিল। যখন সে তার রোজগারের সর্বস্ব চার টাকা দিয়ে জুতোজোড়া পেল, তখন তার মনে হল এ তো আল্লার দান। যাই অজদা দিয়ে আসি

মসজিদে। কিন্তু মসজিদ থেকে বেরিয়ে দেখলাম জুতো গায়েব। তার পালক পিতা তাকে জুতো হারাবার জন্যে মারতে মারতে আধ মরা করে ফেলল। কিন্তু সে মারছে আর বলছে -- দ্যাখ্ আমারও এটা ওটার শখ আছে। আমি পেরেছি সেই পূরণ করতে? শখ ওদের জন্যে, আমাদের মতো গাধা মানুষদের জন্যে নয়। পিটুনি খেতে খেতে ফজলের চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল যেন, -- না. কোনো পাপ আর সে করবে না।

রাস্তায় একটি ফুলওয়ালি ভিন দেশী মেয়েকে নিয়ে যে গল্প লিখেছেন তা আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে। মেয়েটি চীনে গিয়ে কোরিয়ার সমর্থক বলে মার্কিন গুলিতে মারা গেল।

মানুষের দৈন্য, দুঃখ, অপমান লাঞ্ছনার কারন ভারতেও যা অন্যত্রও তাই। একদল ক্ষমতাবান মানুষের লোভের শিকার সাধারণ মানুষ।

তবু একটি বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে তিনি ভেবেছেন, এমন দিন থাকবে না। মানুষ মানুষের কাছাকাছি আসবে। রাত যতই গভীর অন্ধকার হোক ভোর হবেই --

'সুবহ হোতী হৈ'।

উর্দু থেকে অনুবাদ ঃ শওকত আজিম

মজহের ইমাম

কলকাতায় কৃষণ চন্দর

বোধ হয় কানাইয়ালাল কাপুর কৃষণ চন্দরের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি নিবন্ধ লেখেন এবং সেখানে তিনি উল্লেখ করেছিলেন কৃষণ চন্দর একবারে পালিয়ে কলকাতা এসেছিলেন এবং হাওড়া ব্রিজের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমি জানি না উনি একাই পালিয়েছিলেন, না কাউকে সঙ্গে নিয়ে। আমি ওঁকে শুধু দুটি অনুষ্ঠানে কলকাতায় দেখেছি। কলকাতায় আমি ছিলাম ১৯৫১ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত।

১৯৫২ সালে কৃষণ চন্দর এসেছিলেন 'অল ইন্ডিয়া পীস কনফারেন্সে' যোগ দিতে। প্রেসিডিয়ামের সদস্য হিসেবে বক্তৃতা দেন ইংরেজীতে। যদিও কলকাতা মিছিলের শহর, সভাসমিতির শহর, তবু এই সম্মেলন ছিল ঐতিহাসিক। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন -- ডাক্তার সৈফুদ্দিন কিচলু, মুল্‌ক রাজ আনন্দ, হীরেন মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, মজাজ, সর্দার জাফরি, পারভেজ শায়েদী, মখদুম মহিউদ্দীন, মজরু সুলতানপুরী, কৈফী আজমী, নিয়াজ হায়দার, ওয়ামিক জৌনপুরী, আসক্ অমৃতসরী, খাজা অহমদ অব্বাস, আনোয়ার আজিম, প্রকাশ পণ্ডিত, রাজিয়া, সজ্জাদ জহির, সৈয়দ আব্দুল মালিক, পৃথ্বীরাজ কাপুর, সলিল চৌধুরী, সুরেন্দ্র কাউর, অচলা সচদেও, রামকুমার, ওমর শেখ এবং অনেক সাহিত্যিক কবি, বুদ্ধিজীবি এবং শিল্পীরা।

এই সম্মেলন সম্পর্কে বিভিন্ন কথা মনে পড়ছে। একটি উপসমিতির সভায় মজাজ ইংরেজী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই সভায় তিনি কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন। জানিনা, সেখানে উনি কি বলেছিলেন; বক্তৃতা শেষে বাইরে এলে আমি বললাম, মজাজ সাহেব, শুনেছি আপনার বক্তৃতা মানুষের সাহস অনেক বাড়িয়ে দেয়। মজাজ আশ্চর্যভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি শুনলেন না?

'মাফ করবেন আমি একটু দেরীতে পৌঁছেছিলাম'।

'Then I must commit suicide'.

১৯৫২-র পর ১৯৫৭ সালে কৃষণ চন্দর কলকাতায় আসেন। চার'ছ দিন ওঁর আসার খবর কেউ জানতে পারল না। উনি জনতা সিনেমার কাছে ম্যাজেস্টিক হোটেলের একটি ঘরে নিজেকে বন্ধ করে রূপ কেশরীর একটি ছবির জন্যে চিত্রনাট্য লিখছিলেন। এই ছবি সম্ভবত কখনও শেষ হয়নি। অবশ্য খুব কম মানুষই জানেন যে রূপ কেশরীর একটি বিখ্যাত ছবি 'এক থি লড়কী'-র চিত্রনাট্য কৃষণ চন্দরেরই লেখা, আর এই ছবির জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের কারণ শুধু মীনার চঞ্চলতা আর লারেলাপ্পা গান নয়। কৃষণ চন্দরের সংলাপের এই ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

সেই সময় কলকাতার সাহিত্যের গোয়েন্দা ছিলেন শাহযাদ মনজর। উনি

আসক অমৃতসরী ঃ উর্দুভাষায় সত্যিকারের জনগণের কবি। মৃত্যু অল্পবয়সে তাঁকে ছিনিয়ে নেয়।

সুরেন্দ্র কাউর ঃ প্রখ্যাত গায়িকা

অচলা ঃ চিত্র তারকা

রামকুমার ঃ মারাঠী গায়ক

আমাকে খবর দিলেন যে কৃষণ চন্দর কলকাতায় আছেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ সালের 'বৈকালিক আফসার'-এ এই খবর ছাপা হল যে ওঁর সম্মানে কলকাতায় সাহিত্যিকদের চৌরঙ্গী রেষ্টুরেন্টে বিকেল চারটায় চা চক্রের ব্যবস্থা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সাহিত্যিকদের মধ্যে পারভেজ শাহেদী ছিলেন না, শাম আহমেদ আকবরাবাদী বা আমিও ছিলাম না। বেলা প্রায় দুটোর সময় ইব্রাহিম হোসের একটি চিঠি পেলাম। তাতে লেখা ছিল যে আমিও সেই চা চক্রে আমন্ত্রিত। আমি যেন 'আফসার' পত্রিকার অফিসে চলে যাই। সেখান থেকে শালিক সাহেবের সঙ্গে চৌরঙ্গী রেস্টুরেন্টে যাব। আমি তৈরী হচ্ছি। হঠাৎ শাহযাদ মনজর ও আসগর রাহী এসে পড়লেন। তাঁরা জানালেন তাঁরা কৃষণ চন্দরের হোটেলে যাচ্ছেন। আমাকেও যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমন্ত্রণ ছাড়া চা চক্রে যাওয়া আমার ভালো লাগল না। বন্ধুদের উৎসুক্য দেখে আমি কিছু বললাম না। শুধু বললাম শালিক সাহেব আর হোস সাহেব আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। দুই বন্ধু ক্ষেপে গিয়ে চলে গেলেন। পরে আসগর রাহী ক্ষোভে দুঃখে বলেছিলেন যে মজহর ইমাম শালিক শাহেবের সঙ্গে মোটরে আরামে যাবার জন্যে আমাদের সঙ্গে আসেননি।

চৌরঙ্গী রেষ্টুরেন্টে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সবার সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল। বাংলা, হিন্দী এবং উর্দু ভাষার সাহিত্যিকরা ছিলেন। এই চা পানের আয়োজন করেছিলেন প্রগতিশীল লেখকরা; তবু হিন্দী ও উর্দুর প্রগতিশীল লেখক সংঘের কলকাতার সম্পাদক হিসেবে আমাকে কোন খবর দেওয়া হয়নি। ঘটনা ঘটিয়েছিলেন রাজেন্দর ভারতী -- তিনি হিন্দী ও উর্দু খবরের কাগজের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতেন। ওঁর লেখার শখও ছিল। কৃষণ চন্দরের কলকাতায় আসার খবর পেয়ে উনি ছোটাছুটি করে চা চক্রের ব্যবস্থা করলেন। সেইজন্যে আমাদের অনেক বন্ধু খবর পেলেন না। এই সভার সভাপতি ছিলেন হীরেন মুখোপাধ্যায়। কৃষণ চন্দর কলকাতার সাহিত্যের খবর জানতে উৎসাহ প্রকাশ করলেন। হীবেন মুখোপাধ্যায় ও গোপাল হালদার বাংলা সাহিত্যের নতুন ঝোঁক নিয়ে বললেন, হিন্দী সাহিত্য সম্পর্কে বললেন, 'স্বাধীনতা' পত্রিকার হিন্দী সংস্করণের সম্পাদক অনুরাগী। উর্দু সাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলার সময় এল। আমি চুপ করে রইলাম কেননা আমি প্রস্তুত ছিলাম না। সভাপতি ও অন্যান্য বন্ধুরা আমাকে বারবার অনুরোধ করলেন। আমি হঠাৎ এভাবে কিছু বলতে চাইলাম না; শালিক সাহেবকে ইশারা করলাম। শালিক সাহেবের বৈশিষ্ট্য হল এই যে উনি কোন রকম প্রস্তুতি ছাড়াই যে কোন বিষয়ে বলে যেতে পারেন। তবে প্রস্তুতি না থাকলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ যায়। শালিক সাহেব নিজের বক্তৃতা আকর্ষণীয় করতে গিয়ে সবাইকে খুশী করতে পারলেন না। তাড়াতাড়িতে কিছু নাম বাদ গেল। কৃষণ চন্দরের সম্মানে দেওয়া চা চক্র শেষ হবার পরই বিবাদের সূত্রপাত হল এবং

শাহজাদ মনজুর : সাংবাদিক, আলোচক, পাকিস্তানে দেহান্তর হয়েছে।
ইব্রাহিম হোস : কলকাতার প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং কবি। 'দৈনিক আফসারের সম্পাদক
শালিক লখনভি : কলকাতার মানুষ হয়ে গেছেন। কবি, রাজনৈতিক কর্মী, প্রাবন্ধিক, বক্তা, 'দৈনিক আফসারের' মালিক ও এখন পশ্চিমবঙ্গ উর্দু আকাডেমীর চেয়ারম্যান।
আসগর রাহী : নামকরা কবি, যিনি খারাম 'চট্টগ্রাম'-এর সম্পাদক হন।

শালিক সাহেবের বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে।

২৯শে সেপ্টেম্বর সভা সম্পর্কিত খবর প্রকাশ করে 'দৈনিক অসরেজেদিদ' লিখল, শালিক লখনভি যেভাবে আর যে ভাষায় কলকাতার সাহিত্যিক কাজকর্ম, সাহিত্যিক ও কবিদের উল্লেখ করলেন তা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অসম্মানজনক। তাতে এই সভায় উপস্থিত কবি ও সাহিত্যিকরা আহত হয়েছেন'। পরের দিন 'দৈনিক অসরেজেদিদে' শাহযাদ মনজরের লেখা একটি চিঠি ছাপা হল নিম্নোক্ত শিরোনামে : 'কলকাতার সাহিত্যিক এবং কবিদের অসম্মান'। এই চিঠিতে তিনি শালিক লখনভিকে আক্রমণ করে লিখেছেন -- 'উর্দু সাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলার সময় এলে সভাপতি শ্রোতাদের তরফে মজহর ইমামকে (প্রগতিশীল লেখক সংঘের কলকাতার সম্পাদক) কিছু বলার জন্যে অনুরোধ করলেও অজ্ঞাত কারণে তিনি রাজী হলেন না। তাঁর দায়িত্ব ছিল সংঘের কর্মোদ্যোগ ও সংঘের সঙ্গে সম্পর্কিত সাহিত্যিকদের কাজকর্ম ও কলকাতার সাহিত্য পরিবেশ সম্পর্কে কিছু বলা। তিনি কলকাতার উল্লেখযোগ্য কবি এবং সাহিত্যিকদের একটি তালিকাও তৈরী করেছিলেন। জানি না কেন তিনি চুপ করে বসে থাকাই ভাল মনে করলেন। সেই দিনই অসরেজেদিদ ব্যঙ্গ কলমে লিখল যে, 'যখন উর্দুর সব থেকে বড় এবং প্রখ্যাত গল্পকার কৃষণ চন্দর কলকাতায় এলেন, তখন প্রগতিশীল লেখকদের তরফে একটি বিরাট পার্টি দেওয়া হল। সেইসব সংবাদপত্রকে এই খবর দেওয়া হল না, যাঁদের মধ্যে একটুও সংকীর্ণতাবাদের ছোঁয়া আছে, যেহেতু শঙ্কা ছিল, কোন গুপ্ত দরজা দিয়ে কোন সংকীর্ণতাবাদী সাহিত্যিক ঢুকে পড়তে পারে। এইভাবে এই পার্টিতে শুধু প্রগতিশীলরাই এলেন এবং তাঁদের বিরোধীরা এই খবর থেকে বঞ্চিত হলেন যে কলকাতায় কৃষণ চন্দর এসেছেন।'

যাদের সঙ্গে শালিখ লখনভি বা ইব্রাহিম হোসের ব্যবসা, সাংবাদিকতা বা সাহিত্য বিষয়ে মতভেদ ছিল, সেই সব সাংবাদিকরা এর সুযোগ নিলেন। সে সময় প্রগতিশীল বিচার ধারার সাহিত্যিক ও কবিরা শালিক লখনভি, পারভেজ শাহেদী, ইব্রাহিম হোস এবং মজহর ইমামের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। পত্রিকাগুলি চেষ্টা করল কলকাতায় একমাত্র সাহিত্য দলটিকে আঘাত হানতে। তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরী করে দিতে। ১লা অক্টোবর 'দৈনিক ইমরোজ' একটি নোংরা সম্পাদকীয় লিখল – 'প্রগতিশীলদের মধ্যে যুদ্ধ'। এই সম্পাদকীয়তে কৃষণ চন্দরের একটি গল্প 'এক হাজার চারশো বাহাত্তর লড়াকিঁয়া'-র দিকে ইশারা করে কৃষণ চন্দর ও পারভেজ শাহেদীকে বদনাম দেবার চেষ্টা হল। শালিককে আমার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেবার চক্রান্ত করা হল। এখানে সেই সম্পাদকীয়র উদ্ধৃত দিতেও আমার ইচ্ছে করছে না। সম্পাকীয় শেষ হল এইভাবে --' পারভেজ শাহেদী এবং মজহর ইমাম সম্পর্কে কিছু বলা আমরা বাহুল্য মনে করি। তবে শালিক সাহেব ও জোস সাহেব সম্পর্কে বলতে হয় যে একটি দৈনিক পত্রিকাই তাদের বিরাট সাহিত্যিক ও বড়ো কবি করে দিল, নয়ত কলকাতায় তাদের চেয়ে এক হাজার গুণ বড়ো কবি আছেন, গল্পকার ও রম্যরচনাকার আছেন। শালিক সাহেবের জন্যে একবার প্রগতিশীল লেখক সংঘ শেষ হয়ে গিয়েছিল; আর এখন আবার সেই সংঘ তাদেরই কব্জায় চলে এসেছে। তাই আবার একে শেষ করার ভবিষ্যৎবাণী বোধ হয় অসঙ্গত নয়।'

আমাদের মধ্যে ঝামেলা বাঁধাবার আর একটি চেষ্টা করল ৪ঠা অক্টোবরের 'অসরেজেদিদ'। পত্রিকায় তাহের জামালের ছদ্মনামে একটি চিঠি ছাপা হল -- 'শাহযাদ মনজরের বদমাইসি'। কয়েকজন বন্ধু জানাল, এই চিঠি কলকাতার সাংবাদিক (প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক, প্রগতিশীল লেখক সংঘ, কলকাতা) লেখা। আমি অবশ্য খুব নিশ্চিতভাবে এই কথা বলতে পারব না। এই চিঠিতে এমনকি শালিক লখ্নভিকে সমর্থন করা হয় এবং শাহযাদ মনজরের চিঠির উল্লেখ করে লেখা হয়েছিল -- ' এই চিঠির উদ্দেশ্য শালিক সাহেবকে অপমান করা এবং এর পেছনে একটি ষড়যন্ত্র কাজ করছে।' আমার প্রশংসা করা হল এভাবে -- পার্টিতে শুধু এই সাহিত্যিক সংঘের সম্পাদকই নন, সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত আছেন এবং তিনি একটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকও। তিনি কোন এক অজ্ঞাত কারণে চুপ করে থাকলেন। কিন্তু দুচারটি লাইনের পরেই এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে (শাহযাদ মনজরের) চিঠি ছাপার একদিন আগে কলকাতার এক সাংবাদিক এবং গল্পকার শিশ মজঃফরপুরী আমজাদিয়া হোটেলে খোলাখুলিভাবে নিজের বন্ধুর সামনে ঘোষণা করলেন যে তিনি সবে মজহর ইমামের ঘর থেকে ফিরেছেন, সেখানে শাহযাদ মনজর তার বিখ্যাত চিঠি তৈরী করছেন, সেটি ইব্রাহিম হোসের জন্যে অ্যাটম বোমের কাজ করবে। 'অসরেজেদিদের' ছাপার আগে আমার জানা ছিল না শাহযাদ মনজর তাঁর চিঠিতে কি লিখেছেন। হ্যাঁ, তিনি নিজের চিঠি সম্পাদকদের হাতে দেবার পর চঞ্চলভাবে আমার কাছাকাছি আসেন এবং নিজের শক্ত চিঠির জবাব দিয়ে যান। তাহের জানান ছদ্মনামে কেউ দুদিক থেকেই ষড়যন্ত্র করল -- 'একদিকে শালিক' আর জোসের সঙ্গে আমার মন কষাকষি, অন্যদিকে শিশ মজঃফরপুরীর থেকে আমাকে দূরে ঠেলে দেবার চেষ্টা, কেননা পত্রলেখক আমাদের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে যথেষ্টই অবগত ছিলেন। সব ঘটনা আবর্তিত হল উর্দু ভাষায় মহান এক সাহিত্যিককে কেন্দ্র করে।

আর একটি কারণেও হাঙ্গামা বাঁধল। চৌরঙ্গী রেষ্টুরেন্টে চা খাবার পর কৃষণ চন্দরকে কিছু বলতে বলা হল। কৃষণ চন্দর বললেন যে, উনি কোন বক্তৃতা না দিয়ে শুধু প্রশ্নের উত্তর দেবেন। বক্তৃতা না দিয়ে আমি একটা ভুল করেছিলাম। কেননা খবরের কাগজের মতে আমি বক্তৃতা দিলে শালিক সাহেব ভাষণ দেবার সুযোগই পেতেন না। দ্বিতীয় ভুল হল, আমি কৃষণ চন্দরকে প্রগতিশীল লেখক সংঘের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন করলাম। ১৯৫৩ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সারা ভারত প্রগতিশীল লেখক সংঘের ষষ্ঠ সম্মেলনে কৃষণ চন্দর সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রস্তাব এলে কলকাতার প্রগতিশীল লেখক সংঘের প্রতিনিধি নারায়ণ ঝা আপত্তি তুলেছিলেন। উনি এর কারন বলার চেষ্টা করলে এই বলে বসিয়ে দেওয়া হয় যে আপত্তি করলে অন্য একটি নাম তাকে প্রস্তাব করতে হবে।

সংগঠনের নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে কৃষণ চন্দর বললেন যে, সংঘ তার ভূমিকা ভালভাবেই পালন করে চলেছে, আর সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে তার প্রয়োজন নেই। উনি বললেন যে, মার্কসবাদের আদর্শকে ভিত্তি করে এমন একটি সংঘ তৈরী করতে হবে যা দেশকে সমাজতন্ত্রে পৌঁছে দিতে সহায়ক হয়। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, তাহলে সংঘের মৃত্যু ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে না কেন?' কৃষণ চন্দর মৃদু হেসে

বললেন 'মৃত্যু'র আনুষ্ঠানিক ঘোষনার কোন প্রয়োজন হয় না।' মৃত্যু নিজেই নিজেকে জাহির করতে পারে।

এখানে আবার একটি সম্পর্কহীন কিন্তু আকর্ষণীয় কথা মনে আসছে। শালিক লখনভি কৃষণ চন্দরকে কি একটা বড়ো প্রশ্ন করেছিলেন। এখন তার পুরো কথা মনে পড়ছে না। কৃষণ চন্দর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ভাই, আপনি জানেন আমি একটি গাধা। সব কথা ঠিক বুঝতে পারি না। আপনি আপনার প্রশ্নের মূল কথা বলুন। কৃষণ চন্দরের লেখা 'এক গধে কি সরগুজস্ত' কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। উনি নিজেই বললেন, লোকে তার দিকে তাকিয়ে ইশারা করে বলে, ' দেখো গাধা আসছে'। আমাব প্রশ্ন ও কৃষণ চন্দরের উত্তরের সূত্র ধরে 'মাসিক সহেল' (গয়া)-এর অক্টোবর ১৯৫৭ সংখ্যায় কলাম হায়দরি 'নতুন পরিস্থিতি ও আমরা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে কৃষণ চন্দরের বয়ান সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে চাওয়া হয় এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে মার্কসবাদের ভিত্তিতে উনি যে সংগঠন চান, তা কেমন হবে?

... . তিনি (কৃষণ চন্দর) একথা বলেননি যে সংঘ কিছু লোকের দলবাজির শিকার হয়েছে। উনি এও বলেননি যে সংঘকে চরমপন্থী কোন আদর্শবাদের কাছে বলি দেওয়া হয়েছে। .... কৃষণ চন্দর এও বললেন না যে আন্তর্জাতিক স্তরে আদর্শের পরিবর্তন প্রগতি লেখক সংঘকে সোজাসুজি কমিউনিস্ট ঝাঁকুনি দিয়েছে; আর পুরনো থেকে নতুনের দিকে আসার সময় প্রগতিশীলতার বনিয়াদে কোন সাহিত্য সংঘের সংগঠন শুরু করা সম্ভব নয়।

কলম হায়দরি আরও লিখলেন যে, কৃষণ চন্দর বলছেন সাহিত্যিকদের সংগঠন মার্কসবাদ অনুযায়ী হতে পারে। অর্থাৎ, প্রগতিশীলতা মার্কসবাদ থেকে দূরে হটে গেল। এটা পরিষ্কার হল না। উনি কোন ধরনের মার্কসবাদের উপর ভিত্তি করে সংগঠন করতে চাইছেন -- সেই মার্কসইজম যাকে কিছু বছর আগেও স্ট্যালিনিজম বলা হত বা সেই মার্কসইজম যা ক্রুশ্চভ কার্যকরী করেছিলেন, সেই মার্কসইজম, যা টিটো গ্রহণ করেছেন বা মাও-সে-তুঙের মার্কসইজম?

নভেম্বরের 'সোহেল'-এ কলাম হায়দরি শাহাযাদ মনজরের উত্তরে একটি প্রবন্ধ ছাপেন। শিরোনাম ছিল -- 'প্রগতিশীল লেখক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা'। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে এই প্রবন্ধ 'সোহেল' একবার ফিরিয়ে দেয়। কেননা কলাম হায়দরি এক জায়গায় বেশ শক্ত ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। কলাম হায়দরি এও লিখেছেন যে আমি নাকি শাহযাদ মনজরের প্রবন্ধে অনেক পরিবর্তন করেছি এবং তার ভাষাকে অনেক সুস্থ করে তুলতে চেষ্টা করেছি; তবুও কয়েকটি কঠিন বাক্য থেকে যায়। কলাম হায়দরি নিজের প্রবন্ধে যেভাবে নিজের মানসিক বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, তা অন্যায় এবং কলাম হায়দরি ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি, প্রগতিশীল লেখক সংঘ, সোভিয়েত এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিজম সম্পর্কে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য আর কোন মাধ্যম বেছে নিতে পারতেন; কৃষণ চন্দরের ব্যক্তিগত মতামতকে হাতিয়ার করে চেঁচামেচি করার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না।' -- আমার এই কথায় কৃষণ চন্দর সন্তুষ্ট হলেন না। উনি আমাকে চিঠি লিখে জানালেন যে আমার হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও প্রবন্ধকারের ভাষায় তিনি কোন পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন না এবং এটাও খুব বড়ো

সত্যি যে আমার কাছে তার সাফাই গাওয়ার কোন মানে হয় না।

এই সব কিছু ঘটে গেল সেই মানুষটিকে কেন্দ্র করে, যার নাম কৃষণ চন্দর।

এখন এই কাহিনীর সেই ভাগ সম্পর্কে শুনুন যা একশো ভাগ ব্যক্তিগত। চৌরঙ্গী রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আমি অভিযোগ করলাম উনি এতদিন কলকাতায় এসেও কাউকে খবর দেননি! কৃষণ চন্দর বললেন, 'চলুন হোটেলে যাই, ওখানেই কথা বলব'। হাঁটতে হাঁটতে উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'শালিক সাহেবের কাছে মোটর আছে কি?' আমি আশ্চর্য হয়ে ওঁর দিকে দেখলাম -- 'আছে তো বটেই। কি করে জানলেন?' কৃষণ চন্দর বললেন, 'বিদায়ের সময় উনি একটা কথাই বললেন। উনি বলেছিলেন, 'আমাকে একটা জরুরী কাজে যেতে হবে। আমার গাড়ি এখানে দাঁড়িয়ে আছে'। আমি হাসি চাপতে পারলাম না। কৃষণ চন্দরের দেখার সেই শক্তি আছে যা এক ফোঁটায় এক নদী দেখতে পায়।

ম্যাজেষ্টিক হোটেলে পৌঁছে বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের কথাবার্তা হল। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় আমাদের মিটিং হবার সময় ঠিক হল। আমি এই মিটিং সম্পর্কে পারভেজ শাহেদীকে খবর দিলাম। তারপর আমরা আহমেদ আকবরাবাদীর বাড়িতে গেলাম। সেইখানে জমিল মজহরীও উপস্থিত ছিলেন। আমরা সবাই কৃষণ চন্দরের কাছে গেলাম। তখন জানতে পারলাম যে সকাল থেকেই তিনি জ্বরে ভুগছেন। আমরা জোর করে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। জমিল মজহারীর সঙ্গে পরিচয় হলে কৃষণ চন্দর বললেন, 'আমি আপনার সম্পর্কে জানি। আর পুনাতে বোস সাহেবের বাড়িতে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।' পারভেজ শাহেদীকে তিনি নিজের অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'খোদা জহন্নমমে'-র উল্লেখ করে বললেন, এটার বিষয়বস্তু এই যে ঈশ্বর একবার দুনিয়ায় এসেছেন আর এখানে ক্ষমতাশীলরা যেসব অত্যাচারের আর জুলুমের মাধ্যম বেছে নিয়েছে তা দেখে ঈশ্বর কেঁপে উঠছেন। ভাবছেন যে, তার চেয়ে নরক সামান্যই। পারভেজ শাহেদী জিজ্ঞেস করলেন, এতে কি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প আর ইলেকট্রিক চেয়ার ইত্যাদির উল্লেখ থাকবে? কৃষণ চন্দর বললেন, একথা আমি বলব না, কেননা উপন্যাসের আসল মজাটাই নষ্ট হয়ে যাবে; কিন্তু এই উপন্যাস এর থেকেও বেশি। এর থেকেও বেশি ভয়াবহ জুলুম এবং অত্যাচারের উদাহরণ পেশ করা যাবে। উনি বললেন, এই উপন্যাস খুব শীঘ্রই হিন্দীতেও প্রকাশিত হবার কথা। কিন্তু উর্দুতে কে ছাপবে জানি না। এই উপন্যাস আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। কৃষণ চন্দর একটি চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন যে বোধ হয় ঈশ্বরের মর্জি হয়নি।

কথার মধ্যেই কৃষণ চন্দরের ব্যথা বেড়ে গেল। আঃ। আমরা বুঝলাম উনি আরাম করতে চাইছেন। জ্বর, মাথাব্যথা দুই বাড়ছিল। এই ছটফটানির মধ্যে পাশ ফিরে তিনি খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ভাই পারভেজ, এবার আমার কাফন দাফনের (মৃত্যু সন্নিকট) ব্যবস্থা কর। তোমার কলকাতা আমাকে মেরেই ফেলবে। হায়!'

পারভেজ সাহেব তার বাহুতে মৃদু চাপড় দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন-- 'ঘারড়াচ্ছো কেন? সকালে ঠিক হয়ে যাবে; আমি আমার চাকরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে এখানে থাকবে।'

কৃষণ চন্দর বললেন, 'মজহর ইমামও থেকে গেলে ভাল হয়। আমি একান্ত একলা।' আমিও এই বড়ো শিল্পীর সেবা করার সুযোগ হারাতে চাইলাম না। কৃষণ

চন্দর যেভাবে কাতরাচ্ছিলেন, তা দেখে ভাল লোকও ভয় পেয়ে যায়। তাঁর জন্মস্থান 'অঙ্গা'-র এক বন্ধু রাত্রি দশটায় ডাক্তার নিয়ে এলেন। ডাক্তার কিছু ওষুধ দিলেন। ওষুধ কিনতে চৌরঙ্গী পৌঁছলাম রাত এগারোটায়। ভাগ্যিস একটি দোকান খোলা পেলাম। হোটেলে ফিরে দেখি পারভেজ় সাহেবের চাকর এসে গেছে। সে কৃষণ চন্দরকে চিনত, কেননা ১৯৫২ সালে সর্ব ভারতীয় শান্তি সম্মেলনে কলকাতা এসে কৃষণ চন্দর আর জাফরি সাহেব পারভেজ শাহেদীর বাড়িতেই ছিলেন। সেই চাকর সেই সময় পারভেজ সাহেবকে বলেছিল, 'জাফরি সাহেবকে তো লক্ষ্ণৌ-এর মনে হচ্ছে না।' পারভেজ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন'?

'জাফরি সাহেব লক্ষ্ণৌ-এর হলে আতি হুঁ, জাতি হুঁ বলতেন না।'

উর্দু ভাষার সবচেয়ে বড়ো গল্প লেখক, এক মহান শিল্পী বিছানায় অসুস্থ। আমি, যে আজ পর্যন্ত কারো সেবা করেনি, যে সেবা সম্পর্কে কিছু জানে না, সেই তার সেবা করে চলেছে।

কৃষণ চন্দরের ১০১ ডিগ্রির বেশি জ্বর ছিল না। কিন্তু তিনি ক্রমাগত কাতরে যাচ্ছিলেন, আর বারবার একটিই শের বলছিলেন ঃ

উল্টী হো গঁয়ি সব তদ্‌বীরে কুছ না দাওয়ানে কাম গিয়া
দেখা ইস বেমারিয়ে দিলনে আখের কাম তামাম কিয়া।

সব উল্টো হয়ে গেল। ওষুধ কোন কাজ করল না। দেখলে, প্রেমের এই ব্যথা আমাদের শেষ করে দিল।

বারবার মাথার ব্যথার কথা বলতে লাগলেন; আমি আমার পুরো শক্তিতে দুই হাতে তার মাথা টিপলাম। এতে একটু আরাম হলে বললেন, পুরো মাথায় ব্যথা হচ্ছে। এপাশ ওপাশ করে কোনভাবেই আরাম পাচ্ছি না।

'আজ কী রাত মুশাফির পে বহুৎ ভারি হ্যায়'।

আজকের এই রাত যাত্রীর পক্ষে খুব ভারি।

আমি আবার পুরো শক্তি দিয়ে ওঁর পা আর কোমর টিপছি। ওঁর মাথায় ব্যথা আবার বেড়ে গেল। মাথায় হাত বাড়ালাম; আর আমার কানে এল, 'আঃ, সকাল পর্যন্ত বাঁচবো না .... ওষুধ কাজ করল না।' আমি এই হতাশায় মনে মনে খুব হাসলাম, কিন্তু গম্ভীর মুখে তার সেবা করছিলাম। রাত তিনটে নাগাদ কৃষণজীর ঘুম এসে গেল। আমি জেগেছিলাম। জীবনের এই প্রথম এক দিন আমি রোগীর সিথানে সারা রাত জেগে কাটালাম।

কৃষণ চন্দর বম্বে গিয়ে মরতে চাইছিলেন। বোধ হয় উনি দ্বিতীয় দিন সকালের উড়ানে বম্বের টিকিট কাটলেন, সকালে ওর অবস্থা আগের থেকে অনেক ভালো ছিল। ফ্লু-এর প্রভাব তখনও ছিল। জ্বর বেশি ছিল না। বলতে লাগলেন, 'কলকাতার গরম আমি সহ্য করতে পারি না। আমি যখন পাঞ্জাবে ছিলাম, তখন গরম পড়লে পাহাড়ে চলে যেতাম। আমার অসুখ করে না, সেই জন্যে সামান্য অসুখ হলেও ভয় পাই।'

রাত্রির কৃষণ চন্দর সকালে বিলকুল বদলে গেলেন। এখন তিনি মৃত্যুর কথা ছেড়ে জীবনের কথা বলছিলেন। খাজা আহমদ আব্বাস, শাহের লুধ্যায়ানভি, জাঁ নিসার আখতার আর রামন সাগরের কথা বলছিলেন। আমি তাঁকে ধর্মপ্রকাশ, আনন্দ সম্পর্কে

জানতে চাইলাম। তিনি কোন কালে 'আদবী দুনিয়া' 'আদবে লতিফ' ইত্যাদি কাগজে গল্প লিখেছেন; আর কৃষণ চন্দর নয়ে জাগের প্রথম অঙ্ক এবং সম্ভবত নয়ে ফ্যাসানেতেও তাকে জায়গা করে দিয়েছিলেন। কৃষণ চন্দর জানালেন যে আনন্দ দিল্লীতে অফিসার -- এখন গল্প লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। শাহেদ কোনকালে কৃষণ চন্দরের আন্ধেরির বাড়ির গ্যারেজে এবং পরে উপরের তলায় থাকতেন। কিন্তু এখন কোন বড় ফ্ল্যাটে চলে গেছেন। শাহের লুধ্যায়ানভি ও মজরু সুলতানপুরীর উল্লেখ করলে বললেন যে এখন তিনি দুজনের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। কেননা এদের একজনের সঙ্গে দেখা হলে অন্যের নিন্দা করা ছাড়া কোন কথাই বলে না। কৃষণ চন্দরের এই কথায় ডম মোরেসের ভ্রমণ কাহিনী মনে পড়ল আমার। তিনি লিখেছেন 'যখন আমি মুল্‌ক রাজ আনন্দের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, তখন উনি বললেন যে বম্বেতে উর্দু ভাষায় ছ'জন বড়ো কবি আছেন; কিন্তু ওঁদের সম্পর্ক এত খারাপ যে শুধু ওঁরা আমার এখানে ডিনার খেতে এলেই ওদের মধ্যে কথাবার্তা হয়।'

কৃষণ চন্দর বম্বে ফিরে ভালবাসা ভরা একটি চিঠি লিখলেন। সেখান থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি ঃ 'যখন কলকাতা থেকে বেরোলাম ১০২ ডিগ্রি জ্বরে ভুগছিলাম। এখানে পৌঁছে আবার ১০৪ ডিগ্রি হয়ে গেল। সেই থেকে এখনও বিছানায় পড়ে আছি। দু-তিন দিন হল জ্বর নেই। কিন্তু খুব কমজোরী। কলকাতার ফ্লু আমি নিয়ে এসেছিলাম, এখানে সবার মধ্যে তা ভাগ করি দিয়েছি। সেই জন্যে আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে আমার সেক্রেটারী, বাড়ির চাকর-বাকর সবাই ফ্লুতে ভুগছেন। প্রতিবেশীরা এসে আমাদের দেখভাল করছেন আর তাদের কুকরা রান্নাবান্না করে দিচ্ছে। মহীন্দরজী মাঝে মাঝে খবর নিতে আসছিলেন; তিনদিন ধরে তিনিও বাড়িতে ফ্লুর শিকার হয়েছেন। আমার চলে আসার পর আপনি ভালো আছেন তো? এখন কলকাতার নাম শুনলেই ভয় হয়। (এখন বেচারা ওয়াহ্‌শৎভি কলকাতায় রইলেন না) -- আপনার ভালবাসা ও ঘনিষ্ঠতা কলকাতায় আমাকে বড়ো সাহায্য করল। আর এই সুন্দর কথা আমার সবসময় মনে থাকবে .... ।

এটি ১৯৫৭ সালের কথা। আর আজ ১৯৫৯ চলছে। -- কৃষণ চন্দর কেবল বেঁচে নেই, প্রতিদিনই হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছেন। খোদা করে উনি এরকমই হৃষ্টপুষ্ট থাকুন আর নিজের স্বাস্থ্যবান চিন্তাভাবনার আলো জ্বালিয়ে রাখুন।

ইংরেজী থেকে অনুবাদঃ কুমার ভট্টাচার্য

জাহির আনোয়ার

উপন্যাসের শিল্পরূপ ও কৃষণ চন্দর

সকল উপন্যাসপ্রেমিক ও সাধারণ পাঠক সমাজ -- উপন্যাস পাঠে গভীর আনন্দ পেয়ে থাকেন। দেখা যায়, যে কল্পনার জগৎ এবং আমাদের দৈনন্দিন বাস্তব জগৎ-- এ দুয়ের সংমিশ্রণ ঔপন্যাসিকরা খুব সাবলীল ভাবেই করে থাকেন এবং এর মধ্যেই নিহিত আছে উপন্যাসের জনপ্রিয়তার যাবতীয় উপাদান। ঔপন্যাসিকরা জীবনের সতত প্রবহমান গতি, মানুষ এবং নানা ঘটনা নিয়ে কাজ করে থাকেন এবং তাঁদের কল্পনাশক্তির সাহায্য নিয়ে কাহিনীকে সবার গ্রহণ যোগ্য সুন্দর আকার দেন। খুব কম কথায় বলতে গেলে উপন্যাস মনুষ্য জীবনের বিবিধ কাজ, নানা ঘটনা, পারিপার্শ্বিক নানা প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিবরণ আমাদের মধ্যে অর্ন্তলীন করে দেয়।

উপন্যাসের জনপ্রিয়তায় অন্যতম কারণ এর বিশাল সৃজনশীলতা ছাড়াও পাঠককে চিত্ত বিনোদনকারী কিছু উপাদান দেবার মধ্যেও বিদ্যমান। এর আঙ্গিক থেকে যেমন আমরা অপরিসীম আনন্দ পাই তেমনি আমরা মুগ্ধ হই এর বিশাল সংখ্যক চরিত্র ও ঘটনার সমাহার থেকে। এক একজন ঔপন্যাসিকের উপন্যাস লেখার এক এক রকম ধরন থাকে এবং নিয়তিব সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত রূপায়ণের পদ্ধতি মাথায় রেখে আমরা উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক কৃষণ চন্দরের কথায় আসছি। তিনি মানবজীবনের এক দক্ষ কথক; কখনও কাল্পনিক, কখনও বাস্তব, আবার কখনও বিশেষ করে ক্ষুদ্র পরিসরে অত্যন্ত একঘেঁয়ে ও বিষাদগ্রস্ত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর লেখা পড়তে ভাল লাগে। প্রগতিশীল আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ ছিলেন বলে তাঁর উপন্যাসে নানা ঘটনার ঘনঘটা দেখা যায়। অন্তরের গভীরে উনি ছিলেন একজন যথার্থ 'র‍্যোমান্টিক' ঔপন্যাসিক এবং তাঁর লেখায় বিষয়বস্তুর মধ্যে এক দুর্লভ অর্ন্তদৃষ্টি এবং সজীব কল্পনা শক্তির সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। এই 'রোম্যান্টিক' ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের জন্য তাঁর লেখায় এমন একটা স্বাধীন ধারার সন্ধান পাওয়া যায় যা অত্যন্ত চমকপ্রদ ও সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য। বিংশ শতাব্দীর আধুনিক ও কুশলী লেখকদের মত তাঁর লেখার ঠাটের মধ্যে কোন জটিল গঠনশৈলীর প্রভাব নেই; বরং এর বদলে সহজ সরল প্রকাশ ভঙ্গী একটা সজীব 'রোম্যান্টিসিজমের' প্রবণতা এনেছে। গল্পাংশ খুব নিবিড়ভাবে ও সুচারুরূপে এগুতে থাকে। রাজিন্দর সিং বেদী, কৃষণ চন্দের লেখায় মূল্যায়ন করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন যে, তাঁর লেখার ধারা পাঠককে আনন্দ দেয়। কৃষণ চন্দর তাঁর বহু লেখার মধ্যেই গ্রাম্য বা সাধারণ জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর সম্বন্ধে এটাও বলা হয় যে উর্দু সাহিত্যে তাঁর স্থান চিরস্থায়ী। কিন্তু অতি দ্রুত গতিতে লেখার জন্য তাঁর লেখা প্রসাদগুণ থেকে মাঝে মধ্যে বিচ্যুত হয়েছে। অনেক ছোট গল্প লেখা ছাড়াও তিনি প্রচুর নাটক, জীবনী ও উপন্যাস লিখেছেন। উপন্যাসে সব সময় লেখকের দর্শন (বিষয়) এবং জীবনে তার প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত হয়। একজন যথার্থ শিল্পী এই সব বিষয় ও নানা প্রতিচ্ছায়াকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে উপলব্ধি

করেন এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মিশেলে তা পাঠকের কাছে পরিবেশন করেন। অত্যধিক ঘাত-প্রতিঘাত ও বেশি লেখার প্রবণতা লেখকের মাত্রাবোধ ঠিক করে দেয়। ফলত এই উপন্যাস হয়ে পড়ে মন্থর এবং তা জীবনের কোন অর্থময়তার সন্ধান দেয় না। অনেক লেখা সত্ত্বেও কৃষণ চন্দরের গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসগুলি- যথা 'শিকাস্ত' (Defeat), 'দিল কি ওয়াদিঁয়া সা গয়ী (The Valley of heart went to sleep) বা 'গদ্দার' (Traitor) হচ্ছে উর্দু সাহিত্যে তাঁর প্রধানতম অবদান যার আকর্ষণ আজও বিদ্যমান এবং সেটি সমাজের প্রতি লেখকের দায়বোধের প্রতিবিম্ব হয়ে থাকবে। উপন্যাসগুলি নতুন উদ্যমে নতুনরূপে আমাদের কাছে এসে হাজির হয়; তার কারণ লেখক শব্দগুলিকে বর্ম হিসাবে, 'রোম্যান্টিসিজম'-কে শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে এবং চরিত্রগুলোকে রোম্যান্টিক ও বৈপ্লবিক আদর্শে মুড়ে রেখেছেন। বিশ্বের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই উপন্যাসগুলির মধ্যে এসেছে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি বা দ্বন্দ্বের ছবি। এই চিন্তাধারাই তাঁকে সাহিত্য সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

ঔপন্যাসিক হিসাবে কৃষণ চন্দরের মূল অবদান হচ্ছে প্রেমচাঁদের পর উর্দু সাহিত্যের দিগন্তকে আরো প্রসারিত করে দেওয়া। অত্যন্ত জনপ্রিয় কিন্তু একাধারে সাহিত্য প্রসাদগুণ সমন্বিত উপন্যাস রচনায় তিনি খুবই সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'শিকাস্ত' শুরু করেন ১৯৪৩-এ এবং শেষ পর্যন্ত ৩০ টি উপন্যাস লেখেন। তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে "এক ঔরত হাজার দিওয়ানে", (One woman, thousand lovers) "দাদের পুল কে বচ্চে (The children of dader bridge), গঙ্গা বহে না রাত (Neither ganga flows nor the night), "এক ভাওলিন সমুন্দর কে কিনারে" (A violin of the sea side), "সড়ক ওয়াপিস জাতি হ্যায়" (The street goes back) এবং "দুসরি বর্ফবারী সে পহ্‌লে" (Before the next snowfall)।

কৃষণ চন্দর এমন এক সময়ে এই উপন্যাসগুলি লেখেন যখন উর্দু সাহিত্যে এই ধারায় একটা পরিবর্তন আসছে। উপন্যাসের সীমারেখা বিস্তার করার ক্ষেত্রে প্রেমচন্দের পর তিনি সবচেয়ে প্রভাবশালী ও সৃজনশীল ঔপন্যাসিক ছিলেন। তিনি তাঁর লেখার মধ্যে জীবনদর্শন ও সমাজের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। মানবমনের টানাপাড়েন কৃষণ চন্দরের উপন্যাসের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে স্বাধীনতার আগে ও পরে সমাজজীবনে যে একটা পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার একটা বিবরণ পাই। সমাজবাদে তার গভীরভাবে জড়িয়ে পড়া থেকেই ঔপন্যাসিক হিসাবে নিজেকে বন্ধনমুক্ত করে নেবার তত্ত্বটি তিনি আয়ত্ত করে নেন। সাহিত্যের যে একটা রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে তা তিনি কখনও ভোলেন নি। এবং এই কারণে তাঁর উপন্যাস লেখার মধ্যে সাংবাদিক সুলভ এক মনোবৃত্তির পরিচয় পাই। তাঁর লেখা কল্পনাসমৃদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক গুণের জন্য একটা ভিন্নতর মাত্রা পেয়েছে। অনেক জায়গায় তিনি সফল হয়েছেন; কিন্তু মাঝে মধ্যে তাঁর লেখার মধ্যে প্রচারের একটা গন্ধ পাওয়া যায়। তাঁর উপন্যাসগুলিকে যদি খুব মনোযোগ সহকারে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে মনে হবে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'শিকাস্ত' শৈল্পিক উৎকর্ষের চরমস্তরে উঠেছে যা কোন ভাল উপন্যাসের সমগোত্র হলেও মহৎ পদবাচ্য হবে না। আরো দুটো উপন্যাস যেগুলো আজও জনপ্রিয় ও পাঠকেরা পড়ে থাকেন যথা "দাদর পুল কে

বচ্চে" এবং দুসরি বর্ফবারী সে পহলে"। এগুলি অবাধ কল্পনা সৃষ্টির ফসল। "জব খেত জাগে" (When field awaken) সমাজের প্রতি তাঁর প্রবল দায়বদ্ধতার কথা মনে করিয়ে দেয়। "গদ্দার" হচ্ছে সে রকমই একটি উপন্যাস যার মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি লেখকের একাত্মবোধ ও মানবিকতা-বোধ এত বেশি ফুটে উঠেছে যে এই সব ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলির প্রকাশ উপন্যাসটিকে একটি সাধারণ মানের উপরে উঠতে দেয়নি এবং শেষ পর্যন্ত কতকটা শ্লোগান সাহিত্যে পরিণত করেছে।

তাঁর উপন্যাসে বর্ণিত সব ধ্যানধারণাই অভ্রান্ত নয়। তবুও কৃষণ চন্দর তাঁর সময়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক। উর্দু উপন্যাসের ইতিহাসে তাঁর একটা উল্লেখযোগ্য স্থান আছে, শুধুমাত্র এই কারণেই যে তিনি উপন্যাসগুলো লিখেছেন একটা বিশেষ ধারায়। তিনি অনেক লিখেছেন ও সময়ের নিরিখে তাঁর অতুলনীয় অবদান রেখে গেছেন। কিছু উপন্যাসে তিনি চরিত্র ও ঘটনাকে সাফল্যের সঙ্গে এঁকেছেন কিন্তু প্রায় তাঁর সব উপন্যাসেই তৎকালীন বাতাবরণকে অঙ্কন করায় তিনি অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে দেন। তাঁব লেখাব ধরন ও শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। এই সব নানা কাবণে তাঁর উপন্যাসগুলি উর্দু সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য অবদান হিসেবে গণ্য হবে।

'শিকাস্ত' হচ্ছে এমনই একটা উপন্যাস যেখানে তিনি সর্বোত্তম। এটি সেই একই বকমেব উপন্যাস যা একাধারে 'র‍্যোমান্টিক', কিন্তু অন্যদিকে স্থানে স্থানে রয়েছে সামাজিক সচেতনতার চিহ্ন। এই উপন্যাসে শ্যাম ও বন্তী ভালবাসার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এবং এরাই হচ্ছে এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা। শ্যাম লাহোরে একটি কলেজে পড়ে এবং ছুটিতে বাড়ী আসে। সমস্ত ঘটনা ঘটে ছুটিব সময়টুকুর মধ্যে। গল্পটা নতুন কিছুই নয়। শ্যাম ধনী পবিবারের ছেলে। অন্যদিকে বন্তী হচ্ছে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতিনিধি। তারা প্রেমে পড়ে। অবশ্যম্ভাবী রূপে সেখানে নতুন চিন্তাধারা ও পুরানো ধ্যানধারনার বিরোধ লেগে যায়। অন্য যে সব চরিত্র আছে যথা ছায়া, মোহন সিং, অধ্যাপক স্বরূপ কিষণ, আলি জূ এবং অন্যান্যরা। তাদের প্রত্যেকের নিজস্বতা আছে। এরা প্রত্যেকেই আবেগপ্রবণ ও একই সঙ্গে সামাজিক চেতনা সম্পন্ন। সমগ্র উপন্যাসটি এই দুটো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পালাক্রমে ঘুরপাক খাচ্ছে। মানসিক আবেগ যখন একটু পিছিয়ে থাকে তখন সমাজ চেতনা মুখ্য বিষয় হয়ে যায়। এই গোলকধাঁধায় পড়ে চরিত্রগুলো তাদের পূর্বনির্ধারিত পরিণতি প্রাপ্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত আঘাত পায়। শ্যাম ও বন্তীর প্রেম কখনই পূর্ণতা পায় না। বন্তীকে জোর করে আর একজনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় ও সে আত্মহত্যা করে। শ্যাম গ্রামে ফিরে আসে। স্বরূপ কিষণ ও আলি জূ-র চিন্তাধারা উপন্যাসের সামাজিক পটভূমি বদলাতে পারে না। তারা কখনই উপন্যাসের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশে হয়ে উঠতে পারে নি। লেখক সামাজিক বিষয়ে তার ধ্যানধারণা নিয়ে নানা মন্তব্য করার জন্য চরিত্রগুলো স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে না। চরিত্রগুলির স্বাভাবিক পরিণতি প্রাপ্তির পথে লেখকের বাধাদানে অবশ্য আমরা বিরক্তি বোধ করি না। লেখক খুব সচেতনভাবে ঘটনা ও চরিত্রগুলি নির্বাচন করেছেন, পরিবর্তন করেছেন, কখনও নাটকীয়তা দিয়েছেন, কখনও উপন্যাসের ধরন ব্যবহার করেছেন। আগেকার লক্ষনগুলির কথা ধরলে চরিত্রগুলো এক মাত্রিক হয়ে যায়। তারা হয় 'র‍্যোমান্টিক' নয়তো সমাজ নিয়ে নানারকম নৈতিক

উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। এর বেশি কিছু নয়। সেখানে কোন গভীর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব নেই এবং সাধারণভাবে যা ঘটে যাচ্ছে চরিত্ররা তারই স্বাভাবিক পরিণতির শিকার হচ্ছে। নানা চিন্তাধারাকে উপস্থিত করা হচ্ছে কিন্তু কখনই তা চরিত্রের মধ্য দিয়ে নয় যা আদ্রে জিদ বলেছেন। প্রায় সবসময়ই চিন্তা ভাবনায় তারা তাদের স্রষ্টার মতো চূড়ান্ত এবং এজন্য কখনই স্বাভাবিক গতি পায় না। কিন্তু শিকাস্ত লেখকের অন্য উপন্যাসগুলোর মতই বাতাবরণ সৃষ্টির যথার্থ উদাহরণ হিসেবে পরিচিত হবে। উপন্যাসের বিভিন্ন দৃশ্যগুলি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে আঁকা হয়েছে। এই একটা জায়গায় কৃষণ চন্দর অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রাণবন্ত রয়ে গেছেন। পাঠক যে কোন একটি উপন্যাস তা কাশ্মীর অথবা অন্য যে কোন শহরের পটভূমিকায় হোক না কেন পড়তে পারেন। কৃষণ চন্দর প্রকৃতির অগনিত অনুভূতিগুলিকে চিত্রিত করেছেন এবং এই কাজে তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, দূরদর্শিতা এবং জাগতিক নানা বিষয়ে অস্বাভাবিক অনুভূতির মাধ্যমে তিনি দৃশ্যের পর এমন সব দৃশ্য সৃষ্টি করে গেছেন যা আমাদের অন্তরে গভীর ছাপ রেখে যান। প্রকৃতির মধ্যে চরিত্রগুলি শব্দ ও বর্ণনার পাশাপাশি প্রয়োজনে খুব সুন্দরভাবে মিলে মিশে গেছে। কখনও কোন এক দুর্লভ মুহূর্তে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ঔপন্যাসিক বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্নিহিত পরতগুলি উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং এই ভাবে অন্তরে আলোড়ন তোলা প্রাকৃতিক নানা দৃশ্য উপহার দিয়েছেন। আজিজ আহমেদ, একজন প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক কৃষণ চন্দর লেখা সম্বন্ধে এই মত পোষণ করেন ঃ

"প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনার ক্ষেত্রে উর্দু গদ্য সাহিত্যে কৃষণ চন্দরের মত আর কেউ নেই। কোন লেখক অথবা কবি কৃষণ চন্দরের মত করে পাহাড়, উপত্যকা, নদী, ঝর্ণা হ্রদ, হরিৎভূমি, গ্রাম ও শহরের ছবি আঁকতে পারেন নি।"

এই যে মূল্যায়ন এ নিয়ে কোন দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ নেই। 'শিকস্ত' সহ অন্যান্য উপন্যাসের বাতাবরণ তৈরীর ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কোন ছোটখাট অংশকেই বাদ দেন নি। তিনি তাঁর লেখায় দুর্লভ এক বাতাবরণের সৃষ্টি করেন এবং খুব বিচক্ষণভাবে গল্পটিকে সেখান থেকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে যান। 'শিকাস্ত' উপন্যাসে পীরের মেলার কথা যা বলা হয়েছে তা এর এক উদাহরণ। তিনি অন্তরের নানা প্রতীকী তাৎপর্যকে প্রকৃতির দৃশ্য ও আলোকময়তার মধ্যে অনুভব করেছেন। আমরা দৃশ্যগুলির অসীম ও যাদুকরী সৌন্দর্যে, বিশেষত কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই। তিনি পাহাড়, নদী, উপত্যকা ও গ্রামগুলির ও সেখানকার অধিবাসী এবং তাদের আচরণ ও পরিচ্ছদের যে ছবির মতো অথচ মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে তাঁর কল্পনা শক্তির প্রসারতা বোঝা যায়। শব্দের সহজাত কুশলী বর্ণনায় তাঁর কোন জুড়ি নেই। তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই দেখা যায় যে মনের গঠন কিভাবে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে গেছে।

ঘটনা ও সংলাপের রূপকার রূপে পাঠকের কাছে কৃষণ চন্দর-কে বরং আবেগতাড়িত ও দ্বিধাগ্রস্থ মনে হয়। দেখা যায় যে উপন্যাসে একটার পর একটা ঘটনা এমনভাবে ঘটে চলেছে যার সবটাই আগে থেকে নির্ধারিত, উদ্দেশ্যবহুল এবং এমনভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে তা যেন লেখকের ব্যক্তিগত চিন্তা-ধারার সঙ্গে

সাযুজ্যপূর্ণ হয়; আবার কখনও মনে হয় ঘটনার কাঙ্ক্ষিত পরিণতি ঘটানোর ক্ষেত্রে তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ঘটনাগুলি প্রায়শই ঠিক সময়ে সঠিক পরিণতি পায়। প্রায়শই সীমার বাইরে গিয়ে বক্তব্যকে বড়ো করে তোলে। ঠিক একই কথা উপন্যাসে ব্যবহৃত সংলাপ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। বেশিরভাগ সময়ই চরিত্রগুলি প্রচুর কথা বলে যায় এবং পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত খুঁত থেকে যায়। এ থেকে কারো কারো মনে হতেই পারে যে চরিত্রগুলি লেখকের জীবনদর্শন; তাঁর বিদ্রূপাত্মক আদর্শ, ফাঁপা র‍্যোমান্টিসিজমকে প্রচার করার একটা বাহন মাত্র। লেখক গল্পের স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক গতিকে স্তব্ধ করে দেন। তাঁর বিদ্রূপগুলি শেষ পর্যন্ত শুষ্ক ও দীর্ঘ নৈতিক বক্তৃতাতে পরিণত হয়। তাঁর কিছু কিছু উপন্যাস যথা, "এক গধে কি সরগুজস্ত" (A Biography of an ass), "আশমান রৌশন হ্যায়" (The sky is radiant), "এক ঔরত হাজার দিওয়ানে" এবং "চাঁদনি কে ঘা" (The wound of moonlight) পড়লে এই কথাই মনে হয়। শেষ পর্যন্ত এবং উর্দু সাহিত্যের উত্তরণে এটা অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলা যায় যে কৃষণ চন্দর এই ধরনটিকে জনসাধারণের তৃপ্তির জন্য ব্যবহাব কবেছেন। তিনি সমাজের অবহেলিত, সর্বহারা, পিছিয়ে পড়া শ্রেণীব লোকদের জন্য তাঁর সব সহানুভূতি উজাড় করে দিয়েছেন এবং যারা উপন্যাস ভালবাসেন তাঁদের সমর্থন পেয়ে গেছেন। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীকে তুলে ধরতে, যদিও কখনও কখনও তার মধ্যে সুসংহত শৈল্পিক সীমারেখায় ঘাটতি ছিল। তাঁর উর্দু উপন্যাসে মুল্যবোধের একটা বিশাল বিস্তৃতি আছে। তাঁর উপন্যাসে যে কেবল বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় কথাই জানতে পারি তা নয়, স্বাধীনতা পববর্তী সময়ে যে মুল্যবোধ গডে উঠেছিল তারও একটা পরিষ্কার চিত্র পাই। তাঁর লেখার মধ্যে যদিও উচ্চমার্গের এক শৈল্পিক উৎকর্ষতার অভাব আছে তবুও তারই মধ্যে প্রকৃতির বর্ণনা ও একই সঙ্গে মানুষের ভাগ্যের বর্ণনাকে অস্বীকার করতে পারি না।

উর্দু থেকে অনুবাদ ঃ শওকত আজিম

জগদীশ চন্দ্র ওয়াধান

কৃষণ চন্দরের রাজনৈতিক মত ও পথ

কার্ল মার্কসের ' দাস ক্যাপিটাল' সম্পর্কে ইকবাল লিখেছিলেন ঃ
আঁ কলিসে বে তজল্লি আঁ মসিহে বে সলিম
নিস্ত পয়গম্বর পোলেকিন দর বগল দাহত কিতাব

তুমি এমন মুসা যে কখনও ঈশ্বরের রূপ দেখেনি।
তুমি এমন যীশু যার কাছে কোন ক্রুশ নেই,
তুমি কোন অবতারও নয়, তবে তোমার কাছে
একটা বই আছে।

রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাব আন্তর্জাতিকভাবে বিস্তৃত হয়েছিল। বহু লেখক মার্কসের আদর্শ অনুযায়ী শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছেন। কৃষণ চন্দর ভারতীয় লেখকদের উপর রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাবের কথা এভাবে ভেবেছেন ঃ

'আমাদের প্রজন্মের অন্যান্য লেখকদের মতো আমিও রাশিয়ার বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। বিংশ শতাব্দীতে আমি এটিই মানুষের সবচেয়ে বড়ো কাজ বলে মনে করি। এই বিপ্লবের পরই এশিয়া ও আফ্রিকায় স্বাধীনতা কল্পনা সম্ভব হল। ফ্রান্সের বিপ্লবের পর এটি দ্বিতীয় বড়ো বিপ্লব। বন্ধু শত্রু সবাই এ সম্বন্ধে ভাবতে বাধ্য হল। রাশিয়ার বিপ্লব ধনতন্ত্রের প্রথম পরাজয়।

কৃষণ চন্দর একবার তার বন্ধু কানহাইয়ালাল কাপুরকে বলেছিলেন যে কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার সমস্ত গল্প, নাটক, উপন্যাস, আর রম্যরচনার বিষয় কি, আমি বলব ইকবালের এই পংক্তি -- 'কাখে ও ওমরাকে দর ও দিবার হিলাদো'। (কানহাইয়াল কাপুর, রপ্তেদওয়ালে না অজ দিলেমা'। কৃষণ চন্দর সংখ্যা বম্বে, শায়ের পৃষ্ঠা ৩৮) পচা গলা ধনতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে খতম করে দাও তার জায়গায় একটা নতুন ব্যবস্থা নিয়ে এসো, যাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

নরেশ কুমার সাদ একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনার সাহিত্যিক জীবনে আপনাকে কে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে? কৃষণ চন্দর আস্থা নিয়ে বললেন, 'যদি তুমি আমাকে কোন আদর্শ জিজ্ঞাসা কর, আমি বলব মার্কসবাদ। আমি ছাত্রজীবন থেকে মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। যত গুলি দর্শন আছে তার মধ্যে মার্কসবাদ সবচেয়ে বেশি যুক্তিবহ, বৈজ্ঞানিক ও সত্যের কাছাকাছি বলে আমি মনে করি' (কৃষণ চন্দরের ইন্টারভ্যু : আফসানা, দিল্লী, বিসবী সাদী, জুলাই ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ১৫৫)। এই কথা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে তিনি মার্কসবাদী ছিলেন। মার্কসবাদ তাঁর রাজনৈতিক পথ ছিল। মার্কসবাদ তাঁর সাহিত্য ও শিল্পের পথ দেখিয়েছিল এবং তাঁর বিচারধারাকে প্রভাবিত করেছিল। এক্ষেত্রে এটা জানাও খুব জরুরী কোন কোন ঘটনা অভিজ্ঞতা তাঁকে মার্কসবাদের দিকে নিয়ে গেল, কি কারণে তিনি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করলেন। (আহম্মদ হাসান, কৃষণ চন্দরকে সামাজিক ঔর আদবী নজর ইয়াৎ, দিল্লী, আজকাল,

কৃষণ চন্দর বাল্যকাল থেকেই মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এর প্রথম কারণ কৃষণ চন্দের বাবা সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি গরীব মানুষের অধিকারের পক্ষে লড়াই করতেন, ব্রিটিশ সরকার ও সামন্তবাদী ব্যবস্থাকে ঘৃণা করতেন। উনি নিজের চোখে জোরজুলুম ও লুঠপাটের তাণ্ডব দেখেছিলেন। অবশ্য তার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদের বেশি কিছু করতে পারেননি কেননা তাঁর রুটিরুজির চিন্তা ছিল, সরকারী চাকরী ও ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের চিন্তা ছিল। ধর্মের দিক থেকে গৌরীশঙ্কর ছিলেন নাস্তিক। ধর্মের গোঁড়ামি, ধর্মের বাধা তিনি অর্থহীন মনে করতেন। কৃষণ চন্দরকে তিনি তাঁর আদর্শ অনুযায়ী বড়ো করে তুলেছিলেন। কৃষণ চন্দর তাঁর বাবাকেই তাঁর জীবনের আদর্শ মেনেছিলেন। এরই পরিণামে কৃষণ চন্দরের মানসিকতা মানুষের কল্যান ও মার্কসবাদের ভাবাদর্শে উন্নীত হলো। দ্বিতীয় বড়ো কারণ, দারিদ্র্য এবং ক্ষুধার্ত মানুষ কৃষণ চন্দরের মনকে করুণাদ্র করেছিল। শ্রমিক, সাদাসিধে সরল মানুষ দু-বেলা পেট ভরে খাবার পেত না। মুষ্টিমেয় দু-চারজন ধনী লোক পুরো রাজ্যকে নিজেদের জায়গীর ভাবতো। যে কোন সুন্দরী তরুণীর উপর চোখ পড়লে তাকে তুলে নিয়ে যেতো। এর বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিবাদ করলেই জিভ কেটে দেওয়া হতো, রাজ্য থেকে তাকে বের করে দেওয়া হতো। এই নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোন উকিল মুখ তুলে প্রতিবাদ করতে পারত না। এই অমানবিকতা তাঁর মনে যে প্রতিবোধের বীজ রোপন করেছিল তা একদিন চারাগাছ হলো। তারপর মহীরুহ। তৃতীযত, কৃষণ চন্দবের ব্যক্তিগত জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটল যা তার জীবনকে মার্কসবাদী পথে টেনে নিয়ে গেলে।

কৃষণ চন্দর যখন দ্বিতীযবার হাজি পীব গেলেন তখন তার বযস তেরো বছর। শীতকালে বরফ পড়ছিল। চারদিক ববফে ঢাকা। কৃষণ চন্দব দেখলেন একটি মানুষের মৃতদেহ -- ঠাণ্ডায় নীল, হাঁটু পর্যন্ত পাতলা পাজামা পরা, পায়ে খড়ের বিচালী দিয়ে বানানো জুতো, মুখ খোলা, টাক মাথায় একটি টুপি। টুপির উপর মজবুত দড়ি দিয়ে নুনেব একটি টুকরো বাঁধা। তার ওজন দেড় মনের কম হবে না। নুনের টুকবো নিয়ে যাবার সময় ববফ কুযাশা ঝড়ে বাস্তা ভুলে উপত্যকায় এসে পড়েছে। এই দৃশ্য দেখে কৃষণ চন্দরের মন কেঁদে উঠল। কৃষণ তার বাবার কম্পাউণ্ডাবকে জিজ্ঞেস কবে জানল যে শীতকালে পাহাড়ী রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। তখন রাজ্যে পাঞ্জাব থেকে নুন আসে না। ফলে নুনের দাম বেড়ে যায়। সেই জন্যেই এরা রাওয়ালপিণ্ডি বা যেখানেই নুন সস্তায় পেত সেখান থেকে পিঠে বা মাথায় নিয়ে লম্বা রাস্তা পাড়ি দিত। কৃষণ চন্দর শুনে বিস্মিত হয় যে নুনেব মত সামান্য জিনিসের জন্যে কেউ প্রাণ দিতে পাবে। এই ঘটনার প্রভাব কৃষণ চন্দরের সরল সাদা মনে দূরপ্রসারী হয় ঃ

'লোকটা মরে পড়ে আছে। নুন বরফে গলে যাচ্ছে। এই ছবি আমি কল্পনায় হাজার বার দেখেছি। কখনও বুঝতে পারিনি। এর অর্থ খুব কঠিন নয়, তবুও আমি বুঝতে পাবিনি। (কৃষণ চন্দব, মিট্টি কে সনম, দিল্লী, এশিয়া পৃষ্ঠা ২৪)

কৃষণ চন্দর এফ.এ পরীক্ষা দেওয়ার পর ছুটিতে লাহোর থেকে পুঞ্চ যাবার

রাস্তায় হাজি পীর-এ থামলেন। তখন তাঁর বয়স সতেরো আঠারো। দেখলেন হাজি পীরের মজাত্তর (পুরোহিত) সরফো খুব চিন্তিত মুখে বসে আছে। কৃষণ চন্দর তাঁকে ভালভাবেই চিনতেন। রাত্রিবাসের সময় সরফো কৃষণ চন্দরকে তাঁর বিপদের কথা বললেন। তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয় মেয়ে সায়দাঁ রাওয়ালপিণ্ডির একটি বেশ্যা পল্লীতে যেতে বাধ্য হয়েছে। সরফোর একমাত্র সন্তান সায়দাঁ বিবি। কাশ্মীরের সৌন্দর্যের প্রতীক ছিল সে। ঠাকুর সিং নামে এক জুলুমবাজ হাকিমের সায়দাঁ বিবির উপর চোখ পড়ল। হাকিমের ন্যায়ে উনি সায়দাঁ বিবিকে ধর্ষণ করলেন। সরফো কৃষণ চন্দরকে বলল, 'বাবুজী রাওয়ালপিণ্ডি গেলে তাকে বলবে, তোর বাবা তোকে ডাকছে -- সায়দাঁ বিবি, বাড়ি ফিরে চল। ভাবিসনা, মুখ দেখাবার লজ্জার কথা -- এখানে কোন বাড়ি আছে যাকে হাকিম কলঙ্কিত করেনি? ফিরে চল সায়দাঁ বিবি, তোর বাবা একা আছে।' কৃষণ চন্দর এই সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

'আমি আমার নতুন যৌবন, নতুন শিক্ষা, নতুন বৈপ্লবিক তরঙ্গে সরফোকে কিছু বলতে চাইছিলাম — নিজের হাতে মুখ ঢেকো না সরফো, একদিন এই ইংরেজ শাসন শেষ হয়ে যাবে। একদিন রাজা-মহারাজাদের শাসন শেষ হয়ে যাবে। এই শাসনে এক সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। একদিন এই শাসনের ভার জনতার হাতে আসবে। তোমার ক্ষেত তোমার হবে, হাকিম তোমার চাকর হবে। তোমার ঘরের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য তুমি ফিরে পাবে।'

(কৃষণ চন্দর 'মিট্টি কে সনম', দিল্লী, এশিয়া পৃষ্ঠা ২৪)

প্রথম প্রথম কৃষণ চন্দর রাজাদের খুব বীর ও আকর্ষণীয় ভাবতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে ওদের মুখোস খুলতে লাগল। ওদের বিচ্ছিরি চেহারা সামনে আসতে লাগল। উনি দেখলেন সামন্তবাদী ব্যবস্থা প্রজাশোষন ও জুলুম জবরদস্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই ব্যবস্থায় ন্যায় বলে কিছু নেই। বাল্যকালে ওঁকে এক ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে হল। একবার রাজা বলদেও সিং খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। উনি কৃষণ চন্দরের বাবাকে ডেকে পাঠালেন, ডাক্তারবাবু বাজার মহলে যাবার সময় কৃষণ চন্দরকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বাবা রাজাসাহেবকে দেখতে অন্দরমহলে ঢুকে গেলে কৃষণ চন্দর এক কোণায় খেলা করতে লাগলেন। দুই রাজকুমার ও রাজার বাবুর্চির ছেলে ওঁর সঙ্গী হলো। বাবুর্চির ছেলে সুন্দর রঙ বেরঙের পাথর দেখাল। এগুলো সে নদীর ধার থেকে কুড়িয়ে এনেছিল। রাজকুমারের জ্যাঠতুতো ভাই তাকে অদ্ভুত ধরনের পাথর দেখাল। সেগুলো শ্রীনগর থেকে আনা। রাজকুমার তাকে একটা পকেট ঘড়ি দেখাল। ঘড়ি গান গায়। এবার তারা কৃষণকে বলল, তোমার কাছে কি আছে দেখাও। কৃষণ তার পৈতৃক শহর উজিরাবাদের তৈরী করা তিন ফলার ছুরি দেখাল। স্প্রিং-এর উপর চাপ দিলে ফলা এক এক করে খুলে যেত। ছুরির বাঁট হাতির দাঁতের তৈরী, এই ছুরি ছিল কৃষণ চন্দরের খুব প্রিয়। তার বাবা তাকে দেওয়ালীর সময় উপহার দিয়েছিলেন। ছুরি দেখে সবাই চমৎকৃত হল। রাজকুমার কৃষণ চন্দরের হাত থেকে ছুরি নিয়ে নিজের পকেটে রাখল। ছুরির দখল নিয়ে প্রথম রাজকুমার দ্বিতীয় রাজকুমারের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাল। বিপদ বুঝে ছুরি বেহাত হয়ে যাবার ভয়ে কৃষণ চন্দর ছুরি দাবি করল। নিরুপায় হয়ে রাজকুমারকে এক চড় মারল। পরিণামে সবাই মিলে কৃষণ চন্দরকে মেরে ওর অবস্থা

কাহিল করে দিল। জামা ছিঁড়ে দিল। কৃষণ চন্দর কাঁদতে লাগল। কান্নার আওয়াজ শুনে তার বাবা বেরিয়ে এসেই ঘটনা শুনে কৃষণ চন্দরকেই মারতে আরম্ভ করলেন, কেন রাজকুমারের গায়ে হাত তুলেছে। বাবা কৃষণ চন্দরের কোন কথা শুনতে রাজী হলেন না। এই সম্পর্কে কৃষণ চন্দব লিখেছেন ঃ

'এটা অনেক পরে আমি জানতে পারি, এরা এভাবেই করে। হাতির দাঁতের সাদা বাঁটের ছুরি, কোন সুন্দরী মেয়ে, উর্বর জমির টুকরো সবই হাতিয়ে নেয়। কখনো ফিরিয়ে দেয় না। এভাবেই তো সামন্তবাদ চলে -- কিন্তু এরা কাজটা খুব ভাল করেনি। দু আনার ছুরির জন্যে আমাকে শত্রু করল। সেই সাদা হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা ছুরির কথা আমি এখনও ভুলতে পারিনি। এই ধরনের যত লেখা আছে, সবই সেই ছুরি ফেরৎ নেবার জন্যে লেখা। (কৃষণ চন্দব, মিট্টি কে সনম, পৃষ্ঠা ৬২-৬৩)

এইভাবে এই সামান্য ঘটনা কৃষণ চন্দরের জীবনের ধারা বদলে দিল।

পুঞ্ছ রাজ্যে ম্যাট্রিকের কোন পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল না। সেই জন্যে রাজ্যের সব ছাত্রকে রাওয়ালপিণ্ডি যেতে হতো। কৃষণ চন্দর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে পুঞ্ছ ফিবে আসছিলেন। রাস্তায় মরির পাহাড়ের বিখ্যাত স্বাস্থ্যোধারের জায়গায় ইংরেজদের সামরিক ঘাঁটি ছিল। সেখানে কৃষণ চন্দর প্রথমবার যেমন ইংরেজ শাসনের ক্ষমতার উলঙ্গ ব্যবহার দেখলেন, তেমনি পরাধীনতার লজ্জাও অনুভব করলেন। ১৯২৯ সালের ঘটনা, তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল বছর ঃ

'মরিতে আমি প্রথমবার সেই ক্ষমতার নিদর্শন দেখলাম যা সাতসমুদ্রের পার থেকে এসে আমাদের উপর বাজত্ব করছে। যেই দিকে তাকান ফিরিঙ্গিরা মাথা তুলে ফারাওব মত চলছে। ভাবতীয়রা মাথা নত করে থাকত। সামনের দিক থেকে কোন সাহেব এলে পথ ছেড়ে দিত। এই ঘটনা প্রথম আমি মরিতেই দেখি। .... লরিতে বসে থাকা ছাত্রদের আতঙ্কিত মুখ দেখে এটা পরিস্কার হয়ে যাচ্ছিল যে সবাই এই এলাকা থেকে তাড়াতাড়ি বেরিযে যেতে চাইছে। এই দেখে নিজেদের পরাধীনতার শিকল আরও নগ্ন পরিস্কার হয়ে ভাসত, (কৃষণ চন্দর, মিট্টি কে সনম, পৃষ্ঠা ১৮৯)

লাহোরে সাইমন কমিশন আসার কথা। কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কমিশন বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিল। লাহোবে মিছিল বের করার কথা ঠিক হল। মিছিল লাহোর রেলওয়ে ষ্টেশনের বাইরে কমিশনের সদস্যদের আসার অপেক্ষায় ছিল। প্রথম সারিতে ছিলেন লালা লাজপত রায়। শেষ সারিতে কৃষণ চন্দর দাঁড়িয়ে ছিলেন। 'সাইমন গো ব্যাক' ধ্বনি দিচ্ছিলেন। সেখানে প্রখ্যাত বক্তা সাংবাদিক শরিশ কাশ্মিরী ও কৃষণ চন্দরের বন্ধু পি.এল. কাওয়াসও উপস্থিত ছিলেন। সাইমন কমিশনের সদস্যরা গাড়ি থেকে নামলেন। 'সাইমন গো ব্যাক' ধ্বনি বেড়ে গেল। মিছিল কমিশনের সদস্যদের বাইরে যাবার পথ দিয়ে আপত্তি করল। পথ আটকাল, পুলিশ অফিসার স্যান্ডার্স লাঠিচার্জের হুকুম দিল। লালা লাজপত রায়ের উপর মুষলধারে লাঠিবৃষ্টি হতে লাগল। লাঠির একটি আঘাত কৃষণ চন্দরের ঘাড়ে পড়ল। কৃষণ কাঁদো কাঁদো মুখে পিছু হটলেন, পালিয়ে গেলেন। কৃষণ চন্দরের পুলিশের লাঠি খাবার এই প্রথম ও শেষ ঘটনা। কৃষণ চন্দরের কথায়, এব পরে 'ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মিছিলে কয়েকবার যোগ দিয়েছি, কিন্তু সব সময় খেয়াল করে পেছনের দিকে থেকেছি।

কৃষণ চন্দর তার কাঁধে হাত বোলাতে বোলাতে মোরি গেটের পার্কে পৌঁছে গেলেন। একটি বেঞ্চে বসে দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়া দেশপ্রেমিকদের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। বারবার পুলিশের লাঠি খেয়ে, নির্যাতিন সহ্য করেও হাসতে হাসতে ফাঁসিতে গলা দিয়েছে, কিন্তু ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন থেকে ফিরে আসেনি। কৃষণ চন্দর লিখেছেন ঃ

'ওরা কত বাহাদুর যারা বারবার পুলিশের লাঠি খেয়েও মিছিলে যোগ দেন, আঘাত সহ্য করেন, কারাগারে যান। জানা নেই কত নির্যাতিন সহ্য করতে হয় তাদের। ওদের কোন তুলনা হয় না যারা পরাধীনতার জোয়াল নিজের ঘাড় থেকে নামানোর জন্যে ইংরেজ সরকারের কারাগারে ফাঁসিতে প্রাণ দেন।' (কৃষণ চন্দর, আধা সফরকী পুরী কহানী, দিল্লী, রাজপাল অ্যান্ড সন্স, পৃষ্ঠা ১১৯)

এই ভাবনার উত্তাপ কৃষণ চন্দরের রক্তকে সতেজ করে দিল। উনি আবার মিছিলে যোগ দিতে গেলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তখন ঘোষণা হয়েছে, সন্ধ্যায় মোরি গেটে লালা লাজপত রায় জনসভায় ভাষণ দেবেন। কৃষণ চন্দর জনসভায় যোগ দিলেন। শের-এ-পাঞ্জাব লালা লাজপত রায় বলেছিলেন, আমাদের উপর ইংরেজ শাসনের এক একটি লাঠির আঘাত, ইংরেজ সরকারের কফিনে এক একটি পেরেক হবে। সাইমন কমিশন লাহোর পৌঁছেছিল ১৯২৮ সালের ৩০শে অক্টোবর। কৃষণ চন্দরের বয়স তখন পনেরো বছর।

উপরের ঘটনাগুলিকে এত বিস্তারিতভাবে লেখা হল একথা বোঝাবার জন্যে যে বাল্যকালেই কৃষণ চন্দর জোর জুলুম ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মনেপ্রাণে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধেও তাঁর মত তীব্র হল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি তাঁর বাবার আদর্শবাদ তাঁকে কমিউনিজমের দিকে ঠেলে দিল। প্রকৃতিগতভাবেই জমি উর্বর আর নরম ছিল। শুধু বীজ রোপনের অপেক্ষা। কৃষণ চন্দর যখন এফ.এস.সি পড়ছেন তখন তাঁর ও তাঁর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে প্রখ্যাত বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর আলাপ হল।

কৃষণ চন্দর লিখছেন, 'আমি এফ.এ পরীক্ষা দিয়ে ছুটিতে বাড়ি ফিরছিলাম। Dan Brin এর My fight for Irish Freedom এবং বীর সাভারকরের Indian First War of Independence পড়ে মন এক ধরনের কাঁচা উল্লাসে ভরে গিয়েছিল। ফরাসী বিপ্লব, সাম্য, স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র, ধর্ম এবং সামন্ততন্ত্র ইত্যাদি কি কি জিনিস সব মনের কড়াইতে ফুটত।'

আর এক জায়গায় কৃষণ চন্দর লিখেছেন ঃ

'সে সময় বোধ হয় আমার বিয়ের প্রথম বছর বা দ্বিতীয় বছর। সেই সময় আমি লাহোরের এক বিপ্লবী পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আদর্শগতভাবে হয়ে যাচ্ছিলাম মার্কসবাদী। দেশে জাতীয় আন্দোলন খোলাখুলিভাবে শক্ত অবস্থান নিয়েছিল। কুয়াশাভরা দিগন্তে স্বাধীনতার নিশান দেখা যাচ্ছিল। হাওয়ায় নেশা ধরে যাচ্ছিল। শীতকালেও বসন্তের সুবাস আসছিল। সে এমন উল্লাসের দিন ছিল যে প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে ফেরা খুব সামান্য ব্যাপার ছিল, এমনকি আমার মত ভীতুর জন্যেও।'

কৃষণ চন্দর কলেজ থেকে পালিয়ে ভগৎ সিং-এর দলে যোগ দিলেন। বাড়ি

ফিরতেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে লাহোরের কেল্লায় নজরবন্দী করে রাখল। তিনি প্রায় দুমাস সেখানে ছিলেন। কিন্তু সরকার যখন তার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী জোটাতে পারল না, তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। সে সময় তিনি আইন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একবার ডোমেদের ইউনিয়নের সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি নিয়মিত ওদের বস্তিতে যেতেন; তাদের সঙ্গে সভা করতেন, তাদের সমস্যা বোঝা ও সমাধানের চেষ্টা করতেন। কিন্তু এ ব্যাপারটি বেশি দিন চলল না। কৃষণ চন্দর রাজনৈতিক নেতা হবার জন্যে জন্মাননি। মহীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

'কৃষণ চন্দরের জীবনে এই সময় বিভিন্ন ধরনের ঝামেলায় ভরা ছিল; মনে বিভিন্ন ধরনের দোটানা কাজ করছিল — ওঁকে কি রাজনীতিক হতে হবে অথবা সাহিত্যিক। শেষে উনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে তিনি সারাজীবন সাহিত্যের জন্যেই কাজ করে যাবেন। এই সিদ্ধান্ত তাঁর পক্ষে ভালই ছিল, কেননা তাঁর প্রবণতা ছিল সাহিত্যের দিকে।' (মহীন্দ্রনাথ ঃ কৃষণ চন্দর শাখসিয়াৎ সংখ্যা 'নকুশ', লাহোর, পৃষ্ঠা ৩৮৬)

কৃষণ চন্দর তার বিদ্রোহে, কমিউনিস্ট আদর্শের পথে সাহিত্যকে বেছে নিলেন। এই কাজ তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে করলেন। কৃষণ চন্দরের রাজনৈতিক আদর্শ খুঁজতে গেলে আমাদের তাঁর নিম্নলিখিত বইগুলি গভীরভাবে অধ্যয়ন হবে।

গল্প ঃ অন্নদাতা, মহালক্ষ্মীকা পুল, দো ফার্লং লম্বী সড়ক, ব্যালকনি, মুবি, তিন গুণ্ডে, জগন্নাথ।

উপন্যাস ঃ আশমান রওশন হ্যায়, যব খেত জাখে, রিপোর্টাজি পৌদেঁ

দো ফার্লং লম্বী সড়ক

দো ফার্লং লম্বী সড়ক, লাহোরের সেই সড়ক যা গোলবাগ থেকে চক আনারকলি, নীলা গম্বুজ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পথ সবসময় ব্যস্ত। এই সড়ক দিয়ে কৃষণ চন্দর প্রতিদিন যাওয়া আসা করতেন। সড়কের দুইধারে বসে অন্ধ, খোঁড়া, অসুস্থ, ভিখারী কাতরস্বরে হাত পেতে, ছেলেমেয়েদের কান্নাকাটির কথা বলে ভিক্ষা চায়। এখানে কৃষণ চন্দর পরাধীন ভারতের ক্ষুধা, দারিদ্র্য, পশ্চাৎপদতা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার ছবি তুলে ধরেন। এক ফিরিঙ্গি এক টাঙ্গাওলাকে বেদম মারছিল, কেননা, টাঙ্গাওয়ালা ফিরিঙ্গির দেওয়া কম ভাড়ায় আপত্তি করেছে। ঘটনার আরও নির্মমতা এই যে লোকে রিক্সাওয়ালাকেই দুষছে এবং পথচারীদের কথায় রিক্সাওয়ালা কেঁদে কেঁদে সাহেব বাহাদুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে। এটি শাসকজাতির জুলুমবাজি শুধু নয়, একটি পরাধীন জাতির অক্ষমতার কাহিনীও। একটি বৃদ্ধা দুর্বহ ঘুঁটের ভারি ঝুড়ি মাথায় নিয়ে মুখের ভাঁজে সারা জীবনের দুঃখ একত্রিত করে হাঁফাতে হাঁফাতে এক এক পা করে সড়ক ধরে এগোচ্ছে -- এটি একটি ভারতীয় মহিলার শতাব্দীর ক্ষুধা, চিন্তা আর পরাধীনতার, দাসত্বের ছবি। সড়কের দুই ধারে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে হাতের ছোট ছোট পতাকা নাড়ছে অবুঝ ছোট ছোট স্কুলের বাচ্চারা। সূর্যের উত্তাপে তারা ক্লান্ত তবু কোন এক ধনীর জন্যে তাদের অপেক্ষা করতেই হবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষার পর সওয়ারি আসে। মোটর বাইকের ফট-ফট, ব্যান্ড বাজার শব্দ, আনমনা

পতাকা নড়ছে। শুকনো গলা থেকে বেরোনো শ্লোগান পরাধীন জাতির নওজোয়ানদের লজ্জাহীন কাহিনী শোনাচ্ছে। কৃষণ চন্দরের গল্প কখনও কখনও এই জোরজবরদস্তির বিরুদ্ধে চেঁচিয়ে উঠছে। ঃ

'কখনও কখনও তার (সড়কের) উপর চলতে চলতে আমি পাগলের মতো হয়ে যাই। ইচ্ছে হয় সেই সময় কাপড় ছিঁড়ে উলঙ্গ হয়ে যাই। সড়কে নৃত্য করি, আর চেঁচিয়ে বলি যে আমি মানুষ নই, আমি পাগল। আমি মানুষকে ঘৃণা করি। আমাকে পাগলা গারদে দাসত্ব দাও। আমি এই সড়কের আজাদী চাইছি না।'

কৃষণ চন্দর এই আদর্শের পর নিজের লেখার শরীরে জড়িয়ে নেন আন্তর্জাতিকতা, মানবিকতা। (কৃষণ চন্দর, দো ফার্লং লম্বী সডক, মজমুয়া নজারে, কুতুবসানা আদবী দুনিয়া, লাহোর, পৃষ্ঠা ১৪৮)

আশমান রওশন হ্যায়

কৃষণ চন্দরের আদর্শ মানুষের বন্ধুত্ব, আন্তর্জাতিক সহানুভূতি, বিশ্বশান্তি, মানবিকতা ও প্রেম। কৃষণ চন্দর যুদ্ধকে ঘৃণা করতেন। কেননা যুদ্ধ ধ্বংশ করে, মানুষের মুখ থেকে হাসি কেড়ে নেয়। কেননা, যুদ্ধ দাঁড়িয়ে থকে প্রেমের বিপরীতে। একজন সাম্যবাদী মানুষকে ভালবাসেন বলে মানুষকে আনন্দিত, সন্তুষ্ট দেখতে চান। কৃষণ চন্দর তাঁর উপরোক্ত উপন্যাসে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন ঃ

'আমি ইসহাক, বিশ্বাসঘাতক, একশোভাগ দেশদ্রোহী, তোমার আর তোমাদের এই সমস্ত লোকেদের সেবা করেছি যারা ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ চান। আর আমি তোমাকে এটা জানিয়ে দিতে চাই শেঠ, আমি তোমার ও তোমাদের মত লোকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আমি প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক বিচারধারা, প্রত্যেকের আস্থার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। (কৃষণ চন্দর, আসমান রওশন হ্যায়, দিল্লী, এশিয়া, পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪)

যুদ্ধের ধ্বংশ ও ভয়াবহতায় মানবতা কেঁপে ওঠে যেহেতু যুদ্ধ মানুষকে বিকলাঙ্গ করে যায়। যুদ্ধ জন্ম নেয় মানুষের ঘৃণা আর শত্রুতা থেকে। সেই সামাজিক ব্যবস্থাকে ঘৃণা করা উচিত যা মানুষকে বিকলাঙ্গ করে দেয়। দরিদ্র আর কাঙ্গাল করে দেয়, কাহিল করে দেয়। মানুষকে নয় সেই ব্যবস্থাকেই শেষ করা উচিত।

'তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ। আমি যুদ্ধকে কেন ঘৃণা করি। একটু ভেবে দেখ, এই যুদ্ধ আমার ঘরবাড়ি কেড়ে নিয়েছে। আমার হাত থেকে আমার প্রেয়সীর কোমলতা কেড়ে নিয়েছে। আমি এর বিরুদ্ধে যদি না লড়াই করি, তাহলে কি আমার কমলার বিরুদ্ধে লড়াই করব? তাকে আমি ভালবাসতাম। ইসহাক, মানুষকে ঘৃণা করা উচিত নয়। জীবনের এই ব্যবস্থাকে ঘৃণা করা উচিত, যা তাকে অসহায়, চরিত্রহীন এবং দরিদ্র করে দেয়। (কৃষণ চন্দর, আসমান রওশন হ্যায়, পৃষ্ঠা ৯৬-১০২)

প্রত্যেক মানুষেরই নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকার আছে - তার ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি নিয়ে। কারো অধিকার 'ইজম'-এর আড়ালে কারো উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিরোধীদের শেষ করে দেবে। ভালো হয় যদি মানুষের হাত থেকে প্রাণনাশা বন্দুক কেড়ে নেওয়া যায়, আর সুগন্ধি ছড়ানো একটি ফুল তার হাতে গুঁজে দেওয়া যায়, যাতে সে কারো উপর আক্রমণ করার বেওকুফ কাজ না করতে পারে।

'প্রশ্ন এই যে কিভাবে মানুষের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নেওয়া যায় এবং বদলে হাতে একটা ফুল দেওয়া যায়। তুমি জানো, যখন কোন মানুষ ফুল নিয়ে নিজের কোন শত্রুর সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে কথা বলে, তখন তাকে খুব নির্বোধ মনে হয় না কি?'

সাম্যবাদী সাহিত্যের ধারাটির দিকে যদি আমরা নজর দিই, তাহলে দেখব যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির স্বপক্ষে এর চেয়ে যুক্তিসম্মত, ভালো রচনা পাওয়া যাবে না। কৃষণ চন্দর মনে করতেন ধনতন্ত্র মানুষের আত্মাকে ভোঁতা করে দেয়, তাই সেই ব্যবস্থার নেতা আমেরিকাকে কৃষণ চন্দর ক্রমাগত আক্রমন করে গেছেন। একটি ড্রয়িং রুমে মার্কিন ছবি দেখে কৃষণ চন্দর নিজের মতামত জানাচ্ছেন এভাবে ঃ

'আমার প্রিয় আমেরিকা, তুমি কতদূর থেকে এসেছো। আমি তোমার শিকাগো, হার্লেমের গলিতে নিজেকে উৎসর্গ করি যেখানে গণিকার ফর্সা, নরম দেহ বিক্রি হয়। ফটো গ্যারিবিয়ার রঙিন ছাপাখানায় এই দেহগুলো কাগজে আঁকা হয়, ছাপা হয়, আর তড়িৎ গতির হাওয়াই জাহাজ তড়িৎ গতিতে এই পত্রিকাগুলিকে পৃথিবীর কোনায় কোনায় ছড়িয়ে দেয়। আমার প্রিয় আমেরিকা, গমের সোনালী শিষের দেশ, আব্রাহাম লিঙ্কনেব আদর্শের দেশ, ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতার দেশ, আমেরিকা, আমি তোমাকে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করি, যেহেতু তুমি আমাদের বন্দুক দাও, বিমান বন্দর দাও, কারিগরি সাহায্য দাও, আর এই সব দেওয়ার পরও যৌন সাহায্য দাও। এর পর যারা তোমার উপর কৃতজ্ঞ নয়, তারা কত অকৃতজ্ঞ। [কৃষণ চন্দর, আশমান রত্তশন হ্যায়, পৃষ্ঠা ঃ ২৯]

কৃষণ চন্দর আমেরিকাব জীবনের সবকিছুকেই আক্রমণ করেছেন এবং পুরোপুরি সাম্যবাদী অবস্থান থেকে। 'মহালক্ষ্মীকা পুল' কৃষণ চন্দরের একটি বিখ্যাত গল্প যাতে তিনি তাঁর সাম্যবাদী অবস্থান নির্ভীক, দ্বিধাহীনভাবে স্পষ্ট করেছেন। শৈল্পিক প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে ভাষা হয়েছে সতেজ। মনে হয় উনি যেন কোন উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে জনগণকে সম্বোধন করে নিজের প্রশ্নের জবাব চাইছেন। মহালক্ষ্মীর পুলের উপর বাঁদিকের লোহার রেলিং-এর উপর ছটি শাড়ি হাওয়ায় উড়ছে। সেখানকার বাসিন্দারা প্রত্যেকদিন শাড়িগুলিকে শুকোবার জন্যে রোদে মেলে দেয়। মহালক্ষ্মী পুলের লাগোয়া বাঁ দিকে হতদরিদ্র বস্তি। পুরুষেরা কারখানায় মজুরি করে, মেয়েরা ঘরে ঘরে ঝিয়ের কাজ করে। ওরা দুবেলা পেট ভরে রুটিও পায় না। একমাসের উপার্জনে দু বেলা পেট ভরে খাবার মৌলিক প্রয়োজনও মেটাতে পারে না। বেকারীর ছায়া সব সময় তাদের মাথার উপর ঘুরতে থাকে। প্রত্যেক ঘরে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মন কষাকষি এবং ঝগড়া হতেই থাকে। মাইনে পেলেই পুরুষরা জীবনের তিক্ততা দুর করার জন্য তাড়ির দোকানে যায়, যেন এক মাসের মধ্যে অন্তত একদিন নিজের দুঃখকে সাময়িকভাবে ভোলা যায়। ঐ ছটি পুরনো ময়লা বিবর্ণ শাড়ি ঐ ঘর থেকেই এসেছে। আসলে এরা বেঁচে থেকেও যেন কবরের মধ্যে আছে। এই রকম শাড়ি মহালক্ষ্মী পুলের ডানদিকেও দেখা যাবে। কিন্তু সেসব রঙবেরঙের রেশমী শাড়ি, আর এগুলি সেই ঘর থেকে এসেছে যাদের বাসিন্দারা উঁচু উঁচু চিমনি, বড়ো বড়ো কারখানার মালিক বা মোটা অঙ্কের মাইনে পান। তাদের জীবনে প্রতিটি দিনই 'ঈদ'

এবং প্রত্যেকটি রাতই 'সবে বরাত'। কৃষণ চন্দর দুই শ্রেণীর এই তফাৎকে খুলে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন ঃ

'আপনি মহালক্ষ্মী পুলের ডানদিকে বাঁদিকে দুদিকে অবশ্যই চোখ মেলে তাকিয়ে দেখবেন আর তার পরে নিজের মনকে প্রশ্ন করবেন আপনি কোন দিকে যেতে চান। দেখুন, আমি আপনাকে সাম্যবাদী হতে বলছি না। আমি আপনাকে শ্রেণী সংগ্রামের জন্য প্রেরণা দিচ্ছি না। আমি শুধু এ কথাটাই জানতে চাইছি যে আপনি মহালক্ষ্মী পুলের ডানদিকে আছেন না বাঁদিকে? [কৃষণ চন্দর ঔর উনকে আফসানে, অথর পারভেজ এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৮৬ আলিগড় পৃ ঃ ১৬১] কৃষণ চন্দর বলতে চাইছেন যে আমি আপনাকে ছবির দুটি পিঠ দেখিয়ে দিলাম। একদিক অন্ধকারময় ও ঘৃণাভরা, আর অন্যদিক খুব উজ্জ্বল ও আনন্দদায়ক — এই তফাৎকে সামনে রেখে বলুন আপনি কোন দিকে যাবেন? আপনার ন্যায়, আপনার বিবেক কি বলছে?

কৃষণ চন্দর 'তিন গুন্ডে' গল্পে নিজের দেশপ্রেম এবং বিদ্রোহী চিন্তার ব্যাখ্যা করেছেন নির্ভীকভাবে। তিন গুন্ডা আসলে গুন্ডা নয়; এরা সেই লোক যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য হাসতে হাসতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিল। একটি ছাপাখানায় কাজ করা সাধারণ কারিগর 'হিন্দুস্থানী জাহাজী হরতাল জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিতে দিতে বিদেশী শাসকের বন্দুকের গুলিতে প্রাণ দিল। কৃষণ চন্দর চান এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরী হোক ঃ

'মানুষ হাজার হাজার সাল আগেও এরকম ব্যারিকেড তৈরী করেছিল অত্যাচার অশিক্ষা আর পাপকে কাবু করার জন্যে। ব্যারিকেড আমার চোখের সামনে নাচছে, বুদ্ধ, মহম্মদ, যীশু — তারপর আলোর একটি মশালে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। প্রথম চার্লসের মাথা দেখা যাচ্ছে, ফাঁসির ফাঁদ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় প্যারিসে গিলোটিন ... কমিউন ...অক্টোবর রেভলিউশন ... আজকেও ব্যারিকেড হচ্ছে — মরক্কোতে — আলজিরিয়া — মিশরে — ভারতে — ইন্দোচীনে — ইন্দোনেশিয়াতে এটি একটি ঝড়। এই ঝড়কে কে আটকাবে? এটি বিপ্লব। এই বিপ্লবকে কে উসকে দেবে? এটি জামা — মানুষের জামা হাওয়ায় — উড়ন্ত জামা — একে বন্দুকের গুলি দিয়ে ছিঁড়ে দাও — টুকরো টুকরো করে দাও, একে যতই বোমা আর ট্যাঙ্ক দিয়ে উড়িয়ে দাও, তবু এটা গোটাই থাকবে। এই জামা কোনদিন শেষ হবে না। এটি মানুষের আত্মা। [কৃষণ চন্দর, 'তিন গুন্ডে', দিল্লি, ইন্ডিয়ান বুক কোম্পানী লিমিটেড, পৃষ্ঠা ঃ ১৪২-১৪৩]

উপর্যুক্ত উদাহরণ কৃষণ চন্দরের নিজের রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার বিভিন্ন দিক থেকে এটা পরিষ্কার যে তিনি সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা চাইছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই আদর্শ সমাজের কল্পনা কি ছিলো, যার স্বপ্ন তিনি দেখেছেন জীবনভর?

'যতদিন অবধি মুনাফার রেওয়াজ আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদনের মাধ্যম হবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যতক্ষণ পর্যন্ত সাহিত্য ধনতন্ত্রের প্রশংসা করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সংবাদপত্রের উপর থাকবে পয়সাওয়ালাদের দখল, যতক্ষণ পর্যন্ত যন্ত্র এবং মানুষের হাতের উৎপাদন গণতান্ত্রিক সাম্যবাদের আদর্শে বণ্টন করা যাচ্ছে না, ততদিন এই

দুনিয়াতে শান্তি আসবে না, সত্যিকারের স্বাধীনতা আসবে না, স্বাধীন এবং অমর সাহিত্য রচনা করা যাবে না। সেই জন্য, যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে বাঁচবার জন্য, পরমানু যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে বাঁচবার জন্য একটাই পথ আছে —জীবন্ত এবং অগ্রসরমান সাম্যবাদ। এছাড়া মানুষের ভবিষ্যৎ বিপন্ন। [কৃষণ চন্দর বিশেষ সংখ্যা, বম্বে, শায়ের পৃষ্ঠা ঃ ৭৬]

• কৃষণ চন্দরের সাম্যবাদের ভিত্তিপ্রস্তর অর্থনৈতিক সাম্য। কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্যের ব্যাখ্যা বিভিন্ন হতে পারে। এই সম্পর্কে কৃষণ চন্দরকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ঃ

'সাম্যের অর্থ আমার কাছে বিবর্ণ সাম্য নয়, একমাত্রিকও নয়, বরং তা বহু মাত্রিক, যাতে প্রত্যেক মানুষকে তার ঝোঁক অনুযায়ী নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ করার সুযোগ দেওয়া যায়। এইভাবে সে নিজের দলের মধ্যেও এমন একজন ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে যাকে নিয়ে গর্ব করা চলে। যেহেতু আজকের এই সমাজ ব্যবস্থা সে রকম নয়, সেই জন্যে আমি এর সমালোচনা করি, [আহমদ হাসান, কৃষণ চন্দরকে সমাজী ঔর আদবি নজরিয়াৎ (সাক্ষাৎকার) কৃষণ চন্দর সংখ্যা, বম্বে, শায়ের, পৃষ্ঠ ৪২৪]

কিন্তু সাম্যবাদকে শেষ কথা বলতেও রাজী ছিলেন না কৃষণ চন্দর ঃ

'পৃথিবীর সব দর্শন মানুষের ভালোর আর কল্যানের জন্যে আছে, যখন এই দর্শন পুরোন হয়ে যায়, যখন দর্শনের খোসাটুকু পড়ে থাকে, তখন মানুষ সেই দর্শনকে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়। জানিনা এখন পর্যন্ত কত দর্শনের এরকম গতি হয়েছে — সম্ভবত মার্কসইজমকেও একদিন এই অবস্থায় পৌঁছতে হবে, [কৃষণ চন্দর, এক গাধা নিফামে, বাহাওয়াবা কৃষণ চন্দরকে নভেলোমেঁ তরক্কী পসন্দ — হায়াৎ ইফতাকার, লক্ষ্ণৌ, নসীম বুক ডিপো, পৃষ্ঠা ঃ ৪২]

এর থেকে পরিষ্কার যে ওঁর রাজনৈতিক পথে কোন গোঁড়ামি ছিল না, এবং উনি সংস্কার এবং পরিবর্তনের পক্ষে ছিলেন। সবচেয়ে বড়ো কথা তার কাছে মানুষের জীবনের চেয়ে বড়ো কোন 'ইজম' ছিল না, কেননা প্রত্যেক 'ইজম'কে মানুষের জীবনের স্বার্থের কষ্টিপাথরে পরখ করা যেতে পারে। যদি তা মানবিকতার পক্ষে উপকারী হয়, তবে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। এই কথা তিনি তাঁর স্ত্রী সলমা সিদ্দিকির সঙ্গে কথোপকথনের সময় এইভাবে বলেছিলেন ঃ

'জীবনেব চেয়ে বড়ো কোন 'ইজম' নেই, যে 'ইজমে' জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, জীবনের জন্য প্রেম, মানুষের উন্নতি ও নিরাপত্তার সুযোগ থাকে। সেই 'ইজম'ই বড়ো সেই 'ইজম'ই বেঁচে থাকবে। ['তসবিরএঁ কুছ নই, কুছ' পুরানী, দিল্লি, বিশবী সদী, সীতেম্বর ১৯৪৭, পৃ ঃ ২৯]

শেষে যদি দুটি বাক্যে কৃষণ চন্দরের রাজনৈতিক পর্বের আলোচনা বা ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে আমরা বলব উনি পাকা রঙে রাঙানো সাম্যবাদী ছিলেন, যদিও সাম্যবাদী দর্শন ওঁর কাছ শেষ কথা ছিল না। নিজের রাজনৈতিক আদর্শের প্রচার ও বিস্তার তিনি নিজের রচনা ও শিল্পে করেছিলেন, আর এক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব আদর্শ ও শিল্পের ভারসাম্য বজায় রেখেছিলেন; এই হিসাবেও উর্দু সাহিত্যে তিনি এক অদ্বিতীয় শিল্পী ছিলেন।

[ঈষৎ সংক্ষেপিত]

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
পেশোয়ার বা সিন্ধ এক্সপ্রেস

কৃষণ চন্দরের 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস' গল্পটির সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় অনেক দিনের। দেশভাগের মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই বাঙলায় কৃষণ চন্দরের একটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয় ঃ 'ফুলকি ও ফুল'—তার প্রথম গল্পই ছিল 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস'। ১৯৫২ সালে সংকলনটি প্রকাশ করেন র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব; গল্পগুলি অনুবাদ করেছিলেন পার্থ রায়। দেশভাগের সাহিত্য নিয়ে কোন আলোচনা করতে গেলে 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস' গল্পটিকে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না।

বীভৎস-নির্দয এই গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র. বলা যেতে পারে. পেশোয়ার এক্সপ্রেস নামে একটি ট্রেন। পেশোয়ার থেকে ট্রেনটি যাত্রা শুরু করেছিল হিন্দু আর শিখ শরণার্থীদের নিযে। তক্ষশীলা স্টেশনে ট্রেনটিকে থামতে হলো, কাবণ শোনা গেল—আরও কিছু উদ্বাস্তু পরিবার আসছেন। ট্রেনটি অপেক্ষা কবল এবং অবশেযে তাঁরা এলেনও। তবে জ্যান্ত মানুষ নয়—মৃতদেহ। সেই দেহগুলোকে ট্রেনে চাপিযে দিয়ে বলা হলো, এগুলো যেন হিন্দুস্থানে পৌঁছে যায়। শববাহী ট্রেনটি আবার চলতে শুরু করল। কিন্তু এবার চেন টেনে তাকে থামানো হলো এবং ২০০ জন হিন্দু আর শিখকে নামিয়ে হত্যা করা হলো সেই তক্ষশীলা স্টেশনের ওপর। সেই তক্ষশীলা, প্রাচীনকালে যেখানে গড়ে উঠেছিল বিদ্যাচর্চাব এক বিশাল কেন্দ্র।

এইভাবে ট্রেনটি এক সময় লাহোরে পৌঁছল। অমৃতসর থেকে মুসলমান শরণার্থীদের নিয়ে আর একটি ট্রেন তখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। দুই ট্রেন মুখোমুখি হলো, কথাবার্তাও কিছু হলো। জানা গেল, পথে ৪০০ জন মুসলমানকে নামিয়ে হত্যা করা হয়েছে ; ধর্ষিতা হয়েছেন ৫০ জন নারী।

অমৃতসরের বার্তা পেশোয়ারে পৌঁছে গেল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, অমৃতসরের বদলা পেশোয়ার নেবে একেবারে হিসাবে মিলিয়ে। গুণে গুণে ৪০০ জন হিন্দু শিখকে হত্যা করা হবে আর ধর্ষণ করা হবে তাদের ৫০ জন নারীকে।

এ-গল্পের কোন ঘটনাই কাল্পনিক নয়। উদ্বাস্তুরা ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছেন স্টেশনে আর সেই সময় তাদের খুন করা হয়েছে। এমন ঘটনা সেদিন সত্যিই ঘটেছিল সেখুপুরায়, শিয়ালকোটে। কৃষণ চন্দরের গল্পটির নাম সিন্ধ এক্সপ্রেসও হতে পারত। হিন্দু-শিখ শরণার্থী বোঝাই সিন্ধ এক্সপ্রেসকে হরপ্পা স্টেশনে থামিয়ে, নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে। একটি কামরায় ৩০০ জন যাত্রীর মধ্যে প্রাণে বেঁচেছিলেন মাত্র ১২ জন। পাকপত্তন স্টেশন ছাড়ানোর পর ট্রেনটিকে আবার থামানো হয় এবং ৪০০ জন হিন্দু-শিখকে নামিয়ে হত্যা করা হয়; লুঠ হয়ে যান বেশ করেকজন যুবতী। এই সত্য ঘটনার কথা লিখে রেখেছেন জি.ডি. খোসলা,তাঁর 'স্টার্ন রেকনিং' গ্রন্থে। (পৃঃ ১৬৫)

পেশোয়ার এক্সপ্রেস গল্পটি, মনে হয়, ওই ঘটনা অবলম্বনেই লেখা। হরপ্পা স্টেশনকে নাম বদলে করা হয়েছে ঃ তক্ষশীলা। বাদবাকী কাহিনী প্রায় সবটাই সত্য ঘটনা। 'অমৃতসর' গল্পটিও প্রায় একই রকম। লাহোর থেকে হিন্দু-শিখরা এসে পৌঁছলেন অমৃতসরে; আর তাঁদের নির্যাতনের কাহিনী আগুন জ্বালিয়ে দিল সেখানে—নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো মুসলমানদের। সে-কাহিনীও লেখা আছে জি.ডি খোসলার গ্রন্থে। (পৃঃ ১২৫, ২৭৮-৭৯)

খোসলার গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। কৃষণ চন্দরের 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস' গল্পটিও ওই সময় নাগাদ লেখা। সেই অমানুষিক বর্বরতার কাহিনীগুলিকে গেঁথে গেঁথে কৃষণ চন্দর যেন সেই সময় একটা ডকুমেন্টেশনের কাজ করে যাচ্ছিলেন। একথা সাদাত হাসান মান্টো সম্পর্কেও বলা চলে। কিন্তু আজ পঞ্চাশ বছর পরে গল্পগুলি ফিরে পড়লে দেখা যায়, শুধু সময়ের সাক্ষ্য নয়, শিল্পের স্বাক্ষরও ওই রচনাগুলিতে কিছু কম ছিল না।

সমস্ত দেশ হয়ে গেছে বধ্যভূমি। পাঞ্জাব যেন এক শবাগার, আর তারই প্রতীক যেন পেশোয়ার এক্সপ্রেস নামের ওই শববাহী ট্রেনটি। তাকে বহন করতে হচ্ছে সময়ের যন্ত্রণা, সময়ের শব। প্রমত্ত হিংসায় জনমন যখন হতচকিত, বিবেক বিড়ম্বিত, ট্রেনের কথাগুলোই তখন হয়ে ওঠে প্রতিবাদের স্বর। ট্রেনটি আমাদের জানায়, 'শুকনো কাঠ দিয়ে তৈরী আমার দেহ; কিন্তু তবুও আমি চাই না যে, প্রতিহিংসা আর ঘৃণায় ভর্তি করে আবার আমাকে তোমরা পাঠাও ঐ বীভৎস নারকীয় যাত্রাপথে।'

চাই না হিংসা, বন্ধ হোক বর্বরতা—এই কথাটা সোচ্চারে বলার মতো লোক তখন বেশি ছিল না। কৃষণ চন্দর তাই কথাটা শুনিয়েছেন একটা যন্ত্রের মুখ দিয়ে। এক ভয়ানক, যন্ত্রণাজর্জর সময়ে লেখা এই গল্পের গঠনশৈলী আমাদের বিস্মিত করে দেয়।

সূত্র ঃ

১। কৃষণ চন্দর 'ফুলকি ও ফুল', র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, ১৯৫২

উর্দু থেকে অনুবাদ ঃ জাফর আলম

কৃষণ চন্দরের শেষ সাক্ষাৎকার

শেষের দিকে কৃষণ চন্দরের একটি সাক্ষাৎকার নেন মুম্বাই-এর উর্দু পত্রিকা 'সাব-রং'। কৃষণ চন্দরের মৃত্যু হয় ১৯৭৭ সালের ৭ই মার্চ। পত্রিকার তরফে জানানো হয়েছে এটিই কৃষণ চন্দরের দেওয়া শেষ সাক্ষাৎকার। ঈষৎ সংক্ষেপিত আকারে সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হলো।]

এশিয়ার খ্যাতনামা লেখক কৃষণ চন্দরের এক সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য আমি তাঁর কাছে ফোনে নিবেদন করলাম। তিনি তক্ষুনি রাজী হয়ে গেলেন এবং সময় ও তারিখ নির্দিষ্ট করে দিলেন। আমি যথাসময়ে কৃষণ চন্দরের বাড়িতে গিয়ে হাজির হই। সন্ধ্যা সমাগত। কলিং বেল টিপতেই সহাস্য মুখে দরজা খুলে তিনি বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। ঠোঁটে তার অমায়িক হাসি। তাঁর আন্তরিকতা দেখে আমি মুগ্ধ হই।

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রথম গল্পের নাম কি এবং তা কিভাবে সৃষ্টি হয়?

উত্তর ঃ আমার প্রথম গল্পের নাম "ঝিলামের বুকে নৌকা বিহার।" গল্পের উৎস ঝিলাম নদীতে নৌকা বিহারের পটভূমি। তখন ঝিলাম নদী পারাপারের জন্য গায়ালিয়া থেকে নৌকা ছাড়তো। নৌকায় চড়ে ঝিলাম নদী পাড়ি দেয়ার সময় এই গল্পের প্লট আমার মনে দেখা দেয়।

প্রশ্ন ঃ সমালোচকদের মতে, আপনি শুধু কমার্শিয়াল গল্প লিখে থাকেন।

উত্তর ঃ আমি অথবা উর্দু-সাহিত্যের অন্য কোন লেখকই কমার্শিয়াল হতে পারে না। কারণ আমাদেব দেশে একজন লেখক তাঁর গল্পের সম্মানী পান অতি সামান্য। একজন প্রথম সারির লেখক গল্পের জন্য সম্মানী বা দক্ষিণা দুশো টাকার বেশি পান না। যদি মাসে আপনি একটি গল্প লেখেন তা হলে এই টাকায় কয়জন লোকের অন্ন সংস্থান করবেন? এতো গেল খ্যাতনামা লেখকের কথা। অন্যান্য লেখকরা ২৫ টাকা থেকে ৫০ টাকার বেশি সম্মানী পায় না। এই টাকায় সামান্য একটি পাখির অন্নও জোগানো সম্ভব নয়। অথচ উন্নত দেশে লেখকদের কদর আছে। সেখানে একজন সাধারণ গল্পকারও তার রচনার জন্য কমপক্ষে এক হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা সম্মানী পেয়ে থাকেন। আমি লেখকদের শ্রম ও কষ্টের জন্য লেখার সম্মানী বৃদ্ধির পক্ষপাতী।

প্রশ্ন ঃ গল্প রচনার ব্যাপারে আপনি কি কোনো শিহরণ অনুভব করেন? এই ব্যাপারে আপনার অবচেতন মনে কি ধরণের চেতনার উদ্রেক হয়?

উত্তর ঃ যে-কোন সৃষ্টিশীল রচনা এক বিচিত্র অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ফসল। ধরুন, একটি বিষয়বস্তু আজ আপনার মনে উদয় হলো এবং তা দিনে দিনে মনের গহনে দানা বেঁধে চললো। হয়তো দীর্ঘ দশ বছর পর আপনার গল্প বা

উপন্যাস পূর্ণ রূপ নিয়ে সৃষ্টি হলো। অনেক সময় গল্প বা উপন্যাসের প্লট কল্পনারাজ্যকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে যে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গল্পের সৃষ্টি হয় অথবা এক মাসেই উপন্যাসের রচনা শেষ হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমার প্রথম উপন্যাস 'সিকান্ত' এর রচনা মাত্র ২৭ দিনে শেষ হয়েছিল। অন্যদিকে 'একটি গাধার আত্মকাহিনী' শীর্ষক জনপ্রিয় উপন্যাস মাত্র ৭ দিনে রচিত হয়েছে। আবার "পাঁচ-লোফার" উপন্যাসটি লিখতে আমার দীর্ঘ সাত বছর সময় লাগে। সব গল্প ও উপন্যাস রচনার আগে ও পরে এক বিচিত্র অনুভূতি ও মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করি এবং রচনার কাজ শেষ হলে অদ্ভুত এক আনন্দ আমার হৃদয়-মনে দোলা দেয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মনে করেন লেখকদের জন্য মদ্যপান একান্ত আবশ্যক?

উত্তর ঃ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য কোনো মাদকদ্রব্যে অভ্যাস বা মদ্য-পানের মোটেই প্রয়োজন নেই। উদাহরণ স্বরূপ, আমি কোন কিছু লেখার আগে মদ তো দূরের কথা এমন কি কিছু আহার পর্যন্তও করি না। খালি পেটেই আমার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি লিখে শেষ করেছি। অবশ্য এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। অনেকে নাকি মদ পান না করে লিখতে পারেন না। রতন নাথ সরাসরি মদ পান করেই লিখতে বসেন এবং "ফসানায়ে আজাদ" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ তিনি এভাবেই শেষ করেছেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি কিসে প্রভাবান্বিত হয়ে গল্প লেখার দিকে আকৃষ্ট হন?

উত্তর ঃ প্রধানতঃ মুন্সী প্রেমচান্দ ও সুদর্শনের গল্প পড়েই উর্দু গল্প লেখার প্রতি আকৃষ্ট হই। যদিও আমি প্রথমত, আলেফ লায়লার কাহিনী ও পরবর্তীকালে রবি ঠাকুরের গল্প পড়ে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ি। অবশ্য পর্যায়ক্রমে রুশ লেখক টলষ্টয়, তুর্গেনিভ, চেখভ, গোর্কী এবং অনেক ক্ষেত্রে মোপাসাঁ, ও হেনরীর গল্প ও উপন্যাস আমাকে প্রভাবান্বিত করেছে।

প্রশ্ন ঃ আপনার দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের মাপকাঠি কি?

উত্তব ঃ যিনি বিষয়বস্তুর সূক্ষ্ম দিকগুলোর প্রতি বিশেষ সজাগ দৃষ্টি রেখে গল্পের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিবেশের প্রতি যিনি যতই উপযুক্ত রূপে সজাগ এবং সুন্দরভাবে তার প্রতিচ্ছবি আকর্ষণীয় ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তিনিই সবচেয়ে ভালো লেখক বা সাহিত্যিক। শুধু বর্তমান যুগেই নয় সব যুগেই এই ধরনের লেখকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং তার আবেদন হয় চিরস্থায়ী। তাতে প্রেম, পুণ্য কর্ম, প্রভুত্ব, মানবতা ও জীবনের শিক্ষা অবশ্য থাকবে, তবে তা ছায়াছবির আকারে নয় বরং গল্পের বা উপন্যাসের আঙ্গিক চরিত্র ও ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে। নায়ক-নায়িকাব কার্যাবলীতে এই শিক্ষার বাণী পরোক্ষভাবে প্রচারিত হবে।

প্রশ্ন : অনেক উর্দু লেখক যৌন বিষয়ক রচনায় নিজেদের শক্তিক্ষয় করে থাকেন, আবার তারা আধুনিক কালের প্রথম শ্রেণীর লেখক বলে দাবী করেন। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

উত্তর : 'সেক্স' মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি নিজেও আমার রচনায় অনেক ক্ষেত্রে যৌন-জীবনকে বিষয়-বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছি। সেক্স ছাড়া মানুষের জীবন থেকে অন্য অনেক কিছু বেছে নেয়ার বিষয়বস্তু রয়েছে। তাছাড়া এমন অনেক সমস্যা আছে যা আমার বা আপনার দৈনন্দিন জীবনে দিন দিন দুঃখ ও বেদনার বোঝা ভাবাক্রান্ত করছে। অবশ্য বর্তমান দুর্নীতি ও ভেজালের জমানায কতিপয শক্তিধর ও প্রভাবশালী শ্রেণীর কার্যাবলীর ফলশ্রুতি সামাজিক অনাচার ও অবিচার। যার ফলে সেক্সকে সাহিত্য থেকে অনেক ক্ষেত্রে বাদ দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। লেখক প্রথম শ্রেণীর হোন বা তৃতীয় শ্রেণীর হোন নিজের প্রতিভাকে শুধুমাত্র সেক্সের জন্য অপচয় করা অপব্যয় ছাড়া কিছু নয়।

প্রশ্ন : আপনার চলচ্চিত্র জগতে আগমন কিভাবে ঘটে?

উত্তর ১৯৪৪ সালে পুনার সালিমার পিকচার্স এর মালিক ডাবলু জেড আহমদ আমাকে জোস ও সাগর সাহেবের সঙ্গে তার 'চিত্রনাট্য ও কাহিনী রচনা' বিভাগে একটি চাকরি দেন। তখন থেকে চিত্রজগতে সংলাপ রচয়িতা হিসেবে আমার নতুন জীবন শুরু হয়। আমার কাহিনী-ভিত্তিক নির্মিত 'মন কি জীত' ছবি সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করে।

প্রশ্ন : আপনি কি কোন ছবি তৈরি করেছেন?

উত্তর : জী হাঁ। 'সরায়ে কি বাহের' ও 'রাক' নামে দুটি ছবি নির্মাণ করেছিলাম। কিন্তু দুটো ছবিই আমার সব আশা-ভরসাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। তাই এখন শুধু ছবির কাহিনী ও সংলাপ রচনা করে থাকি। এ পর্যন্ত ত্রিশটি ছবির কাহিনী ও সংলাপ রচনা করেছি।

প্রকৃতি সমাজ প্রগতি : কৃষণ চন্দর

দ্বিতীয় পর্ব

হিন্দী থেকে অনুবাদ ঃ কাঞ্চন কুমার
স্বপন দাসাধিকারী

কৃষণ চন্দর

ভোর ভয়ি

'সুবহ্ হোতী হৈ' ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে কেরলের ত্রিচুরে অনুষ্ঠিত প্রগতিশীল লেখক সম্মেলন নিয়ে রচিত। পৌদেঁর (চারাগাছ) মত এখানেও লেখক চরিত্র হিশেবে আছেন। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে।

কেরলের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে, সবুজ মাঠ দিয়ে যাত্রা করার সময় আমার মনে হলো আমি মানুষের আত্মার স্পর্শ পাচ্ছি। অত্যন্ত বিশিষ্ট সেই আত্মা, মহান, প্রাচীন হয়েও একেবারে নবীন এবং বিশাল এবং ক্ষণে ক্ষণে তা নতুন হয়ে উঠছে। এই উপত্যকার প্রতিটি কোণে আমি মানুষের শ্রমের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি ; পরিচিত হয়েছি সেই মানুষদের সঙ্গে যে মানুষ এগিয়ে নিয়ে যায় সাম্যবাদী লক্ষ্যের দিকে, আর যেখানে সেই সাহসী শহীদদের পা পড়েছে, সেখানেই তাদের বিন্দু বিন্দু রক্তে সেজে উঠেছে বিপ্লবের বাগান। সারা কেরলের ভূমি শহীদদের কাছে মায়ের মতো। এই মায়ের কোলে কিছুদিন থেকে মানুষের শক্তির আর প্রেমের প্রতি আমার বিশ্বাস বেড়ে গেছে। আমি অনুভব করেছি, অ্যাটম বোম, হাইড্রোজেন বোম আবিস্কার হওয়া সত্ত্বেও মানুষ মরবে না, সে উন্নতির দিকে প্রতিদিন এগিয়ে যাবে।

কৃষণ চন্দর

আমি আমার হাসিকে খোসামোদে আরও তরল করে, আরও পেছল করে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে সুন্দরী সিন্ধী মেয়েটিকে বললাম, 'আমার ম্যাড্রাস এক্সপ্রেসে ত্রিচুর যাবার একটা সিট চাই।'

সিন্ধী মেয়েটি পাশে দাঁড়ানো গুজবাতী ক্লার্কের দিকে তাকাল। গুজরাতী চোখে চোখে কি যেন বলে দিল। সিন্ধী মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে কড়া স্বরে বলল, 'নেই'।

— 'আচ্ছা', আমি বললাম, ' আজ না হোক কালকের গাড়িতে।'

—'নেই', সে ঠিক একইভাবে যন্ত্রের মতো উত্তর দিল।

—'পরশু', আবার জিজ্ঞাসা করলাম।

সিন্ধী মেয়েটি একটি গুজরাতী ব্লাউজ পরে ছিল। ব্লাউজের হাতায় লাল ঘেরের মধ্যে ছোট ছোট আয়না গাঁথা। তার দিকে তাকাতেই আমার ছবি ব্লাউজের ছোট ছোট আয়নার ভেঙ্গে পড়ল। সিন্ধী মেয়েটি তাড়াতাড়ি করে শাড়ী ঠিক করে নিল, যাতে তার যৌন আকর্ষণ বজায় থাকে। তারপর ক্লার্কের দিকে চট করে দেখে নিয়ে আমার দিকে ঘুরে বিব্রত হয়ে বলল, 'পরশুও নেই'।

আমি আমার জীবনের সেরা একটি হাসি হেসে বললাম —'দেখুন, আমি রিফ্যুজি'।

সিন্ধী মেয়েটির চোখে আত্মীয়তার হালকা ঝলক দেখা দিল ; আর গুজরাতী ছেলেটি তার ভ্রু কোঁচকাল। মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞাসা করল—'সিন্ধু থেকে এসেছেন'?

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, 'না'।

—'তাহলে বাংলা থেকে এসেছ?'

—'না'

—'পাঞ্জাব থেকে'?

—'না'

—'তাহলে কোথা থেকে তোমাকে বের করে দিয়েছে?' সিন্ধী মেয়েটি বিব্রতস্বরে জিজ্ঞেস করল।

—'বোম্বাইয়ের নিজের ঘর থেকে আমাকে বের করে দিয়েছে'। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'বাড়ির মালিককে গত চারমাস আমি ভাড়া দিতে পারিনি'।

—'সিন্ধী মেয়েটি বলল, 'দেখুন মশায়, এখানে ইয়ারকি করবেন না, ২০ তারিখের আগে কোন জায়গা খালি নেই। হ্যাঁ, যদি সাধারণ সিট চান তো, ঐ সামনের কাউন্টারে যান। ওখানে কিছু পেয়ে যেতে পারেন।' সে ব্যাগ খুলে লিপস্টিক বের করতে লাগল। আমি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কাউন্টারে চলে গেলাম।

ওই সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কাউন্টারে একটি অসাধারণ সুন্দরী দক্ষিণী মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার মাথায় জ্বলজ্বলে কুঙ্কুম। গোলগাল গম রঙের চেহারায় পবিত্রতার ভাব, যেমন করে আসল তামাকের উপর লাগানো থাকে ভার্জিনিয়ার ছাপ। আমাকে কাউন্টারের কাছে আসতে দেখে সে খুব মিষ্টি করে হাসল, আমাকে দেখাল যে তার

দাঁত চমক দেবার মতই বাস্তবিক সাদা, মোতির মত। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজকের ম্যাড্রাস এক্সপ্রেসে জায়গা নেই।'

—'কাল'? আমি একটু রেগে জিজ্ঞেস করলাম।

—'কালও নেই', সে আবার মিষ্টিস্বরে বলল, যেন সে আমার উপর দয়া করছে।

—'পরশু', আমি কঠোর হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—'পরশু কি, ২২ তারিখ পর্যন্ত সব বুক্ড', সে হেসে বলল। তার আওয়াজ এত মিষ্টি আর মধুর মতো স্বচ্ছ যে মানুষ পাউরুটিতে লাগিয়ে তা স্বচ্ছন্দে খেতে পারে।

অবশ্য তখন আমি পাউরুটি নয়, একটা সিটের খোঁজে ছিলাম। তাই আমি সেখান থেকে সোজা ডিভিশন্যাল ম্যানেজারের কাছে চলে গেলাম।

ডিভিশন্যাল ট্রাফিক ম্যানেজার একজন কড়া মারাঠা সর্দারের মত চেয়ারে বসে ছিলেন। তার পরনে লক্ষ্ণৌয়ের ক্রীম রঙের স্যুট। তার সুন্দর টেকো মাথার উপর একটা বাল্ব জ্বলছিল। সেই আলোয় তার মাথার চারদিকে একটা গোল ছটা তৈরী হচ্ছিল যাতে তাব ব্যক্তিত্বের চারপাশে একটা দেবত্বের ভাব জেগে ওঠে। আমি তার সামনে চেয়ারে বসে বললাম, 'আমাকে আজই ত্রিচুর যেতে হবে।'

—'তো যান'

—'কিন্তু কোন জাযগা পাওযা যাচ্ছে না'

তখন সে অসহায়ভাবে হাত মোচড়াতে মোচড়াতে বলল, 'তাহলে আমি কি করতে পারি?'

আমি বললাম, 'আপনাকে এইটকুই জানানোর যে ত্রিচুবে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত সাহিত্যিকরা একটি সম্মেলন কবছেন, আমি তার সভাপতি। আমি যদি যেতে না পাবি তাহলে সে বেচারারা আমার সভাপতিত্ব থেকে বঞ্চিত হবে।'

মারাঠা সর্দার গর্জন করে ডাকলেন —'চাপরাশী'।

চাপরাশী ভেতরে এল।

—'হেড ক্লার্ক কো বুলাও'।

হেড ক্লার্ক ভেতরে এল।

—'একে ম্যাড্রাস এক্সপ্রেসের একটা সিট দিয়ে দাও'।

—'সিট নয়, বার্থ,' আমি বললাম, 'তিন দিন তিন রাতের যাত্রা'।

—'একটা বার্থ, ম্যানেজার জোরে বললেন।

হেড ক্লার্ক একবার মাথা নীচু করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—'ইয়েস স্যার'।

বাইরে বেরিয়ে হেড ক্লার্ক আমাকে একটা চিরকুট দিয়ে বলল—'এটা বুকিং কাউন্টারে নিয়ে যান। হয়ে যাবে।'

যখন আমি ফিরে সিন্ধী মেয়েটির কাছে পৌঁছলাম, সেই গুজরাতী ক্লার্ক ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'এই শেঠের রিজার্ভেশনের জন্য ফোন এসেছিল।'

আমাকে দেখেই সিন্ধী মেয়েটি বলল, 'আমি যখন আপনাকে একবার ....'

আমি তাকে কথা বলতে না দিয়ে তার হাতে চিরকুটটা ধরিয়ে দিয়ে সুন্দরী দক্ষিণী মেয়েটিকে বললাম, 'জায়গা পেয়ে গেছি, রাতে খাবার জন্যে একটা তার পাঠিয়ে দিন।' দক্ষিণী মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে নিল—'বাইশ তারিখকি বচ্চী।'

সিন্ধী মেয়েটি চিরকুট দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি বার্থ কি করে পেলেন?'

আমি চুপ করে রইলাম, কেননা আশ্চর্য তো আমিও হয়েছিলাম। ভাব দেখালাম এটা যেন কোন সরকারী গুপ্ত ব্যাপার।

আসলে এটা সরকারী গুপ্ত ব্যাপারই ছিল। বেচারা ট্রাফিক ম্যানেজার আমাকে সরকারী সাহিত্যিকদের কনফারেন্সের সভাপতি ভেবেই বার্থ দিয়েছিল। যদি সে কোনরকমে জানত, এটা প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের সম্মেলন, তাহলে ম্যাড্রাস এক্সপ্রেস কেন, কোন মালগাড়ীতেও জায়গা দিত না — বিশেষ করে সেই নতুন সার্কুলারের পরে, যাতে শুনেছি সরকার তার প্রত্যেক দপ্তরকে প্রগতিশীল লেখকদের সম্পর্কে সতর্ক করেছে। এই সার্কুলারের পর কোন সরকারী কর্মচারী 'প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘের' সদস্য হতে পারবে না। (কেবল সি.আই.ডি-র লোকেরা এর সদস্য হতে পারবে।)

যখন টিকিট পেলাম, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি একটা বাজে। ম্যাড্রাস এক্সপ্রেস দুটোয় ছাড়ে। আমি আমার বার্থে নিজের বিছানা বিছিয়ে নিলাম। আরাম করে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল রাত ন'টায়। এক সহযাত্রী আমাকে ঝাঁকি দিয়ে জাগাল, কারণ ঐ স্টেশনেই আমাকে খাবার দেবার জন্যে তার করা হয়েছিল। একজন লোক জানালার সামনে টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। টিফিন ক্যারিয়ার খুলে দক্ষিণ ভারতীয় খাবার চোখের সামনে প্রথম দেখলাম। প্রথম কৌটোয় ছিল রসম — টমেটোর স্যুপের মত টক। পরেরটিতে সাঁবর — ডাল আর সব্জি। দু ধরনের দই — শেষে ভাত, আর ছোট কৌটোয় পিচড়ী; সেই সঙ্গে কলার পাতায় সুজির উপমা আর দুটো পাপড়ম, যাকে এখানে আমরা পাঁপর বলি। এই স্বাদু ও হালকা খাবার খেয়ে আমি আবার শুয়ে পড়লাম। যখন সকাল হলো দেখলাম, বোম্বাই অনেক পেছনে পড়ে গেছে, আর রেলগাড়ি হফ হফ করে দক্ষিণ ভারতের উপত্যকা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমি এক অজানা দেশে প্রথমবার এলাম। এইজন্যে জানালায় মাথা ঠেকিয়ে বাইরের দিকে দেখতে দেখতে আসছিলাম। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এখানেও বিস্তৃত ; তবু বোম্বের থেকে কত আলাদা, কারণ দক্ষিণভারত ভূমধ্যরেখার খুব কাছে, ফুল, ফল ও গাছ কত বদলে গেছে। কিন্তু এই বদলের পরও অপরিচিত মনে হয় না; বরং মনে হচ্ছিল, যদিও আমি প্রথমবার এসেছি তবুও এই সব দৃশ্য আমি যেন কোথায় দেখেছি। হঠাৎ 'কড়াপ্পা'-র পাহাড়ী ঝাড় দেখলাম। এ গাছ কাশ্মীরের নীচু পাহাড়ী জায়গায়, মীরপুর ও কোটনিতেও পাওয়া যায়। কিছুক্ষণের জন্যে আমার মাথায় সেই সুদূর অভাগা উপত্যকা ঘুরতে লাগল, সেখানে একদা 'মাহিয়া' গীত শোনা যেত, আজ বন্দুকের গুলি চলে। আজ সেখানে মানুষ মানুষকে ভালবাসে না। আজ সেখানে ঘৃণার রাজত্ব। কৃষক আজ লাঙ্গল না চালিয়ে পরিখা খুঁড়ছে; হিন্দুস্থান পাকিস্তান বনস্পতির সেই সাম্রাজ্যে যুদ্ধের খেলা খেলছে। কিছুক্ষণের জন্যে আমার চিন্তা সেই দিকে ঘুরে গিয়েছিল, যেখানে জীবন ও মৃত্যুর সংঘর্ষ চলছে। আবার আমি দক্ষিণ ভারতের এই

সুন্দর উপত্যকায় ফিরে এলাম, আর ভাবলাম, এখানে তো শান্তি আছে, আছে শান্তি-দায়ক সব দৃশ্য— ছোট ছোট পাহাড়, গোল গোল শিখর, পাহাড়ের উপরে ছড়িয়ে থাকা উপত্যকা, এমন মনে হয় পাহাড়রা যেন রোদ থেকে বাঁচবার জন্য হ্যাট পরে রয়েছে। দূরে মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে থাকা জঙ্গল, তারপরে ধানের জমি, কোথাও ধানগাছ দাঁড়িয়ে, কোথাও ধান কাটা হচ্ছে। কোথাও ধানের রঙ সবুজ, কোন জায়গা হলদে হয়ে গেছে। পাহাড়ী ক্ষেত আর ভেকড়ের ঝাড় রোদে শন্‌শন্‌ করে পেরিয়ে যায়। ভেকড় আর খেজুর, খেজুরের গাছ ঘুরে ঘুরে সুন্দর নদী, লম্বা খাল, গরু ছাগল চরছে, কমলালেবুর বাগান আর আলোর উপর জেগে আছে ফণিমনসার ঝোপ, কোথাও কোথাও প্রাচীন মন্দির, গভীর সবুজ চোখের গহীন সরোবর — যতবড় মন্দির, ততো বড়ো পুকুর। উত্তর ভারতের তিনকোণা মন্দির নয়, দক্ষিণ ভারতের বিশাল মন্দির—একটা জঙ্গলের মতো ছড়িয়ে থাকা। সেখানে সংগুপ্ত আছে শিল্প আর শিল্পীর পর্বতের মতো মহানতা আর প্রকৃতির মতো আকৃতির সাবলীলতায় আছে লোভনীয় বৈচিত্র্য। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে আছে দ্রাবিড়ের আত্মার প্রতিবিম্ব, যে জঙ্গলে প্রতিপালিত হয়েছে, নিজেকে বিস্তৃত করে তুলেছে। সেই মন্দিরের বিশালতা আকাশের হৃদয়কে চেনে এবং তাকে মন্দিরের গঠনের মধ্যে আত্মস্থ করে নেয়, কারণ দক্ষিণ ভারতের মন্দির প্রথম থেকেই দক্ষিণ ভারতের সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র শুধু নয়, তা ছিল দৈনন্দিন কাজের কেন্দ্র। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের মন্দির শুধু পূজার জন্যে ব্যবহার করা হতো না, বরং রাজনীতি ও সামাজিক কাজের সমান্তরাল ধারা বইত সেখানে। মন্দির, নাচঘর, কথাকলি পরম্পরার সংরক্ষক রাজারা মন্দিরে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতেন ; মন্দিরে লোকে বিয়ে করত আর যুদ্ধের সময় মন্দির থেকেই তাদের যাত্রা শুরু হতো। মন্দিরের জলাশয়ে তাঁরা স্নান করতেন। ঘরের কাজকর্মের, এমনকি খাবারের জলও মেয়েরা এখান থেকে নিয়ে যেত। দক্ষিণ ভারতের মন্দির অনেক দিন পর্যন্ত সামাজিক জীবনের কেন্দ্র ছিল। আর সম্ভবত সেই জন্যই দক্ষিণ ভারতের জীবন এত দীর্ঘ দিন ব্রাহ্মণ্যবাদের ইন্দ্রজালে আবদ্ধ ছিল।

কড়াপ্পা থেকে নন্দলুর পর্যন্ত জঙ্গলের ধারাবাহিকতায় মনোহর সব প্রাকৃতিক দৃশ্য নজরে আসে। শৃঙ্খলের মতো এই বনাঞ্চল মাদ্রাজ প্রান্ত থেকে ছড়িয়ে আছে হায়দ্রাবাদ রিয়াসতের সীমান্ত পর্যন্ত। নন্দলুরে আমার কামরায় একজন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী ও তার একজন দেশী সঙ্গী প্রবেশ করলেন। রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীর গোলগাল লাল চেহারা, একেবারে বাচ্চার মতো; তাঁর চেহারার উপর একটা হাসির রেখা। ওঁর সঙ্গী কালো রঙের, ঢ্যাঙা, গাল বসে যাওয়া—চোখে তার চিন্তা আর চালাকি। সে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'এ বার্থ আপনার; কিন্তু আমরা মাত্র চারটে স্টেশন যাব। আপনার আপত্তি না থাকলে, আমরা এখানে বসে যাব কি?'

আমার আপত্তি আর কি হতে পারে।

বাইরে ব্যান্ড বাজার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, ভাবলাম এত যখন অয়োজন, তখন নিশ্চয় বড় কোন পাদ্রী হবেন। জানালা দিয়ে দেখলাম, কিছু সরকারী লোক, অনেক পুলিশ—এসব আমাকে স্বাগত জানাবার জন্যে উপস্থিত হয়নি তো? অবশ্য

চিন্তা করে বুঝলাম, এখনও সে যুগ আসেনি যে ব্যান্ড বাজিয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে আসবে। এজন্য আমি হেসে পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কি আপনাকে বিদায় জানাতে এসেছে?' ঢ্যাঙা দেশী পাদ্রী বললেন, 'ব্যান্ড বাজনা মাদ্রাজ প্রদেশের খাদ্য বিভাগের মন্ত্রীর জন্যে। ফলের টুকরি ও অন্যান্য জিনিষ, যা আপনি দেখছেন, এসব মন্ত্রীজীর সঙ্গে, 'অধিক খাদ্য উৎপাদন আন্দোলনের' স্মারক হিসেবে যাবে।'

জানালার বাইরে তাকিয়ে মন্ত্রীজীকে কাছের একটি কামরার দিকে এগোতে দেখলাম। আশেপাশে সেপাইরা ভিড় করেছিল। এককালে এদের জায়গায় জনগণ থাকত। সেপাইদের আশেপাশে ছিল অফিসাররা, ফলের টুকরি আর বেয়ারাদের দল।

আমি বড় পাদ্রীকে বললাম, 'ফাদার আমি খুব ভুল বলিনি। ব্যান্ড বাজনা একজন পাদ্রীকে ছাড়তে এসেছে, গান্ধীবাদী এক বড় পাদ্রীকে .... ।' দুজন পাদ্রী আমার দিকে ভ্রুকুটি করলেন। আমি মুচকি হাসতেই বড় পাদ্রী খিলখিল করে হেসে বললেন, 'ত্রিমোনদোস্ত' (tremendous)।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'গাড়ি এখানে কতক্ষণ থামে? এতক্ষণ দাঁড়ায়?'

দেশী পাদ্রী বললেন, 'না চার পাঁচ মিনিট'।

— 'পনেরো মিনিটের উপর হয়ে গেল', আমি বেজার হয়ে বললাম।

— 'আরে চলবে, চলবে, এত চিন্তার কিছু নেই', সে উত্তর দিল।

একজন বুড়ো লোক, মাথার চুল আর দাড়ি সাদা হয়ে গেছে, কালো চেহারার উপর বড় ভাসা ভাসা চোখ, গোলাপ ফুলের টুকরি নিয়ে এল। আমার 'জানালা দিয়ে ভিতরে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'গোলাপ ফুল কত করে?' বুড়ো লোকটি টুকরিটা পেছন দিকে সরিয়ে নিল। আমার দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, 'বেগম সাহেবা কি ভিতরে আছেন?' দেশী পাদ্রী তাড়াতাড়ি বলল, 'না, আগের কামরায় আছেন'। 'বুড়ো লোকটি আমার জানালার সামনে থেকে সামনের কামরার জানালায় চলে গেল। আমি হতচকিত হয়ে পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি?' দেশী পাদ্রী বলল, 'সে এক দীর্ঘ গল্প। আগামী চার ষ্টেশনে ধরবে না, এইজন্যে সংক্ষেপে বলছি।'

'এই বুড়োর নাম ইয়াসিন। সে পীতমপুর রাজার বাগানে মালির কাজ করত। এখানে নন্দলুরের শত শত মাইলব্যাপী যে জঙ্গল তুমি দেখছ, এটা পীতমপুরের রাজার জায়গির। এই জঙ্গলের কাঠ বাইরে যায়। কমলালেবুর কিছু বাগানও এখানে আছে। দক্ষিণ ভারতে এর থেকে ভালো কমলালেবু কোথাও পাবে না। এই কমলা পেলে নাগপুরের কমলাও তুমি খাবে না।

ইয়াসিন বহু বছর ধরে এই বাগানে মালির কাজ করত। তার আগে তার বাবা এই বাগানে কাজ করত। সে পীতমপুরের রাজার বিশ্বস্ত প্রজা ছিল। রাজা সাহেব ইয়াসিনকে তার বাগানের এক কোনায় একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর ও চাষের জন্যে একটু জমি দিয়ে রেখেছিল। জমিতে সে ধান চাষ করত। কুঁড়ের আশপাশ থেকে শাকসব্জি পাওয়া যেত, বাগান থেকে আসত ফলমূল। ইয়াসিন দিনরাত কাজ করত বাগানে।

ইয়াসিনের বৌ অনেকদিন মারা গেছে। খাবার তৈরী করতো ইয়াসিনের যুবতী কন্যা বেগম। কুঁড়েঘরের দেখাশুনাও করতো সে, বেগমকে ছোট্টবেলা থেকে ইয়াসিন

নিজেই প্রতিপালন করেছিল, কারণ বৌ মারা যাবার সময় বেগমের বয়স পাঁচ বছরের বেশি হয়নি।

সেদিন আমি ইয়াসিনকে বলেছিলাম, সে যেন ছোট্ট মেয়েটিকে আমাদের কনভেন্টে দিয়ে দেয়। সেখানে তার শিক্ষা, ভরণপোষণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হতচ্ছাড়া বুড়ো কথা শুনল না। সে খুবই গোঁড়া মুসলমান, দিনে পাঁচবার নামাজ পড়ে। সে আমাকে বলত, 'পাদ্রী সাহেব, আমার বৌ-এর একটাই তো স্মৃতিচিহ্ন আমার কাছে আছে; তাও যদি আপনাকে দিয়ে দিই, তাহলে আমার কাছে কি থাকবে! আপনি আমার মেয়েকে নয়, আমার ধর্ম কেড়ে নিতে চাইছেন।

যা হোক মশায়! তা ইয়াসিন নিজের মেয়েকে লালন পালন করল। সব সময় সে তাকে চোখে চোখে রাখত। বাগানে যাবার সময় কাঁধে তুলে নিয়ে যেতো। লোকে বলত, মমতা শুধু মায়েদের থাকে জানতাম, বেগমের বাবার মধ্যে তা কম কিছু নেই।

বেগম যুবতী হয়ে খুবই সুন্দরী হলো। আশপাশের গ্রামে এত সুন্দরী মেয়ে ছিল না। ফুল যখন ফোটে, তখন তার সুগন্ধ দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। বেগমের সৌন্দর্যের খ্যাতি রাজাসাহেবের কানে পৌঁছল। তার লালা ঝরল। কিন্তু সে বুকে হাত রেখে বসে পড়ল, কেননা তার বয়স আশি পেরিয়ে গেছে, ফুল ছেঁড়ার বা সুগন্ধ নেবার শক্তি তার ছিল না ; তার হৃদযন্ত্রও যে কোন সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারত।

বেগম নিজের বাপের সঙ্গে পুরুষের মত বাগানে কাজ করত, নিজেদের ক্ষেতেও পুরুষের মত লেগে থাকত। এছাড়া সে নিজের কুঁড়েঘরও সামলে রাখত। কেননা বাবা বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। সে বেশি খাটতে পারে না। বেগম মনে মনে ঠিক করেছিল, তার বৃদ্ধ পিতা যতদিন জীবিত থাকবে, সে বিয়ে করবে না। যখনই ইয়াসিন বেগমকে বিয়ের কথা বলেছে, সে রেগে গেছে, ঝগড়া করেছে। খুবই ভাবুক মেয়ে ছিল সে। কনভেন্টে এলে খুবই ভালো নাম করতে পারত। দুঃখের ব্যাপার, তার ভাগ্যে তা ছিল না।

বেগমের সব কাজকর্মই পুরুষালি। তবু তার মধ্যে নারীর সৌকুমার্য দেখা যেত। তার ফুলের প্রতি ভালবাসা ছিল—আর তা গোলাপ। সে তার কুঁড়েঘরের চারপাশে গোলাপ পুঁতেছিল। কুঁড়ের বাইরের ছোট্ট বাগানে নানারকম টব সাজিয়ে রেখেছিল। গোলাপের কলমের জন্যে ইয়াসিনকে অন্য বাগানের মালিদের কম খোসমোদ করতে হয়নি। কত পরিশ্রম করে যে বেগম কুঁড়েঘর আর তার চৌহদ্দিকে গোলাপ দিয়ে সাজিয়েছিল! শুধু গোলাপ— কখনও রক্তের মত গাঢ় লাল গোলাপ, সন্ধ্যার লালিমাভরা গোলাপ, কুমারী ঠোঁটের লালিমা লেপা গোলাপ, গোলাপে লাল ভোরের সোনা গোলা রঙ লেগে থাকত ; কখনও তা রাতের বরফের মতো সাদা আর আলাভোলা গোলাপ, কখনও হলদে হলদে গোলাপ, কখনও গোলাপের বুকে লেগে থাকত বিরহের আগুন, এমন তার সুগন্ধ যে দূরের ধানক্ষেতেও তা ছড়িয়ে পড়ত ; রহস্যময় সে সুগন্ধ প্রেমের শব্দহীন গোপনীয়তার মত। সেই হালকা গন্ধ ছড়িয়ে যেত মানুষ থেকে মানুষে। এই ধরনের শতশত গোলাপ বেগমের বাগানে ফুটেছিল—তা ব্যবহার হতো বেগমের কেশ সজ্জায়, গলার হারে, মাথায় খোঁপায়, মনোহরণ বেণীর হাসিতে।

এই গোলাপ ছিল বেগমের দুর্বলতা। ইয়াসিন জানত, এই দুর্বলতা সে নিজেই মেয়ের মনে জাগিয়েছে। ছেলেবেলা থেকে সে ফুল ভালবাসতে শিখিয়েছে ; মেয়ের জন্যে বাগান থেকে চুরি করে ভাল ভাল ফুল নিয়ে আসত। বেগম তাই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলা করত। এখন ফুলের সঙ্গে খেলার সময় ফুরিয়েছে, থেকে গেছে ফুলের প্রতি আসক্তি। এখন তার কুঁড়েঘরে ফোটা গোলাপের ফুল এত ঘন যে তা কোন মাদ্রাজী গ্রাম মনে হবে না, মনে হবে ইরাণী কুঞ্জ।

একদিন পীতমপুর রাজ্যের যুবরাজ রাজকুমার বন্ধুদের নিয়ে নন্দলুরে শিকার করতে এলেন। তাঁদের নিজেদের জঙ্গল, নিজেদের বাগান, প্রজাও তাঁদেরই—চারিদিকে নিজস্ব সম্পত্তি। কোথাও ভয়ের কিছু ছিল না। স্টেশনের সাইডিং-এ তাঁর বিশেষ সেলুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর রাজকুমার হাঁকিয়েদের (যারা জীবজন্তু তাড়ায়) নিয়ে শিকারে বেরিয়ে পড়লেন।

দিনভর শিকার হলো। চিতা, ভালুক, হরিণ, শূয়োর, অনেক জংলী জানোয়ার মরল। হাঁকিয়েদের মধ্যে কেবল দুজন মারা গেল। একজন হাঁকিয়েকে চিতাবাঘ ছিঁড়ে ফেলল; অন্য হাঁকিয়ে জংলী শূয়োরের শিকার হল—সে তার থুতনি দিয়ে বেচারা কৃষকের পেট চিরে অন্ন বের করে দিল। সেই সময় শূয়োরের উপর গুলিবর্ষণ চলছিল। কিন্তু মরতে মরতেও সে হতভাগা গরীব হাঁকিয়ের কোমর থেকে ঘাড় অবধি চিরে ফেলল। সে রাজা সাহেবের পুরনো হাঁকিয়ে ছিল। কিন্তু কি করা যাবে। শিকারে এমন তো হয়ই। অনেক সময় এমনও হয় যে একটাও চিতা মারা যায় না। কিন্তু দুচার জন হাঁকিয়ে ফালতু জানোয়ারদের শিকার হয়ে যায়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আজকের দিন বেশ ভালই ছিল। প্রায় পনেরোটা জানোয়ার মারা হয়েছে—যার মধ্যে তিনটে চিতা, আর আমাদের তরফে দুটো হাঁকিয়ে মারা গেছে।

রাজকুমার খুব খুশী হয়ে সেলুনের দিকে ফিরলেন। স্নানের পর মদের ফোয়ারা আর মদ খাবার পর রাজকুমারের চোখও গোলাপী হয়ে গেছে। কথা জড়িয়ে আসছে। তখন কুমার বীর সিং হাত জোড় করে প্রার্থনা জানালো—

হুজুর, আপনার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা ছিল।

রাজকুমার নিজের চেয়ার থেকে উঠলেন আর কুমার বীর সিংকে নিয়ে শোবার ঘরে চলে গেলেন। সেখানে তিনি একটি মেয়েকে দেখলেন, তাকে দেখেই তার পা আটকে গেল। পরে তিনি লজ্জায় চোখ নামিয়ে বীর সিংকে জিজ্ঞেস করলেন—এ কে? আমার ঘরে কি করছে?

কুমার হেসে বললেন, হুজুর এও আপনার প্রজা, আপনার সম্পত্তি। এর নাম বেগম, এর বাপ হুজুরের বাগানে মালির কাজ করে।

রাজকুমার খুবই লাজুক ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে সারা জায়গায় এটা প্রচারিত ছিল যে রাজকুমার কখনো মেয়েদের চোখে চোখ রাখতে পারেন না। রাজাসাহেবের বন্ধুরা কয়েকবার তাঁর যৌনবাসনা উদ্রিক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সবসময়ই রাজকুমার তা এড়িয়ে গেছেন। শেষে রাজাসাহেব কোন উপায় না দেখে রাজকুমারের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। আগামী মাসে তার বিয়ে। কিন্তু এখনো রাজাসাহেব চিন্তিত, যুবরাজ রাজকুমার অন্য রাজকুমারদের মতো নপুংসক না প্রমানিত হয়। এই চিন্তা তাঁর

মনের মধ্যে ধিকিধিকি জ্বলছিল। তিনি খুশী হলেন, যখন কুমার বীর সিংহ শিকারের প্রস্তাব রাখলেন। রাজা সাহেবও খুশী মনে যুবরাজ রাজকুমারকে যেতে বললেন।

রাজকুমার বলল, তুমি তো জানো আগামী মাসে আমার বিয়ে হবে।

কুমার বীরসিংহ হেসে বলল, তাতে কি হয়েছে হুজুর। একটু অনুশীলন হয়ে যাবে ....।

আবার সে একটু থেমে বলল, একটু চোখ উঠিয়ে দেখুন হুজুর কি সুন্দর ফুল এনেছি।

রাজকুমার চোখ তুলে দেখল। এতো আমি আগেই বলেছি, বেগম খুবই সুন্দরী ছিল।

রাজকুমারের শিকার উদ্যোগে নন্দলুরে দুদিন থাকার কথা ছিল, রাজকুমার সেখানে সাত দিন থেকে গেলেন। সাত দিনই ইয়াসিন স্টেশনে তার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসত। কিন্তু কেউ তাকে মেয়ের সঙ্গে দেখা করত দেয়নি। সে সেদিনও অন্য সময়ের মতো বাগানে কাজ করছিল। কেউ এসে তাকে বলল, তোর মেয়েকে রাজা সাহেবের লোকেরা তুলে নিয়ে গেছে। যখন সে পুকুর থেকে স্নান করে ফিরে আসছিল তখন আমি তার চীৎকার শুনি। আমি দেখলাম বাজা সাহেবের লোকজন তাকে ধরে ঘোড়ার উপর বসিয়ে নিয়ে গেল। বেগম তোর নাম ধরে চীৎকার করছিল। কিন্তু এখন আর কি হবে! তুই আমার কথা শোন। চুপ করে যা, বেশি চেঁচামেচি করলে চাকরি যাবে।

কিন্তু ইয়াসিন অন্য মালিদের পরামর্শ শুনল না। সে নন্দলুর স্টেশনে চীৎকার করতে করতে স্পেশ্যাল সেলুনের আশে পাশে ঘুরতে লাগল, সেলুনের সব জানালা বন্ধ। তাই বাইরের কোন চীৎকার কানে গেল না। ভেতরের কান্নার আওয়াজও বাইরে শোনা গেল না। ইয়াসিন ব্যাকুল হয়ে অনেক চেঁচামেচি করল। তাতে কুমার বীরসিংহ ও তার লোকেরা ইয়াসিনকে খুব ভালো করে ধোলাই দিল, আধমরা করে কুঁড়ে ঘরে ফেলে এল।

ইয়াসিন দুদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল ; কিন্তু মরেনি। তুমি তো জানো, এই কৃষকদের প্রাণ কত কঠিন হয়, তাদের হাড় কত মজবুত হয়। বুড়ো বেঁচে গেল, কিন্তু মাথায় গোলমাল হয়ে গেল। চতুর্থদিন সে আবার স্পেশ্যাল সেলুনের কাছে এল— তখন তার হাতে গোলাপের ফুল ভরা একটা টুকরি, ধীরে ধীরে বারবার বলছে, 'আমার বেগমকে আমার সামনে এনে দাও, আমি তাকে গোলাপফুল দেব। গোলাপফুল ....

সে সেলুনের প্রত্যেকটি জানালার সামনে বলতো, বেগম, তুই কি ভিতরে রয়েছিস? আমি তোর জন্যে গোলাপফুল এনেছি। সেদিন থেকে সারাদিন সেলুনের চারদিকে ঘুরত, আর রাতে কুঁড়েঘরে পড়ে থাকত। সকালে ফুলের টুকরি নিয়ে স্টেশনে চলে আসতো। রাজা সাহেবের কর্মচারীরা তাকে মারধোর করত, গালাগাল দিত, ভয় দেখাত, তাকে নিয়ে হাসিতামাসা করত, কিন্তু কিছুতেই তার কিছু হত না; সে কিছুই গায়ে মাখত না। সে খুব মিষ্টি করে কর্মচারীদের বলত, বেগমকে ভিতর থেকে ডেকে দাও, আমি ওকে ফুল দেব, ফুল দিয়েই চলে যাব।

একথা শুনে রাজার লোকেরা জোরে জোরে হাসতে থাকত।

সপ্তম দিনে স্পেশ্যাল সেলুনও চলে গেল; তার সঙ্গে ইয়াসিনের জীবনের শেষ আশাও।'

পাদ্রী চুপ করে গেলেন। দেখলাম, গাড়ি নন্দলুরের প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। সাদা-দাড়ি বুড়ো গোলাপের টুকরি নিয়ে প্ল্যাটফর্মের শেষে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

পাদ্রী মুখ ঘুরিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, সেই দিন থেকে এই বুড়ো প্রতিদিন এখানে আসে, আর প্রত্যেক গাড়ির প্রত্যেক কামরায় উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করে, বেগম কি ভিতরে আছে? তার জন্যে ফুল এনেছি।' কামরায় অনেকক্ষণ কেউ কথা বলল না। গাড়ি এখন নন্দলুর ছেড়ে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। সাহেব পাদ্রী আঙ্গুল তুলে ইশারায় আমাকে বললেন, 'এই রাজা পীতমপুরের জঙ্গল—বহু দূর পর্যন্ত, পশ্চিমে নিজামের হায়দ্রাবাদের ভিতরের পাহাড় চূড়া থেকে এই জঙ্গল ছড়িয়ে পড়েছে। এই জঙ্গলে জংলী জানোয়ারের সংখ্যা অনেক। এরা এত ভয়ঙ্কর যে একবার এক স্টেশন মাস্টারকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। এই জঙ্গলের চিতারা খুবই ভয়ানক।'

আমি রাজা সাহেবের জঙ্গলের দিকে দেখতে লাগলাম—ছোট ছোট বস্তির পাশে পাশে মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে থাকা ভয়ানক জঙ্গল। এই মাদ্রাজ প্রান্ত থেকে হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা জঙ্গলে একটি ফুল বন্দী। সেই ফুল কি কোনদিন মুক্ত হবে? আমি চোখ তুলে বিস্তৃত জঙ্গলের দিকে দেখলাম। তার মধ্য দিয়ে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। এক জায়গায় নীচু জমি আর জঙ্গল। সেখান থেকে পশ্চিমে উঁচু পাহাড়ের উপর ছড়িয়ে যাচ্ছিল রাজাসাহেবের ভয়ঙ্কর জানোয়ারওয়ালা জঙ্গল, পাহাড়ের অন্যদিকে হায়দ্রাবাদের সীমা; সেখানেও জঙ্গল ছড়িয়ে গেছে, তারও পরে তেলেঙ্গানা। আমি ভাবলাম, একদিন, এ ফুলও নিশ্চয় স্বাধীন হবে, তেলেঙ্গানার হাত আর কবিদের হৃদয় জঙ্গলকে নিশ্চয় জিতে নেবে ; এই ফুল হলো মানুষের আত্মা, চতুর্দিকে সুগন্ধ হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সাহেব পাদ্রী খুব দুঃখিত স্বরে বললেন, 'আজকাল শিকারে কোন মজা নেই।'

—'কেন', আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—'শিকারের জন্যে হাঁকিয়ে পাওয়া যায় না, আগে খুব পাওয়া যেত; এখন দুগুন দাম দিয়েও হাঁকিয়ে পাওয়া যায় কম। তুমি তো জানো, হাঁকিয়ে ছাড়া শিকার করে আনন্দ পাওয়া যায় না। এখন কৃষকদের নিজেদের জীবনের উপর ভালবাসা জেগেছে। তারা শিকারে হাঁকিয়ের কাজ পছন্দ করে না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ফাদার, তোমার কি শিকারের খুব সখ?'

তার গোলগাল ছেলেদের মাতো চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, 'ত্রিমোনদোস্ত'।

—'ফাদার আপনি ফরাসী না ইটালী নিবাসী'?

—'আমি ডাচ, এখানে তিরিশ বছর হলো এসেছি'।

—'তিরিশ বছর? এই এলাকাতেই কাটিয়েছেন? আমি গাড়ির বাইরে ইশারা

করলাম। সে বলল, 'হ্যাঁ আমার জায়গাটা পছন্দ, এখানে শিকার খুব ভালো পাওয়া যায়, ভালুক, বাঘ, চিতা, হরিণ, শূয়োর সবরকম পাওয়া যায়। পাওয়া যায় না শুধু হাতী।' আমি বললাম, 'ফাদার, আপনি ভুল বলছেন। হাতী এখানেও পাওয়া যায়। তোমরা কখনও তা শিকার করতে চেষ্টা করনি। তোমরা সব সময়ই গরীব জানোয়ারদের শিকার করেছো। হাতীকে জঙ্গলে একা ছেড়ে দিয়েছো। হাতী হিন্দুস্থানে পাওয়া যায়, নীচে যাও তো সিলোনে পাবে, বার্মাতে পাবে, মালয়েও পাবে। হাতী ইন্দোনেশিয়াতেও পাওয়া যায়। কিন্তু এসব হাতীর রং সাদা। লোকে বলে সাদা হাতী বড়ই পবিত্র এবং পাওয়াও কঠিন। আমার ধারণা এশিয়ায় এমন কোন দেশ নেই, যেখানে সাদা হাতী পাওয়া যায় না। আসলে, ব্যাপারটা তো এই যে সাদা হাতী আরব, সিরিয়া আর প্যালেস্টাইনের মরুভূমিতেও পাওয়া যাচ্ছে। যেখানে তেলের কুঁয়া, লোহার খনি আছে, আছে রবার আর চায়ের বাগান, সেখানেই এই হাতী পাওয়া যায়।'

ডাচ পাদ্রীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার ঠোঁট ভিতরের দিকে চলে গেল। তাড়াতাড়ি সে ক্রুশটাকে ধরে ঘৃণার চোখে আমার দিকে দেখতে লাগল।

কালো পাদ্রী বলল, 'ফাদারকে এই ধরণের কথা বলার তোমার কোন অধিকার নেই। আমি খুব মিষ্টি করে বললাম, 'আমি ফাদারের প্রতি কোন ধৃষ্টতা দেখাইনি, আমি হাতীদের কথা বলছিলাম।'

একটা স্টেশন আসছিল। পাদ্রীদের পরের স্টেশনে নামার কথা, কিন্তু দুজনেই সেখানে নেমে গেলেন। গাড়ি থেকে নামার সময় কালো পাদ্রী বিষ দৃষ্টিতে আমাকে দেখলেন।

আমার আর সহ্য হল না। বললাম, 'যদি যাচ্ছোই, তাহলে শুনে যাও, এর আগে সাদা হাতী আর কালো হাতীতে সব সময় লড়াই হত। এখন শুনি, কালো আর সাদা হাতী খুব মিলেমিশে গেছে। দুজনে একে অন্যের গলায় শুঁড় দিয়ে গলাগলি করে এশিয়ার জঙ্গলে ঘুরছে।'

ডাচ ও দেশী পাদ্রী স্যুটকেশ তুলে আমার জানালার সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল। আমি ছেলেদের মত চীৎকার করে বললাম, 'ত্রিমোনদোস্ত'।

ত্রিচুর যাবার গাড়ি 'অরকুন্‌মে' স্টেশনে বদলাতে হয়। কোচিন এক্সপ্রেস বা মালাবার এক্সপ্রেস, যা মাদ্রাজ থেকে আসে, তাতে সোনুর পর্যন্ত যাওয়া যায়। সোনুর থেকে আবার অন্য লাইন ধরতে হয়, যা কোচিন বন্দরের দিকে যায়। ত্রিচুর এই রাস্তাতেই পড়ে। কোচিন যেতে লাগে দু ঘণ্টা। আরও এক রাত রাস্তায় কাটল। কোন বিশেষ ঘটনা ঘটেনি—কেবল 'গুটি' স্টেশনে দেখলাম ছেলেরা সাদা ঠোঙায় বিরিয়ানী বিক্রী করছে। খুলে দেখলাম, বিরিয়ানীতে তেলের ভাগ খুব কম, বেশ শুকনো। কোন সবজির সঙ্গে না মিলিয়ে দিলে মনে হবে যেন পানে বেশি চুন দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, আমি অন্য খাবার আনিয়ে নিলাম, না পেলেও এই বিরিয়ানী আমি ফেলে দিতাম, ঠোঙাটাই খেতাম।

সোনুর থেকে ত্রিচুর যেতে যেতে সমুদ্রতট পড়ে। এইজন্যে নারকেলের উঁচু উঁচু গাছ, উপত্যকা, জঙ্গল, ক্ষেত, পুকুর আর নদীনালার পারে পারে পাখা ছড়িয়ে বসা

সুন্দর পাখি দেখা যায়। নীল জলের পুকুর, ধানের ক্ষেতে সবুজাভা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন মালাবারী ঢঙ্গের বাড়ি, নারকেল ছোবড়া দিয়ে ছাওয়া ঘর—খুবই মনোরম দৃশ্য চারিদিকে।

সোনুরে আমার কামরায় দুজন মুসলমান ব্যবসায়ী এসে বসে গেলেন, তাঁরা কোচিন বন্দরে ব্যবসা করেন। তারপর এক ধনী মাদ্রাজী প্রবেশ করলেন—পরনে সুন্দর স্যুট, হাতে রূপোর হাতলওয়ালা ছড়ি, ডান হাতে হীরের কয়েকটি আংটি। দুই মুসলমান ব্যবসায়ী ও সেই বৃদ্ধ মাদ্রাজী মালয়ালম ভাষায় কথাবার্তা বলতে লাগলেন। মনে হয় একে অপরের সঙ্গে পরিচয় করার চেষ্টা করছেন। সেই কাজ শেষ হলে তিনি আমার দিকে আকৃষ্ট হলেন। মালয়ালমে কিছু বললেন আমাকে। আমি ইংরেজীতে বললাম, 'আমি ওই ভাষা জানিনা'।

লোকটি চমকে উঠল। তারপর বলল, আমি আপনাকে আলেপ্পিনিবাসী ভেবেছিলাম। আমি বললাম, 'আমার ওই শহরটি দেখার ইচ্ছে আছে।' সে বলল, 'আমি আলেপ্পিতে থাকি'।

যুবক মুসলমান ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি ব্যবসা করেন?'

সে বলল, আমি এল এল বি পড়ছি। আমার সঙ্গে আছে আমার ভাই (দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিয়ে)। আমি এর সঙ্গে ব্যবসাও করি।'

—'কি ব্যবসা'?

—'হার্ডওযার। আপনি কি ব্যবসা করেন?'

আমি বললাম, 'সফ্টওয়্যার'।

—'সফ্টওয়্যার কি জিনিস'—সে হাসল।

আমি বললাম, 'আপনি লোহার ব্যবসা করেন, আমি কলমের ব্যাপারী'।

বড় ভাই বলল, 'ও আপনি ফাউন্টেন পেন বেচেন?'

আমি বললাম, 'সেই রকমই'।

বড় ভাই বলল, 'যাই বলুন মশায়, এখন ব্যবসায় আর লাভ নেই, হতভাগা মজুরদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

বুড়ো বলল, আলেপ্পিতে আমার একটা কারখানা আছে সেখানেও এই অবস্থা। তারপর আমার দিকে ঝুঁকে বললেন, 'সব কিছু কমিউনিস্টদের করানো। কি মশায়?'

আমি বললাম, 'আপনি ঠিক বলেছেন'।

'আমার ছেলে বলত,' বৃদ্ধ আবার বলতে লাগল, 'আমার ছেলে বলত, এই সব লোকেদের শায়েস্তা করে দেবে। আমার ছেলে কে আপনি জানেন?'

—'কংগ্রেসী'?

—'না'

—'হিন্দু মহাসভা'?

—'না, না'

—'তাহলে আর এস.এস হবে'

—'না মশায়, আমার ছেলে মিলিটারীর সেক্রেটারী, আপনি কি যে বলেন!'

—'ক্ষমা করুন,' আমি বললাম, 'মিলিটারীরা রাজনীতিতে নাক গলাবে কেন?'

—'কিন্তু কমিউনিস্টদের দমন করার ব্যাপাবে রাজনীতি আসে কোথায়? এটাতো সোজা কথা, আমার কারখানা মজুরদের হরতালের জন্যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

বড়ো ভাই বলল, 'আমার ব্যবসায় তারা ঝামেলা কবছে। আমি সবাইকে ছাঁটাই কবে অন্য মজুর নিয়েছি। এখন শুনছি আবাব ঝামেলা হবে। আমি গতকালই মাদ্রাজে তার পেয়েছি। সেইজন্যে আমি কোচিন ফেরত যাচ্ছি। এই সরকার কিছু করে না। কি মশাই?' সে আমাকে জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, 'ঠিক বলেছেন'।

—দেখুন, ব্যবসায়ী বলল, 'এখনই সরকার নারকেল বাইরে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। বিলেতে নাবকেলের দাম পাঁচশো টাকা টন। আর এখানে আড়াইশো। আমাদেব প্রতি টন আড়াইশো করে লোকসান হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'বার্মাতে নারকেল দেড়শো টাকা টন, সে হিসেবে আপনি টন প্রতি একশো টাকা বেশি পাচ্ছেন।'

—'আমি বার্মাব কথা বলছি না ... ...'

আমি তার কথা কেটে বললাম, 'মালয়ে ৭৫ টাকা টন, সিঙ্গাপুরে ৫০ টাকা। হনলুলুতে এত নাবকেল বিনা পযসায় পাবেন যে তা দিয়ে আপনি আপনার কবর তাজমহলেব চেযে উঁচু করতে পারবেন। বুঝলেন?'

বড ভাই চমকে উঠল, সে ছোট ভাইয়ের দিকে দেখল। ছোট ভাই বৃদ্ধ মাদ্রাজীর দিকে দেখল, বৃদ্ধ মাদ্রাজী আমাব দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমাকে অচ্ছুৎ কবে দিয়েছে, যদি সম্ভব হত তাহলে হয়তো আমাকে ট্রেন থেকেই বাইরে ফেলে দিত, ভাগ্য বলতে হবে ত্রিচুর স্টেশন সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল — আমার নামার জায়গা।

আজ ত্রিচুরের ছোট্ট স্টেশনে খুব ভিড়। প্রায় দেড়শো ভলান্টিয়ার ব্যাজ লাগিয়ে দাঁড়িযেছিল, আমাকে কিছু লোক চিনতে পারল। স্বাগতম জানাতে থাকলো জোরে। যখন আমি গাড়ি থেকে নামছি, লোকেদের ভিড় ও সহযাত্রীদের দিকে একবাব দেখলাম। তাঁরা আশ্চর্য হয়ে আমাকে দেখছিলেন। আমি কেবল এটুকুই শুনতে পেলাম ছোটভাই বডভাইকে বলছে, 'এও সেই ....

এইটুকু বলেই সে জানালা বন্ধ করে দিল, আমার দিকে পেছন কবে বসল। কিন্তু বিপ্লবী শ্লোগান তুফানী রেলের মতো কামরার ভিতবে শোনা যাচ্ছিল।

'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'

'প্রগতিশীল লেখক সংঘ জিন্দাবাদ'

'মজদুর লেখক ঐক্য জিন্দাবাদ'

হার্ডওযারের ব্যবসায়ী আমার দিকে পেছন ফিরে বসে ছিল, যদিও চোরা চোখে বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছিল। তার চোরা চাহনিতে ভয়ের ভাব, হৃদয়ে আশঙ্কা। হার্ডওযারের ব্যবসায়ী সফটওয়্যারের ব্যবসায়ীর সামনে অপরাধীর মতো চুপ। এই পরিস্থিতিতে বন্ধুদের শ্লোগানে আমার হৃদয়ে জেগে উঠেছিল ইকবালের সেই পংক্তি—'ফুল কি পত্তোসে কট শকতা হ্যায় হীরে কা জিগর।'

ধীরে ধীরে আমি আমার সঙ্গীদের সঙ্গে বাইরে বেরোলাম। দক্ষিণ ভারতে সেই

আমার প্রথমবার যাওয়া ; কিন্তু নিজেকে কখনও অপরিচিত মনে হয়নি। আমার চারদিকে আনন্দিত চেহারা; আর আমি তাদের দিকে এমনভাবে এগোলাম যেন একে অপবকে দীর্ঘকাল ধরে চিনি—উপর থেকে নয়, পরিচিতের মতও নয়, সাধারণ বন্ধুত্বের মতও নয়, হৃদয়ের আকর্ষণ শক্তি থেকে জানি সদাই আমার জীবন তাদের আর তাদের জীবন আমার হয়ে গেছে।

ত্রিচুর একটি ছোট্ট করদ শহর। জনসংখ্যা সত্তর হাজারের বেশি হবে না। বাড়িগুলি পুরনো ধরনের। শহরের মাঝে একটা শিবের মন্দির এবং পাশে একটা পার্ক। সেখানে আজকাল ফ্রীল্যান্ড কোম্পানী হয়েছে। এই পুরো এলাকায় নাচ, গান আর জুয়া হয়। রাত দুটো পর্যন্ত ফিল্মের গান শোনা যায়।

শোনা যায়, ত্রিচুরে আগে সেগুন গাছের বড়ো জঙ্গল ছিল। সেখানে কেউ শিবের মন্দির তৈরী করে। এই শহরের পত্তন হয় তার আশপাশ ধরে। এখানও প্রতি বছর শিবের মন্দিরে মেলা বসে। আশপাশের গ্রাম থেকে কয়েক লাখ লোক আসে। পূজারীরা হাজার টাকা প্রণামী পায়, শহরের ব্যবসায়ীরা অনেক টাকা রোজগার করে। এখানকার ব্যবসা বেশিরভাগ ক্রীশ্চানদের হাতে। ক্রীশ্চান বুর্জোয়াদেরই সঠিক অর্থে কোচিনের শাসকশ্রেণী বলা উচিত।

ক্রীশ্চান ধর্মের ইতিহাস ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনে অনেক পুরনো। এই ধর্ম ইউরোপীয় আক্রমণকারীদের সঙ্গে আসেনি; বরং তার অনেক আগেই এখানে ধর্মপ্রচারকরা প্রচার শুরু করেছিলেন। এখানকার একটি গীর্জা নশো বছরেরও পুরনো। প্রথমে যীশুর শিষ্য ছিলেন সন্ত টমাস। তাঁর গীর্জা এখানে আছে। প্রাচীন যুগে এখানকার সমুদ্র জাহাজ প্যালেস্টাইন ও রোম পর্যন্ত যেতো। পুরনো বাইবেলে পূর্ব থেকে আনা যে কাঠের কথা আছে অনুমান হয়, মালাবার থেকেই সেগুনকাঠ গিয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে ক্রীশ্চান জগতের সম্পর্ক নতুন নয়, বরং কয়েকশো বছরের পুরনো। উত্তর ভারতের বেশীরভাগ ক্রীশ্চানদের আজও বিদেশী মনে হয়, দক্ষিণ ভারতে কিন্তু তা নয়। গির্জার নির্মাণ পদ্ধতিতেও ভারতীয় ধরণ দেখা যায়, যেমন দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের বাইরে পতাকা লাগাবার একটি উঁচু বেদী থাকে। এরকম বহু গির্জার বাইরেও পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্য কিন্তু আমি উত্তর ভারতের গির্জায় দেখিনি। এছাড়া শহরে এবং গ্রামে ছোট ছোট শিব মন্দিরের মতো গির্জা আছে গলিতে গলিতে। সেই গির্জায় যদি ক্রুশ না টাঙানো থাকে, তাহলে মনে হবে এটা শিব মন্দির।

কোচিন আর ত্রিবাঙ্কুরের জনসংখ্যায় ক্রীশ্চানদের ভাগ শতকরা তিরিশের কম নয়। শিক্ষিতের হার কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, অর্থাৎ পঞ্চাশভাগ। সমাজবিন্যাসের ধরন যেহেতু পুরনোই থেকে গেছে সেই হেতু লেখা পড়া শেখার পরও মানুষ গরীব হয়েই থাকে। হ্যা, চার্চ কিন্তু ধনী, বেশির ভাগ রোমান ক্যাথলিক চার্চ। অন্য চার্চও আছে, যাদের নিজেদের মধ্যে দলাদলি মামলা মোকদ্দমা হয়, যাতে জনগণের সম্পত্তি নয় ছয় হয়, প্রতি বছর নতুন-নতুন গির্জা তৈরী হয় এবং পুরনো গির্জাতে নতুনভাবে কিছু না কিছু যোগ করা হয়। অনুমান করা যায়, একটা

ভালো গির্জায় কম করে এক লাখ টাকা খরচা হয়। এই টাকাও জনগণের পকেট থেকে আসে। জনতা যা উপার্জন করে তার অর্ধেক চার্চে দেয়, কিছু ভাগ জায়গীরদার আর শাসকদেরও দিতে হয়, কিছু ধার শোধ করতে হয়। তারপর যা বাকি থাকে তাতে দিন চলে না, কোন কোন জায়গায় দারিদ্র্য এত বেশি যে চোখে দেখা যায় না। অথচ সেখানকার গীর্জা খুব সুন্দর, পাদ্রী ও বিশপরাও বেশ মোটাসোটা।

বুর্জোয়া চায়, ক্রীশ্চানই হোক, হিন্দু বুর্জোয়াই হোক, সে যেন সবসময়ই নিজের শ্রেণী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। এর একটা উদাহরণ ত্রিচুরে পাবে। কয়েক বছর হলো শিবেব মন্দিরে দুটো দল হয়ে গেছে। ঝগড়া ধর্মের নয়, দক্ষিণার ভাগ নিয়ে ; এর পবিণামে পূজারীদেব মধ্যে মাথা ফাটাফাটি হয়েছে। শেষে ঠিক হয় যতদিন না এই প্রণামীর ফয়শালা হয়, ততদিন বার্ষিক মেলা বন্ধ থাকবে। এতে ক্রীশ্চান দর্শণশাস্ত্রের কোন লোকসান নেই, কিন্তু ক্রীশ্চান বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যবসায় এর প্রভাব পড়বে কেননা এরা হিন্দুদের মেলার দিনগুলিতে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করত। এইজন্যে মন্দিরের পূজারীদের সঙ্গে দেখা করে এরা তাদের মধ্যে একটা আপোষ করিয়ে দেয়। এছাড়াও মন্দিরে বিশ হাজার টাকা প্রণামী দেয় এবং পূজারীদের বাধ্য করে বার্ষিক মেলা অনুষ্ঠান করতে। এর খরচও ব্যবসায়ীরা বহন করতে রাজী হল। ফলে মেলা হল এবং যাত্রীরা লাখে লাখে শিবেব দর্শণ করল এবং যারা মেলা লাগিয়েছিল তারা লাখ লাখ টাকা মুনাফা করল। এতে খারাপই বা কি! যদি ধর্মের সাহায্যে জনগণকে লুণ্ঠন করা যায় তাহলে গুলি চালাবার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? গুলি সেই সময়ই চলে, যখন পুঁজিবাদ ঠিকমত মুনাফা করতে পারে না।

এই ত্রিচুরে মালয়ালম ভাষার প্রগতিশীল সাহিত্যের সম্মেলন ১৮ই ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে। ত্রিবাঙ্কুর আব কোচিন মিশে যাবার পর কেরলের এই অংশ মাদ্রাজের সঙ্গে রয়ে গিযেছিল। কিন্তু এই ধরনের ভৌগোলিক পরীক্ষা গণ আন্দোলনের সামনে বেশি দিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, সংযুক্ত কেরলের আওয়াজ কেরলের কোনা কোনা থেকে উঠছিল। এই আওয়াজ মজুর কৃষক আন্দোলনের আওয়াজ। এই জন্যেই বিশ্বাস হয় যে গণতান্ত্রিক কেরল হবেই এবং মালাবার ক্ষেত্র তার সঙ্গে আসবেই, যদিও তা এখনও মাদ্রাজ প্রদেশের অংশ। আজ সেখানে ইংরেজ যুগের স্পেশ্যাল পুলিশ নিযুক্ত, আর আজও কেরলের বীর সন্তানেরা অনেক কষ্টের মধ্যে সাহসের সঙ্গে নিজের ঘরে নিজের দেশে নিজের স্ত্রী কন্যার মর্যাদা রক্ষা করছেন।

এই সম্মেলনে উত্তরী মালাবারের বাহাদুর বীর কিষাণ এবং মজদুর সাহিত্যিকরা সামিল হবার জন্যে এসেছেন। ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচিন এবং উত্তরী মালাবারের সাহিত্যিক ছাত্র, সাংবাদিক, মজুর ও কিষাণ যারা নিজের নিজের ফ্রন্টে লড়াই করতে করতে সাহিত্য নির্মাণ করছেন এবং দেশের এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনকেই প্রধান শক্তি ভাবেন, তাঁরা সখের জন্যে সাহিত্য করেন না ; লড়াইকে জীবনের প্রধান প্রয়োজন বুঝে এবং লাভ অনুভব করে সাহিত্যকে নিজের রক্ত দিয়ে লালন করেন।

সম্মেলন শুরু হল শহরের টাউন হলে। প্রথম দিকে প্রতিনিধি সংখ্যা ছিলো ছ'শো। প্রথমে আমি সারা ভারত প্রগতিশীল লেখক সংঘের তরফে একটি বার্তা পড়ে শোনালাম। এরপর কমরেড অচ্যুত কুরূপ মালয়ালম সাহিত্যের সভাপতির ভাষণে স্থানীয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলেন। এর কয়েকমাস আগে কেরলের সাহিত্যিকদের

একটি সম্মেলন হয়েছিল। তাতে প্রগতিশীল লেখক সঙেঘর ঘোষণাপত্র নিয়ে বাদবিসংবাদ হয়। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। সে বিষয়ে যে কমিটি হয়েছিল তারাও কোন কাজ করেনি। বলা হয়েছিলো, কেরলে সঙেঘর কাজ শেষ হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে এই সম্মেলন ডাকা হয়েছিল, যাতে প্রগতিশীল লেখক সঙেঘর আন্দোলন আবার চালু করা যায় এবং গণ আন্দোলনকে আরও জোরদার করা যায়। ধারণা ছিল যে এই ব্যাপারে বেশ কিছু সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের তরফে যারা এই সঙঘকে নিস্কর্মা রাখতে চায়, তাদেরও মোকাবিলা করতে হবে।

প্রতিনিধিদের মধ্যে এরকম কিছু লোক ছিলেন যাঁরা ঘোষণাপত্র ও তাব শক্তিশালী পরম্পরাকে পছন্দ করতেন না। এক ধরনের পচা ডিমের খোলসের ভিতর থেকে সাহিত্য করতে চাইতেন; তাঁরা নোংরা নোংরা কামুক গল্প লিখতেন এবং এক ধরনের কবিতা লিখতেন যা পড়ে মানুষের টয়লেটে যেতে ইচ্ছে হয়। একজন এমন ভদ্রলোক ছিলেন যিনি একটি কুকুর কুক্কুরীব মৈথুনের গল্প লিখেছিলেন এবং তাকে প্রগতিশীলতার পরাকাষ্ঠা জানতেন। এই সব সাহিত্যের অনুশীলন যখন চলছে, তখন কৃষকরা না খেয়ে মরছিলেন এবং নিজের আনাজ ও পরিশ্রমের ফসল নিজেদের গোলায় তোলার জন্য জায়গীরদার, জমিদার ও পুঁজিপতিদের সঙ্গে লড়াই করছিলেন, চেষ্টা করছিলেন সংগঠিত শক্তি হিসেবে শোষণের মোকবিলা করতে। একদিকে ছিল শহীদদের রক্ত, অন্যদিকে কুক্কুর কুক্করীর কবিতা। এই সম্মেলন ডাকা হয়েছিলো যাতে লেখকরা নিজেদের রাস্তা বেছে নেন।

সাথী অচ্যুত কুরূপ কয়েকঘণ্টা ভাষণ দিলেন। তিনি নতুন ঘোষণা পত্রের সমর্থনে বললেন এবং খুব জোবের সঙ্গে বললেন। কুরূপের উচ্চতা মাঝারি, রোগা, পটকা, শ্যামবর্ণ, চোখের ভুরু ঘন, ছোট ছোট চোখে বুদ্ধিমত্তার ব্যঙ্গ খেলা করে। এই ব্যঙ্গ অনেক বক্তৃতাতেও দেখা যায়। তিনি তাঁর ভাষণে কিছু চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন না, বরং হাসিয়ে শ্রোতাকে নিজের পক্ষে আনেন, তাঁর বিশ্লেষণ মার্কসবাদ এবং ব্যঙ্গে ভরপুর ; সে এইভাবে কয়েকঘণ্টা বক্তৃতা দিতে পারে কারণ তার বলার অনেক কিছু আছে। হিন্দু দেবদেবীর অনেক পুরনো দৃষ্টান্ত তাঁর মনে আছে এবং তা তিনি পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে বলতেও পারেন। এই ধরনের উদারহণ দক্ষিণ ভারতীয়দের মনে পেরেকের মতো বসে যায় যেহেতু তারা নিজেদের দেবদেবীদের ঘনিষ্ঠ ভাবে। কুরূপের বক্তৃতার দু একটি দৃষ্টান্ত আমার মনে আছে। কুরূপ বললেন—'আমরা সাহিত্যের সত্য এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের উপর জোর দিই, দিয়ে আসছি। কিন্তু এই সময় আমরা আমাদের আসল শত্রু অর্থাৎ শোষণকারী শ্রেণীকে ভুলে যাই। আমরা সেই ধরনের সাহিত্য সৃজন করি না, যা তার ঘোমটা খুলে দিতে সক্ষম। বিষয়টি বিস্তারিত করতে গিয়ে কুরূপ ক্রীশ্চানদের গল্প শোনালেন। রাস্তার উপর কেউ একটি গাভী পায়, তার গলায় লম্বা দড়ি বাঁধা। ক্রীশ্চান প্রথমে তাকে দড়ি ধরে বাড়ি নিয়ে এল। সেখানে তার মনে পাপ ঢুকল। তখন সে গাভীটিকে বড়ো দড়ি ধরে টেনে পাদ্রীর কাছে নিয়ে এল। পাদ্রী বড়ই ধার্মিক। সে ক্রীশ্চানকে বলল, গাভীটিকে রাস্তায় যেখানে পেয়েছে, সেখানে গিয়ে সে যেন মালিককে সাতবার ডাকে। মালিকের খবর

না পাওয়া গেলে সে গরুটিকে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে পারে। ক্রীশ্চান তাই করল। রাস্তার উপর জোরে জোরে চেঁচাতে লাগল—একটি লম্বা দড়ি, একটি লম্বা দড়ি, তারপর খুব ধীরে ধীরে বলল, যার মাথায় একটি গরু বাঁধা আছে। সাতবার এই কথা বলে ক্রীশ্চান গরু নিজের ঘরে নিয়ে গেল।'

কুরূপ বললেন, প্রগতিশীলদের লম্বা দড়ি হল সাংস্কৃতিক বিকাশ। তার উপরই আমরা জোর দিই। লেখায় সেই সম্বন্ধেই জোরে জোরে চীৎকার করতে থাকি। কিন্তু যেখানে গাভীর সম্বন্ধ অর্থাৎ বিপ্লব বিরোধীদের মোকাবিলা করার কথা অর্থাৎ মূল থেকে উপড়ে ফেলা দরকাব, সেখানেই আমাদের আওয়াজ নীচু হয়ে যায়। এইভাবে ফর্ম এর বিষয় বলতে গিয়ে তাদের এক হাত নিলেন যারা ফর্ম সৌন্দর্যের সব কিছু মনে করেন, আর যাদের কাছে বিষয়বস্তুর কোন গুরুত্ব নেই। রূপবাদীদের নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতে গিয়ে কুরূপ হিন্দু দেবদেবতার পুরোনো শিল্পী তীর বাজুথন এর উল্লেখ করেন, যিনি একবার সিদ্ধির নেশায় একটা বড় ঝাঁটা হাতে নিয়ে তার একটা দিক গোবরে ডুবিয়ে সেটা দেওয়ালের উপর আছড়ে মারেন। আর লোকেরা দেওয়ালে তাই দেখে তীর বাজুথনকে জিজ্ঞাসা করলো—'এটা কি?'

শিল্পী বললো—'এটা ঘোড়ার লেজ।'

লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো—'ঘোড়া কোথায়?'

তীর বাজুথন উত্তর দিলেন—'ঘোড়া, ঘোড়া দেওয়ালের অন্য দিকে।'

রূপবাদীদের গদ্য এবং পদ্যের শৈলীও তীর বাজুথনের এই শাস্ত্রের মত যা তাঁরা গোবর দিয়ে সৃজন করেছিলেন।

কুরূপ মলয়ালমের এই প্রতিক্রিয়াবাদী লেখকদের তীব্র ব্যঙ্গ করলেন। এর সঙ্গে তিনি বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে নতুন ঘোষণাপত্রের গুরুত্ব বোঝালেন।

কমরেড ইন্দুচুড়নও নতুন ঘোষণাপত্রকে আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলেন। ইন্দুচুড়ন আর কুরূপ-এর ধারণা ছিল যে প্রতিক্রিয়াবাদীদের তরফ থেকে নতুন ঘোষণাপত্রের প্রবল বিরোধিতা হবে, সেইজন্য তাঁরা তাঁদের বক্তৃতায় পুরো সময় সম্ভাব্য আপত্তির উত্তর দিতেই লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু আপত্তি এল ডান দিক থেকে নয়, বাম দিক থেকে। কিছু প্রতিক্রিয়াবাদীরা তো খেলা তাদের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে অতি উগ্রবাদী হয়ে আপত্তি তুললো। পরে যে বাদানুবাদ হলো, তাতে কৃষক মজদুর সাহিত্যিকরা পুরো অংশগ্রহণ করলেন। তারা প্রকৃত পক্ষে ঘোষণাপত্রের উথলে ওঠা বিপ্লবী তাপ এবং তেজকে কমই অনুভব করতেন। নতুন ঘোষণাপত্রের উপর যে বাদবিবাদ হল তাতে প্রায় পঁচিশ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহন করলেন। অনেকের মতে এই ঘোষণাপত্রে কেরলের শহীদদের এবং মালাবারের সাহসী লড়াকুদের আত্মা নেই। তারা আরও বেশী তীব্র এবং আর বিপ্লবী ঘোষণাপত্র চাইলেন।

কমরেড ইন্দুচুড়ন নিজের উত্তর দেওয়া অভিভাষণে ঘোষণাপত্রের সমর্থনে জোরদার ভাষণ দেন। তিনি বলেন—'আমাদের এই ঘোষণাপত্র স্বীকার করে নেওয়া উচিত। এই ঘোষণাপত্র আমাদের লড়াই এর শুরু, শেষ নয়। আমাদের এই সময় এতে সংশোধনী প্রস্তাব রেখে, আমাদের নিজেদের সারা ভারত গণতান্ত্রিক মোর্চা থেকে

আলাদা রাখা উচিত নয়, বরং ভারতের অন্য অংশকে সঙ্গে নিয়ে লড়াইকে এত শক্তিশালী করা উচিত যাতে আমরা নতুন ঘোষণাপত্রেব আরো আগে যেতে পারি এবং আমাদের বন্ধুদের তার জন্য তৈরী করতে পারি।'

দুদিনের লাগাতার বাদবিবাদের পর নতুন ঘোষণাপত্র সর্বসম্মতিতে পাশ হল। অন্য প্রতিনিধিদের বক্তৃতাতেও সম্মেলনের বিপ্লবী ভাবনার ছাপ ছিল।

একজন ছাত্র শ্রীধর তার বক্তৃতায় বললো—'সেই বিপ্লবী সাহিত্যিকই ভাল সাহিত্য রচনা করতে পারেন, যিনি গণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে, পদে-পদে শ্রেণী সংগ্রামে অটল থাকেন।'

অশোক একজন ক্ষেতমজুর কবি। সে হরিজন এবং পমিয়া জাতের, যাদের হিন্দু সমাজে নিকৃষ্ট মানা হয়। অশোক নিজের বক্তৃতায় সাহিত্যে শ্রেণী সংগ্রামের উপর জোর দেয় এবং বলে সাহিত্য 'শ্রেণী'-র বাইরে নয়। সে কোন-না-কোন শ্রেণীর অবশ্যই পক্ষ নেবে—তা প্রত্যক্ষই হোক বা লুকিয়ে চুরিয়ে। প্রগতিশীল লেখকদের কর্তব্য হল, সোজাসুজি মজুর কিষাণের জন্য লেখা এবং তাদের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা।

একজন মালাবারী মজুর উঠে জিজ্ঞাসা করলো—'আপনারা যদি সর্বহারা শ্রেণীর জন্য লেখেন, তাহলে আমাদের পতাকা ব্যবহার করেন না কেন?'

এইভাবে কে. নারায়ণম যিনি উত্তরী মালাবার থেকে এসেছিলেন, একজন প্রতিক্রিয়াবাদীর বক্তৃতার উত্তর দিতে দিতে বললেন—'তুমি বলছো যে জনগণের সাহিত্যিকদের সাহিত্য যাচাই করার অধিকার নেই। এটা তুমি কোন মুখে বল? তুমি তো শুধু লেখ, আমরা আমাদের রক্ত দিই!'

ইন্দুচূড়ন বললেন—'এই ঘোষণাপত্র সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীদের কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছে, কারণ কংগ্রেসী শাসন এখন সামাজিক উন্নতির সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাদ্রাজ প্রান্তের একজন মন্ত্রী কে. মাধব মেনন কিছুদিন আগে বলেছিলেন যে সাম্যবাদীদের সাহিত্যের প্রাচীন পরম্পরার কোন যোগ নেই এবং গণসাহিত্যের সঙ্গেও তাদের কোন সম্পর্ক নেই। এই মিথ্যা অভিযোগের উত্তরে কেবল এটাই বলতে চাই যে এটা সাম্যবাদী শাসন নয়, কংগ্রেসী শাসন, যা সংস্কৃতি এবং গণতন্ত্রের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাদ্রাজ পুলিশ উত্তর মালাবারের কত পাঠাগার, দোকান আগুনে ছাই করে দিয়েছে। এই সব পুস্তকালয়ে শত শত বই ছিলো, রামায়ণ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক প্রগতিশীল সাহিত্য অবধি। এই সব বইগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, নাৎসীরাও বার্লিনে বই জ্বালিয়েছিল। আজকের সংস্কৃতির দুষমন আমরা নয়, তারাই, যারা লাইব্রেরী জ্বালায়, আমাদের খেলাধূলা আর নাটকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে, যারা প্রগতিশীল পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেয়, যেগুলি ইংরেজের শাসনকালেও বাজেয়াপ্ত হয়নি। আজ কেরলেই কয়েক ডজন প্রগতিশীল লেখক জেলের কালো কুঠরিতে বন্ধ। এসব কি সংস্কৃতি প্রেম থেকে হচ্ছে? আমি বলছি, যতদিন ভারত এই কংগ্রেসী শাসনের নতুন দাসবৃত্তি থেকে স্বাধীন না হবে, ততদিন আমাদের সংস্কৃতিও স্বাধীন হতে পারবে না।'

ঘোষণাপত্র স্বীকৃতি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি মজার ঘটনা ঘটলো। মিস্টার ভি. ভি. বলাথ যিনি মলয়ালম ভাষার সাহিত্যিক, আর যাঁর নগ্ন এবং কুৎসিত গল্প লেখার শখ ছিল, তিনি মঞ্চে এসে তাঁর ভুল স্বীকার করলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে ভবিষ্যতে তিনি তাঁর অসামাজিক চালচলন বদলে ফেলবেন এবং নতুন ঘোষণা অনুসারে চলার চেষ্টা করবেন।

এর পর কে. এম. অহমদ এলেন। গম রংয়ের সুন্দর যুবক, নীল রংয়ের সুন্দরজামায় সোনার বোতাম লাগানো। পোষাক মলয়ালী ধুতি এবং জামা, কিন্তু জামা কাপড় দুই-ই দামী। মঞ্চে এসে ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিল মলয়ালমে। দু মিনিটে হল হাততালিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। জানা গেল সম্মেলনের কাজকর্মে প্রভাবিত হয়ে প্রগতিশীল লেখক সংঘকে এক হাজার টাকা দান করেছেন। ইন্দুচুড়ন অত্যন্ত খুশী হয়ে আমায় বললো—'ভাই আমার তো চিন্তা হচ্ছিল, কারণ আমাদের বাজেট ঘাটতিতে চলছিল। ভাবছিলাম পুরো বিল আমরা কি ভাবে শোধ করব। কিন্তু এই বন্ধু এসে সব সমস্যার সমাধান করে দিল।'

যে দুদিন ঘোষণাপত্রের উপর বড় বাদবিবাদ হল, সেই দু দিন রাতে, টাউন হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হল। অনুষ্ঠান ত্রিচুরের জনগণের খুব ভাল লাগলো।

পর্দা সরাতেই চোখে পড়লো ভারতবর্ষের মানচিত্র লাল হয়ে গেছে আর একটি মেয়ে লাল পতাকা হাতে নিয়ে 'জন গণ মন'র সুরে গান গাইছে। পরে জানা গেল এই গান আলেপ্পির একজন মজদুর কবি লিখেছে, যে নারকেলের দড়ি বেলার কাজ করে। আলেপ্পির শিল্পনগরীর মজদুরদের একটি সাংস্কৃতিক দল এসেছিল। দুটি মেয়ের বসন্ত নৃত্য খুব ভাল হয়েছিল। মালয়ালম ভাষার প্রসিদ্ধ নাট্যকার প্রেমজীর লেখা একটা নাটক মঞ্চস্থ হল, যা ধনী কিষাণ-জীবণ সম্পর্কিত। তাতে ধনী কৃষকের ভূমিকায় স্বয়ং প্রেমজী অভিনয় করছিলেন। এই ধরনের চরিত্রে এত সাবলীল অভিনয় আমি আজ অবধি দেখিনি। আমি মলয়ালম ভাষা একেবারেই জানি না। তবুও প্রেমজীর চেহারার ভাবের আরোহন—অবরোহন, তাঁর হাতের ইঙ্গিত, অভিনয়ের অভিব্যক্তি এমন ছিল যে আমি নাটকের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম ব্যাপার বুঝতে পারছিলাম। মুসলমান চাষীর ভূমিকা পি. কুঞ্জনী অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে অভিনয় করছিলেন। এই দুই শিল্পীর অনবদ্য অভিনয়ের জন্য নাটক দর্শকদের হৃদয় অধিকার করে নিল। নাটকের শুরুতে ধনী কৃষকের তুলনায় গরীব কৃষকের দারিদ্র দেখান হয়েছে—এখানে সে স্বয়ং নিজের শিকলকে ভালবাসে। শেষে গরীব চাষীর ছেলে, ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরে এবং ক্ষেত মজদুররা যুথবদ্ধ হয়ে ধনী কৃষকের জমি কেড়ে নেয় এবং তাতে লাঙ্গল চালায়। আমার মতে এই নাটকটি মালয়ালম ভাষার একটি খুবই ভাল নাটক এবং আমি মনে করি এর অনুবাদ ভারতের অন্য ভাষায়ও হওয়া উচিত। প্রত্যেক প্রান্তের গণনাট্য সঙ্ঘের জন্য এই নাটকটি খুবই প্রয়োজনীয়। এ নাটক ছাড়াও 'অপারেশন অ্যাসাইলম'-এ একটি উপমা দেখানো হয়েছিল ছায়াচিত্রের মাধ্যমে। এতে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ এর তথাকথিত স্বাধীনতার পেছনের সত্য উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছিল এবং কংগ্রেস, লীগ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যৌথ খেলার আসল রূপ উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছিল। খুব কম সময় থাকার জন্য এই ছায়াচিত্রগুলি নেওয়ার আগে ভাল

ভাবে রিহার্সাল দেওয়া হয়নি। এর ফলে এই ছবিগুলিতে এক ধরনের অসংবদ্ধতা ছিল, ফলে তা বিশেষ প্রভাব ফেলেনি। কিন্তু তাও সব মিলিয়ে এই নাটক এবং কৃষকের গণতান্ত্রিক লড়াই তার শক্তিকে ভালভাবে তুলে ধরেছিল।

কিন্তু যা সারা টাউন হলে বিদ্যুতের মত তরঙ্গ ছড়িয়ে দিল, তা একটি ছোট্ট দু মিনিটের দৃশ্য যাতে 'ভায়লার'-এর শহীদরা আবার জেগে ওঠেন,—সেই চারশো মজদুর, যাঁরা কেরলের স্বাধীনতার জন্য স্যর সি. পি-র সঙ্গে মোকাবিলা করেছিল, যাদের আজকের এই সময়ের কংগ্রেসীরা অত্যতম গর্বের সঙ্গে নিজেদের শহীদ বলেন। যখন এই শহীদরা কঙ্কাল হয়ে রাতের নিস্তব্ধতায় নিজেদের কবর থেকে উঠে কোনরকমে মঞ্চের এক ধার থেকে অন্য ধার অবধি এসে দাঁড়ান, আবার তাঁরা দুষমণের গুলি খেয়ে পড়ে যান, আমি আপনাকে বলতে পারব না দর্শকদের উৎসাহ কি পর্যায়ে পৌঁছাল ; সে কল্পনাতীত। কয়েক মিনিট ধরে লোকেরা হলে মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলে ভায়লারের শহীদদের জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। উথলে ওঠা রাগ আর গর্জনে মনে হচ্ছিল যেন টাউনহলের ছাদ উড়ে যাবে, আর গগনচুম্বী স্লোগান সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে।

ভায়লারের যে জঙ্গী সাহসী বাহাদুর মজদুর ও কৃষকদের আত্মবলিদানের উপর দাঁড়িয়ে কংগ্রেস ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে কাজ হাসিল করেছিল, আজ সেই ভায়লারের শহীদদের কেরলের কংগ্রেসীরা একেবারেই ভুলে গেছে। কংগ্রেসীদের মধ্যে কেউ কেউ কাগজে লিখে খোলাখুলি শহীদদের অপমান করেন, কেউ কেউ বলেন শহীদদের রক্ত দেবার দরকার ছিল না। কংগ্রেসী নেতারা শক্তি ও শাসনের গর্বে একথা ভুলে গেছে যে তাঁদের সাফল্যের সিঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াতে ভায়লারের শহীদদের অবদান কতখানি! অবশ্য কংগ্রেসী মন্ত্রী এবং নেতারা হৃদয় থেকে ভায়লারের শহীদদের প্রশংসা করেন, যদিও সেই সব নজরবন্দীদের ছাড়েন না, যাঁদের লড়াইয়ের সময় স্যর সি.পি গ্রেপ্তার করেছিল। যদিও স্যর সি.পি কংগ্রেসের কট্টর দুষমন, তবু তাকেই তারা দিল্লীতে মন্ত্রীদের রাষ্ট্রীয় ভোজে আমন্ত্রণ করে, ভারত আমেরিকা সম্মেলনে সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে সামিল করে। স্যর সি.পি মাদ্রাজ রেডিওতে সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেন। সেই সংস্কৃতিতে এখনও শহীদদের রক্তের গন্ধ ভেসে আসে। ভায়লারের পবিত্রভূমিতে এখনও নিহতদের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। এখনও ভায়লারের নারকেল গাছে সি.পি-র সৈনিকদের চালানো 'দমদম' কার্তুজের তৈরী করা গর্ত খুঁজে পাওয়া যাবে। সেই কার্তুজ গাছের গুঁড়িকে দশ ইঞ্চি লম্বা চওড়ায় জখম করেছে। মানুষের বুকে লাগলে কি হতো? এরই গল্প 'শহীদরা জেগে আছে'।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন এই খবর ছড়াল যে পুলিশ সভা নিষিদ্ধ করে দেবে, নিষেধ না মেনে সভা চালালে পুলিশ গুলি চালাবে। প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘের কর্মীরা এই গুজবে কান দিলেন না এবং সাধারণ সভার কাজ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। সাধারণ সভায় সন্ধ্যের সময় আমাকে বক্তব্য রাখতে বলা হলো। কিন্তু কয়েকটি প্রস্তাব বিষয়ে প্রতিনিধিদের মতামত নেবার দরকার ছিল।

সভাপতির পক্ষ থেকে তিনটি প্রস্তাব রাখা হলো এবং সবকটিই সর্বসম্মতিতে গ্রহণ করা হলো।

এক. কমরেড স্তালিনের সত্তরতম জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।
দুই. কেরলের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।
তিন. নয়াগণতান্ত্রিক চীনকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

মজদুরদের দাবী সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করলেন শ্রী গোপাল। তিনি নিজেই একজন মজদুর। নাগরিক অধিকার সম্পর্কে যে প্রস্তাব পাশ হলো তা রাখলেন কে. জি. পদ্মনাভন—তাঁর গল্প বেশ বিচিত্র। সে একদিন বিল্লুরে যখন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছিল, তখন পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে এবং থানায় নিয়ে গিয়ে বলে—'বাচ্চাজী, এবার আপনি ভায়লারের শহীদদের গান গান'। পদ্মনাভন প্রথমে চুপ করে ছিলেন। কিন্তু পুলিশরা জেদ করায় তিনি শহীদদের নামে অত্যন্ত ভালো একটি গান শুরু করলেন। প্রথম পংক্তিটি গাইছেন—তখন পুলিশরা তাঁকে থামিয়ে বেধড়ক পেটাল এবং বলল 'আবার গাও'। আবার পদ্মনাভন দ্বিতীয় পংক্তি গাইলেন, তৃতীয়, চতুর্থ পংক্তি গাইলেন। প্রতিবার পুলিশ তাকে থামিয়ে থামিয়ে পেটাতে লাগল। গানটি অনেক লম্বা। কিন্তু পদ্মনাভন ঠিক করেছিলেন গান পুরো শেষ করে থামবেন। ফলে যখন তিনি শেষ পংক্তিতে পৌঁছলেন তখন তাঁর শরীর রক্তে ভরা। তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

সেই ব্যক্তি এই এখন ত্রিচুরের টাউন হলে নাগরিক স্বাধীনতা সম্পর্কে বলছিলেন। এই বিষয়ে বলার অধিকার সে রক্ত দিয়ে অর্জন করেছিল।

আমার মনে কেবল শ্রীধরের কথাটি গুঞ্জরিত হতে লাগল—'তোমরা তো কেবল লেখো, আমরা রক্তও দিই, আমরা রক্তও দিই।'

সংযুক্ত কেরলের প্রস্তাব পেশ করলেন পি. রামচন্দ্রন। কেরলে ফাঁসির সাজার প্রতিবাদে একজন মজদুর প্রস্তাব পেশ করলেন। সে উত্তরী মালাবার থেকে এসেছিল। আমি তার নাম জানিনা, শুধু এটুকু জানি যে সেই সদস্য লড়াইয়ের ময়দান থেকে এসেছে। তার শরীরে তখনো পুলিশের আঘাতের চিহ্ন। তার থুতুর সঙ্গে এখনও রক্ত পড়ে। তাঁকে যাঁরা দেখেছিল, তাদের ধারণা ছিল এক মাসের মধ্যে সে নিজেই শহীদ হয়ে যাবে। কিন্তু জানিনা কিভাবে সেই হাড়ের খাঁচায় বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা গিয়েছিল। সে গর্জন করে নিজের জীবনের শেষ নিঃশ্বাস গুনে তেলেঙ্গানার বাহাদুরদের এই সম্মেলন থেকে সম্মান জানাচ্ছিল। সে জানত তার আয়ু বেশিদিন নেই, তার বিশ্রামের প্রয়োজন, চোখে তার কোমল দৃষ্টি। কিন্তু সে তো দেশের সেপাই, নতুন সমাজের বনিয়াদের জন্য নিজের জীবনের শেষটুকু পর্যন্ত সে নিংড়ে দিচ্ছে। সে নিজেকে বিপ্লবের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছে। তেলেঙ্গানার জন্য এর থেকে ভালো আর সেলাম জানানোর লোক ছিলো না—যে লোক শুভেচ্ছা লেখে আর রক্তও দেয়।

এক এক করে সব প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। কেরলের জাতীয় সাহিত্যিকদের এই সম্মেলন বিনা বাধায় শেষ হল। কাল প্রতিনিধিরা নিজের নিজের ঘরে ফিরে যাবেন; আর কেরলের গ্রাম শহরে নতুন সাহিত্য নিয়ে আলাপ আলোচনা করবেন। আমি এইসব ভাবছিলাম—হঠাৎ ইন্দুচূড়ণের আওয়াজ এলো—'বন্ধুগণ, এক্ষুনি খবর পাওয়া

গেছে যে আমাদের সাধারণ সভার জায়গা সশস্ত্র পুলিশ ঘিরে ফেলেছে।' সারা হলে নিঃস্তব্ধতা নেমে এলো। ফর্সা রঙের চৌকস ইন্দুচুড়ণের বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ কেতাবী চেহারায় চমক খেলে গেল। সে হেসে প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসা করল, 'এখন আপনাদের কি ইচ্ছে?'

হল থেকে হাজার কণ্ঠে আওয়াজ উঠল—'সভা হবে'।

ইন্দুচুড়ণ গর্জন করে বললেন—'হ্যাঁ, সভা হবে। নিশ্চয় হবে৭ কিন্তু কিভাবে হবে? তাড়াতাড়ি নয়, ঘাবড়েও নয়, এই সভা খুব সরলভাবে, খুব ভালভাবে বীরত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে হবে, যেমনভাবে আমাদের দুদিনের সম্মেলন হয়েছে। কিন্তু এই সঙ্গে এও যেন মনে থাকে, আমাদের অতিথিদের রক্ষা করতে হবে।'

ইন্দুচুড়ণ বলল, 'এর অর্থ আপনারা ভালভাবে জানেন, আমার ভলান্টিয়ার চাই। বুকে গুলি খেলেও যে কৃষণ চন্দরকে সুরক্ষিত বাখবে। এমন ভলান্টিয়ার চাই যারা গুলি খেয়ে মরে যাবে, কিন্তু কৃষণ চন্দরকে সুরক্ষিত রাখবে।

হলে এক হাজার আওয়াজ গর্জে উঠল—'প্রথমে আমরা মরব, তারপর কেউ কৃষণ চন্দরের গায়ে 'হাত' দিতে পারবে।'

হলে এক হাজার লোক দাঁড়িয়ে গেলেন, এক হাজার ভলান্টিয়ার একজন মানুষের জীবন রক্ষার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন, একজন মানুষের জন্য এক হাজার জন জীবন দিতে তৈরী। সেই হলে এক হাজার লোকেদের মধ্যে একজনেরও পেট কামড়ালো না, কেউ চুপচাপ বেরিয়ে পালিয়ে যাবার কথা ভাবলো না; সবাই নিজেব জায়গায় দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিতে লাগল।

মিষ্টি হাসিতে ইন্দুচুড়ণের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আগামী লড়াইয়ের ভাবনা তাকে সতেজ করে তুলল। সে আস্তিন গুটিয়ে বলতে লাগল—'এইভাবে নয়, সবাই বসে যাও, আমি বলছি।'

সবাই নিজের নিজের জায়গায় বসে গেল। ইন্দুচুড়ণ বলল, 'আমি চাই আপনারা হল থেকে বেরিয়ে বিশৃঙ্খল মিছিলের মতো পাবলিক পার্কের দিকে যাবেন না ; বরং দশ পনেরো জনের দল তৈরী করে আলাদা আলাদাভাবে সাধারণ সভায় পৌঁছবেন। সেখানে পৌঁছে মঞ্চের আশেপাশে স্কোয়াড়ের মত বসে যাবেন।'

লোকেরা 'হ্যাঁ' বলে মাথা নাড়ল। এর পরে ইন্দুচুড়ণ আলাদা আলাদা দলকে বোঝালেন কি করবে, কিভাবে সংগঠিত হবে, সভার উপর নিয়ন্ত্রণ কিভাবে রাখা হবে। এইসব কিছু বোঝাবার পর তিনি দলগুলিকে হল থেকে বেরোবার আদেশ দিলেন।

সবার আগে মেয়েদের দল বেরোল। পুরো হল হাততালিতে ভরে গেল। আমার চোখ ছলছল করতে লাগল। আমি নিশ্চিত জানতাম, আমি এত ভালবাসার যোগ্য নই। কিভাবে একজন এত বিশাল ভালবাসা ও সম্মানের অধিকারী হতে পারে। দ্বিতীয় দল ত্রিচুরের সাথীদের। তৃতীয় দলে ছিলেন উত্তরী মালাবারের মজুর ও কৃষকরা, ত্রিবান্দ্রামের বাহাদুর ছাত্ররা দল বেঁধে মার্চ করছিল।

কোয়েলুরের সাথীদের মধ্যে ছিল জি. ফিলিপস। তিনমাস হয়নি তার বিয়ে হয়েছে। সে হেসে আমার পাশে পাশে হাঁটতে থাকল। আমি তার হাত ধরে বলাম, 'এসব বড় বিচিত্র লাগছে, যদিও এর সঙ্গে আমার নয় সারা প্রগতিশীল সাহিত্যের

. মর্যাদা জড়িত। তার সঙ্গে ব্যক্তি হিসাবে আমি জুড়ে গেলাম।' জি. ফিলিপস হেসে আমার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এবার এগোলেন আলেপ্পির প্রতিনিধিরা। এইভাবে আট দশ, বারো, পনেরো কুড়ি জনের প্রতিনিধি দলগুলি হল থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলেন; আর পাবলিক পার্কের দিকে এগোতে লাগলেন—পাঞ্জাবী লুঙ্গির মতো করে পরা, নিজেদের ধুতি হাঁটুর উপর উঠিয়ে বেঁধে নিলেন এবং বেশ হাসতে হাসতেই এগোতে থাকলেন। আমি শেষ দলে ছিলাম।

আমরা যখন পাবলিক পার্কে পৌঁছলাম, তখন সেখানে বিশ হাজার লোকের ভিড়। পুলিশেরও দেখা নেই। পরে জানা গেল অবস্থা বুঝে তারা সিদ্ধান্ত বদল করে।

আমার সামনে বিশ হাজার লোক, পেছনে শিবের মন্দির, পেছনে অতীত আর সামনে ভবিষ্যৎ। আমি দুয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম এ কোন শক্তি যা মানুষকে এখানে টেনে এনেছে, তারা কারা যারা বলে জনগণ সাহিত্য ভালোবাসে না? এই বিশ হাজার লোক কি জন্যে এখানে জড়ো হয়েছে? আমার দিকে তাকিয়ে আছেন বিশ হাজার আশাভরা মানুষ, বিশ হাজার চেহারা আমার কাছে কি খুঁজছে? আমি অনুভব কবলাম, এরা প্রত্যেকেই সাহিত্যিক, প্রত্যেকেই নিজের চেহারায় একটা গল্প লিখে এনেছে। এদের গল্প আলাদা হলেও শেষ পর্যন্ত একই রকম। নিরাশা ও উৎসাহহীনতার গল্প, দীর্ঘকালের অনুসন্ধিৎসু চোখ ও ঠোঁটের কাহিনী, শতাব্দীর আকাশের ক্ষিদে ও নগ্ন পিপাসার কাহিনী, যাতে প্রেম মারা গিয়েছিল, মর্যাদা লুণ্ঠিত হয়েছিল; আর সরলতা তাদের নিঃস্ব করে দিয়েছিল। এই ঘটনা আমি প্রথমে কাশ্মীরে দেখেছিলাম, তারপর পাঞ্জাবে, দিল্লীতে, আবার বোম্বেতে, আবার বাংলায় দেখেছি ; এতো সেই পুরনো গল্প, ভারতের গরীব দুঃখী মানুষের গল্প ....

হঠাৎ কেউ আওয়াজ দিল—ইনক্লাব জিন্দাবাদ,

হঠাৎ সকলের চেহারা বদলে গেল, যেন বিশ হাজার চেহারা অতীতের ধূলোমাটি আর সন্ধ্যার লালিমা মেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন আকাশে ওড়া শাদা মেঘ সূর্যের কিরণে বিচ্ছুরিত হয়ে রঙিন হয়ে গেছে; এখন প্রত্যেকের চেহারাই আনন্দে সোনালী গোলাপ—খুশীতে উজ্জ্বল, সর্বহারা মজুর কিষাণ সাহিত্যিকদের ভয়হীন লড়াকু চেহারা। তুমি তো আমার কাছে অপরিচিত নও, তুমি তো ভারতের ভবিষ্যৎ, উত্তর থেকে দক্ষিণ অবধি। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ভারতের সৌভাগ্যের লাল আকাশে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আমার মনের কথা বিশ হাজার হৃদয়ের গতির সঙ্গে হারিয়ে গেল। আমি ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলাম—'সাঁথিয়ো, দোস্তো!!........'

বেলিপট্টম-এর ওপারে মাদ্রাজ প্রান্তে আছে 'চরকুল' নামের একটি তালুক। ঐ তালুকের চারজন প্রতিনিধি ছিলেন এই সম্মেলনে। এর তিনজন উত্তরী মালাবারের কৃষক কবি। চতুর্থজন লিখতেন সাহিত্য প্রবন্ধ। এঁর নাম ভি. কৃষ্ণ। বাকি তিনজনের নাম—'পি রাঘবন, পি নারায়ণ, আর কে. নারায়ণ'। সবাই যখন সাধারণ সভা থেকে

নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের নিজের হোটেলে ফিরে গেলেন, তখন এঁরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

পি. রমন মেনন, যিনি এই সম্মেলনে সংযুক্ত কেরলের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, আর আমাদের সঙ্গেই থাকতেন, আমাকে বললেন, 'উত্তরী মালাবারের জঙ্গী সাথীরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক। আসুন আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

ভি. কৃষ্ণ মাঝারি গড়নের মজদুর; পরনে নীল জামা আর নীল নেকার। হাসলে মনে হত সে যেন সন্দেহের চোখে দেখছে। রাঘবনের রঙ কালো, পি. নারায়ণের বর্ণ গোধূম। কে. নারায়ণ লম্বায় ছ' ফুটের উপর। চোয়াল বাইরে বের করা, কপাল ভেতরেব দিকে ঢোকানো। চেহারা আলাদা আলাদা হলেও দৃঢ়তা গভীরতা ও চোখের সন্ধানী দৃষ্টি এক। এদের দেখে মনে হয় সবাইকে যেন একটা কালো পাথর কেটে গড়া হয়েছে। অর্থাৎ কেরলের পাথরের মতোই কেরলের মানুষ, কেরলেব গাছের মতোই কেরলের অধিবাসী। অর্কনাটের সিধে খাড়া কঠিন কাণ্ড সমুদ্রের বড়ো বড়ো তুফানেও উৎখাত হবে না।

ভি. কৃষ্ণ হিন্দীও ভালো জানতেন। সে বোম্বাই, নাগপুর, মাদ্রাজের ফ্যাক্টরিতে কাজ করেছে। সে আমাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করছিল।

আমি প্রথমে ভি. কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলাম—'তুমি তো মজুর, দিনে দশ-বারো ঘণ্টা পরিশ্রমের পর সাহিত্যের জন্যে সময় বের করার শক্তি পাও কোথা থেকে?'

ভি. কৃষ্ণ উত্তর দিল, 'প্রথমে আমিও সাহিত্যকে সেভাবেই ভাবতাম—সময়ের অপচয়, কিন্তু যেমন যেমন আমাদের সংগ্রাম বাড়তে লাগল, সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের চেতনাও বাড়তে থাকল; আমি অনুভব করলাম, সাহিত্য আমাদের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাবার খুব ভাল মাধ্যম হতে পারে। কিন্তু সত্যিকারের চোখ খুলল, পুলিশ যখন আমার ঘরে হামলা করে আমার লাইব্রেরী তুলে নিয়ে গেল।'

—'তোমার লাইব্রেরী'? আমি আশ্চর্য চকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

কৃষ্ণ আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমার পৌনে চারশো বই ছিল। এর জন্যে আমি আটশো টাকা খরচ করেছি। এই লাইব্রেরী আমার পনেরো বছরের মজুরীর থেকে পাওয়া, পনেরো বছর আমি সিনেমা দেখিনি, ভালো কাপড় পরিনি, নেশা করিনি। এর থেকে যা বাঁচত, তা জুড়ে জুড়ে আমি বই কিনতাম। তারপর একদিন পুলিশ আমার ঘরে হামলা করল। সব বই নিয়ে গেল। এতে নেহেরুর বই 'ভারত সন্ধানেও' ছিল। ছিল পাম দত্তের 'আজকের ভারত'। পুলিশ একটি পৃষ্ঠাও ছেড়ে যায়নি। সেইদিন বুঝলাম, আমাদের সাহিত্য কত মূল্যবান, কত বিপজ্জনক। বাদশার বিশেষ মালাবার পুলিশও একে ভয় পায়।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'মালাবারে এখনও স্পেশ্যাল পুলিশ আছে?'

—যখন ইংরেজ শাসন ছিল তখন পুলিশ আমাদের মাথার উপর ছিল। এখন কংগ্রেস রাজত্ব—এখনও পুলিশ আমাদের মাথার উপর মজুত রয়েছে।'

পি. নারায়ণ হেসে বলল, আমাদের জায়গাটাই স্পেশ্যাল। তাহলে স্পেশ্যাল পুলিশ থাকবে না কেন? আমাদের চরকুল তালুকের রাজা তার শোবার ঘরের চারপাশে ইলেকট্রিক তার লাগিয়ে শোয়। জনগণের মধ্যে সে এতই জনপ্রিয়। যখন

মালাবারের কৃষকদের ধান না দেবার আন্দোলন শুরু হল, তখন প্রথম গুলি আমাদের দিকেই চালিয়েছিল। কিন্তু এই গুলি চালানোর গল্প বড়ই বিচিত্র।

—কি ব্যাপার?

লম্বা চওড়া কে. নারায়ণ এখনও পর্যন্ত চুপ করে ছিল। বলল, 'আমি সেই আন্দোলনে শরিক ছিলাম। সেই বছর ক্ষেতে ধান খুব কম হয়েছিল। ডিসেম্বরে কম হয়েছিল, সেপ্টেম্বরে অনেক কম হয়েছিল।'

—'তোমাদের জমি কি দু ফসলী'?

—'হ্যাঁ', কে নারায়ণ আমাকে ছোট ছেলের মত বোঝাতে লাগল। 'আমাদের মনসুনে দুটো ঋতু। এক ঋতুর মনসুন বঙ্গোপসাগর থেকে ভেজা হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে আসে, দ্বিতীয় মনসুন আরব সাগর থেকে। সে বছর দু ফসলই কম হয়েছে। কৃষকদেরও উপোষ করতে হচ্ছিল।'

—'তুমি জমিদারকে ধান দিতে অস্বীকার করেছিলে?'

—'না আমি জমিদারকে ভাগ দিয়েছিলাম। লড়াই হল কেননা সে নিজের ভাগের পরেও মন্দিরের জন্যে ভাগ চাইল'।

—'মন্দিরের জন্য'?

—'হ্যাঁ, রাজাজীব দুটো বড় বড মন্দির অছে; সেখানে তিনি কয়েকজন পূজারী ও দেবদাসী পালন করেন। এছাড়া যাত্রী, সাধু ও ভিখিরিদের জন্যে জলসত্র খুলে রেখেছেন। তার জন্যেও কৃষকদের ফসল দিতে হয়। কিন্তু যখন আমাদের ঘরে লোকেরা না খেয়ে মারা যাচ্ছে, আমরা কোথা থেকে দেব? ধান মানুষের জন্যেই পর্যাপ্ত নয়, পাথরের পেট কোথা থেকে ভরবে? এইজন্যে আমরা বললাম, ভগবানের যদি ধানের প্রয়োজন থাকত, তাহলে তিনি কৃষকদের ফসল এভাবে নষ্ট করতেন না। কিন্তু রাজা আমার একটা কথাও শুনলেন না। ফলে বাধ্য হয়ে কৃষকরা ধান না দেবার আন্দোলন শুরু করল। কৃষকের ছেলে না খেয়ে মরছে, কিন্তু পাথরের দেবতার জন্যে তাকে ফসল দিতে হচ্ছে, আমাদের মুখে এক গ্রাস ভাত নেই, কিন্তু তাতে দেবদাসীদের পায়ের নৃত্যের তাল ভঙ্গ হয়নি, মেহনতী মানুষ মরে যাক, কিন্তু অন্যদের মেহনতে বেঁচে থাকা দেবতাদের বিধানে মন্দির মহলে হুল্লোড়ের কমতি নেই।'

—'তারপর কি হলো'?

—তারপর আর কি। গুলি চালাবার পরও আমরা ধান দিইনি। আমাদের আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে গেল। এখন তো শুনছি রাজাজীর মন্দিরের ভিতরে দেবদেবীর মূর্তি বিজলীর তার দিয়ে ঘেরা হয়েছে।' এরপর চারজন কৃষকই জোরে জোরে হাসতে লাগল।

পি. নারায়ণ চুপ করে গেল। অন্যদের দিকে দেখতে লাগল। আমি তার চোখে দুঃখ রাগ ঘৃণার লাভা ফুটতে দেখলাম।

রাঘবন ধীরে ধীরে বলল, 'স্পেশ্যাল পুলিশ আমাদের আন্দোলন গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে সব ধরনের হাতিয়ার প্রয়োগ করছিল। মন্দিরের মেলায় যাত্রীদের দুদলের মধ্যে ঝগড়া করিয়ে গুলি চালায়, কোর্ট চত্বরে বহু মেয়ের বেইজ্জতী করে। আমাদের কাছে সেইসব মেয়েদের হলফ করা বয়ান মজুদ আছে। দুনিয়ার বড়ো বড়ো হাকিমের

সামনে তারা তাদের বক্তব্য বলতে পারে। আমাদের কর্মীরা কংগ্রেসের সভাপতি পট্টভি সীতারামাইয়ার সামনে পুরো ঘটনা বলেন এবং কংগ্রেসের সভাপতি পুলিশের এই বর্বরতার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। তা খবরের কাগজে ছাপাও হয়।'

কে. নারায়ণ বলল, যেন সে নিজের সঙ্গেই কথা বলছে, 'চন্দ্রকোট গ্রামের এক বিপ্লবী কর্মকর্তা রিটেককে পুলিশ ধরে, বেধড়ক মেরে তার শরীরের হাড় ভেঙে দেয়—হাতের আর পায়ের হাড়। তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়, তার সাজানো ঘরদোর জ্বালিয়ে দেয় এবং সেখানে লাঙ্গল চালিয়ে দেয়। সেই জায়গাটা আজও সেই রকমেই আছে।'

কিন্তু রিটেক আজও জীবিত এবং আমাদের সঙ্গে কাজ করছে, ভি. কৃষ্ণ হাসতে হাসতে বলল।

—'কমরেড আনন্দনের গল্প আবও বিচিত্র'—পি. নারায়ণ বলল।

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ', ভি. কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি বলল, 'হ্যাঁ ভাই সে গল্প এঁকে শোনাও'।

রাঘবন বলল, 'কমবেড আনন্দনকে রাজার গুণ্ডারা মেরে ফেলেছিল'!

—'মেরে ফেলেছিল? কেন?'

—'ব্যস, মেরে ফেলেছিল, কৃষকদের মধ্যে কাজ করত। এই অপরাধ কি কিছু কম?'

—'আরে ভাই, মারার খবরে এত অবাক হবেন না। আমাদের এখানে মেরে ফেলা আর মরে যাওয়া সাধারণ ব্যাপার। রোজ এরকম হয়, কিন্তু এতে আমাদের আন্দোলন মুছে দেওয়া যায় না। আন্দোলন এগিয়েই যায়।'

—'তুমি আসল ব্যাপারটা শোনাও', ভি. কৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে বলল,

রাঘবন বলল, 'রাজার গুণ্ডারা রাজার কথামত কমরেড আনন্দনকে মেরে ফেলল...........'

—'দাঁড়াও', আমি বললাম, 'সেই গুণ্ডাদের নাম কি?' রাঘবন বলল, আমি গুণ্ডাদের নাম জানিনা। না, জানি কিন্তু বলব না, কেননা গুণ্ডাদের কোন নাম হয় না। গুণ্ডা গুণ্ডাই। তাদের নাম করলে নামের বেইজ্জতী হয়। আর সত্যিকথা বলতে কি ঐ গুণ্ডার নামেই আমাদের একজন ভালো সাথী আছেন। সেইজন্যে আমি এই গুণ্ডার নাম বলব না। শুধু বুঝে নিন, যে কমরেড আনন্দনকে এই গুণ্ডা মেরে ফেলল। আর রাজা তাকে পুরস্কার দিল। এর পর সে নিজের বৌকে নিয়ে কমরেড আনন্দনের গাঁ থেকে অন্য গ্রামে চলে গেল। কিছুদিন পর সেখান থেকে তাকে বের করে দিল। এইভাবে সে রাজার এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যায়। কিন্তু কোথাও টিকতে পারে না।'

—'কেন'?

—রাঘবন একটু চুপ করে আমার দিকে বিচিত্রভাবে তাকাল। বলল, 'তার বৌ-এর উপর প্রতিদিনই ভর হত। হাল হত। হাল বোঝ? হাল হলে মানুষের মাথা ঘোরে, মুখ দিয়ে ফেণা বেরোয় এবং বিড় বিড় করে যা তা বলতে থাকে। লোকেরা মনে করে ভূতে ভর করেছে।

—'হ্যাঁ', আমি মাথা নাড়লাম।

—'এই অবস্থা গুণ্ডার বউয়েরও হত। আর সে সেই ভব অবস্থায় চীৎকার করে বলত 'আমি আনন্দন, আমি আনন্দন, আমি আনন্দন'। যখন সে জোরে চীৎকার করে উঠত, তখন গুণ্ডা বিব্রত হয়ে নিজের কান চেপে ধরত, বৌ-এর মুখের উপর হাত রেখে বেধড়ক পেটাত।'

—'তারপর, তারপর কি হল'?

—'তারপর একদিন বিব্রত হয়ে সেই গুণ্ডা তার বৌকে গলা টিপে মেরে ফেলল। শুনেছি সে তার বৌকে খুব ভালবাসত'।

ঘরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিঃস্তব্ধতা রইল। কে নারায়ণ নিস্তব্ধতা ভেঙে মধুমক্ষিকার মত মিষ্টি করে বলল, এটা ভেবো না চাবিদিকে শুধুই অত্যাচার হচ্ছে, আর আমরা অত্যাচাব সহ্য করে এই জাঁতায় পিষ্ট হচ্ছি। চরকুল তালুকের কৃষকরা এত কাপুরুষ নয়। তারা এখন প্রবল সাহস নিয়ে লড়ে যাচ্ছে।'

—'মানুষকে তুমি কি মনে কর?' ভি. কৃষ্ণ এগিয়ে এসে বলল, 'মনে আছে এ. কে স্যামুয়েল আরানের সূতী কারখানায় জাহাজীদের হরতালের সমর্থনে আমরা একশো পাঁচ দিন হরতাল করেছিলাম।'

—'একশো পাঁচ দিন!' আমি চমকে উঠে বললাম।

আমি আশ্চর্যান্বিত হওয়াতে ভি. কৃষ্ণ একেবারে চুপ করে গেল। আমাব সঙ্গীরা সাথী কৃষকের দিকে রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসতে লাগল। যেন তারা বলছে, তুমি কখনও এর মোকাবিলা করতে পারবে?

কে. নারায়ণ বলল, 'আমরা এক ছোট্ট স্বাধীন কেল্লা বানিয়েছিলাম কেরীবিল্লুরে। যখন আমাদের আন্দোলনের জোর ছিল, তখন একমাস পর্যন্ত স্পেশ্যাল পুলিশের লোকেরা আমাদের এলাকায় ঢোকার সাহস করেনি—পুরো তিরিশ দিন। অবস্থা বদলালেও এখনও ওরা দিনে ওদিকে যেতে সাহস করে না। রাতে হামলা করে, তাও একশোর উপর লোক নিয়ে। দিনে আক্রমন করার সাহস তাদের নেই।'

পি. নারায়ণ মুচকি হেসে বলল, 'আমাদের মেয়েরাও আমাদের সঙ্গে সমানভাবে লড়াইতে অংশ নিয়েছে। চিম্মির জায়গিরদার জঙ্গলের কাঠ গ্রামের লোকেদের নিতে বারণ করলে মেয়েরা প্রতিবাদ করে; যখন জায়গিরদার পুলিশ ডাকল, কাঠ কেটে আনার পথে আমাদের উপর হামলা করল ; তখন মেয়েরা সাহসের সঙ্গে এর মোকাবিলা করে। পুলিশদের ঘিরে ফেলে কুড়ুল দিয়ে পেটায়। মার খেয়ে বেচারাদের জান বাঁচানো মুস্কিল হয়ে গিয়েছিল। কয়েকজন তো তাদের লাঠিটুপিও ফেলে গিয়েছিল। পরে গ্রামবাসীরাই থানায় পৌঁছে দেয়।'

ভি. কৃষ্ণ বলল, 'খুবই মজা হয়েছিল, সত্যিই'। তিনজনই হাসতে লাগল। আমরা তাদের হাসিতে সামিল হলাম। রাতে ঘন অন্ধকারের মধ্যে আঘাত পাওয়া চেহারার উপর মশালের আলো জ্বল জ্বল করতে লাগল।

আমি ভি. কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সম্মেলন সম্পর্কে তোমার মত কি?'

সে ভেবেচিন্তে উত্তর দিল, 'সম্মেলনে একটা আপনাপন ভাব ছিল'।

আমি আবার ভেবেচিন্তে তিনজন কৃষককে বললাম, 'আমি বোম্বাই-এর জন্য উত্তরী মালাবারের কৃষকদের একটি নির্দিষ্ট বক্তব্য নিয়ে যেতে চাই।'

তিনজন কৃষকই আমার দিকে দেখল, তারপর তারা একে অপরের দিকে রহস্যময় দৃষ্টিতে দেখল। তারপর তারা নিজেদের মধ্যে ধীরে ধীরে কথা বলতে লাগল। যেন কেউ মেনে নিচ্ছে, কেউ আপত্তি করছে, কেউ বা শুধুই কিছু বলছে; একসময় তিনজনের মাথা একসঙ্গে নড়ল এবং তারা ভি. কৃষ্ণকে কিছু বলল।

ভি. কৃষ্ণ আমাকে বলল, 'বোম্বাইওয়ালাদের বলে দেবে যে চারকুল তালুকের কৃষকরা আজও মাথা উঁচু করে চলছে।'

রাত গভীর। আমার হোটেলের ঘরের মেঝেতে চারজন শুয়ে পড়ল, আমার চোখে ঘুম নেই। কখনো আমি জ্বলন্ত ঘর দেখছি, কখনো তাতে হাড় জ্বলতে দেখছি, কখনো মন্দিরের সিঁড়িতে গুলি চলতে দেখছি, কখনো কানে ভেসে আসছে—'আমি আনন্দন, আমি আনন্দন আওয়াজ। আর কোন গুণ্ডা জোরে জোরে খিল খিল করে হাসছে। আমি বিছানায় বসে বন্ধুদের চেহারা দেখতে লাগলাম, যারা স্বাধীনতার লড়াইয়ে নিজের জীবন বাজি রেখেছে। দিনে একটা মানুষ মুখোশ পরে থাকে। তার চেহারার ভিতরের অনেক কিছু দেখা যায় না। কিন্তু রাত যখন হয়, যখন চোখে ঘুম নেমে আসে, তখন সেই লোকের শরীরে অনেক ছবি ভেসে ওঠে—ঘুমন্ত ভাবনা, লুকিয়ে থাকা কামনা, অপূর্ণ ইচ্ছা, অতীতের নিরাশা আর আগামী দিনের আশা সব জেগে ওঠে। ঘুমন্ত চেহারা সংগ্রামের এমন ছবি এঁকে দেয় যা দিনে প্রায় দেখা যায় না। এইজন্যই আমি খুব আশ্চর্য হয়ে কৃষকদের দেখছিলাম; এইসব কৃষক লড়াইয়ের ময়দান থেকে এসেছে, সকাল হলে লড়াইয়ের ময়দানে ফিরে যাবে। তাদের চেহারায় লুকিয়ে থাকা অপূর্ণ ইচ্ছা কাজ করছিল। এদের মধ্যে বাহাদুরি ছিল, দৃঢ়তা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ছিল এক বিচিত্র সোনালী স্বপ্নের ছায়া, যা চারটি চেহারাকে একে অপরের থেকে আলাদা করলেও, একজনকে অন্যের কাছেও এনে দিয়েছিল। মনে হচ্ছিলো এরা চারজনই এক মায়ের সন্তান—এদের সবার মধ্যেই আছে সেই সোনালী স্বপ্ন, যে সোনালী স্বপ্ন আমি একবার লেনিনের চেহারায় দেখেছিলাম, একবার স্ট্যালিনের হাসির মধ্যে পেয়েছিলাম, একবার শহীদ যতীন্দ্র নাথ দাসের চোখে দেখেছিলাম। তারপর আবার ভাবলাম মানুষ কত বলশালী তাই প্রথমে এই স্বপ্নকে কোন বইয়ের একটা পাতায়, ছবির একটা ঝলকে, কল্পনালোকের কোন কোনায় ঝিলমিল করতে দেখে; তারপর নিজের জীবনের সুখ আহ্লাদ অগ্রাহ্য করে সোনালী স্বপ্নকে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে আনে; তৈরী হয় তাজমহল, ইফেল টাওয়ার তৈরী হয়, নিপার নদীর বাঁধ দাঁড়িয়ে যায়, জমিতে ট্রাক্টর চলতে থাকে, মজুররা কারখানা শাসন করতে থাকে; নদীনালার স্রোত, পাহাড়ের উচ্চতা, হাওয়ার মেজাজ বদলে যায়; মানুষের মেহনতে জন্ম নেয় এক নতুন পৃথিবী, এক নতুন প্রকৃতি, জন্ম হয় এক নতুন সৃষ্টির।

আমি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলাম। রাত ডুবতে ডুবতে ডুবে গেল। তারারা এক এক করে আকাশের অতল গভীরতায় হারিয়ে গেল। শেষে যখন পৃথিবীর উপর শাদা কিরণ ফুটতে লাগল, কেউ কাছের ঘর থেকে সেতারে আশাবরীর ধীর লয়ের আলাপ শুরু করল; চারিদিক সকালের সোনালী আলোয় ভরে গেল।

রমন দরজায় হালকা টোকা দিল। আমি উঠে দরজা খুলে দিলাম। রমন ভেতরে ঢুকে বলল, 'মনে হচ্ছে তুমি ঘুমোওনি। ভালই হয়েছে, কারণ তোমার ট্রেন ছ'টায়। তোমার ইচ্ছে কি, এখানে থাকবে না স্টেশনে যাবে। এখন পাঁচটা বাজে। আমি বললাম, 'চলো স্টেশনে গিয়েই অপেক্ষা করব'।

স্টেশনের ছাউনি অন্ধকারে ছোট মনে হচ্ছিলো। তৃতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে লোকেরা মেঝেতে শুয়ে ছিল যেরকম তৃতীয় শ্রেণীর সব ওয়েটিং রুমেই লোকেরা শুয়ে থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে সেগুনের নকশা কাটা একটা টেবল ও চেয়ার ছিল; আর সাদা গোল একটা ল্যাম্প জ্বলছিল। বাথরুমে চীনামাটির একটা জগ, ড্রেসিং টেবলের উপর জলভর্তি একটা বড় জগ রাখা ছিল—তার উপর মাকড়শা জাল বুনে গেছে। এই ওয়েটিং রুমের দৃশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর, যখন কোম্পানী বাহাদুরের সাহেব ও মেমরা এখানে এসে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিত।

রমন বলল, 'তুমি জলখাবার খেয়ে নাও। খিদে না পেলেও ক্ষতি নেই। পথে এত ভাল খাবার পাওয়া যাবে না। কাছেই একটা জায়গায় ভাল ইডলি পাওয়া যায়। খাবার পর তুমি আঙ্গুল চুষতে থাকবে।'

আমি রমনের সঙ্গে গেলাম। এখানে উদ্রতম গাছের নীচে একটা অন্ধকার শেড ছিল। সেখানে একটা বাতি ছিল—তা আলোর বদলে অন্ধকার ছড়াচ্ছিল বেশি, শেড থেকে হালকা হালকা ধোঁয়া বেরোচ্ছিল; আর দু তিনজন যাত্রীর হালকা হাসির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। গরম গরম ইডলির তাজা সুগন্ধ আমার নাকে পৌঁছতেই, আমার ক্ষিদে জেগে উঠল। আমি ইডলি মুখে দিয়ে রমনকে বললাম, 'তুমিও খাও'।

সে বলল, 'এই সময় আমি জলখাবার খাই না'। আমি বললাম, 'আমিই বা কোথায় খাই'? দোকানের ছেলেটিকে বললাম, 'একটা ইডলি নিয়ে এসো'—কিছুটা কথা বলে, কিছুটা ইশারায় নিরর্থক হাসি হেসে কথাটা বোঝালাম।

রমন ছেলেটাকে জলখাবার আনতে মানা করে দিল। কলার পাতায় আমার অবশিষ্ট খাবার সরিয়ে রেখে আমি বললাম, 'তুমি না খেলে আমিও খাব না'।

রমন হাসল, কিন্তু আবার সে গম্ভীর হয়ে আমাকে বলল, 'কমরেড এ কথা নয় যে আমি খাবার খেতে চাইছি না আসলে আমি দিনে কেবল একবারই খাই'।

—'কেন'?

—'এই জন্যে যে দুবার খাবার অবস্থা আমার নেই'। আমি চমকে উঠলাম, রমনের মুখে বিচিত্র হাসি।

রমন কিছুক্ষন থেমে বলল, 'আমার অনেক সাথীর অবস্থা এর থেকেও খারাপ। যখন আমরা কাজ করার জন্যে বাইরে যাই, তখন দুদিন তিনদিন আমাদের খাবার জোটে না। তুমি তো জানো, গ্রামের কৃষকরা কত গরীব, আর আমি তোমাকে সত্যি বলছি, দক্ষিণ ভারতের কৃষকরা সবচেয়ে গরীব। আমি তাদের খাবার থেকে ভাগ চাইতে পারি না। সেই খাবার থেকে চাওয়া সত্যিই অপরাধ।' রমন একটু থেমে আবার বলল, 'সেই জন্যেই আমি জলখাবার খাব না। তাহলে আমার অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে। খুব কষ্টে এই অভ্যাস কায়েম রেখেছি।'

অমি নিঃশব্দে জলখাবার খেলাম। আমরা দুজনে আবার স্টেশনের দিকে

এগোলাম। রাস্তায় অন্ধকার, তবু কোথাও কোথাও পাখিরা পাখা নাড়ছে আর আকাশের উজ্জ্বলতায় কালো কাঁচি তৈরী করে উড়ে যাচ্ছে; কোথাও কোথাও ঝোপের পাশে অলঞ্জী ফুলের সুগন্ধ ভেসে আসছে।

হঠাৎ রমন বলল, এই অলঞ্জীর ছোট ছোট সাদা ফুল আমাদের ছোট ছোট প্রেমের স্মৃতি। কবিরা এদের নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন, প্রেমিকারা এ ফুলে মালা গেঁথেছে, নিজেদের খোঁপায় গুঁজেছে। যখন আমার বিয়ে হয়েছিল—রমন হঠাৎ চুপ করে গেল।

অনেকক্ষন পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বৌ কোথায়'?

অনেকক্ষন পর সে বলল, 'আমার বৌ আব বাচ্চা কখনো এখানে, কখনো ওখানে, কখনো এই সাথীদের ঘরে, কখনো ঐ কৃষকের ঘরে আশ্রয় নেয়।'

রমন ঝোপ থেকে একটা পাথর তুলে আনল। একটা গাছের গুঁড়ির দিকে ছুঁড়ে মারল। 'সারা দক্ষিণ ভারত আমার ঘর'। পাথরটা জোরে গিয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে আঘাত করল। সেখান থেকে নীচে জলে পড়ল। জলে পাথর পড়ার শব্দ হল। আমি বললাম, 'তোমার টিপ খুব ভাল।'

ত্রিচুর থেকে সেই জায়গাটা খুব দূরে নয়, যেখানে মালয়ালমের মহাকবি বালাতোল থাকেন। এটা একটা ছোট্ট গ্রাম, নাম শোরুথোরথী। ছোট ছোট পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই গ্রাম, এর পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ভারত নদী। বালাতোলের ঘর ঘন কলাগাছ দিয়ে ঘেরা, বেশ ঠাণ্ডা এবং আরামদায়ক। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গোয়াল থেকে তাজা ভূষির গন্ধ আসছিল। দুধেল গাই জিভ বার করে বাছুরকে চাটছিল। উঠোনে বাচ্চাদের শোরগোল, বালাতোল পরিবারের মেয়েরা হাসছে, গল্প করছে। এই সব ঘরে যে পবিত্রতা, যে আত্মীয়তা পাওয়া যায়, মানুষ ও প্রেমের সেই লোভনীয় সম্পর্ক এই বাড়িতে আমার চোখের সামনে; আর আমি এই সময় ঘর থেকে অনেক দূরে দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই বিশেষ অনুভব আমার মধ্যে সঞ্চারিত হল। ইন্দুচুরনের লাজুক ছেলেকে মিষ্টি হেসে কোলে নিই। সে আমার ছেলের মতই সরল ও মিষ্টি। প্রথমত সে আমার কোলেই আসতে চায় না, এলেও নিজের নাম বলতে চায় না, নাম বললেও আমার হাত থেকে খেলনা দিতে চায় না। কিন্তু খেলনা দিয়ে চুমু খেতেই একে অন্যের নিবিড় বন্ধু হয়ে গেলাম।

মহাকবি বালাতোল বিপ্লবী কবি যোশের মত একজন বেশ মোটাসোটা চেহারার মানুষ এবং ব্যক্তিত্বশালী যোশ সাহেবের মতই তিনি রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের গান গেয়েছেন, মজদুর কৃষকদের আন্দোলনে রোমান্টিক ক্রান্তিবাদ পর্যন্ত ছিলেন। বালাতোলের বয়স এখন সত্তর, তবে আওয়াজ গম্ভীর ও ভারি। তিনি সাদা ধুতি পরে লম্বা লম্বা হাতে আমার দিকে ইশারা করলেন এবং হাসলেন, বালাতোল ইংরেজী, উর্দু বা হিন্দী ভাষা জানেন না, আমি মালয়ালম্ জানি না, তাই আমাদের কথা গোবিন্দন কুরূপের মাধ্যমে হচ্ছিল। তিনি বালাতোলের ছেলে এবং তাঁর চোখে বুদ্ধির গভীর দীপ্তি।

গোবিন্দন কুরূপ বলল, 'বাবা বলছেন, তিনি আপনাকে নিজের বয়সী ভেবেছিলেন। আপনার বয়স তো অনেক কম।'

ইন্দুচুড়ণ, বালাতোলের জামাই হাসতে লাগল। অচ্যুত কুরূপ, গোবিন্দন কুরূপ আর বালাতোলের দ্বিতীয় ছেলে ও তার জামাই জনগণের আন্দোলনে এগিয়ে এসে অংশগ্রহণ করেন এবং বালাতোলের বিরোধী মতামত রাখেন। বালাতোল মাদ্রাজ সরকারের মহাকবি এবং তার পুরস্কার হিসেবে এক হাজার টাকা বৃত্তি পান।

'বছরে মাত্র এক হাজার!' আমি বললাম, 'মাসিক বরাদ্দ তাহলে চুরাশি টাকারও কম, বোম্বাই কর্পোরেশনের মেথরের মাইনেও এর চেয়ে বেশি। মেথর অবশ্যই কবি ও মন্ত্রীর মতই সমান প্রয়োজনীয়। কিন্তু মাইনের এত তফাৎ কেন? মাদ্রাজ সরকারের মন্ত্রী মাসে হাজার টাকা মাইনে পায়; আর তার মহাকবির মাইনে চুরাশি................। কংগ্রেসী সরকার সংস্কৃতি আর শিল্পকে কত সম্মান করে তা এ থেকে বোঝা যায়। কত সস্তায় তারা মহাকবির ধর্ম লুঠে নিয়েছে।

ইন্দুচুড়ণ বললেন, 'এতো সত্যি কথা ; কিন্তু এই জিনিষের আলাদা একটা রূপ আছে—প্রশ্ন উঠতে পারে আমাদের ঘবে এমন হবে কেন! বাস্তবে বালাতোল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু যখন তাঁর নিজের শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় এল, কিছুটা বয়সের জন্যে, কিছুটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে গভীর সম্বন্ধের জন্য, তিনি আর এগোতে পারলেন না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই এই ট্র্যাজেডী পুনরাবৃত্ত হয়েছে এবং এখনও এর পুনরাবৃত্তি হবে।

বালাতোল পুরনো বৃক্ষের মতই এক কোণায় দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শোনার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি কানে কম শোনেন, তাই বুঝতে পারছিলেন না। উনি আমার কাঁধ ছুঁয়ে গোবিন্দন কুরূপকে কিছু বললেন। গোবিন্দন বললেন, 'বাবা বলছেন, উনি দুঃখিত, আমাদের নৃত্যশালা বন্ধ, আপনাকে কথাকলি নাচ দেখাতেন।'

গোবিন্দন কুরূপ নিজের বোনের দিকে ইশারা করে বলল, 'আমার সবচেয়ে ছোট বোন—ও খুব ভালো নাচে।'

ছোট্ট বোন হেসে ইন্দুচুড়নের ছেলেকে আমার কোল থেকে নিল। বলল, 'চলুন খাবার তৈরী'।

আমি আমার সফরে খুব ক্লান্ত। খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। যখন উঠলাম সন্ধ্যের ছায়া ঘন হয়ে আসছে। রোদ অনেক হালকা। চা খেয়ে ভারত নদীর পুলের উপর দাঁড়ালাম, উল্টো দিকে সোনুর রেলওয়ে জংশন। সোনুরের ওপারে উঁচু উঁচু উপত্যকা, সেখানে সূর্য নেমে যাচ্ছে আর ভারত নদীর কোল উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ইন্দুচুড়ণ বলল, ' এই উপত্যকার এক পাশে মোপলাদের দেশ, মোপলা বিদ্রোহের নাম শুনেছ?' আমি মাথা নাড়লাম।

মোপলারা মুসলমান এবং কিষাণ। যখন তারা বিদ্রোহ করে তখন তা পুরোপুরি কৃষক বিদ্রোহ। মোপলারা মুসলমান হলেও জমির মালিকরা ছিল হিন্দু—সেইজন্যে এই আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িকতার রূপ দেওয়া হয়। অবশ্য বহু হিন্দু মুসলমান এর সঙ্গে ছিল। একবার যখন স্পেশ্যাল পুলিশ মোপলাদের উপর হাঙ্গামা করে এবং পরাজিত হয়, তখন পুলিশের অনেক ব্রাহ্মণ ক্লার্ক মোপলাদের হাতে ধরা পড়ে। মোপলারা তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেনি, বরং নিজেদের কাজে নিয়ে নেয়। তারা আগের মতই টাইপরাইটারে মোপলাদের জন্যে কাজ করতে থাকে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কোন বিশেষ পুলিশ?'

—'ইংরেজের স্পেশ্যাল পুলিশ, যাদের এরা মোপলাদের গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে রেখেছিল।'

একবার গান্ধিজী ও মহম্মদ আলি এই এলাকায় ঘুরেছিলেন, কিন্তু তারপর কোন রাষ্ট্রীয় নেতাই এমুখো হননি। এই আন্দোলন ভুল হাতে চলে যায়। মোপলারা নিজেদের আন্দোলনের সময় অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে। কম্যাণ্ডার হিচককের অত্যাচার সারা মালাবারে প্রসিদ্ধ। যখন মোপলারা তাকেও হত্যা করে, তখন ইংরেজরা এক বড় স্মারক তৈরী করে। আজও তা হিচকক মেমোরিয়াল নামে প্রসিদ্ধ। এর আগে কংগ্রেসী নেতারা বলত যে, তারা ক্ষমতায় এলেই মেমোরিয়াল গুঁড়িয়ে দেবে। কিন্তু ক্ষমতা হাতে পেয়ে এই মেমোরিয়াল বন্ধ করা দূরে থাক, মোপলাদেরই দেশ থেকে তুলে দিল।'

—'তাহলে কি সেই সময়ের স্পেশ্যাল পুলিশ আজও এই জায়গায় আছে?'

—'আছে কি তারা অত্যন্ত এগিয়ে এসে কাজ করছে এবং পচাগলা সমাজ ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এখানে কোন স্বাধীনতা নেই।'

পুলের ওপারে সোনুর জংশন থেকে গাড়ি শান্টিং-এর আওয়াজ শোনা গেল।

ইন্দুচূড়ণ পুল থেকে ঝুঁকে ভারত নদীর জল দেখতে দেখতে বলতে লাগল, 'আন্দোলনের যুগে এই সোনুর জংশনে একবার দেড়শো মোপলা কৃষককে মালগাড়ির এক কামরায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কৃষকদের এখান থেকে কোয়েম্বাটুর নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেখানে মামলা হবার কথা। দেড়শো কৃষককে ছোট্ট মালগাড়ির কামরায় বন্ধ করে পশুদের মত পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখান গিয়ে কামরা যখন খোলা হলো তখন অর্ধেকের বেশি কৃষক মারা গেছে। এটা গল্প নয়, ঘটনা। এদিকের সব খবরের কাগজেও ছাপা হয়েছে।

গোবিন্দন আস্তে করে বলল, 'ইংরেজরা সিরাজদ্দৌলার ব্ল্যাক হোলের কথা বারবার বলে; কিন্তু সোনুরের ব্ল্যাক হোলের কখনও উল্লেখ করে না।

মানুষকে মানবতার আদর্শে পৌঁছবার জন্যে জানিনা কত ব্ল্যাক হোল পেরোতে হবে।

সূর্য ডুবে গিয়েছিল। ভারত নদীর উপর জোনাকি টিম টিম করতে লাগল। কোনুর জংশনে একটা ইঞ্জিন শান্টিং করছিল। গাড়ি কোচিন যাচ্ছিল। অন্ধকার উপত্যকা ছাড়িয়ে মোপলা কৃষকরা আজও তাদের অধিকারের জন্যে লড়াই করছে। ভারত নদীর পুলে কেরলের সীমা শেষ, মাদ্রাজের শুরু। পুলের উপর আবগারী পাহারাদার। সেপাইদের মাথার উপর চন্দনের টিকা। আমি ভাবলাম মদের উপর নিষেধাজ্ঞা আছে। কিন্তু অত্যাচারের উপর নেই। অত্যাচার কখনও নিষিদ্ধ হয় না। মোপলাদের দেশে আজও স্পেশ্যাল পুলিশ মজুত আছে।

গাড়ি হুফ হুফ করে অনেক দূরে চলে গেল। পুলের ওপার থেকে একজন গাড়িওয়ালা গরুর গাড়িতে বসে গান গাইতে গাইতে আসছিল। গোবিন্দন বলল, মোপলাদের নেতাও ছিল একজন গাড়োয়ান, এক গরীব মজদুর। তার নাম কুঞ্জু

আহমদ হাজী। তার নেতৃত্বের তারিফ ইংরেজরাও করত। তার মাথার উপর পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সে ধরা পড়েনি। শেষে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের পুরনো চাল চালল। তাকে বলা হয়েছিল, পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করলে খারাপ ব্যবহার করা হবে না। কিন্তু যখন কুঞ্জু আহমদ হাজী চালে ভুল করে স্পেশ্যাল পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করল, তাকে মেরে ফেলা হল। ঠিক এই রকমই গাড়োয়ান ছিল সে ; গরুর গাড়িতে বসে গান গাইতে গাইতে চলেছিল যে গাড়োয়ান তার দিকে তাকিয়ে বলল গোবিন্দন। গাড়োয়ান আমাদের সামনে দিয়ে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেল।

পরদেশী পোকেণুম পট্টালাম উইভেলম।
ভরণাকার নমুণ্ডে কোন্ডেরেমন।।
পরাইম্মো .... পায়োমান ইয়াংডে।
পরমণ্ডে অচ্ছেন্নে তোক মেন্নু।।

[লোকেরা বলে বিদেশী চলে গেছে আর সেপাইদের ফেরৎ নিয়ে গেছে। এখন আমাদের শাসন। কিন্তু তা হলেও গরীব পরমানের বাবাকে ফাঁসি দেওয়া হবে!]

—এও সেই ...... সেইই—আমি গোবিন্দনকে বললাম। সব সময়েই একজন গাড়োয়ান অন্য গাড়োয়ানের মত হয়।

অলওয়াই যাবার গাড়িতে আমার চুপচাপ কেটে গেল। আমার কামরায় দুজন পাদ্রী ছিলেন, তাদের কথায় জানা গেল ক্রীসমাস উপলক্ষ্যে তাঁরা কোট্টায়াম যাচ্ছেন। অন্যজন অলওয়াই উপনগরে লরির ঠিকাদার। তিনি সোনালী রঙের পাড়ওয়ালা ধুতি পরেছিলেন এবং একটি সুন্দর জামা। খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা চেহারার সেই লোকটি আমার দিকে চেয়ে বারবার হাসছিল। তার চেহারার একটা নরম সৌন্দর্য আর বাঁকা হাসি আমার একদম পছন্দ হচ্ছিল না। আমি তাকে হাসতে দিলাম। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে থাকলাম। সেই দৃশ্য ভেতরের লোকেদের থেকে লোভনীয়। শেষে সাড়ে তিন ঘণ্টা যাত্রার পর যখন অলওয়াই শহরের কাছে এলাম, তখন সেই লোকটা আর থাকতে পারল না। সে আমার কাঁধে হাত রেখে তার দিকে তাকাতে বাধ্য করল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার?

—'আপনি কৃষণচন্দ্র'?

—'হ্যাঁ'।

—'আমি আপনাকে জানি'।

—'কিভাবে জানলেন'?

—'আপনি ত্রিচুরে বক্তৃতা দিয়েছিলেন না?'

—'হ্যাঁ'।

তখন সে অত্যন্ত বিনতভাবে হাত জোড় করল ; আমিও হাত জোড় করলাম। সে বলল, আমি অলওয়াই-এ লরির ঠিকেদার।'

আমি বললাম, 'এটা ভালো হলো, আপনি আমাকে বলে দিলেন, নইলে আমি আপনাকে স্বামী বিবেকানন্দের চ্যালা ভাবছিলাম।'

সে একদম চমকে উঠল। সামলে নিয়ে বলল, 'না, না, আমি অলওয়াই

উপনগরের লরির ঠিকেদার। বড়ো সড়কের উপর সরকারী লরি চলে। ছোট ছোট রাস্তায় আমার লরি চলে। আমার কাছে এগারোটা লরি আছে।' আমি উল্টে বললাম, 'ত্রিচুরে আমি যা বলেছিলাম, সে সম্পর্কে আপনি কি বলেন?'

সে মিষ্টি হেসে বলল, 'খুব ভালো কথা আপনাদের। ক্ষমা করবেন, আপনাদের আন্দোলন অত্যন্ত দুর্বল।' এবার আমি চমকে উঠলাম।

—'তা কেন? কিভাবে?'

—'যদি আপনাদের আন্দোলন জোরদার হতো, তাহলে আমার কাছে আজ পর্যন্ত এগারোটা লরি থাকতো কিভাবে? আপনি আমাকে অনুমতি দিন, অলওয়াই স্টেশন এসে গেছে। সে অতন্ত নম্রভাবে ব্যাগ হাতে নিয়ে নেমে গেল।

নামাব কথা আমারও ছিল। কিন্তু তাব আগে আমি তার ঘাড় মটকে তার মেয়েলিপনাকে পুরোপুরি নিংড়ে নিতে চাইছিলাম। এখানে তো তারই বাদশাহী। সে আমাদের নিংড়ে নিংড়ে দেখছিল, যেন আমবা লরির ঘষা নাটবল্টু। এবার এগুলোকে সে ফেলে দেবে। আমি আমার ঠোঁট কামড়ালাম আর যেতে যেতে বলাম, 'ঠিকাদার মশায়, আপনার প্রত্যেকটি লরিতে আমাদের ড্রাইভাররা বসে আছে। আপনি বুঝতে পাবছেন?'

কিন্তু সে আর ঘুরে দেখল না।

অলওয়াই একটা শিল্পনগরী। এখানে সাব কারখানা, অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা, বাসন ঢালাইয়ের কারখানা আছে। সারা ভারতে এখান থেকে মাল পত্তর যায়। এখানে এত অ্যালুমিনিয়াম হয় না বা এই কারখানার প্রয়োজন মেটাতে পারে সেইজন্যে কোম্পানীওয়ালারা বিদেশ থেকে অ্যালুমিনিয়াম আনান। কাঁচা অ্যালুমিনিয়াম এনেও এখানকার কারখানায় লাভ থাকে কারণ এখানে মজুবি সস্তা। অন্যদিকে বিজলীও খুব সস্তা। বিজলী আসে অলওয়াই থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরের পল্লীওয়াসল হাইড্রোপ্রোজেক্টস থেকে।

অলওয়াই থেকে সরকাবী বাসে বসে কোটায়াম যাওয়া যায়। কোচিন আব ত্রিবাঙ্কুরকে এক করার পর এখানকার বাস সার্ভিস সরকারী হয়ে গেছে। স্টেট এক্সপ্রেস দুপুরে সাড়ে এগারোটার সময় অলওয়াই থেকে কোট্টায়াম যায়।

কোট্টায়াম ক্রীশ্চান বুর্জোয়াজির হেড কোয়ার্টার। দক্ষিণ ভারতের রবার ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্র। ত্রিবাঙ্কুরে অনেক জায়গায় রবারের বাগান দেখা যায়। কোট্টায়ামে চেরিয়াপল্লী নামে একটি প্রাচীন গির্জা আছে। বলা হয় ছ-সাতশো বছরের পুরনো। কোট্টায়াম থেকে কয়েক মাইল দূরে দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে পুরনো গীর্জা। এর নাম 'কোরাবিলংগণা'। এই গীর্জা প্রথম শতাব্দীর— ফার্স্ট সেঞ্চুরী এ.ডি। এই শতাব্দীতে রোম অঞ্চলের অনেক নামী ক্রীশ্চান দক্ষিণ ভারতে এসে বসবাস শুরু করেন। তাদের সম্পত্তির হদিশ আজও কোট্টায়ামে পাওয়া যায়।

অলওয়াই ও কোট্টায়ামের মধ্যে স্টেট এক্সপ্রেস অত্যন্ত সুন্দর আর লোভনীয়।

রাস্তার ধারে ধারে ছোট ছোট অগুন্তি গ্রাম দেখা যায়। সুন্দর সুন্দর বাড়ি। চিংগকলিয়া পাথর দিয়ে তৈরী। নারকেলের ছোবড়া দিয়ে ছাওয়া। কোণওয়ালা ছাদ দূর থেকে খুব সুন্দর দেখায়। প্রায় সব ঘরের বাইরে কেরলে হলুদ হলুদ কলা টাঙানো থাকে, আর মাটিতে কালো মরিচ রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। মরিচের লতা প্রকৃতির এক অবদান এখানে। এছাড়া টিপয়োকা (সাঁকালুর মত এক ধরনের আলু) কেটে কেটে জায়গায় জায়গায় রোদে দেওয়া। কোথাও কোথাও একজন কৃষক বাঁশের বাঁকে সব ভরে নিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাচ্ছে। কিছু ক্রীশ্চান মহিলা গীর্জা থেকে ফিরে আসছেন। কেবলের মহিলাদের পোষাক ধার্মিক বা সামাজিক যাই হোক না কেন, পোষাকেব ধবণ কিন্তু এক—জামা, ধুতি, যা পুরুষরা লুঙ্গির মত করে পরে। কিন্তু ক্রীশ্চান মহিলারা নিজেদের আলাদা দেখাবার জন্যে শাড়ি এমনভাবে বাঁধেন যাতে পিঠেব বাইরের দিক একটু দেখা যায়। ছোট্ট মেয়েরা শাদা ফ্রক পরে। রাস্তার ধারে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত হাজার হাজার ছেলে মেয়ে দেখা যায়। তারা ব্যাগ বগলদাবা করে স্কুল থেকে ফেরে। ভারি সুন্দর এই দৃশ্য। ভারতের অন্য কোন জায়গায় এ দৃশ্য আমি দেখিনি। এখানে জন সংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ পড়ালেখা জানে। মালয়ালম ভাষায় কুড়িটি দৈনিক পত্রিকা বেরোয়—হাজার হাজাব ছাপা হয় সেগুলি। ছোট ছোট স্কুল, গীর্জা আর চায়ের দোকান দেদার দেখা যায়। রাস্তা কখনো পাহাড়ী সরু উপত্যকা পেরিয়ে যায়, কখনো নীচের সমতল কেটে বেরোয়। তার মাঝ দিয়ে নাচতে নাচতে বয়ে যায় নদী। তার উপর কাঠের পুল। দুদিকে সবুজ পানের বরোজ, চোখ জুড়ানো শীতল সুন্দর দৃশ্য। এখন ডিসেম্বর মাস। অনেক ক্ষেতে ধান হলুদ হয়ে গেছে। কাটা হচ্ছে। অনেক জায়গায় কৃষক নদীর ধারে ধারে ঢালের উপর বাঁধ বেঁধে 'চক্রম' দিয়ে জল ছেঁচে তুলছে। জল দিয়ে নতুন জমিকে ধান চাষের উপযোগী করা হচ্ছে।

কাঠের চক্রমে দুই থেকে বত্রিশ পর্যন্ত ব্লেড থাকে। তার সামনে ছোট ছোট মাচায় বসে একজন লোক পা দিয়ে কাঠেব ব্লেডগুলোকে চালায়। চক্রম চলতে থাকে আর জল এক ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে বয়ে যায়। কাঠের চক্রম ছাড়াও ধান ক্ষেতে জল ছেঁচার জন্য টিউ কুঁয়া দেখা যায়—মিশরের কুঁয়ো থেকে জল নেবার জন্যে এই পদ্ধতি ব্যবহার হতো। টিউতে থাকে এক বা একাধিক বাঁশের লম্বা লম্বা লাঠি, যার একদিকে ভার দিয়ে কুঁয়োর বাইরে রাখা হয়। অন্য দিক দুলতে থাকে, যা কুঁয়ো থেকে জল ভরে বাইরের ক্ষেতে উল্টে দেয়। আবার বোঝা নীচে যায়, আর পাত্রটি কুঁয়োর ভিতরে চলে যায়। চক্রম আর টিউ কুঁয়া এখানকার দৃশ্যের বিশেষ অঙ্গ। আবার কোথাও কোথাও, যেখানে জল মাটির খুব কাছে একটি পাত্রকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দোলার মত দোলানো হয়। পাত্র জলে পড়ে জল ভরে; জল ক্ষেতে ফেলে পাত্রটি আবার ফিরে আসে।

নীচে ধানের ফসল হয়। উপত্যকায় টিপয়োকা হয়, যাকে এখানকার লোকেরা মিরচৌনি বলে। মিরচৌনির গাছ আট ফুট উঁপরে দেখা যায়। এর ডালে আলুর মত ফল হয়, যাতে আলুর গুন থাকে। মিরচৌনির চাষ কলম কেটে করতে হয়, অর্থাৎ

গাছের ডাল পাতলা করে ছয় ইঞ্চি কেটে পুঁতে দেওয়া হয়। তার আশেপাশে মাটি দেওয়া হয়, যাতে সার ও জল দুই দেওয়া হয়। কিছুদিন পরে এই মিরচৌনির চোখ থেকে সবুজ সবুজ পাতা বেরোয়। পাহাড়ী ক্ষেতে যেখানে ধান হয় না, সেখানে মিরচৌনি সাধারণ কৃষকের খোরাক। তারা তা শুকিয়ে আলুর মত সেদ্ধ করে মাছের সঙ্গে খায়; মিরচৌনি আর মাছ খাবার হিসেবে খুব ভাল কারণ মিরচৌনিতে স্টার্চ আছে, আর মাছে প্রোটিন। কিন্তু কৃষকরা দারিদ্রের জন্যে মাছ বাজারে বেচে দেয়, নিজেরা শুধু মিরচৌনি খায়। ফলে তাদের অন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়; তা তাদের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেয়। এখানকার কৃষকদের মধ্যে অন্ত্রের রোগ খুবই বেশি।

এই এলাকায় কেশোন্ডি বৃক্ষ অনেক দেখতে পাওয়া যায়। নদীর ধারে পাহাড়ের উপত্যকায় নীচের ঢালে যেখানেই দেখুন এই গাছ। যেখানে ধান চাষ হয়, সেখানেও এই গাছ দেখা যায়। যেখানে ধান হয় না, সেখানেও এই গাছ পাওয়া যায়। যেখানে কিছুই নেই অথবা জমি পাথুরে সেখানেও এই গাছ থাকে। এই গাছ কেউ দেখভাল করে না। নিজেই জন্মায়, নিজেই বাড়ে। কিন্তু এটা কেশোন্ডি গাছ। এ খুব প্রয়োজনীয় গাছ।

এই গাছের উচ্চতার দিকে তাকাবার দরকার নেই, দরকার নেই বাদামী রঙের ফুলের দিকে তাকাবার, ফুল ঝরে যাবার পর এমন এক ফল আসে যা পশ্চিমীদেশে বিশেষত আমেরিকার লোকেরা খেতে খুব ভালোবাসে। এই ফলের নাম কাজু। ত্রিবান্দ্রুরের লোকেরা এই শিল্প থেকে লক্ষ লক্ষ ডলার আয় করে। এখান থেকে কাজু সাফ করে আমেরিকা পাঠানো হয়, সেখান থেকে সোনা, রূপোর ডলার আসে এবং সাম্রাজ্যবাদের গোলামি আসে। এর নাম রাখা হয়েছে সাউথ ইস্ট এশিয়া। বলা হচ্ছে আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি হতে চলেছে। কাজু গাছের কাঠের তৈরী কলম দিয়ে তা সই করা হবে।

শুধু কাজু গাছ কেন কেরলের সব গাছ থেকে ডলার আসে, চা কফি, কাজুনাট, মরিচ, রবার, গুনতেই থাকুন—সব গাছ থেকেই ডলার আসে। শুধুমাত্র নদীর তীরের বালি থেকে ডলার আসে না। তবে জানা গেছে এখানের লাল বালিতে ইউরেনিয়াম আছে ; তাই এখান থেকে লাল বালি বস্তাতে ভরে ভরে আমেরিকা পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে এখন ডলার আসছে, পরে অ্যাটম বোম আসবে।

আমি লরিতে বসে বসে ভাবছিলাম কেরল এত যে ডলার কামায়, সেগুলো কোথায় যায়? এত ডলার কামানোর পরও কেরলের জনগণ কেন এত বুভুক্ষু? এত সুন্দর পাহাড়ের মালিক হয়েও এত মূল্যবান খনিজ পদার্থ থাকতেও, আজ তার মাথায় টুপি নেই, পায়ে জুতো নেই, পেটে ভাত নেই, কেবল সারা শরীরের ক্ষতস্থান থেকে পুঁজ বেরোচ্ছে। জানিনা ১৫ই আগষ্ট যে স্বাধীনতা এসেছিল, কোন ডাকাত তাকে তুলে নিয়ে গেছে! এই স্বাধীনতা কৃষকদের হাতে পড়েনি। হ্যা, ত্রিবান্দ্রামের বাজারে মোটর আগের মতই ঘোরে আর কোট্টায়ামের বাজারে বাটার সুন্দর জুতো বিকোয়, আল্লেপিতে লরির ঠিকাদাররা সোনালী ধুতিও পরে। কিন্তু ডলার উপার্জন করা

জনগণকে এই মোটরে বসতে দেখিনা কেন? চন্দনাশেরীর কৃষকদের বাটার জুতো পরতে দেখিনা কেন, কেন আমি জমকালো পাগড়ি আর ধুতি আলেপ্পির নারকেলের ছোবড়া বোনা শ্রমিকের শরীরে দেখিনা? আর আমি ভাবি যে লোকগুলি জনগণের কাছ থেকে তাদের মোটর, জুতো, জমকালো ধুতি ছিনিয়ে নিয়েছে, সম্ভবত তারাই কেরলের জনগণের মেহনতের সোনার মুদ্রা আর তাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। জনগণের নগ্ন মাথায় পরিয়ে গেছে নারকেল পাতার টুপি। পায়ে জুতো পায়নি, পেয়েছে বিষাক্ত সাপের ছোবল। এই পাহাড়ের ওপারে উত্তরী মালাবারে জনগণ লড়াই করছে। কেরলের দক্ষিণে, পূর্বে, উত্তরে, পশ্চিমে ও কেরলের মধ্যেও জনগণ ধোকাবাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কিন্তু এই হেরাফিরি, এই দালালি, এই চোরাবাজারী, এই রাজনৈতিক তামাশা শেষ হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। আমি এই রকমই ভাবি।'

লরির বাইরের দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। নারকেলের উঁচু উঁচু সাদা সাদা গুঁড়ি, গাছের পাতা সবুজ পাখা মেলে হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে। নীল ঝিলের দূর কিনারায়, সবুজের শোভা, ঘন সবুজ, উদ্‌লামের বৃক্ষ, জলে কেরমপাঁচলা ফুল আর মেয়েটি ধানক্ষেতে গাইছে ঃ মালিক আমার কুরূপ দেখে মুখ বাঁকায় কিন্তু আমার মোতির মত চাল দেখে তা ছিনিয়ে নিতে চায়।

হাজার বছর ধরে কেরলের স্ত্রী নিজের মেহনতের, অভাবের উদাসীন গীত, পৃথিবী, আকাশ ও মালিককে শুনিয়েছে, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি, কারণ বিপ্লব কখনো দয়াভিক্ষা আব ঈশ্বরভক্তি থেকে জন্মায় না ; তাকে শক্তি দিয়ে হাসিল করতে হয়। তাই কেরলের ধানক্ষেতে এক নতুন গান জন্ম নিচ্ছে, সেই গান কেশোন্ডি গাছের মত প্রতিটি জায়গায়, প্রতিটি পদক্ষেপে জন্মাবে, সে গান মেহনতের সোনালী মুদ্রায় বাঁধা। যার কাছে কিছু নেই, সে দেরী করলে অনাহারে মারা যাবে।

কেরলের অমর শহীদের মা, আজ তোমার গান, তোমার চালের দানাকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। উত্তরের দিকে দেখ, তোমার সন্তানরা এই উপত্যকার ময়দানে একত্রিত হচ্ছে।

ত্রিবান্দ্রম পৌঁছিলাম রাত আটটায়। লরিতে আমরা এসেছি সাড়ে আট ঘন্টা। এই যাত্রায় আমার সঙ্গে শ্রীধর এবং রবি মাধবন ছিলো। দুজনেই ছাত্র এবং স্টুডেন্ট ফেডারেশনের উৎসাহী কর্মকর্তা। শ্রীধর পড়ত ত্রিবান্দ্রামে, মাধবন ওয়লুন। দুজনের রাস্তায় খুবই ক্ষিদে পেয়েছিল এবং দুজনেই পথে আমার কম খাওয়া দেখে বিস্মিত হয়েছিল। শ্রীধর কম কথা বলত, মাধবন আরও কম। মাধবনের আকৃতি ছোট, শ্রীধরের আকৃতি তার থেকেও ছোট ; মাধবনের চোখে এক বিচিত্র গাম্ভীর্য ছিল, শ্রীধরের চোখে দুষ্টুমি ভরা চাঞ্চল্য। সে প্রায়ই আমার দিকে তাকিয়ে নাক বাঁকিয়ে সুঁ সুঁ করত, আর আমরা কোন জিনিষকে থু থু করলে ব্যঙ্গ করত।

লরিতে আমরা একসঙ্গে বসেছিলাম। আমাদের পেছনে বিচিত্র লোকেরা বসে ছিল। আমাদের সামনে একজন পাদ্রী। তিনি ভিন্ন জায়গার ধার্মিকতা বিষয়ে অবগত করাচ্ছিলেন। পেছনের সিটের দুজন ভদ্রলোক সারা রাস্তা মদ ও মেয়ে নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কখনও কখনও এমন হচ্ছিলো যে একই জায়গা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মতামত পাওয়া যাচ্ছিল।

যেমন, একটি জায়গায় শ্রীধর আমাকে বললে, 'দেখুন এই, শঙ্খনাসেল, আমাদের কমরেড গোপাল এই জাযগায় থাকতেন—খুবই বাহাদুব, সাহসী কমবেড। মজদুববা তাকে খুবই ভালবাসত।'

পাদ্রী এব মধ্যেই বলল, 'এটা শঙ্খনাসেল। এখানে আমাদের বিশপ নতুন গির্জা তৈরী করেছে, পালিয়া জাতিব বহুসংখক লোককে আমরা ক্রীশ্চান করেছি।

আর পেছনের সিট থেকে আওয়াজ এলো—'এটা শঙ্খনাসেল। এখানে সেই মেয়ে মারিযা থাকত ; একটু আগে তোমাকে যার সম্পর্কে বলেছি।' কি মোলায়েম মেয়েছেলে, নাবকেলের শাঁসের মত মোলায়েম' .. এর পব হাল্কা খিলখিল হাসি এবং চুপি চুপি কানে কানে কথা শুরু হলো। আমি ভাবতে লাগলাম কিভাবে একটি জাযগা সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে লোকে ভাবে, আর প্রতিবারই সেই জায়গাব ব্যক্তিত্ব পরিবর্তিত হয়ে যায়, বাস্তবে কি তাই? সত্যি কি শঙ্খনাসেলের প্রসিদ্ধি এই জন্যে হওয়া উচিত যে এখানে একজন বেশ্যা বা একটি গির্জা আছে, না এজন্যে যে সে একটি শহীদেব মা? এই প্রশ্ন যথার্থ দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু জনগণকে ভেড়া ভাবা হলে, এই জাযগায় কত ক্রীশ্চান ভেড়া, কত হিন্দু ভেড়া তার হিসাব করতে হয়। কিছু মানুষ প্রতিটি বিষয়কে কামনা বাসনার চশমা দিয়ে দেখে—এখানে স্ফূর্তিব সুযোগ কতটুকু। আর কিছু মানুষ দেখে এখানেব জনগণ প্রগতিব পৃষ্টপোষক কিনা! এখান থেকেই সাহিত্যে প্রগতিশীল তত্ত্বের শুরু। এটা স্পষ্ট যে শঙ্খনাশেলের বেশ্যার গল্প লেখা বাস্তবসম্মত হতে পারে, কিন্তু তাকে প্রগতিশীল বলা যাবে না।

এই অনুভূতি ত্রিবান্দ্রামে গিয়ে হলো—আমি পেট্রোল পাম্পের সামনে এক বিশাল ইমারত দেখছিলাম ও তারিফ করছিলাম। হঠাৎ শ্রীধর আমাকে বলল, এখানে প্রথমবার ছাত্ররা সি.পি. রামস্বামী আয়াবের ঘৃণিত হিটলারী শাসনের বিরুদ্ধে সভা করেছিল। পুলিসের লাঠি গুলি খেয়েছিল। তাই হঠাৎ আমার মনে হল, পেট্রোল পাম্প কেবল পেট্রোল ভরার মেশিন নয়, সামনের গগনচুম্বী ইমারত মনোরম শিল্প নয়—এ সবই একটি দীর্ঘযুগের পারস্পরিক সম্বন্ধ, যা জীবনের বিপ্লবী শক্তির জন্ম দেয়। মানুষ প্রগতির জন্যে লড়ে, মরে এবং নতুন তত্ত্বের নির্মান করে। এই ক্ষণ, আমার সামনের এই ক্ষণ কিন্তু একা নয়, এর শিকড় অতীতে এবং তা সঞ্চারিত হয়ে যায় ভবিষ্যতেও। কেউ গগনচুম্বী ইমারতের ইট গুনলে গণিতজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু প্রগতিশীল সাহিত্যিক হতে পারবে না। যদি সে পেট্রোলপাম্পে পেট্রোল নিয়ে যাওয়া মোটরের নানা রঙকে সাহিত্যে স্থান দেয়, তাহলে তার আশ্চর্যজনক স্মৃতি এবং রঙ লাগানোর যোগ্যতা অবশ্যই মানতে হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দুষমনদের কথাও বলতে হবে। সাহিত্য সমাজ-চিন্তার উপর অবস্থিত। অর্ধসত্য এক-চতুর্থ সত্য, আটভাগের একভাগ সত্য—তার জন্যে নয়। সে এই ধরনের সত্যতা চায় যা প্রত্যেক বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করে—তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ বিবেচনা করে এবং বর্তমানে তার অতীতের শিকড় এবং তার ভবিষ্যতের চেহারা খোঁজে।

জীবনের ছবি আঁকলেই হবে না, জীবনের পথ দেখানো চাই—দেখানো চাই সেই সত্যকে যা জনগণ এগিয়ে নিয়ে যায় ও মানুষের ভাগ্য বদলে দেয়। ত্রিবান্দ্রাম,

কোয়েলুন এবং আলেপ্পি নগরে আমাব এই ধবনের অনুভূতি হয়েছিল, কেননা তার প্রতি ইঞ্চিতে মানুষের প্রগতির জন্যে সংঘর্ষের চিহ্ন আছে। আজ এই চিহ্ন এগিয়ে যাচ্ছে ; আব আমি সেই নগরগুলির প্রতিটি ক্ষণ বদলাতে দেখছি।

দ্বিতীয় দিন আমার প্রথম বক্তৃতা ইউনিভার্সিটি কলেজে। এই কলেজ প্রায় একশো বছরের পুরনো। এখানে ছাত্ররা রাজনৈতিক আন্দোলনে সাহসী প্রমাণিত হয়েছে, দেশেব আন্দোলনে কয়েকবাব নেতৃত্বও দিয়েছে। স্যাব সি.পি. রামস্বামী আয়ারের ফ্যাসিবাদেব সময়ে এখানকার ছাত্ররা সবচেয়ে বড়ো হরতাল করেছিলেন। সেই গণসংগ্রামে কংগ্রেসও সামিল হয়। এই কলেজে দু হাজার ছাত্র ; তাব প্রায় অর্ধেক এই সভায় উপস্থিত ছিল। বক্তৃতার পর ছাত্রবা অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রশ্ন করে।

—'আপনি মার্কস লেনিনের প্রবন্ধকে সাহিত্যের শ্রেণীতে ফেলেন কেন?'

—'দক্ষিণ ভাবতেব জনগণের উপব হিন্দী যে ভাযা হিসেবে চাপিযে দেওযা হচ্ছে এ সম্পর্কে মতামত?'

—'সাহিত্যে কোন্ বস্তুকে অগ্রাধিকার দেওযা হবে—ফর্ম না কন্টেন্ট?'

—'টলস্টয়েব সাহিত্যে যে ধার্মিক প্রবৃত্তি দেখা যায তা কতদুর মানা যায়?'

প্রশ্নগুলি থেকেই বোঝা যায ছাত্ররা কত সজাগভাবে নতুন সাহিত্য ঝাড়াই বাছাই করে. প্রগতিশীল সাহিত্যেব প্রতি তাদেব কত অনুবাগ। সভাব সভাপতি ছিলেন প্রফেসার গুপ্ত নায়ার। তিনি নিজে মালযালম ভাষায একজন ভাল নাট্যকার এবং অভিনেতা। কথাবার্তা অত্যন্ত পরিশীলিত এবং তা তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি প্রধান আকর্ষণও।'

এবাব যেতে হলো টাউন হলে, সেখানে মহাত্মা গান্ধী কলেজের ছাত্রদেব তরফে বড়ো সভার আয়োজন করা হয়। টাউন হল বেশি দূরে নয় বলে আমরা পায়ে হেঁটে এগোলাম। আমার সঙ্গে গুপ্ত নায়াব এবং অন্যান্যরা ছিলেন। কেয়ারির পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে আমরা কলেজ ক্যাম্পাসের বিশাল ময়দানে পৌঁছালাম, সভা হবার কথা এক আম গাছের নীচে। নায়াব আমাকে জিজ্ঞিস করলেন—'এই আম গাছ কেমন দেখছেন?'

আমি থতমত খেয়ে গেলাম।

—'ভালো, আমের গাছ যেরকম হয় সেই রকমই।'

নায়ার হেসে বলল, একবার এই আমগাছের জন্য ছেলেরা হরতাল করেছিল।

—'কেন? কিভাবে?' আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

নায়ার বলল, 'কলেজের পরিচালকরা এই গাছ কেটে দিতে চেয়েছিলো।'

ছাত্ররা কিছুতেই কাটতে দেবে না। এই গাছ ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। শত শত ছাত্র দুবন্ত রোদে এর শীতল ছায়ায় বিশ্রাম নেয়।'

আমাদের সামনে আম গাছের ঘন ছায়া। গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দুজন যুবক বই পড়ছিল। গাছের হৃদয়ে খোদাই করা ছিল অনেক কথা। এক জায়গায় লেখা ছিলো, 'প্রতিজ্ঞা করছি আমি যাব।' কোথাও যুবক-যুবতীদের স্মৃতি ও বচনবদ্ধতা—'কেবল তোমার' ; অনেক লোভনীয় দৃশ্য, প্রেমের কত তাজমহল এই বৃক্ষের হৃদয়ে সুরক্ষিত। আমি ভাবলাম আমাদের ছাত্ররা কত হৃদয়বান। কত প্রগতিশীল। তারা যেমন পরিবহন

শ্রমিকদের জন্য লড়াই করেন, তেমনি আম গাছের জন্যও লড়াই করেন। যারা সৌন্দর্য ও শিল্পের পরম্পরা নিয়ে লড়াই করেন, তাদের ত্রিবান্দ্রম গিয়ে এই গাছটি দেখে আসা উচিত। এই গাছটিকে প্রাচীন সৌন্দর্যের রক্ষাকর্তারা ও নবীন সৌন্দর্যের নির্মাতারা উভয়েই নিজের রক্ত দিয়ে রক্ষা করেছেন। এই সাহিত্যকে সেই সব বিশাল সাহিত্যিকরা কিভাবে রক্ষা করবেন, যাঁরা নারী দেহকে পবিত্র দৃষ্টিতে দেখতে পারেন না, যাঁরা বায়রণের মতো প্রেমিকার ঠোঁটে লাসের দুর্গন্ধ পান, আর জনসংঘর্ষে অংশে নিলে প্রগতিশীলদের বলেন পকেটমার। জনগণ ভালভাবেই জানেন স্বাধীনতার নামে কে তাদের পকেট কেটেছে এবং সৌন্দর্যের নামে কারা আমের গাছ কাটে।

টাউন হলে প্রায় হাজার লোকের ভিড় এবং প্রায় এতজনই বাইরে দাঁড়িয়ে। বক্তৃতার পর আমি হোটেলে চলে গেলাম। এখানে অনেক রাত পর্যন্ত প্রগতিশীল সাহিত্য নিয়ে বিতর্ক চলে। এই পুরো সময় ধরে আমাদের বাদবিবাদ। প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘ ইত্যাদি প্রেস ভালোভাবেই প্রচার করে, আসলে কেরলের সাংবাদিকদের একটা বড়ো অংশ প্রগতিশীল আন্দোলন সম্পর্কে সহানুভূতিশীল ; এঁরা নিজেদের মজদুর ভেবে কাজ করেন, সাংবাদিকরা তাঁদের সংগঠন ট্রেড ইউনিয়নের ঢঙে চালান, পুঁজিবাদী মালিকদের বিপক্ষে নিজেদের অধিকারের পক্ষে লড়াই চালান। এই জন্যেই আমাদের সমস্যা এবং চিন্তাধারা সম্পর্কে এঁদের সহানুভূতি আছে।

ত্রিবান্দ্রামের দক্ষিণের শেষ সীমায় রাসকুমারী। সাধারণ লোকেরা তাকেই বলে কন্যাকুমারী। সেখানে যাবার জন্যে থমাস অর্থাৎ রাজনের গাড়ি পাওয়া গেল। থমাসকে তার বন্ধুরা রাজন বলে ডাকে। রাজন এক ছোট প্রেসের মালিক। কিছুদিন আগে সে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করত। এই পত্রিকাটি চুরাশি বছরের পুরনো। সেই কাগজে দক্ষিণ ভারতের রাজনীতির সব রং দেখা গিয়েছিল। সরকারের ধামাধরা থেকে সুবিধাবাদ এবং সমঝোতাবাদ, সম্প্রদায়বাদ থেকে সাম্যবাদ। সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে যেতেই প্রশাসন বন্ধ করে দেয় কাগজ।

—'চুরাশি বছরের পুরনো কাগজ। আমার পূর্বপুরুষেরা রক্ত দিয়ে লালন পালন করেছেন', রাজন ত্রিবান্দ্রামের চিত্রঘরের সামনে থেকে গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'ঘাবড়াবেন না, আমি আবার কাগজ বের করব। ঐ নামে না হোক, অন্য কোন নামে। জনগণের কাগজ কখনও মরে না। তার ততগুলিই নাম যতগুলি সাধারণ লোকের নাম—সে নাম বদলে বদলে সামনে আসে, আর বাজারগুলিতে, জঙ্গলে, অলিতে গলিতে তার নিজস্ব বাণী শোনাতে থাকে। আর যখন জনগণের শত্রুরা আইন করে কাগজের অফিসের দরজা বন্ধ করে দেয়, তখন সেই কাগজ আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায় ; আবার সেখান থেকে একটা সবুজ পাতার মত ফুটে ওঠে। তার পৃষ্ঠা জনগণের হৃদয়ে ছাপা হতে থাকে ; তার বাণী জঙ্গলগুলিতে, অলিতে গলিতে এবং বাজারে আবার শোনা যায় ; আবার মানুষ কানে কানে তার সম্পর্কে কথা বলতে থাকে। ছাত্র মজদুর কৃষক এক হাত থেকে অন্য হাতে তা দিয়ে দেয়, যেমন করে এক প্রদীপ থেকে অন্য প্রদীপ জ্বলে ওঠে, হাসির থেকে হাসি ছড়িয়ে যায়, জনগণের খবরের কাগজ জনগণের হৃদয়ে বিপ্লবের আলো ছড়িয়ে দেয়। পাহারাদার ঘেরা বন্ধ কামরায় অত্যাচারী কেঁপে

ওঠে—এই কাগজ আবার বেঁচে উঠেছে! আমরা তো এটাকে হত্যা করেছিলাম, কালই হত্যা করেছিলাম, পরশু তার ভাইকে হত্যা করেছিলাম, তার আগে তার আর এক ভাইকে মেরেছিলাম। তার আগে...। আজ ফের এটা বেঁচে উঠেছে! খবরের কাগজের শব্দ তার চোখের সামনে অমর হাসির তালে নাচতে থাকে। আমরা মরতে পারিনা কারণ আমরা জনগণের শব্দ, কেউ আমাদের কিনতে পারে না, কেউ আমাদের বেচতে পারে না, কেউ আমাদের গলায় ফাঁসির দড়ি ঝোলাতে পারে না ; কারণ আমাদের মধ্যে রয়েছে জনগণের আওয়াজ, তাদের হৃদয় ও অমর অভিব্যক্তি, একজন ব্যক্তি মারা যেতে পারে, দুজন লোক মারা যেতে পারে, দুলক্ষ লোক মারা যেতে পারে, দুলাখ প্রাণী মারা যেতে পারে, কিন্তু সমস্ত জনগণকে হত্যা করা যায় না ; এইজন্যে আবার আজ তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। কাল তুমি তোমার জ্ঞাতসারে আমাদের হত্যা করেছিলে, কিন্তু আমরা মরিনি। আমরা এই পৃথিবীর হৃদয়ে বীজের মত লুকিয়ে ছিলাম ; সেখানে আমরা গরম ওম পেয়েছি, কারো রক্ত কারো ভালবাসা পেয়েছি, কেউ তার শ্বাস-প্রশ্বাস দিয়েছে—আজ আমরা জীবিত হয়ে পৃথিবী থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছি, আর তোমাদের মাথার উপর ইতিহাসের তরবারি হয়ে নাচছি। অত্যাচারীরা, তোমরা আমাদের ভয় পাচ্ছ, তোমাদের ভয় অকারণ নয়, কারণ অত্যাচারীরা লুপ্ত হয়ে যায়, অত্যাচার শেষ হয়ে যায়, কিন্তু জনগণ জীবিত থাকে, সাহিত্য তাদের চিরকালের মত অমর করে রাখে।

রাজনের গাড়ি কন্যাকুমারীর দিকে ছুটছিল আর রাজন বলছিল, খবর কাগজ বন্ধ হওয়া বড় দুঃখের। আমার মনে হয়, এরা আমার বড় ভাইকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন কেবল আমি আছি, আমার বৌ আর ছোট ছেলে—ঘরে খবরের কাগজ নেই, খালি খালি লাগে। ছাত্রসংঘের সভাপতি গোপী বলল, 'কাগজ বন্ধ হবার কিছুদিন পর রাজনের ঘরে তল্লাসী হয়।'

—'কেন?'

—'তাদের ধারণা ছিল, ঘরে আমি কমিউনিস্টদের লুকিয়ে রেখেছি', রাজন মিষ্টি হাসি হেসে বলল।

সদাহাস্যময় গোপী বলল, 'যদি খালি তল্লাসী করত তাহলে বলার কিছু ছিল না, এতো হয়েই থাকে। কিন্তু তারা ঘরের প্রতিটি জিনিষ ভেঙ্গে দিয়েছিল।' রাজন বলল, 'পুলিস মাটির ঘড়া ও জলের ঘড়াতেও উঁকি মেরে দেখেছিল, পাছে কোন কমিউনিস্ট লুকিয়ে থাকে সেখানে। রান্না ঘরের প্রতিটি বাসন ভেঙে দিয়েছিল, বই ছিঁড়ে দিয়েছিল; রেডিও, খাট, চেয়ার, টেবিল, দোলনা—সব ভেঙে দিয়েছিল।'

—'বাচ্চার দোলনা?' আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

—'হ্যাঁ', রাজন বলল, 'দোলনায় পাছে কোন কমিউনিস্ট থাকে।' একটু থেমে বলল, 'অবশ্য ভুলও নয়। সেই দোলনাতে আমার ছেলে শুয়ে ছিল।'

ফিলিপস রাজনের দিকে ঝুঁকে বলল, 'তোমার গাড়িটা নিরাপদ তো?'

—'সেটাও এইজন্যে যে আমার গাড়ি অন্যদেরও কাজে লাগে। আর অনেক রকম লোকের জন্যে কাজে লাগে। সেইজন্যে আমি যখন চাই তখনই বেশি পেট্রোল পাই।'

গোপী বলল, 'হ্যা, পুলিসের কাজও হালকা করে দাও।'

এখন আমরা ত্রিবান্দ্রম থেকে ছ' মাইল দূরে। রাজন সংকেত করে বলল, 'শহরেব বাস সার্ভিস এখান থেকেই চলে, কারণ এখানে একজন এম.এল.এ থাকেন।'

—'ঐ বিশাল ইমারত দেখছেন?'

—'হ্যা ওটা কি?'

—'ওটা কসাইখানা। এটা বানানোব জন্যে ঠিকে দেওয়া হয়।'

—'কে নিয়েছেন?'

—'একজন কট্টর সন্ন্যাসী. .অহিংসা ধর্মের জয়।'

আমি বললাম, 'অহিংসার ধর্মশাস্ত্র ছাগল এবং মানুষের জন্য নয় ; তা কেবল দেবতা ও চোরাবাজারীদের জন্য নিশ্চিত হয়ে গেছে।' গোপী বলল, 'আর এই যে জায়গা দেখছেন, এর নাম ছ' কেলা।'

—'ছ কেলা?'

—'এক সময় এখানে কলার ছ'টি গাছ ছিল, আমি বললাম, বোম্বাইতে আমার বাড়িব কথা মনে পড়ছে। তাব নামও বিচিত্র—চার বাংলা। কোন সময় সেখানে চারটি বাড়ি ছিল হয়তো।

—কিন্তু মশায়, আপনাব চার বাংলায় কি কোন পুকুর আছে, যেখানে ব্যাঙ দেখা যায় না? বাজন জিজ্ঞাসা কবল।

—'না'।

—'তাহলে এই পুকুবটা দেখুন। এই পুকুরে একটাও ব্যাঙ নেই। যখন দেবাদিদেব ইন্দ্র গৌতম ঋষির অনুপস্থিতিতে তার পত্নী অহল্যাকে সম্ভোগ করতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় ব্যাঙ খুব উৎপাত করেছিল। রেগে ইন্দ্র এই পুকুরের সব ব্যাঙকে অভিশাপ দেন।'

আমি আশ্চর্য হয়ে রাজনেব মুখেব দিকে তাকালাম।

বাজন হেসে বলল, 'ঘটনা হচ্ছে, এই পুকুবের জলে গন্ধক মেশানো আছে। এইজন্যে এখানে ব্যাঙ হয় না। এই দেখুন...পুকুরের জলের রঙ হলদে।'

পুকুব অনেক পেছনে বয়ে গেছে, আর বাজন বলে চলেছে এই গন্ধকেব জন্যে এই অঞ্চলেব অধিবাসীদের মধ্যে চর্মরোগ কম হয়, এখানে লোকজন অনেক বেশি দিন জীবিত থাকেন।

এখন গাড়ি একটা ছোট্ট মফস্বল শহর দিয়ে যাচ্ছিল। এটা নারকেল ছোবড়াব কাজের একটা বড কেন্দ্র। কিন্তু আজকাল মজুররা বেকার বসে আছে।

—'কেন'?

—'ব্যাপারটা হলো নারকেলের ছোবড়া চোরাবাজারে চলে যাচ্ছে। কেন্দ্রগুলি তাই বন্ধ। মজুররাও বেকার হয়ে গেছে।'

রাস্তার জায়গায় জায়গায় গীর্জা মসজিদ দেখা যাচ্ছিল। রাজন বলল, 'ব্যাপারটা এই নয় যে এরা ধনী। এই এলাকার লোকেরা তামিলনাড়ু ও কেরল দুই জায়গার মতই গরীব। আসলে বেচারা জনগণ এত সরল ও অন্ধবিশ্বাসী যে এখনও পর্যন্ত ধর্মের জালে বাঁধা রয়েছে। তারা ভাবে এই জীবনে গরীব থাকলেও সামনের জীবনে সবই পাবে তারা। সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলি ভাবে চিন্তাধারাই তাদের ধনশালী করেছে। তাই

এখানকাব মানুষরা গরীব হলেও গীর্জার পাদ্রীরা, মসজিদ আর মাজারের মোল্লারা অত্যন্ত ধনী।'

—'পাদ্রী আর মোল্লাদের মধ্যে কখনও লড়াই হয় না?'

—'এই লড়াই এই এলাকাব বৈশিষ্ট্য', রাজন বলল, 'মুসলমানের সংখ্যা কম, কিন্তু লড়াইয়ের ধবণ অনেক। এই লোকগুলি জেলে। লড়াই, মাথা ফাটাফাটি রক্তপাত এদের ধার্মিক কর্তব্যে সামিল করে দিয়েছে। এই ঝগড়া যখন আদালতে পৌঁছে যায়, তখন মোল্লা ও পাদ্রীরা এর ব্যবস্থা কবে। তাবা ভালো কাজের জন্যে পয়সা খরচ কবায়, যার অংশ থেকে কোন গীর্জা বা ভালো মাজার তৈরী হযে যায়, আবার নতুন ঝগড়া আবম্ভ হয়।' 'কোট্টাযামের বিশপ দক্ষিণ ভারতেব সবচেয়ে ধনবান ব্যক্তিদের একজন', গোপী বলল আমাকে।

রাজন চা-জলখাবাবের জন্য গাড়ি এক জায়গায দাঁড় করাল। দাঁড করাতেই কয়েকটি মেয়ে তাকে ঘিবে ফেলল। তাবা খুব রঙ-চঙে শাড়ি পরেছিল। কানে তাদের বিচিত্র গঠনের কানফুল, যেন সাপ কুন্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। তাদের বাহুতে উল্কি আঁকা। হাতে ছিল পালমায়বার তৈরী ছোট ছোট সিন্দুক, ব্যাগ ও মোড়া।

চায়েব বদলে আমরা পালমায়বার ঠান্ডা, মিষ্টি রস খেলাম। সামনের দোকানে একটি ক্যালেন্ডার টাঙানো ছিল . তাতে নেহেরু ও পোপেব ছবি ছাপা। পোপ এবং নেহেরু একসঙ্গে—বিচিত্র ক্যালেন্ডার। ফিলিপস বলল, 'এ আর বিচিত্র কি।' একটু থেমে বলল, 'যে লোক এই ক্যালেন্ডার ছেপেছে তার বুদ্ধির তারিফ করতেই হয। এই ব্যস্ততার যুগে এখানে সময মতই পোপের ফবমান পৌঁচেছে এবং তা কাজে পরিণতও কবা হচ্ছে। ফরমানে ক্রীশ্চানদের কমিউনিস্টদের থেকে দূবে থাকার জন্যে ঈশ্বরীয় আদেশ দেওয়া হয়েছে ; এও আদেশ দেওয়া হযেছে যে, তারা যেন সাম্যবাদীদের খতম করে দেয়, অতএব এমনও সম্ভব, কিছুদিন পব চার্চ আমাদের ছেলেদের আর ব্যাপটাইজ করবে না। আমাদের বিযে দেবে না তারা এবং আমাদের কবরের জায়গাও দেবে না। তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ কি হবে?'

—'দুনিয়া আমাদের দেখতে পাবে, কিন্তু এই ধার্মিকরা দেখবে না।' রাজন আমাকে বলল, 'এই ছোট্ট সিন্দুকটা নিয়ে যাও। এটা একটা বিশেষ ব্যাপার।' আমি মাথা নাড়লাম।

—'আচ্ছা, তাহলে এই ব্যাগটা।'

—'না'

—'এই পাখা'।

—'না'।

—'এই পালমাযরা কাঠ দিয়ে বইয়ের র‍্যাক করে। তুমি নেবে?'

—'আমাকে ঐ ক্যালেন্ডার দাও, পোপ-নেহেরুর ছবিওলা ক্যালেন্ডার'; এটা তো ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়ার চেয়েও বড়ো ডিসকভারি। আমার কি ইচ্ছে করেছে জানো? আমি এমন একটা স্বচ্ছ আয়না চাই, যাতে উল্টো দিক দেখা যায়। যদি এমন একটা আয়না আমার কাছে থাকত, তাহলে আমি রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সব শহীদ ও দেশভক্তদের ডাকতাম—যাঁরা সংসদে লড়েছে, যারা ক্ষেতে যুদ্ধ করেছে এবং ১৯৪২-

এর আন্দোলনে যাঁদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে, আমি চাই দাদাভাই নওরোজী থেকে ভগৎ সিং পর্যন্ত সবাইকে এক লাইনে দাঁড় করাতে। তাদের এক এক করে ক্যালেন্ডার দেখিয়ে জিজ্ঞেস করতাম—তুমি কি এই ক্যালেন্ডারের জন্যে স্বাধীনতার লড়াই লড়েছিলে?

পোপ এবং নেহেরু ...
পোপ এবং নেহেরু!!
পহুঁচী বঁহী প্যার খাক জহাঁ
কা সমীর থা।

রাজন দুঃখে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল, 'এই ক্যালেন্ডার দেখলে সত্যিই খুব দুঃখ হয় ; আর মনে হয় ১৯৪২ সালে ভারতবর্ষে যা কিছু হয়েছিল তা বিপ্লব নয়, বিপ্লবের গর্ভপাত', বাজন গাড়ি চালু করতে করতে বলল ; 'ভবিষ্যৎ দেখার জন্যে আয়নার দরকার কি? এখানে কাছেই শাহী পরিবারেব প্রাচীন মহল আছে। এসো তোমাকে দেখাই। তার পাশেই আমাদের ডাচ কম্যান্ডারের কবর। তিনি আমাদের রাজ্যের অনেক উন্নতি করেছেন—ক্যাপ্টেন ডিলনার।'

—'ডাচ কম্যান্ডার'?

—'হ্যা, সে একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিল। সে আমাদের রাজ্য আক্রমণও কবে কিন্তু আমাদের কম্যান্ডার তাকে পরাজিত করেন। সেই সময় মহারাজা বুদ্ধি করে তাকে আমাদের ফৌজে সামিল করলেন শুধু নয়, সেনাপতি বানিয়ে দিলেন। সেই কম্যান্ডার অনেক জায়গির পান ও ছোট ছোট রাজ্য জয় করেন ; সেগুলিকে আমাদের রাজ্যে মিলিয়ে দেন।' এক ছোট্ট পাহাড়ের তরাইয়ে একটা খোলা গীর্জার ভেতরে ক্যাপ্টেনের কবর। সেখানে ছাদও ছিল না। খুব সাদামাঠা কবর। খোলা ছাদের গীর্জা আমার খুব ভালো লাগে। গীর্জার ভেতরে ও বাইরে সুন্দর ঘাসের টুকরো জমি। তেঁতুলের বড় বড় গাছ শান্তভাবে কাঁচা সড়কের উপর ছায়া বিছিয়ে দাঁড়িয়ে। কবর থেকে বেরিয়ে ঐ সড়কের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে এগোতে আমরা সেই যুগের কথা ভাবছিলাম। তখন ডাচদের জাহাজ ও ফরাসীদের রণতরী, পর্তুগীজ ও ইংরেজরা ভারতের মাটিতে একটু একটু করে পা রাখছিল। শিল্প বিপ্লবের পর ইউরোপের সামন্তবাদী যুগ মুঘল ভারতের উপর প্রভাব বিস্তার করছিল। ভারত ইউরোপের বিপ্লব থেকে কোন ফায়দা তোলেনি, বরং নিজেই মুছে গেল। আজকের ভারত সাম্যবাদী বিপ্লব থেকেও কোন শিক্ষা নিচ্ছে না।

ফণিমনসার উঁচু উঁচু ঝাড়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে রাজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। একটা গাছ দেখিয়ে নাম জিজ্ঞেস করল।

—'কোনটা'?

—'এটা চন্দনের গাছ'।

—'ছিঃ ছিঃ', হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বোরোল। 'এই পচা দুর্গন্ধ, বোঁচা কালো, খসখসে গুঁড়িওয়ালা এটা চন্দনের গাছ? ছোট্ট ছোট্ট শুকনো পাতা, হলদেটে মরা ফুল, আরে এটা চন্দনের গাছ? এই কুৎসিৎ চন্দনের এটা বাছ ছিঃ ছিঃ। এই গাছ কত ছলনা করেছে উর্দু শায়েরদের? যদি তারা জীবনে একবারও এই গাছ দেখত তাহলে কখনও

চন্দনের মত বাহুর কথা বলত না। আচ্ছা, এই চন্দনের বাহু কি এত খসখসে, এত কুৎসিৎ হয়?' আমাদের শায়েরী যে বাস্তব থেকে অনেক দূরে তা এই চন্দনের গাছ দেখে বুঝলাম আমি। আমি রাজনকে বললাম, 'দক্ষিণ ভারতে এসে দুটি নামের যাদু ভেঙেছে আমার—একটি নেহেরু, অন্যটি চন্দন, যদিও দুটি নামই অন্তত সৌগন্ধিক মনে হয়'। রাজন হাসতে হাসতে বলল, 'এমনিতে চন্দন খুবই উপযোগী'।

—'কোথায় সেই চন্দন'?

—'এই গাছের ছাল আলাদা করে দেওয়া হয়। তাতে চন্দন হয় না। ফের তার গুঁড়ির উপর থেকে কাঠ আলাদা করে দেওয়া হয়, এবার সেই গুঁড়ির ভেতরের যে কাঠ তাকে বলে পথ। সেই পথ থেকেই চন্দনের তেল বেরোয়'।

চারু দত্ত বলল, 'এবার এগোও। শাহী মহল দেখতে হবে। তাড়াতাড়ি করো, রাস্তায় অনেক কিছু দেখার আছে।'

এই শাহী মহলের ইমারত চারশো কি ছশো বছরের পুরনো। এই শাহী মহল মালাবারী শিল্পের উৎকৃষ্ট নমুনা। ছ-কোণওয়ালা ছন্দ নারকেলের পাতার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। পতাকা তোলার জন্যে কোডিমরম, হল্যান্ডের সেগুন কাঠের পালঙ্ক, চীনের চাবি, তালা। কোনটি ভারতের, কোনটি বাইরের, কোনটি শুদ্ধ, কোনটি অশুদ্ধ? মনে হয়, শুধু আজ নয়, পৃথিবীতে কোনদিনই শুদ্ধ-অশুদ্ধ আলাদা করা হয়নি। পৃথিবী সবসময়েই এক ছিল—উন্নতি কোথাও একটু আগে এসেছে, কোথাও একটু দেরীতে। অনেক রক্তপাত হয়েছে—কিন্তু এই সব সভ্যতা ও শিক্ষার ভান্ডার নতুন পুরনোয় মিলেমিশে এগিয়ে গেছে। ছ'শো বছরের মহল দেখে এটা অনুভব হল যে এটা মহল নয়, অতীতের নদী, সেখানে আলাদা আলাদা তরঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে এগিয়েছে।

এই মহল চারতলা সমান উঁচু। ফরাসী অধ্যাপক লোঁভির মতে তা ফরাসী শিল্পকলার শীর্ষস্থানে। শ্যাম ইন্দোচীনের বর্তমান শিল্পকলা এখান থেকে ধার নেওয়া। চারতলার এই উঁচু মহলে সেগুন কাঠের ব্যবহার করা হয়েছে ; ছশো বছর পরও তা প্রথমদিনের মতই সমান মজবুত। সব চেয়ে উপরের তলায় রাজপরিবারের দেবতা থাকেন। এই দেবতার ঘরে আজও ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলে। জানিনা এই ঘি আসল না নকল। প্রদীপ কিন্তু আসল পিতলের, তার উপরে এক ঘোড়সওয়ার—এরকম ভালো খোদাই করা মূর্তি আমি কখনও দেখিনি, দেবতার কামরার চারিদিকে হিন্দু দেবদেবীদের চিত্র—তাতে চীনের সভ্যতার ঝলক পাওয়া যায়। দেবতার পালঙ্ক সেগুন কাঠের, তার কাজ হল্যান্ডের। এটি একজন ডাচ ছুতোর তৈরী করে। তার উপর জংলী পশুদের চিত্র আঁকা এবং তার মধ্যে একটি ক্রুশের নিশানা। শুনেছি, যখন ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন এক হচ্ছিলো, তখন মহারাজা বলেছিলেন, তিনি ইষ্টদেবতার কাছ থেকে আদেশ নেবেন। সর্দার প্যাটেল রাজী হননি। অবশ্য দেবতা এখন এই মহলে থাকেন না। এখন কেবল কাঠের খাটের উপর খোদাই সবুজ সবুজ টিয়া নিজের ঠোঁট খুলে বলছে—'রাম নাম সত্য হ্যায়'।

রাণীদের কামরায় আয়না লাগানো এবং দোলনাও টাঙানো। দেওয়ালে গয়না পরা স্ত্রীলোকের ছবি. কৃষ্ণের বাল্যলীলা। ছবির মেয়েগুলি বেশ মোটাসোটা—খাওয়া ছাড়া

তাদের অন্য কোন কাজ ছিলো না। শাহীর ভান্ডারে চীনে তালা ও শিকল দেখে মনে হয়, শাহী পরিবার ভারতীয় তালার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেনি। লঙ্গরখানায় এক হাজারেরও বেশি লোকের বসার জায়গা। কিন্তু আজকাল রেশন দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, মহলটি প্রাচীন। দরবারের চৌকিগুলি অনেক উঁচু এবং খড়খড়িগুলি পাথরের মজবুত জাল দিয়ে ঢাকা, যাতে দেখার বাহানায় শত্রুরা তীর চালাতে না পারে। একটি কামরায় লোহার খাঁচা। সেখানে জীবিত মানুষকে বন্ধ করে ফেলে রাখা হত। সে সেখানে না খেয়ে মারা যেত।

এখানে পুরনো খাঁচা, জীবিত মানুষকে জ্বালানোর বাসন এবং অন্যভাবে শাস্তি দেবার (শিক্ষাপ্রদ) বস্তুর সংগ্রহ আছে। আছে বড়ো বড়ো নক্সা কাটা বাসন যাতে লাস মাটিতে পুঁতে দেওয়া হত। ভারতবর্ষে আগে মানুষকে পোড়ানো হতো না। শাহী মহলে সেই বাসন এখনও সুরক্ষিত আছে। কিন্তু সবচেয়ে মনোরঞ্জক যে জিনিষটি শাহী মহলে সুরক্ষিত আছে তা হলো একটি চমকপ্রদ তলোয়ার। এটি ছিল এক দেশভক্ত কৃষকের। ছোট ছোট জায়গিরদার, অফিসার, মহারাজা এবং ইংরেজ রাজ—সবকিছুর উপরই উত্যক্ত হয়ে কৃষকটি বিদ্রোহ করে। আজ থেকে অনেক বছর আগের কথা। তখন স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়নি। তখন লড়াইতে তরবারি ব্যবহার হতো। তার শত্রুরাও বলে সেই কৃষক ছিলেন অত্যন্ত বাহাদুর নির্ভীক নেতা। তিনি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। শক্ত হাতে তা দমন করা হয়। শেষে বলা হলো, আত্মসমর্পণ করলে সেই কৃষককে শাস্তি দেওয়া হবে না ; কিন্তু গ্রেপ্তার করার পর তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হলো। শত্রুরা তাকে অপমান করে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল। সেই দেশভক্ত কৃষকটি ইস্পাতের তলোয়ার নিজের বুকে বিঁধিয়ে দেয়। আজও সেই তরবারি ও ইস্পাতী পাঞ্জা শাহী মহলের দেওয়ালে ঝোলানো আছে এবং তা স্মরণ করায় সেই সব নির্ভীক লড়াকু শহীদদের যারা সমাজতন্ত্রের প্রতিটি ধাপের জন্য রক্ত দিয়েছে। কিছু লোক সাম্যবাদকে এক বিদেশী বস্তু বলে মনে করে বুঝতে চায় না যে এটি একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলন এবং একে সমৃদ্ধ এবং বিকশিত করার জন্যে দুনিয়ার প্রতিটি কোনার মানুষ অংশগ্রহণ করে। এই বিশাল সমুদ্র বিন্দু বিন্দু জল দিয়ে ভরা। এই যুগ আমাদের জীবনে এসেছে, কয়েকশো বছর পেছনেও এসেছে নতুন এবং পুরনো হাওয়ার সুগন্ধ বয়ে নিয়ে। সেই সুগন্ধ কয়েক শতাব্দীর মানুষের অনুশীলন এবং জ্ঞানের নির্যাস। সেখানে সামিল রুশী অনুশীলন, জার্মান শাস্ত্র, ইংরেজ উপদেশ, চীনের বুদ্ধিমত্তা এবং প্রাচীন ভারতের সেই তরবারিও, যা এখন শাহী মহলের দেওয়ালে ঝুলছে।

শাহী মহল থেকে বেরিয়ে আমরা কাছের মফস্বল বাজারে গেলাম। তখন রাজন বলল, 'এই জায়গায় আমাদের কেরলের মজদুর আন্দোলনের প্রথম শহীদ কেলু জন্ম নিয়েছিল। বেকারি, অনাহার, যুদ্ধ, আত্মত্যাগ, শেষে বিজয়। কিন্তু কেলুর বিজয় স্বীকৃতি পায়নি।

ফিলিপস বাইরের দিকে দেখতে লাগল। রাজন বলল, 'দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার কেরলের সীমা এখানেই শেষ হচ্ছে।'

রাজনের গাড়ি সেই মোড়ে ছিল যেখান থেকে তামিলনাড়ুর এলাকা শুরু হচ্ছে।

লোকেদেব বেশভূষা বদলে যাচ্ছিল, বিশেষত মেয়েদের। ভাষা মালয়ালমের জায়গায় তামিল। গাড়ি ঢালু দিয়ে নেমে যাচ্ছিল—এবং পূর্বের দুই প্রান্ত যেন এক জায়গায় মেশবার চেষ্টা করছে। আবহাওয়া একটু জলীয় মনে হচ্ছে। এখানে নারকেলের জায়গায় পালমায়বা বৃক্ষ দেখা যাচ্ছিল, তুঁত গাছ ও মুসাম্বীর বাগান। নীচে একটি সুন্দর উপত্যকায় কোয়েলনগর দেখা যাচ্ছিল, সেখানে হলুদ গোলাপ বিক্রি হয়, সেখানে পিতলের পুরনো বাসন বিক্রি হয়, সেখানে যুবতীরা রেশমেব সুন্দব কাপড় বোনে, আর সেই হাজার বছরের প্রাচীন মহাভারতের যুগের সভ্যতার ঝলক দেখা যায়—নাগমালা, মাহীর প্রতিমাগুলি, ঘুঙুরের মতো লটকে থাকা পদ্ম।

কোয়েলনগরের ডাকবাংলোয় বাজন বলল, এখানে চা খেয়ে আমবা সচেন্দ্রম-এব মন্দির দেখতে যাবো।

—'মন্দিরেব বৈশিষ্ট্য কি'?

রাজন বলল, সেখানে নগ্ন দেবদেবীব মূর্তি আছে, আর কিছু এমনও আছে যেখানে পুরুষ এবং স্ত্রী পরস্পর...

আমি বললাম, 'পাথরের কোকশাস্ত্র আমি এর আগে ইলোরা গুহায় দেখেছি। এখন আমি দ্বিতীয়বার সেই নোংরামি দেখতে যাবো কেন?'

—'বাঃ! এটা নোংরামি কিসেব?' কোবিযা তাব চশমা নাকের উপব ঠিক করতে কবতে বলল, 'এই মুহূর্তগুলি আমাদের প্রাচীন সভ্যতার প্রতীক'।

আমি বললাম, "প্রত্যেক প্রাচীন জিনিসই ভালো নয়। আমাদের সভ্যতার প্রতীকতো সাবনাথের ধ্বংশাবশেষেও আছে; সাঁচীতেও, অজন্তা আর ইলোরায়, কিন্তু যে শিল্প ইলোরায় কামশিল্প বা আপনাদের সচেন্দ্রম-এর দেওয়ালে প্রদর্শিত হয়েছে, তাব থেকে দূরে থাকাই ভালো।'

আমরা এই সম্পর্কে কথা বলতে বলতে 'চা' খেতে লাগলাম।

আমাদের দ্বিতীয় গাড়ি এসে পড়লো। সেখানে ছিলেন কবি চারু দত্ত, ছাত্র রমনন, কৈলুন থেকে আসা আলোচক রামকৃষ্ণ, আর ছিল সুব্বাইয়া। ইস্পাতী চেহারায় সুদৃঢ় স্থির তাঁর সংগ্রামী নিশান। সে কদাচিৎ হাসত। হাসলে মনে হতো কালো পাথরের বুক থেকে উজ্জ্বল নদী উছলে পড়ছে আর তার তরঙ্গ আশপাশের সব দৃশ্যকে আমোদিত করে এগিয়ে চলেছে—সূর্যের মত প্রকাশিত, জলের মতো সহজ সেই হাসি।

আমি গোপীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সুব্বাইয়া এ হাসি কোথা থেকে পেয়েছে?' গোপী বলল তুমি সুব্বাইয়াকে জানোনা। সে খুব চঞ্চল যুবক। দু বছর হলো সচেন্দ্রম মন্দিরে বার্তিক মেলা ছিল। প্রায় লাখ খানেক যাত্রী ইন্দ্র দেবতা দর্শনের জন্য এসেছিল। সবেন্দ্রমে রাজা ইন্দ্র প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন।

—'প্রায়শ্চিত্ত? ইন্দ্রের প্রায়শ্চিত্তের কি প্রয়োজন ছিল?'

গোপী বলল সেই অহল্যার কথা। যখন ইন্দ্রদেব গৌতম ঋষির অনুপস্থিতিতে তারই মত বেশ ধারণ করে অহল্যার সঙ্গে ছলনা করেন, তখন গৌতম ঋষি রেগে শাপ দেন। অহল্যা সেই শাপে পাথর হল। ইন্দ্রের শরীরের প্রতিটি রোম উপদ্রুত হলো। ইন্দ্র লজ্জিত হলেন ত্রবং কোথাও মুখ দেখাবার অবস্থা রইল না। তখন তিনি এখানে এসে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন। নিজের পাপের বিষ শরীর থেকে বের করে দেন।

এই ঘটনার স্মৃতিস্বরূপ প্রত্যেক বছর এখানে মেলা হয় এবং এক বিশাল রথে ইন্দ্রদেবের মূর্তি বের করা হয়। এই রথ একশো পঞ্চাশ ফুট উঁচু এবং এতে কাঠের তিনটি চাকা লাগানো।

—'সেই বেচারী অহল্যার কি হলো?'

—'ইন্দ্র সুস্থ হবার পর অহল্যা পাথরের শিলা হয়ে কয়েকশো বছর পড়ে রইল'।

গোপী বলল, 'এখন সুব্বাইয়ার কথা শোন। যখন ইন্দ্রের রথ মেলার ময়দানে চলছিল, সুব্বাইয়া রথের উপর শুধু উঠলই না, চূড়ার দিকে এগোতে লাগল। লোকেরা হাজারবার চেঁচালেও সে কারও কথা পাত্তা দিল না। একদম উপরে উঠে ইন্দ্রদেবের পতাকা নামিয়ে লাল পতাকা উড়িয়ে দিল।'

—'লাল পতাকা। হাঃ হাঃ হাঃ'

—'এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল যে রাজা ইন্দ্রের রথে মজুর ও কৃষকের ঝাণ্ডা উড়বে। তারপর সুব্বাইয়া উপর থেকে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', 'সাম্যবাদ জিন্দাবাদ' ইত্যাদি ধ্বনি দিতে সুরু করল। আজ থেকে মাত্র দুবছর আগের ঘটনা। জনগণও জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে থাকে। পুলিস প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও রাজা ইন্দ্রকে রক্ষা করার জন্য গুলি চালায়। বারো জন মারা যায়। কিন্তু সুব্বাইয়ার গুলি লাগেনি, লাল পতাকাও নামেনি।'

—'তারপর?'

রাজন বলল, 'সেই দিন থেকে জনগণের বিশ্বাস ইন্দ্রদেবের উপর থেকে কমে গেছে, তাঁরা ভাবেন পুরনো পতাকার চেয়ে লাল পতাকা শক্তিশালী।'

গোপী বলল, 'সেই বছর থেকে মেলার আয় অর্ধেকের চেয়ে কম হয়ে গেছে। পূজারীরা পূজা করার চেয়ে আজকাল কমিউনিস্টদের গালাগালি দিয়ে সময় নষ্ট করছে।' চারু দত্ত বলল, 'বেচারারা আফিং গেলে ; মার্কস ঠিক কথাই বলেছিলেন,।' রমনন চায়ের পেয়ালা হাতে রেখে বলল, 'কমরেড, চা খাওয়া হয়ে গেলে মন্দিরে চলুন।'

আমি ইতস্তত করলেও বন্ধুরা আমাকে ধরে নিয়ে গেল।

'কি মশাই, এতে খারাপ কি? কামবাসনার ছবি আঁকা পাপ? স্ত্রী পুরুষের মিলন কি খারাপ কিছু? যদি খারাপ কিছু না হয়ে থাকে তাহলে শিল্পী তার শিল্পে সেই চিত্র আঁকতে পারবেন না কেন?'

আমি বললাম, 'বাসনা কোন খারাপ জিনিস নয়। বাসনার বর্ণনা সাহিত্যে করা হয়। সব শিল্পেই হয়। আমরা প্রেয়সীর নাক থেকে নোখ পর্যন্ত সব কিছুরই বর্ণনা করি সুন্দরভাবে। কিন্তু 'চিরকী'-র মতো প্রেয়সীর বিকার নিয়ে আমাদের কলমের শক্তি নষ্ট করি না। প্রেমের বর্ণনা খুব সুন্দরভাবে করা যায়। কিন্তু ... এই প্রেমের বর্ণনা কামুকতা। এই ধরনের শিল্প মানুষকে প্রগতির দিকে নেয়না বরং পতনের দিকে নিয়ে যায়, নোংরা চিন্তাভাবনা জাগিয়ে তোলে। এটা আনন্দ নয়, কামুকতার চরম।'

—'তাহলে এই খারাপ জিনিশ আমাদের পবিত্র মন্দিরে কিভাবে প্রবেশ করল?' রাজন বলল, 'যখন সমাজের পতন হয় তখন জীবনের প্রত্যেক অঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া

হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের কালে শিল্পের উন্নতি দেখুন, আবার তার পতনকালের শিল্প দেখুন—একদিকে শক্তি, পবিত্রতা, উন্নতি, অন্যদিকে সস্তা, নোংরা কামকলা। এই শিল্প নিজের সৃজন কুশলতা নয়, কামুক ভাবনার সাহায্য নিয়ে জনগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ হতে চায়।' আমি বললাম, 'এই তো সেই পার্থক্য—মোগলদের সময় আকবরের ফতেপুর সিক্রির পাশে ওয়াজেদ অলি শা-র লক্ষ্ণৌ-এর ঢঙে তাজ ও ছাত্রমঞ্জিল। যে পার্থক্য খেয়াল ও ঠুংরিতে।'

—'কিন্তু দেখা তো উচিত'। রমনন বলল।

—গোপী তাড়াতাড়ি তার কথা কেটে বলল, 'অবশ্যই দেখুন। তাতে খারাপ কিচ্ছু নেই। আমি আপনার সঙ্গে রয়েছি। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবেন। সূর্য ডোবার আগে কন্যাকুমারী পৌঁছতে হবে। নাহলে সব মজাই ভেস্তে যাবে।'

সূর্য কন্যাকুমারীতে অস্ত যাচ্ছিল। কন্যাকুমারী সেখানেই যেখানে পূর্ব পশ্চিম দুই ঘাট এসে মিলে যায়, কন্যাকুমারী সেখানেই যেখানে তিন সমুদ্র গলা মেলায়—আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর আব ভারত মহাসাগর। তিনটি সাগর ছড়িয়ে আছে এক বিশাল অর্ধচন্দ্রে ; তার মাঝখানে পৃথিবীর শেষ কোণা, আর কন্যাকুমারীর গোলাপী বালুর উপর তিন সাগরেব ঢেউ—একে অন্যের গলা জড়িয়ে খেলা করছে।

পৃথিবীর শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমি দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে দেখলাম। সেখানে কখনও আমার ঘর ছিল, আমার ভাই ছিল, আমার শহর ছিল, আমার গ্রাম ছিল, গান ছিল, হাসি ছিল, হীর-এর পায়ের ছাপ ছিল, আর রাজার রূপোলি বাজনা ছিল। আমি কোন শহরের বা কোন দেশের নই, পূর্ব বা পশ্চিমের নই, আমার হৃদয় সারা বিশ্বের আত্মার মতো ভবঘুরে। আমার হৃদয় কন্যাকুমারীতে দাঁড়িয়ে সেই ক্ষেতগুলিকে দেখে নিল, যেখানে আমার ছোটবেলা কেটেছিল, যেখানে আমার যৌবন জেগেছে, যেখানে জীবনের অন্তিম শ্বাস ঘরের মাটি চায়!

সম্ভবত আমার হৃদয়ে সেই সোনালী মাটি কথা বলছিল। হাজারো মাইল দূরে সোনালী ধরিত্রীর স্বপ্ন বুকে জড়িয়ে মিষ্টি মিষ্টি ব্যথা নিয়ে আমি জেগে আছি, আর আমি তোমাকে স্মরণ করছি, 'হে আমার পবিত্র পাঞ্জাবের ধরিত্রী, আমি তোমাকে স্মরণ করছি, কারণ দুনিয়ায় আর কোন 'হীর' নেই। দ্বিতীয় চিনার নেই। সর্ষের শাকের সোনা আর কোথাও নেই। আমি তোমাকে স্মরণ করছি এক, মায়ের মতন, দুই মায়ের মতো নয়, বাচ্চাদের কেবল এক মা হয় ; আর বাচ্চা একা একা নিজের মাকেই মনে করতে পারে। এই গহন অনুভূতির সামনে সংসারের সমস্ত ধর্ম, রাজনীতি, চমৎকারিত্ব অর্থহীন হয়ে যায়। মা, তোমাকে আমি অশ্রু দিয়ে প্রণাম করছি, সেই অশ্রুর কাছে তিন সাগরের জলও থই পাবে না।

এই দুঃখ আমার সঙ্গীদেরও আছে কেননা তারা তাদের জন্মভূমিকে ভালবাসে, নিজের ঘর, নিজের বউ, নিজের বাচ্চাকে ভালোবাসে । সেই ভাঙা বাড়ি তাদের প্রিয়, যেখানে রাতের তারা দেয় প্রেয়সীর খবর, সেই ভাঙা বাড়ি তাদের প্রিয় যার আড়ালে প্রেম তার প্রথম চুম্বন এঁকেছিলো, সেই পুকুর তাদের প্রিয় যেখানে পায়েল পরা পায়ের ছাপ। আমার সঙ্গীরা পৃথিবী, মানুষ, শিক্ষা আর প্রকৃতিকে ভালবাসেন।

এইজন্যে আমাব সেই দুঃখকেও তাঁরা চেনেন, ছেলেকে মায়ের কোল থেকে আলাদা করে দেবাব দুঃখ।

কন্যাকুমারীর শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমি সামনে দেখছি ভাবত মহাসাগর, যা মানুষেব প্রগতির মতো অসীম ; আবার আমি পশ্চিম দিক থেকে আসা আরবেব দিকে দেখছি ; আটশো বছর আগে তারা আমাদের দেশে বিপ্লব এনেছিল, এক হাজার বছর আগে যীশুখ্রীষ্টের শিষ্যরা এই তীরে এসেছিল, এখান থেকে বারোশো-পনেরোশ বছর আগে ভারতের নৌকা, জাহাজ রোমে গিয়েছিলো। বোম, ভেনিস গ্রীস থেকে এদেশের দিকে এসেছিল, উল্টোদিকেও গিযেছিল, ধর্মগুলির মধ্যে সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তের মিশ্রণ হযেছিল। আমি আবাব পূর্বদিক দেখছি, বঙ্গোপসাগব পূব সাগরের ভেজা হাওয়া নিয়ে এসেছে, বর্মা, শ্যাম, মালয়, ইন্দোচীন, চীনের হাওয়ায় লড়াকু গান ভেসে আসছে। ওখানে কৃষকরা জমি, মজদুরবা কারখানা দখল করেছিল, ওখানেও বিদেশী বন্দুক গানের গলা টিপেছিল, সাহিত্যিকদের গলার উপর ছুরি বসিয়েছিল, আর তাদের বইয়ের বহ্ন্যুৎসব কবেছিল।

আর আজ পূব সাগরের জল কি বলে?

এক কদম আগে!
দু কদম আগে!!
তিন কদম আগে!!!

তিনটি সাগরে মিলে গেছে, আবব ইরাণ ভারত চীন এক হয়ে গেছে, বালির শেষ কণাগুলি জলের উপর হাসতে হাসতে বলতে লাগল—খেটে খাওয়া লোকের কোন দেশ হয় না, কোন ধর্ম হয় না, তারা শুধু মানুষ, আর তারা সারা দুনিয়ার উত্তবাধিকাবী।

হঠাৎ সূর্য ডুবে গেল, আর রাজহাঁসের মত উড়ন্ত সাদা মেঘের পাখা লালাভ হতে লাগল। সেই লালিমা দূর সমুদ্রে ক্ষেতের মধ্যে লাল ফসলের মত ; আর তরঙ্গগুলি শেষ সিঁড়ির উপর উঠে এলো। দূর আকাশে মেঘের বেলুন ফুলতে লাগল, সাগরতীরের বাঁধানো ঘাট, গম্বুজ, থাম সোনালী ছাতার আকৃতি নিভে যেতে লাগল, সোনালী মেঘ ছড়িয়ে পড়ল, ফুলে উঠল সোনালী গম্বুজের উপর আর এক সোনালী গম্বুজ, লাল টকটকে হাওয়া এবং গেরুয়া জমির উপর সোনালী তারার খেলা; পৃথিবী আর আকাশ একই রঙে রঙিয়ে গেল, চারিদিকে রঙের উপর রঙ, হাওয়ার সোরগোল আর সমুদ্রের উচ্ছল তরঙ্গ......

কবি চারু দত্ত এক বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার পাশে দাঁড়িয়েছিল সুব্বাইয়া—কন্যাকুমারীর শেষ সিঁড়ির মতো সুদৃঢ় ও স্থির। চারু দত্ত ধীরে বলল, 'সুব্বাইয়া, ওই দেখ, এখন মনে হচ্ছে যেন দুর্গন্ধ আর নোংরা ভেদ করে স্বচ্ছ পবিত্র ইন্দ্রদেবতার রথ আসছে, এক নতুন সচেন্দ্রম......

সুব্বাইয়া হেসে বলল, 'সেই রথের উপরেও আমাদের পতাকা উড়ছে।'

যদি অলবাই থেকে ত্রিবান্দ্রামের পথে কেরলের পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখা যায়, তাহলে ত্রিবান্দ্রাম থেকে কোয়েলুনের পথের সৌন্দর্য সামুদ্রিক। এই পথে দূর দূর

পর্যন্ত পাহাড়ে পাহাড়, আর এক পথে দূর দূর অবধি সমুদ্রেব আওয়াজ, সমুদ্রের কিনাবা ঝলসে ওঠে, পিপাসার্ত চোখ শীতলতা পায়—তার মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যাই, কিন্তু প্রকৃতির যে ছবি ডাঙায় খেলা করে তা হলো মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে থাকা নারকেলের পান্না রঙের সারি ; তাদের কোলে ব্যাকওযাটারের সুন্দর নীল ঝিল নীলকান্ত মণির মতো জ্বল জ্বল করতে থাকে। এই হ্রদের নীচে মেঘের সুন্দর সুন্দর মহল। কখনো কখনো সেখানে দেখা যায় ধনীদেব মনোহর নৌকা বা সেখানকাব জানালার ঝুলন্ত রঙিন পর্দা। রক্ত চাপ বেড়ে গেলে এই ধনীরা স্বাস্থ্য উদ্ধাব করতে আসেন। এখানে কখনো সূতাকলের মজুররা আসে না, তারা জানেনা এই পৃথিবী কত সুন্দর ; শুধু এই টুকুই জানে যে জীবনের প্রত্যেকটি দিন অসুখের। আজ সেই মজদুর এখানে নেই, কখনও এই মনোবম নৌকাগুলির জানালা তাদের জন্যে খুলে যাবে না, বঙিন পর্দা সব সর করে সরে গিয়ে তাদেব স্বাগত জানাবে না।

ত্রিবান্দ্রাম থেকে কোয়েলুন এলাকাকে খুব গরীব মনে হলো। এখানকার বেশিব ভাগ জমি বালিতে ভরা এবং চাযের যোগ্য নয়। জনগণ নারকেল গাছেব উপর নির্ভর করে। এই গাছের শেকড় থেকে শুরু করে সব কিছুই কাজে লাগে। কিছুদিন আগে একটা সরকারী ফিল্মে দেখানো হয়েছিলো কিভাবে গাছেব সবকিছুই কাজে লাগে—নারকেল গাছকে বলা হয সোনাব বৃক্ষ। এর কাঠ থেকে নানারকম ঘরোয়া জিনিষ তৈরী হয়। নারকেল জল ও শাঁস খাওয়া হয়। এর পাতায় ছাদ, পবদা ও জানালা তৈরী হয়, টুপি তৈরী করা হয়। শাঁস থেকে তেল তৈরী করা হয়। নারকেলের ছোবড়া থেকে হয় সতরঞ্চি, গালিচা ও অন্যান্য জিনিষ। পুরো ফিল্মে এমনভাবে নারকেলের প্রশংসা করা হয়েছে যেন তা কোন গাছ নয়, দেবতা। গাছের প্রশংসা কোন খারাপ কথা নয়, কিন্তু যে জিনিসের দিকে সরকাব ফিল্মে বা ফিল্মের বাইরে মনোযোগ দেয়নি তা হলো আমাদের সাধারণ মানুষের গুরুত্ব। সাধারণ মানুষই নারকেল গাছের প্রতিটি অংশকে কাজে লাগিয়েছে। এই সব ছবি উৎপাদন ও অনুসন্ধানে মানুষের গুরুত্ব স্বীকার করে না। শুধু নারকেল গাছ নয়, যদি পরিশ্রমী মানুষদের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া যায, তা হলে বিশ্বে শত শত সোনার বৃক্ষের খবর পাওয়া যাবে, যা লাভের ক্ষেত্রে নারকেল গাছকেও ছাড়িয়ে যাবে।

যখন ত্রিবান্দ্রম থেকে কোয়েলুন যাবার গাড়িতে টিকিট চেকার তিনবার আমার টিকিট দেখল, সে ভালভাবেই জানত আমার নাম কি এবং কোয়েলুন কেন যাচ্ছি। এটা দেখে খুবই আশ্চর্য লাগল এবং খুশীও হলাম যে পথের লোকেরা আমার যাত্রার খবর পেয়েছিল ; কি করে তা বলতে পারি না। কিন্তু ছোট ছোট স্টেশনেও দেখলাম, লোকেরা স্বাগত জানাবার জন্যে লাল পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকেই কোয়েলুন যাবার জন্যে ট্রেনে উঠতে লাগল। যেসব ছোট স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ায় না, সেখানে জায়গায় জায়গায় ছোট গ্রামের সীমানায় বাইরে দশ/পনেরো/পঞ্চাশ জনের দলকে পতাকা নাড়তে দেখলাম। গাড়িতে বসা আমার সঙ্গীরা তাদের শ্লোগানের উত্তর দিচ্ছিলো। কোয়েলুন স্টেশনে ২০০/৩০০ ছাত্র এসে ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলল। সেখান থেকে আমরা মিছিল নিয়ে হোটেলের দিকে রওনা দিলাম। ছাত্ররা আমাকে দেখে আনন্দে শ্লোগান দিচ্ছিলো।

'বিদ্যার্থী এড়েতু, এড়েতু আয়কম জিন্দাবাদ।
ছাত্র ও সাহিত্যিক ঐক্য জিন্দাবাদ

এক মজুর শ্লোগান তুলল ঃ

'তুই লালে বিদ্যার্থী এড়েতু কার, আয়কম জিন্দাবাদ
মজদুর ছাত্র ও সাহিত্যিক ঐক্য জিন্দাবাদ।'

হঠাৎ কেউ বলল, 'আলি সর্দার জাফরি জিন্দাবাদ'। আমার মনে হল সর্দাব মিছিলে হাঁটার সময় আমার কাঁধে হাত রেখেছে এবং আমি তাব হাসিভরা মুখের দিকে ফিরে তাকাচ্ছি। আমার শরীরের প্রতিটি রোমকূপে বিচিত্র আনন্দ ও উল্লাসের অনুভূতি এলো। আমি দেখলাম, এ মিছিল আমার জন্যে নয়, এ মিছিল সর্দারের এবং সুলেমান আরিবের, অয়র রসিদ জহাঁমের আর অমৃত রাইয়ের, ডাঙ্গে, পাহাড়ী, নিয়াজ হায়দর, হবণাম সিং এবং শত শত প্রগতিশীল সাহিত্যিকের, যাঁরা আজ ভারতবর্ষের কারাগারে বন্দী। তাদের অপরাধ কেবল এই যে তারা দেশকে ভালবাসে, এই দেশে বসবাসকারী কোটি কোটি মানুষকে তারা ভালবাসে, কারণ কোন দেশ এক ইমারত, পতাকা, ব্যক্তির নাম নয়, দেশ সেই সব মানুষদের দিয়ে তৈরী, যারা রাতদিন পরিশ্রমে জমিতে লাঙ্গল চালায়, কারখানায় কল চালায়, খনি থেকে কয়লা ও লোহা আহরণ করে। মানুষকে ভালবাসা দেশের প্রতি ভালবাসা, তাব মহান ভবিষ্যতকে ভালবাসা। কোয়েলুনের রাস্তায় চলতে চলতে আমি সেই সব সাহিত্যিকদের দেখছিলাম, যাঁরা হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী পরেও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিলেন—ছিলেন কৈফী আজমী, মজরু সুলতানপুরী, পাকিস্তানের জিগর গোশে, আবদুল্লা মালিক, ইব্রাহিম জলিশ এবং তারিখ জলালি ; এঁদের মধ্যে পাবলো নেরুদা ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে চিলি সরকারের ওয়ারেন্ট ছিলো ; আর ছিলেন হাওয়ার্ড ফাস্ট, লুই আরাগঁ, ইরিয়া এরেনবুর্গ, শলোকভ, ফাদায়েভ। এই মিছিলেই ছিলো তাদের জাগ্রত মস্তিষ্ক ও উদ্ভাসিত হাসি। এই সব মানুষেরা আজ মিছিলের পতাকার নীচে জড়ো হয়েছেন, যা মানুষের পতাকা, শান্তির পতাকা, নবজীবনের পতাকা।

কোয়েলুনের সভায় ত্রিচুর বাদ দিলে উপস্থিতি ছিল সবচেয়ে বেশি। শ্রী নারায়ণ কলেজের বিকাশ ময়দানে সভা হচ্ছিলো—প্রায় পাঁচ-সাত হাজারের মতো লোক। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দশ হাজারের কম নয়। বাকি লোকেরা কোয়েলুনের অধিবাসী। এখানকার লোকোশেডে চারশো মজুদুর কাজ করেন ; এ.ভি কটন মিলে কমসে কম আঠারোশ শ্রমিক আছেন। তার মধ্যে পাঁচশো শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছেন। এছাড়াও কাজু তৈরীর কারখানা আছে ; সেখানে শতকরা পঁচানব্বই জন মেয়ে কাজ করেন। কোয়েলুন এবং তার উপনগরী ধরলে এই ধরনের উদ্যোগে পনেরো হাজার নারীশ্রমিক নিযুক্ত আছেন। কাজু কারখানার লাল ইউনিয়ন খুবই শক্তিশালী। এই ইউনিয়নের সভাপতি কেরলের মানুষের কাছে খুবই বিখ্যাত কমরেড গোবিন্দন নায়ার, ওঁর ব্যক্তিত্বের খ্যাতি এতই বিস্তৃত যে জনগণ তাঁকে নিজেদের দেবতাদের মধ্যে তুলে নিয়েছে এবং তাঁর বাহাদুরি, তাঁর সাহস এবং তাঁর হৃদয়ের বিশালতা নিয়ে অনেক কাহিনী তৈরী হয়েছে; এমন কি কংগ্রেসী ও সরকারী লোকেদের কাছেও তার

প্রশংসা শুনেছি। কোয়েলুনের ছাত্ররাও ত্রিবান্দ্রমের ছাত্রদের মতো জনগণের সঙ্গে থেকে কংগ্রেসের আন্দোলন থেকে সাম্যবাদী আন্দোলন পর্যন্ত নিজেদের কর্তব্য করে এসেছেন। শুধু নিজেদের দাবি নিয়ে তাঁরা লড়াই করেননি, শ্রমিক শ্রেণীর দাবির সঙ্গেও তাঁরা থাকেন. যখন ত্রিবাঙ্কুর পরিবহন মজদুররা লড়াই শুরু করল, তখন ছাত্ররা সেই লড়াইয়ে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করে। ফলে কোয়েলুন কলেজের অনেক ছাত্রকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় ; তার মধ্যে রুবি মাধবনও ছিলেন। তিনিই আজকের সভার সভাপতি। তিনি সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন। যখন অনশন এগারো দিন হয়ে গেল এবং তার জেদে তিনি অটল রইলেন, তখন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওযা হয়। একজন পুলিশেব সেপাইয়ের সঙ্গে তাঁর খুব মজার কথাবার্তা হয।

সিপাই—'তুমি অনশন করছো কেন?'

মাধবন—'তুমি হাসপাতালে এসেছো কেন?'

সিপাই—'আমার ইচ্ছে। তুমি অনশন ভাঙবে কি-না?'

মাধবন—'না।'

সিপাই—'আমি মদ খেয়ে নিই। বলছি শোন, তুমি অনশন ছেড়ে দাও। তোমার পক্ষে ভালো হবে।'

মাধবন—'আমার অনশনে তোমার কি ক্ষতি হচ্ছে?'

সিপাই—'তুমি যদি নিজের মা বাবার প্রতি কর্তব্য নাও কর, হাসপাতাল নিয়ে ভাব, (নার্সের দিকে ইশারা করে) এই মেয়েদের সামনে অনশন করতে লজ্জা করে না তোমার?'

মাধবন—'আমি একটা কুকুরের সামনেও অনশন করতে পারি।'

সিপাই—'তোমাকে পেটাব, দাঁড়াও মদ খেয়ে নিই।'

সিপাই মাধবনকে খুব মাবে। হাসপাতালে হুল্লোড় শুরু করে, লোকেদের মধ্যে উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। সারা শহরে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হতে থাকে। এই সময় কেরল কৌমুদীর সম্পাদক শ্রীবালাকৃষ্ণণ সরকার ও ছাত্রদের মধ্যে সমঝোতার ব্যবস্থা করেন এবং ছাত্রদের দাবি সরকার মেনে নেয়। তখন মাধবন আমরণ অনশন ছাড়েন। কলেজের দেওয়ালে আজও চক দিয়ে লেখা আছে—'মাধবনকে ভোট দিন'। মাধবন মাইকে বলছিল—'আমরা প্রগতিশীল সাহিত্যকে স্বাগত জানাচ্ছি।'

ছাত্রদের হরতালের প্রতি সহানুভূতিতে কোয়েলুনের শ্রমিকরাও হরতাল করে, কোয়েলুনের সাংবাদিকরাও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। যখন মাধবন হাসপাতালে অনশন করছিলেন, তখন মজদুর, সাংবাদিক ও অন্যান্য নাগরিকরা মিছিল করে হাসপাতালে যান। প্রেস কনফারেন্সে সাহিত্য নিয়ে যে প্রশ্ন করা হয়, তাতে বোঝা যায় ত্রিবান্দ্রমের মতো এখানকার সাংবাদিকরাও রুচিমান এবং দৈনিকপত্রে সাহিত্য এক বিশেষ স্থান পায়, এই বিবাদে 'কেরলমের, সাংবাদিক ফিলিপস ও 'নাভারতম', 'কেরল কৌমুদী' 'পাওরিয়া প্রভা'-র সাংবাদিকরা যোগ দেন। ফিলিপস বলেন যে এখানকার সাংবাদিকদের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য এত বেড়ে গেছে যে একবার পুলিস

'কেরলম'-র সহসম্পাদক লছমনমকে ছুউরা মজদুরদের লড়াই-এর ব্যাপারে মার দেয় কারণ পুলিসের লোকদের নিয়ে রিপোর্টটি লছমন লিখেছিলেন। এরপর খবরের কাগজের সঙ্গে সরকার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। যদিও শেষ পর্যন্ত একটি তদন্ত কমিটি গডতে বাধ্য হয়, পরে সব কিছু চাপা পড়ে যায়। এর ফলে একটি ব্যাপার অবশ্যই হয়েছিল যে ছাত্র মজদুর সাংবাদিক এবং সম্ভ্রান্ত নাগরিকরা তাদের সমস্যা নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করতেন, একে অন্যকে সাহায্য করতেন এবং সবসময় জনসংগ্রামে আমাদের সভায় ছ' সাত হাজার লোক জমায়েত হয়েছে।

দুএক দিনের মধ্যেই ক্রীসমাস আসছিলো। আমি ফিলিপসকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ক্রীসমাসে তুমি বাড়ি যাবে, না আমার সঙ্গে আলেপ্পি যাবে?' ফিলিপস এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে আলেপ্পি যাবো।' আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমি কাউকে তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি বাড়ি যাব।' আবার একটু পরে বলল, 'না আমিই যাব। বৌকে চিঠি লিখে দিচ্ছি।' এরপর আমরা দুজনেই হাসতে লাগলাম। ফিলিপসেব বিয়ে তিনমাস হয়েছে। বৌ-এর সঙ্গে এটা প্রথম ক্রীসমাস—তার দোলাচল বুঝতে পারছিলাম—কর্তব্য ও প্রেমের লড়াইয়ে কর্তব্যেরই জয় হলো এবং আমবা আলেপ্পিব পথে বওনা হলাম।

আলেপ্পির লরি কাকভোরে রওনা হয়, সেই জন্যে আমরা ভোর চারটেয় বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছলাম। রাস্তায় বিশেষ কোন ঘটনা ঘটেনি। সারি সারি তালগাছ কুয়াশায় অর্ধনিদ্রিত দাঁড়িয়েছিল , কাজুর সাদা গুঁড়ি চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে, ধানের ক্ষেতে সাদা কুয়াশা এমনভাবে ছড়িয়ে ছিল যেন মেঘ আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসেছে। একটা বিচিত্র ঘুম নেশার ঘোরের মত চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। তারাদের চোখও মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। যাত্রীরা ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে শুনতে ঝিমোচ্ছিলেন। হঠাৎ এক জায়গায় লরি থামার আওয়াজ এলো এবং তার ধাক্কায় যাত্রীরা জেগে উঠল। আমি চোখ বন্ধ করেই ছিলাম। শুনলাম কে যেন বলছে—

—'চা—গরম গরম চা'

—'কমলালেবু, মিষ্টি কমলালেবু'

—'মন্দিরের প্রণামী'

আমি চোখ খুলে চমকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার?'

ফিলিপস বলল, 'কাছেই একটা বড়ো পুরনো মন্দির আছে। মন্দিরের পাণ্ডা যাত্রীদের কাছ থেকে প্রণামী উশুল করছে। ও এখান থেকে কমিশন পাবে।'

আবার আওয়াজ এলো, 'চা'

—'কমলালেবু'

—'প্রণামী'

আমি ভাবলাম, লরির আড্ডাগুলি বেশ ভালোই মজার, এখানে সবকিছু বিক্রি হয়, চা, কমলালেবু, ধর্মের সবকিছুই পাওয়া যায়, সঙ্গে কমিশন। আমি ফিলিপসকে বললাম, 'একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক, তাতে একটু ধর্ম, আর একটু কমলালেবুর

ককটেল কেমন হবে।

যখন আমরা যথেষ্ট কমলালেবু খেয়ে ফেলেছি, তখন ফিলিপস বলল, 'একটা কমলালেবু রেখে দাও।'

—'কেন?'

—'এগিয়ে গিয়ে বলছি।'

—'এখন নয় কেন? বল'।

—'এখন সময় হয়নি।'

—'এই সময়ের ব্যাপারটা কি?'

—'ছেলেদের মতো জিদ করোনা, আগে চলো বলছি।'

দু-তিন জায়গায় লরি থামল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে বলবে?' সে হেসে বলল, 'না, সামনে গিয়ে বলব।'

এইভাবে কথা বলতে বলতে আলেপ্পিব একদম কাছে পৌঁছে গেলাম। আলেপ্পি থেকে চারপাঁচ মাইল এগিয়ে একটি গ্রামের কাছে একজন হাত দেখাল। গাড়ি থামল। ফিলিপস আমাকে নামার জন্যে ইশারা করল। নেমে দেখলাম ফিলিপসের হাতে একটা কমলালেবু। আর রাস্তার উপর দাঁড়ানো আর এক যুবকের হাতে একটা কমলালেবু। তারা একে অন্যাকে দেখে হাসলো এবং যুবক তার পেছনে যেতে ইশারা কবল।

—'তুমি এই টেলিগ্রামের ব্যবস্থা কি কবে করলে? এই গ্রামে কি টেলিগ্রাম আসে? এখান থেকে কোয়েলুন অনেক দূরে?'

ফিলিপস আমার দিকে তাকিয়ে বিচিত্রভাবে হাসল। বলল, 'বেশি জিজ্ঞেস করে কি হবে?'

—'তা ঠিক', আমি বললাম।

—'কোথায় যাচ্ছ?'

—'এব আগে সম্ভবত একজনকে পাওয়া যাবে বেদানা নিয়ে। পরে আমরা বাঁদিকে ঘুরব। একটি লোক মকাই এর ভুট্টা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেখান থেকে ডান দিকে যাবো। একজন একগুচ্ছ আঙুর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেখান থেকে সোজা আমরা আমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবো। একজন তরমুজ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।' ফিলিপস হাসতে লাগল। বলল, 'তুমি রোমান্টিক গল্প ভালো লিখবে, কিন্তু এখানে রোমান্স নেই, কঠিন বাধ্যতা। যে জায়গায় আমরা যাচ্ছি সেখানে সরকারী খোঁজ খবরের গরম এত বেশি যে খুব সামলে কাজ করতে হয়। তুমি যদি কারও খোঁজ করতে আসো যদি অন্যরকম গন্ধ পায় তাহলে তোমাকে গ্রেপ্তার করবে। তোমাকে রক্ষা করার জন্য আমি আমার ক্রীসমাসের ছুটি বরবাদ করে দিয়েছি। চুপচাপ আমার সঙ্গে এসো।'

চুপচাপ চলেছি। রাস্তায় নারকেলের ছোবড়ার কারখানা। চারদিকে নারকেল গাছ, কারখানা খোলা, কিন্তু কোন লোক দেখা যাচ্ছিল না ; আমাদের পথ প্রদর্শক ধানের ক্ষেতের আল ধরে এগোচ্ছিল। সামনে নারকেল গাছের সারি। সেখানে একটি ঘর। এই ঘরের বাইরে দুজন মহিলা নারকেলের ছোবড়া বুনছিল এবং একটি ছেলে নারকেলের ছোবড়া পাতলা সূতোয় বাঁধছিল। দুটি মেয়ে চরকা চালাচ্ছিল, একজন লোক নারকেল গাছের গুঁড়িতে পিঠ দিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল, কেননা

তার হাতে একটি কমলালেবু ছিল।

আমরা আরো এগোলাম। ক্ষেত শেষ হয়ে সেখানে শুরু হয়েছে সাদা বালি। সেই বালি সারি সারি নারকেল গাছের মধ্যে ছড়িয়ে ছিলো। আমি মোজা জুতো খুলে কোমল, নরম এবং কাতুকুতু দেওয়া বালিতে চলতে লাগলাম। এগিয়ে গিয়ে একটি ছোট্ট খালের উপর নারকেল গাছের গুঁড়ি পারাপারের জন্যে বিছানো। ওরা স্বচ্ছন্দে পেরিয়ে গেল ; আমি প্যান্ট খুলে নিলাম, বললাম, 'সার্কাসের দড়িতে চড়ার অভ্যেস নেই, আমি জলের ভেতর দিয়েই যাবো।'

এই খালকে এখানে বলে 'তোড', স্বচ্ছ, নরম জল, তলার নরম বালিতে পা দিয়ে মনে হচ্ছিলো গালিচার উপর হাঁটছি। আমি শান্তভাবে ধীরে ধীরে জল পেরোলাম, যে পথ দেখাচ্ছিল, সে ফিলিপসকে কিছু বলল ; ফিলিপস আমাকে বলল, আগে আরও দু-তিনটে তোড় আসবে। এজন্যে পাতলুনটা তোমার কাঁধে থাকাই ভালো। আমি তাই করলাম। তারা দুজনে হাসতে লাগলো। একটু এগোনোর পর আরও দুজন লোক এলো, পথ প্রদর্শক পাতলুন কাঁধে লোকটির দিকে ইশারা করল। তারা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আরও একটু এগোবার পর ধানের ছোট ছোট ক্ষেত। ফনিমনসার একটা বড়ো ঝাড়ের পাশে একজন কমলালেবু নিয়ে বসেছিল, পথ প্রদর্শক তার কাছে গেল। কিছু কথা হলো, পথ প্রদর্শক ফিলিপসকে কিছু বলল, ফিলিপস আমাকে বলল, 'সব ঠিক আছে। কোন বিপদ নেই।'

'আমি প্যান্ট পরে নিই?'—জিজ্ঞেস করলাম।

সবাই খিল খিল করে হেসে উঠল। ফনিমনসার ঝাড়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে একটা উঁচু জায়গা পেরিয়ে নীচু জমির দিকে এগিয়ে গেলাম। সামনে নারকেল গাছের ভিড, আর তার মধ্যে একটা খোলা জায়গা। সেখানে একটা উদলাম আর পুমরশ গাছ আর একটা পোড়ো বাড়ি। পঞ্চাশ গজ দূরে একটা খোলা জায়গায় নারকেলের সবুজের সমারোহ। চারিদিকে নিস্তব্ধতা এবং ভৌতিক আবহাওয়া।

পুন্নাপাড়া গ্রাম। এখানেই স্যর সি.পি-র হিটলারশাহী শেষ করার জন্যে কেরলের জনগণ তাদের প্রথম যুক্ত মোর্চা শুরু করেন। স্যর সি.পি চাইছিলো ত্রিবাঙ্কুরকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অধিকার দিতে। তাতে তার একনায়কতন্ত্র বজায় থাকতো। এর বিরুদ্ধে এখানের জনগণ প্রথম মোর্চা সংগঠিত করে। এই পোড়ো ঘরে তার সৈন্যেরা থাকত, আর চারদিকের গ্রামের কৃষকরা, আর কারখানার নারকেলের ছোবড়া তৈরীর মজদুররা। স্যর সি.পি-র ৩০/৪০ জন সিপাই মারা গেছে এবং প্রায় ততজনই পুন্নাপাড়ার কৃষক ও মজদুর মারা গেছেন। এই মোর্চার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ত্রিবাঙ্কুরের কংগ্রেসও এই আন্দোলন সমর্থন করে। স্যর সি.পি-র আদেশে চারিদিক থেকে এই গ্রাম ঘিরে ফেলা হয়। যারা বাইরে বেরুবার চেষ্টা করছিল, তাদের মেশিনগান দিয়ে শেষ করে দেওয়া হয়। সেদিন এই গ্রামের আশে পাশে ৫০/৬০ জন কৃষক মজদুর শহীদ হয়েছিল ; আর মেয়েদের মর্যাদা লুণ্ঠিত হয়েছিল কারণ হিটলারশাহীর জায়গিরদাররা অন্যদের মেহনতে বেঁচে থাকে এবং অন্যদের রক্ত চুষে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে।

পথপ্রদর্শক বলল, 'সেদিন ছিল মহারাজার জন্মদিন। পুলিস ছিলো সেই কংগ্রেসীর

ঘরে।'

—'কংগ্রেসী কি পুলিসকে আশ্রয় দিয়েছিল?'

—'না সে সময় ওরা আমাদের সঙ্গেই ছিলো। এই বাড়ি পুলিসরা জুলুম করে খালি করিয়েছিল।'

—'এই বাড়িতে কেউ থাকে না?'

—'এখন এই বাড়িতে কে থাকবে?'

আমি উল্টে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার নাম কি?'

—'তন্‌গাপন।'

—'তুমি কি এই গ্রামের অধিবাসী?'

—'হ্যা'।

—'কোন জাত?'

—'ইরাবস।' সে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলল, আমাদের জাত সবচেয়ে নীচু. কিন্তু সবচেয়ে বেশি শহীদ আমাদের জাত থেকে এসেছে।

—'তাদের কয়েকজনেব নাম বল'।

—'কোলবন, থামোস, ফ্রান্সিস.... '

আমি আবাব তার দিকে তাকালাম। ফিলিপস বলল, 'এই গ্রাম ক্রীশ্চানদের। স্বাধীনতা সংগ্রামে আর মজদুর আন্দোলনে গরীব এই জনগণ কিছু কম অংশগ্রহণ করেননি।'

—'মজদুরদেব জাত একটাই', অন্য পথপ্রদর্শক হেসে বলল।

আমি বালি থেকে উঠে বললাম, 'চল এগোনো যাক।' জায়গায় জায়গায় নারকেলের গুঁড়িতে বন্দুকের গুলির চিহ্ন। একটু এগোলেই একটা ঘরের বাইরে এক বুড়ি নারকেলের দড়ি বানাচ্ছে। পথ প্রদর্শক বলল, 'এর মেয়ে মেরী জেলে'।

—'কেন?'

—'মেরী মজদুরদের আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল।'

—'কংগ্রেস শাসন ক্ষমতা পেয়েই নিজেদের সব প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছে। সার সি.পি-র আমলের বন্দীদের মুক্তি দেবার কথাও তারা ভুলে গেছে।'

মা আমাদের দেখে হাসলেন। হাতের ইশারায় আমাকে ডেকে বললেন, 'আমি আমার অতিথির জন্যে একটা নারকেল রেখেছি, একে খেতে দাও। এটা শুধু অতিথির জন্যেই। মা নারকেল ভেঙে আমাকে দিলেন। ফিলিপস এবং আমি বার বার জল খেতে লাগলাম। মা তন্‌গাপনের মাথায় হাত বুলাচ্ছিল আর আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল।

পুন্নাপাড়া গ্রাম যেখানে শেষ হচ্ছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে গাছের এক বিশাল দঙ্গল। তার উপর সাদা পতাকা উড়ছে। ছোট্ট পুকুরের পাশে একটা ভাঙা ঘর, দরজাগুলি দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। চারদিকের বেড়া ভাঙা, জায়গায় জায়গায় আগাছা ভর্তি। পুকুরে পদ্মফুল ফুটেছে। পুকুর পেরিয়ে আমাদের রাস্তা গেছে আলেপ্পির দিকে। সেই রাস্তা দিয়ে একজন আমাদের দিকে আসছিল। পথ প্রদর্শক বলল, 'ও মীনাক্ষী'।

—'কোন মীনাক্ষী?'

পথ প্রদর্শক কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই যুবতী কাছে চলে এল ; এক বিচিত্র আত্মলীন অবস্থায় পাশ দিয়ে চলে গেল সে। গাছের জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল—অলঞ্জি আর অলঞ্জি গাছের জঙ্গল। সেই সব গাছ ফুলে ভরা। সেখানে গিয়ে যুবতী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, উপরেব দিকে তাকাল ; সেখানে সাদা পতাকা উড়ছে। পরে তার চোখ নীচে নামল। সাদা সাদা অলঞ্জির ফুল মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল। সেগুলি অলঞ্জি গাছের কোটরে রেখে দিল। আবার হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইল।

—'ও কি করছে?'

পথ প্রদর্শক ধীরে ধীরে বলল, 'এটা আমাদের কাও। কাও একটা পবিত্র জায়গা। এখানে গ্রামের লোক পূজো করে। এখানে অনেক সাপও থাকে। এক দিন মীনাক্ষী আর পিত্রুস মিলে কাও-এর সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল তারা বিয়ে করবে।

—'পিত্রুস কে?'

—'সে আমাদের শহীদ। পুন্নাপাড়ার লড়াইয়ে শহীদ হয়েছিল। সে সামনের ঘরে থাকত। তার ঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে এখন কেউ থাকে না। মীনাক্ষী পিত্রুসের ঘরের দিকে চলে গেল। সে দরজার পাশে এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন নিজেকে প্রেমিকের কাছে সমর্পণ করেছে।

—'ও এখানে কি করতে আসে?'

—'ও প্রতিদিন পিত্রুসকে বলতে আসে, তোমার মীনাক্ষী আর কাউকে বিয়ে করবে না।'

পুন্নাপাড়া থেকে আমরা আলেপ্পি চলে গেলাম। গ্রাম থেকে মাত্র চার মাইল দূর। এটা একটা ছাত্রদের সভা। সভার সভাপতি জনগণেব সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন যে আমি একজন প্রগতিশীল মানুষ এবং সাম্যবাদে বিশ্বাস রাখি। সাম্যবাদ খুবই ভালো কিন্তু গান্ধীবাদও খারাপ নয়, সাম্যবাদ মানুষের উন্নতি চায়, ধর্মও তাই চায়। সাম্যবাদ ঈশ্বরকে মানে না, কিন্তু সাম্যবাদীরা খারাপ লোকেদের চেয়ে হাজার গুণ ভাল। তারা দৈনন্দিন ব্যবহারে ঈশ্বরকে জানে না। ঈশ্বর কি?

ঈশ্বর আমাদের ভিতরে আছে, সে সবার ভিতরেই থাকে, সে মানুষ হোক, পশু হোক, ভালো হোক বা খারাপ হোক। একটি জিনিসের দুটি দিক আছে। ভালো মানুষের মধ্যেও খারাপ লুকিয়ে থাকে। খারাপ মানুষের মধ্যেও ভালো গুণ লুকিয়ে থাকে (অর্থাৎ পুঁজিপতিরাও মঙ্গল করে)। কিন্তু কে কাকে দণ্ড দিতে পারে? (চোরাবাজার)। এইজন্যে শাস্তি পাওয়া উচিত নয়......(পুঁজিপতিদের লুঠতে দাও) কেবল নিজেকে আপনি সংশোধন করুন। (আর সমাজকে একই অবস্থায় ছেড়ে দাও) নিজেকে নিজে শোধরানোই মানবতার নির্বাণ...নির্বাণ...প্রগতি নয়। (নির্বাণ হলো জীবনের থেকে মুক্ত হওয়া। জীবনে প্রগতি করা নয়)।

ছেলেবেলায় আমি পুরনো লোকেদের এই রকম বক্তৃতা শুনেছি। আজ অনেকদিন পর এই ধরনের মজাদার বক্তৃতা শোনার সুযোগ হলো। একটি বাক্য অন্য বাক্যকে কাটছিল। বক্তা ভদ্রলোক দ্রুত বিষয় বদল করছিলেন। এই ধরনের চালাকি

ইমপিরিয়াল সার্কাসেও দেখিনি। আমি জানিনা স্টুডেন্ট ফেডারেশনওয়ালারা একে কেন ডেকেছেন। সভার পর চা খেতে খেতে তার সঙ্গে অনেক মজাদার কথা হলো। এবার তার সঙ্গে আরও এক ভদ্রলোক ছিলেন—নেড়া মাথায় গোল টুপি পরা।

থিওজফিস্ট ঃ দেশটাকে জিন্না বরবাদ করে দিল, নাহলে ভাগ হতো না।

গোলটুপি ঃ ঠিক বলেছেন,

আমি ঃ জিন্নার অনেক আগে এ দেশে মনু মজুদ ছিলেন।

থিওজফিস্ট ঃ মনু তো দেশকে পেশায় ভাগ করেছেন। সে খারাপ নয়। খারাপ হলো মুসলমানরা। এ দেশে আসার পর, নিজের সংস্কৃতি বাঁচাবার জন্যে হিন্দুরা জাতপাতের বাধা আরও কঠিন করেছিল।

গোলটুপি ঃ একদম ঠিক।

আমি ঃ মুসলমানদের থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্যেই এসব করা দরকার ছিলো?

থিওজফিস্ট ঃ আমি এই সময়ের রাজনীতির কথা বলছি। সেদিক থেকে মুসলিম লীগ অপরাধী। সে দেশকে ভাগ করেছে।

আমি ঃ দেশ ভাগের চুক্তিতে লীগ ও কংগ্রেস দুজনেই সই করেছে।

থিওজফিস্ট ঃ সে আলাদা কথা। বাস্তবে হিন্দুদের সবকিছু রক্ষার প্রবণতা বেশি, তার সংস্কৃতিতেও বিরোধী চিন্তাকে সামিল করে নেবার শক্তি আছে।

আমি ঃ গত দাঙ্গায় কিন্তু এই চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে!

থিওজফিস্ট ঃ লীগই অপরাধী। আপনি কি মনে করেন হিন্দুরা দেশভাগ করিয়েছে?

আমি ঃ আমি তো একথা কখনোই বলিনি। আমি তো হিন্দু মুসলমান জনগণের নামই নিইনি। এটা অবশ্যই বুঝতে পারি, যে চুক্তিতে দেশ ভাগ হল তাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের, মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর আছে। এত বড় দেশকে ভাগ করার আগে জনগণকে যদি জিজ্ঞেস করা যেতো, দেশভাগে তাদের যায় আসে কিনা তাহলে কিছু খারাপ হতো না। তারপর যদি আজকের মতো হতো ......

থিওজফিস্ট ঃ তাহলেও তাই হতো আজ যা হচ্ছে। এই বিভাজন ছিলো অবশ্যম্ভাবী।

আমি ঃ যদি অবশ্যম্ভাবীই ছিলো তাহলে মুসলিম লীগকে অপরাধী খাড়া করছেন কেন? লক্ষকোটি মানুষকে ঘর থেকে বাইরে এনে মেরে ফেলা হচ্ছে কেন?

থিওজফিস্ট ঃ এই রক্তপাত স্বাধীনতার মূল্য।

আমি ঃ এই স্বাধীনতার মূল্য শুধু পাঞ্জাবী আর বাঙালী কেন দেবে?

থিওজফিস্ট ঃ আমার বিশ্বাস, যদি মানুষের রক্ত থেকে সমাজের কল্যাণ হয়, তাহলে মানুষকে বলি দেওয়া উচিত। যদি এক প্রদেশের আত্মদানে পুরো দেশের উন্নতি হয়, তাহলে সেই প্রদেশের আত্মদান করা উচিত। যদি দেশকে বলি দিলে পুরো পৃথিবীর কল্যাণ হয়, তাহলে সেই দেশকে বলি দেওয়া উচিত।

গোলটুপি ঃ ঠিক বলেছেন, একেবারে ঠিক।

আমি ঃ এটা একেবারে পুরনো ধার্মিক লোকেদের বলিদানওয়ালা শাস্ত্র। যদি একটি মানুষের রক্ত থেকে অন্যের কল্যাণ হয়, একটা ছোট দেশের বা জাতির গলা কেটে অন্য দেশ বা অন্য জাতির কল্যাণ হয় তাকে ন্যায়সঙ্গত ভাবা উচিত—এ থিয়োজফি নয়, ফ্যাসিবাদ।

থিওজফিস্ট ঃ যখন ছেলে জন্ম নেয়, ব্যথা ও রক্ত দুইই তার নির্মানের দাম।

আমি ঃ ক্ষেতে কাজ করেন এমন হাজার মায়েদের জানি, যাঁরা শিশু জন্ম নেবার পরদিনই কাজে লেগে যান। কিন্তু আপনার মতে নির্মাণ কেবল নার্সিং হোমেই হতে পারে।

গোলটুপি ঃ মশায়, এই বিভাজন একেবারে অবশ্যম্ভাবী ছিলো, নাহলে এদেশে কখনো শান্তি—সন্তোষ হতো না।

আমি ঃ আজ দেশে শান্তি-সন্তোষ আছে?

গোলটুপি ঃ তাহলে কি আপনি এই বিভাজনের বিরুদ্ধে?

আমি ঃ আমি পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলিনি। প্রথমে আপনি বিপক্ষে বলছিলেন এবং মুসলিম লীগকে অপরাধী করছিলেন ; আর এখন আপনি বিভাজনের পক্ষে বায় দিচ্ছেন। আমার মতে এটাই আপনার সঠিক চিন্তা।

গোলটুপি ঃ না আমি এই বিভাজনের বিরুদ্ধে ছিলাম। কিন্তু এখন আর বিরুদ্ধে নেই। এখন চাই হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান আলাদা আলাদাভাবে শান্তিতে থাকুক। কিন্তু যতক্ষণ না পাকিস্থান তার পলিসি বদল করছে ততক্ষণ তা সম্ভব নয়।

আমি ঃ এইজন্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী?

থিওজফিস্ট ঃ বলতে পারি ঈশ্বরের আইন বিচিত্র ও রহস্যময়। আপনার মত কি?

আমি ঃ ঈশ্বরের রহস্য তো জানিনা। পৃথিবীর কথা বলছি। আমি সেখানকার অধিবাসী। তাকে এককালে পাঞ্জাব বলা হতো। এই দেশ শ্রীপুর হজাতে থেকে অম্বালা পর্যন্ত এবং রাওয়ালপিন্ডি থেকে মূলতান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো, এতে পাঁচটি নদী বইতো। এখানকার শতকরা নব্বুই জন কৃষক। তাদের ভাষা ও পোষাক এক ছিলো। এ দেশের এ জাতির অনেক কিছুই এক ছিল, কিন্তু সেই ঐক্যকে স্বার্থপর লোকেরা বিকশিত হতে দেয়নি। তারা সব সময় ধর্মকে খুঁচিয়ে তুলেছে। এককে অন্যের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিয়েছে। এই আলাদা করে দেবার চেষ্টা বহু বছর ধরে চলেছে। এদের সবচেয়ে বড়ো শক্তি ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। তার পোঁ ধরল হিন্দু মুসলমান, শিখ পুঁজিপতিরা, এদের পৃষ্টপোষক হলেন অন্য প্রদেশের পুঁজিপতি যাদের মধ্যে গুজরাটী, মাড়োয়ারী এবং উত্তরপ্রদেশের ধনী মুসলমানদের কথা আগে বলতে হবে। আমি বলতে চাই যে তাদের কারও এক মুহূর্তের জন্যে এই অধিকার ছিল না, পাঞ্জাবের জনগণকে ছাগল ভেড়াব মতো গলা কেটে আলাদা করে দেয়। তাদের দেশটাকে একটা ছোটখাটো জমিদারির মত নিজেদের ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়। পাঞ্জাবের ভাগ্য তার ছেলেরা ঠিক করত। চাই কি তারা নিজের দেশকে তিন চার অংশে ভাগ করে নিত। তারা এক হয়ে থাকত, অন্যদের থেকে আলাদা থাকত। এই সব ব্যাপারে শেষ কথা বলার অধিকার কিন্তু পাঞ্জাবের জনগণের ছিল, কিন্তু জেনেশুনেই সে অধিকার দেওয়া হয়নি। তাদের সেই অধিকার না দিয়েছিল কংগ্রেস না মুসলিম লীগ ; কেননা এটা ছিল

তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে। এর প্রমান এটাই যে বিভাজনের পর তাদের স্বার্থের কোন লোকসান হয়নি, লোকসান হয়েছে পাঞ্জাবের জনগণের। তাদের ঘর লুঠ হয়েছে, বিষয় আশয় সব বরবাদ হয়েছে, ক্ষেত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, নারীর মর্যাদা নষ্ট হয়েছে, ছেলেমেয়েদের গলা কাটা গেছে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ সবাই ভাগীদার এই সমস্যার অর্থাৎ এই রক্ত পুরো পাঞ্জাবের নাড়ী থেকে বয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে ধনী শিখদের শ্রেণী এখানে ছিলো তারা পূর্ব পাঞ্জাবে গিয়েও সেই রকমই ধনী ছিলো, যারা এদিকে জমিদার জায়গীরদার ছিলো তারাও সেখানে তাই থেকেছে, অর্থাৎ নিজেদের শ্রেণীর স্বার্থ সুরক্ষিত রেখেছিল, বরং তাদের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভালো করে নিয়েছিলো। কয়েকটি ব্যাপারে আরও শক্ত করে জনগণকে শিকল দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছিলো। এর অন্য অর্থ এই যে জনগণের শক্তি শোষকের শক্তির তুলনায় দুর্বল ছিল। এইজন্যে তাবা হেরে গেল ; এরকম পাঞ্জাবে হয়েছে, বাংলায় এখনও হচ্ছে, হিন্দুস্থান, পাকিস্থানের প্রত্যেক প্রান্তে হচ্ছে। এই বিভাজন পাঞ্জাব ও বাংলার সাধারণ বিভাজন নয়, এটা বাটোয়ারা—এই বাটোয়ারায় হিন্দুস্থান, পাকিস্থানের প্রত্যেক প্রান্তে, প্রত্যেক মফস্বলে, প্রত্যেক গলিতে দুই বিরোধী শক্তি একে অন্যের সামনাসামনি এসে গেছে—দুই আলাদা চিন্তাধারা আর সংস্কৃতির ভাগাভাগি, দুই পরস্পর বিরোধী সমাজের ভাগাভাগি। একদিকে গণতন্ত্রের চেষ্টা, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণকারীদের শ্রেণীস্বার্থ ; একদিকে আগে এগিয়ে যাবার শক্তি, অন্যদিকে পিছনে টানার ষড়যন্ত্র। হিন্দুস্থান আর পাকিস্থানে এই দুই শক্তি একে অন্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে কখনো কোন চুক্তি হতে পারে না। এদের দুজনের একজনকে শেষ হতে হবে। আমার ধারনা মৃত্যুতেই শেষ হবে ; আর জীবন হলো এগিয়ে যাওয়া।'

গোলটুপি ঃ (প্লেট এগিয়ে দিয়ে) আপাতত মিষ্টি খান।

থিওজফিস্ট ঃ (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) মানুষের এই সংগ্রাম স্থায়ী। কোন কিছুতেই তার সন্তোষ নেই। সে সবসময়ই প্রগতি চায়। কিন্তু প্রগতি কি? প্রগতি খুশী। অশোকের যুগের মানুষ, আকবরের যুগের মানুষের চেয়ে কি কম খুশী ছিলো? ছ্যাকড়া গাড়ির গাড়োয়ান কি হাওয়াই জাহাজের চালকের চেয়ে বেশি খুশি নয়? আমি জিজ্ঞাসা করি ......

গোলটুপি ঃ বিলকুল ঠিক।

আমি ঃ বাঁদর কি মানুষের চেয়ে বেশি খুশি?

যে বাদ বিবাদের কথা লিখলাম, সম্ভবত সেখান চিন্তার মধ্য কোন বিরোধ আছে। সম্ভবত আমি অন্যের চিন্তার কোন ভুল অর্থ বলেছি। কিন্তু কথাবার্তার সংক্ষিপ্তসার এরকমই ছিলো এবং সম্ভবত বাক্যের কাঠামো এবং নির্মান এরকমই ছিলো।

আলেপ্পি কেরলের সবচেয়ে বড়ো শিল্পনগরী এবং নারকেলের ছোবড়া থেকে জিনিষ তৈরী করার কেন্দ্র। এর বড়ো বড়ো রাস্তা দিয়ে বেরোবার সময় বড়ো বড়ো কারখানা দেখা যায়। কারখানায় হাজারো মজদুর কাজ করেন। তাদের মধ্যে কয়েকটির নাম—

১. প্যারিস লেজলে অ্যাণ্ড কোম্পানী। ২. ওয়ালকর্ট ব্রাদার্স। ৩. হেম্পন নাগ অ্যাণ্ড কোম্পানী। ৪. ডিয়ার্স স্নেল অ্যাণ্ড কোম্পানী। ৫. গুডএরন কোম্পানী।

কে বলে ইংরেজরা চলে গেছে! হয়তো আমাদের পার্লামেন্টে তাদের চেহারা দেখা যায় না, কিন্তু তারা আছে যেখানে নারকেলেব ছোবড়া বা পাটের উদ্যোগের ব্যাপার বা যেখানে তামা বা চা শিল্পের সঙ্গে সম্পর্ক—সর্বত্রই। কিন্তু কতগুলো আর গোনা যায়। তবে এটা বলাই যথেষ্ট যে যতদূর গতি যায় এই পরিস্থিতি সর্বত্রই বিরাজমান।

আলেপ্পির খোলা সড়ক, সুন্দর চক এবং একই ঢঙের তৈরী বাড়িগুলি বলে যে এই শহর একটি পরিকল্পনা করে তৈরী হয়েছিলো। দেওয়ান কেশব দাস আজ থেকে দেড়শো বছর আগে এটি তৈরী করেন। একে দক্ষিণ ভারতের ভেনিস বলা হয়। ভেনিসের মতই এখানেও শহরের মধ্য দিয়ে সমুদ্রের খাল বয়, অনেক নৌকো চলাফেরা করে। মাল আসবাব দেওয়া নেওয়া করা হয়। এও দেখা যায়, স্টীম এঞ্জিনের নৌকো অপ-অপ করতে করতে শিস দিতে দিতে চলে যাচ্ছে। যাত্রীরা নাবছেন, নৌকোয় সওয়ার হচ্ছেন, মাঝিরা পাল তুলছে, গুটিয়ে নিচ্ছে, মেয়েরা দুধ খাওয়াচ্ছে, ওয়াটারফ্রন্টের কিনারায় কলার কাঁদি এবং কমলালেবু ডাঁই করা ; দালালরা গোলমরিচের দর ঠিক করছে আর বড় ডোঙা থেকে মাঝিরা দাঁড় টেনে নারকেল দড়ির গাঁটগুলি সিঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। দড়ি টানুক বা স্টীম নৌকো চালাক মাঝিরা অল্পি ত্রিবাঙ্কুর কোচিন লাল ইউনিয়ন তৈরী করেছে। এরা শক্তিশালী ও লড়াকু। ছোবড়াবোনা মজদুরদের সংগঠন এবং নারকেলের কারখানায় কাজ করা মজদুরদের লাল সংগঠনের প্রেসিডেন্ট হলো কমরেড টি.ডি. থমাস। এই ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা সত্তর হাজারের উপর। এই ইউনিয়নকে দক্ষিণ ভারতের শক্তিশালী ইউনিয়ন হিসেবে গণ্য করা হয়। ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়িয়েছে যে সাধারণত মিলের ম্যানেজার নতুন কোন মজদুর নিলে এই ইউনিয়নের সদস্যদের মধ্য থেকেই নেন। কারণ তিনি তার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন যে পুঁজিবাদী কোন ইউনিয়নের কোন লোক এসে এই কারখানায় টিকতে পারে না। এই রকমই আলেপ্পিতে বিড়ি মজদুরদের ইউনিয়ন আছে। এই সব ইউনিয়নে দুই আড়াই লাখ মজদুর সংগঠিত হয়েছে। সম্ভবত এই জন্যেই আলেপ্পিকে দক্ষিণ ভারতের মজদুর আন্দোলনের লালদুর্গ বলা হয়।

যে দিনগুলি আমি আলেপ্পিতে ছিলাম সেই সময় মজদুরদের উপর ব্যাপক দমনপীড়ন চলছিলো। ২৬শে অক্টোবর ১৯৪৯ সালে ভায়লার শহীদদের স্মৃতিতে একটি দিন পালন করার সময়ও পুলিস গুলি চালায়। একজন কমরেড মহম্মদ থাপ্পা শহীদ হন। এরপর নভেম্বরে মজদুররা আবার শহরে মশাল মিছিল বের করে। জোর জুলুম করে পুলিস তা ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়—আইন দিয়ে নয়, ফ্যাসিস্ত কায়দায় দমন পীড়ন করে। ট্রেড ইউনিয়নের দপ্তর বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমি তা বন্ধই দেখেছি। কিন্তু আমার যাওয়ার পর মজদুররা তা খোলার সিদ্ধান্ত নেয়, যদিও পুলিসের দমন পীড়ন সেরকমই ছিলো, পুলিসের থানাও ছিলো ট্রেড ইউনিয়ন দপ্তরের সামনে। কিছুদিন আগে এক ডাক্তারের দোকানের সামনে এক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে গুলি করে মেরে দেওয়া হয়েছিলো। এই অত্যাচারের মোকাবিলা করার জন্য শ্রমিকরা আবার ইউনিয়ন দপ্তর খোলেন। এই সময়ও প্রায় পাঁচশো ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য

সেখানে একত্রিত ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে বৈপ্লবিক চিন্তার অভিব্যক্তিও দেখেছি। ইউনিয়ন দপ্তর থেকে বেরিয়ে মজদুররা আমাকে সামনের রাস্তায় নিয়ে গেলেন। সেখানে থানার কাছে কিছুদিন আগে তাঁদের এক উৎসাহী কর্মীকে পুলিস গুলি করে মেরেছিলো। আমি সেই জায়গাটা দেখছিলাম, আর দেখছিলাম বাজারের অনেক দোকান বন্ধ পড়ে আছে। খোলা রাস্তায় আমরা ছাড়া বিশেষ কেউ চলাচল করছে না। থানার বারান্দায় পুলিসরা দাঁড়িয়ে কানে কানে কথা বলছিলো। এক দু-জন বড় রাস্তা ছেড়ে গলিতে ঢুকে পড়ছিলো। আমরা ধীরে ধীরে কথা বলতে বলতে শিবাকোটা পালমের দিকে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ অনুভব করলাম যে আমি পঞ্চাশ ষাট জনের ঘেরাব মধ্যে বয়েছি ; আমার আগে পেছনে মজদুররা নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে এগোচ্ছিলেন। বাস্তবে সবাই আমার সুরক্ষার জন্য বিপজ্জনক পথটুকু আমার সঙ্গে এগোচ্ছিলেন, পালম পার হবাব পর ভিড় পাতলা হয়ে গেল এবং একটু এগিয়ে যখন হোটেলে পৌঁছলাম তখন আমি, ফিলিপস ও আরও দুজন ছিলেন। আমার হঠাৎ মনে পড়ল যে এই কুড়ি বাইশ দিনের মধ্যে আমাকে একদিনের জন্যেও একা ছাড়া হয়নি। একদিন রাত দুটোব সময় বাথরুম যাবার জন্য এগোতেই, কেউ বলল, আসুন, আপনাকে রাস্তা দেখিয়ে দিই। সেই কমরেড হাতে জলের ঘটি নিয়ে আমার আগে আগে চলতে লাগলেন। আমি মনে মনে নিজের সঙ্গীদের, কমরেডদের অনুশাসনের তারিফ কবতে লাগলাম। যে বিপ্লবী জাগৃতি এবং অনুশাসনের অনুভূতি কেরলে এসে হলো তা আমি উত্তরপ্রদেশের খুব কম জায়গায় দেখেছি। এই শৃঙ্খলার জন্যে কেরলের কমরেডরা গর্বে মাথা উঁচু করতে পারে।

সন্ধ্যের সময় বেড়াতে বোরোলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাবো, কিন্তু ফিলিপস বিষণ্ণ ছিলো। আজ ক্রীসমাস, এই আলেপ্পি থেকে অনেক দূরে কোন পাহাড়ী উপত্যাকার ছোট্ট গ্রামে তার বউ তার জন্য প্রতীক্ষা করছে। ভেবেছিলাম, সমুদ্রের তীরের বালিতে খালি পায়ে ঘুরে ফেনিল তরঙ্গের উপর ভেসে ওঠা চাঁদ দেখব। কিন্তু হোটেল থেকে বোরোতই ফিলিপস তার ইচ্ছা বদল করল।

—'চলো তোমাকে সেই বাজার দেখাব যেখান থেকে আমরা মশাল মিছিল বের করেছিলাম। যেখানে কমরেড মহম্মদ থাপ্পা শহীদ হয়েছিলেন।'

আমি বললাম, 'খুব ভালো। সেখান থেকে সমুদ্রের ধারে যাবো।'

সে বাজার অন্য বাজারের মতই। সেখানকার চৌমাথায় একটা মন্দির—তাতে হাজারো ইলেকট্রিক বাল্‌ব লাগানো এবং তার অঙ্গনের আশেপাশে ফুলের হাজারো মালা জড়ানো। ঘন্টা বাজছিলো। কীর্তন হচ্ছিলো। হাজার হাজার যাত্রী খালি পায়ে হাত জোড় করে ধুতি সামলাতে সামলাতে মূর্তি দর্শণ করতে যাচ্ছিলো। মন্দির থেকে দূরে পেছনের আলো লাভার মতো টগবগ করছে মনে হচ্ছিলো। তুবড়ি ও রঙ বেরঙের ফুলঝুরি হঠাৎ আকাশে উঠে হারিয়ে গেল।

—'এটা কি'? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ফিলিপস বলল, 'মন্দিরে মন্দিরে লড়াই। এই মোড়ের মন্দির হলো লোহা এবং গোলমরিচ ব্যবসায়ীদের। সামনের মোড়ে অন্য এক মন্দির আছে। এখান থেকে দেখা

যাচ্ছে না—ঐ যেখানে অনেক আলো, ওটা নারকেল ও সূতার কারখানাওলাদের মন্দির, গত এক সপ্তাহ ধরে দুই মন্দির সাজানো নিয়ে প্রতিযোগিতা চলেছে। কখনও এই মন্দিরের ব্যবসায়ী বাজি জেতে কখনও ঐ মন্দিরের।'

—'এই দুই মন্দিরের মধ্যিখানে কমরেড মহম্মদ থাপ্পার লাশ', আমি ধীরে ধীরে বললাম।

হঠাৎ এই মন্দিরের পুকুরের উপর আতশবাজি আকাশে ফোয়ারার মতো উঁচু হয়ে হালকা বৃষ্টির মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। গোলমরিচের ব্যবসায়ীরা নিজেদের দেবতার বিজয়ধ্বনি করল, অন্যদিকে অন্য মন্দিরের কারখানাওয়ালারা জোরে জোরে তার উত্তর দিলো। আমার মাথায় হঠাৎ এই দুই মন্দিরের মধ্যিখানে মশালের আলো ঝিলিক দিয়ে গেল। আমি ফিলিপসকে বললাম, 'চলো সমুদ্রের তীরে যাই।'

সমুদ্রের আওয়াজ অনেক কম এবং বালিতে এখন বেলাশেষের উত্তাপ। চাঁদ কোথাও ছিলো না, অন্ধকার ছেয়ে রয়েছে এদিক থেকে ওদিকে। ভেজা হাওয়া বিড়ির থুতু লেপটা দুর্গন্ধের মতো। চাঁদ কোথাও ছিলো না। আমরা চাঁদের জন্য অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করে রইলাম, আর পায়চারি করতে লাগলাম। কিন্তু চাঁদ উঠলো না, কেবল আকাশে মন্দিরের ফুলঝুরির রমরমা।

শেষে ফিলিপস বলল, 'চলো বন্ধু ফিরে যাই। চাঁদ নিজে আসবে না, তাকে টেনে পৃথিবীতে নামাতে হবে।'

ভায়লার আলেপ্পি থেকে বারো চোদ্দ মাইল দূরে। এই গ্রাম চরকল তালুকে। এখানে সবসময় আকাল লেগে থাকত। বাঙলার আকালের দিনেও এখানে ভয়াবহ আকাল শুরু হয়েছিলো। তাতে বহু প্রাণহানি হয়। আকালের পর এখানকার অধিবাসীদের গোদ অনেক বেড়ে গেছে ; কারণ চরকল তালুকে মানুষ দূষিত জল খেতে বাধ্য হয়, যদিও আলেপ্পি এই গ্রাম থেকে বারো চোদ্দ মাইল দূরে। সেখান থেকে জলের পাইপ টেনে আনা বা নলকূপ বসানো—এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় নেই কারো। আমাদের নতুন গণতন্ত্র বেঁচে থাক, তাতে যদি ভালো হবার স্বাধীনতা নাও থাকে, কমসে কম রোগ হবার স্বাধীনতা তো আছেই।

ভায়লার গ্রাম কোন ছোট দ্বীপ নয়, কিন্তু দ্বীপের মতো এর তিনদিকে জল এবং চতুর্দিকে গ্রামের সঙ্গে এর সীমা মেশে। আমরা যেহেতু চটকলের রাস্তায় এসেছিলাম, সেই জন্য বাজারে যাবার জন্যে আমাদের নৌকোর সাহায্য নিতে হলো। পূর্বের ব্যাকওয়াটার্স গহন জল চিরে নৌকোটি আমাদের ভায়লারের সমুদ্রতটে নিয়ে এলো।

সমুদ্রতীরে অনেক নৌকো বাঁধা ছিলো। চারদিকে নারকেল গাছের ঘন সারি। এই গাছগুলির পেছনে লুকোনো মজদুরদের ঘর থেকে ছোবড়াকোটা মেয়েদের আওয়াজ আসছিলো। উত্তর দিক থেকে দুটো বড় বড় ডিঙি পশ্চিমদিকে যাচ্ছিলো ; হাওয়া শব্দহীন এবং সমুদ্র তরঙ্গহীন, আর ডোঙা চালাচ্ছিলেন যে মাঝিরা তাদের আহ্বানে এক বিচিত্র আকর্ষণ ও বিষাদের ছায়া ছিলো। সেই নিস্তব্ধতায় ইতস্তত করে আমরা নারকেল গাছের দৃশ্যের বাইরে গ্রামের ভিতর ছাইরঙা পায়ে চলার পথে পা বাড়ালাম।

আমার সঙ্গে ফিলিপস প্রথমবার ভায়লারে এসেছে। রাজনীতিজানা লোকেরা ভায়লারের নাম জানে, কিন্তু এটা জানে না যে ভায়লার দক্ষিণ ভারতের জালিয়ানওয়ালাবাগ। তফাৎ কেবল এইটুকুই যে জালিয়ানওয়ালাবাগে একজন ইংরেজের আদেশে গুলি চালানো হয়েছিলো, আর এখানে একজন এ দেশীয়ের হাতে গণহত্যা হয়েছিলো। তাতে চারশোরও বেশি ভায়লারের মজুর এবং কৃষক স্বাধীনতার ধ্বনি ও স্যার সি.পি. আয়ারের আমেরিকান বিধান মুর্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে শহীদ হয়েছিলেন। অনেক লোক আজকাল এটা ভুলে যান যে ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান আগষ্ট ১৯৪৭-এর পরে ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ত্রিবাঙ্কুরকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতর অন্য একটি স্বাধীন উপনিবেশে স্থান দেবার জন্যে এই সব রক্তপাত করেছিলেন এবং এই জন্যে তিনি নিজের হিটলারী কার্যকলাপ চালিয়ে গেছেন। এব প্রতিরোধ কবায় আলেপ্পির মজদুব, কৃযক এবং পুন্নাপাড়ার কিষাণরা স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেদের রক্ত দিয়েছে। সেই সময়ই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতারা এই শহীদদের বাহাদুরি ও সাহসের প্রশংসা করতেন এবং তাঁদের রাষ্ট্রীয় শহীদ বলা হতো। কিন্তু আজ আর সেই ভুল কেউ করে না।

পুন্নাপাড়া সংঘর্ষের তিন চার দিন পরেই ভায়লারের দ্বিতীয় মোর্চা তৈরী হলো, যাতে ভায়লারের লড়াকু মজুর ও কিষাণরা নিজেদের বুকে সাদা সরকারের কালো গুলি খেয়েছিলেন, আর এই সাহস ও বাহাদুরি নিয়ে দেশের শত্রুদের মোকাবিলা করেছিলেন ; এমনভাবে মোকাবিলা করেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদীদের সিংহাসন নড়ে ওঠে, আর সি.পি. ত্রিবাঙ্কুর ছাডতেই কংগ্রেস শাসন ক্ষমতা হাতে নেয়। আজ আমি সাম্রাজ্যবাদীদের মন্দিরে ফিলিপস-এর সঙ্গে এসেছিলাম।

কিছুদূর চুপচাপ পায়ে চলা পথে এগিয়ে এক রোগাপটকা যুবকেব সঙ্গে দেখা হলো—ভি জি. সুধাকিরণ। সে অরণাকুলামে একটি কলেজে পড়ে। নিজের বাড়িতে এসেছে। এই যুবক আমাদের সারা ভায়লার ঘোরায়। প্রথমে নিয়ে যায় তার বাড়ি। বৈঠকখানায় কেরলের প্রসিদ্ধ সংস্কারক শ্রীনারায়ণের ও প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রীয় কবি কুমার আশানের ছবি টাঙানো। বৈঠকখানায় আমাদের জন্য তাজা নারকেলের জল আনা হলো এবং বাড়ির লোকেরা আমাদের দেখতে এলেন।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সুধাকিরণ একটি ছোট্ট ছেলেকে বলল, নল দময়ন্তীকে খাবার দেওয়া হয়েছে? আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা'? সুধাকিরণ অঙ্গনে খোঁড়া ডোবার দিকে দেখিয়ে বলল, 'দুটো মাছ। এতে থাকে। আমরা ঘরের মাছ কখনো খাই-না।' আমি বললাম, 'হায় স্বদেশী পুঁজিপতিরা যদি এটা অনুশীলন করত। ফিলিপস হেসে বলল, 'তা কি করে হবে'!

আবার সমুদ্রের তীরে এলাম, একটা কালো ছেলে মযলা ছেঁড়া ধুতি জড়িয়ে নৌকায় কালো কাদা তুলে আনছিলো। ঘাসভরা জলে নৌকো বেঁধে কালো কাদা বের করে নারকেল গাছের গোড়ায় দিতে লাগলো। আমি কারণ জানতে চাইলাম, সুধাকিরণ বলল, 'এই কালো কাদা নারকেল গাছের খুব ভালো সার।' সুধাকিরণ তার কাঁধ ছুঁয়ে বলল, 'এখন তোমার হাড়ে ব্যথা করে না সান্‌গুনি? সান্‌গুনি দাঁত বের করল, 'কখনও কখনও ব্যথা হয়। যখন ঠাণ্ডা লাগে বা দুদিন খাবার জোটেনা', সুধাকিরণ সান্‌গুনির

কাঁধ আমার দিকে নিয়ে এসে বলল, যখন ভায়লারে গুলি চলছিলো, এ ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। একটা নারকেল গাছের পেছনে লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এসো সেই গাছ দেখাচ্ছি। সেই গাছের কাছে গেলাম। সুধাকিরণ উত্তর দিক দেখিয়ে বলল, 'গুলি ঐ দিক থেকে এসেছিল গুড়ির মধ্যে ঢুকে বেরিয়ে গিয়ে নারকেল গাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা সান্‌গুনির কাঁধ চিরে বেরিয়ে মাটিতে পড়েছিলো।' যে দিক দিয়ে গুলি এসেছিলো সেদিকে একটা ছোট্ট ফুটো, যেদিকে বেরিয়েছিলা সেদিকে আরও বড়ো ফুটো। সান্‌গুনির কাঁধের উপর আঘাতের একটা বড়ো দাগ।

আমি বললাম, যখন গুলি গাছের গুঁড়িতে না গিয়ে মানুষের বুক পেটে ঢোকে, তখন কত বড় গর্ত হবে? ফিলিপস বলল, 'মাংস এবং কাঠের মধ্যে অনেক তফাৎ, যদিও অনেক শিকারী সেই তফাৎ জানে না ; আমি বললাম, 'জানে নিশ্চয়, পরোয়া করে না।' সুধাকিরণ বলল, 'পল্টন এখানে যে কার্তুজ ব্যবহার করেছে শুনেছি তা বুনো শুয়োর শিকারের জন্য ব্যবহার করা হতো। সান্‌গুনি হেসে বলতে লাগল, 'আমি যখন হাসপাতালে ঠিক হয়ে গেলাম, তখন পুলিস খুব মেরেছিলো। আমার কাছে ভায়লারের মোর্চার লোকেদের নাম জিজ্ঞেস করেছিলো। আমি বললাম, আমার নাম সান্‌গুনি, দ্বিতীয় কারো নাম জানি না।'

এর পর সে গাছের শিকড়ে কাদা ফেলতে লাগলো। আমি ভাবলাম, আমাদের দেশ কত উৎপাদনশীল যেখানে সান্‌গুনির মতো সাহসী লোক জন্ম নেয়।

ফিলিপস, সুধাকিরণ ও আমি গ্রামের মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে পুন্নাপাড়ার মোর্চার বিপ্লবীরা ও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা একসঙ্গে ক্যাম্প সাজিয়েছিলেন।

কুইজুলুম মন্দির একসময় একেবারেই খালি ছিলো। মন্দিরের পাশে একটা কুঁয়ো। কিন্তু সেখানে কেউ জল ভরতে যেতো না। আশেপাশে কাঞ্জিরিমের উঁচু উঁচু গাছ। তাতে নীল ফুল ধরেছে। একটা গাছের সঙ্গে ছাগল বাঁধা আর মন্দিরের প্রদীপগুলি গভীর আঘাত বুকে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো, সুধাকিরণ বলল, 'এখানে তাদের ক্যাম্প ছিলো। তাদের হাতে কেবল বল্লম ছিলো। তারা প্যারেড করছিলো। পাশের গ্রামের জমিদার যে এখন কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য, সেই খবর দেয় স্যার সি.পি.-র সেনাদের। —'ফৌজ কোন দিক থেকে এসেছিলো'?—জিজ্ঞেস করলাম। সুধাকিরণ বলল, 'উত্তরের দিক থেকে ; সেদিকেই সরকারের অতিথিশালা। সেই দিক থেকে ফৌজীদের নৌকো এসে আমাদের গ্রামের তটে নোঙর করে এবং এসেই গুলি চালানো শুরু করে দেয়।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি করে জানলে'?

সুধাকিরণ উত্তর দিলো, আমার মায়ের শরীর খুব খারাপ ছিলো, গ্রামের সব লোক এদিক ওদিক গেছে, অথবা ক্যাম্পে গেছে। আমি মার দেখাশুনা করছিলাম।'

—'তারপর কি হলো?'

সুধাকিরণ বলল, 'যখন গুলি চালানো শুরু হলো, আমি মাকে ওষুধ খাওয়াচ্ছি। আমি উত্তর দিক থেকে গুলি চালানোর শব্দ শুনি, দক্ষিণ দিক থেকে ইনক্লাব জিন্দাবাদের আওয়াজ শুনি।' এই আওয়াজ হাজারো বুক থেকে উঠে আসা মনে হচ্ছিলো। আবার জোরে গুলির বর্ষা শুরু হলো। আবার ইনক্লাব জিন্দাবাদ লাফিয়ে

উপরে উঠে গেল।

—'তারপর'?

—'সাড়ে ছ'ঘন্টা গুলি চলেছে। আমি ইনক্লাব জিন্দাবাদের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম। ধীরে এই ধ্বনি কম হতে লাগল। আওয়াজ শিথিল হয়ে এলো, এবং গুলিবর্ষণ বাড়তে লাগলো। শেষে কেবল একটি আওয়াজ শোনা গেল—ইনক্লাব জিন্দাবাদ। তারপর চারদিক দীর্ঘ নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেল। আমার মা বিছানায় মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।'

সেই রাতে ভায়লারে কেউ ছিলোনা। কেউ কাঁদেনি। কেউ ফোঁপায়নি। ফৌজীরা চলে গিয়েছিলো। কুকুররা চুপ ছিল। পাখীরাও চুপ ছিলো। এত গহন নিঃস্তব্ধতা, এত দীর্ঘ রাত আমি কখনো দেখিনি। মনে হচ্ছিলো, এ অন্ধকার কখনো শেষ হবে না।

দ্বিতীয় দিন দুপুরবেলা বাইবে বেবোলাম, চাবদিকে বিচিত্র ভয়ানক দৃশ্য, শহীদদের লাশ ছড়িয়ে বয়েছে। একে অন্যের উপর পড়েছিলো।

মৃতবা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো, ডোবাতে পড়েছিলো। বেড়াগাছে আটকে ছিলো। কোথাও মাথা, কোথাও হাত, পা কোথাও, চিল আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আর কাকরা কা-কা শব্দ কবছিলো। তাড়া খেতে খেতে এরা সমুদ্রতীরে এসে পড়েছিলো—ক্যাম্পে লালেব দীর্ঘ ধাবাবাহিকতা, আমি দেখলাম ক্যাম্পের কাছে পঞ্চাশ-ষাট জন পড়ে আছে—

তিন পা আগে
তিরিশ চল্লিশটা লাশ
চার পা আগে
বিশ পঁচিশটা লাশ
পাঁচ পা আগে
পনেরো কুড়িটা লাশ
ছ পা আগে
আট দশটা লাশ
সাত পা আগে
চার পাঁচটা লাশ
আট পা আগে
একটা লাশ —এবং তার হাতে মজদুর ও কৃষকের ঝাণ্ডা ছিলো। নিজের মুঠোয় পতাকা উঁচু করে ধরে সে পড়েছিলো। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলো সে, পতাকাও, কিন্তু মুঠো ছিলো বন্ধ। দু পা আগে সমুদ্র ছিলো, সেই সমুদ্র যে আগামী ঝড়ের কথা জানায়।

সুধাকিরণ চুপ করে গেল। আমি মন্দিরের চারদিক দেখে সুধাকিরণকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই মন্দির পরিত্যক্ত কেন?' এই মন্দিরে কেউ প্রদীপ জ্বালায় না কেন'?

সুধাকিরণ বলল, 'এখন গ্রামবাসীদের আর পিতলের পুরনো দেবতাদের উপর বিশ্বাস নেই। তারা বলে, আমরা হাজারো বছর ধরে দেবীর পূজো করে আসছি, কিন্তু যখন আমাদের প্রয়োজন, সে তখন কোন কাজে লাগলো না'।

সুধাকিরণ আগে আগে চলতে লাগলো, আমরা পেছনে। একটা ঝোপের পাশে পালার একটা বড় গাছ দাঁড়িয়ে ছিলো, তাব পাতা অনেকটা খোলা হাতের মতো। পুকুরে সবুজ কলমি ছড়িয়ে, তার উপর ওডম-এর লাল ফুল। সুধাকিরণ সেই পুকুরের কাছে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, 'এই পুকুবে সাঁইত্রিশজন শহীদের লাশ পোতা আছে।'

আমি আর ফিলিপস অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িযে রইলাম। শেষে আমি ঝুঁকে ওডমের একটা লাল ফুল তুলে নিলাম। ফিলিপসকে বললাম, 'অনেকদিন আগে একটা গল্প লিখেছিলাম, 'লাল ফুল'। সেই গল্পে একজন কমবয়সী কবি মজদুরদের হরতালের সময় পুলিশেব গুলিব শিকার হয় ; মারা যাবাব সময় সে জিজ্ঞাসা কবে, 'দাদা, আমার কবরে লালফুল কবে ফুটবে? আজ আমি সেই ছোট্ট কবিকে বলতে চাই, 'ভাই আমার, আমি ভায়লারে সেই লাল ফুল ফুটতে দেখছি'।

ফিলিপস একটা ওড়োলেব লাল ফুল তুলে হাতে নিলো। সুধাকিরণ আমাদেব নিয়ে চললো। হাড়ের একটা বড়ো পাহাড়—সুধাকিবণ বলল, 'এর নীচে একশো কুড়ি জনের লাশ রয়েছে।'

চলতে চলতে আমার পা এই রকম একটা ঢিবির সঙ্গে ধাক্কা খেল। একটু দূরে ধূলো উড়ল এবং দু তিনটে হাড় বেরিয়ে এলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কি?' সুধাকিরণ বলল, 'শহীদদেব হাড়'।

—'কিন্তু ভাল করে কবর দেওয়া হযনি কেন'?

—'তৃতীয় দিনে ফৌজ এলো। তারা পেট্রোল ঢেলে জ্বালানোব চেষ্টা করে। কিছু জ্বলে যায়। কিছু এমনি থেকে যায়। তারপরে ফৌজীবা চলে গেল। এদিক ওদিক থেকে লোকেরা ভায়লারে এলো। কিন্তু লাশের সংখ্যা চারশো। তাদের কিভাবে সৎকার হতো? কিভাবে কবব দিতো? আবাব এদেব কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ ক্রীশ্চান। আমরা সবাইকে একজায়গায় কবে মাটিতে কবর দিয়েছি।'

—'তাহলে এখন এই ঢিবিগুলোর আশেপাশে বেড়া দিয়ে দাও। তাহলে কারো পায়ের ঠোক্করে হাড়গুলো বাইবে বেরিযে আসবে না।'

সুধাকিরণ হেসে বলল, 'আমরা প্রতিবছর ভায়লারে শহীদ দিবস পালন করি। গত বছর আমরা এই ঢিবির আশেপাশে বেড়া দিয়ে তার উপর শ্রমিকদের পতাকা লাগিয়েছিলাম। পুলিস তা তুলেফেলে দেয়। বেড়া ভেঙে ফেলে। আমাদের নেতাদের এখন ভায়লারের শহীদের কোনো প্রয়োজন নেই।'

সুধাকিরণ বলল, 'যারা কেরলকে বিক্রি করে খেয়েছে, তারা শহীদদের কিভাবে রক্ষা করবে? এরা তো নিজেদের শহীদদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু মনে করে। জীবিতদের এরা ততো ভয় পায় না, যতো ভয় পায় ভায়লারের শ্রমিকদের।'

সুধাকিরণ আমাদের এই রকম বড়ো বড়ো দুটো ঢিপি দেখাল। তাতে একশোরও বেশি শহীদদের কবর দেওয়া হয়েছিলো। তারপর সে মানকিয়ার কাছে নিয়ে গেল। মানকিয়ার একটাই ছেলে—শ্রীধর তেলমিলে কাজ করত, আর ভায়লারে লড়াইয়ে শহীদ হয়েছিলো। আমি মানকিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি শ্রীধরের মা'? সুধাকিরণ অনুবাদ করল। মানকিয়া ঘুরে আমার দিকে তাকাল। তারপর দেওয়ালের আড়ালে মুখ লুকোল। তার চোখে অশ্রু থাকতে পারে—আমি দেখিনি। আশ্চর্য

থমথমে পরিবেশ। মনের মধ্যে বিচিত্র একটা ঝড় উঠলো। আমি পাথরের চাতালে দাঁড়িয়ে ছোট্ট ঘরের দিকে তাকালাম—সেখানে শ্রীধর থাকতো, আজকাল তার মা মানকিয়া আর ছোট্ট বোন তিন্‌গমা। আমি তিন্‌গমাকে কোলে তুলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দাদা, তোমাকে কি খাওযাত'?

—'মাছ', তিন্‌গমা বলল।

মানকিয়া আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আমরা কি শান্মি কাবাব খাবো। এই বলে মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

—'তুমি কি আমাকে পর ভাবো?' আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলাম।

মানকিয়া আমার কথার উত্তর দিলো না, আমি চমকে চারদিকে দেখলাম। এই বাড়িতে নারকেলের গাছ বেশি নেই। দেওয়ালের বাইরে নারকেলে ছোবড়া বোনা তকলিতে মর্চে পড়েছে। তিন্‌গমা বিচিত্র চোখে আমার দিকে দেখছিলো। আমি মানকিয়াকে বলাম, 'মা, তোমার ছেলে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছে, তোমার কি গর্ব হয় না?'

মানকিয়া ঝাঁঝিযে বলল—'আমি কি জানি? আমার একমাত্র ছেলে ছিলো'।

আমি, সুধাকিরণ ও ফিলিপস মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলাম। রাস্তার একটা নারকেল গাছের সাঁকো, সেটা পেরোবার জন্যে দাঁড়ালাম। জুতো খুলে হাতে নিচ্ছি। তখনই কেউ পেছন থেকে এসে কাঁধ ধরে ঝাঁকালো। আমি ফিরে দেখলাম, মানকিয়া। তার চেহারা লাল, মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার কাঁপছিলো। —'কি ব্যাপার?' আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। মানকিয়া হাঁফাচ্ছিল। সে জোরে বলল—'আমার ছেলে একটা ভলো কাজে মারা গেছে, আমি তার জন্যে গর্বিত।' একথা বলে সে বাড়ির দিকে ফিরে গেল।

হঠাৎ ফিলিপস-এর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে গেল, 'মা তুমি তোমারছেলের জন্যে গর্বিত। কিন্তু আমি তোমার মত মায়ের জন্যে গর্বিত।'

মানকিয়া শোনেনি, সে ততক্ষণে চলে গেছে।

মানকিয়ার ঘর পার হয়ে আমরা নারায়ণের ঘরে গেলাম। রাস্তায় একটা খোলা জায়গায় প্রায় পনোরো বিশজন মধ্যবয়সী ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নারকেলের ছোবড়া কুটছিলো। আমাদের দেখে কিছুক্ষণের জন্যে থেমে গেল। আবার কাজ করতে লাগল। এই মহিলাদের কোমর ছাড়া আর কোথাও কাপড় নেই। আমি সুধাকিরণকে জিজ্ঞেস করায় সে বলল, 'দারিদ্র্য ও পুরনো যুগের মূর্খতা। বাস্তবে নগ্নতা মানুষের দৃষ্টিতে, শরীরে নয়।'

এইভাবে কথা বলতে বলতে আমরা নারায়ণের বাড়ি পৌঁছলাম, নারায়ণের রঙ কালো, শরীর দুর্বল, দাঁত অত্যন্ত সাদা, চেহারায় হাসি ও বুদ্ধিমত্তার ঝলক। নারায়ণ ভায়লারের মোর্চার সামনে ছিলো এবং পতাকা নিয়ে আগে যাঁরা যাচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে। গুলির দাগ সে আমাকে দেখালো। গুলিতে ডানদিকের বুকের হাড় ভেঙে পেছনে বেরিয়ে গেছে। নারায়ণ বলল, 'কনফারেন্সের রিপোর্ট আমি খবরের কাগজে পড়েছিলাম। আমার আশঙ্কা, এখানে আজও এমন লোক আছেন যারা মনে করেন

সাহিত্যকে যাচাই করার অধিকার জনগণের নেই। জন্ডিস হওয়াতে আমি যেতে পারিনি। যেতে পারলে এই সব সাহিত্যিক দালালদের আমি অবশ্যই বিরোধিতা করতাম। এরা সাহিত্যে ঠিকাদারী করেন আর পুঁজিবাদীদের কাছে তা বিক্রি করে দেন।'

আমি বললাম, 'তোমাকে দুটো প্রশ্ন করব, উত্তর দেবে'?

নারায়ণ 'হ্যাঁ', বলে মাথা নাড়ল।

আমি প্রশ্ন কবলাম, 'তুমি ভায়লারের লডাই লড়লে নিজের রক্ত দিয়ে কিন্তু সংগ্রামে লাভ অন্য শ্রেণীর হলো।'

—'পবিস্থিতি এই রকমই ছিলো। সেই সময এই স্তব দিয়েই এগোতে হতো', নারায়ণ বলল।

—'এই পবিস্থিতি তোমাকে কাপুরুষ করেনি তো?'

—'কাপুরুষ হযে কোথায় যাবো'?

—'যদি তুমি দেশদ্রোহীদের সঙ্গে মিলতে, তাহলে সুখে জীবন কাটাতে পারতে', আমি বললাম।

—'কত দিন পর্যন্ত'?

এই কথা বলে সে আমাব মুখে যেন একটা জোব থাপ্পড মাবল।

আমি প্রশ্ন করলাম—'সাহিত্যিকদের কোন বাণী দেবে'?

—'হ্যা', সে স্থিরভাবে বলল, 'তাদের বলবেন আমি কয়্যার ফ্যাক্টরিতে কাজ করি। আমাদের সম্পর্কে লেখার আগে যেন আমাদেব সঙ্গে দেখা করে।'

নারায়ণের ঘবের বাইরের উঠোনে দাঁড়ালাম। ইতোমধ্যে সুধাকিরণ এক মহিলার দিকে সংকেত করে বলল, 'কমরেড পারো। শহীদ প্রভাকিরণ এঁর একমাত্র ছেলে। এই মহিলাকে আশি বছর বয়সেও নিজের পেট চালানোর জন্যে নারকেলের ছোবডা কোটার কাজ করতে হয়। বৃদ্ধা মা পারো এগিয়ে এলো এবং আমার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ালো। আমাকে কিছু বললে না, কেবল তাঁর ঠোঁট আমাকে দেখে কেঁপে গেল, আমার চোখে চোখ রেখে তাঁর চোখ ভিজে গেল। চলতে চলতে তিনি যখন আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, সময়ও যেন দাঁড়িয়ে গেল, যেমন কখনো কখনো সময় দাঁড়িয়ে যায়, সময় এগোতে অস্বীকার করে। হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও সেই সময় চোখের জল ধরে রাখা যায় না। বলতে পারেন এ আমার ভাবুকতা, আপনি বলতে পারেন, এটা আমার অগভীরতার পরিচায়ক ; আপনি আমাকে বলতে পারেন ভাবুক গাধা এবং জীবনের যাথার্থ্য সম্পর্কে একেবারেই অপরিচিত। হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও চোখের জল আমি ধরে রাখতে পারিনি। সম্ভবত আমার হৃদয়ে এখনো অন্ধ ফ্যাসিজম জন্মায়নি, যা মানুষের শহীদ হবার পরও পাথর হয়ে থাকে। এরা এত স্বার্থপর যে চারশো মানুষের রক্তের ভার নিয়েও মাদ্রাজ রেডিওতে শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে বক্তৃতা করে। আমি স্বীকার করছি, আমি সেই রকম ধোঁকাবাজ নই, আমি স্বীকার করছি আমি একজন দুর্বল মানুষ, আমি পারোর সামনে কেঁদে ফেলেছি, এমনভাবে কেঁদেছি যেভাবে শিশুরা কাঁদে মায়ের সামনে, আর সেইভাবে কেঁদেছি, যেমনভাবে মা ছেলের সামনে কাঁদে আর নালিশ করে। সে আমার ভাষা জানে না, আমিও তার ভাষা বুঝি

না। কিন্তু আমাদের অশ্রু একে অন্যের ভাষা বোঝে—মানুষের ভাষা, সংঘর্ষের ভাষা, তার মৈত্রী, তার মেহনত এবং শহীদ হবার ভাষা। আমি সেই অশ্রু কোথায় লুকোতাম? আমি কিভাবে বলতাম যে আমার চোখের জল শুকিয়ে গেছে, আমার হৃদয়ের স্রোত শুকিয়ে গেছে ; আর আমি শহীদ মায়ের সামনে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। আটকানোর অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও এই অশ্রু ইস্পাতী দেওয়াল ভেঙে সামনের গালেব উপর দিয়ে নেমে এলো। এই দুঃখ ক্রোধ আর ঝড়ের অশ্রু শহীদদের সমাধিতে লাল ফুলের মতো ফুটে থাকে—সাহিত্যে রক্তের বিন্দুর মতো চমকায় এবং শক্তিশালী হাতে বিপ্লবের তরবাবি হয়ে যায়। এই অশ্রুর জন্য আমি লজ্জিত নই।

দুএকজন ছাড়া আমাদের ভায়লারে পৌঁছাবার খবর জানত না। কিন্তু যখন আমরা বিদায় নিলাম, তখন সারা গ্রাম আমাদের সঙ্গে ছিলো। সামনে ছোট বাচ্ছাদের ভিড়, যেদিকে চবতল যাবাব নৌকো বাঁধা, ছোট বাচ্ছারা ভিড করেছিলো। সমুদ্রের তীরে পৌঁছলে ছেলেরা আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে নিলো এবং চেঁচাতে লাগলো—'এখানে বালিতে বসে বড়'। এরা এত ছোট যে আমাকে তাদের আদেশ মানতেই হলো। আমি মাটিতে বসে পড়লাম।

একটা ছোট ছেলে এগিয়ে এলো। তার শরীরে আচ্ছাদন ছিলো না, কোমরে একটা সাদা ঘুন্সী বাঁধা। সে হেসে নিজেব হাত এগিয়ে দিলো। আমি দেখলাম তার হাতে লাল ফুলের মালা। সেই মালা সে আমার গলায় পরিয়ে দিলো। অন্য ছেলেরা খুশীতে হাততালি দিলো।

আমি ছেলেদের মিষ্টি খাওয়ার জন্যে টাকা দেবার জন্যে পকেটে হাত ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'তোমরা কি চাও'?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মালা-পরানো ছেলেটি গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমরা শান্তি চাই।'

আমি আশ্চর্য হয়ে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। সেই সময় অন্য ছেলেরা চীৎকার করে জোরে জোরে বলতে লাগল, 'আমরা শান্তি চাই! আমরা শান্তি চাই!! আমরা শান্তি চাই!!!'

আমি খালি হাত পকেট থেকে বের করে নিলাম, এবং চুপচাপ নৌকায় বসলাম। বাচ্ছাবা ভায়লারের সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়েছিলো।

নৌকোটি ব্যাক ওয়াটার দিয়ে যাচ্ছিলো। ছোট ছোট তরঙ্গে নাচছিল। আমি মালাটি খুলে ধীরে সাগরের জলে ছেড়ে দিলাম। মালাটি কিছুদূর ভাসার পর বাঁশের কঞ্চি দুটি আলাদা হয়ে গেল। বাঁশের কঞ্চিতে বাঁধা লালফুল তরঙ্গে নাচতে লাগল, যেন বাচ্ছারা নৌকো চড়ে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে। একটি কঞ্চি পূর্বদিকে যাচ্ছিলো, অন্যটি পশ্চিমে ; তাদের দেখে আমি একটি গল্পের কথা ভাবছিলাম। সেই ছোট ছোট ফুলদের বলতে লাগলাম—পূর্ব দিকে যাওয়া ছোট ছোট ফুল, তোমরা যখন পশ্চিমে যাবে, তখন কলকাতা দিয়ে অবশ্যই যাবে, সেখানে ভারতের সত্যিকারের স্বাধীনতার জন্যে তোমার পাঁচ মা তাঁদের নিজেদের জীবন দিয়েছে। কলকাতা থেকে রেঙ্গুন হয়ে যেও, সেখানে বার্মার ধানচাষী চেহিয়াররা চার্চিলদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। রেঙ্গুনের আগে গেলে তুমি মালয়ের খাড়ি পাবে। তার তীরে মালয়ের গেরিলারা

তোমাকে সেলাম করবে। এরা এইজন্যে লড়ছে না যে তারা ইংরেজদের ঘৃণা করে, বরং এইজন্যে লড়ছে যে তারা মালয়েব টিনের খনিগুলি এবং ববার ও চায়ের বাগানের সম্পত্তি মালয়বাসীর জন্যে সুরক্ষিত রাখতে চায় এবং দেশের উন্নতির জন্য ব্যবহার করতে চান। এইজন্যে মালয়ের গেরিলাদেব অবশ্যই সেলাম জানাবে। আবার তুমি চলতে চলতে সে গাঁও পৌঁছে যাবে, যেখানে ইন্দোচীন ও হো-চি-মিনদেব দেশভক্ত মানুষরা সাম্রাজ্যবাদের কামনার গোলাব সামনে বুক খুলে রেখেছে! আর সেই কামানগুলি বুকের হিল্লোল দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। প্রিয় ফুলগুলি, সেই বাহাদুর সৈনিকদের বাণীও তোমরা শুনে নিও। তারপর সাংহাইয়ের দিকে চলে যেও।

রাস্তায় চিযাং তোমাকে ডোবাবার চেষ্টা করবে। কারণ বাহাদুর ফুলদের চিয়াং অত্যন্ত ঘৃণা করে, কিন্তু চিয়াঙের উদ্দেশ্য কখনও সফল হবে না, কেননা বাঁশের কঞ্চিতে গাঁথা ফুল, লাল ফুল কখনও ডোবে না। এই জন্য ভালভাবে এবং তাড়াতাড়িই তুমি সাংহাই পৌঁছে যাবে। সারা সাংহাই শহর ব্যান্ড বাজাবে ; সব চীনারা এবং তাঁদের সর্দার মাও সে তুঙ তোমাদেব সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। তাঁর সেলামও তোমরা স্বীকার কোরো, কারণ তাঁরাও শান্তি চান।

সাংহাই থেকে তুমি ব্লাডিভোস্টক চলে যেও। রাশিয়া মজদুর এবং কৃষকদের দেশ। সেখানে একজন বড় মানুষ থাকেন, যিনি ফুল এবং ছেলেদের ভালবাসেন। এখানে রুশী বাহিনী তোমাদের বক্ষা করবে ; আর লোকেরা তোমাদের উড়োজাহাজে ঘোরাবে, কখনো দুখানি নৌকায় ঘোরাবে, কখনো রেনডিয়ারের বরফের গাড়িতে বসিয়ে উত্তর গোলার্ধ পর্যন্ত নিয়ে যাবে। সেখান থেকে আরও এগিয়ে যেও যদিও বরফ ছাড়া আর কিছু নেই, কিন্তু বরফেরও শান্তির প্রয়োজন। যখন তুমি আইসল্যান্ড যাবে, তখন আমেরিকায় যুদ্ধবাজদের দেখবে, যারা চিয়াং-এর প্রভু। এরা আবার তোমাকে লুকোনোর চেষ্টা করবে এবং তোমার পেছনে পেছনে লণ্ডন পর্যন্ত যাবে। সেখানে বন্দরের মজদুররা তাঁদের হাতের শক্তিতে তোমাদের বাঁচাবে। তুমি তাঁদের সেলাম স্বীকার কোরো, কেননা মজদুররা শান্তির সবচেয়ে বড়ো শক্তি।

আবার যখন তুমি জিব্রাল্টার পৌঁছিবে তখন স্পেন ও আফ্রিকার দুই তীর থেকে তোমার উপর গুলি চলবে। ঘাবড়ে যেও না, স্পেনে তোমাকে ভালবাসার লোক অনেক আছে। আফ্রিকার তীরে তোমাকে স্বাগত জানাবার জন্যে লাখে লাখে শান্তি দূত দাঁড়িয়ে থাকবে, কেউ মারাকাসের হাবসি, কেউ পল রোবসনের প্রিয় ভাই। তোমাদের সমুদ্রের তরঙ্গ থেকে তুলে নিজের গলায় পরে নেবে ; তুমি তোমার উদ্দেশ্যে পৌঁছে যাবে।

আর আমি দ্বিতীয়টিকে দেখে বললাম, এবার পশ্চিমের দিকে যাওয়া ফুলেরা তোমরা এডেনের বাহাদুর খালাসিদের সেলাম নাও। সুয়েজ-এর আলেকজান্দ্রিয়ার দেশভক্তদের আর্শীবাদ তোমাদের সঙ্গে রয়েছে ; আর সাইপ্রাসের লড়াকুদের নিশ্বাস তোমাদের ইচ্ছাশক্তিকে বাড়াবে, কারণ এরা অত্যন্ত বাহাদুর, আজ পর্যন্ত নিজেদের দ্বীপে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। সাইপ্রাস হয়ে তুমি কনস্টানটাইন চলে যেও, আর তুর্কী শাসনকে চীৎকার করে বোলো—নাজিম হিকমতকে মুক্তি দাও, কারণ নাজিম হিকমত ও শান্তি একই কবিতার দুটি পংক্তি। সেই গ্রীসের ফাঁসির

দড়িতে ঝুলছে, যে অ্যারিস্টটল ও সক্রেটিসের জন্ম দিয়েছিলো। সম্ভবত দ্বীপের কোথাও তোমাকে পা রাখতে দেবে না। কেননা সাম্রাজ্যবাদী তিনটি দেশ একত্রিত হয়েছে, কিনারে তোমাকে টিকতে দেবেনা, কেননা পোপ লাল ফুলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। যখন তুমি সিসিলি থেকে মালান পৌঁছাবে লক্ষ লক্ষ ইটালীয় জাহাজী মজদুর একসঙ্গে তোমাকে স্বাগত জানাবে। কোন বাহাদুর সৈনিক ডুবোজাহাজ এবং বড়ো বড়ো মার্কিন জঙ্গী জাহাজের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে নিজের হৃদয়ে জড়িয়ে নেবে এবং তোমাকে খুশী হয়ে নিজের ঘরে নিয়ে যাবে, রেখে দেবে সেইখানে, যেখানে রাখা আছে ইউনিয়নের কার্ড।

আবার একদিন ইটালীর জাহাজ আর মারাকাসের হাবসীরা দুজনেই রোমে দেখা করবে, রোম—যা পোপ ডায়াসের শহর নয়, রোম—যা পোপ এগিটসের শহর, রোম নীরোর শহর নয় বরং কাচের শহর, রোম—যা মৌলবাদী ক্রীশ্চানদের শহর নয়, বরং এই শহর আদিমকালের ক্রীশ্চানদের, যাঁরা মানবতার মর্যাদা ও উন্নতির জন্যে শহীদ হয়েছিলেন : এই রোমের শান্তি পরিষদে এক সময় একজন ইটালীর নাবিক, এক মারাকাসী হাবসী লাল ফুল বুকে লাগিয়ে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হবেন এবং রোমের শান্তি পরিষদে ভায়লারের সন্তানদের বাণী পৌঁছে দেবেন।

আমরা শান্তি চাই!

আমরা শান্তি চাই!!

আমরা শান্তি চাই!!!

এই বাণী সারা পৃথিবীর মায়েরা শুনবে, কারণ যদিও দুনিয়ার সব ছেলেদের মায়েরা আলাদা, কিন্তু তাদের সবার মমতা একই রকম। এই বাণী বৃক্ষরাও শুনবে, কারণ যদিও সব দেশের পতাকা আলাদা আলাদা, কিন্তু তাদের সবার মাটি এক। এই বাণী সব সমুদ্রের মাঝিরা শুনবেন, যদিও সব সমুদ্রের নাম আলাদা, কিন্তু তাদের সবারই জল এক।

সব মায়েরা, সব বৃক্ষেরা, সব মাঝিরা গর্জন করে বলবেন—

আমরা শান্তি চাই!

আমরা শান্তি চাই!!

আমরা শান্তি চাই!!!

আমি হেসে ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। সেগুলি তরঙ্গে এমন চকচক করছিলো যেন নীল সমুদ্র রাজমুকুট পরে হাসছে। ফিলিপস আমাকে বলল, 'কমরেড, বাচ্ছারা তোমাকে সেলাম করছে, আমি হাত তুলে ভায়লারের সমুদ্রতটে ছেলেদের সেলাম করলাম। নৌকো জোরে ছুটতে লাগল, নারকেল ছোবড়া কোটার আওয়াজের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে ; ভায়লারের শহীদদের মায়ের হালকা মিষ্টি এবং কাতর দরদভরা গান চারদিকে ছড়িয়ে গেল—

'আমরা আবার আসবো......আমরা আবার আসবো আর মানুষের নতুন আত্মা হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাব।'

কৃষণ চন্দর

যখন ক্ষেত জাগে

রঘু রাও-এব বয়স বাইশ বছর। জেলে আজ ওর শেষ রাত। কাল ভোরেই ফাঁসি।

ফাঁসি সেলে শুয়ে শুয়ে রঘু রাও তার অতীত জীবনের দিকে তাকালো। স্বল্প পরিসর জীবনের প্রতিটি লহমা সে গুণতে লাগলো। কৃষক যেমন তাব নিজেব টাকাটি পকেটে রাখার আগে বেশ ভাল করে উল্টে-পাল্টে দেখে নেয়, ঠিক তেমনিভাবেই, সেই রকম যত্ন, সেই রকম সতর্কতা ও তেমনি সংশয়মনা হয়ে রঘু রাও নিজের জীবনের প্রতিটি পল ভালো করে দেখছে। কেননা তার সমগ্র জীবনের ছাঁচটি তার নিজের হাতেই গড়া। জন্ম, মা বাবার কোল, বাবার কাঁধ, এই ধরনের কিছু কিছু লহমা নিশ্চয়ই তার বাপ মায়ের, আর কিছুটা তার সমাজ ও বংশের টাকশালেব ছাপ নিয়ে এসেছে। কিন্তু জীবনের বহু মুহূর্ত—যে মুহূর্তগুলি সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে কার্যকরী আব সবচেয়ে দামী ও সুন্দব, সবটাই তার নিজের। আর এই মুহূর্তগুলি গড়ে তুলতে ওব নিজের ইচ্ছে ও মেহনতের ভূমিকাটিই ছিল প্রধান, অর্থাৎ সে যা হয়েছে, যা কিছু ভাবনা-চিন্তা, যা কিছু কাজকর্ম সে করেছে, যতটুকু তাব নিজেব বুদ্ধি বিবেচনা হযেছে তার সবটার উপরই তার ব্যক্তিত্বের গভীর ছাপ রয়েছে লেগে। এর ভিতব কোন দেবতার অনুগ্রহের লেশমাত্র নেই।

প্রত্যেক লোকেব জীবনের ছাঁচে কিছুটা থাকে ভালো আর কিছুটা মন্দ। সেগুলিব বাছবিচার দরকার ; নিজের না হলেও পরের জন্যেও বটে। বঘু রাও-এব জীবন তো ফুবিয়ে এসেছে, কিন্তু তবুও শেষ বারের মত বিচার কবতে গিয়ে গভীব চিন্তা-সমুদ্রে মগ্ন হয়ে যেতেই ফেলে আসা জীবনের দিকটা ঘুরে এলো। ওর প্রশস্ত ললাটে চিন্তার গাঢ় ছাপ ফুটে উঠলো।

রঘু রাও-এর পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী, হাত জেলের দেয়ালে ঠোকা পেরেকের সঙ্গে বাঁধা। কিন্তু তবুও ওর বুদ্ধি ও মন এই সব দুঃখকষ্ট উপেক্ষা করে সাগ্রহে ও সযত্নে জীবনের বিগত দিনগুলির ভাল মন্দ পরখ করতে লেগে গেল।

অন্য কেউ হলে জীবনের শেষ মুহূর্তগুলি নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। কিন্তু যাবা সময়টাকে দুনিয়ার রাস্তা বলে জানে এবং তার ফলে সময়ের অধীন হয়ে পড়ে, রঘু রাও সে ধরণের লোক নয়। দীর্ঘ চেষ্টায় রঘুর এ উপলব্ধি এসেছিল যে, সময়টা মানুষের কাছে একটা সাদা-মাটা মেয়েমানুযের মত—যাকে নিজের মর্জিমত গড়ে পিটে নেওয়া যায়, যার সাথে নিজের পরিশ্রম যুক্ত করে মানুষ দুনিয়াটাকে বদলে দিতে পারে। নিজের স্বল্প পরিসর জীবনে রঘু রাও তাই-ই করে এসেছে। তাতে সে কতটুকু সফল আর কতটুকুই বা বিফল হলো আজ জীবনের এই শেষ মুহূর্তগুলিতে সে তাই যাচাই করে দেখতে চায়। এরই জন্য তার জীবনের সমগ্র নক্সাটাকে সামনে বিছিয়ে নিয়ে সে দেখতে লাগলো।

এই ওর মা। তিন বছরের শিশু রঘুকে রেখে তিনি মারা যান। মায়ের কথা ওর অত্যন্ত আবছা আবছা মনে পড়ে। ওই ডাগর কালো কালো চোখ, স্তন ভরা কাঁচা দুধ, যেন ঠোঁট পর্যন্ত ঝরে পড়ছে। একটি নরম ও গরম কোল। আর মায়ের বুকে হাত রেখে শুয়ে পড়া। ব্যস এইটুকুই ওর মনে পড়ে। আদরের চুমু খেয়ে এই স্মৃতি ও একপাশে সরিয়ে রাখল।

এই ওব বাবা ভেরাইয়া, ভেরাইয়া ছিল ওর মা ও বাবা দুই। ছিল ওর বন্ধু। লড়াইতে ছিল ওর সাথী, আবার গুরুও—বিভিন্ন পর্যায়েব সমন্বয়। রঘু রাও-এর জীবনে এরা প্রত্যেকে যদি আলাদা আলাদা লোক হত তবে ভালোই হত, জীবনটা মধুর, গভীর আর সুন্দর হয়ে উঠত। কিন্তু সমাজ স্বজনেরও কিছু ছাপ জীবনের উপর থাকে, যার ফলে সম্বলহীন জীবন মাটিতে গুঁড়িয়ে যায় না। মানুষকে এই সমাজ ও স্বজনের সাহায্যেই নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হয়। মূল কথাটা এই যে, ভেরাইয়া ছিল একজন ক্ষেতমজুর। নিঃস্ব, বেগার খাটিয়ে। এমনই গরীব যে, দ্বিতীয়বার বিয়ে করার মত সামর্থ্যও তাব ছিল না। ছেলেকে স্কুলে পাঠাবার ক্ষমতাও নেই।

রাও বাবার এই ছবিটি উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল। ভেরাইয়াব শরীর বেঁটে, মাথা নেড়া। চোখ দুটো ছোট ছোট। নগ্ন পা দুটো কালো আর মজবুত। পায়ে জুতোব প্রয়োজন ছিল না। বড় হয়ে রাও-এর পা দুইখানিও এই রকম হয়ে গেছে। বাও নিজেব পা দুখানি দেখতে চাইছিলো, কিন্তু তার উপায় নেই, ডাণ্ডা বেড়ীতে বাঁধা। সে একটু স্মিত হাসলো।

ভেরাইয়া রাওয়ের জানটা খুব শক্ত কবে গড়ে দিয়েছে। কাবণ সে ওকে ঠিক মায়ের মতন পালন করতে পারেনি। অবশ্য একটা ক্ষেতমজুরের মা তাব ছেলেকে ঠিক মাযেব মতন পালন কবতেও পারে না। ভেরাইয়াব তো কথাই নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তার কাটে কঠোর পরিশ্রম করে। কেননা রামলু, রঙডু, শোমাপ্পার মত তারও কোন জমি নেই। ওদের গাঁ শ্রীপুরমে আরো অনেকেরই জমি নেই। জমি রয়েছে জমিদারের, এরা সব জমিদারের সেই জমিতে মজুর খাটে। এরা জমিদাবের বেগার, গোয়ালা আর ঘোড়া, দরকার মত মোরগও, প্রয়োজনে নিজেদের বউ-বেটির দালালও বটে। একটা লোককে যখন তার নিজের জীবনের জন্য এত কিছু করতে হয়, তখন সে যদি তার ছেলের জানটা খুব শক্ত করে গড়ে না তোলে তখন বুঝতে হবে, সে তার ছেলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করেছে।

ভেরাইয়া আর সবকিছু ছিল—কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতক পিতা নয়। এ জন্যই রাও ছেলেবেলা থেকেই বুভুক্ষু ও খালি পায়ে ঘুরে ফিবে জীবনেব নীরস ফুল থেকে কোন না কোন প্রকারে অল্প স্বল্প রস নিঙড়ে নিতে শিখেছে। এর বেশী আশা তার নেই। ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু ওদের সমাজের চেহারা এমনই যে ওর আশা আকাঙ্খা এর চেয়ে বেশী অগ্রসর হয়নি। সম্পূর্ণটা ঠিক মনে নেই। তবে এটা ওর ভাসাভাসা মনে পড়ে, ও যখন খুব ছোট আর জানুয়ারী মাসের সকালে ও বিছানায় শুয়ে কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে নিতে চাইত, তখন ওর বাবা ওকে পিঠে বেঁধে নিয়ে জমিদারের ক্ষেতে কাজ করতে চলে যেত। ঘন্টার পর ঘন্টা ও কাঁদত। ওর বাবার সর্বাঙ্গ ঘামে ভেজা, কান্নারত ছেলেটাকে পিঠে ফেলে সে জমিদারের তুলো ক্ষেতে ফুল তুলছে, ফলে ও কেঁদে কেঁদে চুপ করে যেতে শিখল। দুধের বদলে তেঁতুল পাতার চাটনি খেতে শিখল। নিজের হাতে রুটি তৈরী করতে শিখল। ও নিজে ক্ষেতে কাজ করতে না শেখা পর্যন্ত দীর্ঘকাল বাবার জন্য রুটি তৈরী করে ক্ষেতে নিয়ে যেতে লাগলো। এটা বিশেষ কঠিন কাজ নয় ; প্রথমে ও বাজারগুলো চাউলের মত জল দিয়ে ফুটিয়ে নিত। তারপর পিষে পাতার চাটনি করে নিত। শেষে দুটো কলার পাতায় বেঁধে ওর বাবার কাছে ক্ষেতে নিয়ে যেত।

কখনো কখনো জমিদার বাড়ী থেকেও লপসী এসে যেত। লপসী আর চাটনি দিয়ে ভাত খেয়ে ক্লান্ত বাহুতে শক্তি এসে যেত। ভেরাইয়া ফসল কাটতে লাগত আর রাও কাটা ফসল এক জায়গায় জড়ো করত। শেষে এমন দিনও এসে গেল যখন রাও নিজে বীজবোনা ও ফসল কাটা এবং দুটি কাজেই আগাগোড়া লেগে থাকতে শিখল। এখন ও পুরো ক্ষেতমজুর হয়ে গেছে। পুরো শিক্ষাও হয়ে গেছে। ভারবাহী গাধা যেমন অত্যন্ত প্রীতির সাথে নিজের ভারবাহী ছেলের দিকে চায়—ঠিক তেমনি গোলাম বাবা তার গোলাম ছেলেকে সগর্বে দেখলো। পিতৃস্নেহ এই যে ছেলেটার বোঝাটা একটু কম করে দেয়, ছেলের ভালবাসা হোল এই যে, বাবার বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলে নেয়। আর জমিদারের ধারা এই যে, সে দুজনের উপরই বোঝাটা আস্তে আস্তে বাড়িয়ে যায়।

রাও এই নক্সাটিকে আবার উল্টেপাল্টে দেখলো। আকৃতি, রং ও গরিবী। ওর বাবা আর ওর মধ্যে কত বিষয়েই মিল। আকৃতি ও রংটা তো সে বদলাতে পারে না। সেটা করার কোন ইচ্ছেও ছিল না। কিন্তু দারিদ্রকে সে নিশ্চয়ই বদলাতে চেয়েছে, এই ইচ্ছেটা তার কেবল যৌবনেই জাগেনি। তার বহু আগে শৈশব থেকেই তার এই ইচ্ছে জেগেছে। কোন কোন ছেলেকে স্কুলে যেতে দেখে বই, স্কুল, ভাল ভাল কাপড় নিজে পেতে, ছুঁয়ে দেখতে একটা দারুণ উৎসাহ ওর মনের মধ্যে জেগেছিল। কিন্তু ভেরাইয়া খুব শিগগিরই বুঝিয়ে দিল যে, সেটা হওয়া অসম্ভব। গোলামের ছেলে গোলাম হয়, জমিদারের ছেলে জমিদার হয়, নম্বরদারের ছেলে নম্বরদার হয়, আর পুরুতের ছেলে পুরুত হয়। ওই রকমই কোন কোন ছেলে স্কুলে যায়, আবার কেউ কেউ ক্ষেতে ফসল কাটে ; তাতে কোন দোষ নেই। হাজার হাজার বছর থেকে এই রকমই চলে এসেছে, আর হাজার হাজার বছর এই রকমই চলবে। রাও চুপ করে যেতেই বাবা বুঝলো যে, ছেলে ওর মতই হার মেনে গেছে। কিন্তু ঘটনাটা কি এই রকমই হোল?

এইবার রাও নিজের জীবনের আরেকটা মুহূর্ত উঠিয়ে নিল। ওর বয়স তখন এগার বছর। ওদের গাঁ শ্রীপুরমে তখন বড় একটা মেলা লেগেছে। আর এই রকম মেলা প্রত্যেক দশ বছর বাদে হয়। তালপাতায় ছাওয়া সারা শ্রীপুরমে খুশির লহর ছুটে যায়। ভেরাইয়া এই প্রথমবার তার ছেলেকে আগাগোড়া নতুন কাপড় দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে—খদ্দরের ধুতি, কোর্তা, মাথায় খদ্দরের পাগড়ী আর গলায় একটা কালো যন্তরমন্তরের কবচ। কবচটা একটা সাধু ওকে দিয়েছিল। সেদিন রাও ভগবতী নদীতে স্নান করে আর চকচকে কাপড় পরে ভারী খুশী হয়েছে। তাড়াতাড়ি ভাত আর পুড়া খেয়ে সে বাবার সাথে গাঁয়ের প্রান্তে একটা খোলা জায়গায় গেল। সেখানে মেলা বসেছে। রাস্তায় গাছের নীচে ছেলেরা কপাটি খেলছে। একটা বড় বুড়ো গাছের নীচে বালিকারা খেলা করছে। সামনের চণ্ডীমণ্ডপ থেকে শক্ত উঁচু পাথরের রাস্তা শুরু হয়েছে। সেইখানটায় মেলা বসেছে। মেলায় হরেক রকমের বাসন চুড়ি চিরুণী আর কলস এসেছে। তামাক আর গুড়ও উঠেছে। ছোট ছোট ছেলেপুলের জন্য মাটির খেলনা, তালপাতার বস্তা রয়েছে। একধারে জাপানী রেশমের কাপড়ের দোকান। সেখানে রাও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। আহা! কাপড় এত সুন্দর হতে পারে, এত মনোহর আর নরম। ওর মনে আছে ও এগিয়ে গিয়ে রেশমের একটা থান নিজের হাত

দিয়ে ছুঁয়ে দিয়েছিল। কেননা, এটা কি সত্যি যে একখান কাপড় মানুষের স্বপ্নের মত এত নরম, এত চমৎকার ও এত রূপসী হতে পারে? তাই ও নিমেষের জন্য কাপড়ের থানটা ছুঁয়ে দেখে নিল। ঘটনাটি এত বছর পরে আজও এই ফাঁসি সেলে একটা রূপোর টাকার মত আওয়াজ দিয়ে উঠছে। বহুক্ষণ ধরে রাও এই সময়টার কথা ভাবতে আর মনের মধ্যে তার গুঞ্জন শুনতে লাগল। তার হাত এই নক্সাটীর উপর ঘুরতে ফিরতে লাগল।

ওব আরো মনে পড়ে গেল যে, দোকানের মালিক রামাইয়া শেঠি ওকে ধমকে দিয়েছিল ঃ গোলাম হয়ে রেশমে হাত দিয়েছিস, বদমাশ কোথাকার? মেরে একেবারে ভূত ভাগিযে দেবো। এই সময়ে ওর বাবা তাড়াতাড়ি রেশমের থান থেকে ওর হাতখানা সবিয়ে দিযে ওকে নিয়ে আগে আগে চললো। রাওয়ের মনে হয়েছিল জীবনের নগ্নতা শুধু ওর জন্যই। জীবনেব মসৃণতা আব কোমলতা ওব জন্য নয।

রাওযের মন হঠাৎ বড় উদাস হয়ে গেল। ওর বাবা বোঝালেও ভুলতে পাবলো না। ওর বাবা ওকে দোলায় চড়ালো আব সরবৎ খাওয়ালো। মন কিছুটা শান্ত হোল। কিন্তু তবুও কিছুক্ষণ ওর রঙীন রেশমী কাপড়েব জন্য ওর মনটা খচ্ খচ্ করতে থাকলো।

সন্ধ্যেব সময বাপ-বেটা মেলা থেকে বাইরে বেরিযে এসেছে। জমিদারের কর্মচারী ভিমাইযা ও দরগাইয়াব সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে গেল। দু'জনেরই চোখ মদ খাওয়ায় লাল হয়ে উঠেছে। দু'জনেরই হাতে পিস্তল। ওদের বাপবেটা দুজনকে দেখেই ঘিরে ফেললো।

ভেরাইযা জিজ্ঞেস করল ঃ "ভাল তো?"

দরগাইয়া বলল ঃ "সোজাসুজি যদি চলে আসো তবেই সব ভালো।"

"কোথায় যেতে হবে?" ভেরাইয়া জিজ্ঞেস করলো।

"সূর্যপেট, বেগাব দিতে। এখনই. এই সময়েই যেতে হবে। জমিদার ডেকেছেন।"

"কিন্তু আজ তো মেলা"—চমকে উঠে রঘু বলল।

ভিমাইযা ওর বুকের কাছে জামাটা ধরে দুই গালে দুই থাপ্পড় দিয়ে মাথার পাগড়ীটা ধূলোয় ফেলে দিল। রাও মারামারি করার চেষ্টা করলো, কিন্তু ভিমাইয়া তাগড়া জোয়ান আর ও ছেলে মানুষ। এরপর যখন দরগাইয়া ওর বুকের উপর পিস্তল ধরলো, তখন ভেরাইয়া দৌড়ে এসে দরগাইয়ার হাত ধরে হড়হড় করে বলল ঃ "মালিক, ও তো ছেলেমানুষ, ওকি জানে যে আমি বেগারী, সরকারের গোলাম। পুরো মেলার সময়েও যদি জমিদারবাবু ডাকেন তা হলেও যাব।"

"কেন যাবে?" রাও রাগ করে বললো।

"চুপ কর না—।" ভেরাইয়া নিজের ছেলেকে একটা ঘুষি মারল। রাওয়ের ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে লাগলো। ভেরাইয়া আজ পর্যন্ত ওর ছেলেকে কোন দিন মারেনি। সবিস্ময়ে রাও ওর বাবার দিকে তাকিয়ে রইলো। চোখের জল মোছার চেষ্টা পর্যন্ত করলো না। চোখের জলটা যখন গড়িয়ে নিচে নেমে এলো, তখনি বিস্ময়ে বাবার দিকে তাকিয়ে নিজের হাতখানা দিয়ে সেটা মুছে নিল। গড়ানো রক্তের খানিকটা থু করে

ফেলে দিল। কিন্তু কিছু বলল না। ভেরাইয়া নিজের ছেলেকে গালাগালি দিযে বললো ঃ "চলুন মালিক, আমি বেগারী, আমি মালিকের বেগাব খাটবো। আমার ছেলেও বেগাবী। সেও যাবে। ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের গোলামদের আবাব মেলা কিসের!"

"এখন সোজা হয়ে এসেছে। শালা নতুন কাপড পরে সামনে এসেছে।" দরগাইয়া রাওকে একটা ধাক্কা দিয়ে সামনে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগলো। ভেবাইয়া হাত জোড় করে বলল ঃ "বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে, মালিক। আমি তো ওকে বারণই কবেছিলাম। বদমাসটা কি তা শোনে ; বলতে লাগলো, আজ মেলা, নতুন কাপড় পরবো। জানিসনে মালিকের সামনে কেউ নতুন কাপড পবতে পারে না?"

"জানি।"

"তবে?"

"মালিক মাফ করে দিন, ভবিষ্যতে আব কখনো এরকম গাফিলতি হবে না।" ভিমাইযা বললো ঃ "এইজন্যেই তো আমি ওর কাপড় ছিঁড়ে দিযেছি। ভবিষ্যতে ও কখনো আর এরকম গাফিলতি করবে না।"

"গোলাম, গোলামের মতই থাকবি।"

"ঠিকই বলেছেন হুজুর।"

ভিমাইয়া ও দবগাইযা মেলা ও গাঁ থেকে আরো পঞ্চাশ যাট জন গোলামকে একত্র করে তাদের ভেড়ার পালের মত খেদিয়ে জমিদাবেব দেউড়ীর দিকে নিয়ে গেলো।

জমিদারের গড়টা বেশ উঁচু। গড়ের ফটকটিও বেশ উঁচু আর চওড়া। এই গড়ের ভেতরেই জমিদারের ঘর। কোন বেগারী আজও দেখেনি, রাও-এর এই প্রথমবার গড়ে আসার সুযোগ মিলেছে। গড়টি সে দূব থেকে দেখেছে, এক দুই দফায় হিম্মত করে গড়ের কাছাকাছি এসে ঘুরেও গেছে। শান্ত্রীরা পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু গড়ের ভিতর পা ফেলার সাহস ওব কখনো হয়নি। শিশুমনে যে অনুসন্ধিৎসার প্রবণতা দেখা যায় রাও-এর সেটা ছিল। তাই আজ মাব খাওয়া, কাপড় ছেঁড়া এবং জমিদাব আর তাঁর চমৎকার গড় সত্ত্বেও সে বড খুশী মনে গডের এধার ওধার ঘুরে দেখতে লাগলো। ওর বাবা ওর ঘাড়টি ধরে জোরে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে বললো ঃ "ওপরের দিকে তাকাসনে, পায়ের দিকে তাকা নতুবা মালিক চটে যাবেন।"

এই সময় রাও একপলক দেখে নিল যে, মাথা নীচু করে, চোখগুলি পায়ের দিকে রেখে গোলামরা সারি সাবি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

রাও-এর কানে একটা কর্কশ আওয়াজ এলো ঃ "দরগাইয়া"

"জি মালিক।" দরগাইয়া বললো।

বাও কিন্তু ভয়ে ওপরের দিকে তাকাতে পারলো না।

"কতগুলো বেগারী এনেছিস?"

"দুই কম ষাটটা এনেছি হুজুর।"

"বেশ, কাজ চলে যাবে। কিন্তু খাওয়ার বন্দোবস্তটাও করে নিস। ওদের বহুত দূর যেতে হবে।"

"এরা সব খানা নিজেরাই সাথে করে এনেছে হুজুর।" ভিমাইয়া বলল। আর ভেরাইয়া নিজের মনে মনে বললো ঃ "এটা তো বিলকুল মিথ্যে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তবে চল, তৈরী হয়ে নে।" আবার সেই কর্কশ ভীষণ আওয়াজ শোনা গেল।

॥ দুই ॥

ভিমাইয়া ও দরগাইয়া বেগারীদের আবার উল্টোমুখো গড়ের বাইরে নিয়ে এসে ওদের উপর জিনিষপত্র চাপাতে শুরু করে দিল। অনেক জিনিষপত্র। কেননা, সূর্যাপেটে জমিদারের ছেলের বিয়ে। তাই জিনিষপত্র অনেক আর চারটি পাল্কী। একটি হোল জমিদার জগন্নাথ রেড্ডীর জন্য। জগন্নাথ রেড্ডী শ্রীপুরম, পাতিগড্ডু আর আশপাশের চল্লিশটি গাঁয়ের একচ্ছত্র মালিক। দ্বিতীয় পাল্কীটি হচ্ছে জগন্নাথ রেড্ডীর ছেলে প্রতাপ রেড্ডীর। সূর্যাপেটে যার বিয়ে। তৃতীয় পাল্কীটি হচ্ছে প্রতাপ রেড্ডীর মায়ের— এই উপলক্ষে তাঁর সূর্যাপেট যাওয়া একান্ত দরকার। প্রথম দুটি পাল্কী খোলা কিন্তু তৃতীয়টি বন্ধ। চতুর্থ পাল্কীটি বন্ধ কিন্তু এই পাল্কীটি নতুন, রঙিন আর ভারী চমৎকার। দুপাশে লাল রেশমের পর্দা ঝোলান। অল্প একটু হাওয়াতে সেগুলি দুলে উঠছে। বন্ধ করা কাঁচের শার্শিগুলি ঝনঝনিয়ে উঠছে—যেমন লাওট খেলতে গিয়ে অনেক মেয়েরাই একদম হেসে ফেলে। রাও অত্যন্ত খুশী আর আশ্চর্য হয়ে বন্ধ করা পাল্কীটির দিকে দেখছিল আর বাবার কাছে জিজ্ঞেস করছিল। কিন্তু নিজের বাবার কাছ থেকে প্রশ্নের জবাবে একটা ঘুসির বেশী আর কিছু মিললো না।

দেড়ঘন্টা-দুঘন্টা সোরগোল করার পর জমিদারবাবু সদলবলে গড থেকে রওনা হলেন। এক একটি পাল্কীতে আটজন করে বেগারী। প্রথম পাল্কীটি মালিকের। দ্বিতীয়টি ছেলের। তৃতীয়টি মালিকের স্ত্রীর আর চতুর্থটি খালি। রাও বুঝতে পারল না কেন। ভেরাইযার ডিউটি পড়েছে মালিকের পাল্কী উঠানোর আর রাও-এর ভাগে একখানি খুব বড় আয়না নিয়ে যাওয়া। এ আয়নাখানায় ও নিজের চেহারাটা বার বার দেখে খুশী হচ্ছিল। কিন্তু তবুও আয়নাখানা উঠিয়ে নিয়ে ও চতুর্থ পাল্কীটির পাশে পাশে চলতে শুরু করে দিল। পাল্কীবাহকের মধ্যে বাবার বন্ধু রঙড্ডু-ও ছিল। রাও ওর কাছাকাছি চলতে লাগল। যখন দেখল যে তৃতীয় ও চতুর্থ পাল্কীটির মাঝের দূরত্বটা কিছু বেড়ে গেছে তখন ও এধার ওধার দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল ঃ

"কাকা এ খালি পাল্কীটি কার?"

"আমি কি জানি।" রেগে গিয়ে রঙড্ডু জবাব দিল।

"বল না কাকা" রাও একটু সলজ্জভাবে বললো।

জমিদারের গোমস্তারা ওকে ধরে নিয়ে এসেছে বলে রঙড্ডুর মেজাজটা আজ বড়ই চটা ছিল। বছরের সব দিনগুলিই মালিকের, কিন্তু মেলার দিনটি থাকে শুধু গোলামদের। তাই আজ রঙড্ডু কোন কথারই ঠিক জবাব দিতে চায় না। ছেলেটার খুশী আর আগ্রহ দেখে ওর মনটাও কিছু নরম হয়ে গিয়েছে।

রঙড্ডু এদিক ওদিক দেখে বলল ঃ "এটাতে জমিদারের মার (গালাগালি দিয়ে) ও আসবে।"

"কে?" রাও কিছুই বুঝতে পারলো না।

"ওর (গালাগালি দিয়ে) ব্যাটার (গালাগালি দিয়ে) মার (গালাগালি দিয়ে) ও আসবে।"

রাও এবারও কিছু বুঝতে পারলো না। অবাক হয়ে রঙডুর দিকে তাকিয়ে রইল।

রঙডু মাটিতে থুতু ফেলে বলল ঃ "আজ থেকে এক বছর পরে যখন মালিকের ছেলের বিয়ে হবে, সূর্যপেট থেকে এই পাল্কীতে করে কনে শ্রীপুরমে আনতে হবে।"

জমিদারের একজন গোমস্তা এসে রঙডুকে একটা গুঁতো মেরে বলল ঃ শুধু কথাই বলবি, না আগে যাবি? দেখছিস, তৃতীয় পাল্কীটা কত আগে চলে গেছে? রঙডু ও আর একজন গোলাম পাল্কীটাকে তুলে নিয়ে খচ্চরের মত টগবগ করে জোর কদমে চলল। রাও-ও আয়নাখানা তুলে নিয়ে ছুটলো।

শ্রীপুরম থেকে সূর্যপেট যাওয়াটা কষ্টকর। কিন্তু এবারকার যাত্রার দুটো কথা ও কখনো ভুলবে না। একটি এই যে, গাঁ থেকে দূরে গিয়ে একটি পাহাড়ী রাস্তা চড়ে একটি চটির মোড় ঘুরে যখন ও আপনার গাঁয়ের দিকে তাকিয়ে দেখল ওর আয়নায় গাঁ ঝকমক করে উঠলো। প্রসারিত তুলোর ক্ষেত। তুলো—যাকে অন্ধ্রের বরফ বলা হয়। তালপাতার ছাওয়া ঘর। ঘরগুলির মাঝে মাঝে কালো কালো পাথরের চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডীমণ্ডপের ওপারে পা আর চিন্তা গাছের সার—সন্ধ্যায় যাদের প্রসারমান ছায়ায় পাখীরা রাত্রিবাসের জন্য আসে। সমস্ত দুঃখকষ্ট ও লাঞ্ছনার ভাগী হয়েও রাও-এর কাছে নিজের ঘর, নিজের গাঁ, পুকুর বড়ই সুন্দর মনে হলো। আজ পর্যন্ত ও কখনো এতদূর থেকে নিজের ঘর ও গাঁ দেখেনি। তাই দূরত্ব জীবনে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, সেটি ওর মনের আয়নায় একটি আলোড়ন সৃষ্টি করে দিল। ঘরবাড়ী, গাঁ আর দেশের এই মোহিনী মূর্তির সুখস্মৃতি কখনোই মুছে যেতে পারে না। আজ এই ফাঁসী সেলে শুয়ে চোখ বুজেও সেই মোহিনী মূর্তি দেখতে পায়, স্পর্শ করতে পারে। এই সুন্দরী মূর্তিকে পরখ করা, ছোঁয়া, চোখে দেখা ও জ্বালিয়ে দেওয়ার ওর অধিকার আছে। কেননা ও জীবনভর এরই জন্য লড়ে এসেছে।

দ্বিতীয় যে কথাটি ওর মনে আছে, সেটি ওর গাঁয়ে নেই। সেই কথাটি সূর্যপেটের একটা বড় আস্তাবলে বসে ওর মনে হয়েছিল। গাঁয়ের পাটোয়ারী শ্রীরামাপণ্ডপু, পুরোহিত শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী, পুলিশ সর্দার শ্রীলক্ষীকান্ত রাও এবং আরো অন্যান্য গণ্যমান্য নিমন্ত্রিতদের ঘোড়াগুলো রাখা হয়েছিল একটা আস্তাবলে। গাঁয়ের বেগারীদের ঠাঁই দেয়া হোল সেই আস্তাবলে। কিন্তু যে কথাটি ওর মনে ছিল সেটা ঘোড়ার গন্ধ নয় বা আস্তাবলের গন্ধও নয়, খালি মেঝেটার ঠাণ্ডা ও কাঠিন্যের কথাটিও নয় ; সেটি হল বুররা কথা। পণ্ডিপাড়ুর কথকের কাছ থেকে রাতে ঘোড়ার আস্তাবলে বসে সেই বুররা কথা শুনেছিলো। এই কথকও জগন্নাথ রেড্ডীর প্রজা। বিয়ের পাকা দেখার শুভলগ্নে তাকেও ডেকে আনা হয়েছে। এরা ছিল তিনজন, একজন সাদা দাড়িওয়ালা, যে প্রদীপ দেখায়, প্রদীপের আলোয় লোকটার চেহারাখানা অন্ধ্রের লাল মাটির মত চক্‌চক্ করছে। অন্ধ্রের বুকে ক্ষতের মত ওর দেহের লাল চর্মের কুঞ্চন। তার একহাতে একটি একতারা। প্রকাণ্ড একটি পাগড়ি মাথায় দিয়ে

একজন যুবক ভাঁড় সেজেছে। তার চেহারাটায় যেন জীবনের দ্যুতি ঝলক দিচ্ছে, যেন ভরা মধুর চাকে মধু ঝলকাচ্ছে, যেন জীবন কখনো হার মানা জানে না। কথকের কথার মধ্যে হঠাৎ উল্টো-সোজা কথাবার্তা বলে লোককে হাসানোই এর কাজ। তৃতীয় কথকের হাতে একটা বুররা। যেটি মৃদঙ্গের মত বাজে।

রাত গভীর ও নিস্তব্ধ। ঘোড়াগুলো শুকনো বাজরা আর গোলামরা সিদ্ধ বাজরা দিয়ে আপন আপন উদরপূর্তি করে নিয়েছে। কথকরা এখন যেখানে ঘোড়াদের জল খাওয়ানো হয় সেই পুকুরের কিনারে প্রদীপ জ্বালিয়ে তার আলোয় কথকতা শুরু করে দিল।

কথক মৃদঙ্গ বাজিয়ে বলল ঃ আজ থেকে অনেকদিন আগে......

ভাঁড় ঠাট্টা করল ঃ যখন জগন্নাথ রেড্ডী জন্মাননি।

কথক বলল ঃ অনেক বছর আগে......

ভাঁড় বলল ঃ যখন বেগারীরা সাদা চাল খেত, আর সাদা রেশমের কাপড় পরত।

কথক বলল ঃ আজ থেকে কয়েকশ' বছর আগে ওয়ারঙ্গলে কাকতীয়া বংশের নন্দশাহী ও উরমাদেবীর রাজত্বকালে বেলিম পল্লীর গাঁয়ের পাশে একজন যোগী বাস করত .....

কথা শুরু হয়ে গেছে। মৃদঙ্গ, একতারা ও হাসিকারের চুটকি। রঘু সুন্দব অতীতের এক পুরনো মহান অন্ধ্রের মাটিতে গিয়ে পৌঁছলো। বেগারীরা আপনাদের সব সুখদুঃখ ভুলে গিয়ে গল্পে মজে গেল। গপ্তে ছিলেন একজন সুন্দর যোগী আর রূপবতী এক রাজকুমারী। রাজকুমারীর বাবা ছিলেন বিষ্ণু মতের পূজারী আর যোগী ছিলেন শিবের। যোগী সংসারে এসেছেন অত্যাচারের অবসান করার জন্য। তিনি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে চলেছেন—এমনি এক সময়ে রাস্তায় রাজকুমারীর সাথে দেখা হয়ে গেল......

বহুক্ষণ ধরে একতারার সুর থরথর করে আকাশে কাঁপতে থাকল। বেগারীদেব বিস্ফারিত চোখের তারায় রাজকুমারীর চেহারাটি দুলতে থাকল। পুকুবের জলে প্রদীপের শিখা ঝলমল করতে বইল। আকাশের তারাগুলো মিট মিট করে তাকাতে লাগল। রাও বুঝতেও পারল না সে কতক্ষণ পর্যন্ত জেগে ছিল, আর কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

সূর্যের প্রথম কিরণ ওর চোখের পাতায় পড়ায় ও জেগে উঠেই বুঝতে পারল যে, রাতের স্বপ্ন টুটে গেছে এবং আর একটা দিন এসে গেছে। ধড়মড় করে উঠে বসে রাও দেখল যে, তার বাবা তখনও শুয়ে রয়েছে। ঘোড়াগুলো চিঁ হিঁ করছে। আর বিছানো-ফরাসটির উপর বারবার গরম মেজাজে সুরের খটাখট আওয়াজ করছে।

এরপর বহুক্ষণ রাও-এর মনটি ফাঁকা রইল। কোথাও কোথাও জীবনের ঢিমা সুর, ছোট ছোট ঘৃণা বুদ্বুদের মত মনের মধ্যে ফুটে উঠেছে। ও কিন্তু সেদিকে মন দিল না। এই সব ঘৃণার মধ্যে জগন্নাথ রেড্ডী, প্রতাপ রেড্ডী, পুলিশ ও গাঁয়ের অন্যান্য মালিকদের ছবিও বারবার সামনে এসে পড়ছে। কিন্তু এসময়ে সে এদিকে বেশী নজর দিল না, কেননা ও জানতো যে ওর মনে যে অঙ্কুর মাথা তুলেছে তার উর্বর জমিতে ঘৃণার স্বাদ অনেকখানি থাকলেও নীচ ও সংকীর্ণ ঘৃণার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

তাই ও বহুমুহূর্ত ডিঙিয়ে চলে এলো। বহু নকশায় শুধুমাত্র হাত লাগিয়েই পাশে সরিয়ে রেখে দিয়ে শিশুকাল থেকে যৌবনে পৌঁছে গেল। আর এইখানে এসেই ওর বন্ধু নাগিশুরের কথা মনে পড়ে গেল। নাগিশুর ওর মতই দ্বিতীয় কোন ফাঁসি সেলে বন্দী রয়েছে।

নাগিশুর রঘু রাও-এর মত বেঁটে খাটো নয়। বরং ছ ফুটের ওপর সে লম্বা। তার শরীর ছিল যেমন লম্বা, তেমনি লম্বা ছিল তার লাঠি। আর তেমনি তার উচ্চ হাসি। নাগিশুর ভগবতী নদীর ওপারের জঙ্গলে গরু আর মোষ চরাতো, গান গাইতো আর যখন রাও-এর বেগারীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ইচ্ছে হত তখন নিজের ঘরে তাকে আশ্রয়ও দিত। নাগিশুর আর রাও-এর বন্ধুত্ব শুরু হয়েছিল ভালোবাসার মধ্য দিয়ে নয়, ঘৃণার মধ্য দিয়ে। নাগিশুর জমিদারকে ঘৃণা করতো এই কারণে যে, জমিদার বছরের মধ্যে দু চারবাব বিনা পয়সায় ওর কাছ থেকে ভেড়া ছাগল তলব কবে নিত। আর রাও-এর ঘৃণাটা ছিল সে তাদের গোলাম ছিল বলে। কিন্তু ভেরাইয়া ওকে বলেছিল যে ওরা কোন এক সময়ে জমিদারের গোলাম ছিল না। ওদের ছিল একসময় জমি, হাল আর বলদ। ওদেরও ছিল তুলোর ক্ষেত, সোনার ফসল। ওদেরও আঙিনায় ছিল হাসি খুশী শিশু ও কোকিলকণ্ঠি বউ। বড় রাগ ও তেজের সঙ্গে ভেরাইয়া আরো বলেছিল—"বেটা রঘু! ঐ যে সামনে জমিদারের মনোরম গড় দেখছিস, ঐ গড়ই আমার সব কিছু চুরি করে নিয়ে গেছে। আমাকে মানুষ থেকে পশুতে পরিণত করে দিয়েছে। বাবা আমার, ঐ উঁচু গড়ই আমার বংশের দুষমণ। বেটা রঘু, আমার বাবা আমাকে এই ঘৃণা সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন। আজ আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমি তোকে এই ঘৃণা সঁপে দিয়ে গেলাম। লোকে ছেলেকে ধনসম্পত্তি দিয়ে যায়, ঘরবাড়ি দিয়ে যায়, বউ এনে দেয়, জায়গা জমিন দেয় কিন্তু আমার কাছে তো কোন জমি নেই। রয়েছে শুধু এই ঘৃণা। এই ঘৃণাই আমি তোকে দিয়ে গেলাম। বোঝা বইতে বইতে আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আর আমার কোন শক্তি নেই। শক্তির রাস্তাটাও নেই। আছে শুধু এই ঘৃণা, সেটি আমি তোর জিম্মায় রেখে গেলাম। যদি কোন রাস্তা খুঁজে নিতে সক্ষম হোস তবে তাই খুঁজে নিস।"

সেই দিন থেকে রাও এই পবিত্র ঘৃণাকে একটি মহৎ উত্তরাধিকারের মত নিজের মনের মধ্যে রেখে দিয়েছে, নিজের জীবনের শিক্ষা এর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। দৈনন্দিন জীবন ওকে এই শিক্ষাই দিয়েছে যে জমিদারের গড়টি শুধু ওরই শত্রু নয়, রামলু, রঙডু, সোমআপ্পা, ভেঙ্কটরাও-এর মত শত শত বেগারীদের বংশের শত্রু ; যাদের সোনার ফসল, ক্ষেত, গান, ঘর, তুলোর ফুল, আর বউয়ের হাসি—এই গড় চুরি করে নিয়েছে। এই ঘৃণাই হল নাগিশুর আর রাও-এর বন্ধুত্বের বুনিয়াদ। এই ঘৃণাই রঘু রাও-এর মনে এই ধারণা এনে দিয়েছে যে, দুনিয়ায় প্রতাপ রেড্ডীরা অল্প আর বেগারীর সংখ্যাই বেশী। আর এই বেগারীরা যদি নিজেদের মধ্যে একতা গড়ে তোলে তবে ঐ গড়ের দেয়াল বেশীদিন আর উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। এই দেয়ালটি হঠাৎ একদিনে ওর মনে একটা আকার নিয়ে আসেনি। খুব আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আবছা পথ ঘুরে ঘুরে অবশেষে এই তত্ত্বটি তার কাছে এসে পৌঁছেছে।

কিন্তু যে জিনিষটি এই ঘৃণাকে একটা মহৎ অনুপ্রেরণায় রূপ দিয়েছে, সেটি জমিদারের প্রতি ঘৃণা নয়, জীবনের প্রতি ভালোবাসা।

রাও আবার ধীরে ধীরে জীবনের মুঠি খুললো। ঘৃণার মুহূর্তগুলির মাঝে ঝলমলে একটা প্রেমের ফুলকে দেখে ওর চেহারাটি একদম দীপ্ত হয়ে উঠলো।

'চন্দরী'

রাও-এর তিন বছর আগেকার একটি ক্ষেতের কথা মনে পড়ল। ক্ষেত তুলোর ফুলে ফুলে বরফের মত শাদা হয়ে গেছে। ও সকাল থেকে তুলোর ফুল তুলছে। কখনো কখনো শাদা ফুলের সঙ্গে ছাইরঙা ফুল এসে গেলে সেটাকে আবার বেছে নিয়ে আলাদা ঝোলায় রাখছে। বহুক্ষণ ধরে খুব তাড়াতাড়ি ও কাজ করছিলো আর খুব তাড়াতাড়ি নিজের হাত চালাচ্ছিল। কেননা, আজ ওর বাবার অসুখ ; আর সেই জন্যেই একজনকে দুজন ক্ষেত মজুরের কাজ করতে হচ্ছে।

ও কাজ করতে করতে আস্তে আস্তে গুণ গুণ করে গান গাচ্ছিল। যে মেয়েটি ক্ষেতের অপর প্রান্তে ফুল তুলতে তুলতে ওর দিকে এগিয়ে আসছিল তাকে দেখে নয়, নিজের ক্লান্তি ভোলার জন্যই আর গানের আওয়াজের সাথে নিজের ভালবাসার আওয়াজ মিলিয়ে দেবার জন্যই ও গান গাইছিলো। গান গাইতে গাইতে হঠাৎ ও চুপ করে গেল, কেননা ওর সামনের ঘন তুলোর গাছগুলোর ভিতর থেকে একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে ফেললো। রাও ফাঁসি সেলে শুয়ে শুয়ে আস্তে আস্তে চোখ দুটো বন্ধ করলো। প্রথমবার চন্দরীকে যেমনভাবে দেখেছিল তেমনিভাবে দেখতে লাগলো।

প্রথমেই ওর চন্দরীর সাদা দাঁতের কথা মনে এলো, ঠোঁটের মাঝখানে ছোট ছোট দাঁতগুলি মোতির মালার মত ঝকঝক করছে। চন্দরীর ব্লাউজ লাল। তার উপর ছোট ছোট আয়না বসানো। চন্দরী যখন ঘাড় নীচু করে পিছনের দিকে ফিরে দেখলো তখন ও বুঝলো যে, ব্লাউজটা পিছন থেকে খোলা। লালা সুতোগুলো গোলাপের পাপড়ির মত তার পিছনের সাদা অংশটায় ছড়িয়ে পড়েছে। চন্দরী যখন তাড়াতাড়ি ওর দিকে ফিরল তখন মনে হল যে তার মাথার চুলে লাল মখমলের একটি গুছি ঝুলছে। যখন ওকে একটু মুচকি হেসে আর ঘাবড়ে দিয়ে ঘাগরার উপর আঁচলটা দুরস্ত করছিলো তখন ওর মনে হলো আঁচলটাও গাঢ় লাল রঙের আর ফুলদার। আঁচলেও গোল গোল আয়না বসানো, রোদে ঝকঝক করছে, আর তুলোর শাদাতে মিশে চোখ ঝলসে দিচ্ছে। চন্দরী যখন তুলোর ফুল তোলার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল তখন বোঝা গেল, ওর হাতে প্রথম রয়েছে কালো শিংয়ের চুড়ি। আঙটিতে সবুজ হরফে ওর নাম খোদাই করা। মাথার টিকলিতেও ঐ রকম খোদাই। টিকলি থেকে ওর চোখ আরও নীচে নেমে এসে বহুক্ষণ ধরে নীলাভ চোখদুটির মধ্যে হারিয়ে গেল। নীলাভ চোখ...খুব পরিষ্কার খোলা রং...উঁচু আর পুরন্ত চেহারা, পাতলা ঠোঁট।

চন্দরী—!

এই সবই মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল।

পরমুহূর্তে ও একটু হাসলো। কিন্তু এই দ্বিতীয় বারের মুচকি হাসির মুহূর্তটি প্রথমবারে দেখার মুহূর্তটির মত দরকারী নয়। এই প্রথম মুহূর্তটি কতবার ওর মনে

এসেছে। জঙ্গলে ঘোরার সময়, পুলিশ আর ফৌজকে এড়িয়ে চলার সময়, কাগজের কারখানায় কাজ করার সময়, পাহাড়ের গুহায় বসে, জমিদারের চাবুক খেতে খেতে, জেলে অনশন করার সময়ও এই মুহূর্তটি মনে এসেছে। আর এর থেকে শক্তিও সঞ্চয় করেছে। আবার কয়েকবার এই মুহূর্তটি নরম, মিষ্টি ও দুর্বল বোধ করে ও এটাকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। আবার কতবার এই মুহূর্তটি বিনা আহ্বানে হঠাৎ তার মনে উদয় হয়ে তাকে বড় কষ্ট দিয়েছে। মরুভূমির মাঝখানে কোথাও জল নেই। তৃষ্ণার্ত সে সময়, জল মদ হয়ে এসে যে রকম কষ্ট দেয়, সেই রকম কষ্টই এই মুহূর্তটি রঘুরাওকে কতবার দিয়েছে। রাও-এর এই মুহূর্তটির সৌন্দর্য ও এর বেদনার কথাটি পুরোপুরিই জানা। এই সময়, এই মুহূর্তটিকে মনের মধ্যে আনতে গিয়ে ও একটা গভীর আনন্দ ও গভীর বেদনা বোধ করল।

চন্দরী লম্বাড়গোষ্ঠীর একটি মেয়ে। তার বাবার নাম ভাগিয়া। চন্দরী যাযাবর ও মধুকণ্ঠী। নিজেদের গোষ্ঠীর সাথে দিনকয়েকের জন্য ভগবতী নদীর কিনারে এসে পড়েছে। এই সময়টা তুলোর ফসলের সময়। তাই এই সময়ে দেশমুখরা (গাঁতিদার) এই যাযাবরদের তুলোর ফসল তোলার কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। এরই জন্য এই সময়ে চন্দরী জমিদারের ক্ষেতে তুলোর ফুল জড়ো করছিল। নচেৎ সাধারণত সে জঙ্গল থেকে সস্তালু কাঠ জোগাড় করে বিক্রী করে অথবা বাবলা গাছের গঁদ যোগাড় করে ছোট ছোট শহরে হেঁকে বেড়ায়—গঁদ নাও, গঁদ নাও। রাত্রে তার বাবা ঢোল বাজিয়ে গান গায় আর চন্দরী গোষ্ঠীর মধ্যে নাচে। এই প্রথম লহমার পর আরো দ্বিতীয় কতকগুলো লহমাও এসেছিল। কেননা রাও নওজোয়ান আর চন্দরী নওজোয়ানী। তারই ফলে বীজও বোনা হবে আর ফসলও কাটা যাবে। এইসব লহমাগুলোয় ছিল সুগন্ধভরা গান। রাগের ভানও ছিল। আবার দেহ আড়াল করে চলে যাওয়ার ইচ্ছেও ছিল। চন্দরী একটি স্রোতস্বিনী—একটি প্রসারিত ঢেউ। আর সে যখন রাও এর বাগদত্তা হয়ে গেল তখন হলো একজন সুন্দরী নটীও। কিন্তু সে নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে বা অন্য কোন লোকের সামনে নাচতো না। ভাবী স্বামীর সামনে জঙ্গলে অথবা নাগিশুরের বাড়ির সামনে সে নাচত। এই সময় সে তাঁতের মোটা ফুলদার ঘাঘরা পরত। তার উপর দেড়-দু ফুট রূপোর গোট দেওয়া। পেটের অর্ধেকটা খোলা। আর পায়ের গোছের উপর পিতলের গয়নায় সাপের ফণা দুলছে। এই নটীকে দেখে রাওয়ের মনে একখানা পাল্কীর ছবি ভেসে উঠত। সেটি খুব রঙীন আর সুন্দর। দুপাশে লাল রেশমীর তৈরী পর্দা ঝোলানো। সেটি আজ খালি নেই।

আবার সেই দিনটির কথা ওর মনে পড়লো যখন চন্দরী তুলোর ফুল জড়ো করে নিল, আর ও বেলা প্রায় একটার কাছাকাছি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ভগবতী নদীর দিকে রওনা হল, যেখানে চন্দরীর স্বজাতিরা তাঁবু গেড়েছে। রাস্তায় ওর সাথে রামালুর দেখা হতেই সে একটু মুচকি হাসি ছাড়া আর কিছু বললো না। রাও এদিকে বেশী নজর দিল না। কেননা রামালুর হাসি বিষাদভরা বলে বোধ হোল। রাস্তায় ওর কাকা রঙডুর সাথেও আবার দেখা হয়ে গেল। সেও একটু হেসে দিল। রাও কিন্তু খুশী, সে বেপরোয়া এগিয়ে চললো। ও মনে ভাবলো, আমি নিজের জাতের বাইরে ভালবেসেছি বলে বুড়ো কাকা হাসছে, তা হাসুক। রাও মাথা নীচু করে শিউলী ফুলের ঝাড় থেকে

বেরিয়ে নাগফণির ঝাড়ে দুপাশভরা রাস্তার উপর গিয়ে উঠলো। রাস্তাটি যাযাবরদের আড্ডার দিকে চলে গেছে। প্রায় আধ মাইলটাক গিয়ে ও যেখানে যাযাবরদের গাধাগুলো চরে বেড়াচ্ছিল সেখানে গিয়ে পৌঁছলো। নিকটেই তাঁবু ফেলা। কোন কোন তাঁবু পাটের আবার কোনটা তালপাতার তৈরী। পুরুষ মানুষেরা চাটায়ের উপর বসে সেটা বুনছে। আর কোন কোন মেয়েছেলে সম্ভালু গাছের ল্যাকপেকে ডাল দিয়ে ঝুড়ি বুনছে। একজন বুড়িমা একলা একলা বসে যৌবনের গান গাইছে আর কতকগুলি যুবতী তাই শুনে হাসছে। রাও এই সব দেখতে দেখতে ভাগিয়ার তাঁবুতে এসে পৌঁছলো। ভাগিয়া একটা উনানের উপর ঘি-তে পান আর লবঙ্গ লাগিয়ে গরম করছে।

রাও জিজ্ঞেস করল : "এ দিয়ে কি হবে?"

ভাগিয়া চোখ টিপে বলল : "এই সব মিশালেব ঘি একদম আসলের মত দেখতে।"

"আসল ঘিই বা বেচনা কেন?"

"আরে আসল ঘি বেচলে কিনবে কে? এত দামী। তাই আমি নকল ঘিটাকে আসল বলে চালাচ্ছি।"

"চন্দরী কোথায়?"

"এই এসে যাবে, বসো।"

"কোথায়?"

"গড়ে গেছে—জমিদারের ছেলে ডেকে পাঠিয়েছে।"

রাও-এর বুকটা ধকধক করে উঠলো, কিছুক্ষণ পরে বলল : "জমিদারের ছেলে ডেকেছে কেন?"

"কি জানি, কেন?" ভাগিয়া ঘিতে কাঠের চামচ দিয়ে নাডতে নাড়তে বলল, সকালে গেছে, এবার এসে যাবে, বসো।

বাও মাটিতে বসে পড়ল।

বিকেল গেল, সন্ধ্যে উত্রে গেল। অস্তগত সূর্যের লাল আভাও আকাশ থেকে চলে যাচ্ছে, এমনি একটা সময়ে চন্দরী জমিদারের গড় থেকে ফিরে এল। রাও-এর রাগত চেহারাটা দেখে মুহূর্তের জন্য চন্দরী ভয় পেয়ে গেল। শেষে সাহস করে এগিয়ে এসে মুচকি হেসে বলল : "তুমি কখন এলে?"

রাও কোন জবাব দিল না।

চন্দরী ওর কাছে এসে দাঁড়িয়ে আঁচলটা নিয়ে খেলতে লাগলো। "নাগফণীর সরবৎ খাবে?" চন্দরী সুর মোলায়েম করে বলল।

"না।"

"তোমার জন্য ঠাণ্ডা তরমুজ তুলে আনবো?"

"না, না", রাগে চেঁচিয়ে উঠলো। "আমার কিছুই দরকার নেই।"

"কি ব্যাপার চেঁচাচ্ছ কেন?" চন্দরী হয়রান হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"কোথায় গিয়েছিলে?"

"প্রতাপ রেড্ডী ডেকেছিল।" চন্দরী বলল।

"ওখানে গেলে কেন?"

"মালিক ডেকেছেন কেন যাব না?" চন্দরী অবাক হয়ে বলল।

"ওখানে কি—কি হোল?"

এতক্ষণ চন্দরী দাঁড়িয়েছিল। এবার বসে পড়ে বড় ক্লান্ত স্বরে বলল—"নতুন কিছু না, যা হামেশাই হয়ে থাকে।"

"বেশ্যা", রাগে রাও চিৎকার করে উঠলো।

"আমি বেশ্যা নই।" চমকে উঠে রেগে চন্দরী বলল। "আমি ওকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি, ও আমার সাথে যা ইচ্ছে করতে পারে, কিন্তু কখনো আমার বুকে হাত দিতে পারবে না।"

"বুকে হাত না দেবার মানে?"

"বাচ্চা দুধ খাবে বলে।"

"বাচ্চা দুধ খাওয়ার সময়—" চন্দরী গভীর প্রেমভরা দৃষ্টিতে রাও-এর দিকে তাকালো। রাও চোখ দুটো নামিয়ে নিল। রাগে ও ক্ষোভে নিজের মনে মনে ভাবল—চন্দরী বাচ্চা দুধ খায় বলে কি শুধু বুকটাই পবিত্র? যে শিরা বাচ্চাকে দুধ দেয় সেটা কি পবিত্র নয়? যে ঠোঁটে আওয়াজ হয় সেটা কি পবিত্র নয়? যে বাহু আপনার কোলে শিশুকে শোয়ায় সেটা কি পবিত্র নয়? চন্দরী, তুমি তো সমগ্র দেহটা নিয়ে পবিত্র হতে পারতে? কেন তুমি এই পবিত্রতাকে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে দিলে?

চন্দরী কোন জবাব দিল না। কেননা ওদের গোষ্ঠীর কোন মেয়েমানুষের কাছেই এই জুলুমের জবাব নেই। ব্যস, চন্দরী চুপ করে কাঁদতে লাগল। রাও ওর পাশে চুপচাপ বসে সেই অশ্রুধারা বয়ে যেতে দেখতে থাকলো। কিছুক্ষণ পরে চন্দরীর চোখের জল শুকিয়ে গেল—আরও কিছুক্ষণ পরে শুকনো মাটিতে অশ্রুর কোন চিহ্নই রইলো না। হঠাৎ রাও উঠে দাঁড়ালো। কেননা আচমকা ওর খেয়াল হোল যে, এই অশ্রু অন্ধ্রের মাটিতে বন্যা আনতে পারবে না, এর জন্যে কৃষককে তার নিজের রক্ত দিতে হবে।

সেই মুহূর্তে সে তার সমগ্র প্রেমের মুহূর্তগুলি ডিঙিয়ে চলে এলো। এক মুহূর্তেই তার মনের সমস্ত পুরোনো দেয়াল ভেঙে গেল। এই মুহূর্তে সে একটা নতুন মুহূর্তের হাত ধরেছে।

সে রাত্রে ও আর ঘরে না ফিরে গাঁয়ের বাইরে চলে গেল। এই রাস্তায় ওকে একবার গোলাম হয়ে যেতে হয়েছিল। আজ আর ও গোলাম নয়। আজ ও স্বাধীন। আর ওর হাতে রয়েছে একখানা নতুন আয়না। আজ ও একটি রঙীন মনোহর মীনা হাতে তুলে নিয়ে একটা নতুন কনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে।

॥ তিন ॥

আজ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে রঘু রাও তার কিছু এখান থেকে, কিছু ওখান থেকে দেখতে পারে, যেন পুরোনো ইতিহাসের মাঝখানের কয়েকটি ছত্র হারিয়ে গেছে। কিন্তু তারপরের ঘটনাগুলো এক একটা আর আলাদা করে তুলে নিয়ে দেখা যায় না। যদি একটা ধরে টানা যায় তবে আর একটা তার সাথে সাথে উঠে আসে, যেন সবগুলো একটা তারে একই সাথে গাঁথা। কোথাও কোথাও খুব জোর আঘাতও ছিল, কোথাও

বা ছিল পথ ভুলানো বালুবেলা। কিন্তু এই সব নানাবিধ দুঃখকষ্ট ও মুশকিলের মধ্যেও ওর কাছে আর একটি দিক দেখা দিল, যেটি না হলে গত তিন বছরের দুঃখকষ্ট হয়ত বা ও কাটিয়ে আসতে পারত না।

প্রথম প্রথম তো ও বুঝতেই পারেনি যে, কোথায় যাবে আর করবেই বা কি। জীবন সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা ওর ছিল। ছিল জুলুমের একটা অন্ধ অভিজ্ঞতা। ছিল একটা নিরাশ্রয়ী প্রেমের পিপাসা। সেটা সূর্যপেটে তিন-চার মাস বাসন-কোসন মেজেও মেটেনি। যে বেনে বউ-এর ও চাকর ছিল তিনি ওকে সারাদিন খাটিয়ে নিয়ে মাত্র প্রাণ ধারণের মত রুটি দিতেন। এই গাঁয়েই প্রতাপ রেড্ডীর তেজারতি ছিল। কখনো কখনো বেনিয়ার ঘরে কোন অতিথি এলে সে রাতে রাওকে নিরম্বু উপবাসী শুয়ে পড়তে হোত। ওর গাঁয়েও ওকে কয়েকবার উপবাসী শুয়ে থাকতে হয়েছে। কথায় কথায় রাও টের পেয়ে গেল যে, বেনিয়ার গাঁয়ে বহু জমি আছে এবং আরও অনেক জমি সে কিনবার ব্যবস্থা করেছে। বাসন-কোসন মাজতে মাজতেই রাও তার নিজের চোখের সামনেই একটা ছোট-খাট জগন্নাথ রেড্ডী তৈরী হতে দেখল। এটা সত্য যে, বেনেটির বাড়ীটি খুব বড় নয় আর বাড়ীর বাইরে চমৎকার গড়ও নেই। কিন্তু ও নিজের খিদের, একজন বাসন-কোসন মাজা চাকরের খিদের সাথে গাঁয়ের একজন বেগারীর খিদের তুলনাটা তো করতে পারে। নিজের শ্রম ও কষ্টের সাথে বেগারীর কষ্ট ও শ্রমের তুলনা তো করতে পারে। ক্রমশ বুঝতে পারলো যে, বেগার কেবল গাঁয়েই নেই, বেগার শহরেও আছে, গাঁয়েই শুধু রেড্ডী নেই, শহরেও আছে। রেড্ডীদের ভগবান সৃষ্টি করে পাঠাননি। রাতের আঁধারে সঙ্গোপনে ধীরে ধীরে রেড্ডী তৈরী হয়। কথাটির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রাও-এর সেই সময়ই হয়েছে, যখন বেনে ওকে দু-তিনবার চোরাবাজারের জিনিষ এধার-ওধার নিয়ে যাওয়ার কাজে নিযুক্ত করেছিল। প্রত্যেকবারই বেনের থলি ছিল ভরা আর ওর পেট খালি। নিজের খিদের আর থলির তুলনা যে ও করবে না সেটা ছিল অসম্ভব। একটি কাজ রয়েছে ওর সামনে, রয়েছে কি সর্বনেশে খেলা। জগন্নাথ রেড্ডীর ঘরের ভিতর যাওয়ার সুযোগ ওর কখনো ঘটেনি। কিন্তু আজ ও রয়েছে শত্রুর ঘরের মধ্যে উপস্থিত। এখানে ও দিনরাত বেনে আর তার বউয়ের সলাপরামর্শ শোনে। এইসব পরামর্শে হামেশাই টাকা ও জমির কথা হয়। কিন্তু ওর খিদের কথাটা হয় না কোনদিনই।

চোরাকারবার সম্পর্কে দু'একবার খেয়াল এসেছিলো যে, ও এই সর্বনেশে খেলাটি বন্ধ করে দেয়। কিন্তু কেমন করে? গেঁয়ো লোকের স্বভাবের অভিজ্ঞতা ওর ছিল। গাঁয়ের পুলিশ ও পয়সাওয়ালা লোকের মেলামেশার কথাও ওর স্মরণ ছিল। এ অভিজ্ঞতা ওর খবরের কাগজ পড়ে হয়নি, নিজের জীবনের প্রতিটি লহমায় ও পড়েছে, চোখে দেখেছে। তারই ফলে সূর্যপেটে চার মাস থেকেও ওর মুহূর্তের জন্য মনে হয়নি যে, এ ব্যাপারে ও পুলিশের কাছে যেতে পারে। লাখ বার বললেও কিন্তু এটা ওর মগজে ঢোকে না যে, এসব ব্যাপারে পুলিশ কিছু করতে পারে। তবুও কোন লোক ওকে এসব করতে বললে হয়ত বা চুপ করে থাকবে, নয়ত ও একটু তেতো হাসিতে জবাব দেবে।

ওর যে গলিতে বাসা সেই গলিতেই আরও কয়েকজন বাসনমাজা চাকর ছিল—

শহরের বেগারী। ওরই মত বহু বেগারী এসেছে গাঁ থেকে—বিভিন্ন জায়গা থেকে—হিন্দুস্থানের প্রতিটি প্রান্ত থেকে। এদের মধ্যে একের প্রতি অন্যের এক ধরনের সমবেদনাও ছিল। এরা সব নিজেদের মালিকের অনুপস্থিতিতে হরদম গালাগালি দিত। গাঁয়ের বেগারীরা এটা একদম করে না। কিন্তু রঘু রাও-এর এসব বিষয়ে কোন প্রত্যয় হোত না। গালাগালিতে হৃদয়ের জ্বালা তো যায় কিন্তু পেটের খিদে দূর হয় না।

একদিন রঘুরাও তার প্রতিবেশী চাকর ভেঙ্কটকে একথা বলায় ভেঙ্কট জোরে হেসে বলল, "রাও তুই তো একদম আহম্মক। এসব কথাবার্তায় কিছু হবে না। খিদে দূর করার রাস্তাটা এই যে, মালিক তোকে কাটে তো তুই মালিককে কাট। সবজিতে ভাজি, ডালে ডলাইমলাই, পানে সুপারির প্রয়োজন। যেমন রোগী তেমন দাওয়াই। আর কোন কিছু যদি না হয়তো মওকা দেখে একদিন বেনে গিন্নীর গয়না নিয়ে সরে পড় অথবা যদি সম্ভব হয় বেনে গিন্নীকে নিয়েই ভেগে যা। তুই তো জোয়ান। সুশ্রীও আছিস। গাঁ থেকে নতুন এসেছিস। তোর শরীরে এখনো রক্তও আছে।"

কথাটা বলে ভেঙ্কট জোরে হেসে রঘুর উরুতে থাপ্পড় মারলো।

ভেঙ্কট গলির মধ্যে চাকরদের সর্দার। ও সব ঘাটের জল খেয়ে এসেছে। হরেক জায়গা থেকে চুরি করে পালিয়ে এসেছে, জীবনে বিশ বার নাম বদলেছে। আরো বিশ বার বদলানোর জন্য তৈরী আছে। আশেপাশের প্রতিবেশী এমন কি অন্য মহল্লার চাকরদের মধ্যেও ছিঁচকে চোর ছিল। ভেঙ্কট তাদের কাছ থেকেও বখরা নিত। আবার একসঙ্গে বসে মদ খেত অথবা চরসে দম মারতো, নিজের মনিবকে চড়া কথা শুনিয়ে তার কিছুক্ষণ পরেই মনিবের ঘরে ভিজে বিড়াল হয়ে বাসন মাজতো। ভেঙ্কট বার কয়েক রঘুকে নিজের বাসায় টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু রঘু কেন যেন তফাতে রয়ে গেছে। ও জানতো বেগারীদের কোন্ কথা ওর অপছন্দ। রঘু রাও-এর মনে হয়, ছোট পশুপাখীর খুপরির মত ঘরখানি একটি পেষণচক্র, যেটা গরীব মানুষকে ধীরে ধীরে পাপের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। বাবার কাছে সে শুনেছে, ওদের মতোই এদেরও এক সময়ে জমিজমা ছিল। পরে ওরা ক্ষেত মজুর হয়। ক্ষেত মজুর থেকে বেগার আর বেগার থেকে জমিদার ও দেশমুখদের গুণ্ডায় পরিণত হয়। ওর চোখের উপরই চরসে দম দিয়ে, মদের বোতলে আর পানের কোকেনে দরগাইয়া ভিমাইয়াদের নির্দয় গুন্ডা হতেও দেখেছে। এরা ওরই মত মানুষ—ওর সামনে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। রূপান্তরিত হয়ে আকণ্ঠ ডুবে যাচ্ছে। গাঁয়ে যে সব কথা ও জানতো এখানে এসে সেগুলি ও ভুলে বসেছে ; রঘু রাও-এর একটা দিশেহারা ভাব, ক্রোধ আর একটা পবিত্র ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না ; এগুলি দিয়েই সে ঘটনার এই ক্ষতিকর ধারাটি বদলে দিতে পারে।

রঘু কৃষকের বিচার বুদ্ধি নিয়ে কেবল নিজেকেই বাঁচাতে চাইলো। অত্যন্ত যত্ন ও সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করে সে বেনিয়ার কাজ করে দিত। এত শ্রম ও গাঁয়েও কোনদিন করেনি। তবুও এতে কোন ফলোদয় হলো না। কোনদিন দান হিসেবে ওর কিছু বেশী রুটি জুটতো। বেনিয়ার স্ত্রীর একটি হাসিখুশী খুব ভালো ছেলে ছিল। দু'চার দিন ভালই চলে। তারপর আবার সেই খিদে, সেই উচ্ছিষ্ট রুটির ছোট টুকরো। একদিন ছোট একটা থালা রান্নাশালায় হারিয়ে গেল। রাও-এর জুটলো চুরির অপবাদ। বেনিয়ার

স্ত্রী ওকে খুব মারলো, বেনিয়া ওকে পুলিশে দেবে বলে শাসালো। বেনিয়া থানায় যাবার আগেই থালাখানা পাওয়া গেল অপর একজন লোকের ঘরে, একখানা খাটিয়ার নীচে। বেনে ও বেনে গৃহিনী দুজনই চুপ হয়ে গেল, কিন্তু মাফ চাইলো না। মালিক একজন বেগারীর কাছে ক্ষমা চাইবে, সেটা কি কখনো সম্ভব? রঘু রাও-এর মনে পড়ল, কোন না কোন প্রকারের সামান্য ভুল-ত্রুটিতে ওকে দশবার মাফ চাইতে হয়, কেননা ও যে চাকর।

যেদিন রঘু রাও-এর চুরি কলঙ্ক লাগলো সেদিন ও ভয়ানক আনমনা হয়ে গেল। ভেঙ্কট ওকে ভোলানোর জন্য অশ্লীল সান্ত্বনার কথা অনেক শোনালো। তবু ওর মন তাতে শান্ত হোল না। সে ওকে চরসে দম দিয়ে জীবনের দুঃখকষ্ট ভুলে যাওয়ার পরামর্শ দিল। রঘু রাও সেটিও মানলো না। কিন্তু রঘু রাও-এর কাজকর্ম সাবার শেষে ভেঙ্কট তাকে টেনে হিঁচড়ে যেখানে স্ত্রীলোকেরা তাদের দেহ বিক্রি করে সেখানে নিয়ে গেল। রাও আজ পর্যন্ত এদিকে মাড়ায়নি, এই জন্যে প্রথম ও বুঝতে পারেনি, ভেঙ্কট ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। ভেঙ্কট ওকে শুধু এই কথাই বলেছিল যে, আজ ওকে সে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবে যেখানে ও জীবনের সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলে যাবে। রাও-এর বার বার তাগিদ সত্ত্বেও ভেঙ্কট ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বলেনি। অবশেষে রাও তাঁর সামনে একজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেল। ঠিক জায়গায় পৌঁছে ভেঙ্কট রাওকে ধাক্কা মেরে এগিয়ে দিয়ে নিজে পিছনে রইলো। এখানে রঘু দেখল ধোঁয়ায় ভরা কামরায় হলদে রঙের তক্তপোষ—খুব ছোট ঘর। গাঢ় অন্ধকার। সেই গাঢ অন্ধকারে একটি স্ত্রীলোক ঈষৎ হাসির চেষ্টা করছে। রাও মুখ ফিবিয়ে ভেঙ্কটকে জিজ্ঞাসা করল—"এটি কি?" ভেঙ্কট ওর হাতের তালুতে আট আনা পযসা দিয়ে বলল, "যাও বেটা আরাম কর।"

কথাটি বলে ভেঙ্কট অদৃশ্য হয়ে গেল। কামবায় সেই স্ত্রীলোকটি আর রঘু একলা।

স্ত্রীলোকটি তক্তপোষের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'বসে পড়।"

রাও কিন্তু অনেকক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলো এবং স্ত্রীলোকটিকে দেখতে লাগলো।

স্ত্রীলোকটি ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কি, বসে যাও।" শেষে রাও সেখানেই দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "তোমার বুকে হাত রাখতে পারি কি?"

স্ত্রীলোকটির কাছে প্রশ্নটি বড়ই আশ্চর্যজনক লাগলো। তবুও সে বললো, "হ্যাঁ, তুমি পয়সা দিয়েছো। শুধু বুকে কেন আমার সমগ্র শরীরের প্রত্যেকটি জায়গায় হাত দিতে পারো।"

ক্ষণিকের জন্য রঘু রাও-এর সমগ্র শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। রাও কামরা থেকে বেরিয়ে এলো। স্ত্রীলোকটি ওকে ডাকতে লাগল। রাও গলিতে বেরিয়ে পড়লো। ভেঙ্কট ওকে ডাকলো, কিন্তু রাও প্রথমে একটু, শেষে জোরে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। দৌড়তে দৌড়তে ও মনে করল সূর্যপেট থেকে চলে যাবে। কেননা ওর গাঁয়ের মেয়েটিতো তবু কমসে কম তার বুকখানা বাঁচিয়েছিল। আর এখানে সূর্যপেটে স্ত্রীলোক

গোটা দেহটাই বিক্রী করে দিয়েছে। ওর মনে হোল, আজকের পর সূর্যপেটেও আর থাকতে পারবে না।

রাও ফাঁসী সেলের অন্ধকারে নিজের আদর্শানুরাগের জন্যে একটু হাসলো। আদর্শের প্রতি এই অনুরাগ ওকে সূর্যপেট থেকে চলে যেতে বাধ্য করেছিল। শ্রীপুরম থেকে ও এসেছিল সূর্যপেটে। সূর্যপেট থেকে চলে গেল হায়দরাবাদ। এখানে এসে রিক্সা টানা শুরু করলো। কেননা তার বাহু ছিল মজবুত, বুক দৃঢ়। পায়ের পেশীগুলি শক্ত। আর ও বিনা আয়াসে চড়াইয়ে উঠতে পারতো। আবার ঠিক তেমনি উৎরাইতে নামতে পারতো। নতুন নতুন কংক্রীটের রাস্তা ওর ভাল লাগলো, ভাল লাগলো বিজলী আলোর রোশনাই, আর রিক্সার ঘন্টি। রাত্রে ওর ভরপেট খাবার মিলতো। ওর মনে হোল যেন বাঞ্ছিত দ্রব্যের সন্ধান পেয়েছে। রিক্সার মালিকও ওকে দুটি উর্দি তৈরী করিয়ে দিল। ও সব কিছু ভুলে গেল, খুব মজা করে হায়দরাবাদের সড়কের উপর পাঁচ ছ'মাস তেজী কুকুরের মত দৌড়ে বেড়াতে লাগল। ওযে একটা মানুষ, যাকে একটা ঘোড়ার মত জুতে দেওয়া হয়েছে, সেটা ভুলে গেল। একথা ভুলে গেল যে, কিছু লোক সর্বদাই রিক্সা চড়ে আর কিছু লোক সর্বদাই রিক্সা চালায়। কি মতলবে ও এসেছিল সেকথাও ভুলে গেল। দু'খানা কাপড়, আর দুবেলা খাওয়া আর কিছু টাকা ওর চোখে একটা খুশীব রঙের আবরণ এঁটে দিল, আর যেদিন ও ওর বাবা ভেরাইয়াকে কুড়িটি টাকা পাঠিয়ে দিল, সেদিন তো ভাবল যে, ওর মত সৌভাগ্যবান সারা হায়দরাবাদে আর কেউ নেই। বিড়ি বেশ ভাল। সিগারেট আরও ভাল। আর সবচেয়ে ভাল গোস্ত।

পাঁচ ছ'মাস এইভাবে কাটার পর ও অসুখে পড়ে গেল। ভেবেছিল যে ওর সামান্য অসুখ হয়েছে। কিন্তু তা নয়, প্রথম একদিন চড়াইতে উঠতে গিয়ে ওর মাথা ঘুরে গেল। অতিকষ্টে সেটা সামলে নিল। পরে একদিন কাশি। সামান্য কাশি লেগে রইলো। পরে একদিন হোল জ্বর, সাধারণ জ্বর। একমাস অসুখে পড়ে রইলো। এবার রিক্সার মালিক ওর খুব শুশ্রূষা করলো। কেননা ওই মালিকের সবচেয়ে ভালো রিক্সা টানিয়ে। আর রঘু কিছু পয়সা সঞ্চয় করে রেখেছিল, এই অসুখে সেটা ওর কাজে লেগে গেল। আরও মাস দুয়েক পরে সুস্থ হয়ে উঠলো। কিন্তু শরীর এখনো সারেনি, তবু আবার আস্তে আস্তে রিক্সা টানতে লাগলো, কিন্তু ধীরে ধীরে অল্প অল্প কাশি দেখা দিল। ডাক্তার ওকে দু'মাস সম্পূর্ণ বিশ্রামের বিধান দিলেন, কিন্তু বেকাররা যদি কাজ না করে তবে খাবে কোথা থেকে? তাই রিক্সা চালানো দরকার হোল। সুতরাং দম কমে আসতে লাগলো আর মাথায় ও সারা শরীরে ঘাম আসতে লাগলো। শিরা উপশিরা রক্তের চাপে দপ্ দপ্ করতে লাগলো, কালো রঙের কফ বেরুতে লাগলো, কিন্তু রিক্সা তবু চালাতেই হবে ; আবার আঁধার ফিরে এলো।

রঘু রাও চিন্তা করতে করতে থেমে গেল। মুহূর্তের জন্য সেই সমস্ত লোকের কথা ওর মনে পড়লো ঃ ওর রিক্সায় চড়েছিল এক কেরাণী। এক আনা নিয়ে ওর সাথে ঝগড়া করেছে। স্কুল কলেজের ছেলেরা—যারা চায় রিক্সা জোরে চলুক, গুণ্ডা—যে রাতের আঁধারে ছোরা নিয়ে ঘোরে, প্রেমিক—যে সিনেমার পর্দা ছিঁড়ে ফেলে, আর রিক্সার পর্দা টেনে পর্দানশীন মেয়েদের সঙ্গে জবরদস্তি প্রেম করে। ও যখন রিক্সা

চালাতে চালাতে কাশে তখন ওকে কদর্য গালি দেয়। কিম্বা ওর রিক্সা থেকে নেমে গিয়ে পয়সা না দিয়েই আরেকটি রিক্সায় সওয়ার হয়। মৌলভী—যিনি বিক্সার চারদিক চাদর দিয়ে ঘিরে ব্যবহার করেন, খদ্দরধারী—যিনি রিক্সাকে পিকদানের মত ব্যবহার করেন, বেনিয়া—যিনি রিক্সাকে মালগাড়ী মনে করেন, স্ত্রীলোক—যাঁরা রিক্সাকে শিশুদের অনাথাশ্রম মনে করেন, হরেক রকমের মজার লোকের সেবা করতে হয়েছে। গাঁয়ে রঘু রাও দুঃখ পেতে শিখেছিল, আর শহরে সে দুঃখ পেয়ে মুচকি হাসতে শিখেছে। অন্যের উপর মুচকি হাসতে আর নিজেকে নিয়ে হাসতে শিখেছে।

রঘু রাও এই সমস্ত জনতার ভিড় এক নজর দেখে তাদের মধ্য থেকে একটি লোককে বেছে নিল। লোকটি একদিন রাত একটার সময় আবদুল আলি রোড থেকে ওর বিক্সার সওয়ার হয়েছিল। তাঁর হাতে দু'খানি বই। স্বরটিও বড়ই মধুর। যেভাবে তিনি রিক্সাওয়ালাকে নিজের কাছে ডাকলেন, তাতে না আছে অহঙ্কার না আছে ঘনিষ্ঠতাব ভাব। ভাড়াটিও তিনি নিজে বলে দিলেন, সেটি বেশিও নয়, কমও নয—ন্যায্য ভাড়া। তাই কোন বিরোধ হল না। হবদম লোকে রিক্সাওয়ালার কাছে আবোল-তাবোল প্রশ্ন করে। ভাবে না যে রিক্সা চালাতে হলে শ্বাস নেওয়া এত কম হয় যে কথা বলা আর রিক্সা চালানো—দুটো একসাথে হতে পারে না। হয় কথা বলতে পারে—নয় রিক্সা চালাতে পাবে। এদিক দিযেও লোকটি ভাল। অর্ধেক রাস্তা এইভাবে নির্বাক কাটলো।

এরপর জিয়াই রোডের মোড়ে এসে লোকটি আস্তে আস্তে বললেন, এখান থেকে আখতার রোডের দিকে যেতে হবে। চড়াইটা লম্বা। রঘু রাও-এর দম ফুরিয়ে গেল। শিরা উপশিরা সব ফুলে গেল। আবার ঘুরে ফিরে সেই কাশি এলো। লোকটি অত্যন্ত নরম স্বরে বললেন, "রিক্সা থামাও।"

রঘু রাও বললে, " না সাহেব ভয় পাবেন না। এখুনি ভাল হয়ে যাব। আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

লোকটি নরম অথচ কড়া সুরে বললেন, 'রিক্সা থামাও।"

রাও রিক্সা থামালো। ওর মনে হোল এইবার লোকটি ওকে বাতিল করে দেবেন। হয়তো বা দু চারটে গালাগালিও দিয়ে চলে যাবেন, ওর ভাড়াটিও মারা যাবে। লোকটি কিন্তু এসব কিছুই করলেন না। তিনি রাও-এর সাথে সাথে চলতে চলতে বললেন, "চড়াইটা তুমি খালি রিক্সা নিয়ে চল। আমি এগিয়ে গিয়ে আবার তোমার বিক্সায় চড়বো।"

রাও চলতে চলতে সকৃতজ্ঞ নয়নে লোকটিকে দেখলো। লোকটার কালো চেহারায় দুটো বড় বড় দীপ্তিভরা চোখে একটা অদ্ভুত সমবেদনার ছাপ আঁকা রয়েছে—সমবেদনা, জ্ঞান ও ভব্যতা। একটা অদ্ভুত রকমের নৈকট্য ও দূরত্ব।

লোকটি জিজ্ঞাসা করল, "কতদিন থেকে কাশি হয়েছে?"

"মাসখানেক।"

"কোথায় থাক?"

"গোবিন্দ রামের বাড়ী।"

"ইউনিয়নের মেম্বার হয়েছো?"

"কি?" কথাটা রাও বুঝতে পারলো না।

লোকটি কয়েক মুহূর্ত রাও-এর সাথে চললো। পরে লোকটি আস্তে আস্তে ওর গায়ে হাত রেখে বলল, তুমি যেমন এই রিক্সা চালাচ্ছো, তেমনি এই শহরের অন্য রিক্সাওয়ালারাও আছে। সবারই দুঃখ এক রকমের। এরই জন্য সবার চিকিৎসা একই রকমের হতে পারে। তাই রিক্সাওয়ালারা নিজেদের জন্য একটা ইউনিয়ন তৈরী করেছে, যেখানে সব রিক্সাওয়ালা মিলে একটা জায়গায় বসে।"

রাও সাথীটিকে খুব সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো। ওর মনে সূর্যপেটের চাকরদের আড্ডার কথাটা ঘুরে এলো। ওখানে সবাই এসে জটলা করতো। ও রাগ করে লোকটার হাতখানা তার গা থেকে ঠেলে দিয়ে বলল, "না সাহেব, আমি কোন আড্ডাখানার মেম্বার নই। মেম্বার হতেও চাইনে।"

লোকটা আরও কিছুক্ষণ নির্বাক ওর সাথে চললো, তারপর সে আবার এইসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলো, রঘু রাও-এর নাম, কোথা থেকে এসেছে, রিক্সা চালাবার সময় কেমন করে শ্বাসকষ্ট হয়, উৎরাইতে রিক্সা কেমন করে চালাতে হয়, সস্তা খোরাক কোথায় মেলে, সস্তা বাড়ীই বা কোথায়। যে মালিক খোরাক-পোষাক, আর বাড়ী দেয়, রিক্সার আয় থেকে কত অংশ তার জন্যে সে নেয়—বড়ই কাজের কথা। রাও বেওকুফের মত কথাগুলো শুনতে লাগলো। পথে চলতে চলতে কখন যে চড়াইটা পেরিয়ে গেছে তা সে টেরই পেল না। কত রাস্তার মোড়, গলি, বাজার পিছনে চলে গেল। এখন ওরা দুজন কথাবার্তা বলতে বলতে লোকটির বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এই সময়টার মধ্যে লোকটি এক মিনিটের জন্যও রিক্সায় আর চড়েনি। বাড়ীতে পৌঁছে লোকটি ওকে পয়সা দিয়ে বলল, "এক কাপ চা খেয়ে যাও।"

রাও অস্বীকার করলো।

"না, না, এস, এখন ঠাণ্ডার সময়। চা খেলে শরীরটা গরম আর চাঙ্গা হয়ে উঠবে।" এই বলে লোকটি রাও-এর হাত ধরে তার ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। রাও দেখলো ঘরখানা খুব ছোট। কিন্তু ভারী পরিষ্কার, ঝকঝকে তকতকে। দুটো কামরা। একটা কামরায় ও ঢুকেছে আর দ্বিতীয়টি অন্দরে। দুই ঘরের মাঝখানে একটা ফুলদার পর্দা ঝোলানো। বাইরের ঘরটায় তিনখানা চেয়ার। চেয়ারগুলোর গদি আঁটা। একখানা লম্বা বেঞ্চ পাতা। তার উপর একটা নীল গদি। মেঝেয় পাতা একখানি সবুজ সতরঞ্চি। চারধারে কাঠের তাকে বই রয়েছে। এই পর্যন্ত দেখতে দেখতে ও অন্দর থেকে ক্ষীণাঙ্গী শ্যামাঙ্গী একজন স্ত্রীলোককে ফুলদার পর্দা সরিয়ে এঘরে আসতে দেখলো। তার সাথে একটি ছোট মেয়েও দৌড়তে দৌড়তে এলো। আর ঘরে এসেই যে লোকটি রাওকে এখানে এনেছিল তার পায়ের কাছে ঘেঁসে দাঁড়ালো।

লোকটি মুচকি হেসে রঘুকে বললো, "আমার নাম মকবুল, ইনি আমার স্ত্রী আর আমার মেয়ে আমিনা।" তারপর আমিনাকে কোলে নিয়ে বলল, "ইনি আমার সাথী রঘু রাও, এঁকে সেলাম কর বেটি। ওঁর কোলে যাও।"

আমিনা তার সুকোমল বাহু দুটো রাওয়ের দিকে বাড়িয়ে দিল। রাও খুব আশ্চর্য ও অত্যন্ত স্নেহে আমিনাকে কোলে তুলে নিল। আমিনা ওর বাহুর ভিতর এসে বলল, "সাথী লাল সেলাম।"

রাও আমিনার দিকে, মুকবুলের স্ত্রী দিকে—চারদিকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। কিন্তু এদের চোখে এমন একটা অপূর্ব প্রীতি, এমন গভীর দরদ এমন আত্মীয়তা আর চেহারায় এমন একটা অপূর্ব হাসির রেশ ছিল, যা সে ইতোপূর্বে কখনো দেখেনি। এইসব চেহারা মুহূর্তের জন্য দেখে ও বুঝতে পারলো না "লাল সালামের" অর্থটা কি, কিন্তু এইসব প্রীতিভরা চেহারা দেখে এটুকু বুঝলো যে "লাল সালাম" একটা ভাল জিনিষই হবে। তাই আমিনাকে ঝাঁকি দিয়ে বলল "লাল সালাম।"

আমিনা খিল খিল করে হেসে উঠলো। মকবুল হাসলো, মকবুলের স্ত্রীও একটু হাসলো। একটা গদি আঁটা চেয়ারে বসে স্ত্রীকে বললে, "সাথীটি আজ এখানেই খাবে।"

রাও আবার অবাক হয়ে মকবুলের দিকে তাকালো। কিন্তু এরপর আর কিছু বলতে পারলো না।

মেঝের ছোট সতরঞ্চির উপর, চীনামাটির পরিষ্কার থালায় সবাই মিলে খাওয়া শেষ করলো। আমিনা রাও-এর কোলে বসেছিল। আর কোলে বসেই সে তার কাছে খেতে চাইলো, যেমনটি রাও ছেলেবেলায় তার বাবার কাছে খেতে চাইতো। রাওয়ের এই মধুমাখা কথাগুলি ভারী ভাল লাগলো। মকবুলের স্ত্রী সুরাইয়ার বারবার রাও-এর প্লেটে ছোট ছোট মাংসেব টুকরো দেওয়া, ওর খুব ভাল লাগছিলো। মকবুল চুপচাপ খেতে লাগলো। 'সাথী কাকে বলে', 'লাল সেলামের অর্থ কি', আর সবচেয়ে এই প্রীতি, এই নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব ও সহকর্মীর স্নেহের টান ইত্যাদি—নানা কথাবার্তাব অর্থ জানবার ইচ্ছা হচ্ছিল রাওয়ের।

খাওয়ার শেষে সুরাইয়া চাদরখানা সরিয়ে রাখলো, আর ওর জন্য গরম এক পেয়ালা চা নিয়ে এলো। রাও চা খেয়ে মকবুলের দিকে তাকালো, ও কিছু বলতে যাচ্ছিলো। মকবুল বলল, যতদিন তোমার কাশিটা থাকবে ততদিন রাতে কাজ করা উচিত নয়। রাও চুপ করে রইলো।

মকবুল বলল, "আমাদের ইউনিয়নের একজন ডাক্তার আছেন। তুমি তাঁর কাছে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতে পার।"

রাও নিশ্চুপ।

মকবুল বলল, "এত ঠাণ্ডায় গিয়ে তুমি কি করবে? এখানেই শুয়ে থাক।"

হঠাৎ রাও জিজ্ঞাসা করল, "সাথী কথাটার মানে কি?"

মকবুল আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে সুরাইয়াকে বলল, 'সুরাইয়া, সাথী আজ এখানেই শোবে।"

সুরাইয়া অন্দর থেকে একটা বিছানা এনে সতরঞ্চির উপর বিছিয়ে দিল। মকবুল ব্যাগ থেকে একখানা বই বেছে নিয়ে রাও-এর পাশে এসে বসলো। দুজনে লেপ টেনে নিল। টেবিল ল্যাম্পের ছায়া মেশা আলোয় মকবুল বইখানা খুললো। রাও অযাচিতভাবে বইখানার মসৃণ পাতায় হাত দিতেই মকবুল বইখানা ওর সামনে এগিয়ে দিলো।

রাও কি করবে ভেবে না পেয়ে বইখানার মসৃণ পাতাগুলোর উপর হাত বুলাতে

লাগলো। অক্ষর ও পড়তে পারে না। তবে হ্যাঁ, কাগজের মসৃণতা রেশমের মসৃণতার মতোই। ও ধীরে ধীরে বইখানা মকবুলকে দিল।

মকবুল বইখানা খুললো। একখানা পাতায় পৃথিবীর মানচিত্র আঁকা। মকবুল প্রথমে নিজের দেশের উপর আঙ্গুল রেখে বলল, 'এই হিন্দুস্থান আমাদের দেশ।' তারপর উপরে উত্তর দিকে একটা আঙ্গুল রেখে বলল, "আজ থেকে তিরিশ বছর আগে এই দেশটাও আমাদের দেশের মতোই বেগারদের দেশ ছিল...।"

॥ চার ॥

রাত গভীর হয়ে উঠলো, গল্পটাও ছিল বড়। কিন্তু এই রাতের একেকটি পল ও গল্পের একেকটি কথা রাও-এর কাছে ছিল খুব মূল্যবান। ওর মনে হোল যেন ও চন্দরীর পবিত্র বুকে বসন্তের যে সৌন্দর্য দেখেছিল তার ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। এই কথাগুলির মধ্যে ওর নিজের বুকে বহুকালের অতৃপ্ত যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেটি ফলবতী হওয়াও সম্ভব মনে হলো। গড়ের যে বড় বড় খিলানে ওকে মাথা নোয়াতে হয়েছিল, বেগারীদের শক্তি তার চেয়েও বড় বড় খিলানও ভেঙ্গে-চুরে দিয়েছে।

কথাগুলো মকবুলের অন্তর থেকে আসছিলো আর রঘু রাওয়ের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করছিল। এর মধ্যে তাকে রোধ করতে পারে এমন কোন শক্তি ছিল না। রাও দিক্‌দর্শন পেয়ে গেছে, রাস্তা পেয়েছে। আগে ও যার অর্থ বুঝতো না, এখন তার মানে খুঁজে পেয়েছে। যেখানে ছিল অন্ধ অভিজ্ঞতা সেখানে এখন আলোর লহর ছুটে চলেছে। যেখানে সে নদীর কিনারা পাচ্ছিলো না সেখানে পেল শক্ত মাটি, আর রাও খুব ভাল করেই সে মাটির উপর পা রাখলো। ও মনে মনে বলল, আমি জোয়ান আর যা আমি শুনছি তাও নতুন। তাই বীজ বোনা হবে, ফসলও পাওয়া যাবে।

রাও আজ জানে না সেদিন সে কতক্ষণ, কত রাত জেগেছিল, আর কখন শুয়ে পড়ল। শুধু এইটুকু মনে পড়ে যে, ও আর মকবুল লেপের মধ্যে বসেছিল। ও শুনছিল আর মকবুল শোনাচ্ছিল। আর নিকটেই মেঝেতে সুরাইয়া শুয়েছিল। আর কচি আমিনার পাতলা নিঃশ্বাস পড়ছিল। ওর কোমল হাতখানা বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল। ঘরের মধ্যে টেবিল ল্যাম্পের সাদা সাদা আলোর শিখা দেয়ালের ছায়ায় কাঁপছিল। কখন যে ও শুয়ে পড়েছিল সে তার খেয়াল নেই। শুধু এইটুকু মনে পড়ে, গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে সে দেখলো, তার একখানা পা লেপের বাইরে বেরিয়ে গেছে আর সুরাইয়া লেপটি তার পায়ের উপর টেনে দিচ্ছে। লেপটি মুড়ে দিতে গিয়ে সুরাইয়ার আঙ্গুলগুলো ওর পায়ে ঠেকে গেল। কোন এক সুন্দর অনুভূতিকে এই আঙ্গুলগুলো যেন ছুঁয়ে দিয়ে গেল। ওর চোখ জলে ছলছলিয়ে উঠলো। আর সেই ছলছল চোখে ও সুরাইয়াকে ওর বিছানা থেকে সরে মকবুলের লেপ আর তার মেয়ের বিছানা ঠিক করে দিতে দেখলো। শেষে একটা গভীর পরিতৃপ্তির শ্বাস নিয়ে আমিনার হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে তাকে শুয়ে পড়তে দেখলো। রঘু রাও-এর অশ্রু উছলে উঠলো। কিন্তু রাও এ অশ্রু মুছলো না। কেননা এটা দুঃখের অশ্রু নয়, এটা আনন্দের। ও আজ নিজের ঘরে এসেছে।

॥ পাঁচ ॥

রাও কয়েক মুহূর্তের জন্য মকবুল আর তার ঘরের ছবিটার উপর মনোনিবেশ করল। তারপর কি একটা—এই চিন্তা পরম্পরায় ছেদ টেনে দিল। প্রথমে লোহার শিকলের ঝনঝন আওয়াজ ও পরে দরজা খোলার আওয়াজ এলো। কিন্তু রাও নিজের জায়গা থেকে নড়লো না—নড়তে সক্ষমও ছিল না। তারপর মেঝেতে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। দুজন ওয়ার্ডার এসে ওর হাতের শিকল খুলে দিল। জেলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট ওকে দাঁড়াতে বললেন। রাও আস্তে আস্তে উঠলো। মুহূর্তের জন্য আনন্দের-লহর ওর শিরা-উপশিরায় খেলে গেল। পরের মুহূর্তে ডাণ্ডা-বেড়ীতে ওর হাঁটুর ঠোক্‌কর লাগল। তার ফলে হাঁটুতে ডাণ্ডা-বেড়ী খানিকটা ফুটে গিয়ে ব্যথাটা বাড়িয়ে দিল। তথাপি ও সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টেব হাতে একখানা ভাঁজপড়া ও ময়লা কাগজ। তার হাত কাঁপছে। রাও দেখলো যে, হুকুমনামা পড়ার সময় তাঁর নানা ধরণের ভাবনা চিন্তা জনিত লজ্জাভরা চেহারার উপর ঘাম দেখা দিয়েছে। এই হুকুমনামায় রাও-এর আবেদন না-মঞ্জুর করা হয়েছে এবং মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়েছে। কাল সকাল সাতটায় ওর ফাঁসী হবে। সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট সাহেব রুমাল দিয়ে ঘামটা মুছে নিয়ে কয়েদীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাব কিছু বলার আছে?"

উত্তরে রাও একটু মুচকি হাসলো মাত্র।

কয়েক মুহূর্তের জন্য সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট রাও-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ রকম কয়েদীর সন্ধান তিনি আর কখনো পাননি। তিরিশ বছরের দীর্ঘ চাকুরী জীবনে তিনি অজস্র কয়েদী দেখেছেন। বড় বড় দুর্দান্ত ডাকাত যাদের ফাঁসির কোন ভয় ছিল না, তারাও ফাঁসির হুকুম শুনে সরকারকে পাঁচটা গালাগালি শুনিয়েছে—অনেকে কেঁদেছে—অনেকের প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে। অনেকে বেহুঁশ হয়ে গেছে। অনেকে পাগলের মত ছুটে কাঠ খেতে গিয়েছে। অনেকে হাত জোড় করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে। কিন্তু ফাঁসির হুকুম শুনে একটু মুচকি হাসে, এ রকম কয়েদী তিনি কখনো দেখেননি। জেল সুপাব ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েদীকে দেখতে লাগলেন, হয়ত বা তিনি এই মুচকি হাসার মধ্যে কোন ভয়, কোন আশঙ্কা, কোন গোপন দুর্বলতার প্রকাশ দেখতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু এ কাজের উপযুক্ত তিনি ছিলেন না। সারাটা জীবন তাঁর অপরাধীদের চেহারার অর্থ বুঝতে কেটে গেছে। একজন 'মানুষের' চেহারার অর্থ তিনি বুঝবেন কি করে?

সুপার সাহেব মনে মনে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে, কিছুটা রাগ করে দ্রুত পায়ে ফাঁসি সেল থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তাঁর চলে যাওয়ার পর ওয়ার্ডার যাকে বেশী বয়স্ক বলে মনে হচ্ছিল সে এগিয়ে এস বলল, "তোমাকে বেঁধে রাখতে আমার উপর হুকুম আছে। আমি কিন্তু তোমায় বেঁধে রাখবো না। তুমি কুঠরীর মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াতে পার।"

রাও বলল, "তোমার চাকরি যদি যায় তো আমাকে বেঁধে রাখো।"

দুজন ওয়ার্ডারই বলল, "না, আমাদের কোন ভাবনা নেই।"

রঘু রাও চুপ করে থাকলো।

তারপর বুড়ো ওয়ার্ডারটি এগিয়ে এসে চুপি চুপি বলল, "তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে? কোন জিনিষ? মিঠাই, শরবৎ, আমাকে বল। আমি জানিয়ে দিচ্ছি।"

রঘু রাও বলল, "আমার কিছুই দরকার নেই। শুধু এইটুকুই বল যে এখন রাত ক'টা।"

বুড়ো ওয়ার্ডার বাইরে দিয়ে বারান্দায় ঘড়িটা দেখে বলল, "এখন পাঁচটা—এখনো গোটা রাত পড়ে আছে।"

রাও মুখটা ঘুরিয়ে নিল। ওয়ার্ডার দুজন মাথা নিচু করে চলে গেল। আবার শিকলেব শব্দ হোল। আবার ফাঁসী সেল বন্ধ হয়ে গেল। আবার লোহার তালা লাগানোর শব্দ এল—যেন কোন গভীর কুঁয়ায় একটা ভারি পাথর পড়ল। তারপর গভীব নিস্তব্ধতা, নিবঙ্কুশ নিস্তব্ধতা।

রাও হাঁটুর ক্ষতটায় যাতে আঘাত না লাগে সেই জন্য পা ফাঁক করে সেলের মধ্যে আস্তে আস্তে চলার চেষ্টা করল। ও শুধু চার পা মাত্র চলতে পারে—তার পরেই দেয়াল। চারটি দেয়ালের মধ্যে মাত্র চার পা চলার দূবত্ব ছিল। এক—দুই—তিন—চার, এক—দুই—তিন—চার। প্রত্যেক চার পা চলার পর ওকে থেমে গিয়ে ফিরতে হয়। সেলে পা ছড়িয়ে শোয়াও যায় না। রাও একটা নতুন বিস্ময়ে নিজের শরীর, বাহু উরু ও বুকের দিকে তাকালো। ও নিজের নাক, কান এবং মুখে হাত দিল। প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাস্থানে যথাযথভাবে আছে। উষ্ণ ও জীবন্ত, শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে ও সঞ্চালিত হচ্ছে। আগামীকাল এই উষ্ণতা, চলমানতা, জীবন, বাছবিচার, খেয়াল, বাহুর শক্তি ও বুকের জোর ও কামনা-বাসনা চিরকালের মত শেষ করে দেওয়া হবে—কিসের জন্য? মরণে ওর কোন ভয়ই ছিল না। জন্মানো, বড় হওয়া, পরিবর্তিত হওয়া ও পবিবর্তনের স্বপ্নের মত সুন্দর হওয়া—তারপর আস্তে আস্তে ঝরাপাতার মত বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া—আর নিজের মৃত্যুর মধ্যে একটা নবজীবন শুরু হতে দেখা। কিন্তু আগামীকালের মৃত্যুটা কেমন?—আজও সে বুড়ো হয় নি। আজও তার শরীরের ত্বক এতটুকু শিথিল হয়নি—এখনো কুঁড়ি সব খোলেনি—সব পাপড়িগুলো ফোটেনি। শাখায় এখনো কুসুম অঙ্কুরিত হয়নি। আজও বর্ষা ঝরেনি। বিদ্যুৎ চমকায়নি। বুলবুল শিস দেয়নি। আর কোন বৃক্ষই বুলবুল ছাড়া সম্পূর্ণতা পায় না।

রাও সেলের পাকা শীতল মেঝের উপর উপুড় হয়ে বসে পড়লো। ও থুৎনিটা ডাণ্ডাবেড়ীর মাথার উপর রেখে চিন্তা করতে লাগলো। মকবুল ওকে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করিয়েছিল। লেখাপড়া শিখিয়েছিল। আর কিছুদিন পরে মকবুল ওকে রিক্সা টানার কাজ থেকে ছাড়িয়ে এনেছিল—ঐ কাজে ওর ফুসফুসের উপর ক্ষতিকর চাপ পড়ছিল। ওকে একটা কাগজের কলে চাকরী জুটিয়ে দিয়েছিল। মিলে এসে হিন্দুস্থানের শহরের বড় বড় পুঁজিপতি ও গ্রামের জমিদারদের ব্যাপক ষড়যন্ত্রের সূত্রটাও খোলাখুলি দেখতে পেল , যার মূল জীবনের প্রতিটি রাস্তায় বিষক্রিয়ার মত

ছড়িয়ে রয়েছে, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে নতুন জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, মানুষকে আরও মহান করে তুলতে, অবস্থার পরিবর্তন করতে পুরনো জীবনের সাথে লড়াই করতে হয়। কারখানায় এসে রাও লড়াই করতে শিখলো। শুধু লড়াই করতে শেখা নয়, নতুন জীবনের সেই কারিগরদেরও দেখলো, যাদের হাতে পুরনো কাঠের টুকরো আর কাটাছেঁড়া কাপড়ের টুকরো সুন্দর কাগজে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ও দেখলো এই হাতে মরা ধাতু হৃদযন্ত্রের মত ধক ধক করে আর গলে গিয়ে কিষাণের লাঙল, মোটরের অংশ আর ফুলের মালা গাঁথার সুচ তৈরী হয়ে যায়। নবজীবনের এই কারিগরী দেখে মাটিতে পোঁতা এই সব শতাব্দীর খেয়াল—যা কয়লায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল সেগুলো ওর মনে উদয় হোল। সেই সময়ের কথা মনে পড়লো যখন লোহা ধাতুতে পরিণত হয়েছিলো, আর ওর এই খেয়াল আসতেই গর্বে মাথা উঁচু হয়ে উঠলো। অত্যন্ত শক্ত করে ওর সাথীদের হাত আঁকড়ে ধরলো। কেননা এইসব হাতই এই গুপ্ত ধনরত্ন অন্ধকার গহ্বর থেকে ছিনিয়ে আনতে পারে। এই হাতগুলো ও আর কখনো ছাড়বে না। কেননা এই হাত মানুষের ভবিষ্যৎ ধ্বংসকারী মুনাফাখোরদের হাত নয়—নয়াজীবনের কারিগরদের—মজদুরদের হাত।

মিলের একবছরে চাকরী জীবনে ও অনেক কিছু শিখলো ; যেগুলো হয়তো দশ বছরের খাটুনীতেও অন্য জায়গায় এত পরিস্কারভাবে শিখতে পারতো না। নিজের উপর আস্থা রেখে লড়াই করতে আর পরাজয়ে ঘাবড়ে না গিয়েও হরতালকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শিখলো। এখানেও মালিকের গুণ্ডার সাথে বোঝাপড়া হোত। আর এই গুণ্ডাদের সেই মনোভাব—যেমনটি ছিল গাঁয়ের জমিদারের গুণ্ডাদের মনোভাব। কিন্তু এখানে এই গুণ্ডাদের শোধরানো গাঁয়ের থেকে অনেক সহজ। তবুও কয়েকবার ওর উপরে হামলা হয়েছে। কয়েকবার লাঠি ও ছুরির মুখোমুখি হতে হয়েছে। জেলে নাগিশুরের সাথে দেখা হোল। নিজের গাঁয়ের গোয়ালা নাগিশুর। নাগিশুরকে জেলে দেখে বড়ো চিন্তিত হোল। কিন্তু শিগগিরই নাগিশুর ওর চিন্তা দূর করে দিল। নাগিশুর ওকে জানাল যে, শ্রীপুরম আর সেই পুরনো গাঁ নেই। ওখানে জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে। শতাব্দীর পিছিয়ে পড়া বেগারী, ক্ষেতমজুর, গোয়ালা আর জংলী কোয়ারা অর্থাৎ সমস্ত লোক—যাদের জমি নেই—নিজেদের সভা গড়ে তুলেছে। আর এরা চল্লিশটা গাঁয়ের জমির মালিক জগন্নাথ রেড্ডীর সাথে নিজেদের জমির বোঝাপড়া করে নিচ্ছে। রোজই মারপিট হচ্ছে—বেগারীরা গ্রেপ্তার হচ্ছে—এদের উপর হরেক রকমের জুলুম হচ্ছে। কিন্তু আগুন ছড়িয়ে পড়ছে আর বেগারীরা শার্দুলে পরিণত হয়ে চলেছে। কয়েকটি জায়গায় বেগারীরা জমিদারের ইচ্ছা ব্যতিরেকেই জমি চাষ শুরু করে দিয়েছে এবং এই সূত্রেই নাগিশুরকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটকে রাখা হয়েছে।

এসব কথাবার্তা শুনে রাওয়ের খুব আশ্চর্য ঠেকলো। খুশিও হোল। একদিক থেকে ওর এ কথায় বিশ্বাস হচ্ছিল না যে জঙ্গলের বাসিন্দা, গোষ্ঠী জীবনে পালিত কোয়ারাও এইভাবে নিজেদের বাহাদুর প্রমাণ করতে পারে। হাজারো বছরের গোলামীর শিকল কেটে মুহূর্তের মধ্যে মানুষে পরিণত হতে পারে।

নাগিশুর জানালো, কোয়ারাই এই লড়াইয়ে সবচেয়ে আগে রয়েছে। "তুমি ওদের জমায়েত দেখলে অবাক হয়ে যাবে। আর আমাদের গোয়ালারাও তোমাদের বেগারীদেরও পুরোধা হয়ে গেছে। আমাদের গোয়ালাদের তো তুমি জান।" নাগিশুর হাসলো। হাসতে হাসতে ও নিজের মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিল। তারপর ওর চেহাবা রীতিমত খুশীতে ভরে উঠলো।

"কি ব্যাপার?" রাও জিজ্ঞাসা করলো।

নাগিশুর নিজের মাথা নীচু করে কপাল থেকে শুরু করে মাথার তালু পর্যন্ত প্রসারিত একটা চিহ্ন দেখালো। একটা গভীর ডোরাকাটা চিহ্ন। যেন কিসে চামড়াটা পুড়িয়ে দিয়েছে। আর রাও দেখলো যে এই ডোরাকাটা চিহ্ন বরাবর একগাছা চুলও নেই।

"এটা কি করে হোল?" রাও বড় উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলো। "আমাকে যখন ধরে নিয়ে যাওয়া হযেছিল"—নাগিশুব ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলো, "তখন আমাকে জমিদারের আস্তাবলে বন্ধ করে অন্য সকলের কাছ থেকে আলাদা করে রাখা হলো। দুদিন কিছুই খেতে দেয়নি, মারপিটও করলো। কিন্তু আমি আমার সাথীদের নাম বলিনি। তাবপর ওবা আমার মাথার চুল পুড়িয়ে দিলো। আর লোহার একটা ডাণ্ডা দিয়ে আমার চামড়াটা উল্টে দিল। ... আর হাসতে হাসতে বলছিলো, "আমরা তোমার মাথায় এই মস্কো রোড তৈরী করছি ; এখান থেকে তুমি সোজাসুজি মস্কো পৌঁছে যাবে, বুঝেছ?" "কিন্তু আমি আর কি বুঝবো? ব্যথায় তো কাতর হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।" নাগিশুর অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। রঘু রাও কিছু বলতে পারলো না। শেযে নাগিশুর নিজের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে খুশি হয়ে রাওকে জিজ্ঞাসা করলো, "ভাইয়া, মস্কো কোথায়?"

"তুমি জান না?"

নাগিশুর মাথা নেড়ে বললো, "না ভাইয়া।"

"মস্কো একটা শহর।" রাও থেমে বললো, "আর মস্কো একটা খেয়ালও বটে।"

নাগিশুর কিছুই বুঝলো না। সে হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "আমি লেখাপড়া জানিনে, আমি তো জঙ্গলের গোয়ালা। আমি এইটুকুই জানি যে আমার জীবন—আর আমারই বা কেন—আমার বাবার বাবাও জন্মজন্মান্তরে কখনো জমি দেখেনি। আর আজ যখন আমাদের জমি পাওয়ার আশা হয়েছে তখন জীবন থাকতে এ আশাটা ছাড়ি কি করে?"

রঘু রাও বললো, "এ আশার নামই মস্কো।"

নাগিশুর দৃঢ়কণ্ঠে বললো, "যদি তাই-ই হয়, ওরা যদি চায় তো শুধু আমার মাথা তো দূরের কথা গোটা শরীরটাতেই মস্কো রোড বানিয়ে দিক। এই আকাঙ্ক্ষা আমি কিছুতেই ছাড়বো না।" রাও নাগিশুরের হাতখানা সজোরে চেপে ধরে বলতে লাগল, "জেল থেকে বেরিয়ে আমি তোমার সাথে আমাদের গাঁয়ে ফিরে যাব।"

॥ ছয় ॥

কিন্তু যেদিন রাও খালাস পেল, সেদিন নাগিশুর পেলোনা। ওর আরও পনেরো দিন জেল খাটতে বাকী ছিল। তাই রাওকে একলাই নিজের গাঁয়ে যেতে হলো। জেল গেটে মকবুল ও অন্যান্য সাথীরা ওকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিল। রাও যখন মকবুলকে বললো, নিজের গাঁয়ে যেতে চায় তখন মকবুল আপত্তি করল না। তার নিজের চিন্তাও ছিলো এই যে, রাও-এর নিজের গাঁয়ে ফিরে গিয়ে কিষাণ আন্দোলন পরিচালনা করা দরকার। অবস্থা খুব কাহিল হয়ে পড়েছিল। মকবুল বলল, "কিষাণদের প্রচণ্ড আন্দোলন এখন আর নিজামশাহীর পুলিশও দাবিয়ে দিতে পারছে না, তাই নিজামশাহী পুলিশ ও রাজাকার সেনারা মিলে জগন্নাথ রেড্ডীর এলাকায় কিষাণদের কচুকাটা করার চেষ্টা করছে।"

"কিন্তু" — রঘু রাও জিজ্ঞাসা করলো—"এই জগন্নাথ রেড্ডী তো হিন্দু, আর রাজাকারদের জমায়েত তো মুসলমানী। এই দুয়ে মিল হোল কি করে?"

মকবুল বললো, "মুনাফা আর জুলুমের কোন ধর্ম নেই ; আর আমাদের দেশের দস্তুরও তো এই, স্বার্থান্বেষীদের শক্তি পরাজিত হতে থাকলে দাঙ্গাবাজীর সাহায্য নেয়।"

চলতে চলতে মকবুল রাওকে কয়েকটি বিষয় বলে দিলো। যাওয়ার পথে থেমে ও লোকদের সাথে মিলতে পারবে, যাদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে পুরোপুরি জানে। ধন্যবাদ জানিয়ে, মকবুল ও অন্যান্য সাথীদের আলিঙ্গন করে রঘু রাও নিজের গাঁয়ের পথে রওনা হয়ে গেল।

যতই রাও হায়দরাবাদ থেকে দূরে গাঁয়ের দিকে এগুতে লাগলো ততই সমাজের বিশৃঙ্খল অবস্থা ও দুঃখ-কষ্টের চিহ্ন দেখতে লাগলো। প্রথমটায় ও কিষাণদের কাজ করতে দেখেছিলো। কিন্তু হায়দরাবাদ থেকে ক্রমশ দূরে যেতে যেতে ওর সামনে প্রসারিত দৃশ্যপটে মানুষের মনোবলের অভাব দেখা যেতে লাগলো। নিম গাছ, পিপুল গাছ, বাজরার ক্ষেত, বাবুল গাছে বিস্তৃত পরগাছা দেখা গেল। অনেক জায়গায় উঁচু রাস্তার উপর একটার উপর আরেকটা কালো পাথর এলোমেলো সাজান রয়েছে, যেন দৈত্য-দানবশিশুরা খেলার সময় একটার পর আরেকটা পাথর রেখে দিয়েছে। এসব ওর জানা টুকরো টুকরো ছবি। কিন্তু যারা বাজরার ক্ষেত বুনেছে, যারা চষা জায়গায় ফসল ফলিয়েছে, যারা কুয়া খুঁড়েছে, আর গাঁ ও ক্ষেতের মাঝখানে পায়ে চলা রাস্তার পত্তন করেছে অর্থাৎ সেই সব লোক যাদের ইচ্ছায় ও শক্তিতে অবস্থার বদল হয়েছে ও রূপান্তর ঘটেছে তারাই উধাও। ছবির বাকি সব একই রকম। সেই রং, সেই অবস্থা যা ওর জীবনে ছোটবেলা থেকে তৈরী হয়ে রয়েছে। কিন্তু তবুও না জানি কেন আজ প্রত্যেকটি জিনিস যেন অগভীর দেখাচ্ছে। মনে হয় যেন ছবিটির কেন্দ্রস্থলে কেউ ছিদ্র করে দিয়েছে। বারংবার রাও-এর মন এদের উপর পড়ছিল এবং আবার ঘুরে ফিরে আশে-পাশে কি একটা জিনিষ সন্ধান করে ফিরছিল।

মৌজা করিমনগরে ইয়েল্লা রেড্ডীর সঙ্গে ওর দেখা করার কথা। কিন্তু গাঁয়ের কাছে আসতেই ও সারা গাঁ খানা অগ্নিদগ্ধ দেখলো। পঞ্চাশ-ষাট ঘর সবই ভস্মীভূত।

যেগুলো খড় ও তালপাতার ছাউনি ছিল সেগুলো তো সবই ছাই হয়ে গিয়েছে। কেবলমাত্র কয়েকখানা ঘরের মাটির দেওয়ালটা শুধু খাড়া রয়েছে। ইয়েল্লা রেড্ডীর একতলা বাড়ীখানা খারাপ মাটি দিয়ে তৈরী, কিন্তু বাড়ীখানার অবস্থা অন্য বাড়ীর চেয়ে ভাল, কেননা গাঁয়ের অন্যদের চেয়ে তার অবস্থা ভাল ছিল। এই বাড়ীর শুধু দেওয়ালগুলোই খাড়া ছিল। বাড়ীর দরজা খোলা। প্রাঙ্গনে শাহাবাদী পাথরের মেঝে—আর কোণে দুখানা বড় বড় পাথর। একটা জলের লোটা পড়ে রয়েছে। প্রাঙ্গনের মাঝখানে ইয়েল্লা রেড্ডীর মৃতদেহ। দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন। দেয়াল থেকে ধোঁয়া উঠছে। ইয়েল্লা রেড্ডীর চোখের পাতা খোলা। রাও যতক্ষণ প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়েছিলো ও অবাক বিস্ময়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর অত্যন্ত কষ্ট করে সে তার নিজের চোখ সেখান থেকে সরিয়ে নিল। আর মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাও মকবুলের কাছ থেকে ইয়েল্লা রেড্ডীর নামে একখানা আবেদনপত্র নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তার আর কোন আবশ্যক রইলো না। ইয়েল্লা রেড্ডী নিজেই এই হুকুমনামার প্রতিটি অক্ষর পালন করে দেখিয়ে দিয়েছে। গাঁ থেকে বেরিয়ে ও বুধন জঙ্গলের দিকে চললো। রাস্তায় বাজরার ক্ষেত অগ্নিদগ্ধ দেখা গেল। একটি এরণ্ড চারার পাশে একটি যুবতী মেয়ের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। মৃতদেহটি একটা শিয়ালে খাচ্ছে। শিয়ালটি ওর আসার শব্দ শুনে জোরে লাফিয়ে ছুটে পালালো এবং পাথরগুলো গড়িয়ে দিয়ে টিলার অপর পাশে চলে গেল, রাও লাশটা টেনে হিঁচড়ে মাঠের একটা আলের পাশে নিয়ে গিয়ে রাখলো। এবং আলটা ভেঙ্গে তার মাটি ও পাথর দিয়ে লাশটাকে কবর দিয়ে পা ঝেড়ে এগিয়ে চললো। ওর চোখ যেন পুড়ে যাচ্ছে, গলাটায় খচ্ খচ্ করে কাঁটা বিঁধছে এবং ভয়ানক তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে। এ সময়ে সে জলের বদলে রক্তও খেতে পারে।

বুধন জঙ্গলের ঘনছায়ায় ওর দেহের উষ্ণতা কিছু কম হোল। ছায়া ঘেরা গাছে পাখী ডাকছে। ওর নিজের চলার শব্দ অথবা ঝোপঝাড়ে খরগোসের খড়-খড় করে চলাফেরা—এছাড়া চারিদিকেই নিস্তব্ধতা। একটা নতুন অস্পষ্ট পায়ে চলা পথের রেখা ধরে ও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলো। এই নিস্তব্ধতায় রাও উৎকণ্ঠ হয়ে উঠলো। সতর্কও রইলো। আবার কিছুটা আশাও ছিল যে সুযোগ সন্ধান যদি মেলে তো এইখানেই মিলবে। কখনও কখনও চলতে চলতে ওর মনে হচ্ছিল যে, গাছের পেছন থেকে যেন কয়েক জোড়া চোখ ওকে চলতে দেখছে। যেন কোন একটা হাত ওর পিঠে ছোরা মারার জন্য ওর পিছন দিকে উঠে দাঁড়ালো, স্রেফ, ঘাবড়ে যাওয়া এ দৃষ্টিভ্রম। কিন্তু এখানে তো কেউ ছিলো না—জঙ্গলে ও নিতান্ত একা।

একটা বড় টিলার উপর ঝোপঝাড়ে ঘরা জায়গা। ও সেই টিলার কাছ দিয়ে যেতেই কে হাঁকলো, "দাঁড়াও"।

রাও দাঁড়ালো।

টিলাটার উপরে ও একজন কালো বুড়ী ও পাথরের মুর্তির মত একটি স্ত্রীলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। মাথায় সাদা চুল, হাতে বন্দুক। উঁচু লম্বা চেহারা। স্ত্রীলোকটি বন্দুক সোজা করে ধরলো।

রাও তাকে চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠলো, "কাশম্মা।"

স্ত্রীলোকটি বন্দুকের নল নীচু করে মাথায় হাত দিয়ে লোকটিকে চেনার চেষ্টা করতে লাগলো।

রাও চীৎকার করে বললো—আমি রঘু রাও, আমি রঘু রাও, মকবুলের সাথী।...

স্ত্রীলোকটি টিলার কাছ থেকে নীচের দিকে দৌড়াতে লাগলো। ওর পিছু পিছু তিন চারজন পুরুষ টিলাটার পিছন থেকে বেরিয়ে দ্রুত চলে আসছে।

রাও-এর একেবারে কাছে এসে কাশম্মা ওকে চিনতে পারলো, সে ওর মাথায় হাত রেখে বলল, "আরে, খুব রোগা হয়ে গেছ যে! তোমাকে বেটা আমি তো চিনতেই পারিনি।"

"জেল কি কখনো মায়ের ঘর হয় মা?"

"কবে ছাড়া পেয়েছো?"

"পরশু।"

কাশম্মা জিজ্ঞাসা করলো, "মকবুল ভালো আছে তো?"

কাশম্মার স্বরে বড় স্নেহ, গভীর মমতা ও অকৃত্রিম সুর। রাও-এর গলায় কি যেন একটা আটকে গেল। এই স্ত্রীলোকটি ইয়েল্লা রেড্ডীর মা ; যার মৃতদেহ করিমনগরে পড়ে থাকতে দেখে এসেছে। এই মা রাও-এর কুশল জিজ্ঞাসা করছে। জিজ্ঞাসা করছে মকবুলের কথা, কিন্তু তার ছেলে, একমাত্র ছেলে, যে কিষানের ন্যায্য দাবী নিয়ে লড়তে গিয়ে মারা গেছে, তার কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করছে না।

এইজন্য রাও পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করলো, "এ ঘটনাটা কবে ঘটেছে?" কাশম্মা কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, "আমাদের গাঁয়ের এ ঘটনা কোন নতুন নয়। যেখানে যেখানে কিষান সভা জায়গীরদার ও দেশমুখদের অংশ দিতে অস্বীকার করেছে, সেখানেই এরকম ঘটেছে। হয়তো এর চেয়েও খারাপ। আমাদের গাঁয়ে হামলাটা হয়েছিলো রাতে। রাতের আঁধারে গাঁ খানা পুড়িয়ে দিয়ে গেছে—দিনে হলে একটু কঠিন হোত। আবার রাতের আঁধার বলেই অনেক কিষান গাঁ থেকে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে পেরেছে। সে সব লোক এখন আমাদের সাথে আছে।"

রাও কাশম্মার চেহারাখানার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। সেখানে ক্ষোভের চিহ্নমাত্র নেই। নেই কোন ভয়। সে বেশ স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলছে। ইয়েল্লা রেড্ডীর মা নতুন মা হয়ে গেছে। তার এই শান্তচিত্ত ও ক্ষোভশূণ্যতার কয়েকটি কাহিনীও শুনেছে। কখনো কখনো মা নিজে ইয়েল্লা রেড্ডীর বিরুদ্ধেও উচ্চকণ্ঠে বলেছে। কেননা, ইয়েল্লা রেড্ডী ছিল একজন অবস্থাপন্ন কৃষক এবং কয়েকটি বিষয়ে ও অবস্থাটা বুঝতে চাইতো না। এই রকম অবস্থায় ওর মা-ই ওকে সঠিক রাস্তায় চালিত করতো। রাও কাশম্মার চেহারাটা গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো। তেলেগু উপকথার একজন সাধ্বী স্ত্রীলোকের কথা ওর মনে পড়লো। এই উপকথায় সেই-ই সাধ্বী স্ত্রী—কর্মে দাসী, পরামর্শ দিতে স্ত্রী, প্রেমে রম্ভা, খেতে দিতে মা, আর রণে সিপাহী হতে পারে। রাও চিন্তা করলো, এটা কোন নতুন উপকথার ব্যাপার। আর অন্ধ্রের গ্রামে গ্রামান্তরে কাশম্মার মত মা পুরোনো উপকথাকে বদলে নতুন উপকথার জন্ম দিয়ে চলেছে।

কাশম্মা বললো, "এখন কি উপায়, কিষানরা তো ভয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে।"

রাও বললো, 'মকবুলও বলেছে, অন্যান্য সাথীদেরও বক্তব্য এই, এখন খাজনা দেওযা বন্ধ করা ও জায়গীরদারী ট্যাক্স না দেওয়ার অবস্থাটা চলে গেছে। এখন কিষাণ সভাকে সোজাসুজি জমি কিষানদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দিতে হবে। যাদের জমি নেই তারা এরকম অবস্থায় জঙ্গলে পালিয়ে এসে আশ্রয় না নিয়ে করবে কি? গাঁয়ে ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করার মত কি আছে? এদের গাঁয়ে জমি দাও।'

"ঠিক আছে"—কাশম্মার পাশে দাঁড়িয়ে একটা লোক বললো। লোকটি চেহারায় জঙ্গলের কোয়া বলে রাও-এর মনে হলো। জঙ্গলের বাসিন্দাদের ও আমাদের কোয়াদের জমি পাওয়া দরকাব। তবেই গাঁযের ও জঙ্গলের রাখীবন্ধনটি খুব মজবুত হবে।

"ঠিক আছে", বাও বললো। "অন্ধ্রেব জংলীরাও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিছু কম লড়াই করেনি। জংলীগোষ্ঠীর সর্দার আলুরি সীতারাম রাজুব সংগ্রামের কথা অন্ধ্রেব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত জানে। আজও পর্যন্ত লোকে বলে যেখানে অন্ধ্রের জঙ্গল আছে, সেখানেই আলুরি সীতারাম রাজু আজও বেঁচে আছেন এবং বাহাদুর কোয়াদের সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সংগঠিত করছেন।" কাশম্মার সাথীদের মধ্যে একজন ছিল চামার, দ্বিতীয়টি ক্ষেতমজুর। ওরা দুজনেই বলে উঠলো, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা। জমি আমাদের হয়ে গেলে আমরা দেখে নেবো কোন মায়ের দুলাল কিষানদের হাত থেকে জমি ছিনিয়ে নেয়। জমি তো গাঁয়ের চামার ও ক্ষেমজুররাও নেবে।"

রাও বললো, "ওরাই সবার আগে নেবে। জমিতে যারা মেহনত করে জমি তো তাদেরই।"

কাশম্মা কিছুক্ষণের জন্য চিন্তা করলো। তারপর ঘুরে পিছনে দাঁড়ানো লোকটাকে বললো, "রামুলু, জঙ্গলের সব কিষানদের খবর দিয়ে দাও, আমরা করিমনগর ফিরে যাবো। ওখানে কিষানদের জমি ভাগ করে দেওয়া হবে।" রামুলু ছুটে চলে গেল। চামার ও ক্ষেতমজুরটিও খবর দেয়ার জন্য পিছু পিছু চলে গেল।

রঘু রাও বললো, "মা আমার তেষ্টা পেয়েছে।" কাশম্মা টিলার পিছন থেকে একটা মাটির ঢেলা তুলে নিয়ে এলো, রাও সেটায় মুখ লাগিয়ে চুষে আধখানা করে দিলো। জহ খাওয়ার পর রাও বললো, "মা, তুমি এসব করে নেবে, না তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমি এখানে রয়ে যাবো?

কাশম্মা বল্লো, "না রঘু তুমি যাও, আমি সব করে নেবো।" রাও চলতে চলতে দেখলো যে, কাশম্মা টিলার ওপর বসে হাঁটুতে বন্দুক রেখে ওর দিকে একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। রাও কিন্তু এটা নিয়ে বেশী চিন্তা না করে রাস্তা ধরে এগিয়ে চল্লো। হঠাৎ কাশম্মা ওকে পিছন থেকে ডাকলো, "রাও শোন।"

রাও পিছন ফিরে তাকালো। কাশম্মা কিন্তু নিশ্চুপ। অদ্ভুতচোখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ওখানে বসে বসেই আস্তে জিজ্ঞাসা করলো, "ওর চোখ তখন পর্যন্ত খোলা ছিল?" রাও-এর মাথা ঘুরে গেল। ওর মানসপটে এলো কতকগুলো অগ্নিদগ্ধ দেওয়াল। শাহাবাদী পাথরের মেঝে, মেঝের উপর একটা

লাশ—দেহ একদিকে, মাথা আর একদিকে, দুটো চোখ নিশ্চল ও প্রস্তরীভূত একটা প্রশ্নে পরিণত হয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে—ও মুখে কিছু বলতে পারলো না। ধীরে ধীরে মাথাটা নামিয়ে নিলো।

কাশম্মা কিছুক্ষণ চিন্তান্বিতভাবে তাকিয়ে রইলো। তারপর তাঁর সাদা মাথাটা নুয়ে পড়ছে। অশ্রুধারা চোখ থেকে গড়িয়ে বন্দুকের উপর নিঃশব্দে ঝরতে লাগলো।

রাও তার মনের ইচ্ছার রাশ টেনে ধরলো। আর কাশম্মাকে একলা রেখে নিজের রাস্তায় এগিয়ে চললো। তার মানে এই নয় যে ও মানুষ নয়, এটাও নয় যে ওর চোখে জল নেই ; আবার এটাও নয় যে ওর সাথী ইয়েল্লা রেড্ডীর প্রতি ওর কোন স্নেহ প্রীতি ছিল না। এসব থাকা সত্ত্বেও সে কিন্তু নিজের রাস্তা ধরে চলে গেল। তখন ওর মনে শুধু দুটো চিন্তা ছিল—একটা হোল, মানুষের প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথ কত দুঃখকর হয় ; কত তীব্র আঘাত, কত অশ্রুধারা, কত জ্বালাময় হৃদয়ে মানুষকে এক পা, আধ পা, সিকি পা, এমন কি সিকিরও অর্ধেক পা এগুতে হয়। অন্যটি হোল, কাশম্মা একজন মা। তাঁর বেদনাক্লিষ্ট মমতা নিশ্চয়ই একটা পথ খুঁজে নেবে। একটা শিশুসন্তান মারা গেলে মাতৃক্রোড় এতটা সম্প্রসারিত হয় যে হাজার হাজার সন্তান মায়ের সেই কোলে আশ্রয় নেবার জন্য একত্রিত হয়। এই জন্যই কাশম্মাকে নিয়ে রাও-এর কোন ভয় ছিল না। এই জন্যই সে কাশম্মার অশ্রু নিঃশব্দে বয়ে যেতে দিয়ে নিজের রাস্তায় এগিয়ে গেল।

অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে রাও-এর মনে একটা ভাব এলো। আর এই ফাঁসি সেলে সেটা স্মরণ করে ওর মন খুশিতে ভরে উঠলো। কেননা এই ভাবটি আসতেই এবং এর উপর ধ্যান করেই রাও বহু অশ্রুকে বদলে নিতে পেরেছে। আর সে খেয়ালটি এই যে ও কেন একটি নতুন চিন্তাকে কাজে পরিণত করবে না। যাহোক, বেলিমপল্লীর গাঁয়ে ও নিজে জমি বাঁটোয়ারার কাজে অংশ নিলো। ও নিজের চোখে গৃহহীন জমিহীন কিষাণের প্রবল উৎসাহের পরিণতি দেখলো। পুড়ে যাওয়া ঘর আবার বাসযোগ্য হয়ে উঠলো। গাঁয়ের আবর্জনা দূর করার জন্য পয়ঃপ্রণালী খনন করা হোতে লাগলো। জমিতে হলকর্ষণ চললো। আর কিষানের বুক এত উঁচু হয়ে উঠলো যে অত্যাচারীরা ভয় পেয়ে গেল। যারা কাল ছিল অত্যাচারী, বিচারক, আর শতাব্দী ধরে মালিক, তারা গাঁ থেকে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে বড় বড় শহরে আশ্রয় নিতে লাগলো। বেলীমপল্লীর কিষানদের দশ পনেরো জনের একটা দহ্ রাও-এর সাথে ছিল যারা অপরাপর গাঁয়ে জমি বাঁটোয়ারার কাজে সহায়তা করতে লাগলো। এভাবে যে সব গাঁয়ে রাও যেতে লাগলো সেসব গাঁয়ে কৃষকদের বিশাল জমায়েত হতে থাকলো—একটা তরঙ্গ, যাকে থামাতে চেষ্টা করলেও থামে না—একটা বন্যা দুর্মর গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে ; যে পা আগে সিকিরও অর্ধেক চলতো, সে পা এখন দানবের শক্তিতে ধাক্কা দিতে শুরু করেছে। এই বন্যার পা ছিল মাটিতে, আর মাথা ছিল আকাশে। এই গীতের গুঞ্জনধ্বনি ছিল সর্বত্র। আগে কিষান লাঙ্গল চালাতো মাটিতে, আর আজ সে লাঙ্গল চালিয়েছে তার ভাগ্যের উপর। আশমান আজ তার পকেটে। আজ গড়ের খিলানগুলি একে একে ভেঙে পড়েছে।

বেলিমপল্লী থেকে পাতিপাডু, আর পাতিপাডু থেকে শ্রীপুরম পর্যন্ত একটা খুশীর

আলোড়ন চলেছে। এর নজির, আজ পর্যন্ত কখনো দেখা যায়নি। ওর মনে হোল জেলখানার প্রতিটি কোণ যেন আজও সেই খুশির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ; সেই সাদা ফেনার ফাঁপা ঢেউ-এর তুফান যেন ফাঁসি সেলের মধ্যে ঢুকেছে—সেটা ওকে দোদুল্যমান তরঙ্গগুলির উপর বসিয়ে শ্রীপুরমে নিয়ে গেছে।

রঘু রাও অতীতের দিকে ফিরে পাতিপাড়ু থেকে শ্রীপুরম পর্যন্ত প্রসারিত কিষানদের এই লম্বা মিছিলকে দেখলো। আগে কোয়া স্বেচ্ছা-সেবকদের দল। তার পিছনে গোয়ালাদের দল। আর তার পিছনে বেগারীদের সার। তারপর নিশানওয়ালা, শংখবাদক, ঢুলি। তারপর মিছিলের মধ্যে একটা রঙীন সুন্দর বন্ধ করা পাল্কী। তার দুদিকে লাল রেশমের পর্দা পৎ-পৎ করে উড়ছে। এই বন্ধ পাল্কীটার মধ্যে ছিল কাগজপত্র। কাগজপত্রগুলিতে জমি বন্ধক দেওয়া ছিল ; বন্ধক দেওয়া ছিল জীবন, ইজ্জত। শতাব্দী ধরে জমানো এইসব কাগজপত্র অত্যাচারে প্রপীড়িত কিষানরা জমিদারদের কম্পমান হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। কয়েকটি জায়গায় এগুলো ছিনিয়ে নেওয়ারও দরকার হয়নি। জমিদার নিজেই তার গড়, ঘর, দরজা, তার অত্যাচারের নিশানা খালি ফেলে রেখেই পালিয়ে গিয়েছে। এই পাল্কীটির পিছনে খোলা একটি পাল্কীতে লোকে রাওকে বয়ে নিয়ে চলেছে। বলতে গেলে দৌড়েই চলেছে। রাও হেঁটে যাওয়ার জন্য রীতিমত জিদ ধরেছিল। কিন্তু লোকে সেটা মানেনি। ওর পাল্কীর পিছনে ছিল নাগিশুরের পাল্কী। নাগিশুর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎমানসে পাতিপাড়ুতে এসেছিলো। এদের পিছনে ছিল কিষানদের একটা বড় জমায়েত, ঢুলি, নর্তক, আর ছিল খুশীতে গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দেওয়ার দল। বালক, বৃদ্ধ, কিষান, স্ত্রীলোক, ছেলে, অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগী—সবাই নিজ নিজ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। আজ কারও ঘরে কুলুপ নেই, আজ কোন চোর, কোন দোষী নেই। আজ সবাই জমির মালিক।

ধীরে ধীরে পৎ-পৎ করে ওড়া রেশমের পরদাওয়ালা বন্ধ পাল্কীখানি জমিদারের গড়ের দরজায় এসে পৌঁছলো। জনতা পাল্কীখানি গড়ের অন্দরমহলে নিয়ে নামিয়ে রাখলো... গড়ের অন্দরমহলে গাঁয়ের স্ত্রীলোকেরা আগেই গিয়ে জড়ো হয়েছিলো। তারা পাল্কীখানি দীপ দিয়ে বরণ করলো, ফুল ছড়ালো। পয়সা ছুঁড়লো এবং স্বাগত জানিয়ে ভজন গাইলো। রাও এইসব কাণ্ডকারখানা দেখতেই লাগলো। কয়েকবার ও ভেবেছিলো ওর গাঁয়ে যখন বিপ্লব গিয়ে পৌঁছুবে তখন ব্যাপারখানা কি রকম দাঁড়াবে। ওর গাঁয়ে বিপ্লব আসার ধরনটা ও ভেবেছে হাজার রকমে। কখনো ভেবেছে সেটা হবে এক ধাবমান তুফান, কখনো বা ভেবেছে যে সেটা হবে বন্যার গতিবেগের মত, জোর কদমে চলা সৈন্যদের মত—আবার কখনো বা ভেবেছে যে লাখ লাখ সঙ্গিনের মাথায় অজস্র মৃতদেহ নিয়ে আসবে সে বিপ্লব। কিন্তু কল্পনায় এ ছবি ও কখনো দেখেনি যে ওর গাঁয়ে যখন বিপ্লব আসবে তখন সেটি আসবে একটি লজ্জাবতী কনের মত। লালপর্দার আড়ালে একটি বন্ধ পাল্কীতে চড়ে, কেউ তাকে দীপ দিয়ে বরণ করবে, শাঁখ বাজাবে আর স্ত্রীলোকেরা ভজন গাইবে—আর বাহাদুর কিষানরা বন্দুকগুলোর ওপর সিঁদুরের ফোঁটা কাটবে।

তারপর রাও ভাবলো এভাবে চিন্তা করাটাই ছিল ভুল। হিন্দুস্থানের বিপ্লব তো

হিন্দুস্থানী ঢঙেই আসবে। এ বিপ্লব আসবে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আমাদের মানসিক গড়ন, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের দেশের সঙ্গীত ও তার সুগন্ধের রঙে রাঙিয়ে। তার রূপটি হবে না বিদেশী, তার চালচলন হবে না আমাদের চেয়ে পৃথক। সেটি হবে এক অপূর্ব নতুন, ভিন্ন রকমের, এমন একটি জিনিষ যা আগে হয়নি, কখনো কেউ শোনেনি, কখনো কেউ দেখেনি। এমনকি তার তত্ত্বও হবে আপাদমস্তক 'ভারতীয়। আর সেটি চিনে বলতে পাববো যে, "হ্যাঁ, এ বিপ্লব আমাদেরই, এ বিপ্লব আমাদেরই।"

ঠিক এমনি সময়ে গাঁয়ের বৃদ্ধ নারায়ণ রঘু রাও-এর হাতে আমিনের জমি জরিপের চেনটি দিয়ে বললো, "বাছা জমি বাঁটোয়ারা শুরু করো।" রাও জরিপের চেনটি হাতে নিয়ে বললো, "এ সময়ে গাঁয়ের আমিনের আসা উচিত ছিল। কোথায় শ্রীরামাপুন্তলু?"

এতে খুব জোরে একটা হাসির রোল উপচে পড়লো। কে একজন বললো, "সে তো ছিল জমিদারের আমিন। আমাদের গরিব কিষানদের আমিন তো সে ছিল না কোনদিনই ; তাই সে জমিদারের সাথেই চলে গেছে।"

"আর কোথায় সেই গ্রাম্য পুরোহিত শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী? আজকের এই শুভ মুহূর্তে তার আশীর্বাদ একান্ত দরকারী।" আবার একটা উচ্চ হাসির রোল উঠলো। নাগিশুব বললো, "এটা জমিদারের রাজতিলক হলে পুরুতমশাই নিশ্চয়ই হাজির থাকতেন, কিন্তু আজ যে কিষানের রাজতিলক!" অনেক কৃষক একেবারে অধীর হয়ে উঠে বললো, "রাও শিগ্গির করো। জমি বাঁটোয়ারার ব্যাপারে কোন আমিন পুরুতের আশায় আমরা বসে থাকতে পারিনে। আমরা কয়েক শতাব্দী ধরে আজকের দিনটির অপেক্ষা করছি। রাও চেনটি হাতে নিয়ে বললো, 'বাজাও তবে ঢোল কাঁসি। চলো সবাই ক্ষেতের দিকে। আজ শ্রীপুরমের কৃষকদের জয়যাত্রা শুরু হলো।"

রাও পা বাড়াতেই ঢোল বাজানো শুরু হয়ে গেল। কিষানরা খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠলো। বৃদ্ধরা আনন্দে হাসিকান্না শুরু করে দিলো। এমনিতর খুশী আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি। স্ত্রীলোকেরা জয়যাত্রার গান শুরু করে দিলো। কিষানরা এই গানে তাদের স্বর দিলো মিশিয়ে, গানের গভীর গুঞ্জনে সমগ্র আকাশে গুঞ্জরিত হতে লাগলো।

কাপুরুষতা ও ক্ষুদ্র হৃদয়
জানেনা কখনো অন্ধ্র-তনয়
অন্ধ্রজাতির পরীক্ষা আজ
ওঠ, এস সবে, হও সামিল
জয়যাত্রার চলে মিছিল।

॥ সাত ॥

রঘু রাও চোখের কোণ থেকে ধীরে ধীরে অশ্রু মুছে নিলো। যে দিনটিতে জমি মিললো, আর তার আগের যে চারটি দিন শ্রীপুরমে কৃষকদের জমি ভাগ করে দেওয়ার কাজ চলছিল সে দিনগুলি তার জীবনের সবচেয়ে মহৎ দিন। জমি বাঁটোয়ারায়

ছোটখাটো ঝগড়াও হয়েছিলো। কেউ চেয়েছিলো এ অংশ। আবার কেউ চেয়েছিলো অন্য। আবার কেউ তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী প্রত্যাশী, কেউ আবার যে জমি তার ছিল তার চেয়ে কম দেখিয়েছিল। কিন্তু গাঁয়ের প্রবীণতম ব্যক্তি ও পঞ্চায়েতের যারা প্রতিটি ইঞ্চি জমির সাথে পরিচিত, তাদের সহায়তায় খুব সহজেই আপোষ মীমাংসা করে ফেলা গেল।

এই সময়ে রাওয়ের বাবা ভেরাইয়ার কার্যকলাপের কথা তার মনে পড়ে গেল। রাও মনে মনে ঠিক করেছিল যে গাঁয়ের সব কিষান জমি পাবার পর যা উদ্বৃত্ত থাকবে তার থেকে তার বাবা সকলের শেষে জমি পাবে। কেননা, সে রঘু রাওয়ের বাবা।

রাওয়ের বাবা কিন্তু এ কথার অর্থ বুঝতে পারলো না। সেইজন্য বাঁটোয়ারার সময় সে বারবার রাওয়ের সামনে এসে অধৈর্য হয়ে বালকোচিত জেদ নিয়ে নিজের জমির দাবি জানাতে লাগলো। আর ও আস্তে আস্তে মুচকি হেসে জরিপের চেনটা নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো। পুত্রের এইরূপ ঔদাসীন্যে হতবুদ্ধি ভেরাইয়া অন্যান্য কৃষকদের কাছে ওর বিরুদ্ধে নালিশ করতে লাগলো। কয়েকবার দু'চারজন কৃষক বললো ও যেন নিজের জমিটা আগেই বেছে নেয়। তারা ওর বাবাকে গাঁয়ের সেরা জমির একটুকরো দেবার জন্য তৈরীও ছিল। রাও কিন্তু হেসে সে কথা উড়িয়ে দিলো।

ওর ভাগে শেষ পর্যন্ত জমি মিলবে কিনা সে বিষয়ে ভেরাইয়া যখন সন্দিহান হয়ে উঠলো, সেই সময়ে তার জমি মিললো। আর ওর জন্যে, রাওয়ের ভাবী পত্নী ও ভাবী সন্তানদের জন্য যত জমির আশা করেছিলো, রাওয়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাঁয়ের পঞ্চায়েৎ তার চেয়ে বেশী জমি দিয়ে দিল।

ভেরাইয়া খুশিতে নাচতে নাচতে আনন্দে দৌড়ে নিজের ক্ষেতের মধ্যে চলে গেল। সে নিজের ক্ষেতের ঝুরঝুরে মাটি উঠিয়ে নিয়ে ছড়িয়ে দিতে দিতে বললো, "এ জমি আমার, এ জমি আমার।"

তারপর সে দৌড়ে নিজের ছেলের পাশে এসে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো।

পঞ্চম দিনে জমির শেষ টুকরোটাও যখন ভাগ হয়ে গেল, জমির প্রকৃত মালিকরাই যখন জমি পেল, এমনি সময় রাও একদিন গাঁয়ের বাইরে বেড়াতে গেল। সে সময় সন্ধে হয়ে গেছে। রাস্তার কোথাও কোথাও শুকনো পাতা হাওয়ার দমকে নড়ে উঠে চারপাশে চক্রাকারে মড়মড় করে উড়তে উড়তে আবার মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। রাও চিন্তামগ্ন হয়ে আস্তে আস্তে পায়চারি করতে লাগলো। আর আস্তে আস্তে ওর পা ওকে ভগবতী নদীর দিকে নিয়ে গেল।

পশ্চিমে শুধু একটা লালচে রেখামাত্র রয়ে গেছে। নদীর কিনারে পৌঁছে রাও একখানা কালো পাথরের উপর বসলো। তারপর আস্তে আস্তে অজস্র চিন্তার মধ্য থেকে ওর চন্দরীর কথা মনে পড়ে গেল। নীলাভ চোখ, চুলে গুছি আটকানো, লাল পাতলা ঠোঁটে দুষ্টু মুচকি হাসি।

রাও একদম বুঝতেই পারলো না চন্দরী ওর সামনে কেমন করে এসে গেল। কি করে এত তাড়াতাড়ি, এমনি হতবুদ্ধিকর ভাবে, এত জোরে বুক ধড়ফড় করার মাঝেও সে এসে হাজির হোল। রাও মনে মনে জিজ্ঞাসা করলো, চন্দরী তুমি এ সময়ে

কোথায়, কোন নদীর কিনারায়, কোন তাঁবুর বাইরে বসে আছ, কার অপেক্ষায়? তোমার বুক কি আজও পবিত্র আছে, না কোন প্রেমিক তোমাকে পেয়েছে? হঠাৎ রাওয়ের মনে হোল, ও কখনো চন্দরীকে ভুলতে পারে না। চিরকাল ও তার আশায় থাকবে, কেননা মানুষ যে প্রেমের কামনা করে অথচ পায় না, সারাজীবনভর সে তার কামনা করে। এটা কোন অদ্ভুত কথা, বড় কথা, আজগবি আকাঙ্ক্ষা নয়। আবার এমনও একটা আকাঙ্ক্ষা নয় যার জন্য মানুষ মরে যায়। কিন্তু এই কামনা মানুষ সারা জীবন ধরে করে। আর শুতে, জাগতে, হাসতে, খেলতে, নাচতে গিয়ে—সেই প্রাণ, সেই জিনিষ ও তার ঝিলিক দেখতে থাকে। না দেখলেও দেখতে থাকে। না চিন্তা করলেও চিন্তা করে। স্মরণ না করেও স্মরণ করে আর মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনের শেষ সীমানায়ও সেই চেহারার রোশনাই দেখতে থাকে। কেননা এটি মানুষের পবিত্র সুখস্মৃতি—এ স্মৃতি কখনো মন থেকে মুছে যায় না। অথচ এই মুহূর্তটির আগে রাওয়ের মনে হয়েছিলো ও চন্দরীর কথা চিরকালের মত ভুলে গেছে এবং জমির প্রেম স্ত্রীলোকের প্রেমের উপর জয়ী হয়েছে। কিন্তু এখন ও বুঝতে পারলো যে একটি প্রেম অপরটিকে নষ্ট করে না, দুটো প্রেমই পৃথক কিন্তু একে অন্যের সাথী। এ সময়ে ভগবতী নদীর সামনে চন্দরীদের তাঁবু না দেখে রাওয়ের মনে উদ্বেগ, চিন্তা ও উদাসীনতার তরঙ্গ উঠলো। সে কি করবে বুঝে উঠতে পারলো না। কেননা জমি ভাগ করে দেওয়া যায়, কিন্তু প্রেম তো ভাগ করা যায় না। জমি জরিপ করা যায় কিন্তু প্রেমের মাপ তো কোন জরিপ দিয়ে সম্ভব নয়।

যেদিন ও ক্রন্দনরতা চন্দরীর পাশ থেকে উঠে গিয়েছিলো, সে সময়ে জীবনের এ শিক্ষা তার ছিল না। সে সময়ে ও রাগের বশে চন্দরীর জীবনের অসহায়তার কথা বুঝতে পারেনি। চন্দরীদের গোষ্ঠী যাযাবর, গৃহহীন, নিঃস্ব ও জমিহীন হওয়ায় নানারকমে ওরা মালিকের গোলাম ছিল। এ অবস্থায় চন্দরীকে বেশ্যা বলা আর দুনিয়ার সমগ্র অবস্থাকে অস্বীকার করা একই কথা। হয়তো বা সে সময়ে ও নিজেই চন্দরীর চেয়ে পবিত্র ছিল না—যে চন্দরীর হৃদয়ে ছিল প্রেমের আগুন, চোখে ছিল উন্নততর জীবনের জন্য অশ্রু। হয়তো বা এই জন্যই ওর কমরেডরা প্রথমেই এই মীমাংসা করেছিল যে যারা কোয়া বা লম্বাড়ি যাযাবর, জঙ্গলে জঙ্গলে ও গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়, সবচেয়ে অনগ্রসর, এদেরও গাঁ থেকে জমি দিতে হবে। হয়তো বা এই কমরেডরা চন্দরীর মতো মেয়ের অশ্রুর মূল্য জানতো আর একথাও জানতো যে জমির প্রতি যে ভালবাসা তা মানুষের অন্য সব ভালোবাসার সৃষ্টিকারী, সঙ্গী ও সহায়ক। এইজন্যই জমি পাওয়ার পর চন্দরী আপাদমস্তক পবিত্র হয়ে যাবে। এখন হয়তো ও আর কখনই চন্দরীকে পাবে না। হয়তো বা ওর জন্য একখানা কুঁড়েও কখনো বাঁধতে সক্ষম হবে না। তার ছেলেপুলেকে হাতে তুলে নিতে পারবে না। হয়তো বা ওর নিজের জীবন ওই রেশমের মত নরম ও মোলায়েম জীবনকে ছুঁতেও পারবে না—যে রেশম ছুঁয়ে দেওয়ায় রামালু শেঠি ভরা মেলায় ওকে ভীষণ ধমকে দিয়েছিল। কিন্তু একথায় ওর বিশ্বাস ছিল যে ওদের গাঁয়ে মানুষ ও জমির মধ্যে যে সৌহার্দ্য তৈরী হয়ে উঠেছে সেটা এতই সুন্দর যে তার সৌন্দর্য রঙিন প্রকাশমান জীবনের অন্যান্য সৌহর্দ্যের সঙ্গে মিশে যাবে এবং আর কোন চন্দরীকে ভগবতী নদীর

তীরে বুকের পবিত্রতার জন্য কাঁদতে হবে না। এই আদর্শে বিশ্বাস—এই হতবুদ্ধিকর আঘাত বুকে নিয়ে ও ভগবতী নদীর কিনার থেকে উঠে গাঁয়ের দিকে ফিরে গেল।

যাহোক, চন্দরীর প্রেম তো রাওয়ের নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু জমিদারের গড়ের ব্যাপারটা হচ্ছে গোটা গাঁয়ের লোকের। এই গড়টাকে নিয়ে কি করা যায়? জমিদার পালিয়ে যাওয়ার পর গড়টি খালিই পড়ে ছিল, এই প্রথম কিষানরা জমিদারের ঘর দেখতে পেল, তার আগে তো কেবল দরজাটাই দেখতে পেত, যেখানে তাদের বেগারখাটা, খাজনা দেওয়া, জায়গীরদারি ট্যাক্স দেওয়া, জমি ক্রোক করানোর এবং কখনো কখনো জমিদারের গুণ্ডাদের দিয়ে চাবুক মারানোর জন্য ডাকিয়ে আনা হোত; কিছু কিছু লোক জমিদারের কাছারিটাও দেখেছিলো। আর মন্দ-ভাগ্য কিছু স্ত্রীলোক জমিদারের প্রমোদকাননও দেখেছে। কিন্তু এর আগে জমিদারের বড় গড়টার পিছনে বড় ঘরে, ছাদওয়ালা বারান্দা, প্রশস্ত অঙ্গন, লম্বা থাম আর মার্বেল পাথরের মেঝেওয়ালা ঘবগুলোয যে কি ছিল তা কেউ সঠিক বলতে পারতো না। প্রথম পাঁচদিন যখন কিষানরা জমি বাঁটোয়ারার কাজে লেগেছিল তখন কারো এই শয়তান গড়টার কথা মনেই পড়েনি। কিন্তু জমির সমস্যাটা মিটে যাওয়ার পর কিষানরা, তাদের স্ত্রী ও ছেলেপুলে বিশেষ করে ছেলেপুলেরা একের পর এক গড় দেখতে রওয়ানা হলো। তারা দরজায় টোকা মেরে দেখতে লাগলো। শিশুরা মার্বেল পাথরের মেঝেয় শুয়ে হাসতে লাগলো। থামগুলির আড়ালে তারা লুকোচুরি খেলছিলো এবং হাততালি দিয়ে উঁচু দেওয়ালে তাদের প্রতিধ্বনি শুনে খুশি হয়ে হাসির রোল তুলছিলো। অতি বৃদ্ধ কিষানরাও এমন হতবুদ্ধিকরভাবে অন্দরমহলটা দেখছে যে ওরা একটা আশ্চর্যজনক কোন জায়গায় ঘোরাফেরা করছে। গড়ের কোন জায়গায় কিন্তু আশ্চর্যজনক কিছু ছিল না, না ছিল কোন অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক প্রাণীর বাস। অন্ধ্রের প্রতি গাঁয়েই গড় ছিল আর তাব এক একখানা ইট তৈরী হয়েছিল কিষানদের রক্তে।

গড়ের সম্বন্ধে মীমাংসাটা সর্বপ্রথম স্ত্রীলোকেরাই করলো। তারা বললো, অন্দরমহলের অংশটি মহিলাদের দেওয়া হোক। অবসর সময়ে স্ত্রীলোকেরা সব এখানে এসে মিলবে এবং হস্তশিল্পের কাজ করবে। বড় কাছারি ঘর সম্বন্ধে মীমাংসা করলো পঞ্চায়েৎ। তাদের পঞ্চায়েৎ বসবে এখানে। গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপ এমন গরম হয় আর পাথরগুলো এত তেতে ওঠে যে সেখানে বসে ঠাণ্ডা মেজাজে কোন বিচার বিবেচনা করা সম্ভবই নয়।

গড়ের গুদামে থাকবে জমা ফসল। জমিদারের প্রমোদ কাননটি ছিল খুব বড়। রাও ভাবলো এখানে একটা শিশু বিদ্যালয় খুলতে হবে, কেননা স্কুল মাষ্টারকেও যে জমিদার সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।

"কিন্তু শিশুদের শিক্ষা দেবে কে?" পুলম্মা প্রশ্ন করলো। প্রশ্নটি বড় কঠিন। গাঁয়ের যারা শিক্ষিত, তারা ছিল পুলিশ, পাটোয়ারী, পুরোহিত আর জমিদারের কর্মচারী। তারা সবাই গাঁ ছেড়ে চলে গেছে। সারা গাঁয়ে শিক্ষিত লোক একটিও নেই, কেননা জমিদারের বিবেচনায় লেখাপড়ার কোন প্রয়োজন নেই। লেখাপড়া শেখা থেকে বিপ্লব প্রসার লাভ করে, মনে নতুন চিন্তার উদয় হয়; কিষান—যারা কলুর বলদ, তারাও নিজেদের মানুষ ভাবতে শেখে। জমিদারের প্রয়োজন কলুর বলদের, মানুষের নয়।

শেযে রঘুবাও বললো, "আমি হায়দারাবাদ থেকে কোন শিক্ষিত লোক আনিয়ে নেব।" "ততদিন পর্যন্ত কি হবে?" বুড়ী পুলম্মা পুনবায় প্রশ্ন কবলো। "ততদিন পর্যন্ত আমিই পড়াবো।" রাও বললো। বুড়ী পুলম্মার চোখ খুশিতে চকমক করে উঠলো। বাও তাকে জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি কেন খুশী হচ্ছো বুড়ীমা, তোমার তো কোন ছেলেপুলে নেই যে পড়বে?"

বুড়ী পুলম্মা গভীর আগ্রহের সাথে মাথা নেড়ে বললো, "না, আমি নিজেই পড়বো।"

॥ আট ॥

রঘু রাও ফাঁসী সেলের ঠাণ্ডা কালো মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে চলতে লাগল। এ পর্যন্ত তো সব কিছুই নির্বিবাদে কাটলো। কিন্তু এরপব যা কিছু ঘটেছে সেগুলি স্মরণ কবতে ওব খুব অস্বস্তি লাগলো। ওব গাঁয়ে যেভাবে জমি বাটোযারা হযেছিলো, তেমনিভাবে হযেছিলো আরও শত শত গ্রামে। আর চার মাসের মধ্যেই দশ লাখ একর জমি কিষানদেব মধ্যে ভাগ করে দেওয়া গেল। জমিদার আর দালালরা শহরে চলে গেল। সেখান থেকে রাজাকাররা নিজামশাহী সৈন্য ও পুলিশের সহায়তায় গ্রামে হামলা করতে লাগলো।

শ্রীপুরম গ্রামেও জগন্নাথ রেড্ডী দুবার হামলা করেছিলো। কিন্তু দুবাবই গাঁয়েব কিষানবা বীরত্ব ও তেজস্বিতার সাথে এই অত্যাচারের মোকাবিলা করলো এবং নিজেদের ঘর, জমি, স্ত্রীলোক ও পত্নীদের ইজ্জত রক্ষা করলো। দুবারই জগন্নাথ রেড্ডীকে ক্ষতিগ্রস্ত হযে পিছিয়ে যেতে হোল। গাঁয়ের বহু কিষানও মাবা গেল। আর রঘুরাও নিজে এসময়ে জখম হলো।

তারপর গাঁয়ের লোকেরা একদিন শুনলো যে হায়দরাবাদ কংগ্রেসের অধীনে এসেছে। বহু লোক শুনে খুব খুশি হোল, এবার নিজেদের দেশের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব হয়েছে। এবার আমাদের কথা শোনা হবে আর জগন্নাথ রেড্ডীকেই পুরোপুরি সাজা দেওয়া হবে। এই উপলক্ষ্যে গাঁয়ের অধিকাংশ লোকই আলোকসজ্জা করার সিদ্ধান্ত নিলো। কিছু লোক অবশ্য এর বিপক্ষেও ছিল। রঘু রাওয়ের মনেও অবশ্য নানাধরনের প্রশ্ন এসেছিলো। কিন্তু ও কিছু বলেনি। তাই শ্রীপুরমে আলোকসজ্জা করা স্থিব হয়েছিলো, গাঁয়ে, মন্দিরে, চণ্ডীমণ্ডপে, গড়ের উঁচু দরজার উপর, এমনকি আর একটু এগিয়ে গড়ের উপরেই আলোকসজ্জা করা হলো, শত শত দীপ জ্বললো। দূর দূর গ্রাম হতে লোক এই আলোকসজ্জা দেখতে এলো এবং স্বরাজের জন্য একে অন্যকে শুভকামনা জানালো। স্ত্রীলোকেরা ভজন গাইতে লাগলো। একদিকে বুররা কথা হতে থাকলো, গড়ের বাইরের ময়দানে শিশুরা খেলতে লাগলো।

এমনি সময়ে গ্রামের উপর একখানা উড়েজোহাজ উড়তে দেখা গেল। অনেক লোক এই সব তামাসা ছেড়ে আকাশ উড়ন্ত হাওয়াই জাহাজ দেখতে লাগলো। উড়োজাহাজ গাঁয়ের কাছাকাছি দুতিনবার উড়ে নেমে এসে অনেকগুলি কাগজ ছড়িয়ে দিলো। তারপর উপরে উঠে আকাশে মিলিয়ে গেল। অনেকে ক্ষেতে কাগজগুলো কুড়িয়ে আনতে ছুটলো। গাছের শাখাপ্রশাখা থেকে, ঘরের চাল থেকে কাগজ কুড়িয়ে আনা হলো। শিশুরা ক্ষেত থেকে কাগজ উঠিয়ে নিয়ে এলো। একটি স্ত্রীলোকের

কোলের উপর একখানা কাগজ পড়লো। সে সেটা নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে রাওয়ের কাছে এলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাওয়ের কাছে শত শত কাগজ এসে জমা হোল।

রাও এইসব ছাপানো কাগজগুলো পড়তে শুরু করলো। শত শত কিষান কাগজের আশেপাশে এসে জমলো। "রাও বলো এতে কি লেখা আছে? বলো রাও, এই ছাপানো কাগজে কি বলছে? এই ছাপানো কাগজে কি বলছে, আমার কাগজটাও দেখ এতে কি লেখা আছে?" অনেক লোক নিজের নিজের কাগজ ওর সামনে ধরলো।

রঘু রাও দুতিনটে কাগজ পড়ে বললো, এ কাগজ কংগ্রেসের, এ সবগুলিও তাই। এ সবগুলির মধ্যে এক কথাই লেখা রয়েছে।

"কি আছে, জলদি বলো। আমাদের কংগ্রেস কি বলছে?"

"কংগ্রেস বলছে যে, যেসব কিষান জমিদারদের কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়েছে, তারা জমি জমিদারকে ফিরিয়ে দিক। কেননা, শেষ অবধি জমিদার তো কিষানের ভাই। আর ভাইয়ের ন্যায্য জিনিস ভাইয়ের ছিনিয়ে নেওয়া উচিৎ নয়। তাই কিষানদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে তারা নিজেরাই জমি ফিরিয়ে দিক।" রাও কাগজ পড়ে কিষানদের চেহারাগুলি দেখতে লাগলো।

জমায়েতে বহুক্ষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো। শেষে একজন কিষান অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললো, জমিতে যে চাষ করে, কাজ করে, পরিশ্রম করে, জমি তো হয় তারই। যে অন্যের রোজগারের উপর নিজের বাড়ি তৈরী করে, আমাদের স্ত্রীদের বেইজ্জত করে, জমি তার হয় কি করে? কংগ্রেস অন্ধ্রের কিষানদের বলছে যে, তারা জমিদারের জমি ফিরিয়ে দিক। অথচ যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের জমি জবর দখল করেছে সেই জমিদারদেরই কিছু বলছে না!

রাও বললো, "ও তো তোমার ভাই। কাগজে এই রকম লিখছে।"

"ভাই হবে ওরা কংগ্রেসের", আরেকজন কিষান চিৎকার করে বললো, "ওরা তো আমাদের দুশমন।"

বুড়ী পুলম্মা রেগে গিয়ে বললো, "যে যাই বলুক, হাওয়াই জাহাজ ছেড়ে যদি কেউ স্বয়ং ভগবানকেও এখানে ডেকে আনে, তবুও আমি আমার জমি জমিদারকে ফেরত দেব না।" এই কথা বলে ক্রোধভরে বুড়ী গড়ের দরজার দিকে দৌড়ে গিয়ে একটি জ্বলন্ত প্রদীপ মাটিতে আছাড় মেরে ফেলে দিল। এবং অতি দ্রুত অন্যান্য প্রদীপগুলো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরেই গড় আঁধার হয়ে গেল। গাঁয়ের সব দীপগুলি নিভে গেল। কিষানরা হতবুদ্ধি হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

তারপর পুনরায় জগন্নাথ রেড্ডী পুলিশ ও ফৌজ নিয়ে এসে শ্রীপুরম দখল করে নিলো। গড়ের ভিতর শিশুদের পড়ানোর সময় রঘু রাও গ্রেপ্তার হয়ে গেলো।

রঘু রাওয়ের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হোল। মোকদ্দমা চললো। ওর মৃত্যুদণ্ড হোল।

কাল সকালে সাতটার সময় ......

রাও জিজ্ঞাসা করলো, সত্যিই কি ও একটি নরঘাতক মাত্র? নরঘাতকদের একটি

অথবা দুটি, অথবা অনেক রকমের আকার হয়, যাদের লোকে ঘৃণা করে, লোকে যার প্রতিশোধ নিতে চায় ; অথবা নানা ধরনের উত্তেজনার বশীভূত হয়ে মানুষ খুন করে ফেলে, তা সে ঘৃণার আতিশয্যেই হোক অথবা প্রেমেরই হোক।

এখানে তো এরকম ধরনের কোন আকার নেই। নেই এ রকম ধরনের কোন আতিশয্য। রাতের আঁধারে পুলিশ ও ফৌজের সহায়তায় রাজাকাররা ওর গাঁয়ে আক্রমণ করেছিলো। ওর সামনে তখন ছিল না কোন আকার। ছিল শুধু একটা অত্যাচারীর অন্ধ শক্তি। সে প্রথমে দেখেছে এই শক্তি গ্রাম পুড়িয়েছে। আগুনের শিখায় ক্ষেত-খামার ভস্ম হয়ে মিশে যেতে দেখেছে। দেখেছে ইয়েল্লা রেড্ডীর খোলা চোখ। দেখেছে শিয়ালে খাচ্ছে স্ত্রীলোকের মৃতদেহ আর অজস্র বেইজ্জতি। আর এই সব দেখেই সে একটি চরম প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। ও এতে কারও কোন চেহারা দেখেনি। শুধুমাত্র দেখেছিলো গ্রামে ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের ছায়া। আর ও এগিয়ে গিয়ে সেই অত্যাচারকে সঙ্গীনের মুখে রুখে দিয়েছে।

কিন্তু জুলুমের প্রতিবিধান যদি পাপ হয়, নিজের প্রাণ রক্ষা করা, নিজের মায়ের ইজ্জত বাঁচানো, ক্ষেতের স্বর্ণশীষ রক্ষা করা যদি পাপ হয়, তবে জীবনধারণ করাটাই পাপ। শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াটাও পাপ এবং হৃদস্পন্দনও পাপ।

রাও শেষবারের মত আত্মজিজ্ঞাসা করলো। শেষবারেও ওর নজরে এমন অত্যাচারীর চেহারা এলো না যাতে ওর হৃদয় লজ্জিত হয়। আর এই পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে ওর নিজের সমগ্র জীবনের পাতা উল্টে দিয়ে বইখানা বন্ধ করে রেখে দিলো এবং অত্যন্ত আনন্দের সাথে মৃত্যুর চেহারা দেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

॥ নয় ॥

ফাঁসি সেলের দরজা আবার খুলে গেল। দরজায় ওর বাবার চেহারা দেখা গেল। তার পিছনে বুড়ো ওয়ার্ডার। তার গভীর কালো চোখ দুটো জলে ছলছল করছে। ভেরাইয়া ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ওর কাছে গিয়ে থেমে গেল। রাও ধীরে ধীরে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললো, "বস বাপু।" ভেরাইয়া ও রঘু দুজনেই ফাঁসি সেলের মেঝের উপর বসে পড়লো।

ভেরাইয়ার ঠোঁট দুটো কাঁপছে। তার মাথাটা একটা অদ্ভুত অদৃষ্টপূর্ব অবস্থায় ধীরে ধীরে কাঁপছিলো। অনেক কিছুই তার বলার ছিল। কিন্তু হয়তো বা কিছুই সে বলতে পারবে না। তার এই অদ্ভুত অবস্থা দেখে রাওয়ের প্রাণ কেঁদে উঠলো। অত্যন্ত কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে ও বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, "গাঁয়ের অবস্থা কি?"

'গাঁয়ে এখন আর কেউ নেই। নওজোয়ানরা সব গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। যারা বাকী ছিল তারাও জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। সেখানে রাতদিন পুলিশ ও ফৌজ এদের গ্রেপ্তার করার জন্য যায়। আবার মাঝে মাঝে মাঝরাতে জঙ্গল থেকে গুলির আওয়াজ আসে। আর বুড়ী পুলম্মা বলে, "আরও একজন গেল।" তারপর জোরে হাসতে থাকে।

'বুড়ীমা পুলম্মা?' রাও জিজ্ঞাস করলো।

"মা পুলম্মা পাগল হয়ে গেছে।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য রাও চুপ করে গেল। তারপর বললো, "আর জগন্নাথ রেড্ডী?"

জমিদার তো গড় থেকে বেরোয় না। পুলিশের বিরাট পাহারা হয় গড়েই রয়েছে, নয় চুন্দীর মোড়ে। প্রত্যেক কিষানকে এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে যেতে হলে তালাসী দিতে হয়।

তারপর আবার কয়েক মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো। তারপর ঠোঁট কাঁপতে লাগলো। সে আস্তে আস্তে বললো, "আপীল না-মঞ্জুর হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।".

"রঙড্ডু ধোবী বলছিলো যে জগন্নাথ রেড্ডী বলেছে রঘু রাও ক্ষমা প্রার্থনা করলে ওর এই সাজা হোত না।"

"কোন কথার ক্ষমা ভিক্ষা করবো?" রাও রেগে গিয়ে বললো। ভেরাইয়া নরম স্বরে বললো, "আমি তো কিছু বলিনি। রঙড্ডু এই রকম বলছিলো।

"আর তোমার কথাটা কি বাবা?"

ভেরাইয়া ধীরে ধীরে থেমে বললো, "কখনো কখনো আমার মনে হয় যে তুই যা কিছু করেছিস ঠিক করেছিস। আবার কখনো ভাবি আমার যে একটিমাত্র ছেলে।" ভেরাইয়া মাথা নীচু করলো।

রাও নিজের হাতখানি বাবার কাঁধে রেখে বললো, "বাবা তুমিই আমাকে গড়কে ঘৃণা করতে শিখিয়েছিলে, আজ কি তুমি সেটা ভুলে যেতে বলছো?"

"না"—ভেরাইয়ার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল। "কিন্তু বেটা, আমি অশিক্ষিত মূর্খ কিষান। কখনো কখনো আমি ভেবে ঠিক করতে পারিনে, আমার একমাত্র সন্তানকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হোল কেন! কখনো কখনো রাতে জঙ্গল থেকে গুলির আওয়াজ এলে রাত আরও কালো বলে মনে হয়।"

রঘু রাও হাতখানি বাবার কাঁধ থেকে উঠিয়ে না নিয়ে আরও জোরে চেপে ধরলো। ধীরে ধীরে প্রতিটি কথা ওর বাবাকে বুঝিয়ে বলতে লাগলো।

"বাবা, তোমার সেই মেলার কথা মনে পড়ে যেখানে রামাইয়া শেঠির দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে আমি রেশমের একটি থানে হাত দিয়েছিলাম বলে রামাইয়া শেঠি আমাকে গালাগালি দিয়েছিলো। আর তুমি রেশমের থান থেকে আমার হাতখানা সরিয়ে নিয়েছিলে। হয়তো সে সময়ে তুমি তোমার ছেলের মনোভাবটা জানতে যে জগন্নাথ রেড্ডীর ছেলে প্রতাপ রেড্ডীর মত আমি রেশমের জামা পরতে চাই। কিন্তু হয়তো তুমি মনে মনে জানতে যে বেগারীদের জন্য রেশম নয়—রেশমের সবটাই ওধারে। সমস্ত ক্ষুধা এধারে, আর সমস্ত ফসল ওধারে। সমস্ত অপমান এধারে আর সমস্ত ইজ্জত ওধারে। বাবা, রেশমের থান ছুঁয়ে দিতে চেষ্টা করা, আর যে যুগের মানুষ রেশম, ক্ষেত ও মখমলের জন্য কাঁদবে না সেই যুগকে তাড়াতাড়ি আনার চেষ্টা করার মত অন্যায় ছাড়া তোমার ছেলের অপরাধ আর বেশি কিছু নয়। এই একাগ্র লক্ষ্যের জন্যই তোমার ছেলেকে কাল সকালে সাতটার সময় ফাঁসি দেওয়া হবে। ব্যস, এছাড়া আমার আর কোনো অপরাধ নেই।"

ভেরাইয়া কাঁদতে লাগলো। রঘু রাও বললো, "বাবা তুমি কাঁদলে দুনিয়ার লোকে

কি বলবে? গাঁয়ের লোকেরা কি বলবে? জমিদারের গড় তোমাকে দেখে কতই না খুশি হবে!"

ভেরাইয়া অশ্রু মুছে নিলো। বহুক্ষণ ধরে রঘু রাও বাবাকে বোঝাতে লাগলো। আজ যেমন ভাবে ওর বাবার মনে ও সব কিছু উজাড় করে দিতে চেয়েছে এত গভীর মমতা ও দরদের সঙ্গে সে আর কখনো তার বাবার সঙ্গে আলাপ করেনি।

ওর যা কিছু ছিল, যা কিছু ও ভাবনাচিন্তা করেছে, যা কিছু ও করতে পারেনি কিন্তু করতে চেয়েছে, তার সবটাই ও আজকে তার বাবার মনের মধ্যে উজাড় করে দিয়ে বিদায় নিতে চেয়েছিলো। রেশমের জামার কথাটি ওর বাবা বুঝতে পেরেছিলো, এই জন্য ও বাবাকে হায়দরাবাদের গল্প শোনালো। কেমন করে রেশমের জামার জন্য ওর মনটা ছটফট করছিলো, আর সেইজন্যই কত যত্ন করে কয়েকটি টাকা একত্র করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোন না কোন একটা কিছু হয়ে গেছে যার ফলে ওর জীবনের এই আকাঙ্ক্ষাটি আর মিটতেই পারেনি। অত্যন্ত সাধারণ কথা। কিন্তু এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথার জন্যই, রেশমের একটি জামার জন্যই, ফসলের একটি কণিকার জন্যই, ইজ্জতের একটি আনন্দের জন্যই, সৌন্দর্যের একটি রশ্মির জন্যই বেগারীদের দুনিয়া বন্ধ্যা। দুনিয়ায় এই বন্ধ্যাত্ব কতদিন পরিব্যাপ্ত থাকবে? উপর থেকে কেউ এদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করবে না। বেগারীদের কাজ বেগারীদের নিজেদেরই করতে হবে। নচেৎ হাজার হাজার বছরের ন্যায় আরও রেশম ওধারেই থাকবে আর অন্যায় অত্যাচার এধারেই থাকবে।

অনেকক্ষণ ধরে রঘু রাও বাবাকে বোঝাতে লাগলো। ওর বাবা গভীর মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনতে লাগলো। পিতাপুত্র দুজনেই একে অপরের এত সন্নিকট হয়ে নিরুদ্বেগচিত্তে কথাবার্তায় মগ্ন ছিল যেন ওরা গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছে। অকস্মাৎ কে যেন ফাঁসি সেলের দরজাটায় ধাক্কা দিলো...আর রাও ও ভেরাইয়া দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। দরজায় বুড়ো ওয়ার্ডার পাহারায় ছিল। সে মাফ চেয়ে বললো, এখন আবার ডিউটি শেষ হওয়ার সময় হয়ে এসেছে। তাই ভেরাইয়াকে এখন চলে যেতে হবে। নতুন ওয়ার্ডার দেখে ফেললে বিপদ হতে পারে।

ভেরাইয়া উঠে দাঁড়ালো। রঘু রাও তাকে জড়িয়ে ধরলো। আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ভেরাইয়া বললো সকালে গাঁ থেকে ফিরে সে এখানে আসবে। "কিন্তু এখন তুমি গাঁয়ে যাচ্ছোই বা কেন? এই শহরেই পড়ে থাকো অথবা জেলের বাইরে কোথাও শুয়ে পড়ো।"

ভেরাইয়া বললো, "না, আমি গাঁয়ে চলে যাবো। সকালেই এসে পড়বো। আজ সারা রাতটাই যদি চলতে পারি তবেই ঠিক হবে নচেৎ....।" ভেরাইয়া কথাটি শেষ না করেই ওখান থেকে চলে গেল।

ভেরাইয়া যখন গাঁয়ে ফিরে এলো তখন সব লোকই শুয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র পুলম্মার কুঁড়েখানিতেই আলো জ্বলছে, দরজাটা খোলা। ধীরে ধীরে ভেরাইয়া পুলম্মার ঘরে গিয়ে পৌঁছুলো। ওকে দেখে ভেরাইয়া বড়ই বিব্রত বোধ করলো। পাগলী পুলম্মা এখানো জেগে আছে। তার চোখে রীতিমত বিভ্রান্তি ও ভয়ের চিহ্ন। ভেরাইয়াকে দেখেই পুলম্মা খাট থেকে নেমে তার পাশে এসে দাঁড়ালো। আর ওর

কানে কানে কথা বলতে শুরু করলো। "কেমন আছে আমার ছেলে?" এধার ওধার তাকিয়ে পুলম্মা জিজ্ঞেস করলো।

"ভালো আছে, তোমাকে প্রণাম জানিয়েছে।"

"বেঁচে থাকুক বেটা আমার, যুগ যুগ বাঁচুক।" পুলম্মার মুখ থেকে আচমকা বেরিয়ে গেল। তারপর অট্টহাসি হাসলো। ভেরাইয়া উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকে দেখতে লাগলো। পুলম্মা তারপর হাসতে হাসতে থেমে গেল। ভেরাইয়ার দিকে তাকিয়ে বললো, "ভেরাইয়া আমি পাগল নই, হ্যাঁ, কখনো কখনো আমার মনটা এত খারাপ হয় যে আমাকে হাসতেই হয়। না হাসলে মরে যাবো।"

ভেরাইয়া চুপ করে রইলো। পুলম্মা ওর দিকে চেয়ে বললো, "নিশ্চয় তোমার মনে কোন একটা কথা রয়েছে। আমি তোমাকে জানি। নিশ্চয় কোন একটা কথা তোমায় পীড়া দিচ্ছে। বলো, কি তোমার কথা?"

ভেরাইয়া বললো, "না মা, কোন কথা নেই।"

"নিশ্চয়ই আছে, বলো। নচেৎ আমি চীৎকার করে হাসবো।"

ভেরাইয়া থেমে থেমে বললো, "আমার মনে হয় ছেলে রেশমের জামা পরতে চায়।"

"রেশমের জামা?" পুলম্মা হাসলো। "রেশমের জামা! কি রকম কথা বলছো! রঘু নিজে তোমাকে বলেছে?"

"না না, ও কিছুই বলেনি। আমার ধারণা, ওকে যদি রেশমের জামা পরাতে পারি তবে মরার সময় ও বেশ খুশী হবে।"

পুলম্মা জোরে জোরে হাসতে লাগলো। "রেশমের জামা! হা-লা-লা! রেশমের জামা! এটারও তো বেশ মজা আছে। হা-হা-হা। ভেরাইয়া তুমি তো গোঁড়াতেই আহাম্মক ছিলে। রেশমের জামা! হা-হা-হা! এ গাঁয়ে কার কাছে রেশমের জামা আছে? ভেরাইয়া তুমি একটা বিলকুল আহাম্মক।" পুলম্মা জোরে জোরে হাসতে লাগলো।

ভেরাইয়া নরম সুরে বললো, "তুমি বুঝতে পারছো না পুলম্মা। তুমি আমার বাবার মনটা বুঝতে পারছো না। আমার মনে পড়ে যখন একটি তালপাতার ছাতা কিনে দিয়েছিলাম তখন ও কি খুশিতেই না আমার দিকে তাকিয়ে ছিলো। ওর একটা খেলনার কথা আমার মনে পড়ে। তুমি তো জানো, বেগারী নিজের ছেলেকে বেশি খেলনা দিতে পারে না। খেলনা খুব কম বেগারীর ছেলের জীবনেই এসেছে। খেলনার আকাঙ্ক্ষা বেশি থেকে যায়। আজ যখন আমার ছেলে, জোয়ান ছেলে বাইশ বছরের ছেলে রঘু রাও রেশমের জামার কথা বলছিলো, আমি তখন ওর চোখে সেই শিশুর ঔজ্জ্বল্য দেখলাম, সেই শখ দেখলাম, যা বাবার মনকে মুঠির মধ্যে ভরে ফেলে। পুলম্মা তুই তো মা, তুই এসব কিছু জানিস না?"

পুলম্মা মাথা নীচু করলো, "আমার তো সবই মরে গেছে। একটাও নেই। কেউ মরেছে রোগে, কেউ হয়েছে প্লেগের শিকার। কেউ মরেছে জেলে, যারা বাকী ছিল তাদের জমিদারই খেয়ে ফেলেছে। আমার তো সবাই মরে গেছে, ভেরাইয়া। আমি এখন কিছুই জানি না।"

ভেরাইয়া বললো, "গাঁয়ে কারো কাছে রেশমের জামা আছে?" পুলম্মা তারপর জোরে জোরে হাসতে লাগলো। পুলম্মার অট্টহাসিতে আশেপাশের দুচারজন কিষান ভয়ে ভয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো। ভেরাইয়াকে দেখে তারা উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করলো, "কি ব্যাপার, পাগলী হাসছে কেন?"

পুলম্মা বললো, "পাগলী আমি না, যারা বলছে পাগল তারা। ছেলের জন্য আমার রেশমের কামিজ চাই।"

ভেরাইয়া সমস্ত ঘটনাটি তাদের বললো। ভয়ে ভয়ে তারা বললো, "ভেরাইয়া তোমার মনের অবস্থা বুঝেছি, কিন্তু এমনি সময়ে রেশমের জামা কোথা থেকে আসবে? এই রেশমের জামা নিয়ে বৃথাই বাক্যব্যয় করছো। সকালে রাওয়ের ফাঁসি হবে, আর তুমি রেশমের জামা খুঁজে বেড়াচ্ছো। রাও যদি শোনে যে, ওর বাবা মৃত্যুর আগে এরকম ঝঞ্ঝাট করছে তো রেগে যাবে।" একজন কিষান বললো, "গোরম্মার বিয়ে হবে সামনের মাসে। চলো তার বাবার কাছে জিজ্ঞেস করি। বিয়ের জন্য সে রেশমের কাপড় এনে থাকতেও বা পারে। ভেরাইয়ার মনের আশাও মিটবে।" আরেক কিষান বললো, "তুমিও আচ্ছা বেওকুফ। গোরম্মার বাবার কাছে রেশমের কাপড় কেনার পয়সাই বা কোথায়। বেওকুফ বনে যেও না।"

ভেরাইয়া কুণ্ঠার সাথে তাদের বললো, "যাই হোক, জিজ্ঞাসা কবতে দোষ কি?" দু তিনজন কিষান ভেরাইয়ার সাথে গোরম্মার বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে নিলো। এক বৃদ্ধ বললো, "কিন্তু পুলিশ যদি এসে যায়, আর জিজ্ঞাসা করে যে, গাঁয়ের লোক রাত্রে এত কি ফুসুর ফুসুর করছে তবে কি হবে?" জনৈক কিষান চট করে বললো, "সেটা দেখা যাবে। তুমি চলো জী, গোরম্মার ঘর।"

এরা যে সব জায়গা দিয়ে গেল সেই সব জায়গায় কিষানরা জেগে উঠতে লাগলো, আর এদের দলে মিলে যেতে ল্যাগলো। রেশমের জামার কথাটা ছড়িয়ে পড়তে থাকলো। এই সব লোক গোরম্মার বাড়ি পৌছানোর আগেই খবরটা পৌঁছে গিয়েছিলো। গোরম্মার বাবা জোড় হাত করে বললো, "আমার গোরম্মার বিয়ের জন্য যে সব কাপড় কিনে রেখেছি সে সমস্তই এই খাটের উপর রাখা আছে। দেখো, এতে একটুরোও রেশমের কাপড় নেই। আর ঘর তল্লাস করে দেখতে পারো। রঘু রাওয়ের জন্য রেশমের কাপড় তো কোন ছার, জান দিতেও প্রস্তুত আছি।"

ওখান থেকে ফিরে এসে লোকে এদিক ওদিক খবর নিতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে প্রতিটি ঘরেই কাপড় খোঁজা হতে লাগলো। আর এখন গাঁয়ের লোকেরা যে কোন জায়গা থেকে রেশমের জামা আনতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো। অতি বৃদ্ধদের কথাটি সবচেয়ে পছন্দ হলো। যারা ছিল নবীন যুবক তারা এটাকে নিয়েছেলো ভেরাইয়ার আহাম্মকি হিসেবে। কিন্তু এ সময়ে তারাও সঙ্গে মিশে গেল। ঘরে ঘরে বন্ধ দরজার আড়ালে শলাপরামর্শ চলতে লাগলো। ইতিমধ্যে রামালু ধোবী দৌড়ে ভেরাইয়ার পাশে এসে দাঁড়ালো। তার কাছে ছিল ময়লা একখানা কাপড় জড়ানো একটা পুঁটলী। পুঁটলিটা সে ভেরাইয়ার সামনে খুলে দিয়ে বললো, "এটাতে দুটো রেশমের জামা আছে—একটা জগন্নাথ রেড্ডীর, আর অন্যটি প্রতাপ রেড্ডীর।"

ভেরাইয়া ঘৃণাভরে বললো, "আমার ছেলে জমিদারের জামা পরবে? রামালু তুমি

কেমন ধারা কথা বলছো?" রামালু হতবুদ্ধি হয়ে বললো, "তবে আর এ গাঁয়ে রেশমের জামা কোথা থেকে আসবে?"

ভেরাইয়া চুপ করে রইলো। অনেক যুবক ফিরে গেল। আচমকা কি একটা মনে পড়তেই ভেরাইয়া নিজের ঘরের দিকে দৌড়াতে দৌড়াতে চলে গেল।

কুঁড়ের মধ্যে রাখা কাঠের সিন্দুকটা খুলে সে নিজের ছেঁড়া কাপড়গুলো বাইরে বের করলো। সবচেয়ে তলায় তার স্ত্রীর কাপড়-চোপড় রাখা ছিল। এগুলি তার শ্বশুর মেয়েকে যৌতুক হিসেবে দিয়েছিলেন। আর সব কাপড়ই ছিঁড়ে গেছে, শুধু রেশমের ওড়নাটাই রয়েছে। এখানি রঘু রাওয়ের মা তার পুত্রবধূর জন্যে রেখে দিয়েছিল। রাওয়ের মা মাঝে মাঝে বড়াই করে তার স্বামীকে ওড়নাখানি দেখিয়ে বলতো, কোন বেগারীর বউয়ের এমন একখানি ওড়না আছে নাকি? আমি আমার ছেলের বিয়েতে এটা বউমাকে দেব। ভেরাইয়া সযত্নে সিন্দুকের সবচেয়ে নীচ থেকে হাতে-তোলা চুমকি ভরা ওড়নাখানি বের করলো। লাল রঙের চমৎকার ওড়না। সাবেকি রেশম বলে ভালো ছিল। প্রদীপের আলোয় ওড়নাখানি সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে লাগলো। অনেক ছোকরা ভয়ানক খুশি হয়ে এমনি ধারা চিৎকার করে উঠলো যে মনে হোল তারা একটা লড়াই জিতে নিয়েছে। "জামা মিলে গেছে!"

ভেরাইয়া জিজ্ঞাসা করলো, "এই ওড়নায় জামা হবে?" একজন কিষান বললে, "না হবে কেন? দরজিকে এখনই ডেকে আনো। সময় খুব কম।" জনৈক কিষান দরজিকে ডাকতে গেল। কিছুক্ষণ বাদেই সে সোমাপ্পাকে সাথে নিয়ে দৌড়োতে দৌড়াতে এলো। সোমাপ্পা কাপড় দেখে বললো, "সার্ট তো এতে হবে না। ফতুয়া হতে পারে।" যুবকরা চিৎকার করে বললো, "তবে ফতুয়াই বানাও। কিন্তু জলদি করো।"

সোমাপ্পা বললো, "আমি মেশিনটাকে ভুলে ঘরে রেখে এসেছি।" একজন কিষান সোমাপ্পার বাড়ি গেল মেশিন আনতে। ইত্যবসরে সোমাপ্পা কাপড়ের ভাঁজ খুলে দেখতে লাগলো। দেখলো কাপড়খানি দু'তিন জায়গায় পোকায় কেটেছে। ভেরাইয়া ঘাবড়ে গিয়ে বললো, "এখন কি হবে?" সোমাপ্পা মুচকি হেসে বললো, "কিছু ভাবনা নেই। এমন ভাবে কাটবো যে পোকায় কাটা জায়গাগুলি বাদ পড়ে যাবে। রঘু রাওয়ের জামায় কোন ছিদ্র থাকবে না।"

এর মধ্যে মেশিন এসে গেল। সোমাপ্পা অতি যত্নে ওড়নাটি কাঁচি দিয়ে কেটে মেশিনে সুতো পরিয়ে চালাতে লাগলো। এরকম আজব ও অপূর্ব জামা তারা আজ পযন্ত কখনো দেখেনি। তাদের এমন ধারা মনে হতে লাগলো যে প্রতিটি সুতোর সাথে গ্রামবাসীদের শ্বাসপ্রশ্বাসগুলিও সেলাই হয়ে যাচ্ছে। এদের সমগ্র আশা ও প্রার্থনা এই রেশমের চুমকির বাইরে উঁকিঝুঁকি মারার চেষ্টা করছিলো। একবার মেশিন চালাতে চালাতে সোমাপ্পার হাতে এতটুকু রেশম ছিঁড়ে গেল। অমনি শত শত অন্তঃকরণ থেকে এমন জোরে "আঃ!" শব্দ উঠলো যেন ওই রেশমটির সাথে প্রাণগুলিও ছিঁড়ে গেল।

এর পর সোমাপ্পা অত্যন্ত সাবধানে মেশিন চালাতে লাগলো। একটি স্ত্রীলোক বললো, "সোমাপ্পা জলদি করো। তোমার জামা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর আমি এর

ওপর ফুল কাটবো।" যুবকরা অবাক হয়ে স্ত্রীলোকটির দিকে তাকালো। স্ত্রীলোকটি বললো, 'স্ত্রীসভা এই সিদ্ধান্তই নিয়েছে।"

জামাটি আর ভেরাইয়ার ছেলের রইলো না, সারা গাঁয়ের ছেলেদের হয়ে গেল। পাঁচজন স্ত্রীলোক গান গাইতে গাইতে জামাটির উপর ফুলপাতা কাটলো। বুকে কাস্তে হাতুড়ি আর গমের শীষের চিহ্ন আঁকলো ; স্ত্রীলোকেরা জামায় তিলক্‌ লাগালো। কিছু কিছু স্ত্রীলোক এরই মধ্যে ফুলের হার তৈরি করে নিয়েছে। জামাটি এই ফুলের হারের মধ্যে। এরই মধ্যে কারো খেয়াল হোল, সবই তো হোল কিন্তু ইস্ত্রি করা যে বাকী রয়ে গেল। লোহার ইস্ত্রি আবার সোমাপ্পার কাছেও নেই। সেটা ছিল শুধু জমিদারের দরজির কাছে। গড়ের পিছনে তার ঘর। সেখানে যাবে কে? কেননা, পুলিশ পাহারা রয়েছে কাছেই। আর ওই সময় এরা যদি কোন সাড়া পায়। হয়তো বা এ সময়ে তারা সাড়া পেয়েই গেছে। হয়তো বা এরা কোন হামলার আশংকা করছে।

দুজন কিষান বললো যে তারা গড়ের পিছনে গিয়ে জমিদারের দরজির কাছ থেকে ইস্ত্রিটা চেয়ে আনবে।

সেই দুজন কিষান চলে যাবার পর রঙডু বেগারী বলো, "জঙ্গলে খবর দাও। গাঁয়ে গাঁয়ে খবর দাও। আমরা সবাই রেশমের জামাটি নিয়ে জেলখানায় যাবো।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই চণ্ডীমণ্ডপে সমগ্র গ্রামখানিই এসে জড়ো হোল। মশাল জ্বলছে, ধ্বনি উঠছে ; আর এখন কারো জমিদার বা তার সাঙ্গোপাঙ্গদের ভয় নেই। সেই দুজন লোক যখন লোহার ইস্ত্রি নিয়ে এলো তখন তাদের একজনের হাঁটু জখম হয়েছে। এই সময়ে গাঁয়ের লোকের খুশির মাত্রা উত্তাল হয়ে গেল। সেই আওয়াজ গাঁয়ে ধ্বনিত হতে থাকলো। আর এই আওয়াজ অন্যান্য গাঁয়েও পৌঁছে গেল। সেই গাঁ থেকেও জবাব প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করলো।

ইস্ত্রি করার পর জামাটাকে হারে সাজানো হোল। ইত্যবসরে পাতিপাড়ু গাঁয়ে বুর্‌রা কথা-গায়ক, ঢুলি ও অন্যান্য কিষানরা একের পর এক এসে পৌঁছতে লাগলো। আর ক্ষণে ক্ষণে তাদের উৎসাহ বাড়তে লাগলো।

সে রাতটি কেউ ভুলবে না। সে রাতে মশাল জ্বালিয়ে পাঁচ হাজার কিষানের জমায়েত যখন জমিদারের গড়ের কাছে পৌঁছলো তখন জমিদার সদলবলে সেখান থেকে উধাও হয়ে গেছে। পথে যেখানে যেখানে গ্রাম পড়লো, সেসব গাঁয়ের লোকও এই আজব ও অপূর্ব জনসমাবেশে সামিল হয়ে চললো। আর জমিদাররা প্রত্যেক গাঁ থেকে শহরের দিকে চলা শুরু করলো। জনতার আওয়াজ বাড়তে লাগলো, আর শোভাযাত্রাটি জয়যাত্রার মিছিলের মত জেলের দিকে জোর কদমে এগুতে থাকলো। জেলখানা একরাত্রির পথ।

ভোরের খুব কাছাকাছি ....

অতি প্রত্যুষে রাও জামাটি পেয়ে বাবার দিকে বিস্ময়ে চেয়ে দেখলো। বিস্ময়, মমতা, উল্লাস ও উদ্দীপনায় ওর বুক ফুলে উঠলো। আর ওর বাবার কাছে কিরকম কষ্ট করে এই জামাটি তৈরি করা হয়েছে, আর কেমন করে দশহাজার কিষান এই জামাটি নিয়ে জেলের দরজায় এসেছে শুনে রঘু রাওয়ের মন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

সে ছোট ছেলের মত বাবার কাঁধের উপর মাথা রাখলো। আর ওর বাবা ছেলেকে বুকে সজোরে চেপে ধরলো।

তারপর ভেরাইয়া বলো, "সময় আর নেই। আমার ইচ্ছে তুমি এই জামাটি পরো। আর গ্রামবাসীদেরও তাই ইচ্ছে। আর তুমি চাও তো এর উপরেই জেলখানার কাপড় পরো।"

রঘু রাও মুচকি হেসে জেলখানার কাপড় খুলে ফেলতে লাগলো, এবং আস্তে আস্তে অত্যন্ত যত্নের সাথে রেশমের ফতুয়াটি পরতে লাগলো। ওর বাবা সস্নেহে ওর জামা পরা দেখতে লাগলো। আর ছেলের মনেও নানা রকমের ভাবনা। লাল রেশমের জামাটা পরে ওর মনে হোল ও শুধুমাত্র একটা জামাই পরেনি—নিজের ঝাণ্ডা এবং যুদ্ধ ও জেহাদের একটা অপূর্ব নিশান ও পরেছে, যেন ও নিজের রক্ত পরেছে, পরেছে জমি-জমা, পরেছে তার বাবার স্নেহ ও মায়ের আদর। রঘু রাওয়ের বুক গর্বে ফুলে উঠলো। ও রেশমের লালচে ও নরম মসৃণতাকে ছুঁয়ে অনুভব করলো সে যেন মাকড়সার জালের মত মানুষের মনের হাজার হাজার কামনা বাসনাকে ছুঁয়ে দিয়েছে। লাল রেশমের জামার উপর হাত বোলাতে বোলাতে অত্যন্ত মনোযোগ ও ভালবাসায় বাবার দিকে তাকিয়ে রাওয়ের মনে হোল, প্রত্যুষের ঔজ্জ্বল্য রাতের গালে এমন চপেটাঘাত হেনেছে যে, জেলের সমস্ত লোহা গলে স্রোতের মতো বয়ে চলেছে, আর শুধু কয়েকটি মাত্র লোহার গরাদ বাকি। পরের মুহূর্তে ও প্রাচীরের ওপারে আকাশেব বুকে সূর্য উঠতে দেখলো, যেন মায়ের আঁচল থেকে শিশুটি লাফিয়ে বেরিয়ে এলো। আর ও চিৎকার করে বললো, "দেখ, দেখ বাবা, জেলের লোহার গরাদও সূর্যকে আটকে রাখতে পারে না।"

ভেরাইয়ার চোখে জল এসে গেল। সে এই অশ্রু মুছলো না। সে এ অশ্রু নিজের জীর্ণ শরীরের উপর দিয়ে বয়ে যেতে দিলো। ওয়ার্ডার পরিবেষ্টিত হয়ে তার ছেলে রঘু রাও নিজের মাথার উপর সকালের শিশির ও মনে সূর্য নিয়ে ফাঁসির তক্তার দিকে এগুতে লাগলো। শোভাযাত্রার আওয়াজ জেলের প্রাচীর টুকরো টুকরো করে দিয়ে শূন্যে ধ্বনিত হয়ে চললো ঃ

দেখো তেলেঙ্গানা উঠেছে জেগে
এসো সবে অন্ধ্রের তনয়
চলো জয়যাত্রায়, চলো জয়যাত্রায়
দূর হোক সব ভয়

জেলের বাইরে যে গানের গুঞ্জন চলছিলো, জেলের ভিতরেও ভেরাইয়ার ঠোঁটে সে গান ফুটে বেরুলো, গান গাইতে গাইতে ভেরাইয়ার মনে হলো যেন ওর ভিতরে একটা পতাকা ফুটে উঠেছে, যার উপর সোনালী গমের শীষের মতো শহীদদের চেহারা প্রদীপ্ত হচ্ছে। গান গাইতে গাইতে ভেরাইয়ার মনে এই ধারণাটি বদ্ধমূল হয়ে গেল, যে পর্যন্ত অন্ধ্রের কিষান জীবিত থাকবে, তাদের অন্তঃকরণে পতাকা ও গান বেঁচে থাকবে, ততদিন ওর ছেলেও বরাবর বেঁচে থাকবে ; আর তাদের গাঁয়ে দেশমুখদের প্রত্যাবর্তন ঘটবে না।

উর্দু থেকে অনুবাদ : ফহিম আনোয়ার
স্বপন দাসাধিকারী

হাওয়ার কেল্লা

কৃষণ চন্দর অনেকগুলি রম্যরচনা লিখেছেন। তারই একটি উদাহরণ এখানে রাখা হলো। 'হাওয়াই কিলে' প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৪০ সালে, লাহোরের উর্দু বুক স্টল থেকে। 'হাওয়াই কিলে' কৃষণ চন্দরের প্রথম রম্যরচনা। লেখা হয় সম্ভবত ১৯৩৬ সালে। তাঁর প্রথম দিকের রচনার ধরন বুঝতেও এই রচনাটি সাহায্য করবে। —সম্পাদক

হাওয়ার কেল্লার বিষয়বস্তু হলো হিন্দুস্থানের কাল্পনিক পোলাও। হিন্দুস্থানের আদর্শ হলো ক্ষুধা এবং এটি তার প্রতি একটি চমৎকার ইঙ্গিত। এ একটি সীমিত বাধ্বিধি এবং এর কেন্দ্রবিন্দু শুধু পেট, কিন্তু হাওয়ার কেল্লা একটি বিস্তীর্ণ ও সু-উচ্চ বাধ্বিধি এবং তাতে কাল্পনিক পোলাও ছাড়াও কয়েকটি সুন্দর বস্তু মিশে আছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কাল্পনিক পোলাওতে হাওয়ার কেল্লা ঢুকতে পারবে না, কিন্তু হাওয়ার কেল্লায় বসে কাল্পনিক পোলাও পাকানো যায়। এই ভাবেও ভাবা যায় যে সারা ভারতবর্ষ একটি হাওয়ার কেল্লা। আপনি কোন হাওয়ার কেল্লা তৈরী করেছেন? আমি আপনার ছোট বেলার কথা বলছি না, কেননা সারা জীবনকেই আমার হাওয়ার কেল্লা মনে হয়। মায়ের কোলে বসলাম, আবার ঝিমোতে ঝিমোতে একেবারে ফুরুৎ করে পাখি হয়ে বাগানে আপেলের শাদা শাদা ফুলে গিয়ে বসলাম এবং সেখান থেকে ঠোঁট বের করে মাকে ভয় দেখাতে লাগলাম—দেখো, দেখো মা, কত উঁচু জায়গায় বসেছি। মা হেসে প্রতিবেশিনীকে বললেন, 'কি সরল। আর কি বোকা! আমার কোলে বসে ভাবছে কত উঁচু জায়গায় বসে আছে।' এরপর তোমাকে থাপ্পড় দিয়ে বলে, 'শুয়ে পড়, আমার ছুটকি এবং তোমার হাওয়ার কেল্লা ভেঙে পড়ে। এমনও হয় হামাগুড়ি দিয়ে আঙিনায় চলে গেলাম। দেওয়ালের ধারে তিনটি ইট লাগিয়ে দিলাম। একটি আছে কালো কাক, অপদেবতার মতো পশু—দেওয়ালের উপব বসে ভয়াবহ চীৎকার করতে থাকে আর কখনো কখনো তোমাকে একা পেয়ে তোমার ছোট ছোট হাত থেকে বিস্কুট কেড়ে নেয়। দ্বিতীয় ইট নিঃসন্দেহে তোমার বড়ো বোন—সে তোমাকে এমনভাবে চুমু খায় যে এক এক সময় সব মিষ্টি তেতো হয়ে যায়। মিষ্টি লাগে যখন সে খেলতে খেলতে হাসতে হাসতে তোমাকে জোরে চেপে ধরে আর আজব আজব ভালবাসার নামে ডাকে ; তেতো যখন সে তোমাকে স্নান করার জন্য জল ভর্তি গামলায় ফেলে দেয়। নিশ্চয় জল তোমার পছন্দ নয়। তখন তুমি একটা হাঁটাচলা করা পশু, নাকি জলের মাছ। আবার সাবানের সেই নোনতা ফেণা নাকের নরম নরম গর্তে, চোখের পাতার ভেতর ঢুকে লঙ্কার মতো জ্বালা করে। তারপর একটা শক্ত খসখসে তোয়ালে দিয়ে তোমার গা মোছে। তোমার সারা গা লাল হয়ে ওঠে। সে কিন্তু এই কাজের সময় গুণগুণ করে গান গাইতে থাকে, কোন অর্থহীন গান এবং একটু সুগন্ধি তেল তোমার ছোট মাথায় গায়ের জোরে মাখিয়ে দেয়। তোমার মনে হয় 'এক্ষুনি এই নরম মাথা ভেঙে পড়বে।' এও তুমি সহ্য করে নাও। কিন্তু সে এতেই শেষ করে না; বরং কাঠের একটি কাঁটাওয়ালা কাঁকই নিয়ে বারবার তোমার কোঁচকানো চুল আঁচড়াতে থাকে, এত জোরে যে তুমি কঁকিয়ে ওঠ আর ভাব তোমার মিষ্টি বোন কোথায় গেল! এ কে, যে আমাকে কাঁদিয়ে মজা পায়।

তিন নম্বর ইট তোমার সবচেয়ে বড়ো ভাই। তুমি ওকে খুবই কম দেখো। প্রায়শই ওর হাতে একটি মোটা বই থাকে এবং চোখে মোটা কাচের চশমা। ও তোমাকে সেই সময় ভালবাসা দেখায়, যখন তুমি একা থাক। প্রথমে সে এদিক ওদিক তাকায়, বুঝে নেয় তুমি একাই তো। তুমি মনে মনে ভাব, ওর চোখে দুটি গোল গোল কি চমকাচ্ছে। ও তোমাকে থেকে থেকে এত উঁচুতে তুলে দেয় যেন তুমি আকাশ ছুঁয়েছ। ও তোমাকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয়, অনেক উঁচুতে। তুমি হঠাৎ ভয় পেয়ে যাও। আবার ও দুই হাত বাড়িয়ে দ্রুত কোলে টেনে নেয়। তুমি মজা পেয়ে হাসতে থাক। তোমাকে

হাসতে দেখে সে নিজে হাসতে শুরু করে। সে তোমাকে কাতুকুতু দেয় আর তুমি জোরে জোরে হাসতে থাক। এতে সে তোমার চেয়েও বেশি জোরে হাসতে থাকে। চেঁচামেচি শুনে বাড়ির সবাই এসে জড়ো হয়—মাসী, মা, রাঁধুনী, বড় বোন এবং তার বান্ধবী। সব্বাই বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে হাসতে থাকে। বড়ো ভাই লজ্জিত হয়ে তোমাকে ঝট করে মেঝেতে নামিয়ে দেয়। ছুটে পড়ার ঘরে গিয়ে ঝট করে দরজা বন্ধ করে দেয়।

এবার এই তিনটি ইট দিয়েই তুমি সারাদিন খেলা কর। তুমি ভাইয়ের চশমা খুলে নাও এবং তাকে একটি গরু বানিয়ে বোনের বিনুনিতে বেঁধে দাও। তুমি বড় বোনকে ফেণা দিয়ে ভরা গামলায় ফেলে দাও। সে চীৎকার করে। তুমি খুশি হও। খিলখিল করে হাস। আঙিনার এক কোনে মা তোমাকে দেখে মৃদু হাসি হাসেন, আর তকলিতে ডুরী চাপিয়ে ঘোরাতে থাকেন। তৎক্ষণাৎ সেই প্রথম ইট, যাকে তুমি কাক মনে কর, তোমার হাত থেকে বিস্কুট ছোঁ মেরে নিয়ে যায় ; আর তুমি রাগ করে ক্ষেপে গিয়ে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে থাকো। মা জিজ্ঞেস করেন—তুমি উঁ উঁ করে যাও।

না, না মা, আমি শৈশবের হাওয়ার কেল্লার কথা বলছি না। আমি ছোট্টবেলার, যৌবনের এবং বৃদ্ধ বয়সের হাওয়ার কেল্লার কথা ভাবছি, ছোট্টবেলার দুষ্টুমিতেও তুমি শৈশবের পুরনো খেলা ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনছো? ছোটবেলার জীবন একটি ধারাবাহিক হয়রানির জীবন ছিল। আব্বাজানের হুঁকো থেকে আরম্ভ করে কাগজে মোড়া ওষুধের পুরিয়া পর্যন্ত সুন্দর দেখা যেতো। তুমি একটি মাটির পুতুলে জীবন দিতে, একটি কাঠের ঘোড়ায় চেপে সারা বিশ্ব ভ্রমণ করতে, একটি কাগজের নৌকায় বসে সাত সমুদ্রের পারে চলে যেতে। তুমি কি তোমার কৈশোরের প্রিয় খেলা ভুলে গিয়েছিলে? ঠিক কথা, তুমি তোমার দূর কল্পনার সাহায্যে স্কুলের বাড়িতে আগুন ধরিয়েছো। তার শিখা আকাশ ছুঁয়েছে। কতবার মোটা বেঁটে মাষ্টারকে ইতিহাস পড়াবার সময় দু হাত দিয়ে জোরে টেনে একটা উঁচু খেজুরগাছের সঙ্গে উল্টো ঝুলিয়ে দিলে। সংসারের বা বিশ্বের কোন চেষ্টাই তাকে নীচে নামাতে পারেনি। আবার সব মাষ্টার, হেডমাস্টারসহ (এবং এখানে তুমি মৃদু হাসি হাস) তোমাকে সমীহ করে। আর তুমি একেবারে লাফিয়ে খেজুর গাছের ডগায় পৌঁছে যাও আর তোমার মাষ্টারকে কিছুক্ষণের জন্য নীচে নামিয়ে আনো এবং সে সারা জীবন তোমাকে ইতিহাসের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে না। হঠাৎ তোমার হুঁস ফিরে আসে—তুমি ঐ মোটা বেঁটে ইতিহাসের শিক্ষকের ঠিক সামনে বেঞ্চের উপর বসে আছো। সম্ভবত সে তোমাকে কোন প্রশ্ন করল। তুমি তার জবাব দিতে পারলে না। কি করে দেবে! তুমি তো মন ভালো করা হাওয়ার কেল্লা বানাতে ব্যস্ত ছিলে—সেখানেই একটি খেজুর গাছের উপর তুমি ঐ মাষ্টারকে শাস্তি দিয়েছিলে, আর তুমি এও জানো না যে সে কি প্রশ্ন করেছে? তুমি চুপ করে থাকো, সে আবার হাত ধরে টানে। আবার খেলতে খেলতে তোমার হঠাৎ অনুভব হয় যে তুমি স্কুলের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হয়ে গেছো। তুমি হকি খেলছো এবং বিপক্ষ দলকে গোলের পর গোল দিচ্ছো। চারিদিকে সামিয়ানা টাঙানো আর লোকে তোমাকে দেখে হাততালি দিচ্ছে। হাফটাইম হয়ে গেছে, তোমাকে চা, কমলালেবু, আড়ু আর কেক দেওয়া হচ্ছে। হেডমাষ্টার তোমাকে সাবাস জানাচ্ছে। হঠাৎ হুইসেল বাজল, আর তুমি হাতে একটা ব্যাট নিয়ে উইকেটে পৌঁছে খুব জোরে মারছো। 'ওই

মারল, ওই মারল'। বল আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠে ময়দান পেরিয়ে যাচ্ছে। স্কোর বোর্ডে তোমার নামের পাশে ছয়ের অক্ষর লেগে যাচ্ছে ; আর তোমার বন্ধুরা হয়রান হচ্ছে। 'ছয়—আরে একমারে ছয়'। 'তওবা, এই ছেলেটি বিপদের হলো দেখছি'। 'আরে এতো ছুপা রুস্তম বেরোলো'। তোমার ঠোঁটে হাসি ফোটে আর তুমি একের পর এক এমন মেরে যাচ্ছো যে বিপক্ষ দল ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি ছেলেদের কাঁধে উঠে ......

এ কি? বল কোথায় গেল? শোরগোল কেন? ক্যাপ্টেন আমার উপর রাগ করছে কেন? তুমি লজ্জায় মাথা নীচু করলে কেন? তুমি যখন গোলে দাঁড়িয়ে তোমার কল্পনার স্বর্ণ দুনিয়ায় খেলছিলে হঠাৎ বল তোমার পায়ের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গোলে ঢুকে গেল। তুমি কি ঘুমোচ্ছিলে—ক্যাপ্টেন তোমাকে রাগ করে জিজ্ঞেস করল। তুমি মাথা নীচু করলে, আর তোমার হাওয়ার কেল্লা মাটিতে মিশে গেল। আবার এরকমও হয় যে তোমার পরীক্ষা হয়ে গেছে। ফল বেরোবে। তুমি তোমার বৈঠকখানায় বসে আছো আর ভেবে নিচ্ছো, তুমি প্রত্যেক ক্লাসে প্রথম হচ্ছো, অষ্টম থেকে নবম, নবম থেকে দশম, এফ.এ, বিএ। প্রত্যেক ক্লাসেই জলপানি পাচ্ছ। তারপরে আই.সি.এস বা নিজের শহরে পুলিশ সুপারের উর্দি পরে, ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছো। লোকে চারদিক থেকে তোমাকে সেলাম জানাচ্ছে, তোমার মাথার পাগড়ীর সাদা পাক হাওয়ায় কাঁপছে। বাড়ি ঢুকলে ব্যান্ড বাজে, বাবা খুশী হয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরে। আর সেই ছোট ছোট চোখের রোগা পাতলা ছেলে যে ক্লাসে তোমার চেয়ে ভালো করত, আজ তোমাকে ঈর্ষা করছে। কিন্তু যখন ফল বেরোল, তোমার প্রত্যেক সহপাঠী জানতে পারল যে তুমি শুধু তোমার বাবার জোরে পাশ করেছ।

ও! তোমাকে যৌবনের হাওয়ার কেল্লার অবস্থা জিজ্ঞেস করব। জিজ্ঞেস করি, কেমন তারা—ঝিনুকের ভেতরের মুক্তোর মত ; কত নরম—জলের স্বচ্ছ বুদ্বুদের মতো ; কত সুন্দর—প্রেমের দৃষ্টির মতো। প্রেমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তোমাকে আকাশের উচ্চতায় নিয়ে যায় এবং পরের মুহূর্তে জমিতে আগাছার মতো বেড়ে ওঠা ঘাসের উপর ফেলে দেয়। সেখানে তুমি শুয়ে থাকা গানকে জাগিয়ে দিচ্ছো, অনুভবের অন্তঃশীল স্রোত যেখানে বঁয়ে যাওয়া নদীর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং কম্পমান আশমান অসম্পূর্ণ আকাঙ্খাগুলির মধ্যে বিদ্যুতের ঝলক এনে দেয়। তুমি কাঁটাভরা ময়দানে তোমার বেহুঁশ প্রেমিকাকে নিয়ে যাচ্ছো। পদে পদে কাঁটা তোমার পায়ে বিঁধছে, আর নতুন আঘাত আনছে। কিন্তু তুমি তাকে পরোয়া করছো না। সামনে এক আগুনের নদী। তুমি ওর ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছো। তোমার চুল ঝলসে যাচ্ছে। গায়ে পোড়া দাগ , চামড়া উঠে গেছে তবু তুমি তোমার প্রেমিকাকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলেছো। এবার ঠাণ্ডা হাওয়া ভরা একটি সুন্দর উদ্যান ; ফুলে ভরা রাস্তায় একটি ময়ূরের পালঙ্কে তোমার প্রেমিকাকে শুইয়ে দিচ্ছ। এবার তোমাকে একটি সাপ দংশন করেছে। প্রেমিকার হুঁশ ফিরছে এবং তুমি মারা যাচ্ছ। যৌবনের হাওয়ার কেল্লা কত আজব হয়! শৈশব, কৈশোরের সোনার কেল্লা যৌবনে এসে শেষ হয়ে যায়। শৈশবের সেই গিলিডাণ্ডা খেলার সঙ্গী যার সঙ্গে ভবিষ্যতের হাওয়ার কেল্লা গড়ে উঠেছিল, সে আজ কোথায়? শৈশব থেকে কৈশোর—সে সঙ্গ দিয়েছে। এবার হঠাৎ দুরন্ত যৌবনে কেন রাগ করে চলে গেল এবং সব কেল্লাগুলি ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সেই উদাসীন

মেয়ে যে উৎসাহ ভরে মিথ্যে বিয়ে করেছিল সে কেন অচেনা, অজানা লোকের স্ত্রী হয়ে চলে গেল এবং তোমাকে আঘাত দিয়ে গেল। হ্যা, যৌবনে মানুষ অনেক পুরনো হাওয়ার কেল্লাকে ভাঙতে দেখে এবং তার ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে তার শৈশবের সরলতা ও কৈশোরের দুষ্টুমিও চলে যায়।

কিন্তু পুরনো কেল্লাকে জলভরা চোখে বিদায় জানালেও অনেক নতুন নতুন কেল্লাও গড়ে নাও তুমি। তুমি তোমার শ্যামবর্ণ প্রেমিকার রঙকে চামেলীর মতো সুন্দর ভেবে নাও, পড়ে যাওয়া, পিছিয়ে যাওয়া সারির জাতিকে, দুনিয়ার বলিষ্ঠ জাতির সারিতে বসিয়ে দাও। নিজের দরিদ্র দেশের পতাকাকে এত উঁচুতে নিয়ে যাও যে বিশ্বসংসারের সমস্ত বিস্তার ওর ছায়ায় চলে আসে। নিজের টুটাফাঠা ঝুপড়ির জায়গায় তৈরী হয়ে যায় ঝকমকে লাল চুনীর প্রাসাদ এবং নিজের চরিত্রকে এমনভাবে সাজিয়ে নাও যেন মানুষ সর্বসম্মত ভোটে তোমাকে বাদশা বলে মেনে নেবে ; তুমি যেন দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো কবি, গদ্য লেখক, ছোট গল্প লেখক, রাজনীতিবিদ, সৈনিক, হাকিম ও সংস্কারক। তোমার মাথায় অশেষ খ্যাতির মুকুট চাপিয়ে দেওয়া হলো।

তবু তোমার চোখ খুলল, কেননা তুমি আগাছার একটি অফিসে, একটি আগাছা চাকরী পেয়ে আগাছা মাইনেতে থিতু হলে। তোমার মা-বাবা এই জগত ছেড়ে চলে গেছেন, তোমার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে গেছেন এক বিরক্তিকর স্ত্রীকে যদিও সে খুব অনুগত। প্রেমের স্রোত শুকিয়ে গেছে। ঘাসের ঝুপড়ি পুড়ে গেল। তোমার দেশ ও জাতি দরিদ্র হয়ে গেল। এত কিছু সত্ত্বেও হাওয়ার কেল্লার নির্মাণ চলতেই থাকে; যৌবনের পর বার্ধক্য আসে। এখন অতীতের সব কেল্লাগুলি বিলুপ্ত, তোমার জন্যে কিছুই অবশিষ্ট নেই। মনোযোগ এখন অন্যদের দিকে। বৃদ্ধ বাবা কেল্লা বানাল নিজের জোয়ান ছেলের জন্যে। বুড়ীমা নিজের কম্পিত কল্পনায় নিজের জোয়ান মেয়ের স্বামীকে দেখল—তার ঘোড়ার রেকাবে ছোট ছোট মুক্তা আটকে আছে। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, অপ্সরা নাচছে। সুন্দর জামাই নিজের মাথা শ্বাশুড়ীর পায়ে নত করছে।

নওজোয়ান নাতি ঠাকুরদার নামে একটি মস্ত হাসপাতাল তৈরী করেছে যাতে দুনিয়ার বাতের রোগীদের নিঃশুল্ক চিকিৎসা হয়, কেননা ঠাকুরদা নিজেই বাতের রুগী এবং ডাক্তারের ফিজ যোগাতে যোগাতে নাকাল হয়ে যাচ্ছেন। সর্বশক্তিমান খোদা সত্তর বছরের বেশি বয়সের বুড়োদের সব পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাদের মধ্যে বুড়ো ঠাকুরদাও রয়েছেন। সে আনন্দে নাচতে চাইছে, কিন্তু বাতের জন্যে পারছে না ; সে গাইতে চায়, কিন্তু তোৎলামি চলে আসছে ; শুনতে চায়, কিন্তু সারা বিশ্বের উপর একটি বিস্তীর্ণ নৈঃশব্দ নেমে আসে, তারপর চারিদিকে অন্ধকার, বা আলোয় আলো বা জলে জলময়—আবার অনুভব হয় যে আকাশের তারারা সব গুটিয়ে যাচ্ছে, ছোট হয়ে যাচ্ছে, শুধু ভার হয়ে থেকে যাচ্ছে, অন্ধকারের একটি ছোটোখাটো কণা যেন।

রোশনীর এক্‌ ছোট্ট ঝলক
জলের পাতলা ধারা
হাওয়ার কেল্লা গড়তে গড়তে
জীবনের পথ সারা।

উর্দু থেকে অনুবাদ ঃ ফহিম আনোয়ার
স্বপন দাসাধিকারী

কৃষণ চন্দরের একটি নাটকের বই প্রকাশিত হয়েছিলো—দরওয়াজা। এটি ছটি নাটকের সংকলন—দরওয়াজা, হজামৎ, নীলকণ্ঠ, কাহরা কী এক শাম, বেকারী, সরাত্র কে বাহর। বইটির প্রকাশক সর্দার মোহন সিং চৌহান, আজাদ বুক ডিপো, হালবাজার, অমৃতসর।

'শায়ের' বিশেষ সংখ্যা ১৯৪২-তে বেরিয়েছিলো দরওয়াজে খোল দো। এছাড়াও আরও এগারোটি নাটক বিভিন্ন সংকলনের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলো। সেগুলি হলো—মাঙ্গলিক, বদসুরৎ, রাজকুমারী, ঝাড়ু, হমসব গলীজ হেঁ, শিকস্ত কে বাদ, এক নাফেস্তই কী ডাইরী, এক রূপিয়া কে ফুল, হাইড্রোজেন বম কে বাদ, ইশ্‌ক কে বাদ, কিতাব কা কাফন, নকশে ফরিয়াদী।

সরাই-কে বাহর পরে চলচ্চিত্রায়িত হয়। পরিচালক ছিলেন কৃষণ চন্দর নিজে।

অনুবাদের সময় গানগুলির ভাষান্তরে একটু বেশি স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছে, যদিও মূলের ভাব অক্ষুণ্ণ আছে—সম্পাদক

সরাই কে বাহর

নাটকের পাত্রপাত্রী

অন্ধ ভিক্ষুক	
মুন্নি	অন্ধ ভিখারির যুবতী মেয়ে
ভিখারিণী	অন্ধ ভিখারির স্ত্রী
জানি ল্যাংড়া	একজন চালাক ভিখারী, ভিক্ষার শিল্প সম্পর্কে অবগত।
ভবঘুরে কবি	
সরাই-এর মালিক	
বিবি	সরাই-এর চাকরাণী
কয়েকজন শিকারী এবং তাঁদের স্ত্রীরা	

[এক পাহাড়ী শহরতলীর সরাই-এর দরজা থেকে কয়েক গজ দূরে অন্ধ ভিক্ষুক এবং তাঁর স্ত্রী আগুনে হাত সেঁকছে। মুন্নি সরাইয়ের বড়ো দরজায় দাঁড়িয়ে বিবির সঙ্গে কথা বলছে।]

মুন্নি।	বিবি, রুটি দেবে না? সকাল থেকে খাইনি।
বিবি।	দূরে দাঁড়া, মড়া, ভেতরে ঢুকে এসেছিল কেন? যা, চুপ্ করে গিয়ে বস্। যত ঢং।
মুন্নি।	বিবি, শুধু শুধু গালি দিচ্ছিস কেন?
বিবি।	আরে দুটাকার ভিখিরি। তোরও এত গরম। ওরে আমার লাজবন্তী! সারাদিন এদিক ওদিক দেখিয়ে বেড়াস, যাত্রীদের দেখে বেড়াস। রাতে সাধু হয়ে যাস! একদম সতী! উঃ, পেত্নী!
মুন্নি।	বিবি!
বিবি।	বিবির বাচ্ছা! গালি দিলে তার বদলে খেতেও দিই। তোকে আর তোর বুড়ো ভিখিরি বাবাকে। তোর মা পেত্নী গালাগালির বদলে খেতে পায়। সস্তাতেই তো খাবার পাস। আমাকে দেখ, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই সরাইয়ে এঁটো বাসন মাজি, কুঁয়ো থেকে জল তুলি। মালিক, মালকিনকে শত শত তোষামোদ করি। আর, আচ্ছা দেখ এই সময় আমাকে বিরক্ত করিস না। মুসাফিরখানায় খাওয়ার জন্য অনেক লোক জড়ো হয়েছে। আমাকে কেবিনের দেখভাল করতে হবে। খাওয়া হয়ে গেলে জানালায় এসো। ভাগ্যে যা পাবি নিয়ে যাবি। চোখের জল ফেলিস না। বড় বিরক্ত করে ভিখারিগুলো! ভিখারীগুলোকে যে কেন এখানে জড়ো হতে দেয়! [সরাইয়ের দরজা বন্ধ করে দেয়]
ভিখারিণী।	মুন্নি
মুন্নি।	যাই মা
ভিখারণী।	কি হলো মুন্নি?
অন্ধ ভিখারী।	মুন্নি বেটী, বড়ো ক্ষিদে পেয়েছে।
মুন্নি।	আমাকে খেয়ে ফেলো। ক্ষিদে পেয়েছে! সব সময়ই শুনি ক্ষিদে পেয়েছে! পেট না শনি! কখনো ভরছে না। ওদিকে বিবি গালাগালি করছে, আর এদিকে আমার জীবন শেষ করে দিচ্ছে। ক্ষিদে পেয়েছে—আমি রুটি কোথা থেকে আনবো? বিবি বলেছে, যখন জানালা খুলবে তখন রুটি পাওয়া যাবে।
অন্ধ ভিক্ষুক।	কখন জানালা খুলবে?
মুন্নি।	যখন মুসাফিরদের খাওয়া শেষ হবে।
অন্ধ ভিক্ষুক।	মুসাফিরদের খাওয়া কখন শেষ হবে?
মুন্নি।	যখন জানালা খুলবে!
অন্ধ ভিখারী।	যখন জানালা খুলবে! কখন জানালা খুলবে? আমি কিছু জানি না। আমি কিছুই জানি না ; মুন্নি, তুই কি বলছিস? অন্ধ হবার পর কেউ সময়ে আমাকে ভিক্ষার রুটি এনে দেয় নি। মুন্নির মা, তোমার

কাছে একটু রুটিও নেই? হ্যা, থাকবে না। আমি অন্ধ..... আমি বুড়ো......আমার অসভ্য মেয়ের উপর নির্ভর।

ভিখারিণী। সবুর কর। একটু পরে বিবি জানালা খুলবে। তুমি পেট ভরে খেতে পাবে। আজ সরাইতে অনেক মুসাফির এসেছে। আমি প্রতিদিন প্রার্থনা করি, সরাই মুসাফিরে ভরে যাক। তাদের পড়ে থাকা খাবার আমরা পাবো। অনেক কিছু...

মুন্নি। কিন্তু মা, মুসাফিররা এত পেটুক যে প্লেটে কিছু পড়ে থাকে না। খাবার একটুও বাঁচে না। বিবি যদি সদয় না হয় তো......!

ভিখারিণী। মুখ থেকে খারাপ কথা বের কোরো না। আল্লা সবার মালিক। তওবা তওবা। আজ বড়ো ঠাণ্ডা। হিমেল হাওয়া বইছে। ঝড়। শরীর কেটে কেটে যাচ্ছে। মুন্নি, আগুন একটু বাড়িয়ে দে (উনুনের কাঠগুলো এদিক ওদিক করতে লাগলো)

মুন্নি। চিড় গাছের কাঠে ধোঁয়া বেশি হয়। আগুন কম।

ভিখারিণী। জঙ্গল থেকে কাও গাছের কাঠ খুঁজে নিয়ে আয়। আমি তোকে কতবার বুঝিয়েছি।

মুন্নি। কাও-এর জঙ্গল খুব ঘন। আমার ভয় করে।

ভিখারিণী। পাগল নাকি! ভয় কিসের?

অন্ধ ভিখারী। মুন্নি, দেখ জানালা খুলল কিনা। এ কারা আসছে?

মুন্নি। মুসাফিররা, সরাইয়ের ভেতর যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়াচ্ছি। আব্বা, কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই। [চলে যায়]

ভিখারিণী। তুমি শুনেছ, মুন্নি কাও-এর জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে ভয় করে।

অন্ধ ভিখারী। হ্যা, মুন্নি জোয়ান হয়ে গেছে।

ভিখারিণী। তুমি ওর বিয়ে দিচ্ছো না কেন?

অন্ধ ভিখারী। এই শহরতলীতে তেমন ভিখারী কই? শুনেছি, শহরের ভিখারীরা খুব ধনী হয়। আমাকে একবার সরাইয়ের এক মুসাফির বলেছিলো, সে খবরের কাগজে পড়েছে, একটি শহরে, নাম মনে নেই, এক ভিখারী থাকত। যখন সে মারা গেল, মুন্নির মা, ষাট সত্তর হাজার টাকা রেখে মারা গেল। ষাট সত্তর হাজার টাকা কত, তোমার ধারণা আছে?

ভিখারিণী। না, কিন্তু আমি ভাবি, আমার মুন্নিরও এই রকম ভিখমাঙা মিলে যাবে।

অন্ধ ভিখারী। তুমি তো আমার কথা শোন না, সেই দোকানদার পাঁচশো টাকা দিচ্ছিলো ; ওর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলে... মুন্নি সুখী হতো, আমরাও।

ভিখারিণী। পাঁচশো টাকায় কি হতো তোমার?

অন্ধ ভিখারী। ঐ পাঁচশো টাকায়...আমি আবার একটা জমির টুকরো কিনে নিতাম, গরু পুষতাম। ছাগল ভেড়া পালতাম, আমার একটা ছোট্ট সুন্দর ঘর হতো—কাঁচা ম্যাটির বানানো, চক মাটি মাখানো। মুন্নির মা, জানো, ভিখারির দলে ঢোকার আগে আমি একজন কৃষক ছিলাম।

ভিখারিণী। আমি জানি। তুমি একথা কয়েকবার বলেছো।

অন্ধ ভিখারী। তুমি একটা বুড়ো অন্ধের কথা কখনো বিশ্বাস করবে? কিন্তু মুন্নির মা, আমিও ভালো দিন দেখেছি। আমার ঘরের চারধারে সুন্দর ক্ষেত ছিলো, দূরে এক পাহাড়, এক ঝলমলে নদী। ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে মিঠে মিঠে গান গাইতে গাইতে বয়ে যায় নদী, ঐ নদীর ধারে আমি আমার ভেড়া ছাগলদের নিয়ে চরাতাম, সেখানে লম্বা লম্বা ঘাস, বনস্পা ফুল, টক আনারের জঙ্গল, আর......

ভিখারিণী। আর তোমার বাবা ম্‌রা গেল। গাঁয়ের দোকানদারের কাছে ধার ছিলো। দোকানদার তোমাদের জমি ক্রোক করে নিলো। তুমি ভিখারী বনে গেলে। তুমি এলে আমাদের পাড়ায়। আমি এসব কথা ভালভাবে জানি। কিন্তু এখন তুমি ভিক্ষুক। তুমি আগেও ভিক্ষুক ছিলে, ভিক্ষুকই থাকবে সবসময়, একজন ভিখারীর মতই মরবে। শুধু এটুকুই ঠিক, বাকি সব মিথ্যা। তোমার বাবাও কৃষক ছিলো না, আমার মাও ধনী ছিলো না। আমি জানিনা, আমার মা কে ছিলো! কল্পনা করি, সে একটি পেত্নী। আমি বাজারে লোকের পিছনে ছুটে ছুটে যে পয়সা পেতাম, সে সব কেড়ে নিতো। রাতে খালি পেটে রেখে দিত, যাতে আমি মোটা হয়ে না যাই।

[দুজন মুশাফির প্রবেশ করে]

ভিখারিণী। কে?

অন্ধ ভিক্ষুক। কে?

কবি ও জানি ল্যাংড়া। মুসাফির হ্যায় বাবা, একটু আগুনে সেঁকে নিই।

অন্ধ ভিখারি। মুসাফির তো সরাইয়ে যাও, আমাদের ফকিরদের কাছে কি কাজ তোমাদের?

জানি ল্যাংড়া। সরাইয়ের ভেতরে যাবার ক্ষমতা থাকলে তোমার সঙ্গে কে কথা বলত?

অন্ধ ভিখারি। তুমি কে?

জানি ল্যাংড়া। আমার নাম জানি ল্যাংড়া, আগে আমি নূরপুরে ভিক্ষা করতাম, কিন্তু সেখানে পুলিশ বিরক্ত করে। বেচারা ভিখারিদের রোজ থানায় হাজিরা দিতে হয়। আমার পা ল্যাংড়া, তার উপর দু'চারটে পুরনো জখমি। বসে বসে সরাইয়ের রুটি পাওয়া যেতো। মরুক পুলিশ ব্যাটারা!

অন্ধ ভিখারী। তোমার সঙ্গে আর একজন কে?

জানি ল্যাংড়া। একেই জিজ্ঞেস করে নাও।

কবি। আমি......আমি একজন কবি।

অন্ধ ভিখারী। কবি কাকে বলে? বড় বড় ভিখিরি দেখেছি—নানা ধরনের। কিন্তু এই ধরনের ভিখিরির খবর আজ প্রথম শুনলাম।

জানি ল্যাংড়া। আরে বাবা, এ কবি গীত লেখে, আর গ্রামে গ্রামে শুনিয়ে নিজের পেট ভরায়।

অন্ধ ভিখারী। হ্যা, হ্যা, তাকে ভাট বলে। বলো, আমি ভাট।

কবি। আজব নাম বের করেছো।

জানি ল্যাংড়া। একে আমি রাস্তায় পেয়েছি। আমি বললাম, সফরে দুজন হলে রাস্তা তাড়াতাড়ি ফুরোয়। এই জন্যে এক সঙ্গে নিয়ে এলাম। বাবা, তুমি তো এখানে খুব মজায় আছো। এই বুড়ি কে?

অন্ধ ভিখারী। এ আমার বিবি। [পায়ের শব্দ] আমার মুন্নি আসছে, আমার মেয়ে মুন্নি। মুন্নি, এ জানি ল্যাংড়া। ও একজন কবি, কবিতা লেখে। বিবি জানালা খুলল? হ্যা, তুই চট করে খাবার দে।

মুন্নি। বিবি বলছে, খাবার পরে পাওয়া যাবে। আজ সরাইয়ে মুসাফিরদের খুব ভিড়।

অন্ধ ভিখারী। কিছুটা তো দিয়ে দিতে পারতো। আমি ক্ষিদেয় মারা যাচ্ছি।

কবি। একটা মকাই আছে। পুড়িয়ে খেয়ে নাও।

অন্ধ ভিখারী। কই, কোথায়? কোনখানে? মুন্নি, এটা আগে পুড়িয়ে দাও। উঃ আজ কি শীত। আজ এই গরম গুদড়িতেও প্রাণ যাবার অবস্থা...কৌন হ্যায়, কি আছে, কোন ধনী লোকের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে; মুন্নি, যাও, ছুটে যাও।

জানি ল্যাংড়া। আমিও যাই তোমার সঙ্গে ; দু এক পয়সা আমিও পেতে পারি। মুন্নি, আমাকে একটু সাহায্য কর...আঃ

[সরাইয়ের দরজায় এক ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল]

প্রথম শিকারী। উঃ বন্ধু, বড় ক্লান্ত আজ।

প্রথম বিবি। সরাই দেখে মনে হচ্ছে কষ্ট হবে। আমাকে একটু সাহায্য কর। Thank you.

দ্বিতীয় বিবি। আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। তার উপর যা শীত। কাল ঘরে পৌঁছে ধন্যবাদ দেব।

দ্বিতীয় শিকারী। শিকারে পুরুষদের সঙ্গে আসা কোন হাসি ঠাট্টার ব্যাপার নয়। আজ আমি তোমার সাহস দেখে নিলাম। Oh, how brave you are, my Courageous knight.

মুন্নি। সাহেব, এক পয়সা। মেম সাহেবের সঙ্গে মজায় থাকো। একটা পয়সা দাও।

জানি ল্যাংড়া। গরিব, অসহায় ল্যাংড়ার উপর করুণা করে যাও।

তৃতীয় শিকারী। Oh Damn, কমবখত হর জগহ মজুত হ্যায়। কে জানত, এই out of the way সরাইয়েও এই সব Creature মাথা খারাপ করতে হাজির হবে।

মুন্নি। মেম সাহেবদের জুটি বজায় থাকুক। সাহেবের ভাগ্য ভালো হোক, মেমসাহেবজী আপনার এক খুবসুরৎ বাচ্চা হোক ...।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিবি। Now indecent push, চলো জলদি, অন্দর চলো ; নইলে এই ভিখিরিরা শেষ করে দেবে।

[সরাইয়ের ভেতরে ঢুকে পড়ে]

প্রথম শিকারী। হ্যা, চলো তোমরা। আমি জিনিষপত্র একটু সাজিয়ে রাখি। ভাই, হুইস্কি কোথায়?

তৃতীয় শিকারী। ক্যারিয়ারে, চিন্তা কোরো না। এসব ভুলি নাকি!

মুন্নি। কুছ মিল যায়ে হুজুর।

দ্বিতীয় শিকারী। বেয়ারা, এদের কিছু দাও।

[বেয়ারা মুন্নিকে দু আনা দিলো]

সরাইয়ের মালিক। আইয়ে আইয়ে হুজুর, অন্দর তসরিফ লে আইয়ে।

প্রথম শিকারী। তুমি এই সরাইয়ের মালিক?

জানি ল্যাংড়া। হুজুরেব বাড়বাড়ন্ত হোক। এই গরিব ল্যাংড়ারও কিছু মিলে যাক।

প্রথম শিকারী। ওঃ, জলদি এই blody begger-কে কিছু দিয়ে বিদায় করো। তুমি এই সরাইয়ের মালিক, দরজায় ভিখিরি বসিয়ে রেখেছো।

দ্বিতীয় শিকারী। মুসাফিরদের দুদিক থেকেই লুঠে নাও—ভেতরে, বাইরে।

সরাইয়ের মালিক। হুজুর অন্দর তসরিফ লাইয়ে। সবাইয়ের বাইরের জমির মালিক আমি নই। হুজুর, ভেতরে আসুন।

মুন্নি। সাহেবজী আপভি।

তৃতীয় শিকারী। এই ভিখিরী মেয়েকে তো বেশ লাগছে। তুমি কি বলো?

দ্বিতীয় শিকারী। ইস্, যতো বাজে কথা। বেয়াবা, সব সামান ঠিক হ্যায়?

বেয়ারা। জী, হুজুর।

প্রথম শিকারী। চলো ভাই, অন্দর চলো। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ঠাণ্ডায় জমে যাবে।

সরাইয়ের মালিক। অন্দর তশরিফ লে চলিয়ে হুজুর।

মুন্নি। সাহেবজী, আপভি এক দুআনি

[সাহেবরা সরাইয়ের ভেতরে ঢুকে যায়]

বেয়ারা। ভাগো ভাগো হিঁয়াসে। কখন থেকে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। মুস্টান্ডি কাঁহিকি।

অন্ধ ভিক্ষুক। কুছ মিলা?

জানি ল্যাংড়া। এক এক আনি

মুন্নি। ঔর এক দু আনি মুঝে ভি।

জানি লাংড়া। যুবতী নারীকে লোকেরা এমনি বেশি ভিক্ষা দেয়। তোমার মেয়েও তো......

অন্ধ ভিখারী। হ্যা, এক দোকানদার এর বদলে পাঁচশো টাকা দিচ্ছিলো। কিন্তু মুন্নির মা......

জানি ল্যাংড়া। মুন্নির মা বুদ্ধি খাটাল। যদি তুমি বুদ্ধি খাটাও, এই মেয়ে তোমার সারা জীবনের রুটি আনতে পারে। কি কবি মশাই, তুমি কি বল?

[চুপ করে থেকে]

কবি ভাই।

কবি। কি বললে! আমি শুনিনি।

জানি ল্যাংড়া। হিঃ হিঃ হিঃ, 'ভালই হলো, তুমি শোননি। তুমি কি কবিতা লিখছিলে?

কবি। একটি নতুন কবিতা।

জানি ল্যাংড়া। জরা শুনাও। সারেঙ্গীটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দাও।

কবি। ভিখিরি আমি, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি
বিশাল ধরণী, ভবঘুরে হেঁটে চলি
ভালবাসা নেই, কেউ নয় মোর প্রিয়
শুধু যদি বলে অশ্রুর ভাগ নিও
ছুটে চলে যাই, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি
ভবঘুরে আমি গানে গানে কথা বলি

অসহায় গান তারায় তারায় ভাসে
ভিখিরির মতো দুয়াবের পাশে আসে
গান দেখো আজ কান্নার মতো ঝরে
এ গান আমার, আমার মতই ভবঘুরে।

তুমি কাঁদছ কেন বাবা?

অন্ধ ভিখারী। আমার সুখের দিন মনে পড়ল, ধানের মধুর ক্ষেত, বয়ে যাওয়া নদীর নির্মল জল। আমি ছাগল চরাতাম। আমার মা ঘুমপাড়ানী গান শোনাত। বাবা কাঁধে করে শহরতলীর বাজারে নিয়ে আসতো।

ভিখারিণী। ঝুট হ্যায়, বিলকুল ঝুট হ্যায়, আমি একে এই শহরতলীর বাজারে ভিক্ষা চাইতে দেখেছি। হুঁ, কিসানকা ব্যাটা থাকে সরাইয়ের বাইরে, আর স্বপ্ন দেখে মহলের।

কবি। হ্যা, হ্যা, ঠিকই বলেছ। আমরা সরাইয়ের বাইরে থাকার লোক—কুকুর আর ভিখারী। মুসাফিরদের বেঁচে যাওয়া খবারে পেট ভরাই। প্রায়ই পেট ভরেও না। আমাদের এরকম সোনালী স্বপ্ন দেখা উচিত নয়।

জানি লংাংড়া। মিএগ্র, এই কথা ভেবে কি হবে? আমি বুঝেছি আমি জীবিত অবস্থাতেও ভিখারী, মরেও ভিখারী—এটা ইমানের কথা। এই পেশা এত খারাপ নয়। বসে বসে রুটি পাওয়া যায়। লোকে দুচারটে গালমন্দ করে; কিন্তু কোন পেশায় গালাগালি নেই? আমি বড়ো বড়ো লোককে দেখেছি—গালি শোনে, কিছু বলে না, প্রতিবাদও করে না ; বন্ধু আমি অনেক ভেবে এই পেশা পছন্দ করেছি।

[সবাই চুপ করে থাকে]

মুন্নি। কবি, তোমার সব কবিতাই কি এই রকম?

কবি। তুমি কি বলতে চাও, মুন্নি?

মুন্নি। খুব খারাপ কবিতা তোমার। বাবার চোখে জল আনল, আমারও।

কবি। তুমিও!

মুন্নি। হ্যা, আমার চোখেও জল এসে গিয়েছিলো।

কবি। মুন্নি, আমার কাছে জলের একটি ভাণ্ডার আছে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেছে বেছে আমি চোখের জল জড়ো করেছি। এই অশ্রুতে মানুষের কাহিনী আছে। তুমি কখনো এই ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুর ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখেছো? এতে মাইলের পর মাইল লাল আগুনের ময়দান আছে, লক্ষ লক্ষ শিখা লকলকে জিভ বের করে আশমানের দিকে চলে যাচ্ছে। এই অশ্রুর দিগন্ত সব সময় কালো মেঘে ঢাকা—সেখানে আহতদের যন্ত্রণার শব্দ, কচি বাচ্চার কান্না, বিধবা নারীদের যন্ত্রণা। এখানে কখনো কখনো ভয়াবহ বিজলী এঁকে বেঁকে চলে যায়। বড় বড় সাহসীদের মনও ভয়ে কেঁপে ওঠে।

মুন্নি। হায়, তুমনে মুঝে ডরা দিয়া।

কবি। কিন্তু এই অশ্রুর পেছনে সাতরঙের রামধনুকের নরম ও কোমল দোলনা দেখা যায়। সে কিছুক্ষণের জন্য। সেই কালো মেঘ আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ শিখার লাল পাতলা জিভগুলি আশমান ছুঁয়ে যায়, কথা বলে।

মুন্নি। আমি কখনো দোলনায় বসিনি।

কবি। সাতরঙের রামধনুতে বসতে পারো? তুমি খুবই সাধারণ, মুন্নি। এখন পর্যন্ত কোন মানুষ এই রামধনু ছুঁতে পারেনি। ছোঁয়া তো দূরের কথা, অনেকে একে দেখতেও পায়নি। আমি কখনো কখনো একে দেখেছি। এই রামধনু প্রতিটি মানুষের অশ্রুতে ঝিলমিল করে না। হ্যা, যখন গান করি, আর যখন আমার গান শুনে নিষ্পাপ শিশুর চোখে জল আসে, সেই সময় আমি এই রামধনুকে এক পলকের জন্যে দেখে নিই। যদি সেই ধনু প্রতিটি অশ্রুতে দেখা যায়, তবে এই জাহান্নামের আগুন চিরদিনের মতো নিভে যায়।

মুন্নি। তবে কি হবে কবি? তুমি আজব লোক!

কবি। যা হবে তা তুমি চোখে কখনো দেখনি, তুমি সবসময় যে জানালা খোলার আশা নিয়ে থাকো, তা চিরদিনের জন্যে খুলে যাবে।

মুন্নি। সেইজন্যেই কি তুমি সংসারের বিভিন্ন প্রান্তের অশ্রু জমা করছ?

কবি। হ্যা।

মুন্নি। আব্বা, আব্বা, এই মুসাফির বলছে সে সংসারের বিভিন্ন প্রান্তের অশ্রু জমা করছে। এই সরাইয়ের জানালা চিরদিনের জন্যে খুলে যাবে।

[জানি ল্যাংড়া, মুন্নির মা, আব্বা আর মুন্নি খিলখিল করে হাসতে থাকে]

জানি ল্যাংড়া। কবিরা সবাই পাগল হয়।
[তীব্র হাওয়া বইতে থাকে। দূর জঙ্গলে শিয়াল ডেকে ওঠে]
ওঃ বরফের মতো ঠাণ্ডা হাওয়া। বেচারা মানুষ কি করবে, শিয়ালও শীতে চীৎকার করে যাচ্ছে।

অন্ধ ভিখারী। তুমি সেই ঘটনাটা শোননি? এক ছিলেন রাজা। তিনি শীতের দিনে শিয়ালদের ডাকতে শুনে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মন্ত্রী বললেন, মহারাজা এই শিয়ালদের শীত করছে। মহারাজ হুকুম দিলেন ওদের মধ্যে কম্বল ও লেপ বিলি করা হোক। [কবি হাসে] [খেপে গিয়ে] হাসছেন?

কবি। আমি জিজ্ঞেস করি, ঐ রাজার শহরে কোন ভিখারী ছিলো না?

অন্ধ ভিখারী। ভিখারী থাকবে না কেন? এই কবি কি রকম কথা বলে। যেখানে রাজা থাকে সেখানে ভিখারীও থাকে। কিন্তু তার সঙ্গে এই কাহিনীর সম্পর্ক কি। আমি গল্প বলছি, তুমি তার মাঝে খামোকা বাধা দিচ্ছ। কি রকম লোক তুমি?

জানি ল্যাংড়া। ওকে মাফ করো। তুমি তো জানোই যারা কবিতা লেখে, তারা অর্থহীন কথা বলে।

মুন্নির মা। শেয়ালের গল্প শুনে আমার একটা কথা মনে পড়ল। একবার আমি রাস্তায় বসে ভিক্ষা চাইছিলাম আর বলছিলাম—কোই রুটি, কোই পয়সা, ভিখারী ভুখি হ্যায় বাবা। তখন দেখি সামনে দিয়ে খুব সুন্দরী একটা মেয়ে যাচ্ছে ; তার পোষাক রেশমের, মাথা থেকে পা পর্যন্ত গয়নায় ভরা, সঙ্গে ছিলো মিষ্টি ছোট্ট একটি মেয়ে। আমি ওদের দেখে আরও অসহায় স্বরে বললাম, 'কোই রুটি, কোই পয়সা, ভিখারণ ভুখি হ্যায় বাবা'। শুনে সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। নিজের বটুয়া থেকে একটি পয়সা বের করল। ছোট্ট মেয়েটি বলে উঠল, 'মা, এর ক্ষিদে পেয়েছে।' মা বলল, 'হ্যা, বেটী।' ছোট্ট মেয়েটি বলে উঠল, 'মা, যদি ক্ষিদেই পেয়েছে, বিস্কুট খাচ্ছে না কেন?' বিস্কুট, শুনেছ মুন্নির বাবা, বিস্কুট, [হাসতে থাকে, জোরে জোরে হাসতে থাকে] ওর মা জোরে এক চড় মারল, তারপর মেয়েকে নিয়ে এগিয়ে গেল। বিস্কুট! [শুকনো হাসি হাসল]

অন্ধ ভিখারী। ভাই, আমার গল্প শেষ হয়নি, তোমরা মাঝখানে...

বিবি। [দূর থেকে] মুন্নি, মুন্নি, মুন্নি বেটা।

অন্ধ ভিখারী। জানালা খুলে গেছে, মুন্নি, জানালা খুলে গেছে। বিবি তোকে ডাকছে। ছুটে যা।

বিবি। মুন্নি, মুন্নি।

জানি ল্যাংড়া। বিবি জানলায় নেই। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

ভিখারিণী। মুন্নি, ছুটে যাও।

মুন্নি। যাই, বিবিজী [দৌড়ে যায়] বিবি এবার খাবার দেবেই।

বিবি। হ্যা, হ্যা, পেত্নী, তোকে খাবার কেন, অনেক ভালো ভালো জিনিস দেব। চল, সরাইয়ের ভেতর চল। সরাইয়ের মালিক তোকে ডাকছে।

মুন্নি। আহা, আহা [তালি বাজিয়ে] সরাইয়ের মালিক কোথায়? [সরাইয়ের দরজা বন্ধ হয়ে যায়]

ভিখারিণী। মুন্নি সরাইয়ের ভিতর চলে গেল?

জানি ল্যাংড়া। বিবি মুন্নিকে নিয়ে সরাইয়ের ভিতর ঢুকল। সরাইয়ের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

অন্ধ ভিখারী। সরাইয়ের ভিতর চলে গেল, কি বলছ! জানি? আমার মুন্নি তো আজ পর্যন্ত সরাইয়ের ভেতর যায়নি...মুন্নি কিভাবে সরাইয়ের ভিতর গেল? সরাইকে অন্দর? ...মুন্নি...মুন্নি...মুন্নি

কবি। একদিন না একদিন ওকে সরাইয়ের ভিতর যেতেই হতো।

অন্ধ ভিখারী। নেহী, মেরী বেটী।

কবি। আজ সরাইয়ের অতিথিশালা তার জীবনকে দুভাগে ভাগ করে দিল—সরায়কে অন্দর ঔর সরায়কে বাহার। আর মুন্নির ইজ্জৎ এই সরাইয়ের অতিথিশালার চারধারে ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়াবে। জানি, আগুন একটু বাড়িয়ে দাও। আমার গান এই ঠাণ্ডা রাতে শীতে কুঁকড়ে যাচ্ছে। গান এই ঠাণ্ডায় শেয়ালের মতো, ঠাণ্ডায় কম্বল কোথায় পাবে? সে অন্ধ ভিক্ষুকের লেপের মতো ; তার তলা দিয়ে ঠাণ্ডা ঢোকে শূলের মতো। আমার গান ক্ষুধার্ত, নগ্ন, পিপাসার্ত—ওদের কেউ বিস্কুট দেয় না, আমার গানগুলো সংসারে পচা, গলা, জখমী। আজ পর্যন্ত সে কারো শুশ্রূষা করেনি।
[সারেঙ্গী বাজাতে শুরু করে]

জানি ল্যাংড়া। হিঃ হিঃ হিঃ, ঠাণ্ডায় বেচারা পাগল হয়ে গেছে।

কবি। গান দেখো আজ কান্নার মতো ঝরে
এ গান আমার আমার মতই ভবঘুরে
ক্ষুধায় আতুর, কান্নার ঝুলি কাঁধে
শীতের হাওয়ায় খালি গায়ে শুয়ে কাঁদে
রাতের এ গান তারাদের সাথে ঘোরে
এ গান আমার, আমার মতই ভবঘুরে।

ভালবাসা তুমি কতদূরে নিয়ে যাবে
শরীরের শেষে মনের খোঁজ কি পাবে?
ভিখিরি চলেছে হাতে ভিক্ষার থালা
আকাশের নীলে তারার প্রদীপ জ্বালা
ভিক্ষার থালা দুয়ারে দুয়ারে ঘোরে
মন খুঁজে খুঁজে গান হলো ভবঘুরে।

[অন্ধ ভিক্ষুক তার ছিন্ন লেপ গোছাতে থাকে]

ভিখারিণী। কোথায় যাচ্ছো, মুন্নির বাবা?

অন্ধ ভিখারী। আমি আমার মুন্নিকে ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছি। আমি সরাইয়ের দরজায় ঠক ঠক করব, চেঁচামেচি করব, চিল্লাব, গালাগালি করব,

	কি ভেবেছে এরা? আমি কৃষক ছিলাম। আমারও ঘর ছিল, গরুর বলদ ছিলো, সুন্দর ক্ষেত ছিলো......মেরী মুন্নি।
জানি ল্যাংড়া।	চলো চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। এসো কবি মশাই।
	[আস্তে আস্তে এগোয়]
	দরজায় ঠক ঠক করো
	[খট খট]
	কেউ সাড়া দিচ্ছে না।
	[খট খট]
	সরাইতে সব চুপচাপ।
	[খট খট]
	সবাই ঘুমিয়েছে
	[খট খট]
কবি।	[ব্যঙ্গ করে] মুন্নিও ঘুমিয়ে থাকতে পারে!
অন্ধ ভিখারী।	[চীৎকার করে] দরওয়াজা খোল দো, সরাইয়ের বদমাইস কুকুর। দরজা খুলে দে, আমার মুন্নিকে ফিরিয়ে দে। দরওয়াজা খোল দো। আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দে। আমি মুন্নির বাবা। দরজা খুলে দে। দরওয়াজা খোল দো।
	[খট খট]
	আঃ, শয়তান সব, জাহান্নামে যা ব্যাটারা! আমার মুন্নিকে ফিরিয়ে দে। ও তোদের কি ক্ষতি করেছে? আমি কি ক্ষতি করেছি? তোরা আমার ঘর কেড়ে নিলি, সোনালী ক্ষেত কেড়ে নিলি, আমার সুন্দর গরুর জুটি, আমার চোখ দুটোও উপড়ে নিলি—আজ আমি অন্ধ, তোদের দরজার ভিখিরি। দরজা খোল, খোল দো।
	[খট খট]
	একটা অন্ধ ভিখারির উপর দয়া কর বাবা, তার বার্দ্ধক্যের সম্বল মেয়েটাকে ফেরৎ দিয়ে দাও। আমার মুন্নিকে ফেরৎ দিয়ে দাও, তোমাদের থেকে কিচ্ছু চাইব না আমি, চুপচাপ এখান থেকে চলে যাব। জঙ্গলের শেয়ালদের সঙ্গে থাকব, চুপচাপ চলে যাব। চুপচাপ
	[খট খট হালকা ভাবে, আস্তে আস্তে কাঁদতে কাঁদতে বলে]
কবি।	[দুঃখের স্বরে] আমি জানতাম, এই সরাই কখ্খনো খুলবে না। এই সরাই কখনো ভুলবে না, এর বুকের পাথরে সরাইয়ের প্রত্যেকটি নিঃশ্বাস জমে আছে। সেই পাথর প্রতিদিন তোমার পায়ে লাগে। তোমাকে জখম করে। এই পাথর দিয়ে তৈরী হয়েছে সরাইয়ের দেওয়াল। সরাই-এর বুক পাথরের, এর বুকে শ্বাস-প্রশ্বাস কাঁপে না। আর যেখানে বুক কাঁপে না, সেখানে কোন শব্দও হয় না। এই জন্যে সরাই স্তব্ধ হয়ে আছে। তবু ঘাবড়ে যেও না। এই স্তব্ধ সরাইতে যে শক্তি মুন্নিকে গিলে নিয়েছে, সময় এলে সেই ওকে উগরে দেবে। এসো আগুনে হাত সেঁকে নিই।
	[মুন্নি বেরিয়ে আসে]

অন্ধ ভিখারী। আমার কাছে চলে আয় বেটী [অন্ধ মুন্নির গলা টিপে ধরতে চেষ্টা করে, মুন্নি চীৎকার করতে থাকে। কবি এবং জানি ল্যাংড়া দুজনকে আলাদা করে দেয়]

মুন্নি। ক্যায়া বাত হ্যায় আব্বা . .... কেয়া বাত হ্যায়? তুমি আমাকে [বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে] মেরে ফেলবে। আমি তোমার জন্যে খাবার এনেছি। নিজের জন্যে সুন্দর কাপড় পেয়েছি। কবি, আমার গায়ে কেমন মানায় দেখ। ভালো লাগছে না?

ও আমাকে খুব ভালবাসে। বলছিলো, যখন সরাইয়ের বাইরে তোমাকে দু-আনা দিযেছিলাম, তখন থেকেই তোমাকে ভালবাসতে শুরু করেছি; ওর কথায় অনেক মজা। ও যে আমাকে খুব ভালবাসে। কবি, সে বলে, আমি তোমাকে বিয়ে করব। ও কাল নিজের বাড়ি যাবে। ও ওখান থেকে সরাইয়ের মালিককে লিখবে। আমার জন্যে সুন্দর চার ঘোড়ার গাড়ি আসবে। ওতে করে আমি নিজের স্বামীর কাছে যাবো। আম্মা, তোমার মনে আছে, একবার এক ভিখারী আমার হাত দেখে তোমাকে বলেছিল, এই মেয়ে বড়ো হয়ে শাহাজাদী হবে। ভিখারিনী থেকে শাহাজাদী। ও একজন আমীর। মাইলের পর মাইল তাব ক্ষেত। ওর অনেক জোড়া হালবলদ আছে। ওর বাড়ি লাল ইটে তৈরী আর তার চারদিকে বড়ো বাগান আছে। সে অনেক ভালো লোক। আমি ওকে বললাম, আমার মা বাবাকে সঙ্গে ক রে নিয়ে যাবো। সে বলতে লাগল, এতো খুব ভালো কথা। আমি ওঁদের জন্য একটি আলাদা বাড়ি করে দেব। তোমার বাবার জন্যে ক্ষেত ও জোড়া বলদ কিনে দেবো। তুমি আমার সঙ্গে যাবে তো আব্বা? আম্মা, তুমি আর ভিখারী থাকবে না। দরজায় দরজায় ভিক্ষা চাইতে হবে না। বিবির গালি শুনতে হবে না। সরায়ের বাইরে শীতে কুঁকড়ে ঢিমে আগুনে তাপতে হবে না। হ্যা, জানিকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। আমি ওকে বলে দেব। ও খুব ভালো লোক। কবি, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে। তোমার সুন্দর গান শুনে ওর চোখে জল এসে যাবে। কি, ঠিক আছে তো? ঠিক তো আব্বা? [বিরতি] আম্মা [বিরতি] জানি [বিরতি] তোমরা সবাই চুপ করে আছো কেন? কবি, তোমার কি হলো? কথা বলছেন না কেন? [ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে] কেউ কিছু বলছো না কেন? .. ... [ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে]

কবি। মুন্নি, কেঁদোনা, আজ তুমি সত্যিকারের কালো অন্ধকার রাতের শাহজাদী, এই সরাইয়ের রাণী ; তোমার জামাকাপড় রেশমের, তোমার চুলে গোলাপের ফুল আটকানো, তোমার ঠোঁটে প্রেমের চুম্বন, twinkling. আজ রাতে তুমি সাত রঙের রামধনু দেখেছ। আজকের রাতে সে তোমার স্বামী, আজ রাতে সে তোমাকে চার ঘোড়ার গাড়িতে বসিয়ে নিজের বৌ করে নিজের ঘরে নিয়ে

গেছে। আজকের রাতে সে তোমাকে নিজের সোনা ও জহরৎ দিয়ে তৈরী মহল ঘুরিয়ে দেখিয়েছে, তোমার কোমরে হাত দিয়ে নিজের বিস্তীর্ণ প্রাসাদে ঘুরিয়েছে। মুন্নি, কেঁদো না। এই খুশির অশ্রু সামলে রেখো, এই অশ্রু আর ফিরে পাবে না। আজ রাতে তুই কি হারালি আর কি পেলি? হয়তো এই তথ্য এই সময়ে জানতে পারবি না। কাল যখন সেই মুসাফির নিজের চার ঘোড়ার গাড়িতে চেপে নিজের সোনার মহলে ফিরে যাবে, তখনই তুমি বুঝতে পারবে, এই নির্দয়ী সরায়ের পাথর দিয়ে তৈরী অতিথিশালায় তোর বিয়ে হয়েছে, যার দরজায় তোর বাবা মাথা ঠুকে ঠুকে অন্ধ হয়ে গেছে। মুন্নি কেঁদো না। কান্নার জন্যে সারা জীবন পড়ে আছে। কাল তুই বুঝতে পারবি, রামধনু অদৃশ্য হয়ে গেছে ; ওই সোনার মহল ছাই এর স্তুপ হয়ে গেছে। বিরাট বাগান আর ক্ষেতে ফসল ফলে না, তার উপর দিয়ে বালির ঝড় বয়ে গেছে, চারিদিকে ঘূর্ণির শব্দ—আর তুই নিজের ছেড়া খোঁড়া লেপ লেপ্টে হাত বাড়িয়ে এদিক ওদিক ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছিস—কোই রোটি, কোই পয়সা, ভিখারিণী আছি ......

মুন্নি। না, না কবি, এ কি ছবি দেখাচ্ছো তুমি? এ কোনদিন হবে না। আমি কারও ক্ষতি করেছি?

কবি। তোর দুর্ভাগ্য যে তুই সৌন্দর্যের চিরন্তন খুশী থেকে, চিরকালীন মুহূর্ত থেকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন আত্মাকে বের করে এমন একজনকে দিয়েছিস যে এর মূল্য জানে না। এই মুহূর্তে যার জবাব চাঁদ ও সূর্যের কাছেও নেই। মানুষ এখন মানুষ নেই। সুন্দর, পবিত্র কিছু দেখলেই তার ক্ষতি করে, অত্যাচারীকে সে পুজো করে, নরম অনুভবকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দেয়।

জানি ল্যাংড়া। চ, চ, চ। ও বেচারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। বেচারা, পাগল হয়ে যাবে। চাঁদ, সূর্য, রামধনুর সঙ্গে টাকার সম্পর্ক কি? অনেক মাথা খারাপ করেছ, এরপর যদি তুমি সাধারণভাবে কথা না বল, তাহলে জানি ল্যাংড়া তোমাকে পায়ের খেলা দেখাবে। আমার পা ল্যাংড়া হলেও খুব চলে। বড়ো এসেছিস তুই, মুন্নিকে বোঝাবার লোক! চলে যা এখান থেকে। [কবি আস্তে আস্তে পাকদন্ডীর দিকে পা বাড়ায়]

[কিছুক্ষণ সব চাপচাপ]

মুন্নি। কবি দাঁড়াও। আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো।

কবি। না, আমার সময় নেই। আমি তোমার কান্না আমার সঙ্গে নিয়ে চললাম। প্রেম করা বা আহত জীবনের শুশ্রষা আমার কাজ নয়। আমি পৃথিবীতে শুধু কান্না জড়ো করি [চলে যায়]

[স্তব্ধতা। জঙ্গলে শেয়ালের ডাকের শব্দ]

পর্দা পড়ে।

হিন্দী থেকে অনুবাদ ঃ কিশোর কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষণ চন্দর

অন্তিম হাসি

কমরেড ভরদ্বাজের সাথে আমার প্রথম দেখা লাহোরে ১৯৩৭ সালে। সেইসময় পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে পার্টির সব সদস্যই 'আন্ডারগ্রাউন্ড'এ চলে গিয়েছিল। ভরদ্বাজের গায়ের রং ছিল শামলা, কাঁধ ছোট আর রোগা পাতলা শরীর। তাকে দেখে মনে হত না যে তার ভেতরে এত অফুরন্ত প্রাণশক্তি সঞ্চিত আছে যা দিয়ে সে এত পরিশ্রম করতে পারে বা একজন রাষ্ট্রবাদী বা সমাজবাদীব জীবনে যত রকম বিপদ আছে তার অনায়াস মোকাবিলা করতে পারে।

আমি সেই সময় কলেজে পড়তাম, সেই সময় আমার চিন্তাভাবনায় ব্যক্তি উপাসনার কোন স্থান ছিল না। তাই ভরদ্বাজের ব্যক্তিত্ব আমার উপর লেশমাত্র প্রভাব ফেলে নি। সেই সময় পাঞ্জাবে কংগ্রেস নিজেদের টানাপোড়েনে ব্যস্ত। যুব সম্প্রদায় বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হয়ে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির দিকে ঝুঁকছে। সমাজবাদীদের স্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছে 'পপুলার ফ্রন্ট'। সেই সময় সমাজবাদী কম্যুনিষ্ট র‍্যাডিক্যাল গণতান্ত্রিক পার্টি, পুরানো বিপ্লবী সংগঠনগুলো ও নওজোয়ান ভারত সভা অর্থাৎ সব সংগঠনের সদস্যরাই কংগ্রেস সমাজবাদী পার্টির সদস্য ছিল। যদিও 'পপুলার ফ্রন্ট' ঠিক ফ্রন্ট ছিল না কিন্তু তা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ছিল। সারাদিন ব্রাড়লে হলের সভায় কোন গঠনমূলক প্রস্তাব বিচার করার থেকে অনেক বেশী সময় আলোচনা চলত 'অমুক ব্যক্তি কি সি.আই.ডি-র লোক?' আমি এক বছর ধরে দেখেছিলাম যে সব মিটিং—একে অপরের বিরুদ্ধে সি.আই.ডি-র লোক হওয়ার অভিযোগ আনছে, আর তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত "পপুলার ফ্রন্ট" ঠিক নিশ্চিত হতে পারছে না কে সি.আই.ডি-র লোক আর কে নয়!

সেই সব দিনে পাঞ্জাবের যুব সম্প্রদায় সশস্ত্র সংগ্রামের ভাবধারায় বিশ্বাসী হয়ে কোন পথের সন্ধান না পেয়ে কখনও অরাজকতা, কখনও আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছে, কখনও সমাজবাদীদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, আবার কখনও র‍্যাডিকাল গণতান্ত্রিক পার্টির সঙ্গে থেকে আন্দোলন করার চেষ্টা করছে। এইরকম একটা সময়ে আমার দেখা হয় স্বর্গীয় ভরদ্বাজের সঙ্গে। লাহোরে তার আসার কথা গোপন রাখা হয়েছিল। মাত্র কয়েকজনেই তাঁর আসার কথা জানত।

ভরদ্বাজের লাহোরে আসার কিছুদিন আগে থেকে সমাজবাদী রাজনীতি বোঝার বা বোঝাবার জন্য লালা লাজপত রায় ভবনে ঘন ঘন সভা হত। সেই সময় সারা পাঞ্জাব থেকে সমাজবাদী যুব সদস্যদের যোগ দিতে বলা হয়েছিল। বাস্তবে এই সভাগুলোতে একটাই আলোচনা হত যে "অমুক ব্যক্তির সঙ্গে পুলিশের যোগ আছে কি নেই?" কিন্তু সভার বাইরে কংগ্রেসী সদস্যদের বা সরকারের এই ধারণাই ছিল যে

পাঞ্জাবের যুব সম্প্রদায় বিপ্লবের জন্য তৈরী হচ্ছে। সেই জন্য খবরের কাগজে এই সব সভার খবর বেরোতে লাগল। আর সরকারের পুলিশ অজস্র সেপাই নিয়ে লাজপত রায় ভবন থেকে ব্রাডলে হল, গর্ভনমেন্ট কলেজ থেকে মিউনিসিপ্যাল বাগ পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল। আমার মনে আছে যে আমরা অনেক দিন নাওয়া খাওয়া ভুলে কেবল পরস্পরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করে পেট ভরাতাম। আর দোষারোপে দোষারোপে ক্লান্ত হয়ে যখন বাইরে বেরোতাম তখন প্রেসের লোক আমাদের ঘিরে ধরত আর জিজ্ঞাসা করত—"কিছু ঠিক হল?" আমরা খুবই গম্ভীর স্বরে উত্তর দিতাম—"হয়ে যাবে। দেখুন না কি হয়"? এই খবর পুলিশের কাছে যখন পৌঁছত তখন হয়ে যেত—"বিপ্লব হয়ে যাবে, দেখে যান।" আর সেই খবর শুনে ইনস্পেক্টরের হাত কাঁপতে কাঁপতে কোমরে ঝোলান পিস্তলের ওপর ঘোরা ফেরা করত।

এইসব সভাগুলো কখনও কখনও পাঁচ-ছয় দিন ধরে চলত। এর মধ্যে কতকগুলো বড় সভা হত। আর কিছু ছোট ছোট সভা হত যেখানে কোন একটা বিশেষ দল, তাদের সদস্যরা পরের বড়সভায় নিজেদের অবস্থান কিভাবে তুলে ধরবে তার আলোচনা চালাত। ছয় কিংবা সাতদিন পরে লাজপত রায় ভবনের লাইব্রেরীর ওপরের একটা ঘরে এই বকমই একটা দলের সভা ছিল। সেই সভাতে ভরদ্বাজ হাজির ছিলেন। সেখানেই আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। তাঁর ব্যাপারে অনেক কথাই শুনেছিলাম যে ভরদ্বাজ অনেক উঁচুদরের নেতা। এখানে এসেছেন পার্টিকে বাড়াতে। 'আন্ডারগ্রাউন্ডে' থেকে সারাদেশ চষে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হন নি। আমি অনেক বড নেতাদের কাছ থেকে দেখেছি; তাই এই সব কথাবার্তা আমার ওপর কোন প্রভাবই ফেলেনি। যাই হোক পরিচয় হবার পর সভার কাজ শুরু হল। সেইসঙ্গে সেই সি.আই.ডি-র প্রসঙ্গ সামনে চলে এল। কিন্তু ভরদ্বাজ এই কথা শুনে সভায় উপস্থিত সবাইকে এমন বকাবকি শুরু করল যে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ভরদ্বাজের শানিত কথা অন্য সবাইকে নিশ্চুপ করিয়ে দিল। তার চোখে যেন আগুন জ্বলতে লাগল। সেইসঙ্গে তার সমস্ত চেহারা বদলে গেল। কিছুক্ষণ আগে যে ভরদ্বাজ হেসে হেসে সবার সঙ্গে কথা বলছিল তার সঙ্গে এই ভরদ্বাজের কোনও মিলই নেই। আমাদের মধ্যে বিদগ্ধজনেরা অনেক কাগজ দিয়ে তাকে প্রভাবিত করতে চাইছিল। কিন্তু ভরদ্বাজ তার যুক্তি দিয়ে ও সাথে সাথে তির্যকপূর্ণ মন্তব্যে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তার কাছে ঐ সব অযৌক্তিক কথার কোন দাম নেই। এরপর সে তার জ্বালাময়ী ভাষণে সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে আমাদের কাজ করতে হবে শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের মধ্যে; সে বলেছিল অরাজকতা ও আতঙ্ক সৃষ্টির বদলে আমাদের উচিত নিজেদের সংগঠিত করে এমন এক পার্টি গড়া যা শ্রমিক কৃষক ও ছাত্রদের মধ্যে থেকে তাদের জন্য কাজ করবে, শ্রমিক কৃষকের মুক্তির জন্য লড়বে। সে যখন শোষণহীন সমাজ গড়ার কথা বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলছিল তখন দেখে আশ্চর্য লাগছিল যে ঐ শামলা রঙের রোগা পাতলা একটা লোক কি করে সবাইকে চুপ করিয়ে দিয়েছে! বিদগ্ধ সভ্যরা অনেক চেষ্টা করেও ভরদ্বাজকে তার বক্তব্য থেকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে নি। যখনই ওরা প্রশ্ন তুলছিল তখনই ভরদ্বাজ

তাঁর বক্তব্য দিয়ে ওদের লজ্জিত করেছিল। শেষ পর্যন্ত এতদিন এত সভা করে যা ঠিক হয়নি আজ তাই ঠিক হল যে আমরা কৃষক শ্রমিকের মুক্তির জন্য লড়ব। এই প্রস্তাব যখন একটা কাগজে লিখে সবাই দস্তখত করছিল ঠিক সেই সময় দরজায় একটা আওয়াজ হয়। সবাই সচকিত হয়ে দরজার দিকে তাকায়। কেউ একজন জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর আসে—"পুলিশ! দরজা খোল!"

"পুলিশ" এই কথাটা শোনামাত্র অন্ধকার ঘর যেন আরও অন্ধকারে ছেয়ে গেল। দেখা গেল ঘরের চারদিক পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। এমনকি যে দরজা লালা অচিন্ত্যরামের ঘরের দিকে গেছে সেদিকেও পুলিশের লোক। আমাদের একমাত্র চিন্তা হয়ে উঠল যে করেই হোক ভরদ্বাজকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। এই চিন্তা থেকে কেউ কেউ চেয়ার ছোট টুল ইত্যাদি হাতে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এখনও যে দৃশ্য আমার চোখে ধরা পড়ছে তা হলো ভরদ্বাজের শান্ত ভাব। দেখলাম ভরদ্বাজ শান্তভাবে ঘরের এক কোনে দাঁড়িয়ে আমাদের সই করা দলিলটা টুকরো টুকরো করে মুখে নিয়ে গিলে ফেলছে যাতে দলিলের একটা টুকরোও পুলিশের হাতে না পড়ে। দরজায় শব্দ আস্তে আস্তে বাড়ছে। একটু সময় পরে পুলিশ দরজা ভাঙ্গতে শুরু করল। ভরদ্বাজের বাঁচার কোন আশাই দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ ভরদ্বাজ পিছনদিককার একটা জানলা খুলে দেখল যে একটা নতুন বাড়ীর দেওয়াল অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। সে সিদ্ধান্ত নিল যে সে দোতলা থেকে ঐ দেওয়ালের ওপর লাফ মেরে পড়বে। সিদ্ধান্ত নিয়েই ভরদ্বাজ জানালার ওপর উঠে দাঁড়াল ও সবাইকে বিদায় জানাল। সবাই চিৎকার করে বলল যে ওখান থেকে লাফ দেওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু। এই কথা শুনে ভরদ্বাজ বলল—"আমি মরব না। আমি ঐ দেওয়ালের ওপর লাফিয়ে পড়ব। তারপর সেখান থেকে সামনের বাড়ীর উঠানে লাফিয়ে পড়ে বেরিয়ে যাব।"

এই সময় তার দৃষ্টি আমার দিকে পড়ল। সে আমাকে তার সঙ্গে যেতে আহ্বান করে বলল—'তুমি আমার সাথে চল; কারণ তুমি এই প্রথম আমাদের সভায় এসেছ। তোমার পুলিশের হাতে ধরা না পড়াই ভাল।" আমি নীচু হয়ে লাফানোর জায়গাটা খুব ভয়ে ভয়ে দেখতে যেতেই ভরদ্বাজ 'চলে এস' বলেই নীচে লাফ মারল। আমিও সেইসঙ্গে লাফ মারলাম। তারপর ঐ দেওয়াল থেকেই আমরা সামনের বাড়ীর উঠানে লাফ মারলাম। উঠানে এক মহিলা শুয়ে ছিল। আমাদের দেখে সে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। আমি দেখলাম সে চিৎকার করতে চাইছে কিন্তু ভয়ে কথা বলতে পারছে না। আমরা তাড়াতাড়ি উঠান থেকে ভিতরে চলে গেলাম। সামনের একটা ঘরে এক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা দেবরাজ শেঠী বসে ছিলেন। আমাদের দেখে প্রশ্ন করলেন—'বাইরের দরজা বন্ধ। আপনারা কি করে এলেন? তাছাড়া সমস্ত এলাকাটা পুলিশ ঘিরে রেখেছে।'

আমরা বললাম—'উপর থেকে এলাম। সবাই পালিয়ে যেতে চাইছে।'

দেবরাজ শেঠী একটু ভেবে বললেন—'একটা রাস্তা আছে; সেখান দিয়ে গেলে আপনারা খিড়কির রাস্তায় পড়বেন। কিন্তু সেখানেও তো পুলিশ পাহারা রয়েছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'আমরা এখানেই থেকে যাব?'

ভরদ্বাজ উত্তর দিল—'না, সেটা খুবই ভুল হবে। আমরা এখানে থাকলে পুলিশ

দেবরাজ শেঠীকে হেনস্তা করবে। সেটা আমাদের পক্ষে উচিত কাজ হবে না।'

এবার ভরদ্বাজ দেবরাজ শেঠীর দিকে ফিরে বলল—'আপনি খিড়কির রাস্তাটা দেখিয়ে দিন।' একটু চিন্তা করে দেবরাজ শেঠী আমাদের রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেন। আমরা সেই রাস্তা দিয়ে খিড়কির গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। সেখানে দেখতে পেলাম একজন মাত্র সিপাই দাঁড়িয়ে আছে। ভরদ্বাজ আমাকে নির্দেশ দিল প্যান্টের পকেটে হাত রেখে ধীরে ধীরে হাতটা নাড়াতে যাতে মনে হয় পকেটে পিস্তল আছে। সে বলল—'যদি এভাবে বেরিয়ে যেতে পার তাহলে ঠিক আছে। না হলে অন্য উপায় করা যাবে। কিন্তু খুব ধীরে ধীরে যাবে। কোন ব্যস্ততা দেখাবে না।'

আমরা এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে গেট পর্যন্ত পৌঁছালাম। পুলিশের সিপাই আমাদের দিকে ঘুরে দেখল। আমরাও তার দিকে ঘুরে দেখলাম। ভরদ্বাজ সিপাইয়ের সামনে পকেটের মধ্যেকার হাতটা একটু ঘোরাতেই সিপাইটা কাঁপতে কাঁপতে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। আমরা গেট থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার মোড়ে যেই পৌঁছালাম ভরদ্বাজ আমার সাথে হাত মিলিয়ে বলল—'এবার আমি একলা যাব।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'একলা যাবেন?' সে হাসল এক অদ্ভুত স্বপ্নভরা হাসি—বলল—'আমি সব পথই চিনি। আমি একলাই যাব। আমাকে ধরা খুব সহজ নয়। বন্ধু, আমরা যে আদর্শে বিশ্বাস করি সেই আদর্শে বিশ্বাসীদের ধরা খুব সোজা নয়।' এই কথা বলে একটু হেসে আমার সাথে আবার হাত মিলিয়ে সামনের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর ভরদ্বাজের সাথে আর কখনও দেখা হয়নি। এই ঘটনার পর আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। দেশের রাজনীতিও অনেক বদলে যায়। ভরদ্বাজের পার্টি দেশের এক অন্যতম রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিগনিত হতে থাকে। এইরকম এক সময়ে হঠাৎ শুনতে পেলাম, ভরদ্বাজের টি.বি. হয়েছে। দলের জন্য দেশের অন্নহীন মানুষদের জন্য লড়তে লড়তে সে নিজেকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে। হয়ত তার ভেতরের যে আগুন—যে আগুন তাকে সারা ভারত চষে বেড়াতে বাধ্য করত—যে আগুন তাঁকে তার ঘর বন্ধু সবার থেকে আলাদা করে দিয়েছিল, যাতে সে দেশের অন্নহীন বস্ত্রহীন মানুষদের মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে পারে—সেই আগুন তার শরীর হয়ত সইতে পারেনি। এই সেই আগুন যা ভরদ্বাজ সারা ভারতে ছড়িয়ে দিচ্ছিল, আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বন্দুকধারী পুলিশ তার জন্য সারা দেশ চষে বেড়াচ্ছিলো।

ভরদ্বাজের ক্ষয়রোগের কথা শুনে আমি শুধু একটা কথাই ভাবছিলাম—যার ভেতর এত আগুন তাকে ক্ষয় কি করে গ্রাস করতে পারে? পারা কি কখনও স্থির থাকতে পারে?—আমি কেবল ভাবছিলাম যে রোগগ্রস্থ হয়ে ভরদ্বাজ কি করে বিছানায় পড়ে আছে? কখনও আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল লাজপত রায় ভবনের সেই দৃশ্য, সেই অদ্ভুত স্বপ্ন ভরা হাসি আর সেই সঙ্গে এই কথাগুলো—'আমি সব পথই চিনি। আমি একলা যাব।'

আজ ভরদ্বাজ আমাদের মধ্যে নেই। সে সত্যসত্যই একলা চলে গেছে। যদিও সে সব পথই চিনতো, তবুও অন্য কোন পথে হাঁটতে পারেনি; এমনকি ক্ষয়রোগও তাকে গ্রাস করতে পারেনি। ভরদ্বাজের মৃত্যুর সংবাদ সবাই জানে। কিন্তু আমার

জীবনে এই ঘটনা এক বিশিষ্ট স্থান নিয়ে আছে। তাই সেই ঘটনার কথা আমি সবাইকে জানাতে চাই।

পনেরোই আগস্টের স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল স্বাধীন দেশের সরকার তাকে গ্রেফতার করতে চায়। সেই সময় ভরদ্বাজের ১০৪ জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে। কাশির সঙ্গে রক্ত বার হচ্ছে। এই কাশি বেশ কয়েক বছর তাকে সমস্ত কাজ থেকে বিরত রেখেছিল। ভিতরের আগুন জ্বললেও বাইরের ফানুসটা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। এটা সত্যি যদি সে আমাদের মতো ঘর সংসারে থেকে ভালো খাওয়া দাওয়া করে আরামের জীবন কাটাতো তাহলে আজ যে রক্ত তার শরীর থেকে বার হচ্ছে তা বেরোত না। এটা আরও সত্যি যদি সে নিজের আদর্শের পথ থেকে সরে দাঁড়াত— যদি শ্রমিক কৃষকের মুক্তির স্বপ্ন না দেখত (যা সে স্বাধীনতার আগে থেকেই দেখেছিল)—যদি সে কোটি কোটি ক্ষুধার্ত দরিদ্র মানুষের মুক্তির কথা চিন্তা না করে কয়েক লক্ষ পুঁজিপতি, ধনীদের স্বার্থ দেখত— তাহলে বোধহয় স্বাধীন দেশের পুলিশ ভরদ্বাজকে গ্রেফতার করতে আসত না, যেমন এসেছিল আজ থেকে দশ বছর আগে লাজপত রায় ভবনে।

কিন্তু আজ তার বাঁচার কোন রাস্তাই ছিল না। যদিও ঘরের সব দরজা জানালা খোলা ছিল তবুও সেখান থেকে পালাবার কোন উপায় ছিল না। পুলিশ যখন তাকে ধরতে এসেছিল তখন জ্বরের মধ্যেও সে বিছানা থেকে উঠে জামা কাপড় পরে তাদের সঙ্গে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যখন সে ঘর থেকে রওনা হচ্ছে তখনও তার মুখে সেই অদ্ভুত স্বপ্ন ভরা হাসি।

আজ আমি ঐ হাসির মর্ম বুঝেছি। কারণ ঐ হাসি আমি আজ থেকে দশ বছর আগে দেখেছি। তাই আমি ভরদ্বাজের মাকে বলতে চাই—মা তুমি চিন্তা কোর না। তোমাব ছেলে মারা গেছে কিন্তু সে আমাদের এমন এক স্বপ্নভরা হাসি উপহার দিয়ে গেছে যা কোন দিন মলিন হবে না বা মুছে যাবে না, যা মানবজাতির দুঃখের মতই স্থায়ী আর তোমার মমতার মতই অসীম। এই স্বপ্নভরা হাসি আমাদের এগিয়ে যাবার পথ দেখায়—যে পথ বন্দুক, গুলি জেল পেরিয়ে শ্রমিক কৃষকের রাজ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যায়। ১৯৩৭ সালে ভরদ্বাজ যখন সেই পথেই এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল তখন এক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা দেবরাজ শেঠী তাঁকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচায়। আর আজ যখন সে সেই পথেই হাঁটছিল তখন স্বাধীন দেশের কংগ্রেস সরকার তাকে গ্রেফতার করার আদেশ দেয়। ভরদ্বাজের পথ একই ছিল। শুধুমাত্র শৃঙ্খল বদলে গিয়েছিল। তখন ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল আর আজ স্বাধীন দেশের সরকারের শৃঙ্খল। আজ সে প্রচণ্ড অসুস্থ অবস্থায় হাসি মুখে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল। না, আজ সে আর কোন দোতলা বাড়ী থেকে লাফ মারেনি। কিন্তু যারা তাকে গ্রেফতার করতে এসেছিল তাদেরকে সে সেই স্বপ্নভরা হাসি দিয়ে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। সে বলতে চেয়েছিল—'বন্ধুরা, আজ তোমরা আমায় গ্রেফতার করতে এসেছো। অথচ একটা সময় ছিল যখন আমরা এক সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলাম। কিন্তু আজ একটু সুখ, সামান্য প্রলোভন তোমাদের থামিয়ে দিল। আর আমাকে তোমরা থামিয়ে দিলে। তোমরা বুঝলে না আসল স্বাধীনতা অনেক দূরে আর আমি সেই পথেই চলেছি। তোমরা আমার এগিয়ে

চলা থামাতে পারবে না। আমি আমার পথ চিনি। আমি তোমাদের এই পথও খুব ভাল করেই চিনি, যে পথ দিয়ে তোমরা এখন হাঁটছ। তোমাদের এই পথ শুরুতে খুব সুন্দর কিন্তু এই পথের শেষ—"ফ্যাসিজম্, জনগণের সঙ্গে শত্রুতা ও বিনাশ, বন্ধুরা এই পথ থেকে তোমরা সরে দাঁড়াও।"

কিন্তু তারা সেই কথা না শুনে ভরদ্বাজকে জেলে বন্দী করে। সেই জেল যার প্রাচীরের শীর্ষে এখন তেবঙ্গা ঝাণ্ডা ওড়ে—যে ঝাণ্ডা উঁচু রাখবার জন্য ভরদ্বাজ তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়, যৌবনের সুন্দর ও মধুর দিনগুলি, তার চিন্তার সর্বোত্তম ফসল বিছিয়ে দিয়েছিল।

চার দিন পরে ভরদ্বাজ জেলে মারা যায়। শেষ সময়ে সে চোখ খুলে তাকায়। মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচু করে দেশের শ্রমিক কৃষক আর দিনরাত কাজ করা দরিদ্র মানুষদের সেলাম জানায়। আমি কেবল ভাবতে থাকি—'আমি আমার এই দেশকে কি করে বিশ্বাস করব যে ভরদ্বাজকে মৃত্যু উপহার দিয়েছে। আমি সেইসব লোকেদের কি করে সম্মান কবব যাঁরা ভরদ্বাজকে মৃত্যুশয্যা থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে কারাপ্রাচীরের মধ্যে বন্ধ করেছে। আমি কি করে সেইসব লোকেদের গুন গাইব যারা ভরদ্বাজের মৃতদেহ তেরঙ্গা পতাকা দিয়ে মুড়ে দিয়েছে।—এই দেশতো আমার দেশ নয়। এই দেশতো ভরদ্বাজেব স্বপ্নের দেশ নয়। এই দেশতো সেই লক্ষ লক্ষ নাম না জানা সৈনিকদের দেশ নয়, যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে।

আমি ভাবতে থাকি কেন আমি বিশ্বাস করব না মৃত্যুর সময়ে ভরদ্বাজের মুখের সেই অদ্ভুত স্বপ্নভরা হাসিকে—যে হাসি সমগ্র মানবজাতির এক কোমল কুঁড়ি যা একদিন ফুল হয়ে ফুটবে, এক টুকরো সুর যা একদিন সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় ভরিয়ে তুলবে, এক মৃদু তরঙ্গ যা একদিন সমুদ্র হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

উর্দু থেকে অনুবাদ : রুহিন আনোয়ার
স্বপন দাসাধিকারী

আলি সর্দার জাফরি

কৃষণ চন্দর

সারা কাশ্মীর জানে ফুলটির রঙ
সারা বুকে তার বিশ্বের খুশবু
হরিণ ছুটেছে কলমের গতি বালে জিব্রিল* যেন
বর্ণের গতি কবিতাকে ছোঁয়, শব্দ তোমার যাদু

বইয়ের পাতায় শব্দের রাশি প্রজাপতি উড়ে যায়
সোনার হরিণ ছুটে চলে যায় ঘুমে
কবিতা তোমার ঝলমল করে গানে
সেই গান এসে কবিতার শমে থামে

তোমার জাগায় মানুষের জেগে থাকা
আঁধার আকাশে তারাদের ঝিকিমিকি
কখনো শ্লোগানে ফরিয়াদ কথা বলে
দারিদ্র্য আজ রক্তের রঙে নিশানের মতো লাল

আকাশ প্রদীপ আর্তির মতো জ্বলে
তোমার স্বপ্ন মানুষের কথা বলে

* স্যর মহম্মদ ইকবাল
'লহু পুকারতা হ্যায়' কাব্যগ্রন্থের ১১৬ পৃষ্ঠা থেকে।

সুলতানা জাফরি

কৃষণ চন্দর : একটি মানুষ রত্ন

কৃষণ চন্দরকে আমি প্রথম দেখি বোম্বেতে ১৯৬৪ সালে। তাঁর গল্প আমার পড়া ছিল। তাঁর সুন্দর গল্পরীতির আমি একজন ভক্ত ছিলাম। তাঁর ব্যক্তি জীবনের প্রভাব আমার উপর তাঁর গল্পের চেয়ে কম ছিল না। তাঁর লম্বাটে মুখে ধরা ছিলো শিশুর সরলতা। টাক মাথা, ছোটখাট চেহারার মানুষ হলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে তীব্র আকর্ষণ ক্ষমতা ছিলো।

কৃষণ ভালবাসতেন, তাঁর বন্ধুরা, তাঁর সহযোদ্ধারা তাঁকে সবসময় ঘিরে থাকুন। কিন্তু তাঁর প্রিয়তম বন্ধু যতদূর আমি জানি, ছিলেন সর্দার আলি জাফরি। তাঁরা ছিলেন যমজ ভাইয়ের মতো—কৃষণ চন্দর জন্মেছিলেন ১৯১৩ সালের ২৩শে নভেম্বর, সর্দার ছিলেন ছ' দিনের ছোট—তাঁর জন্ম ১৯১৩ সালের ২৯শে নভেম্বর। যখন যেখানে তাদের দেখা হতো প্রেমিক প্রেমিকার মতো তারা একটা নিরালা কোন খুঁজে বের করতো এবং সেখানে দুজনে গল্প করত। তাদের দুজনের এই একা হয়ে যাওয়া নিয়ে আমি ও সলমা মজা করে খুব হাসাহাসি করেছি।

প্রতি রবিবার প্রগতিশীল লেখকদের সভা হতো সাজ্জা দ জহিরের বাড়িতে। নাট্যকার, কবি ইত্যাদি সব ধরনের প্রগতিশীল লেখকরা সেখানে উপস্থিত হতেন। কৃষণ চন্দর একমাস সে মুখো হননি। প্রগতিশীল লেখক সঙেঘর সম্পাদক হামিদ আখতার যিনি কার্যবিবরণী লিখতেন, তিনিই প্রথম নজর করলেন কৃষণ চন্দরের অনুপস্থিতি। খোঁজ শুরু হল। শাহির, কৈফী, সর্দার, হামিদ চৌপট্টিতে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে দেখা গেল কৃষণ চন্দর চাট, গোলগাপ্পা এসব খেয়ে চলেছেন। তাঁরা অনুপস্থিতির কৈফিয়ত চাইলেন। যুক্তিগ্রাহ্য কোন বক্তব্য ছিলো না কৃষণের। দাবি করা হলো প্রগতি লেখক সঙেঘর সবার জন্যে একটি পার্টি দিতে হবে। দিনক্ষণ ও সময় ঠিক হলো। কৃষণ চন্দরের বাড়ি আন্ধেরিতে হবে এই পার্টি এবং পরের দিনই। পরের দিন সূর্য ডোবার আগেই জনা বিশেক সদস্য উপস্থিত হয়ে গেলেন। কৃষণ চন্দরের পুরনো ধরনের বাংলোয় একটা বড়ো হল ঘর ছিল, সেখানে এই জনতা স্বচ্ছন্দে ধরে যায়। সম্ভবত বীয়ারেরই ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু হলে একটা হট্টগোলের অবস্থা হলো। প্রত্যেকেই কথা বলে যাচ্ছিল।

এই হৈ-চৈ-এর মধ্যে একটি আকর্ষণীয়া অ্যাংলো মহিলা তার প্রেমিককে নিয়ে সিনেমার কায়দায় সেখানে ঢুকে পড়লেন। সব চোখ গিয়ে পড়ল সেই সুন্দরীর দিকে। মেয়েটি কৃষণ চন্দরের ছবিতে কাজ করছিলেন। কৃষণ চন্দর সর্দারের সঙ্গে মেয়েটির পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর সেরা বন্ধু ও একজন বড় কবি বলে।

সর্দার মেয়েটির হাত ধরে বলে, 'তুমি খুব সুন্দর'

—'তুমি আমাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখবে?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

—'একটা কবিতা নয়, তোমার সৌন্দর্য একটা বই দাবি করতে পারে।'

মধ্যরাতের পর কৃষণ চন্দর লক্ষ্য করলেন সর্দারি সেখানে নেই। কৃষণ চন্দর উঠে দাঁড়ালেন এবং বন্ধুর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। বাইরে ঘন অন্ধকার। একদিকের বাথরুমে সামান্য আলোর রেখা দেখা যাচ্ছিল। কৃষণ চন্দর দেখলেন সর্দারি মেঝেতে পড়ে আছে আর তাঁর কপাল থেকে রক্তের ধারা নেমে আসছে। কৃষণ চন্দর চীৎকার করতে করতে ছুটে গেলেন—'সর্দারিকে খুন করেছে, খুন-খুন-খুন'। তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। 'কে, কে খুন করল আমার বন্ধুকে'— কৃষণ চন্দর চীৎকার করতে থাকলেন। 'রক্ত, রক্ত, এত রক্ত'। চারদিকে তাকিয়ে কৃষণ দেখলেন তালিশ, অভিনেত্রীর সেই প্রেমিকটি সেখানে নেই। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'তালিশ একাই এ কাজ করেছে। আমি তালিশের চোখে ঈর্ষা দেখেছি। সর্দারি যখন বলছিল, মেয়েটির জন্যে একটা গোটা বই লেখা যায় তখন আমি তালিশের চোখ দেখেছি।' তালিশকে দেখা গেল না। সবাই ভাবল নিশ্চয় সে বাইরে লুকিয়েছে। 'আমি জানতাম, পাঠান সর্দারিকে খুন করবেই', কৃষণ চন্দর বলল। 'সবাই পাঠানকে খুঁজতে বেরোল, কৃষণ চন্দর সবার সামনে জোরে জোরে শপথ নিল, তালিশকে সে খুন করবেই।

তখনো বেশ অন্ধকার। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। নিরাশ হয়ে অতিথিরা বাংলোয় ফিরলেন। হামিদ দোতলার ঘরগুলি দেখতে চাইল। দেখা গেল একটি ঘরে কাঠের মেঝেতে তালিশ ঘুমোচ্ছে। কৃষণ তালিশকে তুলল, 'দানব, তুমি জাননা, তুমি কি ন্যক্কারজনক কাজ করেছ, তুমি আমার সেরা বন্ধুকে মেরে ফেলেছ..........'

তালিশ লাফিয়ে উঠল, তার দমবন্ধ অবস্থা। ভয়চকিত চোখে চারদিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল—'কাকে মেরে ফেলেছি আমি? খোদা জানে, আমি কারো গায়ে হাত দিইনি। আমি চার ঘণ্টা ধরে এখানে ঘুমোচ্ছি।' কিন্তু কৃষণ চন্দর কেঁদেই চলল, 'তালিশ এ তুমি কি করলে ....'। কারও উপস্থিত বুদ্ধি কাজ করছিল না। কেউ কিছু ভাবতে পারছিল না। কেউ মৃতদেহ দেখতে গেল না। বাথরুমের ম্লান আলো শুধু সর্দারিকে দেখছিল।

হঠাৎ সবাই সর্দারের কাছে ছুটে গেল। দেখা গেল সর্দারি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। কৃষণ সর্দারিকে জড়িয়ে ধরল—'সর্দারি, কে তোমাকে খুন করেছে? সর্দারি বল, কে তোমাকে মেরেছে?'

—'দুর্ঘটনা', সর্দারি বলল।

বাথরুমে ঢোকার সময় সর্দারি পিছলে যান, একটা ঝোলানো ব্র্যাকেট তার কপালে ধাক্কা দেয়। সর্দারি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান, কপাল থেকে রক্ত ঝরতে থাকে।

ঘটনাটি হাসাহাসির পর্যায়ে চলে যায়। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে কৃষণ চন্দরের ভালবাসার ধরনটি উপলব্ধি করা যায়। জীবনে তিনি অনেক সাহসিকতা দেখিয়েছেন, কিন্তু রক্ত সহ্য করতে পারতেন না।

একবার হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার সময়, কৃষণের সাহসিকতাও দেখেছি। সি.পি.আই কড়া নির্দেশ দিয়েছিল, যাঁরা মুসলিম নন, তাঁরা যেন ভিণ্ডিবাজার এলাকায় কোন ভাবেই না যান। একদিন কৃষণ চন্দর মুসলিম এলাকায় ঘুরে রাজভবনের উত্তর দিকে, মুসলিম এলাকার গায়ে সি.পি.আই-এর মূল অফিসে এলেন। সবাই তাকে দোষ দিতে

লাগল। 'কেন তুমি গিয়েছিলে? তোমাকে তারা চিনতে পেরেছিল?' কৃষণ শান্তভাবে বলল, 'হ্যা, কয়েকজন আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমি তাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করলাম দোকানে, মানুষের মনুষ্যত্ব ধ্বংশ হয় না।'

তিরিশ বছর ধরে আমরা বম্বেতে একটি পরিবারের মত বাস করেছি। সাপ্তাহিক সভাগুলিতে আমাদের দেখা হত। সান্তাক্রুজের বাড়িতে আমরা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছি। সলমা, কৃষণ আমাদের সীতামহলের বাড়িতে কতদিন গল্প করে গেছে।

কৃষণ ভালো খাবার পছন্দ করতো—মাছ-মাংসে তার রুচি ছিল খুব। অন্যদিকে সলমা পাক্কা নিরামিশাষী। শীতের দিনের গাজরের হালুয়া খুব পছন্দ ছিল কৃষণ চন্দরের। শীতে পুষ্ট রসালো গাজর পাওয়া যেত বেশি। আমার মতই ফলের উপর ছিল তার ভালবাসা, আমরা তার সান্তাক্রুজের বাড়িতে খেতে গেলে সে নিশ্চিত হত যে সেই সময়ের সবচেয়ে ভালো ফল আনা হয়েছে। তার প্রিয় ফলওয়ালাটি তাকে সময়মত কাশ্মীরের আপেল, বেনারসের ল্যাংড়া পাঠাত। আম তার খুব প্রিয় ছিল—তা তার কাছে ছিল স্বর্গের ফল।

কৃষণ চন্দরের মেয়ের বিয়ে হলো দিল্লীতে। খানার ব্যবস্থা করেছিল মহীন্দ্রনাথ। খাবার কৃষণ চন্দরের বিশেষ পছন্দ হয়নি। অতিথিদের খাবার পর কৃষণ চন্দর তার প্রিয় রেষ্টুরেন্টে খেতে চলে গেলেন ।

কৃষণ চন্দর যখনই বেড়াতে যেতেন তিনি তার নিজের খাবার নিয়ে যেতেন—কাবাব, রোষ্ট করা মুর্গীর মাংস। প্রচুর স্ন্যাক্স। বন্ধুদের বলতেন কোটার পাবড়ি, ভুপালের কোফতা ইত্যাদি আনতে। কৃষণের এই অতিরিক্ত ব্যাপারটা আমরা খুব উপভোগ করতাম।

কৃষণ জন্মেছিলেন ও বড় হয়েছিলেন কাশ্মীরে। কাশ্মীর উপত্যকা ছিল ফুলে ফলে ভরা সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। কৃষণ এসেছিলেন সেখানকার ভালবাসার বার্তা নিয়ে। ছোট্ট জীবনে তিনি পৃথিবীর দুঃখদারিদ্র কষ্ট দূরীভূত করতে চেয়েছিলেন।

মধুসূদন

অনুভবী কৃষণ চন্দর

মধুসূদন : আমি কৃষণজীর সঙ্গে পরিচিত হই ১৯৪০ সালে। সেই সময় আম ২৮ বছরের যুবক এবং একমাত্র কৃষণজীর সঙ্গে মিলবার জন্য আমি দিল্লী থেকে লাহোর আসি। কৃষণজী তখন লাহোর অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকরি করেন। আমাকে দেখে উনি অবাক হন। আমি তো সামান্য যুবক। আমার নিজের লেখা কিছু গল্প দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি পড়ে আমাকে বলেন, মধুসূদন তুমি লেখাতে নিজের স্টাইল তৈরী করো। একটা ব্যাপার পরিষ্কার ছিলো, তখন আমি কৃষণজীর লেখার দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত এবং তাই আমার নিজের লেখার মধ্যে প্রায় পুরোটাই তাঁর স্টাইলের ছাপ পড়েছিলো। এর পর তিনি একই কাজ নিয়ে দিল্লী রেডিওতে চলে আসেন। কৃষণজী দিল্লী এলে সপ্তাহে প্রায় পাঁচ দিন তাঁর কাছে যেতাম আলোচনা কথাবার্তার জন্য। এই সময়টা ১৯৪১-৪২ সাল। আমি ক্রমশ নিজের লেখার শৈলী পরিবর্তন করতে শুরু করি, একটা পথ খুঁজি। এই সময়ের লেখা পড়ে কৃষণজী খুবই আনন্দিত হন এই ভেবে যে শেষ পর্যন্ত আমার লেখার ক্ষেত্রে নিজস্ব একটা ধারা তৈরী হচ্ছে। তিনি এই উপদেশ এই কারণেই কেবল দেননি যে একজন লেখকের লেখার স্টাইল ও প্যাসন-এ লেখকেরই একটি ধারা তৈরী হয় বরং শিল্প সাহিত্যেই নতুন ধারা তৈরী হতে পারে।

❑ কৃষণ চন্দর-এর চলচ্চিত্র ভাবনা ও নির্মাণ সম্পর্কে বলুন।

মধুসূদন : অনেক মানুষ জানেন না যে কৃষণজী নিজেই ফিল্ম প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছিলেন বম্বেতে, তাঁর নিজেরই স্ক্রিন প্লে থেকে। ছবির নাম ছিল 'রাখ'। তাঁর ভাই, মহেন্দ্রনাথ যিনি নিজেও একজন লেখক ছিলেন, তিনি এই ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ছবিটি উন্নত গুণমানের ছিলো। আজকের দিনের আর্ট ফিল্ম বলতে ঠিক যা বোঝায় তা নয়। তবে তা স্টারকাস্ট-এর উপর নির্ভরশীল ছবি নয়। নিজেদের পরিচিত জগতের

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তিনি নিয়েছিলেন। কিন্তু স্টারডম ছবি বলতে যা বোঝায়, তার একটা নির্দিষ্ট ফরমুলা— নাচ-গান-মারামারি ইত্যাদি—কেউ আশা করবেন না কৃষণজী এই ধরনের ছবি তৈরী করবেন। এই ছবিতে মহেন্দ্রনাথ পূর্ণ সহযোগিতা করেন। আর একজন ছিলেন ক্যাপ্টেন কে. এস. গ্রেবাল; উনি ছিলেন ছবিটির ঘনিষ্ঠ সহযোগী। বানিজ্যিক সফল ছবির পরিচালক না হলেও, কৃষণজী চিত্রনাট্য লেখায় সফল হয়েছিলেন। 'মনচলি' বলে যে ছবিটি হয়—সিলভার জুবিলি হয়েছিলো। একটি সফল চিত্রনাট্য—কৃষণজী সেটা লিখেছিলেন। পরে আরো অনেক ছবির স্ক্রিন প্লে লিখেছিলেন। বম্বেতে থাকতেন 'চারবাংলায়'। বিশাল বাংলো। অনেক নামী লোকের আনাগোনা ছিলো। 'রাখ' ঐ সময়ের তৈরী। পরে নিজে আর ছবি তৈরীর দিকে না গিয়ে তিনি চলে এসেছিলেন 'শালিমার স্টুডিও'-তে। এখানে এস. ডব্লু. জেড আহমদ ছিলেন খুবই পারদর্শী লোক। সাহিত্য তিনি খুব ভালো বুঝতেন। আরও অনেক নামী মানুষের সমাগম হয়েছিলো— জোশ মালিয়াবাদী, রামানন্দ সাগর, শ্যাম, চেতন আনন্দ, বলরাজ সাহনী, ভারতভূষণ। পুনেতে কৃষণজী ২/৩ বছর ছিলেন। 'অন্নদাতা'-ও লিখেছিলেন এখানে। স্টুডিও বন্ধ হয়ে যাবার পর কৃষণজী বম্বে চলে এলেন।

পুনায় কৃষণ চন্দর সঙ্গ পেয়েছিলেন আখতার লিমা, বিখ্যাত উর্দু কবির। বহু পুরস্কার পেয়েছিলেন। ভারতভূষণ ছিলেন খুবই কাছের মানুষ। তাঁদের মেলামেশা, কথাবার্তা এতো মধুর ছিলো যে ভোলার নয়।

❑ কৃষণ চন্দর-এর উপর যে ডকুমেন্টারী তৈরী হয়ে ছিলো তার স্ক্রিপ্ট পাওয়া যাবে?

মধুসূদন : আমার কাছে নেই। এটা পাওয়া যাবে রেবতী শরণ শর্মার কাছে। উনিও এই কাজে যুক্ত ছিলেন।

❑ কৃষণ চন্দর-এর জীবনের কোন বিশেষ দিক........

মধুসূদন : তাঁর জীবনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য দিক হলো তিনি খুব সুন্দর জীবন যাপন করতে ভালোবাসতেন। তিনি খুব খরচ করতেও ভালোবাসতেন। খরচ করার ব্যাপারটা এই রকম যে ধরা যাক তিনি এক লাখ টাকা উপার্জন করেছেন; কিন্তু ব্যয় করলেন এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা। সব সময় সকলের জন্য তিনি ব্যয় করতে ভালো বাসতেন। তবে আত্মীয় স্বজনের ক্ষেত্রে অর্থব্যয়-এর বিষয়টি খুবই ডেলিকেট। সে সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করবো না। তবে বন্ধুবান্ধব এর জন্য যথেষ্ট খরচ করতেন।

❑ তিনি দুটি ফিল্ম তৈরী করেছিলেন 'সরায় কে বাহার' ও 'দিল কী আওয়াজ'।

মধুসূদন : প্রথমটিতে তাঁর ভাই মহেন্দ্র নাথ ছিলেন হিরো।

❑ ফিল্ম জীবনে বহু নারী, ফিল্মের নায়িকার সংস্পর্শে এসেছিলেন। কৃষণ চন্দর

বলেছেন, এঁদের সম্পর্কে কিছু না লিখলে তাঁরা ভাববেন যে তিনি এঁদের বিরুদ্ধে। এই কথা লিখেছেন 'আধে সফর কী পুরী কহানী'-তে এই বিষয়ে.........

মধুসূদন : দেখুন এই বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর, কিছু বলতে চাই না।

❑ তাঁর জীবনের উপর যে তথ্যচিত্র তৈরী হচ্ছিলো। তাতে কৃষণ চন্দর বিশেষ কিছু চিত্র গ্রহণের জন্য বলেছিলেন?

মধুসূদন : একটি ঘটনাতো বটেই। জুহু বীচের কাছে চাটের দোকান ছিলো। তিনি খেতে খুব ভালোবাসতেন। দই বড়া, গোলগাপ্পা। খাওয়ার সিকোয়েন্সটা উনি নিজে তুলতে বলেছিলেন।

❑ এই তথ্য চিত্রে কিভাবে এগিয়েছিলো?

মধুসূদন : প্রথমে আমরা জম্মু যাই। সেখান থেকে আমরা বহুদূর এক গ্রামে যাই— এখন আমি নাম স্মরণ করতে পারছি না। একটি পর্বত শৃঙ্গ তার অপর পারে পাকিস্তান। কাশ্মীর ছিলো কৃষণ চন্দর-এর সব থেকে ভালো লাগার জায়গা। তিনি খুব স্বাচ্ছন্দ অনুভব করতেন এখানে। একবার সুটিং করতে গাড়ী করে পুঞ্চ-এর দিকে যাচ্ছি। কৃষণজী, মহেন্দ্রনাথ, ক্যামেরাম্যান ও আমি— গাড়ি ছুটে চলেছে। এক বৃদ্ধ রাস্তার ধারে বড় মাটির জালায় জল খাওয়াচ্ছিলো। তাকে অতিক্রম করে যেতেই কৃষণজী চেঁচিয়ে বললেন— রোখো, রোখো। গাড়ী থামলে তিনি বৃদ্ধের কাছে ফিরে এলেন, আমরাও। সকলে জল খেলাম। বড় তৃপ্তিদায়ক সেই জল। কোন ঝর্ণার জল হবে। জল খেয়ে কৃষণজী বৃদ্ধকে টাকা দিতে চাইলে বৃদ্ধ সৌজন্যবশত নিতে চাইলেন না। তাঁর কর্তব্য জল খাওয়ানো। খুবই সামান্য ঘটনা। কিন্তু এর তাৎপর্য ছিলো বড়। কৃষণজী বললেন, বৃদ্ধ বসে আছে যাত্রীদের জল খাওয়ানোর জন্য। আমরা যদি তাকে অতিক্রম করে চলে যেতাম, তবে মনের দিক থেকে বৃদ্ধ খুবই কষ্ট পেতো। তাই আমরা নেমে ছিলাম এবং জলও খেয়েছিলাম। একঘণ্টা আধ ঘণ্টা পরে পরে হয়তো একটা গাড়ি যাবে! কেউ নামবে জল খেতে। তারপর বৃদ্ধ বসে থাকবে অন্য গাড়ির আশায়। কাশ্মীর-এর জনগণের জন্য কৃষণজীর হৃদয়ে এক গভীর অনুভূতি ছিলো।

❑ এই দৃশ্যটি কী গ্রহণ করেছিলেন?

মধুসূদন : না, ক্যামেরা অন্য গাড়িতে ছিলো।

❑ তথ্যচিত্র কী কৃষণজীর প্রথম দিকবার জীবনের ঘটনা নিয়ে?

মধুসূদন : না, এর বেশীর ভাগটা ছিলো কৃষণজীর চরিত্র বৈশিষ্ট্য, সাহিত্য, জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ এবং নিম্নবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি নিয়ে। কুড়ি মিনিট দৈর্ঘের তথ্যচিত্র এটা। ফিল্ম ডিভিসনের মারফৎ প্রদর্শিত হয়েছিলো।

❑ কবে এটা তৈরী হয়?

মধুসূদন : ১৯৭৩ সালে। আমি মনে করতে পারছি। কারণ ঐ বছরই আমরা 'অল ইন্ডিয়া ফিল্ম পারসন্স কনফেডারেশন' গঠন করি। প্রথম কনফারেন্স হয়

মাদ্রাজে। ফিল্মের কাজ শেষে আমি চলে যাবো বলেছিলাম। কৃষণজীরা ওখানেই ছিলেন। কিন্তু আমি কনফারেন্স-এ যোগ দিতে পারিনি। কারণ প্লেন চার ঘণ্টা লেট ছিলো।

❑ কৃষণজীর চলচ্চিত্র কি সাহিত্যের চেয়ে বেশি গুণমানের ছিলো?

মধুসূদন : আমি তা মনে করি না। কৃষণজীর সাহিত্য কর্মের সঙ্গে এই ধরনের কমার্শিয়াল ফিল্মের কোন তুলনাই হয় না। তার তৈরী ফিল্মও ফিল্মের গুনমানের দিক থেকে উত্তীর্ণ হয় নি, যদিও এটা অফবিট ফিল্ম।

❑ 'সরাই কে বাহর' কী রিলিজ হয়েছিলো? মহেন্দ্র নাথ লিখেছেন এটা 'হলে' বেশ কয়েকদিন চলেছিলো।

মধুসূদন : আমার মনে পড়ছে না। তবে মহেন্দ্রনাথ-এর কথা অনেক নির্ভরযোগ্য। কারণ তিনি ঐ ফিল্মে ছিলেন। 'সবাই কে বাহর'-এর লেখক কৃষণ চন্দর, সঙ্গীত। ঋষি দত্ত। শিল্পী ছিলেন সবিতাদেবী, হেমাবতী, তালেশ, মহেন্দ্রনাথ, শিবরাজ, তাজ মেহেরো, কোকা। সামিনা ছিলেন নায়িকা। ফিল্মে অন্য নাম ছিলো। তিনি রেডিও আর্টিস্ট ছিলেন। কৃষণজীর ব্যাপারে অনেক কথা বলতে পারবেন শিবরাজজী। তিনি বান্দ্রায় থাকেন।

❑ কৃষণ চন্দর তথ্য চিত্রের পরিচালক হিসাবে আপনার ধারণা কেমন? তিনি কী পরিচালককে নির্দেশ দিতেন অথবা আপনি যেমনটি ভেবেছেন তেমন করেছেন?

মধুসূদন : তথ্যচিত্রে কৃষণজী নির্দেশ দেওয়ার মতো কিছুই করেন নি। বরং পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে কিছু না বুঝলে জিজ্ঞাসা করেছেন।

❑ কিছু টুকরো স্মৃতি কথা বলুন

মধুসূদন : সেই পানিওয়ালা'-র ঘটনা তো বললাম, তারপর বলতে গেলে 'চাট' খাওয়ার কথা। আপনাদের বাংলায় এটাকে কী বলে। রাস্তার ধারে চলজলদি খাবার দোকান। কৃষণজীতো এই খাওয়ার দৃশ্যকে তথ্যচিত্রে ব্যবহার করেছেন। জানিনা আর একটি কথা বলা ঠিক হবে কিনা! তিনি তখন পুনায় থাকেন। কৃষণজীর পা টেপানোর শখ ছিলো। আমি দেখি তাঁর কাজের লোক পা টিপে দিচ্ছে। দ্বিতীয় দিনও তাই। আমি বললাম, আপনি ফিউডাল ব্যবহার করছেন। তিনি অনেকটা এই রকম উত্তর দিয়েছিলেন— দেখ আরাম একটা অন্য জিনিস! এটা ১৯৪৫ সালের কথা, পুনায়। অন্য একটা ঘটনা কৃষণ চন্দর যখন চার বাংলায় থাকতেন। সেখানে অনেক নামী লেখক কবি সাহিত্যিকরাও থাকতেন। শাহির লুধিয়ানভিও থাকতেন। কৃষণজীর তখন একজন সেক্রেটারী ছিলো। নাম ছিলো আদাকার রোমানি। নিজেও লেখক ছিলেন। পরে ফিল্মের স্ক্রিপ্ট ইত্যাদির কাজও করেন। মুসলিম ছিলেন। পরে নাম পাল্টে রেখেছিলেন আনন্দ রোমানি। এই ঘটনা আমাকে আদাকারই বলেছিলেন। সপ্তাহে একদিন মদের দোকান বন্ধ থাকতো। তেমন এক দিনে কৃষণজী আদাকারকে মদ আনতে বলেন। আদাকার বলেন যে পুলিশ তাঁকে ধরবে। কৃষণজী বলেন ধরলে আমার

কথা বলবে। যাই হোক আদাকার যখন দোকান থেকে মদ আনছিলেন, যথারীতি পুলিশ ধরে। আদাকার কৃষণজীর কথা বললে পুলিশ তাঁকে সেফ প্যাসেজ দিয়ে দেয়। কথাটা এই কারণেই উল্লেখ করা গেল যে কৃষণজী সম্পর্কে পুলিশটির মনেও নিশ্চয়ই কোন স্থান ছিলো। আমার মনে হয় পুলিশটি ছিলেন মুসলিম এবং উর্দু জানতেন। আর ঐ চার বাংলায় কে কে থাকে তখন সবাই জানতো। কৃষণ চন্দরের জন্য এও সম্মান দেখানো। আমি কৃষণজীকে কখনও মাতাল হতে দেখিনি।

❑ আপনাদের এই ফিল্ম রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন, এর কর্ম পদ্ধতি কি।

মধুসূদন : এটা মূলত একটা ট্রেড ইউনিয়নই। অনেক আগে দেখা গেছে প্রোডিউসার তাঁর প্রাপ্য অর্থ পাননি। টেকনিশিয়নদের টাকা পয়সা পেতেও অসুবিধা হতো। পরে এই ধরনের সংস্থা গঠনের জন্য এর কাজের পরিধিও বেড়েছে।

❑ অ্যাসোসিয়েশন-এর ব্যাপারে কৃষণ চন্দরের অবদান কী?

মধুসূদন : বলতে গেলে অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাপারে কৃষণজীর অবদান সব থেকে উল্লেখযোগ্য। বম্বেতে বাসস্থানের সমস্যা একটি বড়ো সমস্যা। এই ব্যাপারে কৃষণজী যে অবদান রেখেছিলেন তা বোধ হয় এখনও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সময়টা ১৯৭৫/৭৬ সাল। জরুরী অবস্থার সময়। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কৃষণজীর ভালো সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিলো। এই সমস্যা নিয়ে তিনি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করেন এবং একই সঙ্গে বম্বেতে মিনিস্টার অব হাউসিং-এর মন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেন। এই উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিলো। সরকার ১৩২ টি দুই কামরা ও অন্য সুবিধাযুক্ত ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করেন। হ্যাঁ, তার একটিতে আমি এখনও থাকি। কৃষণ চন্দরের ব্যক্তিত্ব এই অসম্ভব কাজটি সম্ভব করাতে সক্ষম হয়েছিলো। জরুরী অবস্থার সময় এই কাজটি কৃষণজী করতে পেরেছিলেন ; এর বড় একটা দিক ছিলো ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ভালো যোগাযোগ।

❑ এটা কী কৃষণ চন্দর এমার্জেন্সিকে সমর্থন করেছিলেন, তার জন্য?

মধুসূদন : তিনি ছিলেন নিউট্রাল। আমি এটাকে সাপোর্ট বলবো না, এটাকে অপোজও বলবো না। এর দুটোর মধ্যে প্রত্যেকটিই অসত্য। কোন মানুষ যদি কিছুকে সমর্থন করে তা সে করে সক্রিয়ভাবে, ঠিক তেমন যদি কিছুর বিরোধিতা করতে হয় তবে তাকেও করতে হয় সক্রিয়ভাবেই।

❑ তাঁর জীবনীকার জগদীশচন্দ্র ওয়ার্ধন বলেছন যে কৃষণজীর এমার্জেন্সিকে সমর্থন করার ফলে তাঁর মৃত্যুর পর বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর মানুষ খুব কমই এসেছিলেন অন্তিমযাত্রায়।

মধুসূদন : আমি মনে করি কৃষণজী সক্রিয়ভাবে এমার্জেন্সিকে যেমন সমর্থন করেননি, তেমনি সক্রিয়ভাবে বিরোধিতাও করেননি। এটা ছিলো শক্ত দড়ির বাঁধনের উপর হাঁটা। এখন প্রশ্ন হলো ঐ রকম সময়ে কৃষণজী ১৩২টি আবাসন-এর ব্যবস্থা করেছেন— তিনি যদি এমার্জেন্সির সক্রিয় বিরোধিতা করতেন তবে কী মন্ত্রীর ঘরে ঢুকতে পারতেন? আবার আমি জানি যে তিনি সক্রিয়ভাবে

এর সমর্থনও করেননি।

❑ আপনার সঙ্গে এই ব্যাপারে কোন কথা হয়েছিলো?

মধুসূদন : কোন আলোচনার কথা আমার এখন মনে পড়ছে না। তবে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি না যে ১৩২টি আবাসনের ব্যবস্থা কৃষণজী করে দিয়েছেন বলে তিনি যে এমার্জেন্সি সমর্থন করেছেন। তবে এটাও ঠিক তিনি ইন্দিরা গান্ধীর এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং হতে পারে যে বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগের জন্য হয়তো এঁদের বিরুদ্ধে কিছু বলাও তাঁর পক্ষে অস্বস্তিকর ছিলো।

❑ কতদিন কৃষণজী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদে ছিলেন?

মধুসূদন : তিন/চার বছর ১৯৭৩ অথবা ১৯৭৪ সাল থেকে হবে। এটা গঠিত হয়েছিলো ১৯৫০ সাল নাগাদ। মুখরাম শর্মা, শায়ির লুভিয়ানভিও আরও অনেকে এই সংস্থার সভাপতি ছিলেন। পরে কৃষণজী হন।

❑ একজন ঔপন্যাসিক, গল্প লেখক, নাট্যকার ব্যক্তি এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

মধুসূদন : দেখুন নাট্যকার বা তাঁর নাটক সম্পর্কে কিছু বলছি না। কিন্তু আমি একমত যে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে কৃষণজী সার্থক এবং তাঁর ছোট গল্পের স্টাইল কখনও অনুকরণ করা যাবে না। এই ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রোমান্টিক। এ কথার অর্থ এই নয় যে কৃষণজী রোমান্টিক স্টাইলের লেখক ছিলেন শুধুই। তিনি রোমান্টিক ছিলেন জীবনের বাস্তবতার দিক থেকে। প্রকৃতির মধ্যে তিনি রোমান্টিকতার অর্থ খুঁজে পেতেন। কাশ্মীরের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ এই ধারাকে ব্যাপকভাবে প্রশস্ত করেছে। কাশ্মীর পর্বের লেখাগুলি পড়লে যে কেউ প্রকৃতির প্রেমে পড়তে পারে। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্যই হলো এমন এবং অনন্য যে তা আর কারো মধ্যে আগে দেখা যায়নি। ধরুন, গাছকে তিনি লিখছেন গুল মোহর কী দ্রক্ত। তিনি ফুলকে একটা নামে ডাকছেন। এটাই ছিলো কৃষণ চন্দরের সাহিত্যে অবদান। তাঁর লেখার সংখ্যা দিয়ে সব কিছু হয়তো বিচার করা যাবে না। কিন্তু আমি জানি না কেন কৃষণজী মৃত্যুর পর মিথ হলেন না। একটা কথা ঠিক যে কৃষণজীকে অনেক অনেক বেশী লিখতে হয়েছিলো।

❑ কৃষণ চন্দরের লেখার উপর ভিত্তি করে নাটক, ফিল্ম অথবা টিভি সিরিয়াল হয়েছে, দেখেছেন?

মধুসূদন : না তেমন আমি কিছু দেখিনি; কিংবা যদি কিছু হয়েও থাকে কোথাও তা কিন্তু কমার্শিয়াল রিলিজ হয় নি। কেবলমাত্র 'ইয়া সে শহর কো দেখো'। সলমাজীর ছেলে আর. কে. মুনির টিভি সিরিয়ালের জন্য 'পাঁচ লোফার' তৈরী করেছেন।

❑ আপনি দীর্ঘ সময় ধরে অনেক কথা বলেছেন। কৃষণ চন্দর সম্পর্কে আপনার শেষ কথা কী।

মধুসূদন : তিনি ছিলেন মহান উর্দু লেখকদের মধ্যে অগ্রগন্য এবং থাকবেনও তাই। জীবনকে দেখার তাঁর ছিলো অসাধারণ আবেগপ্রবন মন। জীবনের প্রতি

কৃষণজীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো খুবই ইতিবাচক। দুঃখবোধের প্রতি রোমান্টিক দৃষ্টি, শোষনের প্রতি রোমান্টিক দৃষ্টি এবং জনগণের প্রতি কৃষণজীর রোমান্টিক দৃষ্টি ছিলো তাঁর জীবনধারণের পদ্ধতি। কৃষণজী একটি ঘটনা বলেছিলেন আমাকে। ঘটনাটি কাশ্মীরের। দিনটি মনে নেই। কিছু মহিলাদের ধর্ষণ করেছিলো একদল পুরুষ। তাদের মধ্যে একটি ছেলে একজন বৃদ্ধাকে ধর্ষণ করে। মহিলা বলছেন ঃ 'পুত্র ধীরে ধীরে'। কী মর্মান্তিক হৃদয় বিদারী ঘটনা। ১৯৪৭/৪৮ সালের কথা। এক উপজাতি আক্রমণের ঘটনা। এটা কৃষণজীর কোন কাহিনীর মধ্যে লেখা হয়ে থাকবে। তবে এটা আমি তাঁর মুখ থেকে শুনেছি।

❑ আপনি প্রগতি লেখক সংঘের সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন?

মধুসূদন : সেটা হলো ১৯৪২ সালের কথা— প্রথম সম্মেলন, দিল্লীতে। হিটলার-স্তালিনের মধ্যে অনাক্রমন চুক্তি সই হয়েছে। আমি তখন একেবারে যুবক। আমার কাজ ছিলো লোকেদের কাছে নিমন্ত্রন পত্রে ঠিকানা লিখে পাঠানো। আর এক বন্ধু ছিলো, নাম যজ্ঞে। কৃষণজী আমাদের তদারক করতেন। তারপর বম্বেতেও সম্মেলন হয়েছে। ইপ্টা রয়েছে। প্রগতিলেখক সংঘ বর্তমানে প্রকৃত পক্ষে ভেঙ্গেই গেছে।

একটা কথা মনে রাখবেন কৃষণচন্দর ছিলেন মূলত বামপন্থী মনোভাবাপন্ন। কিন্তু সময়ের দাবী অনুসারে তিনি কিন্তু তথাকথিত বামপন্থী সাহিত্য লেখেননি। বরং তিনি যে সাহিত্য রচনা করেছেন তা ভাবধারা, উৎকর্ষতার দিক থেকে তথাকথিত বামপন্থী সাহিত্য থেকে অনেক উৎকৃষ্টমানের। এই দিক থেকে কৃষণচন্দর ছিলেন অগ্রগণ্য সাহিত্যকার।

অনুলেখন : দিলীপন ভট্টাচার্য

জ্যাহিরুল হাসান

কৃষণ চন্দর ঃ সাহিত্যে ও ইতিহাসে

উর্দু মুসলমানদের ভাষা—অনেকে তা-ই মনে করেন আর সেই সূত্রে ভেবে নেন যে, কেউ মুসলমান হলেই সে উর্দু জানে। কৃষণ চন্দর এর বিরুদ্ধে এক জলজ্যান্ত প্রমাণ। আর একটি পূর্বধারণা বিশেষ করে উর্দুভাষী মুসলমানদের সম্পর্কে প্রচলিত যে তারা মৌলবাদী স্বভাবের। আদপে উর্দুভাষী জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ মুসলমান হলেও, ভারত কেন পাকিস্তানেরও বহু মুসলমান নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষাতে কথা বলে, তারা ভাল করে উর্দু জানেও না। ভারত বা পাকিস্তানের উর্দুর অবস্থা খানিকটা ইংরেজির মতো। এখানে ইংরেজি যেমন কোনও রাজ্য-নির্দিষ্ট ভাষা নয়, উর্দুও তা-ই। কিন্তু উন্নত ভাষা হিসেবে এবং অভিজাত শ্রেণীর ভাষা হিসেবে এককালে উর্দুর যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল এই উপমহাদেশে। অবিভক্ত পঞ্জাবের কী মুসলমান কী হিন্দু সকলেই উর্দু জানত। জম্মু ও কাশ্মীরেও তেমনি—স্থানীয় ভাষা কাশ্মীরি, ডোগরি বা পঞ্জাবি থাকা সত্ত্বেও লেখালেখির কাজে উর্দুই ব্যবহার হত বেশি। অতএব যাঁর জন্ম পশ্চিম পঞ্জাবে, বাল্যশিক্ষা জম্মুতে, সেই কৃষণ চন্দর (১৯১৩-১৯৭৭) জাতে পঞ্জাবি হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও যে উর্দুতে সাহিত্য রচনা করবেন এতে আশ্চর্য কী! যেহেতু পাকিস্তান আন্দোলনে উর্দুভাষীদের প্রধান ভূমিকা ছিল এবং পাকিস্তানের সরকারী ভাষাও উর্দু—যদিও সেখানকার জনসংখ্যার মাত্র দশ শতাংশ প্রকৃত উর্দুভাষী, এই দেশভাগজনিত রাজনীতির প্রভাবে উর্দুর গায়ে মুসলমানের ছাপ লেগে গেছে। তার আগে উর্দু ছিল যে-কোনও আধুনিক ভাষার মতো এক ধর্মনির্বিশেষ ভাষা। হিন্দু মুসলমান শিখ ও পার্সি সকলের অবদান আছে এই ভাষার বিশাল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পিছনে। শুধুমাত্র বাঙালি হিন্দুর অবদান নিয়ে উর্দুতে একটি বই ('বঙালি হিন্দুয়োঁ কি উর্দু খিদমত') লিখেছিলেন শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য (১৯৩০-১৯৯৩), যার মৃত্যুর পর কলকাতায় এক স্মরণসভায় 'অঞ্জুমনে তরক্কি-এ উর্দু'র সহ-সম্পাদক কাসেম আলি স্বীকার করেন যে পশ্চিমবঙ্গের ৫০ লক্ষ উর্দুভাষী সবাই মিলে মাতৃভাষার জন্য যা করতে পারেনি, শান্তিরঞ্জন একাই তা করে গেছেন সারা জীবন উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত থেকে। আর এখন, উত্তর ভারতে যেখানে সবচেয়ে বেশি উর্দুর প্রচলন ছিল, সেখানেও এমনকী মুসলমান পরিবারের ছেলেমেয়েদের হিন্দি বা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়তে পাঠানো হয় কারণ পর্যাপ্ত উর্দু স্কুল নেই। আজকের যুগে অন্তত এই দেশে উর্দুতে কোনও কৃষণ চন্দর বা মুহম্মদ ইকবাল জন্মাবে তা কল্পনা করাও কঠিন।

শুরুর কথার সূত্র ধরে এ প্রসঙ্গে আরও কিছুটা যোগ করতে চাই যে উর্দুর সঙ্গে মৌলবাদকে মিলিয়ে দেখা কতখানি ভুল। রাজনীতি বা ধর্মের ক্ষেত্রে যাই হোক, উর্দুসাহিত্যে মৌলবাদের স্থান নেই। এক সময় সারা ভারত প্রগতি আন্দোলনে উর্দু কবি-লেখকরাই ছিলেন সম্মুখ ভাগে। চল্লিশের দশকে গঠিত ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ বা গণনাট্য সংঘেরও আগে এদেশে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে প্রগতি আন্দোলনের প্রয়াস প্রথম সংগঠিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে লখনউয়ে সারা ভারত

প্রগতি লেখক সম্মেলনের মাধ্যমে যার উদ্যোক্তা ছিলেন সাজ্জাদ জাহির এবং তাঁর সহযোগী প্রধানত উর্দুরই কিছু কবি-লেখক। কৃষণ চন্দর শুধু যে প্রগতি আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন তা-ই নয়, এই আন্দোলনের ফসলও বলা যায় তাঁকে। প্রগতি সম্মেলনের আসরে কৃষণ চন্দর প্রথমবার উপস্থিত হন ১৯৩৮ সালে কলকাতায়। হ্যাঁ, কলকাতা তাঁর অভিষেকভূমি। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর। প্রগতি লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাজ্জাদ জাহিরের প্রগতি আন্দোলন-ভিত্তিক বিশাল স্মৃতিকথা 'রওশনাই' গ্রন্থে সাহিত্যের বড়ো মঞ্চে প্রথম পা-দেওয়া সেদিনের সেই তরুণের যে বিবরণ পাই তা এই রকম ঃ 'না, আগে কখনও আমি কৃষণ চন্দরকে দেখিনি বা এই নামে পঞ্জাবে যে কোনও লেখক আছে জানতাম না। ওঁকে দেখে একটু নিরাশই হলাম। ফয়েজের চেয়ে লম্বায় দু-ইঞ্চি ছোটো। মুখ থেকে কথা খরচ করায় ফয়েজের চেয়েও কৃপণ। চেহারা দেখে মনে হয় যেন সদ্য কলেজে-ঢোকা ছাত্র (তখন ওর মাথায় অনেক চুল ছিল)। কথার স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে মিনমিন করে সাড়া দিত।' ওই সময় পঞ্জাব বিশেষ করে লাহোর ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্যতম প্রধান পীঠভূমি। কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় প্রগতি লেখক সম্মেলনে সেই পঞ্জাব অর্থাৎ অবিভক্ত পঞ্জাবের একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন কৃষণ চন্দর, তখন তিনি যতই অখ্যাত হোন না কেন। যেহেতু একমাত্র প্রতিনিধি তাই সংঘের পঞ্জাব শাখার সম্পাদকও নির্বাচিত হলেন তিনিই। এ দায়িত্ব যে ভুল হাতে পড়েনি তা পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করেছে।

কৃষণ চন্দর যে শীঘ্রই পঞ্জাবে প্রগতি আন্দোলনের অন্যতম মুখ্য সংগঠন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন এবং সেই সঙ্গে সাজ্জাদ জাহিরের আস্থাও অর্জন করতে পেরেছিলেন তা বোঝা যায় সাজ্জাদের স্মৃতিকথার পরবর্তী অংশ পড়ে। ১৯৪০ সালের গোড়ার কথা লিখতে গিয়ে সাজ্জাদ স্বীকার করেছেন যে তখন পঞ্জাবে প্রগতি আন্দোলনের পরিস্থিতি কী ছিল তার যথাযথ বর্ণনা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়— সে কাজ করতে পারতেন ফয়েজ নয়তো কৃষণ চন্দর। ওই অল্প সময়ের মধ্যে সাহিত্যকর্মেও যে কৃষণের দ্রুত উন্নতি হয়েছিল তার এজাহার পাই সাজ্জাদের লেখায়। যে কৃষণের নামই শোনেননি তিনি দু বছর আগে, গল্পকার হিসেবে ইসমত চুগতাই, বেদী, মান্টো, আহমদ আলি, সর্দার জাফরির পাশে তাঁর নাম তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলে আসছে তাঁর বিবরণে। তাঁর গোটা বইতে খাজা আহমদ আব্বাস বা আলি সর্দার জাফরির চেয়ে বেশিবার উল্লেখ আছে কৃষণ চন্দরের। এমনকী ফয়েজ আহমদ ফয়েজ যিনি ইকবাল-উত্তর উর্দু সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিই শুধু নন, সাজ্জাদ জাহিরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং প্রগতি লেখক আন্দোলনের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নেতা ছিলেন, সাজ্জাদের গ্রন্থে সেই ফয়েজও যত উল্লেখ পেয়েছেন, কৃষণ তার চেয়ে কম পাননি। সাহিত্যিক হিসেবে এবং প্রগতি আন্দোলনের যোদ্ধা হিসেবে কৃষণ চন্দরের গুরুত্ব বুঝবার এটা একটা চটপট উপায় বলেই এই প্রতিতুলনা দিলাম।

ইংরেজিতে এম. এ তদুপরি আইনের ডিগ্রি—তাঁর যা শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল তাতে কৃষণ চাইলেই অধ্যাপক বা উকিল হতে পারতেন। কিন্তু সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের টানে তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে যোগ দিলেন। রেডিওর লাহোর

কেন্দ্রের কর্তা ছিলেন প্রসিদ্ধ উর্দু রসসাহিত্যিক আহমদ শাহ বুখারি যিনি পত্‌রাস নামেই অধিক পরিচিত। বেছে বেছে কবি-লেখকদের চাকরি দিয়েছিলেন তিনি রেডিওতে। নিজে যখন দিল্লি কেন্দ্রে বদলি হলেন কৃষণকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন সেখানে। শুধু কী কৃষণ, আরও অনেক বিখ্যাত কবি-লেখক—মান্টো, অশ্‌ক, রাশিদ প্রমুখ দিল্লি কেন্দ্রে যোগ দিয়েছেন তখন পাত্‌রাসের আহ্বানে। সেটা ১৯৪১ সাল। ততদিনে সহযোদ্ধা হিসেবে সাজ্জাদের সঙ্গে কৃষণের বেশ সখ্যতা হয়েছে। সাজ্জাদ রেডিও স্টেশনে আসতেন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। মান্টো বা অশ্‌কের সঙ্গে তত নয়, কৃষণের সঙ্গেই বেশি কথা হত তাঁর। সেই সব আলোচনার ভিত্তিতে ১৯৪২ সালে দিল্লিতে তৃতীয় সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সম্মেলনের উদ্যোগ শুরু হয় এবং কৃষণ চন্দর এর আহ্বায়ক নিযুক্ত হলেন। আগের সেই মুখচোরা অখ্যাত তরুণের কলকাতা সম্মেলন থেকে দিল্লি সম্মেলনে এ এক আশ্চর্য রূপান্তর। কৃষণ কথা তখনও কম বলতেন কিন্তু সংগঠনের কাজে তাঁর সক্রিয়তার অভাব ছিল না। তবে নামে সর্বভারতীয় সম্মেলন হলেও দিল্লি, লাহোর, অমৃতসর ও লখনউ-এর বাইরের লেখক তাতে খুব বেশি কেউ অংশ নেননি। উর্দু লেখকদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল এবং সবাই যে এঁরা প্রগতি চিন্তার শরিক ছিলেন তাও নয়। আসলে কৃষণ নতুন দায়িত্ব পেয়ে কোনও ভেদাভেদ না করে যাকে পেরেছেন তাকেই আমন্ত্রণ করেছেন। ফলে দুভাগে সভা করতে হল। একটা সাধারণ সভা আর একটা সভা শুধু প্রগতি লেখকদের জন্য। তবে যে-প্রস্তাব নেওয়া হল সেখানে তাতে সব লেখকই একমত হলেন যে তাঁরা সংগ্রামী জনগণের পক্ষে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। যুদ্ধ চলাকালে তাঁদের এই ঘোষণা ইংরেজ শাসকদেরও খুশি করেছিল, নইলে রাজ-কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও কৃষণ চন্দর কী পারতেন সম্মেলনের আহ্বায়ক হতে। এ বিষয়ে তিনি আগেই সবুজ সংকেত পেয়ে গিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে।

কিন্তু বেশি দিন রেডিওর চাকরি ভালো লাগেনি কৃষণের। চারের দশক থেকে বোম্বাই উর্দু কবি-লেখকদের এক বড়ো ঘাঁটি হয়ে ওঠে, বলা বাহুল্য, চলচ্চিত্র জগতের আকর্ষণে। জোশ মলিহাবাদি, ইসমত চুগতাই, আলি সর্দার জাফরি, মজাজ, জান নিসার আখতার, কইফি আজমি, সাহির লুধিয়ানবি, উপিন্দরনাথ অশ্‌ক, আখতার-উল-ইমান, সমরুর ভগ্নিদ্বয়, খাজা আহমদ আব্বাস, মজরুহ সুলতানপুরি—পুরনো দিনের হিন্দি সিনেমার দর্শকদের কাছে গীতিকার বা চিত্রনাট্যকার হিসেবে এঁরা অনেকেই পরিচিত নাম, এঁদের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও। এঁরা কেউ থাকতেন পুনাতে, কেউ খোদ বোম্বাই শহরে। কৃষণ এবং তাঁর সাহিত্যিক ভ্রাতা মহিন্দরনাথও এসে আস্তানা গড়লেন পুনায়। প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রাণপুরুষ সাজ্জাদ জাহিরও তখন বোম্বাইয়ে হাজির কমিউনিস্ট পার্টির উর্দু সাপ্তাহিক বের করার দায়িত্ব নিয়ে। এঁদের সঙ্গে বোম্বাই শহরে বসবাসকারী মরাঠি, গুজরাতি, হিন্দি, মালয়ালম, তেলুগু ও কন্নড় ভাষার প্রগতি ভাবাপন্ন কবি-লেখকদের যোগাযোগ ছিল। যৌথ সভা হত নিয়মিত। এঁদের কর্মব্যস্ততা এবং ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ এমন ঘন হয়ে উঠছিল যে চতুর্থবার সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সম্মেলন আয়োজনের প্রয়োজন অনুভব করলেন সংঘের নেতৃবৃন্দ। সেই মুহূর্তে একমাত্র বোম্বাই ছিল এর জন্য

সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। বলা বাহুল্য, তেতাল্লিশের এই সম্মেলন হয়েছিল বোম্বাই শহরেই। মরাঠি সাহিত্যের প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কমিউনিস্ট নেতা এস এ ডাঙ্গে। মরাঠি সাহিত্যিকরাই তাঁর নাম প্রস্তাব করেছিলেন, নইলে অন্য ভাষার লেখকদের কাছে শ্রমিক আন্দালনের নেতা ভিন্ন আর কোনও পরিচয় ছিল না তাঁর। সেবারের সম্মেলনেও উর্দু সাহিত্যিকরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। সাজ্জাদ জাহির দ্বিতীয়বার সংঘের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। কৃষণ চন্দর এই সম্মেলনেও উপস্থিত ছিলেন সক্রিয়ভাবেই ; তবে মঞ্চের কেন্দ্রে আসার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে হায়দ্রাবাদের পরবর্তী সম্মেলন পর্যন্ত।

এই হায়দ্রাবাদ সম্মেলনেরই কাহিনী কৃষণ লিখেছেন তাঁর 'পওদেঁ' গল্পে রিপোর্তাজ ভঙ্গিতে। 'এবং জলার্ক' কাগজেই তার অনুবাদ ছাপা হয়েছে। হায়দ্রাবাদে তখন নিজাম রাজত্ব। প্রজাদের মধ্যে মাত্র দশ শতাংশ উর্দুভাষী, তা হলেও শিক্ষা ব্যবস্থা বা সরকারী কাজে তেলুগুর চেয়ে উর্দুরই ছিল বেশি বোলবোলা। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রগতিশীল উর্দু কবি-লেখকদের সন্দেহের চোখে দেখা হত। উর্দুর প্রসিদ্ধ কবি জোশ মলিহাবাদি, যিনি যৌবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছিলেন এই হায়দ্রাবাদ শহরে, নিজের প্রতিবাদী স্বভাবের জন্য বহিষ্কৃত হন এবং সম্মেলন উপলক্ষেও পুনঃ প্রবেশের অনুমতি পাননি। হায়দ্রাবাদে প্রগতি সম্মেলন চলাকালে মুসলিম লিগ-পন্থি লেখকরা এক পাল্টা সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং প্রগতি আন্দোলনের প্রধান নেতৃবৃন্দের অন্যতম, সম্মেলন উপলক্ষেই আগত মৌলানা হসরত মোহানিকেও তাঁরা ওই সম্মেলনে আমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর মৌলানা উপাধি দেখে। কিন্তু মজার কথা, মৌলানা সেখানে গিয়ে প্রগতি আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট-দেরই প্রচার করে এলেন। সাজ্জাদ জাহির তাঁর স্মৃতিকথায় সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে একটা কথা বলেছেন যে এদের এই নেতিবাচক আবেগ থেকে একটাও বলার মতো উর্দু কবিতা বা অন্য কোনও ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি। সত্যি এটা আশ্চর্য, উর্দুভাষীদের এক বড়ো অংশ পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করলেও, গুরুত্বপূর্ণ উর্দু কবি-লেখকরা প্রায় সকলেই তখন, নিজেদের মধ্যে নানারকম মতবিরোধ সত্ত্বেও প্রগতি ও মানবিক ভাবনার অনুগামী ছিলেন।

১৯৪৫-এর অক্টোবরে হায়দ্রাবাদে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা সর্বভারতীয় পর্যায়ের হলেও সেটা ছিল শুধুই উর্দু কবি-লেখকদের জন্য। আগেও বলেছি যে এতে অনেকখানি আলো পেয়েছিলেন কৃষণ চন্দর। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে তিনিই সভাপতিত্ব করেন। এ ছাড়া তাঁর ওপর দায়িত্ব ছিল উর্দু উপন্যাস সম্পর্কে স্বরচিত আলোচনা পাঠ করার। যদিও সাজ্জাদ জাহির বলেছেন যে 'পওদেঁ'তে সম্মেলনের যে বিবরণ দিয়েছেন কৃষণ তার অপেক্ষা ভালো বা তার সঙ্গে তুলনীয় কোনও প্রতিবেদন এ বিষয়ে রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তা হলেও কৃষণের বর্ণনা বা তথ্যে কিছু অসম্পূর্ণতা আছে। 'এবং জলার্ক'-এর পাঠক 'পওদেঁ'র বর্ণনা সম্পর্কে অবগত। সেটা থেকে সাজ্জাদ যে বিবরণ দিয়েছেন তাঁর 'রওশ্‌নাই' গ্রন্থে তা অনেকটা আলাদা, এমনকি যেখানে কৃষণ সম্পর্কে উল্লেখ আছে সেই অংশটুকুও। অবশ্য কৃষণের লেখায় তার নিজের প্রসঙ্গ সবটা না থাকার আলাদা কারণ আছে। যাবার দিন কৃষণ স্টেশনে

এলেন রুপালি পর্দার জনৈকা সুন্দরী অভিনেত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। এই কথা তিনি বেমালুম চেপে গেছেন তাঁর নিজের প্রতিবেদনে। যাই হোক, তা নিয়ে সাজ্জাদের কোনও মাথাব্যথা ছিল না। তিনি চিন্তিত ছিলেন কৃষণের বক্তৃতা নিয়ে যা তিনি বোম্বাই ছাড়ার আগে তাঁকে দিয়ে কিছুতেই লেখাতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল যে হায়দ্রাবাদে পৌঁছে লিখে দেবেন। যদিও হাতে সময় ছিল না, পৌঁছবার পরদিনই সম্মেলন। তার ওপর আবার হায়দ্রাবাদে যেতেই কৃষণের জ্বর এল। একবার কলকাতায় এসে মাত্র ১০১ ডিগ্রি জ্বরেই কেমন কাহিল হয়ে পড়েছিলেন কৃষণ, তার সরস বিবরণ আমরা পড়েছি মজহর ইমামের লেখায় এই কাগজেরই গত কৃষণ চন্দর সংখ্যায়। কিন্তু হায়দ্রাবাদে উলটোটা ঘটেছিল। রাত্রে ডাক্তার এসে তাঁকে দেখে গেছেন। পরের দিন সকালে যেদিন সম্মেলন শুরু, সাজ্জাদ কৃষণের ঘরে এলেন তাঁর শরীরের খোঁজ নিতে। গিয়ে দেখেন কৃষণ লেখার টেবিলে ঝুঁকে আছেন এবং ভাষণ ততক্ষণে প্রস্তুত। সাজ্জাদ তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'তোমার তো জ্বর ছিল, লিখলে কখন?' ভারমুক্ত মনে কৃষণ মৃদু হেসে জবাব দিলেন, 'রাত থেকেই লিখতে শুরু করেছি, টের পাইনি জ্বর কখন নেমে গেছে।' এই হায়দ্রাবাদ সম্মেলনেই খোলাখুলি আহ্বান জানালেন কৃষণ চন্দর লেখকদের সাম্যবাদের প্রচারে এগিয়ে আসার জন্য। বলেছিলেন, 'আমাদের সামনে দুটোই রাস্তা—নিরন্তর গতিশীল সাম্যবাদী বিচার ধারা অথবা নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট বসে থাকা মৃত্যুর জন্য।' এই ঘোষণার ফল অবশ্য ভালো হয়নি কারণ প্রগতি আন্দোলন ছিল কমিউনিস্ট অকমিউনিস্ট সব রকম লেখকদের মিলনক্ষেত্র যাঁরা অনেকেই ছিলেন উদার মানবতাবাদী—কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী না হয়েও। সংগঠনে কমিউনিস্ট প্রভাব বৃদ্ধির ফলে এঁরা ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে লাগলেন এবং কেউ কেউ নানা পীড়নের শিকার হলেন কমিউনিস্ট আদর্শ থেকে বিচ্যুতির অভিযোগে।

হায়দ্রাবাদের পর প্রগতি লেখক সংঘের আর এক সম্মেলন হয়েছিল শুধু উর্দু কবি-লেখকদের নিয়ে আহমেদাবাদে। সেখানেও প্রথমদিন অধ্যক্ষতা করেন কৃষণ চন্দর। মুসলিম লিগপন্থীদের হুমকি সত্ত্বেও প্রায় আটশো থেকে হাজার দর্শক এসেছিলেন অনুষ্ঠানে, তাও টিকিট কেটে। দ্বিতীয় দিনে আলি সর্দার জাফরির বক্তৃতা চলাকালে এক লিগ-সমর্থক শ্রোতা চেঁচামেচি শুরু করলেন, 'কী হচ্ছে! জাফরি সাহেব মুহম্মদ ইকবালকে কমিউনিস্ট বানাতে চাইছেন কেন?' ইকবালকে নিয়ে গোঁড়াপন্থী এবং প্রগতিশীলদের এই টানাটানি আজও থামেনি। যাই হোক সেদিন ওঁরা লিগপন্থীদের হামলা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই সামলেছিলেন।

দেশভাগের পর সাজ্জাদ জাহিরকে দলের নির্দেশে যেতে হল পাকিস্তানে—প্রগতি লেখক সংঘের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ছেড়ে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তিনি। পরে সেখানে দীর্ঘদিন কারাবাসের পর দেশে ফিরে তিনি ১৯৫৫ সালে প্রগতি লেখক সংঘের কাজকর্ম আবার নতুন করে শুরু করেন এবং এই ব্যাপারে কৃষণ চন্দর তাঁর সহযোগী ছিলেন আগের মতোই। যৌবনের শুরুতে যে প্রগতি শপথ নিয়েছিলেন তা পালন করে গেছেন দুজনেই আমৃত্যু।

বাঙালি পাঠকের কাছে কৃষণ চন্দরের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়—প্রগতি আন্দোলনে তাঁর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা, এ সম্পর্কে অন্তরঙ্গ বিবরণ তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ওই আন্দোলন প্রসঙ্গে সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ সাজ্জাদ জাহিরের 'রওশনাই'। উর্দু তেমন ভালোভাবে না জানা সত্ত্বেও সরাসরি মূল থেকে পাঠ করে কৃষণ চন্দর সম্পর্কিত কিছু তথ্য যথাসাধ্য এখানে উদ্ধার করেছি। এবার কৃষণ চন্দরের সাহিত্য সম্পর্কেও দু-এক কথা বলা দরকার। সেটাও এই বিষয়ে যাঁরা ওয়াকিবহাল এবং কৃষণের মূল্যায়ন করেছেন তাঁদেরই মুখ থেকে।

সাম্প্রতিক কালে যাঁরা উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে তিনজনের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই তিনজন হলেন মুহম্মদ সাদিক, র‍্যাল্‌ফ রাসেল এবং আলি জাওয়াদ জাইদি। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রত্যয়ী আলোচনা লাহোরের অধ্যাপক সাদিকের। তাঁর বইয়ের প্রথম সংস্করণ বেরিয়েছিল ১৯৫৭ সালে এবং দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ বেরয় ১৯৮২তে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস থেকে। সাদিকের পছন্দ-অপছন্দ খুব স্পষ্ট এবং আলোচনাভুক্ত যে-কোনও বিষয় সম্পর্কে তিনি খোলাখুলি রায় দেন। তাঁর 'ছোটগল্প' শীর্ষক অধ্যায়ে কৃষণ চন্দরের জন্য তিনি সাকুল্যে দেড় পাতা বরাদ্দ করেছেন। উর্দু সাহিত্যে কবিদেরই প্রাধান্য, ফলে কবিরা যেমন কেউ কেউ সাদিকের ইতিহাসে গোটা অধ্যায় জুড়ে আছেন, কথাসাহিত্যিকদের ভাগ্যে তা জোটে নি, এমনকি প্রেমচন্দেরও নয়। তারই মধ্যে তুলনামূলকভাবে বড়ো জায়গা যাঁরা পেয়েছেন, কৃষণ তাঁদের অন্যতম। সাদিক কৃষণ চন্দরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তাঁর দুটি গল্পকে—'জিন্দগি কে মোড় পর' এবং 'ফিরদাউস'। যে-কোনও বড়ো লেখকের মতো কৃষণকেও কোনও নির্দিষ্ট তকমার মধ্যে আঁটানো সম্ভব নয়, সাদিক এ কথা স্বীকার করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে প্রকৃতিপ্রীতির জন্য কৃষণ ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও রুশোর সঙ্গে তুলনীয়। একদিকে তিনি সমাজবাদী মননের অধিকারী এবং সেই অর্থে আধুনিক। আবার অতীতও তাঁকে মুগ্ধ করে এবং অতীতের কল্পলোকে প্রবেশ করতে তাঁর দ্বিধা নেই।

র‍্যাল্‌ফ রাসেল বিদেশি হলেও উর্দু সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়ন গভীর। তিনিও চাঁচাছোলা কথা বলতে ভালোবাসেন এবং বাস্তবতা থেকে মিথকে আলাদা করতে যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছেন। তাঁর 'দ্য পারস্যুট অব উর্দু লিটারেচার' ১৯৯২ সালে ছাপা হয় সেই একই প্রকাশনালয় অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস থেকে। কৃষণকে তিনি স্থান দিয়েছেন তাৎপর্যময়ভাবে 'প্রগতি লেখক আন্দোলন' শীর্ষক অধ্যায়ে। কৃষণ পাঁচ হাজারের অধিক গল্প লিখেছিলেন এ কথা বলেই তিনি তাঁর সম্পর্কে এক কঠোর মন্তব্য করেছেন যে এর আশি ভাগ গল্প যদি ধ্বংসও করে দেওয়া হয় তাতে সাহিত্যের কোনও বড়ো ধরনের ক্ষতি হবে না। তবে কৃষণকে উর্দুর শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে স্থায়ী আসন দিতে তাঁর আপত্তি নেই। রাসেল তাঁর গ্রন্থে কৃষণের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন যা কৃষণ সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠকদের

জানা উচিত। রাসেলের কাছে নিজের গল্পের সমালোচনা শুনে কৃষণ তাঁকে প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন যে ইংরেজি অনুবাদের জন্য ইসমত চুগতাই এবং রাজিন্দর সিংহ বেদীর গল্পই বেশি উপযুক্ত। তিনি নিজে যে গল্প লেখেন তা সাধারণ উর্দু পাঠকদের জন্য এবং এইভাবেই তিনি লিখে যেতে চান। রাসেল বলতে বাধ্য হয়েছেন যে এর পর আর কোনও কথা চলে না এবং তিনি স্বীকার করেছেন যে দেশভাগের সময় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা নিয়ে কৃষণ যেসব গল্প লিখেছিলেন সেগুলো মহৎ সাহিত্য যদি নাও হয়, অন্তত তিনি মানবিকতার প্রতি তাঁর কর্তব্য পালন করে গেছেন।

সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা হিসেবে জাইদি যদিও সাদিক বা রাসেল যে মানের সে মানের নন, তা হলেও সাহিত্য অকাদেমি দ্বারা প্রকাশিত তাঁর এই বইটি তথ্য ও বিবরণের দিক দিয়ে মূল্যবান। কৃষণকে তিনি রেখেছেন তাঁর 'আধুনিক গল্প' শীর্ষক অধ্যায়ে এবং তিনিও তাঁর জন্য দেড় পৃষ্ঠার বেশি জায়গা দেননি। তাঁর মতে কৃষণের গল্পে বাস্তবতা ও রোমান্টিকতার সহাবস্থান নয়, বরং এই দুইয়ের সম্পূর্ণ মিশ্রণ ঘটেছে।

এই তিনজনের লেখায় সব মিলিয়ে যা পাওয়া গেছে তাতে আনন্দের কথা কোনও পরস্পরবিরোধিতা নেই, বরং কৃষণের এক সামগ্রিক চেহারা ফুটে উঠেছে। কৃষণ খুব বড়ো লেখক না হতে পারেন কিন্তু ভুলে যাওয়ার মতো লেখকও নন। শুধু সমসময় নয়, পরবর্তী সময়ও যে তাঁকে মনে রেখেছে তার প্রমাণ ভিন্ন ভাষায় এই দুই খণ্ডের কৃষণ চন্দর সংখ্যা।

কিশলয় সেন

কৃষণ চন্দর ঃ পুনর্পাঠের প্রয়াস

সময়টা যাটের দশকে, শেষদিকে। যতদূর স্মরণে আছে সেটা সাতষট্টির শেষ অথবা আটষট্টির শুরু। কৃষণ চন্দরের 'হাম ওয়াঁসী হ্যায়' (আমরা বর্বর) গল্প সংকলনের বাংলা অনুবাদ হাতে এলো। অনুবাদকের নাম মনে নেই। যতদূর স্মরণে আছে পাঁচ-ছটি গল্প নিয়ে সংকলনটি। পেশোয়ার এক্সপ্রেস, লাল গোলাপ, জনসন সাহেব—এ রকম আরও দু-একটি গল্প। সবই দেশভাগ আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে নির্মাণ। গল্প পাঠে সে মুহূর্তে শিহরিত হয়েছিলাম। এক বুক ঘৃণার, ক্রোধের প্রকাশ গল্পগুলোর ছত্রে ছত্রে। তীব্র কষাঘাতে, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে মন আলোড়িত হয়ে ওঠে। কৃষণ চন্দরের সাহিত্য কৃতির সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। বাংলা সাহিত্যেও দাঙ্গার পটভূমিতে বেশ কিছু গল্প উপন্যাস আছে। কিন্তু কৃষণ চন্দরের ভঙ্গী স্বতন্ত্র, বেদনার প্রকাশ স্বতন্ত্র, মানবতার প্রতি গভীর ভালবাসার প্রকাশ স্বতোৎসারিত। এই বিশিষ্টতাই তাঁর রচনার আকর্ষণকে তীব্রতর করে।

ভাষার একটা দূরত্ব তো আছেই তবুও তাঁর রচনা অভিনিবেশ দাবি করে। পরবর্তীতে বাংলা ভাষায় কৃষণ চন্দরের কিছু গল্প উপন্যাস অনূদিত হয়েছে। তার রচনাকর্মের সঙ্গে আর একটু পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেছি।

সাহিত্য অকাদেমির ইংরাজি ভাষায় অনূদিত গল্প সংকলন গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায়—কৃষণ চন্দরের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা আশির বেশি। এর মধ্যে ত্রিশটি ছোট গল্পের সংকলন। অবশ্যই সব কটি রচনা পাঠের সৌভাগ্য হয়নি।

আসরফ চৌধুরী মূল উর্দু থেকে কিছু গল্প অনুবাদ করেছেন। গল্পরীতি আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানাচ্ছেন—"১৯০৮ সাল থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান—এ সময়কালে উর্দু সাহিত্যে বেশ কয়েকজন শক্তিশালী কথাশিল্পীর আবির্ভাব ঘটে, উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে 'রূমানবী' গল্পকার নামে তাঁরা পরিচিত। তাঁদের রচনাশৈলী ও ভাষা বড় চমৎকার, কিন্তু তাঁদের গল্পগুলি ভাবাবেগে ভারাক্রান্ত, বাস্তবতাবর্জিত। প্রেমচন্দের হাত ধরে এই গল্পরীতির পরিবর্তনের সূচনা হয় ...।" এই পরিবর্তনের ধারাটি আমরা লক্ষ্য করি কৃষণ চন্দর, সাদাত হোসেন মান্টো, ইসমত চুগতাই, রাজিন্দর সিং বেদী, মুলুকরাজ আনন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট উর্দু ভাষার সাহিত্যকারদের মধ্যে। এঁদের রচনায় এসেছে সাধারণ মানুষের জীবন, জাতপাত সাম্প্রদায়িক হানাহানি, শোষণ-বঞ্চনা, অপমানিত অবমানিতা জীবনের নানা জটিল বাস্তবতা। বেঁচে থাকার অদম্য, প্রাণান্তকর লড়াইয়ের বর্ণময় জীবন্ত ছবি।

কৃষণ চন্দরের সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত ছাত্রাবস্থায় ঘটলেও সুস্পষ্ট দিশা লাভ করেছিল প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অংশভাগ হিসেবে, এক আদর্শগত আন্দোলনের পরিমণ্ডলে। এই আন্দোলনই পুষ্ট করে তাঁর জীবনমুখী গভীর দৃষ্টিভঙ্গী, সমাজপ্রগতির জীবনদর্শন।

কৃষণ চন্দর প্রসঙ্গে আলোচনায় মহেন্দরনাথ লেখেন—"শব্দের কমনীয় সৌন্দর্য, বক্তব্যের গভীরতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ লঘু কৌতুকের হাস্যচ্ছটার ভেতর দিয়ে রচনা যেভাবে

ধীরে ধীরে প্রকৃতির বৈচিত্র্য, মানুষের মনুষ্যত্ব ও মহত্বের সৌন্দর্য এবং পাশবিকতার এক পূর্ণাঙ্গ আখ্যায়িকায় পরিণত হয়, সেটা শুধু কৃষণ চন্দরের কাহিনীর মধ্যেই পাওয়া যায়...।" ('নয়া ইস্তাহার'—আশরফ চৌধুরী)।

কৃষণ চন্দর নিজেই জানাচ্ছেন—"আমি আমার দিদিমার মুখে গল্প শুনেছি। নিজের মায়ের মুখেও গল্প শুনেছি। সেজন্য আমার গল্পের শিল্প কৌশলও অত্যন্ত পুরোনো। যাতে পাঠক গল্প পাঠে আনন্দ পায়। রাত, মৃত্যু, অন্ধকারের ভয় দূর হয়ে যায়।...আমরা যে সূর্যের সন্তান। অগ্নি আমাদের দেশ। তাপ আমাদের ভোজন। চাঁদনি আমাদের প্রিয়তমার মুখ। এই পৃথিবীতে চোখের থেকে পবিত্র আর কিছুই নেই। ...তাই আমার গল্পে চোখ থাকে। এই চোখ পথ দেখে ; পথের আশপাশের মনোরঞ্জক দৃশ্য দেখে, কিন্তু লক্ষ্য পথের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে।" ('আমার প্রিয় গল্প'—ভূমিকা)।

আমরাও দেখি তাঁর গল্পে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণচ্ছটা, জীবন্ত মানুষের মিছিল। দৃষ্টিতে তির্যকভঙ্গী, কৌতুক বিদ্রূপ ঘৃণা। আমরা লক্ষ্য করি ব্রাত্যজনের জীবনাশ্লিষ্ট কোন সমস্যাই কৃষণ চন্দরজীর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর সময়কালে গান্ধীবাদী নেতা বিনোবাজীর নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল 'ভূদান আন্দোলন'। এ আন্দোলনের ঘোষিত 'আদর্শ ও লক্ষ্য' ছিল ভূস্বামী-মহাজনদের হৃদয় পরিবর্তন ঘটিয়ে কৃষক সমস্যার সমাধান ঘটানো। ভারতে বহু যুগ ধরেই কৃষকদের ভূমিস্বত্বলাভের আন্দোলন বারবার বিদ্রোহের আকারে ফেটে পড়ছিল। প্রত্যেকটি বিদ্রোহই আগের বারের চেয়ে আরও সংগঠিত আকারে আত্মপ্রকাশ করছিল। ভূস্বামী-মহাজন শ্রেণীর তাত্ত্বিক নেতারাও এ কারণে শংকিত হয়ে পড়ছিলেন। তারই ফলশ্রুতি—বিনোবাজীর 'ভূদান আন্দোলন'। এ ইতিহাস সবারই জানা।

কৃষণ চন্দর এ দেশের কৃষক জীবনের সম্যক পরিচয় জানতেন। তাঁর বিবৃতি থেকে জানা যাচ্ছে—"আমার শৈশব এবং কৈশোর কৃষকদের মধ্যেই কেটেছে। শ্রমরত মানুষের প্রতি যে ভালবাসা তা আমাকে ভারতীয় কৃষকরাই শিখিয়েছেন। তাদের সঙ্গে থাকার জন্যে, যে অত্যাচার তাদের ওপর চলে আসছে তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগও পেয়েছি। আর তা বর্তমান জীবন ব্যবস্থার ওপর পুরোনো জীবন ব্যবস্থার ভার চাপিয়ে দিয়েছে। এক এক সময় মনে হয় আমি নিজেই তাদের ঘাড়ের ওপর এই জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছি। কারণ আমি ছিলাম সামন্তশ্রেণীর সন্তান। ...অন্যদিকে কৃষক এবং কৃষক সন্তানরাই ছিল আমার বন্ধু। ...তাই দুদিক থেকেই কৃষকদের দেখতে পেয়েছি ...।" ('এ মহাজাগর' উপন্যাসের পৃষ্ঠভূমি)

কৃষণ চন্দরের দুটি রচনা এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে—'ভূমিদান' গল্প এবং 'এ মহাজাগর' উপন্যাস।

'ভূমিদান' গল্পের শুরু হয় আচারিয়াজীর ভাষণ দিয়ে। তিনি বলেন—"বড় বড় জমিদারদের মন খুলে ভূমি দান করা উচিত—নিজেদেরই স্বার্থে। ...নিজেদের বাঁচানোর জন্যে, দেশকে হিংসার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে, ভূমি দান করো।" লক্ষণীয় এই গান্ধীবাদীরা 'শ্বেত সন্ত্রাসের' কথাটি ভুলেও উচ্চারণ করেন না। তীব্র শ্লেষে কৃষণ চন্দর এই নেতাদের স্বরূপটি তাই ব্যাখ্যা করেন—"জগতে সব

মহাপুরুষদেরই কাজ, মানুষকে কিছু না কিছু থেকে রক্ষা করা। ...তিনিও জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন রক্ষা করার জন্য। জমিদারদের কৃষকদের হাত থেকে, কৃষকদের বিপ্লব থেকে আর বিপ্লবকে কমিউনিস্টদের হাত থেকে বাঁচানোর কাজে লেগে আছেন তিনি।"

আচারিয়াজীর ডাকে সাড়া দিয়ে গাঁয়ের সবচেয়ে বড় জমিদার, অত্যাচারী জমিদার শিউনারায়ণ সিং দু একর জমি দান করলেন। কৃষণজী তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গীতে কৃষক সাধারণের অনুভূতিটি প্রকাশ করেন এইভাবে—"ক্ষেতমজুর রামু কালুয়া বললো—জমিদারের ভেতর কোন নতুন মন ফিট করে দিয়ে নাকি হে, টিউবওয়েলের মতো?

কালু ধোপা বললো—মন তো আর মন নয়, কুর্তা হয়ে গেছে। দরকার পড়লেই চুপচাপ বদলে নাও।"

ওই বিশেষ দিনে রামু কালুয়াও সেই অনাবাদী জমির ভাগ পেল। তারপর সে অমানুষিক শ্রমে., দীর্ঘ লালিত স্বপ্নে সেই বন্ধ্যাভূমি সোনার ফসলে ভরিয়ে দিল। তখন শুরু হল জমিদারের কূট চক্রান্ত।

এই চক্রান্ত আর বর্বরতার স্বরূপটিকে দেখিয়ে কৃষণজী লেখেন—"জমিদারের লোক বেশি ছিল। ওদের ধরে ফেলে খুব মার দিল। রামুয়ার কুঁড়েতে আগুন লাগিয়ে দিল। তারপর কাটা ফসল তুলে নিয়ে গেল সব। ..."

"রামুয়ার চেহারা রক্তাক্ত, কিন্তু তার চোখে এক ফোঁটা জল নেই। আজ তার ক্ষেত তার নয়, তার মেয়ে তার নয়, তার ফসল তার নয়।...

...এই মুহূর্তে রামুয়ার মনে হচ্ছে, চোখের জল কোন কাজের নয়, ও দিয়ে কিছু করা যায় না। এই অশ্রু তলোয়াব নয় যে শিউনারায়ণ সিং-এর বুকটা চিরে ফেলতে পারে। ওটা ঢাল নয় যে, তার মেয়েকে বেইজ্জতি থেকে বাঁচাতে পারে। ওটা আগুনও নয় যে, তাই দিয়ে অত্যাচারীর চিতা জ্বালাতে পারে। তা হলে সে কেন কাঁদবে?"

এক গভীর একাত্মতা বোধ ছাড়া কৃষক জীবনের এই ট্র্যাজেডি প্রকাশ সম্ভব নয়। এভাবেই কাহিনীর পরতে পরতে শোষকদের তঞ্চকতা, ভণ্ডামিকে শাণিত বিদ্রূপ, তীক্ষ্ণ শ্লেষে ফালা ফালা করে গল্পটি নির্মান করেন কৃষণ চন্দর। আমরাও রামুয়ার ট্র্যাজিক পরিণতি, তার মর্মবেদনার শরিক হয়ে উঠি।

'এ মহাজাগর' তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহের এক মহৎ দলিল। কৃষণ চন্দরের এক বিবৃতি থেকে জানা যায় এর কাহিনী বহু আয়াসে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন আন্দোলনের কর্মী এবং আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সাংস্কৃতিক কর্মীদের থেকে।

প্রসঙ্গত কৃষণ চন্দর—এই মহৎ সংগ্রামের কাহিনীটি রচনা করতে গিয়ে কৈশোরের অভিজ্ঞতাগুলি স্মরণ করেছেন—"কিশোর বয়সে আমি এক রাজাকে দেখেছি। তিনি মাঝে মাঝে তাঁর জমিদারী দেখতে বার হতেন এবং যে গ্রামে যেতেন সেখানকার সমস্ত কৃষক এবং তাদের স্ত্রী-কন্যাদের আনতেন বেঁধে। পুরুষ এবং মহিলাদের দাঁড় করাতেন পৃথক পৃথক সারিতে। পুরুষদের জুতো দিয়ে পেটাতেন এবং মহিলাদের পাঠিয়ে দিতেন তাঁর কর্মচারীদের তাঁবুতে, সারারাতের জন্য।"

আর এক জায়গায় লিখছেন—"এক কংগ্রেসী বন্ধু বলেছেন, এমন ঘটনা সিমলা যাওয়ার পথে অনেক গ্রামেই দেখা যায়। সেখানে জলের ভীষণ অভাব। জলের জন্য গ্রামের মেয়েদের যেতো হতো পাহাড়ের জঙ্গলে, ঝরণায়। এই পাহাড় আর জঙ্গলের

অধিকার ছিল মহকুমার ইজারাদারদের। তাই এই ঝর্ণায় জল নেবার বিনিময়ে তাদের দিতে হত নিজেদের সতীত্ব।" এরপর কৃষণ চন্দর স্বাধীনতা উত্তরকালের অভিজ্ঞতার জগতে উপনীত হয়ে দেখেন "... শত শত বৎসর ধরে চলছে তাদের উপর এই অত্যাচার। ...অত্যাচার যারা চালায় তারা আগেও বধির ছিল—আজও বধিরই। ...কৃষকরা যখন নিজেদের ভিটেমাটি, মা বোন স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষার জন্য উঠে দাঁড়ায়, তখন তাদেরই ওপর চালানো হয় গুলি। তাদের ওপর পুরোনো ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্যে পাঠানো হয় পুলিশ মিলিটারি। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তাদের ঘরবাড়ি, ফসল সব কিছু।"

'এ মহাজাগর' উপন্যাসের নায়ক বাইশ বছরের কৃষক সন্তান রঘু রাও। কৃষণ চন্দরের জবানীতে—"বিপ্লবী চেতনা সমৃদ্ধ কৃষকদের কাহিনী—যে কৃষক তার জমির অধিকার রাখার জন্য অত্যাচারীর হিংসার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে।" রঘু রাও তারই প্রতীক।

স্বাধীন ভারতের কারাগারে তরতাজা জোয়ান রঘুর ফাঁসি হয়ে গেল প্রতিবাদের ভাষাকে প্রাণবন্ত রূপ দিতে গিয়ে। ফাঁসির আগের দিন রাতে তার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে টুকরো টুকরো ছবি। কৈশোরের ক্ষুধা, অপমান আর অত্যাচারের দিনগুলি, অস্ফুট প্রেম, নাগরিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, আদর্শচেতনার উজ্জীবন, গ্রামের লড়াই সংগঠনের জীবন্ত সব ছবি। তার অনুভবে—'জীবনের বহু মুহূর্ত—যে মুহূর্তগুলি সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে কার্যকরী আর সবচেয়ে দামী ও সুন্দর সবটাই তার নিজের।' রঘুর জীবনের অভিজ্ঞতা রঘুর চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছিল। শত্রু মিত্রর আসল চেহারাটা বুঝতে শিখিয়েছিল। বুঝেছিল—'বেগারীদের' দুনিয়া বন্ধ্যা। দুনিয়ায় এই বন্ধ্যাত্ব কতদিন চলতে পারে! উপর থেকে কেউ এসে অবস্থাটা পাল্টে দেবে না। এ কাজ নিজেদেরই করতে হবে।

কৈশোরের রঘুর সাধ ছিল রেশমের জামা গায়ে দেওয়ার। মেলায় রামাইয়া শেঠির দোকানে চুপি চুপি রেশমের থানের ওপর হাত বুলানোর অপরাধে তাকে ও তার বাবাকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। সে বেদনা সে কখনো ভুলতে পারেনি। সেদিন সে বুঝেছিল—'বেগারীদের জন্যে রেশম নয়'। কিন্তু রেশমের জামার স্বপ্ন তার বুকের মাঝে ছিলই।

পাতিপাড়ু গাঁয়ের মানুষের মনে রঘুর বাসনার কথা গেঁথে ছিল। রঘুর ফাঁসির আগের দিন রাতে গাঁয়ের সবাই মিলে রেশমের জামাটি তৈরী করলো। "ইস্ত্রি করার পর জামাটাকে তারা সাজালো। ...সে রাতের কথা কেউ ভুলবে না। ...মশাল জ্বালিয়ে পাঁচ হাজার কিষাণের জমায়েত যখন জমিদারের গড়ের কাছে পৌঁছাল তখন জমিদার সেখান থেকে উধাও হয়ে গেছে সদলবলে। পথে যেখানে গ্রাম পড়লো, সে সব গাঁয়ের লোকও এই আজব ও অপূর্ব জনসমাবেশে সামিল হতে শুরু করলো। ...শোভাযাত্রাটি জয়যাত্রার মিছিলের মত জেলের দিকে জোর কদমে এগুতে লাগলো।"

"অতি প্রত্যুষে রাও জামাটি পেয়ে বাবার দিকে বিস্ময়ে চেয়ে দেখলো।" শুনলো দশ হাজার কিষাণ এই জামাটি নিয়ে জেলখানার দরজায় এসেছে। "রঘু রাওর বুক গর্বে ফুলে উঠলো। রেশমের লালচে ও নরম মসৃণতাকে ছুঁয়ে অনুভব করলো যে সে

যেন ...মানুষের মনের হাজার হাজার কামনা ও বাসনাকে দিয়েছে ছুঁয়ে। ...ওয়ার্ডার পরিবেষ্ঠিত হয়ে ...রঘু রাও নিজের মাথার ওপর সকালের শিশির ও মনের সূর্য নিয়ে ফাঁসিকাঠের দিকে এগুতে লাগলো।" আর জেলের বাইরে তখন শোভাযাত্রার আওয়াজ জেলের প্রাচীর টুকরো টুকরো করে দিয়ে শূন্যে ধ্বনিত হয়ে চললো। এ যেন শোষিত মানুষের মানবতাবোধ এবং সহমর্মিতার এক প্রাণবন্ত ছবি। এখানেই কৃষণ চন্দর এক বিশিষ্ট ভূমিকায় সমাজবাস্তবতা প্রকাশ করেন।

জীবনের, সমাজের নানান প্রশ্নে, নানা সমস্যায় কৃষণ চন্দরের মন বারবার আলোড়িত হয়েছে। নিসর্গের সৌন্দর্যময়তা যেমন তাঁর গল্পে প্রবল উপস্থিতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি আবেগময় প্রেমের গল্প, নীচুতলার মানুষের জীবনের যন্ত্রণা, ক্লান্তি, হতাশা সংগ্রাম, ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার পৈশাচিকতাও সমমনোযোগে স্থান পায়।

কৃষণ চন্দরের শৈশব কেটেছে কাশ্মীরের ভরতপুরে এবং পুঞ্চে। কাশ্মীরের মতোই পুঞ্চও প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যের ভাণ্ডার। এই পরিবেশেই তাঁর মন গড়ে উঠেছিল। তাই তাঁর বহু গল্পের প্রেক্ষাপটেও থাকে নিসর্গচিত্রের বর্ণময় উদ্ভাস। এ প্রশ্নে অনেকেই তাঁকে 'রোমান্টিক' বলেছেন। 'রূমানবী' সাহিত্যধারার পরম্পরা তাঁর ছিলই। কিন্তু তাঁর গল্পে জীবন বিমুখতা, বাস্তবতাবর্জিত নিছক অতিকল্পনাশ্রয়ী প্রকাশ আমরা পাইনা। তাঁর মধ্যে যেটা পাই সেটা হল—'a protest of passionate and contradictory protest against the bourgeois capitalist world, the world of 'lost illusions', against the harsh prose of business and profit. (The necessity of art—Enest Fisher, P. 52) তাঁর আদর্শ, তাঁর জীবনদর্শনই সমাজ বাস্তবতার অন্তর্নিহিত সত্যটি চিনে নিতে প্রেরণা যোগায়।

দেশভাগ এবং সাম্প্রদায়িক হানাহানি কৃষণ চন্দরকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। এই ঘটনা তাঁকে শৈশব, কৈশোর, যৌবনের চারণভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। এটা তিনি কখনোই মেনে নিতে পারেননি। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা তাঁর ভাষায় বর্বরতারই নামান্তর। এই বেদনারই প্রকাশ ঘটে 'হাম ওয়ঁসি হ্যায়', 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস', 'গদ্দার'-এর মত রচনায়।

এই দেশভাগের পশ্চাদভূমি স্মরণ করলে দেখতে পাব—গতানুগতিক ধারায় দেশভাগের দায় চাপানো হয় মহম্মদ আলি জিন্না, কবি ইকবাল, স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রমুখের ওপর। অথচ এদেশের হিন্দুত্ববাদী জাতীয় নেতাদের ভূমিকা যে এ প্রসঙ্গে কতটা ক্রিয়াশীল ছিল সেটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গোপন করার প্রয়াসের মধ্যেই ধরা পড়ে। এই নেতারাই তাঁদের কার্যকলাপ, ভাষণ ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মের ভিত্তিতে দেশের জনগণের মধ্যে বিভেদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ; আর ভারত দু টুকরো হয়ে গিয়েছিল। তার ফল আজও আমরা ভোগ করছি।

কৃষণ চন্দরের 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস' গল্পটা একটু খুঁটিয়ে পড়লে এবং সমকালীন ইতিহাসের প্রেক্ষিতটি স্মরণে রাখলেই তাঁর তীক্ষ্ণ শ্লেষ, বিবরণের নৃশংস পৈশাচিক বিবরণ দানের মানসিক ভিত্তিটি স্পষ্ট ধরা পড়ে। তাঁর কলমে 'পনাহগুজী' নিয়ে যে ট্রেনটি পেশোয়ার থেকে রওনা হয় তার মানবায়ন ঘটে। আত্মগতভাবে সে বলে চলে তার অমানুষিক অভিজ্ঞতার কাহিনী। "ওরা প্রাণের ভয়ে আপন দেশের মাটি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল যে মাটিতে আজ হাজার হাজার বছর ধরে ওরা বসবাস করে আসছে।

...আজ ওদের সেই দেশ জননী একেবারে পর হয়ে গেছেন।"

দেশের মাটিকে পর করে দেবার পরিকল্পনাটি প্রথম তৈরী হয়েছিল ১৯২৫ সালে। পঞ্জাবের লালা লাজপত রায়ই প্রথম ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের প্রস্তাব এনেছিলেন। এই প্রতিক্রিয়ার অনিবার্য প্রকাশ ইকবালের 'ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্র' গঠনের প্রস্তাব ১৯২৯-এ। এসব তথ্য ছড়িয়ে আছে রমেশচন্দ্র মজুমদার, কেনেথ জোন্স প্রমুখ ইতিহাসকারদের গ্রন্থে। অস্বীকারের উপায় নেই এবং স্মরণে রাখা আজ বড় প্রয়োজন।

আবার ফিরে আসা যাক 'রেলগাড়ি'র আত্মকথনে। তক্ষশিলা স্টেশন। দুশো হিন্দু লাস। 'প্রতিটি মুসলমান এক একজন হিন্দুকে কাঁধে করে বয়ে' এনেছিল। তারপর 'নির্বিকারভাবে বেলুচি সেনাদের হাতে লাশগুলো সঁপে দিল, দিয়ে বললো, তারা যেন খুব খাতির করে এই মানুষগুলোকে হিন্দুস্তানের সীমানা পার করে দেয়।'

এখানেই ঝলসে ওঠে কৃষণ চন্দরের বিদ্রূপ বাণ। যে তক্ষশিলা ছিল—'এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়', 'সভ্যতা সংস্কৃতির পীঠস্থান', যেখানে একদিন 'ভগবান বুদ্ধের অহিংসার বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল' তারই পাদমূলে ঘটে নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। এখনও এই একবিংশ শতকের ওই বর্বর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেনি। এরপরও 'বামিয়ান বুদ্ধ' ধ্বংস হয়। ধ্বংস হয় 'বাবরি মসজিদ'।

রেলগাড়ি বলে যায়—এরপর আসে উজীরাবাদ। 'এই সেই উজীরাবাদ যেখানে হিন্দু আর মুসলমান একসঙ্গে মিলেমিশে যুগ যুগ ধরে 'বৈশাখী মেলা' খুব ধূমধামের সঙ্গে পালন করে আসছে। মেলার আনন্দ উৎসবে একসাথে অংশ গ্রহণ করেছে। ...আজ এখানে লাশের মেলা। ...গ্রামের লোকেরা নেচে নেচে গান গাইতে গাইতে আসছে, ওদের পিছু পিছু আসছে নগ্ন নারীদের এক মিছিল। সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা নারী। ...মেয়েরা হিন্দু আর শিখ, পুরুষরা সব মুসলমান। মেয়ে পুরুষ মিলে আজ এই বিচিত্র বৈশাখী উৎসব পালন করছে।" লেখক এখানে পৈশাচিক উল্লাসের এক চিত্রময় প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

আটারি পৌঁছতেই পরিবেশটা পাল্টে যায়। এবারে মানবায়িত রেলগাড়ির ভাষায় পরিবর্তিত পরিবেশের ছবিটা অন্যভাবে ধরা পড়ে—"...শরণার্থী, সিপাই জাঠ আর শিখ সবাই নেমে নেমে বনের দিকে ছুটত লাগলো। ...এমন সময় দেখি বহু মুসলমান চাষি বিবি আর বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বনে গা ঢাকা দিয়ে আছে। 'সৎ শ্রী আকাল এবং হিন্দুধর্মকী জয়'-এর শ্লোগানে শ্লোগানে সারা বনটা থর থর করে কেঁপে উঠলো। ...আধ ঘন্টার মধ্যে সব বিলকুল সাফ। ...এক জাঠ বল্লমের আগায় বিঁধে নিয়ে এসেছে একরত্তি এক দুধের শিশুকে। শিশুটিকে শূণ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে লোকটা গাইছে, 'এল গো বৈশাখী, এল বৈশাখী, বৈশাখী এল এল এল গো।"

আম্বালা স্টেশন। এক ফার্স্ট ক্লাস কামরাতে একজন মুসলমান ডেপুটি কমিশনার বিবি বাচ্চা নিয়ে উঠেছিলেন। ...জানালার কাঁচ ভেঙে লোক কামরায় ঢুকলো। সাহেব বিবি ছেলেদের হত্যা করা হল। মেয়েটি ছিল অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী। মেয়েটিকে নিয়ে জঙ্গলের ভেতর চলে গেল ঘাতকরা। তার কাতর প্রার্থনা কেউ শুনলো না। "ফুটফুটে ঐ মেয়েটি জঙ্গলের ঘাসের গালিচার ওপর ধড়ফড় করতে করতে মারা গেল। ওর বইখানি ওরই রক্তে রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। বইটির নাম—সোসালিজম ঃ থিওরি এ্যান্ড প্রাকটিস। ...ওর হৃদয়ে ছিল এ দেশকে, দেশের মানুষকে সেবা করার আকাঙ্খা।

ওর হৃদয়ে কাউকে ভালবাসবার, কাউকে কামনা করবার, কারো আলিঙ্গনপাশে ধরা দেবার, কোন শিশুকে স্তন্যপান করাবার সাধ ছিল। ...কিন্তু কেউ এগিয়ে আসছে না। কেউ বিপ্লবের দ্বার খুলে দিচ্ছে না।" এক নিহত মানবতার উলঙ্গ প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি।

তাই প্রচণ্ড ক্ষোভ, ঘৃণা আর বেদনা নিয়ে কৃষণ চন্দর লেখেন,—"হয়তো আর কোনদিন চন্দ্রভাগা নদীতে বান আসবে না। হয়তো এ মাটিতে মির্জা সাহেবের 'দাস্তানে উলফত' আর কোনদিন শোনা যাবে না। লক্ষ লক্ষ ধিক সে সব দেশনেতাকে আর তাদের চোদ্দ পুরুষকে যারা এই শ্রীমণ্ডিত পঞ্জাবকে, এই অপরূপ, আমার প্রিয়, সোনার পঞ্জাবকে দু টুকরো করে দিয়েছে এবং পঞ্জাবের নিষ্কলুষ হৃদয়কে সমাধি দিয়েছে, পঞ্জাবের সুদৃঢ় সুগঠিত শরীরটাকে ঘৃণার পুঁজে রক্তে ভরে দিয়েছে। আজ পঞ্জাব মরে গেছে। পঞ্জাবের ভাষা মূক হয়ে গেছে, পঞ্জাবের সংগীত আজ গতপ্রাণ, পঞ্জাবের সমস্ত নির্ভীক সরল হৃদয় আজ মৃত ...।"

সমকালীন ভারতের বাস্তবতার নিষ্করুণ ছবি তাঁর 'দু ফার্লং লম্বা সড়ক', 'কালু ঝাড়ুদার', 'মহালক্ষ্মীর পুল' ইত্যাদি গল্পেও এসেছে। এ ধরনের গল্পে লেখকের পক্ষপাত অবশ্যই নির্যাতিত মানুষের সপক্ষে। তাদের বেদনার, জীবন যন্ত্রণার কথাই শোনাতে চান দেশবাসীকে।

আবার 'পূর্ণিমার রাত', 'ব্যালকনি', 'প্রীতো', 'গালিচা', 'পুঞ্ছের ক্লিওপেট্রার' মত বহু গল্প লেখেন প্রেমকে আশ্রয় করে। এ সব গল্পে কাব্যময় নিসর্গ বর্ণনা, দুটি হৃদয়ের মিলন আকাঙ্খা, বেদনা, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, মনুষ্যত্বের সৌন্দর্যময়তা অনাবিল শিল্পসুষমায় প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এখানেও তিনি চরিত্রগুলি বেছে নেন অতি সাধারণ স্তর থেকে।

জীবনে যেমন বাঁচা এবং বাঁচার জন্য লড়াই আছে তেমনি নরনারী প্রেমও এক অঙ্গীভূত বিষয়, সেটা সকলেরই জানা। এখানে দেখার হল স্তর নির্বাচন। যে সমাজে বাস্তবতায় ধর্ম, জাতপাত, শ্রেণীগত ফারাক প্রবলভাবে বিদ্যমান সেখানে প্রেম, দুটি হৃদয়ের কাঙ্খিত মিলন সহজ সফলতা পায় না। ট্র্যাজেডির সূচনা ঘটায়। 'গদ্দার' বা 'বিশ্বাসঘাতক' উপন্যাসেও অনুরূপ পরিস্থিতির আমার মুখোমুখি হই। ইমতিয়াজ-পার্বতীর প্রেম দেশভাগ আর দাঙ্গার অভিঘাতে চুরমার হয়ে যায়।

পার্বতীর জবানীতে জানতে পারি—"...ইমতিয়াজ আমায় ভালবাসতো, আমিও ভালবাসতাম তাকে। একসঙ্গে এম. এ পড়তাম। পাকিস্তান হবার পর ইমতিয়াজের মা-বাবা সারা পরিবার নিয়ে চলে যায় লাহোরে। কিন্তু ইমতিয়াজ গেল না। ...তার পার্বতীর জন্য সে ছেড়ে দিল তার দেশ, তার পরিবার, কেননা কথা দিয়েছিলাম তাকেই বিয়ে করবো। ...বিয়ের আগে আমার বাবা হিন্দু গুণ্ডাদের দিয়ে তাকে হত্যা করাল।" "মাথা উঁচু করে হাঁটছে সে, কি অদ্ভুত মেয়ে। ...জিজ্ঞাসা করলাম—এবার পাকিস্তানে গিয়ে কি করবে! আমি তার মায়ের কাছে গিয়ে বিধবা হয়ে থাকবো।" এখানেই প্রেমের দৃঢ়তা। এখানেই স্বীকৃতি কিন্তু বড় করুণ, বড় বিষণ্ণ।

এমনিভাবেই কৃষণ চন্দর জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে দেখে যান। অজস্রধারে পরিবেশন করেন জীবনের, সমাজের নানা রূপকে। তার রচনার সামগ্রিক অনুবাদ বাংলায় আজও হয়নি। এখানে তাই অপ্রাপ্তির ক্ষোভ রয়েই গেল। তাই সামগ্রিক সাহিত্য মূল্যায়নও অধরা রইলো।

নীহাররঞ্জন বাগ

কৃশন চঁদরের ছোটগল্পে মানবতাবাদের স্বরূপ

আমাদের সাহিত্য আলোচনায় দুটো শব্দের খুব চল ঃ ক্লাসিক আর রোমান্টিক। এই দু গোত্রের যে কোন একটায় কারুকে পুরে দিতে পারলে সমালোচকের স্বস্তি ও সন্ন্যাস। শব্দ দুটো প্রথম আসরে এনেছিলেন ফ্রিডরিশ ফন শ্লেগেল। তখন তাঁর কাঁচা ছাব্বিশ। তিনি বলেছিলেন ক্লাসিক হল সীমার ভেতর অসীম অনুভবের প্রকাশ ; আর রোমান্টিক হল এক বিশ্বগত কাব্য যার সৃষ্টির ভেতর দিয়ে কবি তৈরী করে নেন তাঁর স্বকীয় সূত্রাবলী। সেই সূত্রপাত। আর তারপর কম করে গড়িয়ে গেছে শ দুই বছর। নানা জনের হাতে বিবর্ধিত ও বিবর্তিত হতে হতে এখন তা প্রায় অর্থহীনতায় পর্যবসিত। এফ. এল. লুকাস তাঁর 'রোমান্টিক আদর্শের অবক্ষয় ও পতন' গ্রন্থে রোমান্টিসিজমের ১১,৩৯৬টি সংজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছেন। আর বারজুন তাঁর 'ক্লাসিক, রোমান্টিক ও আধুনিক' গ্রন্থে বলেছেন লেখকের ব্যক্তিক ও প্রাতিস্বিক প্রয়োজন অনুযায়ী রোমান্টিকের অর্থ দাঁড়ায় ঃ আবেগতপ্ত, উচ্ছ্বসিত, খামখেয়ালি, জড়বাদী, নিরর্থক, নর্ডিক, নিঃস্বার্থপর, বাগবহুল, বাস্তববাদী, বীরোদ্দীপক, বোকামিভরা, রক্ষণশীল, রহস্যময়। আরো যোগ করা যায় ঃ অতিনাটকীয়, অলোকসামান্য, আভিযাত্রিক, দুঃসাহসিক, রতিরঞ্জনী, সংরক্ত এবং স্বেচ্ছাচারী। মানের মহলে পথ হারিয়ে আমাদের তাই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে রোমান্টিক শব্দে ঠিক কোন বৈশিষ্টের কথা ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন আখতার ঔরেনবি, যখন তিনি বলেন, কৃশন চঁদরের গোড়ার দিকের গল্পগুলো রোমান্টিকতায় মাখা ; অথবা উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা আলি জাবাদ জাইদি ঃ যদিও প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে কৃশন চঁদরের সংযোগ সম্পূর্ণ হয়েছিল তবু আরো দীর্ঘদিন তাঁর রচনায় ছড়িয়েছিল রোমান্টিক দ্যুতি—তখনই বা কোন অর্থে প্রয়োগ করেন তিনি ঐ শব্দ? বস্তুত সংজ্ঞাকে যখন অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষে ছেঁকে ধরে তখন তা আর সংজ্ঞা থাকে না। অর্থকে সরিয়ে অনর্থই কায়েম হয় তখন। তবে কি কৃশনের রচনায় ছিল না কোন আপন শৈলী বা অনুসৃত কোন আদর্শ? কোন পছন্দের পরিচয়ই কি তুলে ধরতে চাননি তিনি তাঁর কৃতি ও কথায়, আচার বা আচরণে? কিন্তু সে জিগগেশায় জড়িয়ে পড়ার আগে কৃশন নিজেই কীভাবে ব্যবহার করেছেন এই শব্দ তা এক ঝলক দেখে নেয়া যেতে পারে।

১. অল্প বয়সে আমার স্বভাবটা ছিল রোমান্টিক আর মনটা ছিল ভাবপ্রবণ। নেচে নেচে বেড়ান পাখি আমার ভাল লাগত, ভাল লাগত নীল আকাশ, রামধনুর বিকশিত বর্ণচ্ছটা আর সেই মেয়েদের, হাসলে যাদের গালে টোল পড়ে। আর ভাল লাগত সেই নদী যা পাথরে পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে বয়ে যায়। (হায়ার ম্যাথেমেটিক্স)

২. বড় সুন্দর রোমান্টিক জীবন। খিলজি বত্রিশ টাকা মাইনে পেত, আরো পনের বিশ টাকা ও বাড়তি রোজগার করত। খিলজি বয়সে তরুণ, সে ভালোবাসত, ছোট একখানি বাংলোতে থাকত সে, সেরা সেরা সব লেখকদের গল্প কাহিনী পড়ত আর প্রেমে পড়ে কাঁদত। কেমন চমৎকার, রোমান্টিক আর আনন্দময় জীবন ছিল খিলজির। (কালু ঝাড়ুদার)

রোমান্টিকতা বলতে যে কৃশন এখানে আবেগতপ্ত ভাবপ্রবণতা বুঝিয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না আমাদের। রোমান্টিক ভাবের জগতের বাসিন্দা। বাস্তবকে সে চায় ভাবের সঙ্গে মেলাতে। তার কাছে জীবন নয়, ভাবই হল বাস্তব। জীবন তার কাছে ভাবজগতের একটা পর্যায়। জীবনের যেগুলো সাধারণ যোজক সেগুলো জীবনের মধ্যে নেই, রয়েছে দেশ ও কাল ছাড়িয়ে সেই রহস্যময় ভাবের ভেতর, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সমান্তরাল ধ্রুব, শাশ্বত, চিরকালিক এক জগত ছাড়ান জগতের ভেতর। সেখানে কোন বিশেষ গাছ আদর্শ গাছের প্রতিরূপ মাত্র। এই বিশেষের ক্ষয় আছে, কিন্তু তার আদর্শ অক্ষয়। তেমনি সৌন্দর্য। সমস্ত সুন্দর বস্তু এক পরম সৌন্দর্যের প্রতিরূপ, যা অপরিণামী ও অনাদি অর্থাৎ নিত্য। এখানেও বিশেষের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, কিন্তু পরিপূর্ণ সুন্দর অবিনশ্বর। রোমান্টিকতার সঙ্গে পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে এরকম একটা ভাববাদী জীবনদর্শন। আমরা কৃশনের 'ভরা চাঁদের রাত' গল্পের গোপুরমে ঘুরে আসতে পারি একবার। কৃশন নিজেই এই গল্পকে রোমান্টিক বলে চিহ্নিত করেছেন। বাদাম গাছে প্রথম ফুল ফোটার উৎসবের কোজাগরে জ্যোৎস্নাভরা শিকারায় ভেসে যায় ঘর পালান এক যুবক যুবতী। তাদের নামাঙ্কিত করেননি কৃশন। তাদের সামাজিক পরিচয়ও বিশেষ কিছু লিপিবদ্ধ করেন না তিনি। 'যেদিন তোমার বাবা খেতে লাঙল দিয়েছিল, মই দিয়েছিল, বীজ বুনেছিল।' এই বাক্যবন্ধ থেকে অনুমান করতে হয় মেয়েটির বাবা একজন কৃষক। কিন্তু সে সামান্য চাষি না খেত মজুর সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অস্পষ্টই থেকে যায়। যেমন ছেলেটির পরিবার কতখানি সম্পন্ন তাও বুঝতে পারি না আমরা। এ বিষয়ে শুধু একটি বাক্যই ব্যয় করেন কৃশন ঃ 'তারপর আমি অই ঝিলেরই ধারে একটি ছোট্ট বাড়ি কিনে নিলাম, নিয়ে আমরা দুজনে ঘর বাঁধলাম।' ছেলেটির বয়স সম্বন্ধে তবু একটা আন্দাজ হয় আমাদের। প্রথম মিলনের রাতে সে ছিল বাইশ। মেয়েটির সম্বন্ধে কিশোরীর অতিরিক্ত আর কোন পরিচয় লেখা থাকে না গল্পে। বিশেষ থেকেই যে সামান্যে যেতে হয়, সামান্য যে প্রথমত বিশেষেরই অন্তর্গত এই ধারণা থাকে না রোমান্টিকের। বিশেষের অভিধাযুক্ত সেই যুবক তাই তার প্রথম চুম্বনের বর্ণনা দেয় ঃ হ্রদের জল বারে বারে এসে তীরকে চুমু খেয়ে যাচ্ছিল। বারে বারে তার চুম্বনের স্বর আমাদের কানে বাজছিল। আমি দুহাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে দৃঢ় আকর্ষণে বুকে টেনে নিলাম। ঝিলের জল বারে বারে তীরকে চুমু খাচ্ছিল । আমি প্রথমে ওর চোখে চুমু খেলাম, ঝিলের জলে লক্ষ লক্ষ পদ্ম ফুটে উঠল। তারপর আমি ওর গালে চুমু খেলাম, ঝিরঝির হাওয়া হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে শত শত সঙ্গীত গেয়ে উঠল। তার পর ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম, লক্ষ লক্ষ মসজিদ মন্দির আর গির্জাতে প্রার্থনার ধ্বনি উঠল, এই ধরণীর ফুল, আকাশের তারা আর বাতাসের মেঘ সবাই মিলে তা তা থৈ থৈ নেচে উঠল। তার পর আমি ওর চিবুকে চুমু খেলাম, তার পর গ্রীবায়, কমলগুলি এক বার ফুটতে একবার বুজতে লাগল, যেন কমলকলিকা। সঙ্গীত বেজে বেজে উঠে নীরব হয়ে যেতে লাগল, নৃত্য ঢিমে লয়ে এসে এসে থেমে গেল। এই বর্ণনা লেখকের দৃষ্টিতে নয়, চরিত্রের দৃষ্টিতে। অথচ চরিত্র হল বাইশ বছরের সবে মাত্র কৈশোর পেরোন এক যুবক, যার শিক্ষার মান, শ্রেণীগত অবস্থান, মানসিক গঠন, জীবন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী, তথা যা কিছু বিশেষের পরিচায়ক, তার বিন্দুবিসর্গও জানি না আমরা। শুধু এইটুকু জানা হয়ে

যায় আমাদের যে লেখকের ভাবের জগতই চরিত্রের ওপর আরোপিত হয়ে চরিত্রের প্রকৃত জীবনকে কীভাবে যথেচ্ছ ঘোলাটে করে দিয়ে গেল। গল্প এগিয়ে চলে। তুচ্ছ ভুলের প্রভাবে তাদের প্রথম মিলনের রাত হারিয়ে যায়। ক্ষিপ্র আঁচড়ে কৃশন আমাদের জানিয়ে দেন ; তার পর নায়ক অন্যত্র বিবাহিত হয়, অনেকগুলি সন্তান সন্ততি রেখে তার স্ত্রী মারা যায়, নায়িকাও অনেক অপেক্ষার পর বিয়ে করে, তারও ক্রমে সংসার ভরে ওঠে। কুড়ি বছর পার হয়ে নায়ক নায়িকার দেখা হয় আবার। সেই পুনর্মিলনের লগ্নে আকাশের চাঁদ তাদের বলে ঃ মানুষ মরে যায়, কিন্তু জীবন মরে না। বসন্ত শেষ হয়ে যায়, কিন্তু আবার বসন্ত আসে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেমও সমাপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু জীবনের মহান যথার্থ প্রেম সদাই অবিচলিত থাকে। তোমরা দুজনে গত বসন্তে ছিলে না। এই বসন্ত তোমরা দেখলে। আগামী বসন্তে তোমরা থাকবে না, কিন্তু জীবন থাকবে, প্রেমও থাকবে ; যৌবনও থাকবে আর থাকবে সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং সরলতা। আসলে এই সৌন্দর্য, মাধুর্য, সরলতা বিষয়গত ভাববাদীর পরম সৌন্দর্য, পরম মাধুর্য, পরম সরলতার ধারণা থেকে নিঃসৃত। এই পরমই হল সামান্য। তারই প্রতিরূপ এই বিশেষ। ভাব থেকে জীবনের দিকে নেমে আসা তার। আর রোমান্টিকতার গোড়ার কথাই তো তাই।

২

রোমান্টিকতা যদিও জীবনের অন্তর্বস্তুকে বাস্তবের উর্ধে ভাবের মধ্যে অন্বেষণ করে, তবু একজন সমাজমনস্ক রোমান্টিক শিল্পীর মানসবিশ্বে সমাজের তথা জগতের নানাবিধ বিষয়, ঘটনা অনবরত ছায়া ফেলতে থাকে। ধীরে ধীরে চলার অভিমুখ পালটে যেতে থাকে তাঁর। ভাব থেকে জীবনের দিকে না গিয়ে জীবনের বিষয়ঘটনাময় সংঘর্ষ থেকে সমুত্থিত ভাবের দিকে চলা শুরু হয় তখন। প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির বিরুদ্ধে সমাজের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে সব প্রতিবাদ উচ্চকিত হয় তার একটা ভাষাচিত্র ঠাঁই করে নেয় লেখকের ক্যানভাসে। নান্দনিক সেই আদর্শে অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে ইউটোপিয়া। রোমান্টিক সেই রূপক গল্পে মিশে থাকে বহুল পরিমাণে দ্বৈততা আর দুঃখময়তার ছোপ। তবু রোমান্টিকতার এই চলনের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় সমাজের বিবিধ স্ববিরোধ আর অসংগতির উপস্থিতি, বিভিন্ন স্তরের মানুষের সম্পর্কে অনির্বাণ আগ্রহ।

লেখক জীবনের বিবর্তনের একটি ছোট্ট নিশানা রেখে গিয়েছেন কৃশন। 'কালু ঝাড়ুদার' গল্পের এক জায়গায় নিজেরই রচনা সম্বন্ধে বলেছেন, রোমান্টিক গল্প 'আংগি'-তে চাঁদের আলোয় খেত সাজিয়েছিলেন তিনি ; আর 'ইয়রকানিয়ত' গল্পে রোমান্সের জগৎ ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে 'হুশন আউর হৈবান' -এ নানা বৈচিত্রভরা জগৎ দেখতে দেখেতে 'টুটে হুয়ে তারে' পৌঁছেছিলেন। কিন্তু যেদিন তিনি 'ব্যালকনি' থেকে উঁকি মেরে 'অন্নদাতা'-দের নৈরাশ্য দেখলেন, দেখলেন পাঞ্জাবের মাটিতে রক্তনদীর ধারা তখন মানুষ যে কত বর্বর সে কথাটা উপলব্ধি করলেন। মাত্র দুটো বাক্যেই কৃশন বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর ক্রমোত্তরণের অভিজ্ঞান ও ইতিহাস। অনাকার আবেগের বর্ণহীন রোমান্টিকতা কীভাবে সংরক্ত হয়ে ওঠে সমাজের সংঘর্ষে তারই এক রেখালেখ্য 'দু ফার্লং লম্বা সড়ক'। কাছারি থেকে ল কলেজের মধ্যে ছড়ান নাতিদীর্ঘ এই পথ। তার রঙ কখনো বদলায় না। তার ফুটপাতে ছড়িয়ে থাকে সব খোয়ান ফকির আর হাড়

জির-জিরে কুকুর। শিশুগাছের ছায়ায় টাঙ্গাওয়ালা আর মগডালে সন্ধানী শকুন। রাস্তা দিয়ে চলে যায় কখনো ঘুঁটেওয়ালির দল, কখনো বা বিশিষ্ট ব্যক্তির কনভয়। দু পাশে তখন দাঁড়িয়ে থাকে অভিবাদনরত ক্ষুধার্ত্ত পড়ুয়ার দল। কখনো বা দেখা যায় মরে পড়ে থাকা ভিখিরির নিষ্প্রাণ দেহ আর যুগপৎ গোরা সৈন্যের উদ্ধত আচরণ। এখানে কেউ কারুকে দয়া করেনা। রাস্তা মৌনমূক আর জনহীন। এ রাস্তা সবাই দেখে কিন্তু এক তিলও বিচলিত হয় না। মানুষের হৃদয়ের মতই এ রাস্তা নির্মম ও বর্বর। কৃশনের তখন মনে হয় ঃ

চরম হতাশায় আর ক্রোধে আমি মাঝে মাঝে ভাবি এই রাস্তাটাকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিলে কেমন হয়। প্রচণ্ড এক শব্দে এর খণ্ডবিখণ্ড অংশগুলো আকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে, তা দেখে আমার যে কী আনন্দ হবে তা কেউ কল্পনা করতে পারবে না। মাঝে মাঝে এ পথে হাঁটতে হাঁটতে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি। ইচ্ছে করে সব কাপড় চোপড় ছিঁড়ে ফেলে উলঙ্গ হয়ে রাস্তার মাঝে নাচতে শুরু করে দিই আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলি, আমি মানুষ নই, আমি উন্মাদ। মানুষকে আমি ঘৃণা করি—মানুষকে আমি ঘৃণা করি। আমাকে উন্মাদাগারের বিভীষিকা দাও। চাইনা আমি পথের এই মুক্ত জীবন।

কৃশনের এই বেদনাক্ষিপ্ত উচ্চারণে কি শোনা যায় না বৈনাশিক নিহিলিজমের দূরাগত স্তনন? যে ভাবের জগৎকে একদিন তাঁর মনে হয়েছিল ধ্রুব, শাশ্বত আর তারই নিষ্ফল প্রতিরূপ আমাদের এই অস্থায়ী জীবন, এখন তাকেই মনে হয় অজস্র অসংগতির আকর। মনে হয় অমানবিক এই বর্তমান সমাজব্যবস্থা, তার শ্রেয়োনীতি বলে কিছু নেই। পুরুষার্থ শূন্য, মুমুক্ষা অসাড়। 'দু ফার্লং সড়কে'র মতনই তা সীমাবদ্ধ, শ্বাসরোধী, স্বার্থপর, নির্বিবেক। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এরকমই এক সমাজব্যবস্থাকে চূর্ণ করার ডাক দিয়েছিলেন আঠাশ বছরের এক স্লাভ যুবক। তাঁর নাম পিসারেভ। তুর্গেনিয়েফ তাঁকে অমর করেছিলেন তাঁর পিতাপুত্র উপন্যাসের বাজারভ চরিত্রে। কিন্তু ভাঙ্গার উন্মাদনায় ধ্বংসবাদের মধ্যেও এসে গিয়েছিল আরেক ধরণের মানুষ। 'শয়তান' উপন্যাসে দস্তয়েফস্কি তাঁদেরই নাম দিয়েছিলেন ভেরখোভেনস্কি। লেনিন ধ্বংসবাদের দুটো ভাগ করেছিলেন ঃ এক, বৈপ্লবিক ধ্বংসবাদ, যা প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক স্বাভাবিক নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ; আর দুই, বুদ্ধিজীবী বৈনাশিকের নৈরাজ্যবাদ। 'দু ফার্লং লম্বা সড়ক'-এ মানুষের অন্তহীন লাঞ্ছনা দেখে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন কৃশন, নিজেকেই আর মানুষ বলে ভাবতে ঘৃণা হয়েছিল তাঁর, ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে গিয়েছিল এই দু ফার্লং লম্বা সড়ক তথা শ্বাসরোধী সেই সমাজব্যবস্থা, যা মানুষের প্রতি অমন অলজ্জভাবে উদাসীন আর বিবেকহীন। তবু কৃশনের এই ধ্বংসবাদ নৈরাজ্যিক নয় বৈপ্লবিক নতুবা কীভাবে তিনি বেরিয়ে পড়তে পারেন নিহিলিজমের সাময়িক প্রকোপ এড়িয়ে মানবিক সত্তার অবিচল অন্বেষণে?

৩

'কালু ঝাড়ুদার' লেখার সময় আট বছরের গল্পকারের জীবন পার করে এসেছেন কৃশন। বাষট্টিটা গল্প তখনই লেখা হয়ে গিয়েছে তাঁর। এই গল্পে, নামেই স্পষ্ট, কালু হল হাসপাতালের সামান্য এক কর্মচারী, এক ব্রাত্য ঝাড়ুদার। তার জীবনের কোন

দিকই এমন নয় যা চিত্তাকর্ষক, কোন ক্ষেত্র এমন নয় যা অন্ধকারাচ্ছন্ন, কোন কোণ এমন নয় যা চুম্বকের মত আকর্ষক। তার ঝাড়ুকে মনে হত তা যেন মায়ের পেট থেকে নিয়েই জন্মেছে, মনে হত ওটা যেন তার দেহেরই কোন প্রত্যঙ্গ। জন্তু জানোয়ার যেমন সে ভালোবাসত, তারাও ভালোবাসত ওকে। ডাক্তারের গরু এসে তার ন্যাড়া মাথা চেটে দিত, আর কম্পাউন্ডারের ছাগল উপাসনার ভঙ্গিতে তার পায়ের কাছটিতে ঘনিয়ে বসত, মনে হত যেন এক নিপুণা গৃহিনী কুরুশ কাঁটা দিয়ে কালু ঝাড়ুদারের জন্যে শোয়েটার বুনছে। পশুপাখির প্রতিও ছিল তার গভীর ভালোবাসা। প্রতিটি পাখির ডাক সে জানত আর নিজেও ডাকতে পারত। তার কোন দিন প্রেম তো দূরের কথা, বিয়েই করা হয়নি। আট টাকা মাইনের কর্মচারী ছিল সে, যার চার টাকার আটা, এক টাকার তামাক, এক টাকার নুন, আট আনার চা, চার আনার গুড়, চার আনার মশলা, আর এক টাকার মহাজনের ধার শোধ করতেই চলে যেত। এক টাকা মাইনে বেশি পেলে ভুট্টার আটার পরটা খাবে বলেছিল কালু। কিন্তু সে ইচ্ছে তার আর পূর্ণ হয় নি কখনো। কেননা আট টাকায় আটকে গিয়েছিল তার বেতন। আর জীবন— হাসপাতালের পুঁজরক্তভরা ব্যান্ডেজ ধুয়ে, রোগীদের মলমূত্র সাফাই করে, ডাক্তারের ছেলের জন্যে ভুট্টা সেঁকে, তাঁর বাড়ির বিনি বেতনের চাকরান খেটে, কম্পাউন্ডারের প্রেমিকাদের শুশ্রূষা করে, গাঁয়ের পাটোয়ার আর নম্বরদারের ছেলের হাতে জখম হওয়া নারীর পরিচর্যা করে, আর চাপরাশির মায়ের অচৈতন্য দেহ শীতের রাতে বয়ে এনে। সেই কালু ঝাড়ুদার যখন মারা গেল তার দেহটাকে পুলিশে নিয়ে গেল, কারণ তার কোন ওয়ারিশন ছিল না, যদিও হাসপাতালের কর্মচারী হয়েই ডাক্তারের বাড়িতেই পড়ে থেকেছে সে বিশ বছর, তবু ডাক্তার তো তার কেউ নয়। আর ওয়ারিশন ছিল না বলেই তার শেষ বেতনও বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল সরকার।

আঙ্গিকের অভিনবত্বে এক অসাধারণ মাত্রা পেয়েছে কৃষনের এই গল্প। আবার সচেতন সৃষ্টিশীল লেখক হিশেবেও প্রতিক্রিয়াশীল সমাজব্যবস্থার প্রতি নিহিলিজমের নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে সরিয়ে রেখে পৌঁছে গিয়েছেন তিনি মানবিক সত্তার প্রত্যয়ে। গল্পের শেষ দিকে তিনি বলেছেন ঃ দেখ, আমি একটা নতুন গল্প ফাঁদতে পারি, কিন্তু আমি তো নতুন মানুষ সৃষ্টি করতে পারি না। তার জন্যে আমি একা যথেষ্ট নই। তার জন্যে চাই লেখক আর পাঠক, ডাক্তার আর কম্পাউন্ডার, পাটোয়ার আর নম্বরদার দোকানদার আর শাসক, আর রাজনীতিবিদ আর শ্রমিক আর খেতে কাজ করা কৃষক। চাই প্রতিটি মানুষের, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের সমবেত প্রচেষ্টা। একা আমি অসহায়, একা আমি কিছু করতে পারব না। যতদিন না আমরা হাতে হাতে মিলিয়ে একে অপরকে সাহায্য করব, এ কাজ হবে না। ততদিন তুই এমনি ঝাড়ু হাতে আমার মস্তিষ্কের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকবি আর আমি কোন মহৎ কাহিনী রচনা করতে পারব না, যাতে মানব আত্মার পরিপূর্ণ উল্লাস ব্যক্ত হবে। কোন স্থপতি এমন কোন সৌধ নির্মাণ করতে পারবে না, যাতে জাতির গৌরব সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হতে পারবে আর কোন সঙ্গীতের গভীরতায় বিশ্বের সমুদয় রহস্য উচ্ছ্বসিত হবে। এই কথাগুলোর ভেতর দিয়ে দার্শনিকের মতন কোমর বেঁধে মানুষ সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন শারীরিক ভাষ্য রচনা করতে চাননি কৃশন। গল্পের রশি একটুও আলগা না করে, তিনি খুবই স্বাভাবিকভাবে, রচনার এক চিলতে উঠোনে ছড়িয়ে দিয়েছেন উপলব্ধির

অমিতাভ আলো। মানুষ তাঁর কাছে আর কোন বিমূর্ত প্রত্যয় নয়। আবার ফয়রবাখের মতন কোন নৃতাত্ত্বিক ক্যাটিগরিও নয়। সে সমাজবদ্ধ জীব। জীব হিশেবে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের প্রতিটি কালের মানুষের সঙ্গে তার যোগ। জীববৈজ্ঞানিক প্রতিটি প্রক্রিয়ায় তার অভিন্নতা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু যে জায়গায় তাদের পার্থক্য, সেটা হল তাদের সামাজিক সম্পর্ক। মানুষকে বুঝতে গেলে যে সমাজে তার ঠাঁই, সেই সমাজের সঙ্গে তার যে সম্পর্কগুলো রয়েছে, সেই সব সম্পর্কের সমগ্রতায় তাকে ধরতে হবে। এই সব সম্বন্ধকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হল বস্তুগত বা মেটেরিয়্যাল সম্পর্ক। আরেকটা হল ভাবাদর্শগত বা ইডিওলজিক্যাল সম্পর্ক। বস্তুগত সামাজিক সম্পর্কগুলো, বস্তুগত প্রাকৃতিক সম্পর্কগুলোর মতই, মানবিক চেতনার বাইরে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে। তাদেব সুনির্দিষ্টতাই তাদের স্বাতন্ত্র। সেই কবে, ১৮৯৪ সালে, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা থেকে সরে-যাওয়া স্বঘোষিত জনগণের বন্ধুদের জবাব দিতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন মানুষ তার অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্যে যে কাজকর্ম করে তারই ধরণ থেকে উঠে আসে এই সব বস্তুগত সামাজিক সম্পর্কের নানা চেহারা। উৎপাদন, বন্টন, সঞ্চালন (বিনিময়) আর উপযোগ—উৎপাদনের এই সম্পর্কগুলোই হল অর্থনৈতিক সম্পর্ক। বস্তুগত সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক আর উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্ক এই তিনটে ক্রিয়াকলাপ অন্তর্বস্তুর বিচারে অভিন্ন। তফাৎ হল, বস্তুগত উৎপাদনের কাজের (activity) যে সামাজিক রূপ তারই একেকটা দিককে মেলে ধরে অই একেক সম্পর্ক। যেমন, বস্তুগত সামাজিক সম্পর্ক এইটেই হল মুখ্য, ভাবাদর্শগত সম্পর্ক ভাক্ত ; অর্থনৈতিক সম্পর্ক তার কর্মক্ষেত্রের ঠিক লাগোয়া জায়গাটাকে দাগিয়ে দেয় মোটা রেখায় ; আর উৎপাদন সম্পর্ক দেখিয়ে দেয় যে কর্মকান্ড থেকে তার জন্ম তারই বিভাগগুলোর স্বাতন্ত্র। অন্যদিকে ভাবাদর্শগত সম্পর্ক হল অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর অধিসৌধগত ক্রিয়াকলাপের সামাজিক রূপ। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডের বিশেষ ধরণধারণের উপর নির্ভর করে তাদের রাজনৈতিক, আইনি, নৈতিক, নান্দনিক ও ধর্মীয় সম্পর্কে বিভক্ত করা যায়। আগেই দেখেছি বস্তুগত সামাজিক সম্পর্কগুলো মানুষের ইচ্ছে বা চেতনার বাইরে জন্ম নেয়, কিন্তু ভাবাদর্শগত সম্পর্কগুলো গড়ে ওঠার আগে চেতনার দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হতে হয় তাদের।

তাই চেতনানিরপেক্ষ উৎপাদন সম্পর্ক আর চেতনাসাপেক্ষ ভাবাদর্শগত সম্পর্কের যোগফলই হল সামাজিক সম্পর্ক। আর এই সমস্ত সম্পর্কের সামগ্রিক রূপ থেকেই নির্ধারিত হয় মানবিক সত্তা। 'কালু ঝাড়ুদার' গল্পের অন্তিম পংক্তিগুলোর ভেতর দিয়ে সাহিত্যের ভাষায় মানবিক সত্তার এরকমই এক সংজ্ঞায় পৌঁছোবার চেষ্টা করেছেন কৃশন। অস্তিত্ববাদী জ্যাক মারিত্যাঁর সঙ্গে এখানেই তাঁর তফাৎ। ধর্মীয় রহস্যবাদের এই উৎসাহী প্রবক্তাটি বলছেন ঃ মানুষ কী? এই প্রশ্নের জবাবে মানুষ সম্বন্ধে গ্রিক, হিব্রু ও খৃষ্টিয় ধারণার সঙ্গে সহমত হয়ে আমরা বলতে পারি, মানুষ হল একটা প্রাণী যার রয়েছে বিচার করার ক্ষমতা, মানুষ হল ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে সংযুক্ত এক স্বাধীন পুরুষ, যার পরম ন্যায় ও সততা হল ঈশ্বরের নিয়মের প্রতি স্বতঃপ্রবৃত্ত আনুগত্য; মানুষ হল পাপাচারী এবং পীড়িত প্রাণী যার প্রার্থনা মুমুক্ষা, কামনা দিব্য জীবন আর প্রেমে যার পরিশুদ্ধি। মানবিক সত্তার এই হল মারিত্যাঁর বিমূর্ত আধ্যাত্মিক

ব্যাখ্যা। 'অখণ্ড মানবতাবাদ'-এ মানুষ যেন এক রবিনসন ক্রুসো, সমাজের সঙ্গে যার কোন যোগ নেই, যার কোন সামাজিক প্রবৃত্তি নেই, বস্তুগত সামাজিক সম্পর্কগুলো যেন তাকে জড়িয়ে নেই কোনক্রমেই। তার সম্পর্ক শুধু ঐশী সম্পর্ক, মারিত্যানির্মিত ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক। সেই ঈশ্বরের ওপর চাই তার অকম্প্র আস্থা আর অবিরল তারই অনুধ্যান। ম্যাকসিম গোর্কিকে লেখা এক চিঠিতে ঈশ্বরের নির্মাণের এই শঠ মানবতাবাদীদের উদ্দেশে লেনিন বলেছিলেন ঃ যাঁরা ঈশ্বর নির্মাণের কাজে নামেন তাঁদের প্রত্যেকেই এমন কি যাঁরা নিছক সেই কার্যকলাপকে সহ্যও করেন, তাঁরা সম্ভাব্য সমস্তভাবে নিজেদেরই অবমাননা ঘটিয়ে থাকেন, কারণ কর্মের পরিবর্তে তিনি আসলে নিজেকে আত্মশ্লাঘা আর আত্মানুচিন্তনে মজ্জিত করেন ; অধিকন্তু এরকম মানুষই অহংয়ের সবচেয়ে নীচ, সবচেয়ে নির্বোধ আর সবচেয়ে দাসসুলভ প্রকৃতিরই আরাধনা করেন। ঈশ্বরনির্মাণের প্রক্রিয়ায় আসলে তাঁরা অহংয়ের ওপরেই দেবত্বারোপ করেন।

'পাতের বেগুন' গল্পে ঈশ্বরনির্মাণের এরকম এক প্রক্রিয়াকে সার্থকভাবে মেলে ধরেছেন কৃশন। অধিসৌধ হিশেবে কোন নির্দিষ্ট সমাজে ভাবাদর্শগত যে সম্পর্কগুলো বিছোন থাকে তারই একটা হল ধর্মীয় সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের কলকবজাগুলোকে নানা দিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কৃশন ছোট্ট এই গল্পের পরিসরে। গল্পের প্রতিটি বাঁকে ধাক্কা খেয়ে খলখলিয়ে উঠেছে লেখকের শ্লেষ পরিহাসের তোড়। কখন কোন ছুতোয় ঈশ্বরের ভাড়াটে যাজকেরা সক্রিয় হয়ে ওঠে, কীভাবে কোন ফিকিরে ঈশ্বর বাণিজ্যের বস্তু হয়ে যায়, কারা ফায়দা ওঠায়, কোথায় কোন অজান্তে ধর্মের উন্মাদনা ফেনিয়ে ওঠে এবং স্থানকালপাত্র ভেদে ঈশ্বরের অপার মহিমা কোন রহস্যবলে রুপেয়ার কাছে পিছু হঠে—সব মিলিয়ে তারই এক ভুক্তভোগী পরিবেশ এই 'পাতের বেগুন'।

গরিব এক দম্পতির দিনের সঞ্চয় বলতে ছিল খান চারেক রুটির মতন অল্প একটু আটা আর একটি আধুলি। অই পয়সা দিয়ে স্বামীটি বাজার থেকে কিনে আনে একটি বেগুন। স্ত্রী বঁটি দিয়ে বেগুনটা কাটতে গিয়ে দ্যাখে বীজগুলোর ভেতর কী যেন একটা লেখা ফুটে উঠেছে। স্বামীর মনে হয় আরবি হরফে সেখানে যেন 'আল্লাহ' লেখা রয়েছে। পাড়ায় দ্রুত বেগে ছড়িয়ে পড়ে সেই খবর। হিন্দু ও খৃষ্টানরা তাতে গা করে না। কিন্তু ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ভেতর সাড়া পড়ে যায়। হাজি অচ্ছন মিঞা সেই বেগুনের ওপর চাপিয়ে দেন ইমানের মহিমা। সবাই লক্ষ করে কাফেরের ঘরে আল্লার কুদরত। বেগুনটাকে কাচের ঘেরাটোপে রাখা হয়। নজর নিয়াজ বেড়ে চলে। সাঁই করমশাহ চরশে দম দিয়ে সেটাকে পাহারা দেয়। পক্ষকালের মধ্যে অবশ্য মুসলমানদের ইমানে ভাটা পড়ে। স্বামী তখন অন্য ফিকির খোঁজে। রাতের অন্ধকারে বেগুনটাকে মুচড়ে দিয়ে তার ভেতরে ওঁ লেখাটা ফুটিয়ে তোলে। এবার ভেঙ্গে পড়ে হিন্দু পুণ্যার্থীর দল। পণ্ডিত রামদয়ালের তত্ত্বাবধানে চলে যায় সেই বার্তাকু। করম শাহকে লাথি মেরে ভাগিয়ে দিলেন তিনি। ভজনকীর্তন শুরু হল। প্রণামী পড়তে লাগল। সাধু সন্ত যোগী, সিদ্ধ পুরুষ মহাত্মা এবং স্বামীজীরা আসতে লাগলেন ঝাঁকে ঝাঁকে। তাঁরা বলেন আল্লাহ ওঁ বনে গিয়ে মুসলমানদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছেন এবং পানিপথের তিনটি যুদ্ধের বদলা নিয়েছেন। শহরের এখানে ওখানে হিন্দু

ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর বক্তৃতা চলে। শহরে থমথমে ভাব। এমনি করে পঁয়ত্রিশ দিনে হাজার পনের বিশের মত প্রণামী পড়ে। একসময় হিন্দুদের সেই উন্মাদনা থিতিয়ে আসে। স্বামী তখন চুপি চুপি বীজগুলোকে ওপর নীচে সাজিয়ে একটা ক্রুশের চেহারা দেয়। এবার এগিয়ে আসেন সপার্ষদ রেভারেন্ড সাহেব। কীর্তনের বদলে শুরু হয় যিশুর ভজন। প্যালা পড়ে। ভক্তিতে ভিজে যায় বেগুনস্থলী। আর শহরে ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা। হিন্দুরা বলছিল বেগুনটাতে ওঁ লেখা ; মুসলমানেরা বলছিল আল্লা, আর খৃষ্টানেরা ক্রুশ। উত্তেজনা বাড়তে বাড়তে পরস্পরের ওপর ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে গেল। দুয়েকটা ছোরা মারামারির ঘটনাও ঘটে গেল। সমতিপুরাতে দুটো হিন্দু খুন হল আর ওদিকে মন্তরি মহল্লাতে তিনজন মুসলমান। এক কশাইকে শহরের বড় বাজারের মাঝখানে কেটে ফেলল। শহরে ১৪৪ ধারা জারি হল। গ্রেপ্তার এড়াতে জিনিশপত্তর বাঁধাছাঁদা করে রাতের অন্ধকারে অন্য কোন শহরে রোজগারের নতুন ধান্দায় সরে পড়ে স্বামী স্ত্রী। হাজির হয় মুম্বই। পুরুষটি প্রণামীর টাকা দিয়ে একটা ট্যাকসি কেনে। শহরে ট্যাকসি চালাতে শুরু করে সে। একদিন আরো কজন ড্রাইভার বন্ধুকে নিয়ে সে ভাটিখানায় ঢোকে। হঠাৎ তার নজরে আসে টেবিলের ওপর ভেজা গ্লাসের তলায় একটা আঁক। বন্ধুকে সেটা দেখিয়ে বলে, সামাদ ভাই, দ্যাখো তো গেলাসের তলাটা টেবিলে কী দাগ কেটেছে? এ দাগটা ওঁ-এর মত দেখতে না কি আল্লাহ-র মত? সামাদ তার পিঠে সজোরে এক কিল মেরে বলে, আ বে শালে, এটা বোম্বে। এখানে না আছে ওঁ, না আছে আল্লাহ, এখানে যা কিছু আছে তা হল রুপিয়া, ব্যাস, শুধু রুপিয়া। তারপর টেবিলের ওপর জলের দাগটাকে ভুল অক্ষরের মত মুছে দিয়ে বলে, চল চল, রাতের শিফটের কোন খদ্দের খুঁজি। গল্প শেষ হয় এখানে। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজির প্রভাব সারা দেশে ছড়িয়ে থাকে অভিকর্ষের মত। আর শহরের মধ্যে তার প্রভেদ খুব একটা বেশি নয়। কিন্তু দু জায়গার মানুষজনের ভেতর চিন্তার তারতম্যও থাকে অনেকখানি। গাঁঘর থেকে উঠে আসা গল্পের নায়ক আর তার শহরবাসী বন্ধুর ভেতর চিন্তার পার্থক্যটাও একই সঙ্গে ধরিয়ে দিয়েছেন কৃশন। পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই যা সাম্প্রদায়িক নয়। বহু ধর্মের দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। সুতরাং সেখানে সাম্প্রদায়িক বিভাজনটাও বেশি। কত সহজেই না তাই একটা সম্প্রদায়ের আগুন খুঁচিয়ে আরেকটা সম্প্রদায়ের ভেতর অনলআয়তি ঘটিয়ে দিতে পেরেছে উপনিবেশবাদী আর তার শাগরেদরা। টুকরো হয়ে গিয়েছে দেশ, অনিকেত হয়ে গিয়েছে ঘর-পরিবার। রাজনৈতিক সম্পর্ক আর ধর্মীয় সম্পর্কের সেই বিবিধ তন্তুকে কীভাবে কৃশন তাঁর গল্পের টানা ও পোড়েনে বয়ন করেছেন অন্য একটা পরিচ্ছেদে আলোচ্য হতে পারে তা। আপাতত আমরা চলে যাই কৃশনের অন্য একটি গল্পে 'বিধাতা যবে শিশু ছিল'—গল্পটার নাম 'শিশু যবে বিধাতা ছিল'ও হতে পারত—যেখানে লেখক মারিতঁ্যার মত আস্তিকদের বিমূর্ত ঈশ্বরকে দাদারের ঝুপড়িতে এনে ফেলেছেন আর তার কাছে অনিবার্য করে তুলেছেন সমাজের নিয়মের প্রতি নিরালম্ব আনুগত্য। সেই ঈশ্বরের দিকে এক টুকরো মানবিক করুণাঘন কৌতুকও ছুঁড়ে দিতে কিন্তু করেননি লেখক। আবার একই সঙ্গে ঈশ্বরের জন্ম ও উদ্বর্তনের ইতিহাসটুকুও নিজের মুখেই কবুল করিয়ে নিতে ভুল হয়নি তাঁর।

একটি সরল নিষ্পাপ শিশুর দেখা পাবার প্রত্যাশায় স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে ঈশ্বর। ঠাঁই নিয়েছে দাদারের বস্তিবাসী এক ক্ষুধার্ত মানুষের বিস্তারায়। লোকটি তাকে বোঝায় পবিত্রতার যে মূর্তিকে বিধাতা তার মনশ্চক্ষুতে এঁকে রেখেছে তার বাস্তব অস্তিত্ব সমাজেই নেই। জাতিমাত্রেরই একটা সম্পদ হল শিশু। অথচ তারাও আজ অর্থগৃধ্নুতার চাকার সঙ্গে বাঁধা। বিধাতার বিশ্বাস হয় না সে কথা। মধ্যরাত্রে দুজনে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। তিলক ব্রিজের কাছে এসে পড়ে তারা। হঠাৎ বিধাতার নজরে পড়ে বছর এগারোর একটি ছেলে এক পার্শি বৃদ্ধকে চাকু মেরে তার পার্স হাতিয়ে নিয়ে রেল ইয়ার্ডের রেলিং টপকে পালিয়ে যাচ্ছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে লোকটার, যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে একখুনি শেষ নিঃশ্বাস পড়বে তার। হত আর হত্যাকারীর মুখ বিধাতার সামনে। সঙ্গীটি শুধোয় সে যদি সত্যিই ঈশ্বর হয় তাহলে জঘন্য এই হত্যাকাণ্ড দেখে কীভাবে সে মানিয়ে নিচ্ছে নিজেকে এসব ঘটনাসংস্থানে? বিধাতাপুরুষের কী তবে সত্য পরিচয়? জবাবে বিধাতা ঃ মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমি নিজেই জানি না আমি কে? বহু বহু যুগ আগে আমি ছিলাম এক দুর্নিবার অগ্নি যা পর্বতকে দীর্ণবিদীর্ণ করে গলিত লাভাস্রোতের মত বেরিয়ে এসেছিল। সেই অগ্নি আদিম মানবের অন্তরকে আতঙ্কে অভিভূত করে তুলেছিল আর তারা সেই অগ্নিকে ভেবেছিল বিধাতা, ভেবে তারা তাকে পূজো করেছিল। তার পরে আমি হলাম জল, যা বিশাল মহাসিন্ধুর প্রচণ্ড ক্রোধের মত কূলে আছড়ে পড়েছিল, দেখে মানুষ আতঙ্কে গুটিয়ে গিয়েছিল। তারপর সূর্যরূপে বজ্রসচকিত মেঘপুঞ্জের বুক চিরে আমি আলোকচ্ছটা বিস্তার করলাম, সারা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিলাম সোনালি রোদের কিরণ। এরপর আমি হলাম গাছ, সাপ, পাহাড়। কামনার আর ভয়ের যত প্রকাশ তত আমার নাম। তারপর মানুষ ভয়কে করল জয় আর আমিও মানবসুলভ তুচ্ছতার উর্ধে উঠলাম। আমি সমস্ত জল, পাহাড়-পর্বত আর গাছপালার চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে এসে হয়ে গেলাম বিরাট এক শূন্য। এখন আমার কোন মুখ নেই, কোন অধিষ্ঠান নেই, কোন নাম নেই। আমি সেই এক, এই আকাশ আর মাটির উর্ধে আমি বসে আছি বিচ্ছিন্ন এক জাঁকজমকের মধ্যে। সহস্র সহস্র পৃথিবী আমার অধীনে এবং সহস্র সহস্র সূর্য এই ভেবে আবাক যে কে আমি আর কী আমি। এই হল কৃশনের 'বিধাতা'। একদা আদিম মানুষের হাতে উৎপাদিকা শক্তিগুলো ছিল নিচু মানের। ফলত তার জ্ঞানের ভাঁড়ারও ছিল খাটো। তখন প্রকৃতির শক্তিগুলোকে তাদের বোঝার ক্ষমতা ছিল কম, বশে আনা ছিল আরো দুষ্কর। তাই প্রাকৃতিক বস্তুর ওপর তারা কখনো করেছে চেতনার আরোপ কখনো বা তাদের ভেবেছে ঐন্দ্রজালিক শক্তির আধার। অথবা কোন বিশেষ প্রাণী বৃক্ষ বা বস্তুর সঙ্গে তারা স্থাপন করেছে তাদের জন্মের সম্পর্ক। ভেবেছে এই টোটেমই তাদের পূর্বপুরুষ, তাদের শক্তিমান রক্ষক, তাদের খাদ্যের যোগানদার। কৌম বা জাতীয় দেবতার উদ্ভব হয়েছে অনেক পরে। আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভেঙ্গে গেছে তখন, দেখা দিয়েছে শ্রেণী, গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র। শক্তি যত সংহত হয়েছে রাজার হাতে, রাষ্ট্র নায়কের হাতে, ততই তারই প্রতিরূপে গড়ে উঠেছে বহু দেবতার পরিবর্তে এক স্বরাট, অখিলাত্মা, গীর্বাণ, সর্বশক্তিমান বিধাতা। গোর্কিকে তাই সঠিকভাবেই

লিখেছিলেন লেনিন ঃ (ইতিহাসে এবং বাস্তব জীবনে) ঈশ্বর হল প্রথমত খানিকগুলো অন্যোন্যসম্বন্ধ ধারণার ঘোঁট, যার উৎপত্তি বহিঃপ্রকৃতি আর শোষকশ্রেণীর ঘানির নিষ্ঠুর দাসত্ব থেকে—সেই সব ধারণা, যা এই গোলামিকে পোক্ত করে, আর শ্রেণীসংগ্রামকে দেয় ঘুম পাড়িয়ে।

গল্পের খেই ছেড়ে এসেছি অনেক আগে। সেখানেই ফিরে যাই আমরা। চোখের সামনে ঘটে-যাওয়া কুৎসিত এই হত্যাকাণ্ড দেখেও একটি নিষ্পাপ শিশুর দেখা পাবার ইচ্ছে নিভে যায় না বিধাতার। এবার তারা ছ বছরের শিশুর ছদ্মবেশে স্বপ্নের শিশুর অন্বেষণে পথে নামে। অবশেষে বড়িবন্দর ডকইয়ার্ডে ছেঁড়া তেনা পরনে বছর সাতেকের একটি খোঁড়া ভিখিরি ছেলের সঙ্গে দেখা হয় তাদের। ছেলেটি বলে বিশটি ভাই বোন ওরা, একসঙ্গে এক জায়গায় থাকে। বিধাতা শুধোয়, ওরা তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে কিনা। শিশুটি সারা দিনের মাধুকরী হাতের তালুতে নাচাতে নাচাতে বলে, ওদের দাদা যদি দীক্ষা দিতে রাজি হয় তাহলে শামিল হতে বাধা নেই দলে। অনেক রাস্তার সাপলুডো আর অজস্র গলি খুঁজির গোলকধাঁধা পেরিয়ে একটা নোংরা নালার ধারে ঝুপড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় তিনজন। খোঁড়া শিশুটির দাদা তখন ওর অন্যান্য ভাইবোনদের দিনের কামাই বুঝে নিচ্ছিল। নবাগতদের পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে তাদের দীক্ষা দিতে রাজি হয় সেই লোক। ছেলেটি যখন মাঝরাতে তাদের দীক্ষানুষ্ঠানে যাবার জন্যে ডাকতে আসে, বিধাতা জানতে পারে, তার সঙ্গীর দুটো পা ভেঙ্গে দেয়া হবে, আর তার চোখ দুটো অন্ধ, কেননা লোকে কানাখোঁড়াদেরই ভিক্ষে দেয়, সুস্থ সবল ছেয়েমেয়েদের প্রতি কারুরই কোন থাকে না দয়ামায়া। শুনে, বিধাতা আর তার সঙ্গী দুজনে উর্ধশ্বাসে ছুটতে থাকে। সঙ্গীটি পালাতে পারে, কিন্তু ধরা পড়ে যায় বিধাতা। গল্পের শেষ দুটি বাক্য ঃ শেষবার আমি যখন বিধাতাকে দেখেছিলাম, সে তখন ছ বছরের শিশু—দুর্বল এবং অন্ধ। দিনের আবছা আলোতে পুলের ওপর ভিক্ষের জন্যে হাত পেতে দাঁড়িয়ে। শঙ্খ ঘোষের ভিখিরি ছেলে দুরন্ত অভিমানে বলেছিল ঃ বেশ করেছি, ভেক ধরেছি/বাঁচিয়ে রাখি জান/দূরের থেকে দেখি সবার দরদভরা টান। কৃশন তাঁর গনেগনে ঘৃণা উদ্‌ঘাটিত করেছেন মানুষের দয়া মায়া করুণা সহানুভূতির মূলধনের ওপর গড়ে তোলা নিষ্ঠুর এক ব্যবসাকে; আর এই সব সুকুমার বৃত্তির মুদ্রা ছড়িয়ে পুণ্যার্থীর দল সমীপবর্তী হয় যে বিধাতার, একই সঙ্গে তার অসহায়তারও। বস্তুত, দৃষ্টিখোয়ান অন্ধ ঈশ্বরের হাতে ভাঙা করঙ্ক স্থাপন করে, ঈশ্বরনির্মাতাদের চোখের সামনেই দুটি ছোট বাক্যে বিধাতার বিনির্মাণ ঘটিয়ে দিয়েছেন গল্পকার।

৪

তৈত্তিরীয়োপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুবাকে একটি অন্নস্তোত্র আছে ঃ

অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ।
অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ।
অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে।
সর্বং বৈ তেহন্নমাপ্নুবন্তি। যেহন্নং ব্রহ্মোপাসতে।
অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে।
অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে জাতান্যন্নেন বর্ধন্তে।
অদ্যতেহত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যতে।। ইতি।

পৃথিবীতে যত কিছু জীব আছে তারা সকলে অন্ন হতে জাত হয়, অন্নের দ্বারা জীবন ধারণ করে এবং জীবন শেষে এই অন্নেই লীন হয়, যেহেতু অন্ন সকল ভূতের জ্যেষ্ঠ। এ জন্যে অন্নকে সর্বৌষধি বলে। যাঁরা ব্রহ্মকে অন্নরূপে উপাসনা করেন, তাঁরা সমুদয় অন্ন লাভ করেন। যেহেতু অন্ন সমুদায় প্রাণীর জ্যেষ্ঠ, সেজন্যে তাকে সর্বৌষধি বলে। অন্ন থেকে ভূতবর্গ জাত হয়, হয়ে অন্নের দ্বারা বর্ধিত হয়। অন্ন ভূতবর্গের দ্বারা ভক্ষিত হয় এবং স্বয়ং ভূতবর্গকে ভক্ষণ করে বলে অন্নকে অন্ন বলে থাকে। বৃদ্ধি অর্থে বৃহ্ ধাতুর সঙ্গে মনিন্ প্রত্যয় যোগ করে ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। অতএব ব্রহ্ম মানে সমস্ত প্রাণী যার দ্বারা বৃদ্ধি পায়, সর্বদা ভক্ষিত হয়েও যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, যা স্বভাবতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে সমগ্র জগৎকে ভরণ করে, বা যার সাহায্যে সর্বভূতের বৃদ্ধি হয়। বেদোত্তর কালে ব্রহ্মের তাৎপর্য ভাববাদী অর্থে যতই পরিবর্তিত হোক না কেন নিরুক্তকার কিন্তু এই স্তোত্রে ব্রহ্ম বলতে অন্নই বুঝেছেন। উপনিষদ-সাহিত্যে এইভাবে কোথাও না কোথাও টিকে থেকেছে আদিম বস্তুবাদের ইশারা ; সেই বস্তুবাদ অনুসারে অন্নই চরম সত্য, পরম সত্তা। কৃশনের 'মহেঞ্জোদাড়োর খাজাঞ্চিখানা' গল্পে মহাকাল বলেছে, রুটিই পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, সমস্ত ভাষারই চাবিকাঠি এই রুটি, রুটিই তো সারা সভ্যতার খোদা!

কেমন ছিল মহেঞ্জোদাড়োর এই সভ্যতা, যা প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরনো ; আর হরপ্পা জুড়ে নিলে বিস্তৃতির বিচারে যা হয়ে ওঠে মিশর সভ্যতার দ্বিগুণ এবং সুমের ও আক্কাদ সভ্যতার সম্ভবত চার, যাকে একত্রে বলা হয় সিন্ধু সভ্যতা? প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সেখানে খুঁজে পেয়েছেন নগর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। লোকবসতি ছিল অত্যন্ত ঘন। মানুষজনেরা ছিল কেউ বা সওদাগর, কারু বা ছিল দোকানদারি, কারু বা বৃত্তি ছিল কারিগরি। হয়তো বা বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত ছিল ক্রীতদাসও। স্বভাবতই পূর্বোক্ত শ্রেণীর মানুষদের খাদ্য উৎপাদনে কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। আবার একটা সভ্যতাও থাকতে পারে না নিরন্ন। তাহলে কারা ছিল সেই খাদ্যের যোগানদার? খাদ্য উৎপাদনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে কিছু সংখ্যক মানুষ মুক্ত না হলে অমন বড় নগর, উন্নত কারুশিল্প এবং সুবিস্তৃত বাণিজ্য কখনো কি সম্ভব হতে পারে? তাহলে কারা নিয়েছিল সেই দায়িত্ব? কেমন ছিল সিন্ধুসভ্যতার আর্থসামাজিক সম্পর্ক? স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যেতে পারে, নাগরিক পরিসীমার অব্যবহিত পরেই ছিল দিগন্তে মেশা খেত খামার। সেখানে চাষবাসের কাজে নিয়োজিত ছিল অগণিত মানুষ। কৃশনের গল্পে মহাকাল বলেছে, এই নাগরিক সভ্যতার ভেতরেও ছিল নাদির শাহ-র দল, যারা হয়ত বাহ্যিক অর্থে লুঠেরা নয়, কিন্তু যারা সিন্ধু সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিরাট এলাকা জুড়ে চাষিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিত উদ্বৃত্ত ফসল, অথবা আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলা যায় উদ্বৃত্ত মেহনত, সহজ কথায় সেখানেও ছিল সামাজিক শোষণ। কিন্তু কোন সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে তার? 'মহেঞ্জোদাড়োর খাজাঞ্চিখানা'-য় কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় যার থেকে এই সিদ্ধান্ত দুর্নিবার হয়ে ওঠে যে, সিন্ধুসভ্যতার তুলনামূলক প্রাচীনতার গরিমার মধ্যেও লুকিয়ে ছিল শোষণের আর্কিটাইপ্যাল আভাস?

মহেঞ্জোদাড়োর শেষ টিলাটি খোঁড়াখুঁড়ির সময় উঠে আসে একটি সোনার সিন্দুক। এর আগে পাওয়া গিয়েছে নানান প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী ঃ কলশি, শিলমোহর, চাকি,

আস্তাবল, স্নানাগার, গুদাম, কাপড় রঙ করার পাত্র, শবদেহ বইবার জন্যে মাটির তাবুত। এ সব বস্তুর মধ্যে ধরা আছে তখনকার জীবন যাত্রার একটা নির্বিশেষ ডৌল। কিন্তু এই সিন্দুকটি বয়ে নিয়ে আসে এক অন্তর্গূঢ় সংবাদ। সিন্দুকের ওপরে অপরূপ কারুকার্য। মহেঞ্জোদাড়োর প্রাচীন ভাষাও তার ওপর খোদিত, আর এক অদ্ভুত দেবতার প্রতিমূর্তি। সোনার সিন্দুক, তাতে সোনার তালা। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ভাবেন, হয়ত বা এই ঝাঁপির ভেতর রয়েছে মহেঞ্জোদাড়োর ভাষার অমূল্য সম্পদ—নীলা, পান্না আর হীরা, অথবা মহেঞ্জোদাড়োর ভাষার পাঠোদ্ধারের সব চেয়ে জরুরি কুঞ্চিকা, কিম্বা মহেঞ্জোদাড়োর খোদা—এই সভ্যতার ত্রাতা, উদ্ধার্তা ও রক্ষক। সিন্দুকের ঢাকনা খোলা হয়। দেখা যায় সেখানে রয়েছে আনাজের তৈরি আগুনে সেঁকা একটা রুটি, সূর্যের আলোয় সোনার থালার মতন ঝকঝকে, মানুষের প্রথম আনন্দ আর শেষ দুঃখের মতন একটিই মাত্র গোল রুটি। এই আবিষ্কারের ওপর কোন অর্থ আরোপ করতে চেয়েছেন কৃশন? তিনি কি লিখতে চেয়েছেন তৈত্তিরীয় উপনিষদের ধাঁচে আরেকটি কোন আধুনিক অন্নস্তোত্র? আমাদের হয়ত মনে রাখা সঙ্গত হবে বৈদিক মানুষদের ছিল না কোন নগরসভ্যতা। তাদের ছিল পশুপালননির্ভর কৌম জীবন। তারা জানত না কৃষিকাজ। পশুপালন-প্রধান অর্থনীতির উপর নির্ভর করে নগরসভ্যতা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। অন্যদিকে সিন্ধু নদ থেকে নীল নদ পর্যন্ত প্রাচীন পশ্চিম এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে যে-সভ্যতা তার অর্থনৈতিক ভিত্তি বলতে সর্বত্রই কৃষি উৎপাদন। সমাজ যখন পশুপালন থেকে কৃষিকাজের দিকে অগ্রসর হয় তখন দেখা দেয় লঘিষ্ঠ গোষ্ঠী দ্বারা বহুজনের শোষণের অনিবার্য প্রক্রিয়া, উদ্বৃত্ত শ্রমের আমানত ভাঙিয়ে অল্পকিছু মানুষের সুখ বিলাসিতা ও বৈভবের উপক্রম, এই জীবনের সম্ভোগকে পারলৌকিক জীবনেও অটুট ও অব্যাহত রাখার নিপুণ উদ্যোগ। মিশরিয় সভ্যতায় দেখা গেছে মৃত্যুর পর নতুন জীবনে যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তার জন্যে রাজার সমাধির ভেতর রাখা হত তার প্রিয়তম খাদ্য ও পানীয়, সারাক্ষণ সেবার জন্যে ভৃত্য ও খানশামা, মনোরঞ্জনের জন্যে সুন্দরী ক্রীতদাসী। একমাত্র শোষণভিত্তিক সমাজেই সম্ভব হতে পারে এত কিছু। 'মহেঞ্জোদাড়োর খাজাঞ্জিখানা' গল্পে সোনার তালাওয়ালা সোনার সিন্দুকের মাধ্যমে তখনকার উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কটাকেই গল্পকার তুলে ধরেছেন আলতো ইশারায়। তদানীন্তন শোষণের মৃগয়াভূমিতে দাঁড়িয়ে এখনকার একটি পশুচারণরত শোষিত মানুষকে তাই মনে হয় সে যেন অবিশ্রাম কেঁদে চলেছে এই রুটির জন্যে—যে রুটিই হচ্ছে মানুষের প্রথম আনন্দ আর শেষ দুঃখ। দুঃখের এই উৎস যে আর্থসামাজিক শোষণ তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক সেটা অনুভব করতে পেরেছে তখন। মজুররা তাই কাছে আসবার আগেই রুটিটাকে লুকিয়ে ফেলে তারা যেভাবে শোষণের প্রসঙ্গকে সযত্নে আড়াল করে রাখে শোষকের ইতিহাস।

৫

১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রগতিশীল লেখক সম্মেলন বসে হায়দ্রাবাদে। কলেজ পড়ুয়াদের ভেতর তখন অটোগ্রাফ নেয়ার খুব উদ্দীপনা। সাহিত্যিকদের ঘিরে ধরে তাঁদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করার খেলায় মেতেছিল ছাত্রেরা। এমনই সব স্বাক্ষরশিকারীদের খাতায় সাজ্জাদ জাহির লিখেছিলেন 'সোস্যালিজম জিন্দাবাদ' ; আর কৃশন চঁদর

'মানবতাবাদ জিন্দাবাদ'। সোস্যালিজম বা সমাজবাদ এমন একটা সমাজব্যবস্থার কথা বলে যেখানে উৎপাদনের উপকরণগুলোর মালিকানা হয়ে ওঠে সামাজিক, শোষকশ্রেণীর অস্তিত্ব নিবারিত। কমে আসে গ্রাম আর শহরের ফারাক, কায়িক আর মানসিক শ্রমের বৈষম্য। সেই সমাজে থাকে পারস্পরিক সৌহার্দে আবদ্ধ দুটো শ্রেণী—শ্রমিকশ্রেণী আর কৃষক সম্প্রদায়—আর বুদ্ধিজীবীদের একটা সামাজিক স্তর। মালিকানা সামাজিক থাকে বলে ক্রমশ একটা পরিকল্পিত অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হয় সমাজ। তবে মানুষজনের বস্তুগত ও কৃষ্টিগত বর্ধমান চাহিদাকে আরো বেশি করে আরো সামগ্রিকভাবে সামাল দিতে পারে উৎপাদনের সামাজিক সমৃদ্ধি। 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ অনুযায়ী নিয়ে প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী দেয়া, এই হল সেই সমাজে বস্তুগত সম্পদ বন্টনের মূলনীতি। সাজ্জাদ জাহির যখন অটোগ্রাফের খাতায় লিখেছিলেন সোস্যালিজম জিন্দাবাদ পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশে তখন চলছে নতুন এই আদর্শের রূপায়ণ। কিন্তু কৃশন যখন লেখেন 'মানবতাবাদ জিন্দাবাদ' তখন বিস্ময় জমে। মোটেও আনকোরা নয় এই আদর্শের কথা। ইতালিয় নবজাগরণের মহান পুরুষ পেত্রার্কা বোক্কাচ্চিও লোরেঞ্জো ভাল্লার হাতেই প্রথম রূপায়িত হয়েছে সেই আদর্শ, একথা ভাবাও হবে প্রবল ঐতিহাসিক অপলাপ। বস্তুত সামাজিক নিপীড়ণ আর নৈতিক অধোগতির বিরুদ্ধে হাজার হাজার বছর ধরে অত্যাচারিত মানুষের লড়াই থেকে উঠে এসেছে তার ধারণা। মানুষকে ব্যক্তি হিশেবে কবুল করা, তার স্বাধীনতা অধিকার আর মর্যাদাকে আগলে রাখা, যেসব শক্তি মানুষকে দাসত্বে বেঁধে রাখে তার থেকে তাকে মুক্ত করার আকাঙ্খা এবং সকল মানুষের জন্যে সুখের স্বপ্ন রচনা করার সংকল্প—এসবই ধূসর ইতিহাসের কাল থেকে পোষণ করে এসেছে দলিত মানুষ। স্মরণ করা যেতে পারে মানবিক সুখ ও স্বাধীনতার জন্যে অমর শহীদ প্রমেথিউসের কথা, কিম্বা আমাদের দেশের অগ্নিপুরাণের দধীচির কথা। এমনকি যখন অধিকাংশ মানুষই ছিল দাস, তাদের নির্মম শ্রমের ওপর ভর করে দাঁড়িয়েছিল সমাজ, তখনো শ্রমজীবী মানুষের প্রবাদে প্রবচনে সমাধিশিলার প্রকীর্ণ লেখমালায়, অথবা দাসতাযুগের শিল্পকলায় ফুটে উঠেছে শ্রমিক মানুষটির প্রতি শংসা আর শ্লাঘা—আর তাই নিজের শ্রেণীর ওপর অহঙ্কার, তার অধ্যবসায়, দক্ষতা আর নৈতিক শক্তি—কখনো বা শ্রমের হাতিয়ারগুলোরই কোন না কোন আঁক। যে সব লোকোক্তি জনপ্রবাদ সময় উজিয়ে এখনো সজীব রয়েছে তাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় নিজের মূল্য সম্বন্ধে মানুষের চেতনা, পারস্পরিক সহযোগে আস্থা এবং সমষ্টির কাছে এক প্রকার দায়বদ্ধতা ঃ ভীরুর নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কিন্তু সে ক্রীতদাস মাত্র, সহিষ্ণুতা উপহাসের খোঁচা খেলে ক্রোধের রূপ ধরে, বদ সেই লোক যে আপনার কাছে আপনি ভালো অথবা যে লোক কেবল নিজের জন্যে বাঁচে সে মরা মানুষের বাড়া—এমনি আরো কত অজস্র। হিতোপদেশ বা আখ্যানমঞ্জরীর মধ্যে এমন অনেক গল্প বা নীতি উপদেশ আছে যা স্পষ্টতই নির্দেশ করে যে সামাজিক অবস্থানের সমত্ব আগে তারপর বন্ধুত্ব, মানবিকতা ; যেমন, দাসে আর মালিকে দোস্তি হয় না। মনে পড়ে আভিআনুসের গল্প 'তামার কলশি, মাটির কলশি' অথবা ফৈদ্রুসের ছাগল ভেড়া আর গাভীর গল্প, যেখানে তারা সিংহের শিকার হয়েছিল। এসব গল্পের ভেতর দিয়ে বন্ধুত্বের মোড়কে শ্রেণীচেতনার নির্যাস সংহত হয়ে আছে। এই শ্রেণীচেতনা দিয়েই

শুরু হয় খ্রিষ্টধর্মের সূত্রপাত, যা আদতে নির্যাতিত মানুষদেরই এক আন্দোলন। দাস, অর্ধদাস আর গরীব মানুষ যাদের মতন পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছিল সামাজিক গ্লানি আর দুঃসহ পীড়ণ, তারাই একদিন সমুদয় শোষণ আর অত্যাচারের ময়দানে দাঁড়িয়ে গেয়ে উঠেছিল মানবিক মুক্তির গান, ছড়িয়ে দিয়েছিল মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে একটা অস্পষ্ট গণতান্ত্রিক সাম্যের চেতনা। সামন্ততান্ত্রিক যুগেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা সময়ে যে সমস্ত কৃষকবিদ্রোহ ঘটে গিয়েছে, সেখানেও দেখা গেছে মানুষের আত্মমর্যাদা রক্ষার সযত্ন প্রয়াস ; যে সমস্ত সংস্কার শ্রমজীবী মানুষকে ছোট করে রাখে, আত্মিক আর নৈতিক বোধকে খর্ব করে দেয় সেই সব অন্ধতমসাবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার ঐকান্তিক চেষ্টা ; অথবা যে সমস্ত সমাচার প্রভুর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের কথা বলে, ঐহিক দুঃখের অবসানের জন্যে পরজন্মের পরামর্শ দেয় কিম্বা সুসময় ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকতে বলে, সেই সব ধর্মীয় অনুশাসন উপেক্ষা করার প্রবল স্পর্ধা।

এ সবই মানবতাবাদী ভাবধারার কথা আর উৎসও অতি পুরোন। তাহলে কৃশন কি সাজ্জাদের অত্যন্ত অগ্রসর সমাজতন্ত্রের তুলনায় মানবতাবাদ নামক এক আদ্যিকালের ধারণায় আটকে গিয়েছিলেন আদ্যোপান্ত? এ জিজ্ঞাসায় নামার আগে কৃশনের একটি গল্পে মনোনিবেশ করা যেতে পারে একবার।

ছোট্ট কয়েক পৃষ্ঠার এক গল্প 'জঞ্জাল বুড়ো'। যকৃতের ওপর বার দুয়েক অস্ত্রোপচার করিয়ে, যকৃতের একটি ও অন্ত্রের খানিক বাদ দিয়ে সাড়ে পাঁচ মাস বাদে জেল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায় খুদে চাকরির এক মানুষ। তার সংসার ছন্ন হয়ে গেছে তখন। চিকিৎসার দীর্ঘতায় চলে গেছে চাকরি আর খরচে সংসারের শেষ কুটোটিও। নারীটিকে তুলে নিয়েছে বিত্তবান ব্যবসার মালিক আর তার আগে ভেসে গেছে বিরূপ পরিবেশ আর ভাবী বাপমায়ের দুর্দশায় জন্ম নিতে অনিচ্ছুক সুবোধ সন্তান। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে লোকটির তাই ঠাঁই হয় মস্ত এক জঞ্জালের টবে। শহরের গলি বাজার পথ তার কাছে ছিল এক ধোঁয়াটে ছায়ার তৈরি জগৎ। বাইরের মাঠ খেত আরখোলা আকাশ ব্যর্থ কল্পনা। ঘরসংসার, কাজকর্ম, জীবন, সমাজসংঘর্ষ এই সব অর্থহীন শব্দ পচে গলে মিশে গিয়েছিল ১৫×৩০ ফুট চওড়া টবের উপচীয়মান আবর্জনায়। লোকের দৃষ্টিতে সে ছিল এক ন্যাড়া গাছের মত, প্রত্ন এক স্মৃতিচিহ্নের মত। সবাই তাকে বলত জঞ্জাল বুড়ো। সে কারুর সঙ্গে কথা বলত না, কারুকে সাহায্য করত না, কারুর কাছে ভিক্ষে চাইত না। নগর সভ্যতার সে ছিল এক নবীন কণাদ। আর এই আবর্জনার টব? তার কাছে অই কুণ্ড ছিল এক খোলা বাজার। যে দোকানে যে সওদা প্রয়োজন তা সে বিনি পয়সায় নিত। এই বাজারে সেই ছিল একমাত্র মালিক। তার বিশ্বাস ছিল, এই দুনিয়ায় মঙ্গল শেষ হয়ে যেতে পারে, প্রেম শেষ হয়ে যেতে পারে, বন্ধুত্ব শেষ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আবর্জনা কোন দিন শেষ হয়ে যাবে না। সারা দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে বাঁচবার শেষ উপায় শিখে নিয়েছিল। অথচ এমন নয় যে সে বাইরের দুনিয়ার কোন খবর রাখত না। এই আস্তাকুঁড়ের আস্তানা থেকেই সে বলে দিতে পারত কখন জমাদারদের হরতাল চলছে, শহরে চিনির দাম বেড়েছে কখন, পাঁউরুটিই বা কখন গমের দরের সঙ্গে পা মিলিয়ে বাজারে হয়ে উঠেছে অপ্রতুল। মহাযুদ্ধ থেকে শুরু করে মেয়েদের গোপন ব্যাধি পর্যন্ত

সবকিছুই ধরা পড়ত তার এই আবর্জনার অ্যানটেনায়। মাঝে মাঝে তার মনে হত এই দুনিয়াই বুঝি খুব বড় একটা আবর্জনার স্তূপ। সেখানে সব লোক আপন আপন স্বার্থের কোন টুকরো, ব্যক্তিগত লাভের কোন খোশা বা মুনাফার কোন ন্যাকড়া খাবলানোর জন্যে সব সময় তৈরী হয়ে আছে। বাস্তবে এ সংসারে যত কথাবার্তা হয় তা মানুষের মধ্যে হয় না, হয় কেবল নিজের জাতের সঙ্গে আর তাদের কোন স্বার্থের মধ্যেই।

এইভাবে পঁচিশ বছর ধরে সে এই আবর্জনার টবের ধারে বসে বসে আপন জীবন কাটিয়ে দেয়। একদিন কুণ্ডের ভেতর থেকে ভেসে আসা চিৎকারে তার তন্দ্রা ছিঁড়ে যায়। চোখ রগড়ে সে দেখে পাঁউরুটির টুকরো, চোষা হাড়, পুরোন জুতো, আমের খোশা, বাসি চাট আর টেড়া ভাঙ্গা বোতলের মাঝখানে এক নবজাত উলঙ্গ শিশু পড়ে আছে আর হাত পা নেড়ে তীক্ষ্ণ চিৎকারে নিজের খিদে ঘোষণা করছে। সে তো এখনো জানেনা, দারিদ্র কী হতে পারে, মমতা কতটা ভীরু হতে পারে, জীবন কীভাবে বিগড়ে যেতে পারে, জীবনকে কীভাবে ময়লা দুর্গন্ধময় করে জঞ্জালের টবে ফেলে দেয়া যেতে পারে। এখন সে কেবল ক্ষুধার্ত। জঞ্জাল বুড়ো টব থেকে একটা আমের আঁটি তুলে নিয়ে তার প্রান্তভাগ বাচ্চাটার মুখে ধরে রাখে। তার তখন মনে হয়, জীবন তাকে ফের ধরে ফেলেছে আর ধীরে ধীরে ধাক্কা দিয়ে তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে আসছে। হঠাৎ তার পলাতক স্ত্রীর কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে গর্ভের মধ্যে নষ্ট-হয়ে-যাওয়া তাদের সন্তানের কথা। গল্প শেষ হয় এইভাবে ঃ

সারা রাত জঞ্জাল বুড়ো ঐ নবজাত শিশুকে নিজের কোলে নিয়ে অস্থির ও অশান্ত হয়ে ফুটপাতে পায়চারি করল। যখন সকাল হল আর সূর্যের আলো দেখা দিল তখন লোকে দেখল, জঞ্জাল বুড়ো আজ জঞ্জালের টবের কাছে বসে নেই, পরন্তু পথের ধারে তৈরী হওয়া ইমারতের নিচে ইট বইছে, আর এই ইমারতের কাছে এক কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় ফুলের নকশাওলা কাপড়ে শুয়ে এক ছোট্ট শিশু মুখে দুধের চুষিকাঠি নিয়ে হাসছে।

'ছাড়পত্র' কবিতায় সুকান্ত বলেছিলেন ঃ 'তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,/এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি/নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।' সুকান্তর নিজের ভাষ্য অনুযায়ী এই 'নবজাতক' নাকি কমিউনিস্ট পার্টি। সে পার্টি তখন অত্যন্ত ছোট 'খর্বদেহ' ও 'নিঃসহায়'। তাই একব্রত কর্মী হিসেবে সেই সদ্যোজাতকেই দেহের রক্তে তাঁর আশীর্বাদ। কিন্তু কবিনির্দিষ্ট সূত্র ধরে কবিতার মর্মে প্রবেশের দায় নেই পাঠকের। অন্যভাবেও বোঝা যায় এই কবিতা। জঞ্জাল, শিশু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ থাকলেও আসলে কবির বক্তব্য হল নতুন জায়মান পৃথিবীর কাছে জীর্ণ জরতী পৃথিবীকে রাস্তা ছেড়ে দিতে হবে ; কিম্বা এই বিমূর্ততা থেকে সরে এসে বলা যায় যেহেতু সামাজিক পরিবর্তন কোন আধিবিদ্যক প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয় না তাই এগিয়ে আসতে হয় এই সমাজের প্রাগ্রসর শ্রেণীকেই, তাদেরই হস্তক্ষেপে অপসৃত হয় সমাজের জঞ্জাল, বাসযোগ্য হয়ে ওঠে স্বপ্নের পৃথিবী। অই শ্রেণীর ওপর এই ঐতিহাসিক দায়িত্বই ন্যস্ত করে সময় ও সমাজ। সুকান্ত বন্ধু অরুণাচলকে বলেছিলেন ঃ বড় বেশি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব রয়ে গেল কবিতাটিতে। কোন অর্থে সত্যি এই কথা? যে অর্থে ভাবের জগতে পরিবর্তনকে লক্ষ্য করেন একজন দ্বান্দ্বিক ভাববাদী। কিন্তু আলোচ্য গল্পে কোন

বিমূর্ততাকে প্রশ্রয় দেননি কৃশন। যে সমাজ একটা মানুষকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে, যে সমাজ একটা নিষ্পাপ শিশুকে পরিত্যাগ করে চলে যায় অবৈধ বলে, সেই সমাজের দ্বন্দ্বগুলোকে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন উলঙ্গ করে। সহজ কথাটা সহজভাবে বলতে একটুও গলা কাঁপেনি তাঁর যে, ফুলের নকশাঅলা কাপড়ে শুয়ে যে সমাজে হেসে উঠবে শিশু, সেই সমাজ মানুষকে অবশ্যই মিটিয়ে দেবে তার মেহনতের উপযুক্ত দাম। সত্যিই কি তাই? যে সমাজ একটুও পালটাল না, পঁচিশ বছর বাদে যখন নিজেরই প্রায় সমস্ত কর্মশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন এই উঞ্ছজীবী মানুষকে আবার সেই একই নির্মম নিষ্করুণ কর্মক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়ে, কৃশন কি তবে তাঁর পাঠকের মনে এই বিশ্বাসের বীজ বুনে দেওয়ার চেষ্টা করলেন যে, এবার আর প্রত্যাহত হবে না এই বৃদ্ধ? এই প্রক্রিয়ায়, যতই মনোহারী হোক না কেন গল্পের উপসংহার, আবার কি সেই প্রচলিত রোমান্টিকতার বৃত্তেই নিজেকে আবদ্ধ করে ফেললেন না লেখক? কিন্তু আমাদের পক্ষে সে সংশয় হবে অমূলক। কোন ভদ্রাসন তুলে দেয়ার জন্যে এই অবৈধ শিশুকে আস্তাকুঁড় থেকে উদ্ধার করেনা সেই বৃদ্ধ। কোন উত্তরাধিকার তার মধ্যে প্রবাহিত দেখার বাসনা থেকেও তাকে কোলে তুলে নেয়না নিজেই নিঃসহায় এই মানুষ। এমনকি বাৎসল্যের যে গুরু গুরু হাহাকার তার মধ্যে বেজে চলেছে নিরন্তর, শিশুটিকে বাঁচিয়ে তোলার সেইটাও হতে পারে না সক্রিয় কারণ। আসলে যে জীবন থেকে ছিটকে দেয়া হয়েছিল তাকে, সেই জীবনের দিকেই ফিরে আসতে চাইছে সে এখন। কেন্দ্রাতিগ শক্তিটাকে সমর্থভাবে চিনিয়ে দিয়েছেন কৃশন। যে সম্পর্কগুলো মানুষের সত্তাকে নিরূপিত করে তার বৈপ্লবিকীকরণের মধ্যেই যে মানবিক সত্তার পুনর্জাগরণ ঘটে, এই সিদ্ধান্ত তখন কেলাসিত হয়ে ওঠে পাঠকের মনে। লেখকের বড় গুণ এইটেই যে, অমানবিকীকরণের কারণটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার পর ভাষ্যকারের ভূমিকা থেকে নিঃশব্দে সরে যান তিনি আর পাঠকের ওপর ছেড়ে দেন উত্তরণের সূত্র খোঁজার ভার, অনেকটা ব্রেযটের নাট্যনির্মাণেব শিল্পিত কৌশলে।

এমনি আরো একটা গল্প 'চৌরাস্তার কুয়ো'। একটি লোকের ছেলের খুব বাড়াবাড়ি। কেউ বলল, কোথাও-না গাঁয়ে চৌরাস্তার মোড়ে একটা কুয়ো আছে, তার জল যদি ছেলেটির মুখে এক ফোঁটা দেওয়া যায়, ভালো হয়ে উঠতে পারে সে। মুমূর্ষু ছেলেটিকে নিয়ে তাই লোকটি খুঁজতে খুঁজতে এল সেই কোথাও-না গাঁয়ে। কুয়োটা সাফাই হচ্ছে তখন, ডুবুরি নেমেছে জলে। জলের ভেতর থেকে কাদা ময়লার সঙ্গে উঠে আসছে অনুষঙ্গবাহী চিরুনি, প্রতিহিংসাপ্রবণ ছোরা, বেদনামথিত গজদন্তের চুড়ি। একে একে উঠে আসছে সব আস্ত এক একটা ইতিহাস নিয়ে। এবার উঠল একটি বাচ্চা ছেলের মৃতদেহ। সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন শুভ্রকেশ দীর্ঘদেহ সৌমদর্শন এক বৃদ্ধ। উপস্থিত জনতাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কার ছেলে এটি?' সবাই নিরুত্তর, কবুল করল না কেউ। তখন সেই বৃদ্ধের নির্দেশে ডুবুরি মৃত শিশুটিকে আবার কুয়োর ভেতর রেখে এল। হঠাৎ অসুস্থ শিশুটি বাপের কোল থেকে নেমে, 'দাঁড়াও দাঁড়াও আমি তোমার সঙ্গে খেলা করব' বলে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হতচকিত পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে সেই ঋজু বৃদ্ধ মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ঃ তুমি অবশ্যই তোমার ছেলেকে ফিরে পাবে, যেদিন কোন কুমারী মেয়ে এসে কুয়োতে ঝুঁকে পড়ে মৃত শিশুটিকে ডাকবে, তাকে নিজের সন্তান বলে স্বীকার করবে। লোকটি আজো দাঁড়িয়ে আছে সেই কুমারী

মেয়েটির পথ চেয়ে, যে একদিন কুয়োর কাছে আসবে, এসে তার বাছার প্রাণ ফিরিয়ে দেবে। গল্পে আছে, কুয়ো থেকে তখন একটা পঙ্কিল পূতিগন্ধ উঠে আসছিল, যেন কুয়োতে কোন জল নেই, আছে শুধু বিষাক্ত ফেনা, যে ফেনা কুয়োর ভেতর বিজবিজ করছিল আর কুয়ো থেকে বেরিয়ে এসে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল—সমতলে, উপত্যকায়, পাহাড়ের সানুদেশে। গল্পের সঙ্কেতকে এভাবেও বুঝে নেওয়া যায় ঃ কুয়ো হল এই পুঁজিবাদী সমাজ, বৃদ্ধ হল সময়ের বিবেকী স্বর, আর অই শিশু আমাদেব মুমূর্ষু অস্তিত্ব। হানস মায়ার্স-এর 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজেতা' বলে একটি উপন্যাস আছে, তার নায়ক আরশোলা। এই কীট, নাকি পতঙ্গ, এমন এক প্রজাতি, যা পরিবেশের যে কোন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও টিকে থাকে কেবল অবিরাম অভিযোজনের প্রক্রিয়ায়। পরিবেশকে পালটাবার কোন অঙ্গীকার নেই তার, তারই নিজের শুধু মুহুর্মুহু পালটে পালটে যাওয়া। মায়ার্সের মুখ্য কুশীলবের মতই সমাজের মধ্যশ্রেণীও সমতলে, উপত্যকায়, পাহাড়ের সানুদেশে উঁচুনিচু বিষবাষ্পের যে ঢেউগুলো আছড়ে পড়ে ক্রমাগত, তাদের বিষয়ে সে থাকে দুঃশোধনীয়ভাবে নিরুচ্চার। এই গল্পে তাদের সেই অলজ্জ মৌনকেই আঘাত করতে চেয়েছেন কৃশন। 'জঞ্জাল বুড়ো' গল্পে পচনশীল সমাজের ছবি তুলে ধরে উৎক্রান্তির সূত্র খোঁজার ভার অবনত মানুষজনের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি ; কিন্তু, 'চৌরাস্তার কুয়ো' গল্পে আমাদেব ভাবী প্রজন্মের জীবন, সমাজটা যে অবৈধ প্রাথমিকভাবে এই স্বীকারোক্তির সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িত, সেই কথাটাই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন লেখক। কেননা কোলের ভেতর যতই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসুক ম্রিয়মান সন্তানের আয়ুপরিসর, অভিযোজনপটু মধ্যশ্রেণীকে দিয়ে এই সত্যটুকু কবুল করানোই যে দুষ্কর।

কৃশনের প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের এক গল্প 'অসিরি জেঠিমা'। বছর যাটেকের এক প্রৌঢ়া মহিলা তিনি। লোকে তাঁকে কুমারী জেঠিমাও বলে, কেননা খুব ছোট্টটি তিনি, যখন তিনি স্বামী যোধরাজের সংসারে আসেন, অথচ তাঁকে নিয়ে এক দিনের জন্যেও ঘর করেননি মদ্যপ লম্পট আর বেশ্যাসক্ত সেই পুরুষ। তবু চিরবঞ্চিত অই নারী তিরিশ বত্রিশটি বছর শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গেই তাঁদের আপন করে, সেবাযত্ন করে কাটিয়ে দিয়েছেন। কোনদিন অনিষ্ট করেননি কারু, ভাগ্যের ওপর দোষারোপ করেননি কখনো, দুঃখী বা মনমরা হয়ে থাকতেও দেখা যায়নি তাঁকে কোনদিন। একথা ভাবা তো অসম্ভব ছিল যে পাশে কোন বাড়িতে আনন্দ উৎসব চলছে আর উনি তাতে যোগ দেননি, কিংবা কারু বাড়িতে শোক দুঃখ আর উনি সেই শোকে দুঃখে ভাগীদার হননি। স্বামী তাঁকে যে মাসোহারা দিতেন,সেই সামান্য পয়সাতেও তিনি সহজভাবেই হয়ে উঠতে পারতেন সুদক্ষিণা। গণিকার ঘরে মারা গিয়েছিলেন তাঁর স্বামী, তবু লক্ষ্মী নামক সেই নারী যখন অসুস্থ, লোকচক্ষুর খর দৃষ্টি এড়িয়ে নিষিদ্ধ পল্লীতে বার বার গিয়ে দেখে আসতেন তিনি, আর অবশেষে সেই নারী যখন মারা গেলেন ভাইপোর ভর্ৎসনাকে দীর্ঘশ্বাসে প্রতিহত করে তিনি বলেছিলেন ঃ 'তোর জেঠার অই তো শেষ চিহ্ন ছিল, আজ সেও চলে গেল। সাতচল্লিশ সালের দাঙ্গায় যখন জলন্ধরে উদ্বাস্তুর স্রোত, রোজ সকালে উঠে তিনি চলে যেতেন শরণার্থী শিবিরে। সাধ্যানুযায়ী সেবা করতেন তাঁদের। সেই সেবায় জাতিধর্মের মরিচা জমতে দেননি কখনো। মাস চার পাঁচের মধ্যে তাঁর নিজেরই গৃহ হয়ে উঠেছিল মাবাপহারান ছেলেমেয়েদের ছোটখাট

এক সরাইখানা। ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি কোন টানই ছিল না তাঁর। প্রকৃতি তাঁর মস্তিষ্কের অই খোপটিকে খালি রেখেছিল। যা কিছু ছিল সে সবই ছিল অন্যের সেবার জন্যে। কৃশনের সংবেদনশীল লেখনী এই নারীকে এঁকেছে সনাতন ভারতবর্ষের সাধ্বী মমতাময়ী মাতৃমূর্তির ডৌলে। যেমন ঃ

১. ওঁর চোখ দুটি দেখলে আমার মাতা বসুমতীর কথা মনে হত, মনে হত মাইলের পর মাইল বিস্তৃত শস্যখেতের কথা, মনে হত বিশাল এবং গভীর নদীর অগাধ জলরাশির কথা। কারণ ও দুটি চোখে ছিল সীমাহীন স্নেহমমতা, অথই সরলতা আর প্রতিকারহীন দুঃখ বেদনা।

যখন প্রয়াত স্বামীর অসুস্থ রক্ষিতা লক্ষ্মীকে দেখে ফিরছেন ঃ

২. ওঁর গোলগাল মুখখানিকে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন ম্যাডোনার মত সরল আর রহস্যময়।

অথবা যখন ঘরে কর্পূর আর ধূপকাঠির সুগন্ধ, মরদেহ শাদা চাদরে ঢাকা, কেবল মুখখানি অনাবৃত ঃ

৩. ওঁর চোখ দুটি নিমীলিত, সরল পাণ্ডুর মুখখানি প্রশান্ত ; নীরব এবং যেন এক গভীর স্বপ্নে আচ্ছন্ন, দেখে মনে হচ্ছিল ও মুখ বুঝি অসিরি জেঠিমার নয়, বসুমাতার প্রসারিত সীমাহীন মুখমণ্ডল, যার দু-নয়ন থেকে সব নদী বয়ে চলেছে, যার কোলে লক্ষ লক্ষ উপত্যকা জনবসতিতে পূর্ণ হয়ে পুলকিত, যার অঙ্গ স্বার্থহীন প্রেমের সৌরভে সুরভিত, যার সরলতায় সৃজনকর্মের পবিত্রতা প্রকাশিত, যার অন্তরে অপরের জন্যে গভীর মমতাবোধ জাগে, যার আনন্দ শুধু একজন জননীই উপলব্ধি করতে পারে।

অসিরি জেঠিমার এই মাতৃকামূর্তির পাশাপাশি আর কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট কি খোদাই করে দিতে পেরেছিলেন কৃশন, যেমন পেরেছিলেন ব্রেখট তাঁর 'অবিমৃষ্যকারী বৃদ্ধা' (ডি উনহুয়েরডিগে গ্রাইসিন) গল্পে? নিজেরই ঠাকুমার অনুসরণে নাকি এই গল্প লিখেছিলেন ব্রেষট, যদিও লেখকের কাকা তাঁর মা সম্বন্ধে ভাইপোর এই বিবরণকে আদ্যোপান্ত অমূলক বলে আখ্যা দিয়েছেন। বৃদ্ধাকে ঘিরে লেখকের কয়েকটি তথ্য ঃ স্বামী মারা যাওয়ার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল বাহাত্তর। চেহারা ছিল রোগাটে আর ছোটখাট, চোখদুটো গিরগিটির মত চঞ্চল, কিন্তু কথা বলবার ধরণ ছিল ধীর। সাতটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন তিনি। আর অভাব অনটনের মধ্য দিয়েই বড় করতে হয়েছিল তাদের। পরে অবশ্য কর্মোপলক্ষ্যে বা বৈবাহিক কারণে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে দেশে বিদেশে। স্বামীর মৃত্যুর পর একা হয়ে গেলেন তিনি, নাকি একা করে নিলেন? ছোট ছেলে, যার সংসার বড়, থাকত সেই শহরেই, বড়সড় ফাঁকা বাড়িটিতে মায়ের কাছে সপরিবার উঠে আসতে চেয়ে প্রতিহত হয়েছিল। অন্যেরা অল্প কিছু করে মাসে মাসে পাঠাতেন তাঁকে। সেই পয়সায় তিনি নাকি একদিন অন্তর হোটেলে খেতেন, মাঝে মাঝে একটা জঘন্য সিনেমা হলে ছবি দেখতে যেতেন, প্রায়শ লাল মদ কিনে ভাটিখানার বেকার মেয়েমানুষ আর দিনমজুরে ঠাশা বস্তির ভেতর এক মদ্যপ মধ্যবয়সী মুচির কারখানায় গিয়ে তাস খেলতেন। জুটত যে হোটেলে খেতেন সেই হোটেলের একটি হাবাগোবা পাচিকা। একদিন নাকি বিরাট এক ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে, ঘোড়দৌড়ের মাঠেও গিয়েছিলেন। প্রিয় মায়ের অন্যায় কাজের খবরে বিব্রত

বোধ করত ছেলেরা। প্রকৃতপক্ষে জীবনের শেষ বছর কটাও বিলাসিতার ভেতর কাটাননি তিনি। সন্তানদের না জানিয়ে বাড়িটা বন্ধক দিয়েছিলেন, সেই অর্থ কীভাবে খরচ করেছিলেন, অজ্ঞাত থেকে গিয়েছিল তাও। হয়ত এটাও হতে পারে ছেলেদের উষ্মার কারণ, কিম্বা অভিমানের। লক্ষ্মী নামক বেশ্যার বাড়িতে স্বামী যখন মারা যান, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেননি অসিরি জেঠিমা ; শবদেহের সঙ্গে শ্মশানেও যাননি তিনি। ব্রেষটের বৃদ্ধাও স্বামীর সমাধি দেখতে যাননি গোরস্থানে। বোঝা যায় পর পর দুটো জীবন যাপন করেছেন শেষোক্ত এই নারী। প্রথমটা মেয়ে, স্ত্রী আর মায়ের জীবন আর দ্বিতীয়টা স্রেফ ফ্রাউ বে-র। স্বামীর মৃত্যুর পর দু বছর বেঁচেছিলেন তিনি। প্রথম জীবনটায় প্রায় সাত দশক জীবন কেটেছে তাঁর, দ্বিতীয়টায় দু বছরের বেশি নয়। অর্থাৎ দীর্ঘকাল ঝিয়ের জীবন আর সামান্য কদিন স্বাধীনতা। জীবনের রুটি, গুঁড়োটুকু বাদ দিয়ে, সেই ক দিনই গ্রহণ করার সাহস দেখাতে পেরেছিলেন বৃদ্ধা। ব্রেষট স্বাধীনতার এই অভীপ্সাটাকেই বড় করে দেখাতে চেয়েছেন তাঁর রচনায়, আর কৃশন মাতৃত্বের মহিমা, যদিও অসিরি জেঠিমার ভেতর স্বাতন্ত্রের অভিব্যক্তিও অপ্রকাশ নয়।

'অসিরি জেঠিমা'র সীমাবদ্ধতাকে কৃশন সহজেই কাটিয়ে উঠেছেন তাঁর 'রাজকুমার' গল্পে। সেখানেও কেন্দ্রীয় চরিত্রে যিনি আছেন তিনি এক নারী, কিন্তু যিনি কখনো নারীবাদী নন। আপাতভাবে মনে হতে পারে তিনি যখন পুরুষটিকে খারিজ করছেন, তখন তাঁর লড়াই বুঝি এই পুরুষটিরই সঙ্গে। কিন্তু সে কথা অপহ্নব হবে। আসলে তাঁর বিদ্রোহ যে সমাজ নারীত্বের, তার ব্যক্তিত্বের, অবমূল্যায়ণ ঘটায়, সেই সমাজের বিরুদ্ধে। সেই বিদ্রোহ কখনো নিছক পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর বিদ্রোহে সার্থক হতে পারে না। সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালিত তারই অনুযাত্র হয়ে অগ্রসর হতে হয় তাকে।

সুধা সুরূপা ছিল না, কুরূপাও না, মোটামুটি চলনসই দেখতে একটি ঘরন্তি মেয়ে। রান্নাবান্নায় পটু, সেলাই ফোঁড়াইয়ে দক্ষ। মনকে প্রলুব্ধ করার মত কোন গুণই ছিল না তার। সদাগরি অফিসের কেরানি বাপের নাজুক-লাজুক অই মেয়ে। তাকে কলেজে পাঠানো হয় উচ্চশিক্ষার জন্যে নয়, যদি সেখানে কোন ভাল ছেলের নজরে এসে হিল্লে হয় কিছু। কিন্তু তার হেঁট মাথা, লেপাপোঁছা বুক, নীরব দৃষ্টি আর কম কথা বলার স্বভাব এবং সবার ওপর বাপের সামান্য সম্বল দেখে কুৎসিততম ছেলেরাও ফিরে যায়। বর আর জোটে না। আরো দু বছর কেটে যায়। আসফ আলি রোডের একটি ফার্মে অনুলেখকের চাকরি পায় সুধা। সে এখন আগের চেয়ে আরো বেশি শান্ত, স্বাভিমানী এবং পরিশ্রমী। অনেকদিন বাদে আশীর্বাদের টাকা, বিয়ের দানসামগ্রী, যৌতুকের নগদ নির্দিষ্ট করে মোতি বলে একটি ছেলেকে মেয়ে দেখাতে নিয়ে এল তার বাবা। সুপুরুষ সেই ছেলেটিকে মনে ধরেছিল সুধার। কিন্তু ঐশ্বর্যের টানে বাঁধা পড়ে অন্যত্র বিয়ে করে মোতি। মেয়ের দুঃখে সুধার বাবা মারা যান, মা-ও চলে যান অল্প কিছু কাল পর। একা হয়ে যায় সুধা। ভাইয়েদের সংসারছেড়ে পেয়িং গেস্ট হয়ে উঠে আসে একটা সম্পন্ন পাড়ায়। অফিসে তার উন্নতি হয় ম্যানেজারের ব্যক্তিগত সচিবের পদে। বয়স এখন চল্লিশ। অন্তরের ঐশ্বর্যকে উপেক্ষা করে চলে গেছে মোতি। ঘরেতে এল না সে তো, তবু মনে তার নিত্য আসা যাওয়া। জীবনের প্রতিটি বসন্ত তারই ধ্যানে কাটিয়ে দিয়েছে সুধা, তারই স্মরণে সিঁথিতে দিয়েছে সিঁদুর, বাজুতে শঙ্খের বলয়। তারই ছায়াকে

সঙ্গী করে অনেক নির্জন সন্ধ্যা কেটেছে পার্কের অন্ধকারে, প্রেক্ষাগৃহের উষ্ণতায় ; নিজেরই পয়সা খরচা করে উপহার নিয়েছে শাড়ি, কোন অলঙ্কার ; তার হাত থেকে, কল্পনায়। একদিন মোতি ফিরে আসে বাস্তবে। তখন তার রূপ ঝরে গেছে, রোগের মদের বিফলতার আর রুক্ষতার বিষ তার রোমে রোমে। কয়েকটি বৈধ ও অবৈধ সন্তান রেখে মারা গেছে তার খিটখিটে দেমাকি নির্মম নিষ্ঠুর স্ত্রী। মোতি ফিরে আসে তারই অফিসের ম্যানেজার হয়ে। সুধাকে চিনতে পারে মোতি। একদিন সুধাকে সে বলে ঃ আমার চোখ একটি হীরে দেখেছিল, আর পাথর ভেবে তাকে হেলায় ছুঁড়ে ফেলেছিল। ...তুমি কি আমাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারনা? তুমি কি আমায় বিয়ে করতে পার না? আমি তো ভালোবাসাও পাই নি, সারাটা জীবন যে ভালোবাসার জন্যে আমি কাঙাল হয়েছিলাম। সুধা তাকে বলতে পারেনি, সে চায়নি দাম্পত্য প্রেম, চায় নি ফুলশয্যা, চায়নি সন্তানের স্নেহ। শুধুমাত্র তার কল্পনা, তার প্রীতিকর প্রতিচ্ছবিকে মনের মাঝে লালন করে চলেছিল এত দিন। অথচ সেটুকুও নরকের চিতাগ্নিতে ভস্ম করে দিতে এসেছে অই মানুষ। কিন্তু এসব কিছুই বলা হয়ে ওঠেনা সুধার। মোতি যখন তার হাতখানা ধরতে চাইল, রাগে জ্বলে উঠল সে, হাতখানা এক ঝটকায় ঠেলে দিয়ে ঘরথেকে বেরিয়ে গেল, কল্পনার রাজকুমারকে পিছনে ফেলে-পার্কের রেলিং-এ ঠুকে ঠুকে ভেঙ্গে ফেলল তার শাঁখা, মুছে ফেলল তার সিঁথির সিঁদুর। সেই মুহূর্তে নিশ্চয়ই সিন্ধু বারোয়াঁয় লাগে তান, সমস্ত আকাশে বাজে, অনাদিকালের বিরহবেদনা। কিন্তু "পরিশেষ"-এর 'বাঁশি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মতন আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরানির ভেদটুকু মুছে দেন না কৃশন ; অথবা বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে ছেঁড়া ছাতাকে রাজছত্র মেলে চলে যেতে দেখেন না বৈকুণ্ঠের দিকে। হরিপদর জীবনে ধলেশ্বরী নদী-তীরের নারীটি যে আঙিনাতেই থমকে থাকে, তার কারণ সদাগরি অফিসের কনিষ্ঠ অই কেরানির বেতন মাত্র পঁচিশ যা দিয়ে ঘর বাঁধা যায় না। কিন্তু আর্থসামাজিক এই ইঙ্গিতটুকু স্পষ্ট করেও যখন রবীন্দ্রনাথ বিরহবেদনাকে অনাদিকালের করে তোলেন, তখন আমাদের মন খারাপ হয়ে ওঠে। অথচ কৃশনের গল্পে সুধা যখন তার সিঁথি থেকে মুছে ফেলছিল সিঁদুর, পার্কের রেলিং-এ ঠুকে ভেঙে ফেলছিল শাঁখা এবং এইভাবে তার স্বপ্নের 'রাজকুমার'-কে ঘিরে যাবতীয় অরব আয়োজন বাতিল করে দিচ্ছিল, তখন যে আসলে সে একটা অর্থস্বার্থসর্বস্ব সমাজব্যবস্থার খানিকগুলো অমানবিক মূল্যবোধকে অনাবৃত করে দিতে চাইছিল, এ বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকে না আমাদের।

'চিনে পাখা' গল্পে প্রেমপ্রত্যাহত সবিতার হাত পাখায় চিনে ভাষায় লেখা ছিল নারীর একটি উক্তি ঃ ওগো আমার অচিন বন্ধু! আমি তোমার জন্যে কুয়ানটুঙের তুষারশিখরে উঠব। তোমার জন্যে প্রচণ্ড তুষারঝঞ্ঝাকে আমি তুচ্ছ করব। তোমার সঙ্গে আমি থাকব হিমশীতল উঁচুনিচু পাহাড়ে। খালি পায়ে হাঁটব আমি তার উপরে। আমার গর্ভে আমি টুঙের লাল ফুলকে লালন করব। কেননা আমি যে নারী আর নারীকে ভালোবাসতেই হয়। এ তো সেই নারীরই মর্মবাণী, গল্পে যার নাম সবিতা, যে ভালোবেসেছিল এক মানুষকে। তারো গর্ভে এসেছিল টুঙের ফুলের মত এক সুন্দর শিশু। কিন্তু অর্থের লোভে স্ত্রী ও পুত্রকে ফেলে সেই পুরুষ চলে যায় বিত্তবতী এক চিত্রাভিনেত্রীর কাছে। নারীসত্তার গভীরে কোথাও সে ক্ষত সারাক্ষণ দগদগ করতে

থাকে আর সে ক্ষতে সারাক্ষণ পুঁজ রক্ত জমতে থাকে। সে ক্ষত শুকোয় না কোনদিন। ভেঙ্গে পড়ে না তবু সবিতা। হোটেলে হোটেলে পরিচারিকার চাকরি নেয় সে। ওদিকে রুপোলিপর্দার সেই নারী ডুবে যায় বিত্তবহুল সমাজের ক্লেদে ও কর্দমে আর সেই পুরুষ সুরায় সঙ্গহীনতায়। ঘটনাচক্রে সবিতার সঙ্গে দেখা হয় তার স্বামীর। 'আপনি সুখে আছেন?' এই প্রশ্নেব উত্তরে তখন অই সীধুবিধুর ঃ 'বহুদিন আগে আমার সামনে প্রশ্ন উঠেছিল সুখ না ঐশ্বর্য। আমি ঐশ্বর্য চেয়েছিলাম। আজ তো আমার কোন অধিকার নেই অভিযোগ করার।' তীক্ষ্ণকণ্ঠে আচমকা সবিতা ঃ 'আপনি মানুষ না কি শুয়োর?' ক্রোধে ঘৃণায় বিবমিযায় ছুঁড়ে দেওয়া অই প্রশ্ন শুধু কি পুরুষটির মদেব গেলাশে কাঁপন তুলেছিল, নাকি সেই ঢেউয়ের অপসারী প্রবল ঝাপট পুরুষশাসিত সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে আছড়ে পড়ে তার অস্তিত্বকে অসার ঘোষণা করতে চেয়েছিল? কৃশন এখানেও স্পষ্টবাক। রবীন্দ্রভক্ত কৃশনেব তাই রবীন্দ্রনাথেব মত বিভ্রম ঘটে না ঃ 'তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে এ গলিটা (পড়ুন সমাজ) ঘোর মিছে (পড়ুন মায়া)/দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো।' আর সিন্ধু বারোয়াঁর তানই (পড়ুন প্রেম) কেবল সত্য। রবীন্দ্রনাথ যেটাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে চান, কৃশন সেটাকেই অসংগতির উৎস বলে চিহ্নিত করেন। জীবনে সিন্ধু বারোযাঁ তখনই সত্য হতে পারে যদি তার সত্য হয়ে ওঠাব পথে পথে ছড়ান পাথরগুলোকে অপসারিত করা যায়, এই উপলব্ধিতে এখন পৌঁছে গেছেন লেখক। কিন্তু এই উপলব্ধি কি তাঁর উচ্চারিত মানবতাবাদের প্রত্যয় থেকে ভিন্ন, অথবা অনুবন্ধী? আপাতত সেই জিজ্ঞাসায় প্রবেশ করব আমরা।

৬

নবজাগরণেব পুরোধাপুরুষ পেত্রার্ক তাঁর 'সৌভাগ্যের পথ' রচনায় বলেছিলেন মানবিক সাম্যের কথা ; মানবিক মর্যাদার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন এবং গুণ আর আচরণ দিয়ে মানবিক যোগ্যতা মাপার প্রয়োজনীয়তার কথা। রক্তেব রঙ সব সময় এক। তবু যদি কারু রক্তের রঙ কিছুটা হালকা হয়, তাতেই সে হল না কিছুমাত্র অভিজাতক, বরং সে হল অধিকতর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। সুকৃতিমান পুরুষ মহান হয়ে জন্মায় না, সুকৃতির ভেতর দিয়েই মহান হয়ে ওঠে সে। নীচ কুলে জন্ম বলেই কারু মর্যাদার হানি হয়না, জীবনই তাকে সেই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। মানুষ আর তার সামাজিক পরিবেশের ওপর দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করেছিল সেই মানবতাবাদ। তৎকালীন চিন্তানায়কদের লেখায় ছড়িয়ে পড়েছিল এই প্রত্যয় যে সুস্থ দেহ আর সবল মনের একজন মানুষ অলৌকিক সাধন করতে পারে, পালটে দিতে পারে তার জীবন, ছিনিয়ে আনতে পাবে যে কোন সৌভাগ্য। ধর্মীয় তপশ্চর্যাকে নাকচ করে, দৈহিক নিগ্রহ আর ঐহিক নিবৃত্তিকে উপহাস করে ইহলোকের সুখান্বেষণকেই বড় করে দেখিয়েছিলেন তাঁরা। মিরানদোলা যেমন ঈশ্বরের মুখ দিয়ে আদমকে বলেছিলেন ঃ পৃথিবীর মাঝখানে নির্দিষ্ট করেছি তোমার স্থান যাতে তার সবকিছু স্বচ্ছন্দে দেখতে পার তুমি। দিব্য বা পার্থিব করে তৈরি করিনি তোমাকে, করিনি মরণশীল অথবা অমর করেও, যাতে নিজেকে ইচ্ছেমতন গড়ার আর আপনাকে আপনি অতিক্রম করার স্বাধীনতা থাকে তোমার, পশুত্বের মধ্যে ডুব দিয়েও স্বর্গীয় স্বরূপে ভাস্বর হতে পার আবার। পশুরা মাতৃগর্ভ থেকে বহন করে আনে তাদের স্বভাব আচরণ বিশেষত্ব আর আজীবন সেটুকুই তাদের

আহরণ। কিন্তু উন্নত প্রাণীরা জন্মকালে অথবা তার অব্যবহিত পর থেকেই শুরু করে তাদের ক্রমাগত হয়ে-ওঠা। আদম, শুধু তোমাকেই অর্পণ করেছি স্বাধীন ইচ্ছা, বৃদ্ধি আর অনন্ত বিকাশ। হয়ত এ সব কথার গায়ে কোন কোন স্থানে ধর্মীয় আস্তর লেগে আছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ভাবাদর্শকে খণ্ডন করতে গিয়ে কিছু কিছু যাজকীয় পরিভাষার সাহায্য নিতে হয়েছিল তাঁদের, যদিও সে সব শব্দের ভেতরেও তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন নয়া জমানার নতুন ব্যঞ্জনা। উদীয়মান প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের এমনিতর কথাবার্তার সঙ্গে পঞ্চম পরিচ্ছেদে বর্ণিত জনগণের সামন্তবাদবিরোধী ভাবাদর্শের কিছু কিছু মিল দুর্লক্ষ্য নয়। আর এটাই স্বাভাবিক কেননা সামন্ততান্ত্রিক সম্বন্ধগুলোর বিরুদ্ধে, সামন্ত-যাজকীয় বিশ্বদৃষ্টির বিরুদ্ধে দু তরফেরই সংঘাত, কিছু দূর পর্যন্ত দু তরফের একই লক্ষ্য। তাদের ভেতর সুনির্দিষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দুই ভাবাদর্শই সাধারণ মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছে সামন্ততন্ত্রের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বন্ধন থেকে। বিকাশশীল ধনতন্ত্রের বড় দরকার ছিল অপরিচ্ছিন্ন লোকবলের, এমন লোক, যে কোন ব্যক্তিগত আনুগত্যে কোন রাজা বা ভূস্বামীদের কাছে বদ্ধ নয়। আইনের দৃষ্টিতে অন্তত সমান করে তুলতে হবে তাকে, ঝেড়ে ফেলতে হবে সামন্তবাদের সামাজিক শ্রেণীক্রম। ধনতন্ত্রের এই বিকাশের পিছনে রয়েছে উৎপাদিকা শক্তিগুলোর ত্বরিত উন্নতি, যে উন্নতির জন্যে আবার চাই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্রমান্বয় উন্নয়ন। এই সব পরিস্থিতিই নিরূপিত করে দিয়েছিল বুর্জোয়া মানবতাবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট। ধর্মীয় অভিভাবকতা থেকে মানবিক প্রমূল্যকে বাঁচাবার সংকল্পে তার মধ্যে নির্ভীকতার যে পরিচয় ছড়িয়ে ছিল, তার মধ্যে একই সঙ্গে দেখা গিয়েছিল অতিপ্রাকৃতকে উপড়ে ফেলার দুঃসাহস, মানুষের সৃজনক্ষমতায় অপরিসীম আস্থা, গরিমা আর বিচারবোধের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা, দেবতার জগৎকে ছোট করে মানুষের জগৎকে প্রসারিত করার জন্য দুর্বার আগ্রহ। যুদ্ধের প্রতি ধিক্কার তৎকালীন মানবতাবাদীদের এক সাধারণ লক্ষণ। উদাহরণস্বরূপ এরাসমুসের এই আবেদন ঃ যুদ্ধের বিরুদ্ধে সমবেত হও সবাই। কণ্ঠে তোমাদের ধ্বনিত হোক ধিক্কার। প্রচার ও কীর্ত্তন কর শান্তির। একান্তে ও সাধারণ্যে মহিমান্বিত কর তাকে। অভিজাতের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐক্য সমাবেশে চিনে নাও তোমাদের লুক্কায়িত বীর্য ও বিক্রম। গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষই প্রার্থনা করে শান্তির, ঘৃণা করে যুদ্ধকে। শুধু অল্প কিছু লোক চায় যুদ্ধ, অন্যের দুঃখের ওপর যাদের সমৃদ্ধির নির্ভর। সময়ের বিচারে এ এক জরুরি শ্লোগান। পিছনে একশো বছরের যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ, সামনে তিরিশ বছরের দুঃস্বপ্ন। প্রতিটি ভূস্বামীর প্রতিটি দুর্গই তখন আক্রমণের যুগপৎ উৎস ও অভিমুখ। সাধারণ মানুষের প্রাণ করের বাহুল্যে কর্মের অভাবে ওষ্ঠাগত। বিঘ্নিত যাবতীয় ব্যবসা ও বাণিজ্য। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থেই তখন তাই যুদ্ধবিরোধী জিগির। কিন্তু ইতিহাসের পরিহাস এই যে শতাব্দীর ব্যবধানে অই একই শ্রেণী হয়ে উঠবে যুদ্ধের প্রবক্তা। অস্ত্র হবে তাদের অন্যতম ব্যবসায়, মূলধনের স্বার্থে গড়ে তুলতে হবে যুদ্ধদলিত উপনিবেশ, রাজনৈতিক পরিভাষায় সাম্রাজ্যবাদী হবে তখন তাদের পরিচয়। রাষ্ট্রের অতিলৌকিক জন্মের ফানুশটাকে খারিজ করে দিয়েছিল উদীয়মান বুর্জোয়া তাত্ত্বিকের দল, কেননা সেই প্রতিষ্ঠান ছিল সামন্ত শাসকদের হাতে এমন এক প্রহরণ যা মানসিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত ব্যাহত করে তুলেছিল

বুর্জোয়াজির অভ্যুদয়। নতুন আদর্শে 'সাধারণের স্বার্থ' বলে একটা কথা থাকবে, কিন্তু সচেতন বা অচেতনভাবে তাতে প্রতিফলিত হবে বুর্জোয়া শ্রেণীরই অকৃত্রিম স্বার্থ। রাষ্ট্র যে কোন অনাদ্যন্ত প্রতিষ্ঠান নয়, ইতিহাসে এমন সমাজও যে ছিল, যেখানে রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন ছিল না, এমনকি সে বিষয়ে ধারণাও ছিল না কোন তাদের ; এবং অথবা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গেই যে রাষ্ট্রের অনিবার্য উত্থান এবং তার বিলোপের সঙ্গেই যে তার ক্রমশ অবধারিত বিলয়, নতুন আদর্শে এই সব কথা থাকবে একান্তভাবেই অনুপস্থিত। হবসের মতন কোন মানুষ হয়ত বলবেন ঃ অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, পৃথিবীতে আইন অবতীর্ণ হয়েছিল বিশেষ কিছু মানুষের প্রকৃতিগত স্বেচ্ছাচারিতাকে সংযত করার জন্যে, এমনভাবে যাতে তারা কাউকে আঘাত না করে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে এবং সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। হবস-এর এই উক্তিতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উচ্ছ্বাস হিংসা আর প্রবল স্বেচ্ছাচারের হাত থেকে ব্যক্তির বৈধ অধিকারগুলোর সংরক্ষণের অভিপ্রায় ফুটে ওঠে। কিন্তু যে আইনের কথা বলেন তিনি, তাও কি নয় এই উঠতি শ্রেণী তথা বুর্জোয়া শ্রেণীরই বস্তুগত অবস্থা থেকে উঠে আসা আর শ্রেণী স্বার্থ দিয়ে মোড়া কিছু বিধির সমাহার? অধিসৌধের অংশ স্বরূপ সেই আইন কি নয় বিশেষ এই সমাজের কর্তৃত্বশীল উৎপাদন সম্পর্কের দ্বারা নিরূপিত, এবং বিপরীতক্রমে যা এই উৎপাদন সম্পর্ক আর তার ওপর প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ককে দেয় কায়া, কলেবর ও অনুমোদন? দাস সামন্ত আর বুর্জোয়া আইনের সাধারণ চরিত্রই কি নয় মালিক আর অধস্তনের সম্পর্ক তথা ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর স্থাপিত সম্পর্ককে মজবুত করা? দাসযুগের আর সামন্তযুগের আইন খোলাখুলিভাবেই চাপিয়ে দিয়েছিল বহুর ওপর অল্পের আধিপত্য, বেঁধে দিয়েছিল প্রভুত্বশীল শ্রেণীর অধিকারভোগী অবস্থান। বুর্জোয়া আইন কপট ঃ শ্রমজীবী শ্রেণীর জন্যে তার শুধু বাহ্যিক অধিকার, প্রকৃত অধিকার পুঁজিপতির। বুর্জোয়াজি একদিন যে আইন প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা সম্পূর্ণভাবে তাকে পরিত্যাগ করে আশ্রয় নেয় দমন পীড়নের বিবিধ বিধিবর্হির্ভূত পদ্ধতির। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রচলিত আইনকানুনের ওপর একটা প্রভাব রেখে যায় শ্রেণীসংগ্রাম। তবু এইভাবে শাসক শ্রেণীর কাছ থেকে যে সামান্য সুবিধা আদায় করে অধস্তন মানুষ তাতে অবশ্যই আইনের শ্রেণীসম্পৃক্ত চরিত্র পালটে যায় না একটুও।

তবু বুর্জোয়া মানবতাদের আলোচনায় অষ্টাদশ শতকের ফরাসি জ্ঞানালোকবাদীদের অনুল্লেখ অপরাধ হবে। ফ্রাঁসের মত য়ুরোপের আর কোথাও অমন তীব্রভাবে দেখা যায়নি সামন্তবাদের সঙ্গে পুঁজিবাদের লড়াই, অমন প্রখর অনমনীয় আর অবিচল। সামন্ত-যাজকীয় যে-সমাজব্যবস্থা গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষকে ন্যুব্জ করে রেখেছিল তার বিরুদ্ধে সেই লড়াই ছিল সর্বাত্মক—একাধারে নান্দনিক, দার্শনিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক। মনীষী রুশো বলেছিলেন মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন, কিন্তু সর্বত্রই তার শৃঙ্খল। দিদেরোর কণ্ঠে তাই সেই মানুষকে আপন স্থানটিকে শনাক্ত করে নেয়ার ডাক ঃ আমরা যেন বিস্মৃত না হই যে, চিন্তা ও অনুধ্যানে সক্ষম একমাত্র যে জীব সেই মানুষকে যদি পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ঝেঁটিয়ে ফেলা হয়, তাহলে বিষাদ ও স্তব্ধতায় পর্যবসিত হবে আমাদের সমস্ত সমুজ্জ্বল আর অনুপ্রাণক ভূদৃশ্য। তাহলে

কেনই বা না আমাদের এই কর্মকাণ্ডে (বিশ্বকোষে) ওর জন্য ধার্য করব না একটি ঠাঁই, যা হবে মহাবিশ্বে সে যে স্থান অধিকার করে আছে তারই সমানুপাতী? সাধারণ কেন্দ্র করে তোল না কেন তাকে সব কিছুর? মানুষই সেই অনন্য বিন্দু যেখান থেকে সমস্ত কিছুর নিঃসরণ আর যেখানে সব কিছুর প্রত্যাবর্তন। কিন্তু জ্ঞানালোকবাদীর এই মানবতাবাদও ছিল সঙ্কীর্ণ। স্বার্থবাদ থেকে তাঁরা নিষ্কাশিত করতে চেয়েছিলেন সদাচার, আত্মপ্রেমকে করেছিলেন নব্য নৈতিকতার প্রস্থান বিন্দু। পরহিতব্রত আর আত্মোৎসর্গ তাঁদের কাছে ছিল ভিত্তিহীন প্রত্যয়। ব্যষ্টিস্বার্থ আর সমষ্টিস্বার্থের সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে কোন না কোনভাবে তাঁরা ব্যক্তিস্বার্থের ওপরই আরোপ করেছিলেন তাঁদের স্বাভাবিক ঝোঁক।

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ধ্বনি দিয়ে শুরু হয়েছিল সেই মানবিকতাবাদ। মানুষের স্বাভাবিক সত্তাকে স্বাধীনভাবে বিকশিত করার অধিকারও ঘোষণা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু বুর্জোয়া মানবতাবাদের সুন্দরতম অভিব্যক্তিও মানবিক আদর্শকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদেব ওপব স্থাপন না করে প্রকাশিত হতে পারে না। গনতান্ত্রিক সমাজে মানবতাবাদের ধ্বনি আর তার রূপায়ণের ভেতর যে দ্বন্দ্ব তার সমাধানে বুর্জোয়াজি বস্তুত অক্ষম। পুঁজি যত পুঞ্জিত হয়েছে, ততই বেড়েছে শোষণ, সৃষ্টি হয়েছে অধিকারচ্যুতের দল, যারা মজুরি শ্রমের ফাঁসে আটকে গিয়ে বাধ্য হয়েছে অনশনে অর্ধাশনে দিনযাপনে। তাই শুরু থেকেই বুর্জোয়া মানবতাবাদীদের ভেতর আরো একটা ধারা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যাঁরা বলেছিলেন শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের কথা। সমাজের মানবতাবিরোধী চরিত্রের দিকটা উদঘাটিত করে তাঁরা তার দোষত্রুটি কদাচারকে আক্রমণ করেছিলেন, দাবি করেছিলেন সম্পদে সমানাধিকারের কথা। যেমন এক 'সৌরনগরী'-র কথা কল্পনা করে কাম্পানেল্লা লিখেছিলেন ঃ সমস্ত ধনী আর নির্ধনে গড়া সেই সমাজ। তারা ধনী কেননা তারা চায় না কিছুই, নির্ধন কেননা তাদের নেই কিছুই। ফলত তারা পরিস্থিতির দাস নয়, বরং পরিস্থিতিই তাদের সেবাদাস। কাম্পানেল্লার সেই কল্পসমাজে সবাই কাজ করে, বলা যায় সেখানে কর্মেরই উপাসনা। সেই সমাজের সদস্যেরা দীর্ঘদিন ভুলে গেছে কখন মানুষেরা তাদের ব্যক্তিগত গুণাবলীর জন্য নয়, উচ্চ বংশোদ্ভূত বলে সম্মানিত হয়েছে। সেখানে তারা তাঁকেই মহত্তর, অধিকতর কীর্তিমান বলে মনে করে যিনি নিজেকে অনেকানেক শিল্পের সাধনায় মগ্ন রেখেছেন এবং জানেন সেই সব শিল্পের সমুচিত ও সুনিপুণ ব্যবহার। কায়িক ও মানসিক শ্রমের সুষম সমন্বয়ের কথাও উত্থাপন করেন কাম্পানেল্লা। সৌরনগরীতে প্রতিটি অধিবাসীই উভয়প্রকার শ্রমে অভ্যস্ত এবং এই বৈচিত্রেই তাদের কাজ হয়ে ওঠে সানন্দ ও সুখকর। সামাজিক সম্পর্কের রূপান্তর প্রতিটি মানুষের নৈতিক স্বভাবে এক জোরালো পরিবর্তন আনে। সেখানে নেই অপরাধের কোন জননসত্র। আলস্য, মিথ্যাচার, জাতিগত ধর্মগত অসহিষ্ণুতার কোনরকম শরিক নয় সেই সৌর নাগরিকের দল। কাম্পানেল্লার এই মানবতাবাদ ছিল সুদূর ভবিষ্যতের এক সাহসী অথচ অপ্রাপণীয় স্বপ্ন। তবু স্বপ্নই, কেননা সমাজ বিকাশের বস্তুগত সূত্রাবলী তাঁর, শুধু তাঁর কেন, অন্যান্য ইউটোপিয় সাম্যবাদীদেরও কাছে ছিল একান্ত অজ্ঞাত, ফলত তাঁদের মানবতাবাদের আদর্শও ছিল অবৈজ্ঞানিক ও খণ্ডিত।

তাহলে কোন মানবতাবাদের কথা বলেছিলেন কৃশন?

৭

অর্থনৈতিক রাজনৈতিক আধ্যাত্মিক নিপীড়ণের হাত থেকে শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষের মুক্তির সুনিশ্চিত শর্ত হল ধনতন্ত্রের ধ্বংস। শত্রুর বিরুদ্ধে নিপীড়িতের জ্বলদর্চি ঘৃণা ছাড়া সম্ভব নয় এই কাজ। এঙ্গেলস বলেছিলেন ঃ ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াজির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা আর অবিচ্ছেদ দ্রোহে উদ্বেলিত থেকেই কেবল শ্রমিকশ্রেণী তার মনুষ্যত্বের বোধকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। ততক্ষণই তারা মানুষ যতক্ষণ শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ বহ্নিমান। লেনিনও কঠোর সমালোচনা করেছিলেন তাঁদের যাঁরা শত্রুর প্রতি প্রলেতারিয়েতের সুতীব্র শ্রেণীঘৃণাকে নিভিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের ভেতর 'প্রেম' ও 'সৌভ্রাত্রে'র বুর্জোয়া এবং পাতিবুর্জোয়াসুলভ মানবতাবাদী ভাবধারা ছড়িয়ে শ্রমজীবী মানুষের মনকে বিষিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বুর্জোয়া মানবতার শাঠ্যকে উদ্ঘাটন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন কী ভয়ঙ্কর সামাজিক ক্ষতিই না সাধন করেছেন উদারগণতন্ত্রী ফিলিস্তিনের দল যাঁরা স্বয়ং বুর্জোয়া মানবতার মাদকে প্রভাবিত হয়ে শোষকের প্রতি ঘৃণা উদ্রিক্ত করার পরিবর্তে জনগণকে সংক্রামিত করতে চেয়েছেন ভক্তি ও দাস্যের বিষবাষ্পে। এ প্রসঙ্গে পাঠকের স্মরণে আসতে পারে তাঁর তলস্তয়ের তীক্ষ্ণ সমালোচনা, বিশেষত তলস্তয়ের অহিংসা, সত্যাগ্রহ, নৈতিক আত্মশুদ্ধি আর 'বিশ্বজনীন ভালোবাসা'র কথা, যা লেনিন আখ্যাত করেছিলেন অবৈজ্ঞানিক এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের পক্ষে চূড়ান্ত ক্ষতিকারক বলে।

লেনিন ছিলেন রাজনীতিক ও বিপ্লবী, তলস্তয় সাহিত্যিক। তাই অই সমালোচনা একজন উদারনৈতিক ভূস্বামিক সাহিত্যিকের প্রতি একজন বিপ্লবী রাজনীতিকের। কিন্তু রাজনীতিক যদি হন অহিংসা আর আত্মশুদ্ধির প্রচারক, আর সাহিত্যিক শ্রমজীবী শ্রেণীর আদর্শের রূপকার, তাহলে শেষোক্তের হাতে কীভাবে চিত্রিত হতে পারে নৈতিক আত্মশুদ্ধির রাজনীতিক, তার একটা সকৌতুক ছবি ধরা আছে কৃশনের 'মূর্তি জেগে উঠেছে' গল্পে। যাদু বাস্তবতার আঙ্গিকে লেখা এই রচনায় আনা হয়েছে তিলক গোখেল নৌরজি আর গাঁধি—জাতীয় কংগ্রেসের এই চার নেতাকে। স্বাধীন ভারতে মূর্তি হয়ে মুম্বই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছেন তাঁরা। প্রতি ঘোর অমাবস্যায়, যখন চারদিকে গভীর অন্ধকার সেই সময় মূর্তি জেগে ওঠে। তখন যদি কেউ ডাকে এবং কিছু জিগগেশ করে তবে তাঁরা উত্তর দেন।

'স্বতন্ত্রতা আমাদের জন্মগত অধিকার' তিলকের দেয়া এই শ্লোগানে উত্তমরাও খাণ্ডেকার নামে এক যুবক শিক্ষক উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ইতিহাস পড়াতেন তিনি। একদিন ক্লাসে সিপাহী বিদ্রোহকে স্বাধীনতা আন্দোলন বলায় চাকরি খোয়াতে হয় তাঁকে। সরকারের আক্রোশ প্রবল ছিল বলে কোন জায়গাতেই আর কিছু সংস্থান হয় না তাঁর। বাচ্চারা খিদের জ্বালায় মারা যায়। প্যাটেলদের প্ররোচনায় বাপের বাড়ির গ্রামেও ঠাঁই হয় না স্ত্রীর। অবশেষে বেশ্যাবৃত্তির বদলে নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করতে হয় তাঁকে। উত্তমরাও কৃষকদের খাজনা বন্ধের আন্দোলনে শামিল হন। সেই আন্দোলনে বিশটি গুলির ক্ষতচিহ্ন নিয়ে একদিন মৃত্যু হয় তাঁর। পট্টভি সীতারামৈয়ার কংগ্রেসের ইতিহাসে তাঁর স্থান হয় না। গ্রামের মানুষ, পুনের মানুষ, মহারাষ্ট্রের মানুষও

মন থেকে মুছে ফেলে তাঁকে। এক অমাবস্যার রাতে দীক্ষিত আসেন তাঁর দীক্ষাগুরুর কাছে। যে মানুষের ইতিহাসে জায়গা নেই, মানুষের হৃদয়ে নেই, তাঁর ছায়ামূর্তি মূর্তিকে শুধোয় ঃ তবে আমার জায়গা কোথায়? গুরু কোন সদুত্তর দিতে পারেন না। অন্য কোথাও মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পরামর্শ দিয়ে আপাতত দীক্ষিতের হাত থেকে নিষ্কৃতি আদায় করেন তিলক।

এমনিভাবে অমাবস্যার রাতে কর্তার সিং সারাভা গিয়েছিলেন ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের মেম্বার গোখেল মহারাজের মূর্তির কাছে। এই আইনসভার প্রবক্তারাই ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন সারাভার, গোখেল তখন কাউন্সিলের কর্মকর্তা। দেশকে স্বাধীন করার সংকল্পে সারাভা গিয়েছেন জেলে, অংশ নিয়েছেন ভুখ হরতালে, ঘুরেছেন কলকাতা থেকে মেরঠ এবং অমৃতসরের সেনাবাহিনীর ছাউনিতে, যাতে তাদের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত করা যায়। সেই অপরাধে ফাঁসি হয় সারাভার। গোখেল তাঁকে শুধোন ঃ তুমি এখন কী চাও? জবাবে সারাভা ঃ আমাকে অই চবুতরে দাঁড়াবার একটু জায়গা দাও। অই চবুতবে দাঁড়াবার অধিকার আমারো আছে। বন্ধু, দেশের জন্যে আমি ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে ভাষণ দিইনি সত্যি, কিন্তু মৃত্যুর দড়ি গলায় পরেছি। আমি এখন খুব ক্লান্ত, আমাকে সামান্য একটু জায়গা দাও। প্রত্যুত্তরে গোখেল ঃ তোমাকে আমার পাশে জায়গা দিতে পারিনা, কেননা আমি অহিংসার পূজারী আর তুমি হিংসার।

একই অমাবস্যায় নৌরজির মূর্তির পাদদেশে দেখা যায় আমালনের এক মিল মজদুরকে। তাঁর তিনটি সন্তান স্ত্রী আর বুড়ো বাপ মা, যাঁরা এখন দিন কাটাচ্ছেন অনশনে, কেননা তাঁদের ভরণপোষনের ভার যাঁর ওপর স্বাধীনতার পর প্রথম গুলিটি তাঁর মাথায়। রক্তাক্ত শরীরে সেই শ্রমিক এসে দাঁড়াতে চান তাঁর ছত্রছায়ায় ঃ দাদাভাই, আমি সব সময় কংগ্রেসকে চাঁদা দিয়ে এসেছি, আর স্বাধীনতার জন্যে হরতাল করেছি। বিনিময়ে স্বাধীন সরকারের কাছ থেকে পেয়েছি এই গুলি। আপনি তো পার্লামেন্টে বাঘের মত গর্জন করতেন, এখন আপনি কেন চুপ করে আছেন, বলুন, আমার মাথার এই রক্ত কি কোন দিন বন্ধ হবে না? 'হিন্দুস্থানের জাতীয়তাবাদের বৃক্ষরোপনকারী' নৌরজির এ প্রশ্নের উত্তর অজানা। শ্রমিকটির অবস্থা শুনে লেখকের চোখ জলে ভরে আসে। তিনি কাঁদতে কাঁদতে এসে দাঁড়ান এ. আই. সি. সি-র প্যাণ্ডেলের সামনে— যেখানে গাঁধির মূর্তি ছিল সেখানে। তখন অধিবেশন শেষ। মেরাপ খোলার কাজ চলছে। লেখক মূর্তির কাছে এগিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন ঃ বাপুজি দেখ, তোমার রাম রাজ্যে কী অত্যাচার চলছে। লেংটি-পরা বাপু। আমি তোমাকে দেখাচ্ছি তোমার পূজারীরা তোমার নামে কী করছে। কিন্তু বাপুজি কোন উত্তর দেন না। সেদিন তাঁর মৌনব্রত বলে নয়, গল্পের কাল অনুযায়ী, তখন অমাবস্যার রাত্রি শেষ হয়ে আসছে, আর ভোর হয়ে গেলে মূর্তিরা কথা কয় না। তখন একজন মজুর লেখককে বলেন ঃ চবুতরার কাছ থেকে সরে যাও, এই মূর্তিকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে। লেখক ঃ কোথায়? লোকটি ঃ এক মিল মালিক এটা কিনে নিয়েছে, মূর্তি আজ তার ঘরে উঠে যাবে।

ইংরেজ শাসনের পর্যায়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা বহুবার উঠে এসেছেন কৃশনের রচনায়। ৪৭-এর পরেও অই সব নেতারা দেখা দিয়েছেন কখনো

স্বনামে কখনো বেনামে। সাম্রাজ্যবাদ অথবা দেশিয় পুঁজিবাদের সেবাদাস হিশেবে তাঁদের জনবিরোধী ভূমিকাকে স্পষ্ট রেখায় চিনিয়ে দিতে একটুও ভুল হয়নি কৃশনের। গাঁধির অহিংসা, সত্যাগ্রহ, স্বরাজ ইত্যাদি প্রত্যয়গুলো বিভিন্ন আন্দোলনের পটভূমিকায় স্থাপিত করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি দিয়ে উদঘাটিত করেছেন তাঁদের শ্রেণীচরিত্র। এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টান্তমূলক গল্প ঃ 'বাপুজি ফিরে এলেন'। স্বর্গ থেকে স্টেশন ওয়াগনে করে গাঁধি এসেছেন তাঁর সাধের দেশভূমি দেখে যেতে। সালেন জেলে তখন ২১ জন কম্যুনিস্ট বন্দীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, ত্রিবান্দ্রামের স্লটার হাউস নিয়েছেন একজন কংগ্রেসি ঠিকেদার, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যদি কালোবাজারিতে লুকিয়ে থাকে তবে খদ্দর ঢেকে রেখেছে কালোবাজারিকে। কাশ্মির হয়ে উঠেছে ভারত আর পাকিস্তানের মল্লভূমি। লেখক বাপুজিকে নিয়ে যান রাষ্ট্রপতির আবাসে, সংসদ ভবনে, মুম্বইয়ের কোলিবাড়া ক্যাম্পে, চম্পারণে, আমেদাবাদের সুতো কলে, কুড়প্পার শান্তি মিছিলে। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আলাপ হয় জাতির জনকের। তাঁদের একজন বাপুজিকে বলেন ঃ আপনার অহিংসা তো দু টুকরো জমিনের মাঝখানের সীমারেখা। অর্থাৎ ইংরেজের বিরুদ্ধে অহিংসা সংগ্রাম আর মুম্বইয়ের শ্রমিকদের ওপর গুলি। হিন্দি বা হিন্দুস্তানি মাঝখানের আল ছিল না তো, কী ছিল? খিলাফত আর গোসেবা, মসজিদ মন্দির ঐক্য, পুনে অ্যাওয়ার্ড, আরুইন প্যাক্ট, মাউন্টব্যাটন ঘোষণা—যেন নয়া স্বাধীনতার সমস্ত কাঠামোর ভিত্তিই এই মাঝের আলের ওপর তৈরি করা হয়েছে। মাঝের এই আলের কল্যাণে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘরবাড়ি লুঠ হয়েছে, লক্ষ লক্ষ শিশু অনাথ হয়েছে, গুলি চলেছে এক দুই তিন অহিংসার বুক লক্ষ্য করে। স্বরাজ সম্বন্ধে চম্পারনের ঝব্বু জানায় ঃ নিজের রাজ তো নিশ্চয়ই, কিন্তু জমি নিজের নয়। জমি তো অই জমিদারের, আর তার অত্যাচার একইভাবে চলেছে। তার ওপর সরকার আছে ; সরকারও ঠিক তেমনি, যেমন স্বাধীনতার আগে ছিল। কেবল টুপি বদলেছে, আর কিছুই বদলায়নি। আগে ইংরেজি টুপি ছিল আর এখন গাঁধি টুপি। লেনিন এক জায়গায় বলেছেন, যখন সমগ্র পুরোন সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটেছে, যখন সেই পুরোন সমাজব্যবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত জনসাধারণ—যারা মাতৃদুগ্ধের সঙ্গেই সেই সমাজের বিশ্বাস ঐতিহ্য অভ্যাস নীতি সব কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে—তারা যখন জানেনা এবং জানতে পারে না যে, যে সমাজব্যবস্থা 'জন্মগ্রহণ করছে' তার স্বরূপ কী, কোন কোন সামাজিক শক্তির ফলে এটা গড়ে উঠছে এবং 'ভাঙা গড়ার' সময়ে স্বভাবতই যে সব অসংখ্য আর অতি শোচনীয় দুঃখ দারিদ্র দেখা দেয় তা থেকে মুক্তি আনতে 'ঠিক কোন কোন সামাজিক শক্তি সক্ষম'—তখনই অনিবার্যভাবে আত্মপ্রকাশ করে সত্যাগ্রহের (প্রতিরোধ না করার) মতবাদ—এই মতবাদ তখন লোকের মনে সাড়া জাগায়। গাঁধির সত্যাগ্রহও প্রথমে ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে আরম্ভ হলেও শেষ পর্যন্ত তা ভারতের বৈপ্লবিক গণসংগ্রামের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছিল। ভারতের জাতীয় সংগ্রাম যাতে বৈপ্লবিক সংগ্রামে পরিণত হতে না পারে তারই জন্যে উদ্ভাবিত হয়েছিল সত্যাগ্রহের কলাকৌশল। ১৯১৯-২২ সালের জাতীয় সংগ্রামের মধ্যে তার চিহ্নগুলি ঐতিহাসিক হয়ে আছে। সায়সুন মিলের কামাল যখন গল্পের গাঁধির মুখের ওপর বলেন, এ স্বরাজ পুঁজিপতিদের সমাজ, যদি কারু অধিকারে একটা

গোটা কারখানা থাকে, আর আমার অধিকারে শুধু একটা ঝুপড়ি, যদি কারু অধিকারে য়ুরোপের ঐশ্বর্য থাকে আর আমার অধিকারে চা খাবারও পয়সা না থাকে, যদি কারু সন্তানের বিদেশে শিক্ষা প্রাপ্তির অধিকার থাকে, আর আমার সন্তানের চার অক্ষর পড়ারও অধিকার না থাকে, তবে অন্যের অধিকার আমি অবশ্যই ছিনিয়ে নেব ; অথবা বোনাসের আন্দোলন থেকে সরে এসে অই শ্রমিক যখন বলেন, বোনাস চাই না, চাই নিজেদের রাষ্ট্র ; সমস্ত কলকারখানা আমরা চালাব, সমস্ত খেত খামার আমরা নিজেরাই চাষ করব, সমস্ত মেহনত আমরা নিজেরাই করব, আর সমস্ত ফল আমরাই ভোগ করব, তখন 'নৈতিক আত্মশুদ্ধির' পুরোহিতের মুখে শোনা যায় ঃ তুমি অন্যের অধিকার কেড়ে নিতে চাইছ। বস্তুত গল্পের এই একটি মাত্র বাক্যেই গাঁধিবাদের সারাৎসার লেখা হয়ে যায়। পাঠকের জানা হয়ে যায় যে, উৎপাদন সম্পর্কের কোন প্রকার পরিবর্তনেরই ঘোর বিরোধী এই দর্শন।

কিন্তু যে শ্রেণীঘৃণার কথা দিয়ে অধ্যায়ের সূচনা করেছিলাম সেখানেই ফিরে যাই আবার। 'দু ফার্লং লম্বা সড়কের' দিশাহীন নিহিলিস্টিক ক্রোধের চড়াই পার হয়ে আসার পর কৃশনের গল্পে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। সে মাত্রা শ্রেণী সচেতনতার। 'বিশ্বজনীন ভালোবাসা' নয়, সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের প্রতি ভালোবাসায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে তাঁর রচনা। সমস্ত রকম শোষণ আর দাসত্ব থেকে মুক্তির বাসনা জাগিয়ে দিতে হবে নিপীড়িত মানুষের মনে, একই সঙ্গে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে তীব্রতম শ্রেণীঘৃণায়, এই হয়ে ওঠে তাঁর সারস্বত সাধনা। সেখানে মানবতা মানে করুণা নয়, অনুকম্পা নয়, কেননা এই সব শব্দে সমাজের শ্রেণীক্রমের কথাটাই মুখ্য হয়ে থাকে, ইতিহাস যাঁদের হাতে নির্মিত হতে থাকে করুণার পাত্র করে তাঁদেরই ঠেলা দেয়া হয় অন্তরালে। মানুষের ভেতর কোথাও রয়ে গেছে আদি পাপের স্বাক্ষর, অথবা সহজাত স্বার্থপরতার দুর্মর প্রবৃত্তি—এই সব যাজকীয় মন্ত্রণাও শতাব্দীর পর শতাব্দী শ্রেণীসংগ্রাম থেকে ছিটকে দিয়েছে মেহনতি মানুষকে, তাদের মুমুক্ষাকে বলেছে নিষ্ফল, উপায়কে বলেছে অপ্রাপ্য। সুতরাং এই সব ক্ষতিকারক ধারণাগুলো থেকেও শ্রমজীবী মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে নিরন্তর, কেননা তার নিজের মুক্তির পথ সঠিকভাবে খনন করে নিতে না পারলে মানবিক সত্তার স্রোতস্বিনী উৎসারিত হবে না কিছুতে। স্বীকার্য, শ্রেণীঘৃণা কোন অনড় উৎকেন্দ্র লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না কখনোই, কিন্তু যতদিন মেহনতি মানুষ তার মুক্তির জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে, ততদিন শ্রেণীঘৃণাও জৈবিক অভিব্যক্তির মত তার সত্তার ভেতর থাকবে স্বতশ্চল। কৃশনের 'সবচেয়ে বড় পাপ' গল্পে এই ঘৃণারই লাভানল গড়িয়ে আসতে দেখি সহস্র ধারায়।

সকালবেলার কাগজে মোটা হরফের হেডলাইনে চোখ পড়তেই মনটা বিষণ্ন হয়ে যায় অধ্যাপক শঙ্করের। স্ত্রীকে কথা দিয়েছিলেন, সেদিন ছেলেমেয়েদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসবেন চৌপাটির সৈকতে। কথা রাখতেই বেরিয়ে পড়তে হল তাঁকে। তবু প্রমোদ ভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে মারোয়াঁর আলাপের মতন সংবাদপত্রের সেই হেডলাইন তাঁকে বিস্রস্ত করে দিতে লাগল বারবার। কিন্তু কী সেই খবর, যার সঙ্গে আদৌ অন্বিত নন তিনি অথচ য়া তাঁর পারিবারিক সুখের মুহূর্তগুলিকে বিবর্ণ করে তুলছিল অজান্তে? সেটা ছিল এথেল আর জুলিয়াস রোজেনবার্গের ফাঁসির খবর। পরমাণু শক্তি সম্পর্কিত তথ্য চুরি করে সোভিয়েত রাশিয়ায় পাচার করার মিথ্যে অভিযোগে ১৯৫৩ সালের

১৬ই জুন ফাঁসি হয় অই দম্পতির। অভিযোগের প্রারম্ভে সরকারি উকিল অপরাধকে প্রমাণিত করার জন্যে ১১৩টি সাক্ষীর নাম আদালতে পেশ করেন। পরে অবশ্য এই সাক্ষীদের কাউকেই আদালতে পেশ করা হয়নি। প্রকৃত সত্য এই ১৯৪৭ সালের আমেরিকার শক্তি কমিশনের রিপোর্ট থেকেই জানা যায় যে, সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৪০ সালেই পরমাণু বোমা তৈরির গুপ্ত রহস্য ভেদ করেছিল। তাহলে ১৯৪০ সালেই যে রহস্য আর গুপ্ত ছিল না, সেই রহস্য ১৯৫০ সালে ফাঁস করার মিথ্যে অভিযোগে দু-জন নিরপরাধ মানুষকে মৃত্যু দণ্ড দেয়া হল। কিন্তু ফাঁসি কি শুধু অপরাধীদেরই দেয়া হয়? না, কখনো কখনো নিরীহ মানুষকেও ফাঁসির মঞ্চে তুলে দেযা হয়। কিন্তু কেন? কৃশন লিখছেন ঃ (সাম্রাজ্যবাদ) কখনো বা কোরিয়ায় যুদ্ধ শুরু করে দেয়, আর লক্ষ লক্ষ আমেরিকান যুবককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। কখনো বা হিরোশিমার ওপর বোমা নিক্ষেপ করে, আর সারা দুনিয়ার সামনে গলা ফাটিয়ে নিজের পরমাণু শক্তির এবং বোমার ঠিকেদারির কথা ঘোষণা করে। কিন্তু যখন অত্যাচার প্রতিরোধ করা হয় এবং অন্য দেশের বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের নিজস্ব শক্তি আর মেধার সাহায্যে প্রকৃতির রহস্যকে উদঘাটিত করেন, তখন কারু ওপর ক্রোধ হওয়া তো স্বাভাবিক। তখন কাউকে বলির পাঁঠা বানানো হয়, নিরপরাধ ভালো মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হয়। জনসাধারণের মনে বিদেশি গুপ্তচরের ভয় সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তাই এথেল আর জুলিয়াস রোজেনবার্গের মৃত্যু একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে। ফাঁসির কয়েক ঘন্টা আগেও সরকারের তরফে বলা হয়েছিল তাঁরা যদি নিজেদের গুপ্তচর বলে স্বীকার করে নেন তবে মৃত্যুদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে। উত্তরে দম্পতি বলেছিলেন ঃ আমরা নিরপরাধ, এ কথা ঘোষণা করে বলছি, আমরা সমাজে সম্মান এবং মর্যাদার সঙ্গে ফিরে যাবার অধিকার চাই। আমরা মুক্ত হয়ে এই সমাজে এমন এক দুনিয়া নির্মাণ করতে চাই যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য স্বাধীনতা, রুটি এবং গোলাপফুল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা রুটি আর গোলাপের চিন্তা আপত্তিকর। তাই রোজেনবার্গ দম্পতিকে মৃত্যুবরণ করতে হয়, যেভাবে শাসক প্রভুদের হাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন যিশু, যিশুর আগেও আরো অনেক যিশু, আর পরেও এক না এক যিশু। শঙ্করের মুখে রোজেনবার্গদের গল্প শুনে ছেলেমেয়েরা ঘন হয়ে আসে বাবার কাছে। তারা বলে, ওঁদের অনাথ শিশু সন্তানদের তাদের কাছে নিয়ে আসতে। ওরা তাহলে ওদের ইশকুলে নিয়ে যাবে, এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনতে শিখিয়ে দেবে, দিয়ে দেবে সাধের চাকু, পরিদের নতুন গল্পের বই। এইভাবে যখন নিষ্পাপ ভালোবাসায় মিশে যেতে চায় দুটো ভিন্ন দেশের পবিত্র শৈশব, তখন গল্পের ভাব ও ভাষার দুই তট ভেঙ্গে আছড়ে পড়ে ঘৃণার উপর্যুপরি লহর ঃ নিউইয়র্ক, শিকাগো, সানফ্রানসিসকোর মুনাফাবাজরা শোন। আজ শঙ্করের ছেলে রঞ্জন রোজেনবার্গের ছেলে রোবির ভাই। আজ সারা দুনিয়ার শিশুরা তোমাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে। ওয়াল স্ট্রিটের ব্রোকার, তোমরা কি দশ পর্যন্ত গুনতে পার? দশ পর্যন্ত, শ পর্যন্ত, লাখ পর্যন্ত? তবে গোন; লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি শিশু আজকে রাত্রে তোমাদের থেকে নিজেদের পৃথক করে রোজেনবার্গের ছেলেদের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। তোমরা কত জায়গায় তোমাদের শূল পুঁতবে? কত মানুষকে তোমরা তোমাদের বৈদ্যুতিক ফাঁসিতে মৃত্যু দেবে? মূর্খ তোমরা। পোপ যদি পৃথিবীর ঘোরাকে

রুখতে না পারে তবে তোমরা কী করে শান্তি আন্দোলনকে রুখবে? কোপার্নিক এবং ব্রুনো, সাক্কো এবং ভাঞ্জেত্তি, এথেল এবং জুলিয়াস, রোবি এবং রঞ্জন, গুণে যাও। কিন্তু তোমরা কত গুণবে? এ মানব সন্তান—স্পেনের ইনকুইজিশন থেকে বৈদ্যুতিক ফাঁসি—মানব সন্তানকে আজ পর্যন্ত কে রুখতে পেরেছে? শ্রেণীঘৃণার কথা বলতে গিয়ে একটা জরুরি বিষয় বিস্মৃত হওয়া বোধ করি উচিত হবে না আমাদের, তা হল ঘৃণার চারিত্র। গণতন্ত্র ও প্রগতির প্রতি যে ঘৃণা সাম্রাজ্যবাদী গোমায়ুর, যে ঘৃণা তার জনসাধারণ ও প্রগতিশীল মানবসমাজের প্রতি, তার সঙ্গে বিস্তর ফারাক সেই ঘৃণার, যে ঘৃণা দাসত্ব ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের। শেষোক্তের ঘৃণা স্বাধীনতা ও কল্যাণের জন্য, ইতিহাসে তার প্রকৃত ভূমিকা উৎকীর্ণ করার জন্য, আপন শ্রেণীর প্রতি ভালোবাসা আর প্রকৃত ভূমিকা উৎকীর্ণ করার জন্য, আপন শ্রেণীর প্রতি ভালোবাসা আর প্রকৃত মানবতাবাদের পথকে প্রশস্ত করার জন্য ; সে ঘৃণা কেবল ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্যায় জুড়েই জরুরি ও অর্থময়।

৮

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইমারত' বলে একটি গল্প আছে। রাজমিস্ত্রি জনাব আলি সে গল্পের নায়ক। সারা জীবন মানুষটি গড়েছে কত মন্দির মসজিদ গম্বুজ আর মিনার, বড়লোকের কত বিরাট বিরাট সৌধ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে যার ওলন আর কর্নিকের নিপুণ চালনায়, জীবনের অন্তিম দশায় একটি কুঁড়ে ঘরও জুটল না তার। পয়সার অভাবে তার নিজের ঘরটি সারাই করে নিতে পারেনি সে, উলটে খাজনা বাকি থাকায় নিলাম হওয়া পোড়ো ঘরের জমিনে নয়া বাস্তু গড়েছে তার সচ্ছল প্রতিবেশী। শেষ পর্যন্ত মুমূর্ষু জনাব আলির ঠাঁই হয় গ্রামের এক বুড়ো বট গাছের তলায়। যখন বৃষ্টি নামে, ঝাপশা হয়ে আসে দিগ্বিদিক, অনিকেত মানুষটির তখন খোদাতালার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে দুই চোখ। গাছটাকে তার মনে হয় ঈশ্বরের নিজের হাতে গড়া ইমারত। জমিদারের শোষণ তাকে ভিটেছাড়া করেছে বটে, কিন্তু তার ঠাঁই মিলেছে খাশ ঈশ্বরের ইমারতে।

> "ঝপঝপ করে বৃষ্টি নেমে আসছে—
> আসুক।
> জনাব তাকাল মাথার উপরে। বুড়ো বটগাছের পাতায় পাতায় ঢাকা গোল গম্বুজের মত মাথার দিকে। খোদাতালার নিজের হাতে গড়া ইমারত।
> সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে—এইটুকু ছাড়া"।

উদীয়মান বুর্জোয়াজি মানুষকেই তার আপন স্থপতি ঠাওরেছিল। কিন্তু আজ তার পতনের যুগে, আবার তার মনে পড়ল আরো এক বড়ো স্থপতির কথা, যিনি আমাদের সেই সাবেক ঈশ্বর। দীর্ঘদিনের অজ্ঞাতবাস থেকে আবার টেনে আনা হল তাকে। সামাজিক শোষণের শিকার হয়ে যে সমস্ত মানুষ তাদের তৈলতুলাতনুনপাৎ খুইয়েছে, শোষণের যাঁতায় যে সমস্ত মানুষের নিজস্ব কুঁড়ে ঘরটুকুও গুঁড়িয়ে গিয়েছে, তাদের নিয়ে আসা হল ঈশ্বরের ইমারতের নিচে। সেই ভাগবতী ধারার রিমঝিম শব্দে তাদের সত্যিকার সৃষ্টিগুলো ঝাপশা হয়ে গেল, জেগে রইল শুধু অলীক ঈশ্বরের তৈরি অলীক ইমারত। এজন্যেই এঙ্গেলস বলেছিলেন, অধ্যাত্মবাদ এবং অনুমাননির্ভর ভাববাদের বাড়া আর শত্রু নেই প্রকৃত মানবতাবাদের। কেননা, অই দুই দর্শন আসল

ব্যক্তি মানুষের জায়গায় নিয়ে আসে 'আত্মা' আর 'আত্মজ্ঞানে'র কথা। সুসমাচার প্রচারকদের মতন তাদেরও বক্তব্য 'the spirit quickeneth everything and the flesh profiteth not.'

তারাশঙ্করের মানবতাবাদবিরোধী এই গল্পের পাশে কৃশনের একটি গল্পকে রেখে দুই লেখকের মনোধর্মের প্রভেদটুকু বুঝে নেয়া যেতে পারে। কৃশনের গল্পটির নাম 'ড্যানি'। ড্যানি ঢ্যাঙা আর হাড়কুচ্ছিত এক মানুষ। ওর মাথায় ঘিলু বলে কোন পদার্থ ছিল না। ছিল শুধু এক ভয়ানক খিদে। তাই নারীর প্রেম, মানুষের করুণা, বন্ধুর আত্মত্যাগ এসবের কোন অর্থই নেই ওর কাছে। ও চেনে শুধু এক অনিঃশেষ খিদে, যে খিদে শিশুকাল থেকে তাকে যৌবনকাল অবদি ধাওয়া করে এসেছে। ও চাইত লোকে ওকে চব্বিশ ঘন্টা খাটিয়ে নিক। বিনিময়ে তাকে শুধু পেট ভরে খেতে দিক। এই জন্যে সে একটা ইরানি রেস্তোরাঁয় চাকরি নিয়েছিল। মালিক তাকে পেট ভরে খেতে দিত, আর দিত মাস মাইনের বিশটি টাকা। ড্যানি অই টাকায় দিশি মদ খেত। পেট ভরে খেয়ে দিশি মদ টেনে ফুটপাতে ঘুমিয়ে পড়ত আর তখন ও পয়সাকড়ি রাজনীতি খ্যাতি নারী ইত্যাদি কোন কিছুরই ধার ধারত না। তবু তার জীবনে একদিন নারী এল। তার নাম সারিয়া। তাকে তার ভাই বিশ টাকায় গুণ্ডাদের কাছে বেচে দিচ্ছিল। ড্যানি ওর মোটা মাথা দিয়ে টুঁ মেরে তাদের চার জনকেই পেড়ে ফেলে এবং সারিয়াকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করে। ড্যানির প্রাথমিক প্রতিরোধ সত্ত্বেও সারিয়া তারই কাছে থেকে যায়। ইরানি রেস্তোরাঁয় তারও একটা কাজ জুটিয়ে দেয় ড্যানি। কাজ সেরে রোজ রাতে তারা ফুটপাতে ঘুমিয়ে পড়ত। ড্যানি এখন খালি পেটে কিংবা আধ পেটা খেয়েই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। খাবারের বেশিটাই সে তুলে রাখত সারিয়ার জন্যে। কেননা সারিয়ার পেটে তারই সন্তান বেড়ে উঠছে এখন। আসন্ন সন্তানকে ঘিরে তাদের মধ্যরাত্রির একটি চূর্ণ দ্বিরালাপ ঃ

কিন্তু ছেলে আমাদের না খেয়ে থাকবে না। ড্যানি দৃঢ় কণ্ঠে বলল।

ওর সব থাকবে। সারিয়া আশাভরা গলায় বলল।

পেট ভরাবার খাবার, গায়ে দেবার কাপড়, ওর সব থাকবে।

আর থাকার জন্যে ঘর।

ঘর?

কেন তোমার ছেলেকে ঘর দেবে না তুমি? ও কি এই ফুটপাতে থাকবে নাকি?

কিন্তু কেমন করে ঘর হবে তাদের? ওদের ছেলে যাতে ওদের ঘরেই জন্মাতে পারে সে জন্যে ইরানি রেস্তোরাঁর সঙ্গে আরো একটা চায়ের দোকানে কাজ ধরল। রোজগারের পয়সা দিয়ে শস্তা দরের এক কামরার একটা ফেলাট কেনার কথা ভাবছিল ওরা। কিন্তু একদিন মাঝরাতে একটা ট্রাক এসে সারিয়াকে থেঁৎলে দিয়ে ফুটপাতে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছে ধাক্কা মারল। চায়ের দোকানের কাজ সেরে ড্যানি যখন ফিরে এল তখন সব শেষ। এক মারাত্মক ভঙ্গিতে মাথাটাকে ঝাঁকিয়ে ও ট্রাকের ওপর গিয়ে চড়াও হল। পুরো ছটি মাস ও হাসপাতালে ছিল। অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছিল বটে কিন্তু ওর মস্তিষ্কের একটা অংশ প্রায় বিকল হয়ে গিয়েছিল। ইরানি রেস্তোরাঁর মালিক সেজন্যে ওকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। একদিন ড্যানিকে দেখা গেল কোথা থেকে তিনখানা ইট জোগাড় করে এনেছে ড্যানি। একখানা ইটের ওপর আরেক

একখানা, তার ওপর আরেকখানা ইট সাজিয়ে বাড়ি বানাতে ব্যস্ত সে। ফুটপাতের প্রতিবেশিরা ঘিরে ধরে তাকে। ড্যানি তাদের বলে বিশ তলা বাড়ি হবে ওটা, প্রত্যেক তলায় থাকবে তিরিশটি করে ফেলাট আর প্রত্যেক ফেলাটে চার চার কামরা। সকলের জায়গা হবে সেখানে। কাশেমের জন্যে, রামুর জন্যে, গোপীর জন্যে, ধীরাজের জন্যে, বসন্তের জন্যে, পাতিলের জন্যে, রঙ্গাচারির জন্যে, থাগো লেন আর তোরা গলির ফুটপাতে যারা ঘুমোয় তাদের সবার জন্যে জায়গা হবে সেখানে। অবশেষে কয়েকমাস খাটাখাটুনির পর সেই বাড়ি তৈরি শেষ হল। ড্যানি রাত এগারটা থেকে একটা পর্যন্ত টিনের একটা কৌটো বাজাতে বাজাতে চরক রোডের দুপাশের ফুটপাত, থাগো লেনের ফুটপাত, চোরা গলি, ক্রস বাজার আর আশপাশের ফুটপাতের সব মানুষগুলোকে তাদের সংসার নিয়ে নতুন বাড়িতে উঠে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে এল। সে আরো বলে, কাল সকালে সারিয়া যখন ওর বাপের বাড়ি থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে আসবে তখন তাদের সবার জন্যে বাড়ির দরজা খুলে দেবে সে। গির্জেয় ঘন্টা বাজবে। সেই শুভ সময়ে গির্জের ঘন্টার সঙ্গে সঙ্গে সবাই তার বাড়িতে ঢুকবে। কৃশনের গল্পের অন্তিম অনুচ্ছেদ ঃ

পরদিন সকালে ড্যানিকে মেরি মাতার মূর্তির পায়ের তলায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। চোখ দুটি ওর মেলা, যেন নীল আকাশে একটি অসম্পূর্ণ স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পরনের কাপড় ফালি ফালি জালি জালি হয়ে আছে। বুকের উপর সেই তিন খানি ইট। পবিত্র মেরি মাতার পায়ে মাথা ঠুকে ঠুকে সে মাথা ফাটিয়ে ফেলেছে।

দাও দাও খুলে গির্জা,
আর বাজাও অই ঘন্টা।
দ্যাখো এই চলেছে যিশুখৃষ্ট,
বুকে ইটের ক্রুশ বয়ে নিয়ে।

স্বর্গদ্বার আজ কাঙাল গরিবদের জন্যে খুলে গেছে। ছুঁচের ফুটো দিয়ে একটা উট নাও গলে যেতে পারে, কিন্তু আইনের প্রতিটি ফাঁক দিয়ে একজন ধনী অনায়াসে গলে যেতে পারে।

আজ থেকে দুনিয়ার মালিক হবে গরিব গুরবোরা আর গরিবদের মনিব হবে ধনীরা।

অই চলেছে যিশুখৃষ্ট।
এস, আমরা ওকে সমবেদনা জানাই।

দুটো গল্পের দুটো উপসংহার থেকে লেখকদের নিজ নিজ দৃষ্টির স্বভাবপ্রকৃতি ছেঁকে নেয়া যায় অনায়াসে। তারাশঙ্কর দেখেন শ্রমজীবী শ্রেণীর অবক্ষয় এক অনিবার্য ঘটনা। মনুষ্যত্বের অবমাননা তারই এক স্বাভাবিক পরিণাম। নিত্য অই অপমান থেকে নিষ্ক্রমণের কোন পথ নেই নিপীড়িতের। তার জন্যে শুধু থাকে অপমানের ক্ষতমুখে ঐশ্বরিক প্রলেপ। গৃহহীন জনাব আলির জন্যে তাই গাছতলার অধিক আর কিছু জোটাতে পারেন না তারাশঙ্কর। বুড়ো বটগাছটাকেই তিনি ভাবতে শেখান ঈশ্বরের ইমারত বলে। শ্রেণী অবস্থানের কারণেই তাঁর পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হয়না, উৎপাদনের সঙ্গে যে সম্পর্কে বাঁধা আছে জনাব আলির দল সেই সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারলেই কেবল উচ্ছিন্ন মানুষ আবার তার আশ্রয় ফিরে পেতে পারে।

বিপরীতভাবে কৃশন মনে করেন বর্তমান যুগে, ইতিহাসের নিয়ামক শ্রেণী হল শ্রমজীবী শ্রেণী। তারাই নিতে পারে সম্পর্কের পরিবর্তনের ভার। মালিকানা কথাটার সঙ্গে একটা বস্তু জড়িয়ে থাকে সব সময়। তবু বস্তুটাই মালিকানা নয়। বস্তুটাকে ঘিরে একটা মানুষের সঙ্গে আরেকটা মানুষের যে সম্পর্ক আসলে সেটাই হল মালিকানা। মানসিক ভারসাম্যহীন ড্যানি এই সম্পর্কটাই বদলে দিতে চেয়েছিল। সে যে ইমারত বানিয়েছিল সেটা স্বপ্নের হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের নয়। তাই তার মালিকানা সে সমশ্রেণীর মানুষজনের হাতে তুলে দিতে পেরেছিল। অর্থাৎ মালিকানার ব্যক্তিগত ধরণটাকে সামাজিক ধরণে ঢালাই করে দিয়েছিল। আর এই প্রক্রিয়ায় মানবতাবাদের একটি নতুন নির্বন্ধও সে ফুটিয়ে তুলেছিল, যাকে বলা যায় প্রলেতারিয় মানবতাবাদ।

৯

ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুসারে এমন একটা সময় ছিল যখন সম্পদ ছিল কিন্তু সম্পত্তি ছিল না। উৎপাদনী শক্তিব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের ভেতব নানারকম পরিবর্তন আসে। পরিবর্তন দেখা দেয় অধিসৌধে আর সামাজিক চেতনার বিস্তৃত ক্ষেত্রে। প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতিটাকে সামাজিকভাবে মজবুত করার দরকার হয়ে পড়ে তখন। চলে বিভিন্নভাবে তাকে শক্তিশালী করে তোলার চেষ্টা। এ সমস্ত প্রয়াসেরই একটা বিশেষ ধরণ থেকে তৈরি হয় আইন। বুর্জোয়া আইনের ভেতর তাই স্বাভাবিকভাবেই বস্তুগত বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটে।

রাজা সলমনের দরবারে দুই নারী এসে হাজির হয়েছিল। সঙ্গে এক শিশু। দুজনেই দাবি করেছিল, শিশুটি তার। দুই নারীর মাতৃত্বের এই কাজিয়া কীভাবে নিষ্পত্তি করেছিলেন বিচারপতি সলমন? তরবারি দিয়ে শিশুটিকে দুটুকরো করে প্রত্যেককে এক এক টুকরো দেবার আদেশ দিয়েছিলেন রাজা। শুনেই কেঁদে ওঠে এক নারী ঃ না, না কখনো না। আমার সন্তানকে ওভাবে ফেরৎ চাই না আমি, বরং দিয়ে দিন অই মহিলাকে, তবুবধ করবেন না ওকে। আর অন্য নারীটি ঃ ও সন্তান যদি আমার না হয়, ওর-ও যেন না হয়, দুভাগ করে দিন তাই। আর তখুনি বাদামি দাড়িতে মৃদু টোকা মেরে প্রকৃত মায়ের কাছে তাঁর নাড়িছেঁড়া সন্তানকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তীক্ষ্নধী বিচারক। নারী দুটির শ্রেণীগত অবস্থান জেনে নেবার প্রয়োজন বোধ করেননি রাজা, দরকার মনে করেন নি কীভাবে ছোট্ট অই শিশু গর্ভধারিণী মায়ের কাছ থেকে ছিটকে গিয়ে অন্য নারীটির সংস্পর্শে এসেছিল। তাঁর ধারণা ছিল মমতা সেখানেই গাঢ়তর, যেখানে রক্তের সম্পর্ক। দ্বিখণ্ডনের কথায় তাই সেই নারীর মধ্যেই হবে মমতার উচ্ছলন, যার রক্ত অই শিশুর শিরায়। আসলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুশাসনের ভিত্তিতেই বিচারটা করেছিলেন গোষ্ঠীপ্রবর সলমন। রক্তের সম্পর্কের মধ্যেই খুঁজে দিতে হবে প্রকৃত দায়াদ, এই ছিল সেই আইনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়।

কিন্তু গর্ভধারিণী মাকে শনাক্ত করেও অন্য আরেক ভাবে বিচার করেছিলেন ব্রেষটের আজডাক তাঁর 'ককেশিয় খড়ির গণ্ডি'-তে। সামাজিক ডামাডোলের সময় এক ধনাঢ্য নারী সন্তানকে ফেলে গয়নাগাঁটি নিয়ে চলে গিয়েছিল তার পিত্রালয়ে। সে বাড়িরই পরিচারিকা সৈন্যদের উদ্যত খড়গ থেকে কোনক্রমে বাঁচিয়ে দেয় তাকে, তারপর নানা দুঃখ কষ্ট আর সামাজিক লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে অপত্যস্নেহে বড় করে তোলে শিশুটিকে। যুদ্ধ চুকলে বড়লোক মা ফিরে এসে আত্মজকে দাবি করে। মামলা

ওঠে আজডাকের এজলাশে। একটা খড়ির গণ্ডি টেনে সেই বৃত্তের কেন্দ্রে শিশুটিকে রেখে দু দিকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় দুই নারীকে, যাতে যে নারী বেশি ভালোবাসে বাচ্চাটিকে টেনে নিতে পারে নিজের দিকে। 'শুরু' বলতেই ধনী নারী বাচ্চাটিকে বৃত্তের বাইরে আনে হ্যাঁচকা টানে। শিশুটির ক্ষতি হতে পারে ভেবে হতভম্ব পরিচারিকা বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। আজডাক অবশ্য শিশুটিকে পরিচারিকার কাছেই ফিরিয়ে দেন এই বলে যে ছেলেটি তারই কাছে হয়ে উঠবে সত্যিকার মানুষ। চারণ গল্পের সারার্থ জানিয়ে দেয় গানের মাধ্যমে ঃ

Dass da gehoeren soll, was da ist, denen, die fuer es gut sind, also
Die kinder den Muetterlichen, damit sie gediehen
Die Wagen den guten Fahren, damit gut gefahren wird
Und das Tal den Bewaesserern, damit es Frucht bringt.
যা কিছু রয়েছে, সেসব তাদেরই হোক, যোগ্য যারা তার, তাই
দাও শিশুদের যাঁরা জননীসমান, যাতে ওরা হয় বিকশিত
দাও শকট চালকেরে, যেন ভালোভাবে তা হয় চালিত
আর দাও উপত্যকা সিঞ্চনকারীদের যাতে সেটা ভরে ওঠে ফলে।

'ট্যাকসি ড্রাইভার' গল্পে এই রকমই এক 'সামাজিক ব্যবহার-এর প্রশ্ন তুলেছিল বিক্রম। বিক্রম একজন ট্যাকসি চালক। শহরের সবচেয়ে বড়লোকের গাড়িকে তার ট্যাকসি পাশ কাটিয়ে তীব্র বেগে বেরিয়ে যায়। এতে ট্যাকসির চেয়ে হাতের কুশলতাই বেশি ছিল। কিন্তু ট্যাকসিওয়ালার এই বেয়াদবি সহ্য করতে না পেরে অই বড়লোকটি বিক্রমের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠোকে। বিক্রম সেই থেকে চার মাসে এগারো দিন হাজির হয় আদালতে। তবু তার কেস ওঠে না। কবে উঠবে তাও জানতে পারে না। একদিন সে কথা জানতেই বিচারকের আরদালিকে অনুসরণ করে জজসাহেবের বিশ্রামকক্ষে ঢুকে পড়ে। জজসাহেব সেদিন অনুপস্থিত। হঠাৎ তার মাথায় এক খেয়াল চাপে। জজসাহেবের উর্দি চড়িয়ে চার নম্বর এজলাশে হাজির হয়। পর পর তিনটি মামলার বিচার করে সে।

প্রথম বিচার ঃ আসামি বালাচন্দ্রনের বয়স সত্তর। তিনি একা। বিরাট বাড়ি, তাতে খান দশেক ঘর, তারই একটিতে ভাড়া থাকতেন এক বৃদ্ধা। ছ মাস আগে তাঁর একমাত্র রোজগেরে ছেলে দুর্ঘটনায় মারা যায়। তখন থেকেই ভাড়া বাকি পড়ে। বালাচন্দ্রন ভাড়াটে উচ্ছেদের মামলা করেন। বিক্রম বৃদ্ধাকে শুধোয় সে তার দশ কামরার ঘর থেকে একটা কামরাও অই অনাথ মহিলাকে দিতে পারে কিনা। আসামির উকিল বলে হুজুর সেকশন নং অমুক অমুক, অমুক অমুক ধারার অমুক অমুক অমুক কানুন বলে...। বিক্রম গর্জে ওঠে ঃ আর মানবিকতা কী বলে? তারপর আসামির উদ্দেশে ঃ যদি অই বৃদ্ধা তোমার নিঃসঙ্গ জীবন সেবায় শুশ্রূষায় সাহচর্যে ভরিয়ে দেয় আর পরিবর্তে দু মুঠো খাবার আর দশটা কামরা থেকে একটা কামরা ব্যবহারের জন্যে চেয়ে নেয় সেটা কি খুব বেশি হবে। বৃদ্ধ ফয়শালা মেনে নেন এবং এই রায়ের বিরুদ্ধে উকিলের উচ্চতর আপিলের প্রস্তাব নাকচ করে বৃদ্ধার সঙ্গে আদালত কক্ষ ছেড়ে যান।

দ্বিতীয় বিচার ঃ একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে। মামলা বিবাহ বিচ্ছেদের। অভিযোগ, তার স্বামীর মুখ থেকে রশুনের গন্ধ ছাড়ে আর রাত্রে জুতো পায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। বিচারক বিক্রম বলে শোবার আগে ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে তার স্বামীর মুখে গুঁজে দিতে। উকিল ভারতীয় আইনের ধারা উদ্ধৃত করে আপত্তি জানায়। বিক্রম তাকে থামিয়ে বলে স্বামী যদি বিছানায় জুতো পরে বিছানায় শোবার চেষ্টা করে, তবে স্ত্রীরও চপ্পল পরে শোবার পুরোমাত্রায় হক আছে। কেস ডিসমিস হয়।

তৃতীয় বিচার ঃ কাঠগোড়ায় মিল মালিক কৃষ্ণমাচারি। শ্রমিক রেডডির মেশিনে হাত কাটা গেছে। কৃষ্ণমাচারি বলে রেডডির নিজের গাফিলতিতেই অই দুর্ঘটনা, সুতরাং মিল মালিক হিশেবে ক্ষতিপূরণ দেবার দায় তার নয়। বিক্রম বলে যে মিলে সত্তর লাখ টাকার বিনিয়োগ থেকে মুনাফা ওঠে তিন কোটি চল্লিশ লাখ, সেখানে শ্রমিকেব হাতই হোল আসল হকদার। সুতরাং রেডডিকে সারা জীবন পেনশন দিতে হবে। কৃষ্ণমাচারি বলে সেটা সোশ্যালিজমের দেশে হয়। উকিলও ভারতীয় আইনের ধারা উদ্ধৃত করে প্রতিবাদ করে। বিক্রম তখন ঃ এখন থেকে মিলের মালিক তারাই, যারা এতদিন পর্যন্ত তাদের হাতের মেহনত-পুঁজি তাতে লাগিয়েছে। যেহেতু কৃষ্ণমাচারি নিজের হাত না লাগিয়ে শুধু মুনাফার দাবিদার হতে চায়, সুতরাং তার দুহাত কেটে নেয়া হবে। রাষ্ট্রের শুধু সে হাতেরই প্রয়োজন, যে হাত কাজ করে।

শেষমেশ অবশ্য বিক্রম ধরা পড়ে যায়। বিচারকের আসনে বসে মহামান্য আদালতকে অপমান করার দায়ে তার ছ মাস সশ্রম কারাদন্ড হয়। যাবার আগে আদালতকে সে জানিয়ে যায় ঃ হুজুর, জিন্দেগি ট্যাকসির মত তীব্র বেগে চলে। কিন্তু আইন এখনো ছেকড়া গাড়ির গতি নিয়ে চলেছে। সরকার আমি বেকসুর। আমি আদালতের চেয়ারে বসিনি। শুধু একসিলারেটরের ওপর একটু পা রেখেছিলাম।

আইন বাস্তবতাকে চেনার একটা বিশেষ পদ্ধতি। কোন দেশের বিভিন্ন ধারাগুলো থেকে সেই দেশের সমাজব্যবস্থার গড়ন সম্বন্ধে একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। 'ট্যাকসি ড্রাইভার' গল্পে আসামি পক্ষের উকিলেরা যে সব ধারার কথা উল্লেখ করে, বহিরঙ্গে তারা যতই সার্বজনিক হোক, একটা শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সে সবই যে উৎপাদনী উপকরণের যারা মালিক তাদেরই স্বার্থরক্ষা করে চলে, সে বিষয়ে আর কোন সংশয়ের অবকাশ থাকেনা। বিচারকের আসনে বসে বিক্রম বুর্জোয়া আইনের সেই পক্ষচারী দিকটাকেই প্রকাশ করে দিয়েছে। অবশ্য বিক্রম বা আজডাকেরা যে বিকল্প বিচার উপস্থাপিত করে তাকে বিচারের ইউটোপিয়া বলা ভাল, কেননা বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সম্ভব নয় বিচারের সে রকম প্রয়োগ ; অথচ কাম্পানেল্লা, সাঁ সিমঁ, ফ্যুরিয়ের, ওয়েনের মতন মনস্বী ইউটোপিয়ানরা সমাজের সামাজিক রূপান্তরের পিছনে যে সব চালিকাশক্তি সক্রিয় তাদের স্বরূপ অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েও স্বপ্ন দেখেছিলেন ওরকমই এক মানবিক বিচারব্যবস্থার। অর্থাৎ কী হওয়া উচিত সেটা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু কোথায় তার অন্তরায় সেইখানটায় ঠেকে গিয়েছিলেন তাঁরা। ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতার কারণেই তাঁদের পক্ষে বলা সম্ভব হয় নি যে, যতদিন না সমাজের শরীর থেকে বিরোধী শ্রেণীসমূহের উচ্ছেদ ঘটান যাচ্ছে ততদিন সাম্য আর স্বাধীনতা ঘিরে

সমস্ত কথাকলাপ এক আত্মপ্রতারণা, এবং বঞ্চনা সেই শ্রেণীর প্রতি যারা খাটে, যাদের শোষণ করে পুঁজি ; প্রকৃত প্রস্তাবে অই উদ্‌ঘোষ বুর্জোয়াজির স্বার্থের সান্ত্রীপ্রহরী। যতদিন না শ্রেণী বিলুপ্ত হয়, ততদিন সাম্য আর স্বাধীনতা নিয়ে যাবতীয় যুক্তির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলবে এসব প্রশ্ন ঃ কোন শ্রেণীর জন্যে স্বাধীনতা, আব কী তার উদ্দেশ্য, কোন কোন শ্রেণীর ভেতর সাম্য আর কোন কোন ব্যাপাারেই বা তার সমতা? এই প্রশ্ন যদি এড়িয়ে যাওয়া হয় আর উৎপাদনের উপকরণগুলোব ব্যক্তিগত মালিকানা ঘিরে যদি কোন কথাই উচ্চারিত না হয়, তাহলে সাম্য আর স্বাধীনতা বিষযে সমস্ত শ্লোগানই হয়ে পড়ে মিথ্যাচার আর বুর্জোয়াজির বুজরুকি।

১০

'চারাগাছ'-এর ভূমিকায় অই কথাই বলেছেন কৃশন আত্মন্তর বিশ্বাসে ঃ যুদ্ধের প্রতিবোধ ততদিন সম্ভব নয়, যতদিন এই দুনিযায় ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ থাকবে, যা মানুষকে মানুষেব গোলাম কবে রাখে ; যতদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে , যতদিন সাহিত্য ধনতন্ত্রের প্রশংসা করে যাবে ; যতদিন সংবাদপত্রের ওপর থাকবে অর্থেব দখল, যতদিন না আমাদের সব উৎপাদন গণতান্ত্রিক সাম্যবাদের নিয়মে ভাগ করা যাবে ততদিন এই দুনিয়ায় শান্তিস্থাপন সম্ভব নয়, ততদিন দুনিয়ায় সত্যিকার স্বাধীনতা আসবেনা। কথাগুলোব ভেতর দিয়ে তাঁর শ্রেণী অবস্থান মুদ্রিত কবে দিয়েছেন কৃশন, বুঝিয়ে দিয়েছেন কোন শ্রেণীর প্রতি তাঁর পক্ষপাত। নাতিহ্রস্ব লেখকজীবনে কৃশন দেখেছেন ঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্বাধ লুঠতরাজ, শ্রমিক ও কৃষক বিদ্রোহের কঠোর অবদমন, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে আত্মঘাতী সংঘাত, পদলেহী জাতীয় নেতাদের উত্থান ও আত্মবিক্রয়, দেশমাতৃকার দ্বিখণ্ডন ; দেখেছেন স্বাধীন ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতার হস্তান্তর, উত্তরোত্তর গণ ও শ্রমিক আন্দোলনের ওপর আঘাত, শরণার্থীর স্রোত, অশিক্ষা বেকারি ও দারিদ্রের বৃদ্ধি, আমলাতন্ত্রের অমানবিকতা, রাষ্ট্রিক প্রতিশ্রুতি ও প্রতিকারের ভেতর দুস্তর ফারাক। ইতিহাসের বস্তুবাদী ছাত্র হিশেবে তাঁর বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে অই সব সমস্যার সম্ভব নয়, কেননা তারাই তার জনক ও সঞ্চালক। তাই উঠে আসতে হবে শ্রমিকশ্রেণীকে, ইতিহাসের সমস্ত সম্পদের যারা প্রকৃত স্রষ্টা। আঘাত করতে হবে মূলধনের ওপর। হতে হবে শোষণকারীদের শোষক। রাষ্ট্রের নিয়ন্তা হতে হবে তাদের। মানবিকতার সংকীর্ণ ও বিমূর্ত অর্থ থেকে মুক্তি দিতে হবে তাকে। এ কেবল সাহিত্যিকের কোন রমণীয় বিশ্বাস নয়। গোর্কির মত তিনিও ভেবেছিলেন সেই দিন আজ অপসৃয়মান যখন বিশ্বাস ও জ্ঞান আর নয় বিপ্রতীপ যেমন সত্য আর মিথ্যা। যেখানে শাসক প্রলেতারিয়েত, সেখানে জ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক নয় পরিপন্থী ; সেখানে বিশ্বাস তার বিচারশক্তিজাত জ্ঞানের ফসল, যা বীর সৃষ্টি করে, যা জন্ম দেয় না—আর দেবেও না কখনো—দেবতার। নতুন এই মানবধর্মের নাম প্রলেতারিয় মানবতাবাদ। এই ধর্মের স্রোতঃপথ অনুসরণ করে সমাজতন্ত্রী সাজ্জাদ আর মানবতাবাদী কৃশন এসে মিলে যান অভিন্ন মোহানায়। 'নিচুতলার মানুষ'-এর সাতিনের মতন কৃশনের কুশীলবেরাও তাই বলে উঠতে পারে ঃ কৃপা নয়, শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা কর মানুষকে। করুণা দেখিয়ে খাটো করো না তাকে। মা নু ষ! দেখ শব্দটার মধ্যেই বেজে ওঠে কেমন স্বেমহিন্নি ধ্বনি।

সঞ্চারী দাশগুপ্ত

কৃষণ চন্দর ঃ উত্তরখণ্ড

হজারোঁ খোয়হিশেঁ অ্যায়সী
কে রে খোয়াহিশ পে দম নিকলে
বাহোৎ নিকলেঁ হ্যাঁয় মেরে আরমা
লেকিন ফির ভি কম নিকলে।

সহস্র বাসনায় কণ্ঠাগত এ প্রাণ।
প্রকাশ হল বহু আকাঙ্খা আমার
তবুও হল না বাসনার অবসান।।

মির্জা গালিব

একজন সৃষ্টিশীল মানুষের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করার আকুলতা থাকা স্বাভাবিক। কখনও কখনও সেই প্রকাশ মাধ্যম একের বেশীও থাকে। লিখতে লিখতে কেউ হয়ত হয়ে উঠলেন চিত্রকর, গান গাওয়া হয়ত নিয়ে গেল মঞ্চাভিনয়ের দিকে। কৃষণ চন্দর যখন লক্ষ্ণৌ রেডিওতে কাজ করছেন তখন তিনি প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। কিন্তু মাণ্টোর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর, দিল্লিতে থাকাকালীনই তিনি ফিল্মে যোগ দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেন। তাই যখন শালিমার পিকচার্স এর আমন্ত্রণ পেলেন, তখন আর পেছন ফিরে তাকানোর কথা ভাবলেন না। তৎকালীন লক্ষ্ণৌ রেডিও স্টেশন ডাইরেক্টর সোমনাথ চেব, যিনি এক কালে লাহোরের একটি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন, কৃষণ চন্দরকে খুব পছন্দ করতেন। তিনি তাঁকে 'পদত্যাগে' নিরস্ত করতে চাইলেন কিন্তু ততদিনে শালিমারের রঙীন উদ্যানে কৃষণ চন্দর মনে মনে পৌঁছে গেছেন।

নতুন মাটি, নতুন আকাশ, নতুন দিগন্ত, নতুন মানুষ। কাজও নতুন। কৃষণ চন্দরের সামনে তখন এক নতুন পৃথিবী। আদ্যন্ত রোম্যান্টিক এক পরিবেশ, সেই সঙ্গে মেধা ও প্রতিভার বিদ্যুৎস্ফুরণে তৈরী এক আবহ। একেবারে মনের মত জগত। একদিকে নিজের নাটক 'সরাই কে বাহর' মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতি, অন্যদিকে বিদগ্ধজনের আড্ডায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় কমিউনিস্টদের অবস্থান কী হবে তা নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক। কখনও আবার নতুন বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে সদ্য রিলিজ হওয়া ছবি দেখে গভীর রাতে বাড়ি ফেরা। এরকম একটি রাতের কথা লিখেছেন কৃষণ চন্দর—'বর্ষায় ঝাপসা কিছু দিনের কথা মনে আসে। আমরা সিনেমা থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতাম। তিন চারটি ছেলে, তিন চারটি মেয়ে। মনে পড়ে বৃষ্টির হালকা ছিটে, চকচকে চোখের ভেজা দৃষ্টি, ভিজে রাস্তায় ভিজে পায়ের শব্দ, সিক্ত হাতে উষ্ণতার অনুভব, সজল আবেগে মথিত আমাদের গান, যা আমরা পথ চলতে চলতে গাইতাম।

কৃষণ চন্দর পুণায় প্রথমবার রেস খেলেন। একবারই। পরে একবার বম্বেতে। প্রথমবার দশ টাকা জেতেন। দ্বিতীয়বার হারেন দশ টাকা। পুণায় ওই দিন রেসের

মাঠেই তাঁর আলাপ হয় প্রমথেশ বড়ুয়া, যমুনা দেবীর সঙ্গে।

এভাবে সব মিলিয়ে অসাধারণ দিন কাটছিল পুণায়। কিন্তু এক সময় শালিমার পিক্‌চার্স ছাড়তে হল কৃষণচন্দরকে। এর পেছনে রয়েছে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বিখ্যাত অভিনেতা বলরাজ সাহনী ছিলেন কৃষণচন্দরের বন্ধু। তিনি এবং নির্দেশক চেতন আনন্দ শালিমার পিকচার্সে কাজ পাওয়ার জন্য কোম্পানীর মালিক আহমদ্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আহমদ্ সাহেব যে বেতনের কথা বলেছিলেন তা বলরাজ সাহনী বা চেতন আনন্দের পছন্দ হয়নি। কৃষণ চন্দর তখন তাঁদের পরামর্শ দিয়েছিলেন আহমদ্ সাহেবের প্রেমিকা হিরোইন নয়না দেবীকে ধরতে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ফল হয়েছিল উল্টো। বেতন তো বাড়েই নি উল্টে আহমদ্ সাহেব নয়না দেবীর উপস্থিতিতে কৃষণ চন্দরকে ডেকে বলেছিলেন 'আপনি আপনার বন্ধুদের বেতনের ব্যাপারে নয়না দেবীব সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন?' কৃষণ চন্দর চুপ করে ছিলেন। আহমদ্ সাহেব বলেছিলেন 'আজ থেকে আমি আপনার বেতন বাড়িয়ে দিচ্ছি।'

এরপর আর আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন একজন লেখকের পক্ষে শালিমারে থাকা সম্ভব হয়নি। ঘটনাচক্রে সেই সময়ই কৃষণ চন্দরের দেবীকা রাণীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তার মাধ্যমেই বম্বে টকিজে কাজ পাওয়া গিয়েছিল। পুণার সঙ্গে এভাবেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল কৃষণ চন্দরের।

জীবনের এই অধ্যায়ে সাহিত্যচর্চা পুরোদস্তুর বজায় ছিল। ভাই মহেন্দ্রনাথ লিখছেন—'পুণায় আসার পর তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন ফিল্মকে তাঁর সাহিত্যজীবনের সামনে কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেবেন না। পুণায় থাকাকালীন তিনি তাঁর কিছু সেরা লেখা লিখেছিলেন। ফিল্মের কাজকে তিনি তত গুরুত্ব দিতেন না যতটা দিতেন সাহিত্যকর্মকে।' 'অন্নদাতা' ও 'মৌজ' দুটি বিখ্যাত গল্প এ সময়েই লেখা। শালিমার পিকচার্সে থাকাকালীন করা চিত্রনাট্য 'মন কী জীত' ফিল্মটি হিট হয়েছিল, সিলভার জুবিলীও হয়েছিল। এই ছবিটিই ফিল্মী দুনিয়ায় কৃষণ চন্দরের একটি জায়গা তৈরী করে দিয়েছেন।

বম্বে টকিজে কৃষণ চন্দর স্টোরি ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ হিসেবে যোগ দিলেন। পুণায় বেতন ছিল মাসে সাড়ে ছশো টাকা। তাছাড়া একটি ফ্ল্যাটে থাকার ব্যবস্থা। বম্বে টকিজে পনোরোশো টাকা সম্পূর্ণ করমুক্ত বেতন, বাড়িভাড়া মিলল। তবু এক বছরের মধ্যেই কৃষণ চন্দরের উৎসাহ উবে যেতে শুরু করল। অন্যের কোম্পানীর হয়ে কাজ করা ছেড়ে দিয়ে তিনি নিজের কোম্পানী খুলবেন মনস্থ করলেন। নাম দিলেন—মডার্ণ থিয়েটার্স। দুটি ফিল্ম তৈরী হল, একটি কৃষণ চন্দরেরই বিখ্যাত নাটক 'সরাই কে বাহর' অবলম্বনে। অন্যটির নাম 'রাখ'। প্রথমটির হিরো ভাই মহেন্দ্রনাথ, হিরোইন সবিতা দেবী, সাইড রোলে কৃষণ চন্দরের এক প্রেমিকা শমীনা খাতুন। প্রথমটি ফ্লপ, দ্বিতীয়টি মুক্তিই পায়নি। সব কটিরই পরিচালক-প্রযোজক ছিলেন কৃষণ চন্দর নিজেই। সমালোচকদের মতে অনভিজ্ঞতাই ছিল এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ।

যাইহোক, জানা যায়, এই দুটি ছবি বানানোর সময় কৃষণ চন্দর একটু ছোট মাপের 'মুগল-এ-আজম'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জলের মত পয়সা খরচ

হয়েছিল। আর এই সময়েই তাঁর পরিচয় হয়েছিল সাহির লুধিয়ানভি, সর্দার জাফরী ক্যায়ফী আজমী, খ্বাজা আহ্‌মদ্ আব্বাস, ইসমত চুগতাই প্রমুখের সঙ্গে। সব মিলিয়ে সে এক সুখের স্বর্গ।

কিন্তু দুটি ছবিই ব্যর্থ হওয়ার পরে স্বর্গচ্যুত হলেন কৃষণ চন্দর ; মর্তে নয়, একেবারে কঠোর, রুক্ষ বাস্তবের জমিতে অবতীর্ণ হলেন তিনি। সঞ্চিত অর্থ যা ছিল, সব তো গেলই ; বাংলো, তিনটি গাড়ি, ভৃত্যকুল সব ছাড়তে হল, কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা দেখা দিল বিশাল ধার মেটাতে গিয়ে। তখন আর্থিক অবস্থা যা, তাতে এ কাজ প্রায় অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল। যে সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় চুকতে বসেছিল ফিল্ম বানানোর হুজুগে—অর্থ রোজগারের জন্য আবার তারই আশ্রয় নিতে হল। তবে, সব দুঃসময়ের মত একদিন এই অন্ধকার দিনগুলোও কেটে গেল।

১৯৬০ সালে কৃষণ চন্দর কিছু দিনের জন্য বোম্বাইকে বিদায় জানিয়ে দিল্লি গেলেন এবং '৬২-র শুরু পর্যন্ত সেখানেই রইলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল সেখানেই পাকাপাকিভাবে থাকার, কিন্তু সম্ভবতঃ আর্থিক কারণেই আবার বোম্বাই ফিরে আসতে হল। কৃষণ চন্দর এ সম্পর্কে তাঁর এক বন্ধু সাহিল আজিমাবাদীকে লিখেছিলেন— "...আমার দুরবস্থার কথা কী লিখব—জীবন এখন যে খাতে বইছে তাতে কবে আবার বম্বে ফিরে যেতে হবে কে জানে। "রও মে হ্যায় রখল এ উমর..."—এর ঘটনা আর কী।' এরকম দুঃসময়েই বস্তুত কৃষণ চন্দরের প্রেম হয় সলমা সিদ্দিকীর সঙ্গে। সম্ভবত কৃষণ চন্দরকে কিছুটা মানসিক আশ্রয় দিয়েছিলেন এই অন্য নারী—কৃষণ চন্দর স্থির করেছিলেন বোম্বাইতেই যেখানে তাঁর স্ত্রী-পুত্র পরিবার থাকে, তার চেয়ে দূরে দিল্লিতে সলমার সঙ্গে বাস করবেন। ১৯৬১-র ৭ জুলাই নৈনিতালে সলমার সঙ্গে সম্পর্ক পাকা হল যদিও সম্ভবতঃ এ বিয়ে আইনসিদ্ধ ছিল না। সেখানে দুমাস কাটিয়ে তাঁরা দিল্লী ফিরে এলেন। কিন্তু ক্রমশ বোঝা গেল দিল্লীতে বেশীদিন থাকা সম্ভব হবে না। কৃষণ চন্দরের সে সময়টা খুব বেশী কিছু উপার্জন ছিল না। সলমার রোজগারেই চলত। তাই ক্রমশ নৈরাশ্য আর অবসাদ গ্রাস করতে লাগল তাকে। ফের বোম্বাই ফিরে এলেন তিনি। সেখানেও প্রথম দিকে কোনও কাজ মিলল না। দু বছরের অনুপস্থিতির ফলে যোগাযোগ অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। পুরোন বন্ধুরা কেউই আর এগিয়ে এলেন না। বাড়ি ভাড়া না পেয়ে সস্তার হোটেলে থাকতে হল। যাই হোক, অবশেষে জীবনের নিয়মেই সময়ের পরিবর্তন হল। প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করতে পারার ক্ষমতা কৃষণ চন্দরকে সাহায্য করল। আস্তে আস্তে আবার ফিল্মে কাজ পাওয়া শুরু হল।

কৃষণ চন্দর দেশে বিদেশে অনেক জায়গায় ঘুরেছেন। প্রগতিশীল উর্দু সাহিত্যিক সংগঠনের তিনি ছিলেন মধ্যমণি। বিভিন্ন শহরে তাঁদের সভায় ভগ্নস্বাস্থ্যের পরোয়া না করেই তিনি যোগ দিতেন। বিদেশ সফরেও গিয়েছেন বহুবার। একবার কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে একটি ফিল্মের সূত্রে চীন গিয়েছিলেন। সেই দলে সঙ্গী ছিলেন পৃথ্বিরাজ কাপুর। ১৯৬৭ আর ১৯৭১এ রাশিয়ায় চতুর্থ ও পঞ্চম সাহিত্য কংগ্রেসে শামিল হন। সলমাও সঙ্গে গিয়েছিলেন। এছাড়া হাঙ্গেরীতেও যাওয়া হয়েছিল কৃষণ চন্দর ও সলমার।

১৯৪২সালে কৃষণ চন্দরকে 'সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহরু অ্যাওয়ার্ড' দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে তিনি পনেরো দিনের জন্য রাশিয়া যান। সলমাকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য কৃষণ চন্দর বিশেষ অনুমতি নিয়েছিলেন রুশ কর্তৃপক্ষের। এরপর '৬৭-তে চতুর্থ সাহিত্য কংগ্রেসে ভারত থেকে দশ বারোজন সাহিত্যিকের যে দল যায় তাতে কৃষণ চন্দর ছিলেন। সেবার চীন ছাড়া বাকি সব রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ক্রেমলিনে জড়ো হয়েছিলেন। পাকিস্তান থেকে গিয়েছিলেন ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ। তাঁর সঙ্গে কৃষণ চন্দরের সাক্ষাতের একটি মজার গল্প আছে।

ফয়েজ ও কৃষণচন্দর দুজনেই মস্কো হোটেলে উঠেছিলেন ; কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক শুরুতেই দুজনের দেখা হয়নি। প্রথমদিন যখন সলমা আর দোভাষীর সঙ্গে কৃষণ চন্দর ডাইনিং রুমে গেলেন দেখলেন প্রত্যেকটি দেশের জন্য আলাদা আলাদা টেবিল রাখা হয়েছে এবং তাতে দেশগুলোর ছোট ছোট পতাকা লাগানো রয়েছে। কিন্তু কাছাকাছি কোথাও পাকিস্তানের পতাকা চোখে পড়ল না। ফয়েজকেও কোথাও দেখা গেল না। কৃষণ চন্দর খোঁজ নিয়ে জানলেন ভারত আর পাকিস্তানের টেবিলের মধ্যে অন্তত তিনটে টেবিলের ফারাক রাখা হয়েছে এবং ফয়েজ তখনও খেতে আসেন নি।

পানীয়ের গ্লাসে দু-এক চুমুক দেওয়ার পর কৃষণ চন্দর দেখলেন বারান্দা দিয়ে ফয়েজ আসছেন। ফয়েজ টেবিলে বসে কৃষণ চন্দরের মতই চারদিকে কাকে যেন খুঁজলেন। ওঁর চোখও কোন একটা বিশেষ টেবিল খুঁজছিল। দুজনে চোখাচোখি হল। ফয়েজ তক্ষুনি নিজের টেবিলের ফ্ল্যাগ তুলে নিয়ে কৃষণ চন্দরের টেবিলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

এদিক থেকে কৃষণ চন্দরও ভারতের ফ্ল্যাগ হাতে রওনা হয়েছিলেন। ঘরের সবার দৃষ্টি তখন এই দুজনের দিকে। মাঝামাঝি কোনও একটা টেবিলের সামনে দুজনের মিলন হল। দুজনেই পাশের টেবিলে নিজের নিজের দেশের পতাকা রেখে দিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েন। গোটা হল করতালিতে মুখর হয়ে উঠল এবং ফয়েজকে নিয়ে কৃষণ চন্দর নিজের টেবিলে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত তা চলতে থাকল। ১৯৬৫-র ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের রেশ তখনও দু দেশে বর্তমান। কিন্তু তা এই দুই সমমনস্ক সাহিত্যিকের মিলনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল না। ফয়েজ বললেন—'এরা কী ভেবেছে? আমরাও আমাদের স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকদের মত একে অপরের শত্রু নাকি? সাহিত্যে কখনও শত্রুতা চলে, না চলেছে?'

কৃষণ চন্দর বললেন—'কিন্তু এটা তো দুর্ভাগ্য বলে মানবে যে তোমার-আমার দেখা ভারতে হবে না, পাকিস্তানেও না। হলে হবে হয়ত মস্কোতে।'

ফয়েজ বললেন—'এদের উচিৎ প্রত্যেক বছর এখানে সাহিত্য কংগ্রেস করা। এই অজুহাতে আমাদের দেখা হয়ে যাবে।' তারপর একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন—'তোমার দোভাষী মেয়েটি তো বেশ সুন্দর দেখতে। কোথায় পেলে?'

কৃষণ চন্দর বললেন—'চাইলে বদলে নাও। কিন্তু মনে রেখো, এ কিন্তু ইহুদী।' তারপর গ্লাসে গ্লাসে শিঞ্জন হল।

সাহিত্য কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ ছিল। ফয়েজ বললেন, 'আমি যদি বলি তাহলে কাশ্মীর নিয়েও বলব। আমার দেশের সেরকমই হুকুম'।

কৃষণ চন্দর বললেন—'তাহলে আমার পক্ষে বক্তৃতা না করাই ভাল। নিজেদের ঝগড়া অন্যদের সামনে প্রকাশ করে কী লাভ।'

তারপর ফয়েজ তাঁর বক্তব্য শলোকভ ও অন্যান্য রুশ সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিলে ছাপলেন। সেই প্রয়াসে কৃষণ চন্দরও শামিল হয়েছিলেন। এতে লাভ হয়েছিল এটাই যে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে বিদেশে জলঘোলা হয়নি, আর শলোকভের মত বিখ্যাত সাহিত্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্যও ঘটেছিল কৃষণ চন্দরের। এই সাহিত্য সমাবেশেই চিলির বিখ্যাত কবি পাবলো নেরুদার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছিল।

বিদায়কালে ফয়েজ পকেট থেকে দুটি কাগজের টুকরো বার করে বললেন—'এ দুটো কবিতা আমি এই মস্কোতেই লিখেছি। দেশে পৌঁছে এটা সজ্জাদ জাহিরকে দেবেন, আর একটা সর্দার জাফরীকে।' তারপর সজোরে কৃষণ চন্দরের করমর্দন করে ব্যথাতুর দৃষ্টিতে বললেন—'এ বিচ্ছেদ অনিবার্য। কিন্তু আবার আমাদের দেখা হবে বন্ধু।'

এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভাল কৃষণ চন্দরের বিশ্বাস ছিল যে একদিন ভারত পাকিস্তান আর বাংলাদেশ মিলে একটিই ফেডারেশন তৈরী করবে। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে এই তিনটি দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই সাময়িক বিচ্ছিন্নতাকে নির্মূল করবে।

এরপর ১৯৭১-এর সাহিত্য কংগ্রেসেও কৃষণ চন্দর উপস্থিত ছিলেন কিন্তু ফয়েজ যেতে পারেন নি ; আর কোনওদিনই দুজনের দেখা হয়নি।

'৬৭-তেই হাঙ্গেরি গিয়েছিলেন কৃষণ চন্দর ও সলমা। সেখানে বালাটুন লেকের পাশে রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে লাগানো একটি গাছ তার নীচে রাখা স্মৃতিফলক, লেকের পাস দিয়ে বয়ে চলা পথ টেগোর অ্যাভিনিউ, সবই এই দম্পতির নজর কেড়েছিল।

কৃষণ চন্দরের খুব ইচ্ছে ছিল বুদাপেস্টের কোনও থিয়েটারে নাটক দেখার। ঘটনাচক্রে সেসময়ই হাঙ্গেরীর বিখ্যাত নাট্য নির্দেশক কাজি মীর 'রামায়ণ' করছিলেন। বিশ্বের যে ১১টি ক্ল্যাসিক নিয়ে তিনি নাটক করেছিলেন, 'রামায়ণ' তার অন্যতম। সেসময় কাজি মীরের নাটক দেখার জন্য তিন মাস আগে থেকে রঙ্গালয়ের সব আসন পূর্ণ হয়ে যেত। যাহোক, অনেক কষ্টে টিকিট জোগাড় করে কৃষণ চন্দর আর সলমা নাটক দেখলেন। তিনখানি নাটক। কাজি মীর অসম্ভব শৈল্পিক দক্ষতার সঙ্গে বিশাল এই মহাকাব্যকে চিত্রিত করেছিলেন। এজন্য নানা অভিনব কলাকৌশল ও প্রতীকের সাহায্য নিয়েছিলেন তিনি। সীতার পোশাক ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়, কিন্তু রামকে পরানো হয়েছিল সাদা প্যান্ট আর আচকানের মত হাফ কোর্ট। নাটকের শুরুতে হিন্দিতে গান শোনা গিয়েছিল—'ভারত কী এক নারী কী হুম কথা সুনাতে হ্যাঁয়'। আসলে গোটা নাটকটাই ছিল রামের বদলে সীতাকে কেন্দ্র করে। আধুনিক মন চিরকালই মানুষকে অন্যভাবে ভাবায়। এই শতাব্দীতে ভারতবর্ষে রামকে কেন্দ্র করে যে কুৎসিত কার্যকলাপ চলছে, তাতে রামায়ণের অন্যতর ব্যাখ্যা আমাদের স্পর্শ করে।

হাঙ্গেরীর মত দেশে নিজের ভাষার গান শুনে কৃষণ চন্দরও আপ্লুত হয়েছিলেন। আরো অভিভূত হয়েছিলেন যখন নাটকের শেষে সমবেত দর্শকমণ্ডলী বার বার তাঁকে আর সলমাকে রামায়ণের দেশের লোক বলে করতালির মাধ্যমে অভিনন্দিত করেছিলেন

১৯৪৭-এ নিজের ওপরে তোলা ফিল্মস ডিভিসনের একটি ডকুমেন্টারির সুটিং এর উদ্দেশ্যে কৃষণ চন্দর কাশ্মীর গিয়েছিলেন। সেখানে ছোটবেলার দিনগুলি কাটিয়েছিলেন যে বাজোরি নদীর পারে, পুঞ্চের যে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ভাই মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন সেসব জায়গা আবার নতুন করে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল। ফিল্মস্ ডিভিশন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন একটি সংস্থা, '৭৩-এর মত উত্তাল সময়ে কৃষণ চন্দরের দেখভাল করার জন্য একজন ইন্‌ফর্মেশন অফিসার নিয়োগ করেছিল। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কৃষণ চন্দরের সম্পর্ক এসব ছোট ছোট ঘটনাতেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। জরুরী অবস্থার সমর্থনে মিছিলে হাঁটা তো এরই ধারাবাহিক ফলশ্রুতি।

ব্যক্তি কৃষণ চন্দর

জীবনাদর্শ আর জীবন যাপন, এ দুটো খুব কম মানুষই মেলাতে পারেন, কৃষণ চন্দর পারেননি। আদর্শগতভাবে তিনি বামপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন, আবার জীবনের সুখ বিলাসের প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল সমান। শিল্পীদের যা হয়। তাঁরা একাধারে হন স্বার্থপর ও কোমলহৃদয়। নিজেরটুকু পুরোপুরি চাই, সেই সঙ্গে কামনা থাকে অন্যের ভালো হোক। যা বস্তুত অসম্ভব। কৃষণ চন্দর খাদ্য হিসেবে পছন্দ করতেন—মসল্লা মুর্গ, শামী কবাব, বিরিয়ানি, কোফ্‌তা, মাংসের আরও নানারকম পদ। মিষ্টির মধ্যে—শাহী টুকরে, সিরনি, সেওই, জর্দা, শেরমাল, গাজরের হালুয়া, দুধ-মাল ঠান্ডা কাস্টার্ড। এছাড়া পঞ্জাবী আর কাশ্মীরী খানাও তাঁর পছন্দ ছিল। পানীয়ের মধ্যে প্রিয় ছিল স্কচ হুইস্কি। এয়ারকণ্ডিশন্ড ঘর, দামী মলমলের কুর্তা-পাজামা, মহার্ঘ লেখার কাগজ-কলম ছিল তাঁর প্রিয় ব্যসন।

প্রথম স্ত্রী বিদ্যাবতীর সঙ্গে সম্পর্ক প্রাথমিকভাবে ছিল গতানুগতিক। বিদ্যাবতী ছিলেন সনাতনপন্থী ভারতের আদর্শ নারী, যিনি দাম্পত্য বলতে বুঝতেন একজন নিয়মনিষ্ঠ সংসারী পুরুষ, যিনি একটি নির্দিষ্ট সময় বাড়ির বাইরে থাকবেন, দোকানবাজার করবেন, বাচ্চাদের দেখাশোনা করবেন—যা কৃষণ চন্দরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি বলতেন, তাঁর এই ধরাবাঁধা জীবনযাত্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত। কৃষণ চন্দরের জীবনীকার লিখছেন, তাঁর কিছু আত্মীয়স্বজনের বয়ান অনুযায়ী বিদ্যাবতী ছিলেন অত্যন্ত বদমেজাজী। খিটখিটে স্বভাবের মহিলা। তাই কৃষণ চন্দর ক্রমশ সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু সম্ভবত এটাই একমাত্র কারণ নয় কৃষণ চন্দরের সলমা সিদ্দিকীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হবার। স্বভাবগতভাবে কৃষণ চন্দর ছিলেন রোম্যান্টিক প্রকৃতির। কিছুটা মুক্ত বিহঙ্গও। পুনা ও বম্বে থাকাকালীন তাঁর কিছু প্রেমিকার কথা শোনা যায়, তবে তাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সলমা সিদ্দিকী ছিলেন এদের মধ্যে অন্যরকম। তিনি সাহিত্যের অকৃত্রিম পাঠিকা, নিজে লিখতেন, সম্ভবত আধুনিকমনা এই নারী কৃষণ চন্দরের হৃদয়ে এক স্থায়ী ছাপ ফেলেছিলেন, যাকে স্বীকৃতি দিতেই কৃষণ চন্দরের দ্বিতীয় বিবাহ ঘটে। তবে বিদ্যাবতীও একটি ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। একবার এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়—'আপনার সঙ্গে কৃষণ চন্দরের বিচ্ছেদের মূলে কি সলমা ছিলেন?' বিদ্যাবতী উত্তর দেন—'হ্যাঁ সলমা একটা বড় কারণ, কিন্তু এমনিতেও

আমাদের মানসিকতা আর দৃষ্টিভঙ্গীতে বিস্তর ফারাক ছিল।' নিজেদের সম্পর্কের এই বিশ্লেষণ যে তাঁর মত একজন অল্পশিক্ষিতা মহিলা করতে পেরেছিলেন, সেটিও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।

তবে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ বিদ্যাবতী বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেননি। খোদ কৃষণ চন্দরের লেখা চিঠি (ভাই উপেন্দ্রনাথকে) থেকে জানা যাক ঘটনাটি—

প্রিয় ওম্

তোমার চিঠি পেয়েছি। মাকে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। এ মাসে তোমাকে টাকা পাঠাব ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন কদিন একটু অসুবিধায় আছি। বিদ্যা আমার আর সলমার নামে ফৌজদারী মামলা করেছে। আমাদের নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছিল, গ্রেফতারও হয়েছিলাম। তারপর থানায় জামিন দিয়ে ছাড়া পেয়েছি। চোদ্দ জুলাই. .মামলার প্রথম শুনানি হবে। অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে। ও বলেছে আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আমরা হিন্দু বিবাহ করেছিলাম যা সম্পূর্ণ বে-আইনী। কিছু নকল সাক্ষী জোগাড় করে ও প্রমাণ করতে চেয়েছে যে মহেন্দর তার দাদরের ফ্ল্যাটে এই বিয়ের আয়োজন করেছিল। তুমি ভেবে দেখো এই মহিলা কীরকম। মাকেও বলো, তিনি তো বিদ্যাবতীর দুঃখে একেবারে কাতর হয়ে আছেন। শুনছি রঞ্জনকে দিয়েও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ানো হবে। .'

রঞ্জন কৃষণ চন্দরের পুত্র। তাঁর তিন সন্তান ছিল। রঞ্জন, কপিলা আর অলকা। ১৯৬১-তে সলমাকে বিয়ে করার পর আগের বাড়ি ছেড়ে চলে এলেও সন্তানদের দায়িত্ব অস্বীকার করেন নি। বিদ্যাবতীর বয়ান থেকে জানা যাচ্ছে, বিচ্ছেদের দিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কৃষণ চন্দর স্ত্রী ও পরিবারের ভরণপোষণ করেছেন।

সলমার সঙ্গে কৃষণ চন্দরের দাম্পত্য জীবন ছিল অভূতপূর্ব। দুজনের পরস্পরের প্রতি প্রেম ছিল অসম্ভব গভীর। দুজনেই ছিলেন সাহিত্যপ্রেমী। পরস্পরকে মীর, গালিব, ইকবালের কবিতা পড়ে শোনাতেন। দুজনের জগত ছিল এক অসাধারণ রোম্যান্টিকতায় মোড়া। সলমা স্মৃতিচারণ করছেন এভাবে—

"পুরোন ছবির অ্যালবাম আমার সামনে খোলা, আর তোমার কল্পনা আমার চোখে ভাসছে। অনেক যুগ পরে এই অ্যালবাম দেখছি। বা হয়ত প্রথম বার দেখছি। তুমি আমার পাশে বসে আছ। তোমার একটা হাত আমার কাঁধের ওপর রাখা। ছবি দেখতে দেখতে কোনওটা তোমার পছন্দ হলে তুমি আস্তে আস্তে আমার কাঁধে চাপড় মারছ। আমি তোমার দিকে তাকালে তুমি মৃদু মৃদু হাসছ। তুমি নিজের হাসি সম্পর্কে কী অজ্ঞ! কী অজানা কী অচেনা নিজের হাসি তোমার কাছে। লোকে বলবে, এ তো শুধু হাসিই। মৃদু হাসি—

—কিন্তু এই হাসির কত বিভঙ্গ, কত দিক, কত রং, কত রূপ কেউ জানেনা।'

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। সলমার লেখা সম্পর্কে কৃষণ চন্দর খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। একবার সমকালীন লেখিকাদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'সলমা মূলত প্রাবন্ধিক। তাই ওর লেখায় আবেগ কম। ও সাধারণত মুসলমান সমাজ তার রীতি রেওয়াজ, তার Sex Pattern, বিশেষ করে হায়দ্রাবাদের জীবনযাত্রার কথাই বেশী লিখেছে। ...'

এখনকার লেখিকদের মধ্যে কুব্অতুলেন হায়দারই সেরা। তাকে প্রশ্ন করা হয়, কুব্অতুলেন ইসমত চুগতাইয়ের উচ্চতায় পৌঁছেছেন কিনা। কৃষণ চন্দর বলেন—'না। কিন্তু তিনি খুব ভাল লেখেন।' নারী সম্পর্কে কৃষণ চন্দর ছিলেন সনাতনপন্থী, অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে নারীশরীরের রহস্যই তাঁর কাছে প্রধান বিচার্য ছিল। সলমার সান্নিধ্য পেয়েও মেধার প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মায়নি। একবার এক পানীয়ের আসরে তার এক বন্ধু কোনও একজন মহিলার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছিলেন—'ওর মধ্যে আকর্ষণীয় কিছুই নেই, 'no hips no busts'— কৃষণচন্দর বললেন—'তাহলে তো তাকে মেয়েই বলা যাবে না।' সলমা বললেন—'কৃষণ চন্দরজী, এমন কথা আপনাব মুখে শোভা পায় না।' কৃষণ চন্দর হেসে জবাব দিলেন—'কেন, আমি এখনও জোয়ান, মেয়েদের সম্পর্কে এখনও সমান আগ্রহ দেখাতে পারি।' শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী—যাঁবা নিজেদেব সমাজের এগিয়ে থাকা অংশ বলে দাবী করেন, মহিলাদের বিনোদনেব উপকরণ হিসেবেই ভাবা কবে ছাড়বেন কে জানে!

কৃষণ চন্দর এমনিতে ছিলেন বেশ হাসিখুশী স্বভাবের। নিবহঙ্কার। আসরের মধ্যমণি বা 'জান-এ-মহফিল' বলে সুনাম ছিল তাঁর। অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ছিল, গুণমুগ্ধও ছিলেন প্রচুর, অতিথি বৎসল হিসেবে নাম ছিল। বন্ধুত্বকে খুব মূল্য দিতেন কৃষণ চন্দর। প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করা, কেউ অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার ভার নেওয়া এসব ব্যাপারে তিনি ছিলেন দরাজহস্ত।

কৃষণ চন্দরের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অনেকেই অভিযোগ করেছেন। স্বাধীনতার আগে ঘটা অত্যাচারের, শোষণের বিরুদ্ধে কৃষণ চন্দরের কলম সর্বদাই সোচ্চার ছিল, কিন্তু ১৯৭৫-৭৬-এ ইন্দিরা গান্ধীর জমানায় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখার বদলে তিনি ইমার্জেন্সির মত সরকারী কার্যকলাপকে সমর্থন জানিয়েছেন। এর একটা কারণ এই হতে পারে যে রাজনৈতিক দলের তিনি সমর্থক ছিলেন, এই অবস্থানই তাঁদের ছিল। অন্য কারণ হতে পারে যে দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে বিভিন্ন সরকারী আনুকূল্য, যার মধ্যে পদ্মভূষণ উপাধি (১৯৬৯), নেহেরু পুরস্কার (১৯৭৩), ফিল্ম ডিভিশনের তৈরী তথ্যচিত্র (১৯৭৪), আকাশবাণীর—PRODUCER EMERITUS পদপ্রাপ্তি (১৯৭৬)—সবই কৃষণ চন্দর পেয়েছিলেন। সেই হেতু কিছু কৃতজ্ঞতা বা দায়বদ্ধতা তার জন্মে থাকবে। এছাড়াও সে সময় কৃষণ চন্দর শারীরিকভাবেও খুব সুস্থ ছিলেন না। ১৯৬৭-তে তাঁর প্রথমবার হার্ট অ্যাটাক হয়, ১৯৬৯-এ দ্বিতীয়বার এবং এরপর তাঁর জীবনাবসান হয়। বার্ধক্য ও তাঁর প্রতিবাদী স্বরকে দুর্বল করেছিল সম্ভবত। তাই জরুরী অবস্থার সমর্থনে মিছিলে তাঁকে দেখা গিয়েছিল, স্খলিত পদচারণায় অন্তিমের দিকে এগিয়ে যেতে।

কৃষণ চন্দরের শেষযাত্রায় মাত্র একশজনের মত শামিল হয়েছিলেন। হয়ত এর চেয়ে বেশী সম্মান তার প্রাপ্য ছিল, কিন্তু ইতিহাস সংকটের সময় মুখ ফিরিয়ে থাকা

অথবা সেই সংকট সৃষ্টিতে সাহায্য করা মানুষকে, সে তিনি যতই প্রতিভাবান হোন না কেন ক্ষমা করে না।

কৃষণ চন্দরের জীবনীকাহিনী পড়লে মনে হয় তিনিও অন্য অনেকের মত এক যাত্রী, জীবনের বাঁকে বাঁকে নতুন নতুন রূপ, রস, গন্ধ আস্বাদনেই ছিল তাঁর আনন্দ। সৌখীন মেজাজ, সুখী মন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বামপন্থী ধারা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল, তাঁর রচনায় সে ছাপ স্পষ্ট। নিজের সৃষ্টিশীলতা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাও করেছেন অনেক, তাঁর তৈরী বিভিন্ন গল্প, দুটি ছবিই তার সাক্ষ্য। কাজ করার সঙ্গে অস্থিরতাও তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। বেশ কিছু নারীর সঙ্গে সম্পর্ক ঘটেছিল, শেষজীবনে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের কারণেই সম্ভবত বন্ধু বান্ধবদের প্রীতিচ্যুত হয়েছিলেন—সব মিলিয়ে তাঁর জীবন একজন ভারতীয় সাহিত্যিকের মতই। জীবনের সফরটা ঘোড়ায় চড়ে, সব কিছু হটিয়ে দিয়ে তফাত করে নিয়ে চলতে পারেননি, আবার গতানুগতিক পথেও হাঁটেননি।

কৃষণচন্দরের গল্প আমাদের মনে থাকবে। কারণ কোনও সৃষ্টিই প্রমাণ করে তার স্রষ্টা কী হতে চায়। সে কী হতে পারল, তা বড় কথা নয়।

সলমা সিদ্দিকী

স্মরণের রামধনু—কৃষণজী

[বম্বের ভারসোভার সাবরি আবাসনে ১১ই ও ১২ই জুলাই ১৯০১ দুদিন ধরে কৃষণ চন্দরের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় তাঁর স্ত্রী সলমা সিদ্দিকীর। দু দিনের এই সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করেন সন্দীপ মান্না, ওযাজেদ আলি সিদ্দিকী, স্বপন দাসাধিকারী ও দিলীপন ভট্টাচার্য।

৬৯ বছরের সলমাজী স্মৃতিচারণে ও বিশ্লেষণে এখনও সজীব। পুরো সাক্ষাৎকারটি তিনি দিয়েছেন হিন্দী ভাষায়, তাতে তিনি প্রভূত পরিমাণে উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং কিছু ইংরেজী। বক্তব্যের ধরন স্পষ্ট করতে বেশ কিছু উর্দু শব্দ রাখা হয়েছে।]

আমাকে জানানো হয়েছে যে আপনারা কৃষণ চন্দর-এর উপর কাজ করছেন। আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে যে ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষা—বাংলায় এই কাজ শুরু হয়েছে। কৃষণ চন্দর-এর প্রথম যে উপন্যাস আমি পড়ি তা 'অন্নদাতা'। বাংলার আকালের উপরে লেখা। এই লেখাই আমার হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। তার আগে আমি কৃষণজীর সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। এছাড়াও কৃষণজীর বাংলা সাহিত্যের উপর ভালবাসা ছিলো। বিগত একশ বছরের সাহিত্যের ইতিহাসে বহু গুণীজন এসেছেন কিন্তু প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে গুরুদেব টেগোর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)-এর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কৃষণজীর মনেও টেগোর সম্পর্কে উচ্চ আসন ছিলো। তার সময় দেশভক্তি, আজাদীর লড়াই-এর সময়। তিনি কলেজের প্রথম বছর ইনকিলাব, ক্রান্তির লড়াই-এ অংশ নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন—তাও ঐ কলকাতায়। কলকাতা ঐ সময়ে ইনকিলাবের সিম্বল ছিলো। তিনি মনে করতেন বাংলা ভাষায় যে উপন্যাস, ছোট গল্প প্রভৃতি রয়েছে তার সঙ্গে পরিচিত না হয়ে পারা যায় না। উর্দুতে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের প্রভূত আদর ছিলো। কৃষণজীরও তাই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ ছিলো। আর তাঁর অন্নদাতাও লেখা হয়েছিলো কলকাতার পটভূমিতে। তখন ইংরাজের সময়। অন্নদাতার স্টাইলে বাংলার লেখকদের প্রভাব ছিলো, উপন্যাসের বিস্তারে সেই সময়ের যে সমস্যা উঠে এসেছিলো তা সহজেই হৃদয়কে ছুঁয়ে গেছে। তখন থেকে কৃষণজী অনেকবারই কলকাতা আসা যাওয়া করেছেন। কলকাতা তখন ইনকিলাব এর গহেরা তালুক ছিলো, আজাদীর সিম্বল হয়ে গিয়েছিলো। তারপর কৃষণজী দিল্লী চলে এলেন এবং অল ইন্ডিয়া রেডিওতে যোগ দিলেন। কিন্তু ওখানে বেশী দিন থাকতে পারেননি। বদলি হয়ে লক্ষ্ণৌ চলে গেলেন। এভাবে উনি উত্তর প্রদেশে এলেন , কাটনিতে ছিলেন এবং উর্দু ভালোভাবে শিখেছিলেন। ছোটবেলা কেটেছিলো কাশ্মীরে, ফলে সেখানকার প্রকৃতি তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। কিন্তু এটা আমার জানা ছিলো না যে কৃষণজী কাশ্মীরে অনেকটা সময় কাটানোর জন্য উর্দুর প্রতি তাঁর ভালোবাসা গভীর হয়েছিলো এবং তাই কাশ্মীরের প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হলেও তিনি কাশ্মীরের জনগণের গরিবী, মানাজেতকে তাঁর কাহিনীতে তুলে এনেছিলেন। তাঁর অনেক কিছুর সাথে আমার পরিচয় হয় অনেক পরে। কেননা আমি তাঁর জীবনে এসেছি অনেক পরে।

আমি আলিগড়ের মানুষ। কিন্তু আমার জন্ম হয়েছে বেনারসে। মা ছিলেন দাদুর বাড়ীতে। ভাইবোন মিলে আমরা আলিগড়ে জীবন কাটিয়েছি। বাবা আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। আমার পড়াশুনা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে, আর পড়িয়েছিও ওখানে। বাড়ীতে লেখাপড়ার আবহাওয়া পেয়েছিলাম। এজন্য আমার লেখার প্রবণতা ছিলো। আলিগড়ে তখন পড়াশুনা সাহিত্য চর্চার পরিবেশ ছিলো। আমার বাবা প্রফেসর রফি আহমদ সিদ্দিকী এ ব্যাপারে খুবই যত্ন নিয়েছেন।

❑ কৃষণজীর সঙ্গে কবে পরিচিত হয়েছেন?

স.সি. আমি কৃষণজীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম অনেক পরে। তার আগে ১৯৫৫/৫৬ সালে রেডিওতে কৃষণজী অন্নদাতা পড়েছিলেন। সেই আমি প্রথম কৃষণজীর কণ্ঠস্বর শুনি। সেটা একটা সময় ছিলো, আমাদের বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রগ্রেসিভ রাইটিং-এর প্রচুর খোঁজ রাখতো। লেখকদের সঙ্গে মেলামেশা করবার একটা ধারা ছিলো। তাঁরা যে নতুন দিশা দেখিয়েছেন, লেখা যে রোশনাই ফেলেছিলো তার দ্বারা আমরা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলাম। আমরা খোঁজ নিতাম ইসমত চুগতাই এর কি লেখা বেরুল, বেদীর, আলি জাফরির কি বই বেরুল, ফৈজ আহমদ ফৈজ এর কবিতার কোন্ বই এলো, কী সায়ির পড়লেন—খোঁজ নিতাম। আমরাও চর্চা করতাম। তারপর ফিল্ম এব ঢেউ এলো, সাহিত্য আন্দোলনেও যেমন আসে। মাটি যখন নরম থাকে নানা পরীক্ষা চলে। তাঁরা নিজেদের লেখায়, ছবিতে জীবনের জন্য ফসল ফলান, আমরা সেই সব কিছুর প্রভাবে অতিবাহিত করেছি।

আমি চলে এলাম দিল্লী। ওখানে এক ম্যাগাজিন প্রকাশিত হোত। ফ্যাসান ম্যাগাজিন—'শোয়াঁয়'। তাতে আমি দুই এক কলম লিখেছি। তার একটির কভারে আমার ছবি ছাপা হয়। কৃষণজী সেই কাগজে লিখতেন। একবার তাঁর সম্পাদক সুন্দর শ্যাম পারভেজ আমাকে বলেন, বার্ষিক সংখ্যা (সালনামা) বার করতে হবে। আমি বম্বে যাবো কৃষণজীর লেখা আনতে। এই বলে তিনি আমার ছবি ছাপা হওয়া সংখ্যাটি নিয়ে বম্বে চলে যান এবং লেখা নিয়ে আসেন। আমাকে বলেন, 'কৃষণজী লেখা দিয়েছেন, শুধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে কভার-এর ছবিটি কার। আমি বলেছি একজন মহিলার—তিনি এই পত্রিকাতে লেখেন।'

কৃষণজী ভাই এর বিয়ে উপলক্ষে দিল্লী এলেন ১লা ডিসেম্বর। ভাইয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে এলেন ; সঙ্গে ছিলেন কবি মজহুর। তিনিও আলিগড়ের। কৃষণজীর সঙ্গে মজহুর-এর ভালো তাল্লুকাত (পরিচয়) ছিলো। আমি সেই বিবাহে গেছি। সেখানে কৃষণজীর সঙ্গে মোলাকাত কথাবার্তা হয়েছে। সকালে আমাকে মাজারে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই সব কথা অবশ্য আমি অন্যত্র লিখেছি। তারপর অনেক ঘটনা ঘটেছে। এসব আমি লিখেছি তাঁর আত্মজীবনীর ভূমিকায়। সকলে জানেন সেই জমানা ঠিক ছিলো না। কৃষণজীর সঙ্গে সম্পর্ক অনেক গভীর হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু এর পরেও সম্পর্ক ঘিরে অনেক এতরাজ, অনেক আপত্তি ঘটেছে। কিন্তু দিন গড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমে দৃঢ়তর হয়েছে। একটা মনের জগৎ তৈরী হয়েছে। সেসব বলে বোঝাবার মতো নয়। এই রিস্তা (আত্মীয়তা) এতই দৃঢ় হয়ে গিয়েছিলো যে এর মাঝখানে সমাজের কোন শক্তি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। আমাদের সম্পর্ক একটা পরিণতি লাভ করেছিলো।

□ মুসলমান হবার জন্যে আপনি কোন সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হন নি?

স.সি. তখন দেশ ভাগের পনেরো বছর হয়েছে, দেশে প্রচণ্ড টেনশন, অনেক কড়া শাসনের মুখোমুখি হতে হয়েছে। সব কিছুই খুব কঠিন অবস্থার মধ্যে চলছিলো।

□ এইসব অসুবিধা অতিক্রম করলেন কিভাবে?

স.সি. উভয় তরফ থেকে করেছি। দুটো ভিন্ন ধর্মমত হওয়ায় এই কাজ খুব সহজ হয়নি। প্রবল আপত্তি হয়েছে। আমাদের সমাজে রক্ষণশীলরা কী কম! এরা সহজেই নিজের ব্যাপার ঠিক করে নেয়, অন্যদের উপদেশ দিয়ে থাকে। এই এক আজব রীতি। এদেশে হিন্দু মুসলমান বিয়ে দেশভাগের আগেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে, পরেও হবে। এ হৃদয়-এর ব্যাপার, অনুভব ও বিচারের ব্যাপার; একে ধর্মমত বা সামাজিক কোন নিয়ম দিয়ে বাধা দেওয়া যায় না।

□ আমাদের বাংলায় এমন একটা ধারনা তৈরী হয়েছে যে কৃষণজী এমার্জেন্সী সমর্থন করেছেন।

স.সি. তিনি কখনই এমার্জেন্সী সমর্থন করেন নি। সমর্থনের একটা ব্যাপারে দেশে একটা ভাগ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু অনেকেই এমন ছিলেন যে তারা পক্ষেও ছিলেন না বিপক্ষেও নয়। এখন এমার্জেন্সীর আগে দেশের অবস্থা কেমন ছিলো? লুটপাট চলছিল, সম্পূর্ণ অরাজকতা। তারপর ঢাকায় লড়াই চলছে। মুজিবর রহমানের পরিবারকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। ইন্দিরী গান্ধী চেয়েছিলেন দেশের এই নৈরাজ্যকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসতে। তার জন্যে কঠিন এক পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। তিনি ভেবেছিলেন হয়তো দেশের অবস্থার কিছু ভালো হবে ; কিন্তু সঞ্জয় গান্ধী এমারজেন্সীর প্রবক্তা হবার পর এটা সম্পূর্ণ গলদ দিশায় চলে যায়। তখন সকলেই তার বিপক্ষে চলে যায়। কৃষণজী সরাসরি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেন, আপনার এই কাজ ভুল, আপনি গলদ দিশায় দেশকে নিয়ে যাচ্ছেন। এই ঘটনা হচ্ছে ১৯৫৫ সালের ; আর কৃষণজী মারা গেছেন ১৯৭৭ সালে। শেষের দিকে তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছিলো না। পেসমেকার বসানো ছিলো। তিনি এই অবস্থায় ৪/৫ বছর বাঁচতে পারতেন। তিনি তাই বলেছিলেন, আমি সুস্থ থাকলে খুল্লাম খুল্লা এই অবস্থার বিরোধিতা করতাম। আমাকে জেলে পুরলে কোন চিকিৎসাই হবে না। এ সত্ত্বেও তিনি আমার সামনে ইন্দিরাজীকে বলেছেন, আপনি ভুল নীতি গ্রহণ করেছেন। কৃষণজীর সঙ্গে আই. কে. গুজরালের এমারজেন্সীর ব্যাপারে কথা হয়েছে। গুজরালজী কৃষণজীর খুব বন্ধু ছিলেন, কলেজ জীবনের। কিন্তু কৃষণজী হৃদয়ের দিক থেকে এই ব্যাপারে খুবই পরিষ্কার ছিলেন।

□ কৃষণজীর এ ব্যাপারে কিছু বদনাম হয়েছে।

স.সি. দেখুন কৃষণজী নিজের হৃদয়ের দিক থেকে খুবই পরিষ্কার ছিলেন। তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হয় বড় করে অনুষ্ঠান করে। সারা জীবনের কাজের স্বীকৃতি হিশেবে। কৃষণজীর ৫৫তম জন্মদিনে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরাজী এসে তাঁকে পুরস্কৃত করেছেন, অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন। এখন পুরস্কার পাওয়াকে এস্টাব্লিশমেন্টের সঙ্গে লেগে থাকা বোঝাতে পারে। যদি ভাবতাম ইংরাজরা অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে তার একটা অর্থ হতে পারে। কিন্তু এ তো আমার নিজের দেশের সরকার। আমারই গণতন্ত্রের। একজন

প্রগ্রেসিভ রাইটার হিসাবে কোন রকম সমঝোতা তিনি করতেন না। 'অন্নদাতা' তো ইংরাজ জমানায় ১৯৪২ সালে লেখা। দেশ ভাগের পর কৃষণজী 'তাবায়ৎ কে খৎ' লিখছেন কায়েদে আজম জিন্না ও জওহর লাল নেহরুর নামে। চিঠি লিখছেন কাহিনীতে গৌরব রসুলকে যে আমার কাছে দুটি মেয়ে আছে বেলা আর বতুল। আমি এদের নিয়ে কী করবো। তোমরা এদের অ্যাডপ্ট করে নাও। জিন্না একজনকে কো অপ্ট করো মেয়ে হিসাবে অন্যজনকে করো নেহরুজী। সেটা ছিলো মোরারজী দেশাই-এর জমানা। একদিন আঁন্ধেরী-র কুবের লজ-এ মাঝ রাতে সত্যি সত্যি পুলিস এলো কৃষণজীর ঘরে। এসে বলে কোথায় সেই মেয়ে দুটো বেলা আর বতুল—তাদের বার করো। কৃষণজী বললেন ঐ মেয়ে দুজনতো আছে আমার চিন্তায়। পুলিস বলে, না না আমাদের কাছে ওয়ারেন্ট আছে। কৃষণজী বললেন, ভাই একজন লেখকতো মার্ডারার-ও হয়ে থাকে তার কাহিনীতে। আমি তো আমার অনেক লেখায় অনেক খুন করেছি, আমিতো 'কাতিল'-ও। তোমরা আমাকে মেয়ে দুটির ছিনতাইকারী হিসাবে যদি সাজা দিতে চাও তো আমার লেখায় যে অনেক খুন হয়েছে তার জন্যেও তো আমাকে কয়েদ করতে হবে। সাচ্চাই এই যে কোন প্রগতিশীল লেখককে কয়েদ করা যায় না। কখনও কখনও সমাজে এমন অবস্থাও আসে যে ইনসাফ (সত্য)-এর জন্য জুলুম হয়ে থাকে। ইতিহাসে এই রকম ওযাক্ত (অবস্থা) অনেকবার এসেছে আবারও আসবে।

▫ আপনার বিয়ে কবে হয়েছিলো? কোথায়?

স.সি. ১৯৫৭-তে নৈনিতালে। কাশ্মীরের পর নৈনিতাল ছিলো কৃষণজীর ভালো লাগার জায়গা। আমারও খুব ভালো লাগতো। ছোট বেলায় মা-বাবার সঙ্গে প্রতি বছর আমরা নৈনিতালে আসতাম।

▫ আপনারা রাশিয়ার রাইটার্স কংগ্রেসে গিয়েছিলেন। সেখানে দুনিয়ার সেরা লেখকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো, আলেকজান্ডার ফেদিন, শলোকভ, ফৈজ আহমদ ফৈজ—সব কিছু নিয়ে আপনার অভিজ্ঞতা কী রকম?

স.সি. আমার জীবনের সেরা ঘটনা—সোভিয়েত রাইটার্স কংগ্রেস-এ যেতে পারা। সেবার আমি কৃষণজীর সঙ্গে গিয়েছি ; কৃষণজী নিজে একা একবার সোভিয়েত ইউনিয়ন গেছেন। সেটা ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার নিতে ; আর ১৯৫৭ সালে ভারত থেকে শিল্প সাহিত্য চলচ্চিত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে গিয়েছিলেন চীন। এ সব কিছু বিস্তৃতভাবে আছে তাঁর আত্মজীবনীতে।

সোভিয়েত রাইটার্স কংগ্রেসে ফেদিন, সলোকভ, অ্যানা সেঘার্স, পাবলা নেরুদা, ফৈজ সহ এতো দেশের সাহিত্যিক এসেছেন (এর বিস্তৃত বিবরণ আছে আধে সফর কী পুরী কহানী-এর ভূমিকাতেও)। এই কংগ্রেসের পর আমরা ইউরোপের অনেক দেশে যাই, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড—অনেক দেশে। সাহিত্য কংগ্রেসে তো অনেক মানুষ এসেছেন। ফৈজ এসেছেন। তিনিতো কৃষণজীর গভীর বন্ধু ছিলেন ; আমার জন্য এই সাহিত্য কংগ্রেস ছিলো গৌরবী এক্সপেরিয়েন্স। আর ইত্তেফাক এই ছিলো যে প্রেসিডিয়ামেতো হতোই, এমন কী একদিন আমি নিজের হোটেলের দিকে যাচ্ছি তখন হঠাৎ দেখি শলোকভ যাচ্ছেন। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে,

ভি.আই.পি-দের সাধারণ ও অসাধারণ পার্থক্য ছিলো না। আমি শলোকভকে দেখে একদম চমকে যাই, আর স্থির হয়ে দেখতে থাকি। শলোকভ এগিয়ে এসেছেন। আমি তো অবাক হয়ে তাঁকে দেখছি, আজকাল ছেলেমেয়েরা যেমন ফিল্ম-এর লোকজনকে দেখে। সলোকভ আমার শাড়ী ধরে দেখেন আর বলেন, 'খরসো, খরসো—ভালো, খুব সুন্দর। আমার সঙ্গে ইন্টারপ্রেটার ছিলো। তিনি খুব তারিফ করছিলেন এবং লিফ্‌টে ৭৮ তলা পর্যন্ত ওঠা অবধি সলোকভ-এর সঙ্গে আমি ছিলাম। আমার জীবনে এটা আমার পরম প্রাপ্তি। খুব কাছ থেকে দেখেছি ইলিয়া এরেনবুর্গ, লর্ড স্নোডেন, দক্ষিণ আফ্রিকার কবি আলেক্সি লেগুমা-কে। অনেক দেশের সাহিত্যিকরা এসেছিলেন বলে একই জায়গায় সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা, একে অন্যকে বোঝার পরম সুযোগ হয়েছিলো। আনা সেখার্স-এর খুব সান্নিধ্য পেয়েছি। তিনি বেশীরভাগ সময় আমাদের সঙ্গে খেতেন। আর নিজের দেশের বাঙালী, মারাঠী এবং অন্য সব প্রদেশের সাহিত্যিকরাও ছিলেন। আমি কৃষণজীকে বলেছিলাম যে দেখুন আমরা সাহিত্য কংগ্রেসে এসে ইউরোপীয়, দেশী রুশদেশের সকলের সঙ্গে যে সহজেই মিলে গেলাম কিন্তু নিজের দেশে ভারতীয়দের সঙ্গে মেলা মেশার ক্ষেত্রে কত অসুবিধা। ভাষা আলাদা, পোষাক রীতি-নীতি আলাদা, খাদ্যাভ্যাস আলাদা ; এ এক অসুবিধা। কিন্তু ওখানে ওরা বলছে যে তোমরা তোমাদের নিজের ভাষাতে বলো কোন অসুবিধা নেই। দোভাষী আছে।

সাহিত্য কংগ্রেসের এই দিকটি আমাকে বেশী প্রভাবিত করেছে যে নিজ মাতৃভাষার ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

❏ সাহিত্য কংগ্রেসে ফৈজ-এর সঙ্গে যোগাযোগ কেমন হয়েছে?

স.সি এর কিছু কৃষণজীর আত্মজীবনীতে আছে। ঘটনা আমার সামনেই ঘটেছে। এর আগে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়ে গেছে ১৯৬৫ সালে। এই বিষয়টি আয়োজকদের মাথায় ছিলো। সেই রকমভাবে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছিলো। প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট করতে প্রত্যেক দেশের পতাকা থাকতো আলোচনা-খাওয়ার টেবিলে। আমাদের দুইদেশের পতাকা রাখা ছিলো দূরে দূরে, প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধিরা খুব টানটান। কিন্তু হলো কী ফৈজ নিজের দেশের পতাকা তুলে নিলেন আর কৃষণজী নিলেন নিজের দেশের পতাকা। তারপর একে অন্যের কাছে এসে এক জায়গায় পতাকা দুটি রেখে একে অন্যের গলা জড়িয়ে ধরলেন। গোটা হল আনন্দে ও করতালিতে মুখরিত হয়ে পড়ে।

কৃষণজী এর উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন আমাদের মধ্যে কোন বাধা থাকতে পারে না। আমরা প্রত্যেকে আলোচনায় বসতেই পারি। কখনও হয়তো ফল নাও পেতে পারি, কিন্তু সব সময় আলোচনার দরজা খোলা রাখা উচিত।

কিছু কথা কৃষণজী বলেওছেন এইভাবে ঃ কিন্তু বিগত চব্বিশ বছরের তিক্ততা লড়াই ঝগড়া সত্ত্বেও হৃদয়ে এক তার আছে যা ছেঁড়ে নি এবং ছিঁড়বেও না। হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান আর বাংলাদেশ-এর ফেডারেশন একদিন গঠিত হবে; কেউ মানুক অথবা না মানুক এটা সময়ের তকাজা (দাবী)।

কৃষণজী ঠিক এই ধরনের মত পোষণ করতেন। ফৈজ এর সঙ্গে সাহিত্য কংগ্রেসে

সাক্ষাৎকার নূতন ঘটনা নয়। ফৈজ-এর সঙ্গে তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিলো। কিন্তু দু'দেশের মধ্যে তিক্ততার পরও তাঁরা পরস্পরের কাছে এসেছেন। দেশে দেশে রাজনীতিতে যা হয়ে থাকে তা তাঁরা সাহিত্যকাররা নিজেদের আলাপ আলোচনার, ভালোবাসার বাধা করে তোলেননি। কৃষণজী বরং বলেছিলেন ঃ 'কী ভাবেন এরা? রাজনীতিজ্ঞদের মতো আমরা সাহিত্যিকরাও শত্রুতা রাখবো? সাহিত্যে এই শত্রুতা চলে না। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার তোমার আমার এই সাক্ষাৎকার নিজের দেশে হচ্ছে না, হচ্ছে মস্কোতে।' এই জন্য কৃষণজী মজা করে বলেছিলেন ঃ 'রুশ সাহিত্য কংগ্রেস প্রতি বছর করা চাই, এই বাহানায় আমরা মিলতে পারি।'

ফৈজ-এর সঙ্গে মিলিত হতে পারা সুখের কিন্তু সাহিত্য কংগ্রেসে তাঁরা ভাষণ দিতে পারেন নি; কেননা ফৈজ বললেন, তিনি যদি বলেন তো কাশ্মীরের উপর বলবেন; এর পাল্টা কৃষণজী বলেছেন যে তুমি যদি কাশ্মীরের উপর বলো তো আমি এর জবাব দেবো। হাঁ, এই জন্য দুজনের কেউই ভাষণ দেননি ববং দুইজনের তকরীর (বক্তব্য) সলোকভ ও অন্য দুই রুশ লেখকের সঙ্গে ছাপা হয়েছে।

❑ কৃষণজী লিখেছেন যে রুশ সাহিত্য কংগ্রেসে লেখকদের প্রথম সারিতে বসিয়ে মন্ত্রিসভার লোকজনকে পিছনের সারিতে বসানো হয়েছে। এটা কী রাশিয়ার লেখকদের বিশেষ মর্যাদা দান নাকি সাহিত্য কংগ্রেসের লেখকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা?

স.সি. ঠিক তা নয়। আমাদের দেশের লেখকদের জন্য বিশেষ করে গুরুদেব টেগোর-এর জন্য বিশেষ সম্মানের স্থান ছিলো রাশিয়ায়। কৃষণজীর কোন লেখা বেরুলে তার খোঁজ হতো। আমি নিজে দেখেছি যে সাহিত্যকারদের বিশেষ যত্ন নেওয়া হতো। টলস্টয় ও গোর্কি তো রুশজীবনের সব সময়ের অনুপ্রেরণা। চেঙ্গিশ আহত্মাতভ কে লেনিন পিস প্রাইজ দেওয়া হয় মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে। আমাদের দেশে তো এটা ভাবতেই পারিনা।

❑ কিন্তু আমরা দেখি যে সলঝেনিৎসিন এর 'গুলাগ আর্কিপেলাগো' ইত্যাদি নিয়ে লেখক হিসাবে তাঁকে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। তার আগে বরিস পাস্টেরনাকের-এর 'ডঃ জিভাগো' নিয়েও রাশিয়াতে অনেক সমস্যা হয়। এটা কেন হলো?

স.সি. রাশিয়াতে পরবর্তীকালে এবং আগেও যা হয়েছে তাতে অনেক কন্টোভার্সিয়াল বিষয় আছে। সেসব আমরা পড়ে জেনেছি। কিন্তু বহু ব্যাপার ছিলো তার সম্পর্কে রাশিয়ায় অতিরিক্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করা হতো। রাশিয়া থেকে এক বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি আমেরিকা যাবে, কী একটা চুক্তির ব্যাপারে। এই সময়ে বিষয়টি খুবই জরুরী ছিলো। আর আমাদের এশিয়ান মেজাজ যা হয় আলোচনা অথবা খাওয়ার টেবিলে হঠাৎই আমি ইন্টারপ্রেটারকে জিজ্ঞাসা করি ঃ আর ভাই ওর কিছু খবর পেলে যে আমেরিকায় গিয়েছে, কিছু হলো। দেখলাম কেউ কোন উত্তর দিলো না, বরং খুব টেন্‌স্ হয়ে পড়লো। কৃষণজীও চুপ ছিলেন। একজন উঠে এসে আমাকে বললেন ঃ ম্যাডাম আপনি এই বিষয়টি জানতে যদি খুবই আগ্রহী হন তো আমরা ফরেন সেক্রেটারি পর্যায়ে ইন্টারভিউ বা আলোচনার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। ফলে দেখেছি যে রাজনীতিক আলোচনা কিংবা কোন কৌতুহলকে এরা একদম পছন্দ করতো না।

সোভিয়েত জনতার মনে অনেক প্রশ্ন ছিলো, কিছু স্বাধীন চিন্তার ইচ্ছা ছিলো কিন্তু সব কিছুতেই প্রতিবন্ধকতা ছিলো। ইউরোপে দেখেছি চেক্, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত বিরোধী মেজাজ। বুদাপেস্টের রাস্তায় সোভিয়েত সৈন্য মার্চ করে গেলে জনতা কটু মন্তব্য ও গালিগালাজ করতো। আসলে জনতাকে এইভাবে দমিয়ে রাখা যায় না।'

❑ পাস্তেরনাকের ডঃ জিভাগো ও সলঝেনিৎসিনের গুলাগ আর্কিপেলাগো কৃষণজীতো পড়েছেন, তার মত কী?

স.সি. অবশ্যই পড়েছেন এবং বলেছিলেন যে, এই বই দুটি খুবই কমজোরী বই, মূলতই সোভিয়েত বিরোধিতা। এটা ছিলো নিজেদের মধ্যকার কন্‌ফ্লিক্ট এবং এই কারণে এটাকে ব্যান করেছিলো। এছাড়াও একটা কাবণ ছিলো, এ দুটির স্তালিন বিবোধিতা। এই সব মিলিয়ে ছিলো সমস্যা।

পরবর্তীকালে শাসনক্ষমতায় যাবা ছিলো তারা লেনিনের নীতি থেকে অনেক সরে এসেছিলো। স্তালিনের ক্ষমতা দখলের পর, ১৯৫০ সালেব পরে ওদেশে অনেক কিছু ঘটেছে, সকলেই জানেন। বিরুদ্ধে তো বলার প্রশ্নই ওঠে না, কেউ কিছু আলোচনা পর্যন্ত করতে পারতো না। স্তালিনের মেয়ে শ্বেতলানাকেও দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়।

❑ আপনারা সোভিযেতে গিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন যাপন ও দেশের গঠনের অনেক কিছুই দেখেছেন।

স.সি. বিশ্বযুদ্ধ সোভিয়েত জনতাকে কাবিল (চালাক) করে তুলেছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংস কেমন হয়েছিলো তা ধারনাও করা যায় না। তাদের কাছে জমি ছিলো কিন্তু ফসল ফলাবার সংস্থান ছিলো না। লেনিনগ্রাদে এমন সব জায়গা দেখিয়েছে সেখানে মানুষ ঘাস খেয়ে ছিলো, মৃত্যু অবধারিত জেনেও। হিটলারকে রুখতে জনতাকে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তার কোন হিসাব হয় না।

একদিন আমি বলেছিলাম আপনারা এতো এতো রুটি আনান কেন। ওরা বলে, আমরা অনেকদিন ধরে ক্ষুধার্ত ছিলাম। এটা আমরা ভুলতে পারি না। এটা আমাদের 'সাইকোলজিক্যাল ক্ষুধা'।

❑ বোরিস পলেভয়ের 'ফেট অব ম্যান'— এও অনেক রকম কন্টোভার্সি ছিলো। এতে দেখানো হয়েছে মানুষ লড়াইয়ের ময়দান থেকে বাইরে থেকেও নিজের ভাগ্য তৈরী করতে পারে।

স.সি. দেখুন সোভিয়েত ইউনিয়নে সব কিছুকে এমন নিয়মের মধ্যে রাখা হয় যে তার বাইরে আমরা তেমন কিছু জানতে পারিনি। এই বইয়ের মধ্যে রাজনীতি কী ছিলো এনিয়ে আমি কৃষণজীকেও জিজ্ঞাসা করিনি।

❑ রুশ সাহিত্য কংগ্রেসের শেষ দিনের কথা বলুন।

স.সি. বিদায়ের সময় এলো, পরের দিন ফৈজ-এর ভিয়েনা যাবার ছিলো, আমাদের আজেরবাইজান। ডকাইনা হোটেলের লম্বা চওড়া লাউঞ্জে আমাদের দোভাষী এরিনা। আমরা গলা জড়িয়ে ছিলাম। অন্য ষাট/সত্তর দেশের সাহিত্যকাররাও দল বেঁধে এসেছিলেন। ফৈজ দুটো কবিতা দেন—একটি সর্দার আলি জাফরির জন্য, অন্যটি সজ্জাদ জাহিরকে দেবার জন্য। এ দুটি তখনও কোথাও ছাপা হয় নি। আর মজা এই যে ফৈজ এর কবিতা পাকিস্থানে ছাপার আগে এদেশেও ছাপা হয়েছে অনেক।

❑ কৃষণজীর কী কী বই রুশ ভাষায় অনুবাদ হয়েছে?

স.সি. কৃষণজীর প্রায় প্রতিটি বই বিদেশী ভাষায় অনুদিত হয়েছে। রাশিয়া এক বিরাট দেশ, বহু আঞ্চলিক ভাষা—কাজাখাস্থান, উজবেকিস্থান, তুর্কমেনিস্থান। সব আঞ্চলিক ভাষাতে তার লেখা অনুবাদ হয়েছে। তিনি যা কিছু লিখতেন সবই রুশ ভাষাতে অনুদিত হয়েছে। আমরা যে কোন হোটেল, রেস্তোরায় গিয়েছি ওয়েট্রেসরা এসে কৃষণজীকে তার সর্বশেষ রচনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছে। এটাতো আমাদের জন্য অনেক হয়রৎ কী বাত (অনেক গৌরবের কথা)। অরুণা আশফ আলির কাছে শুনেছি কৃষণজীর এক রচনায় এক জিপসি মহিলার কথা আছে—লাচি। সেই উপন্যাসকে নাটকের রূপ দিয়ে বাইলোরুশিয়ায় এক জিপসি থিয়েটারে লাচি নামে ২৫ বছর ধরে নাটক চলেছে, এক দম নিজেদের নাটক ভেবে নিয়ে। এওতো হয়রৎ এর কথা।

❑ কৃষণজীর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ কী?

স.সি সার্বিকভাবে যা কিছু হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়, মানুষের কাছে তাই প্রিয় হয়ে ওঠে। কৃষণজীর রচনাতেও মানুষ সেই মন ছুঁয়ে যাবার বিষয় পেয়েছেন। এখন আপনি যদি কোন সৌন্দর্যকে দেখেন তার মাপকাঠি অনেক রকম। কৃষণজী এমনই মাপের লেখক ছিলেন যে তাঁকে ভগবানের মতো পূজা করা হতো। এই আন্ধেরিতে এক পানের দোকান। ছোট কারবার। ভদ্রলোক দোকানের নাম রেখেছিলেন কৃষণ চন্দর স্টোর্স। কৃষণজীর একটা লাইনও যদি লেখা হতো তো তাঁকে পড়ে শোনাতে হতো। তিনি সকলকে বলতেন কৃষণজীতো মেরে লিয়ে কৃষ্ণ ভগবান। তিনি তাঁর পূজা করতেন এবং বলতেন তিনি যদি তাই না হবেন তো তাঁর কলমে এমন তাকত কি করে এলো। শাহির এক কবিতায় বলেছেন, কৃষণ সব অবস্থাতেই আসেন। যদি কোথায় কোন জুলুম হয় কোন তকলিফ্ হয় তখন তিনি আসেন। গীতায় এই ধরনের কথা আছে। আজকের সাহিত্যকারদের মধ্যে কৃষ্ণ হলো কৃষণ চন্দর।

❑ গোপীচাঁদ নরঙ্গ কৃষণজীর সাহিত্য মূল্যায়ণ করতে গিয়ে বলেছেন ঃ এটা খুবই দুঃখজনক বিষয় যে কৃষণ চন্দরের চূড়ান্ত আদর্শবাদ প্রায়শই তাঁর শিল্প মনকে ক্ষুণ্ণ করেছে, তাঁর আবেগ প্রায়শই অশ্রুপূর্ণতায় অবদমিত হয়েছে এবং বিষয় বস্তুর উপরের সরটুকু তুলে নেওয়ার প্রবৃত্তি তাঁকে বিষাদপূর্ণ বিষয়ের দিকে নিয়ে গেছে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষণ চন্দরের সৌন্দর্যবোধ এতই ব্যাপক ছিলো এবং মানবতাবোধ এতই অনুপ্রবেশযোগ্য ছিলো যে তাঁর যে কোন দুর্বল মুহূর্তেও কৃষণ চন্দরের রচনা কখনই নীরস হয়নি। এবং তাই তিনি স্পষ্টভাবেই আলাদা মাপের লেখক। উর্দু লেখকদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য নেতৃত্ব হিসাবে গণ্য হবেন।

স.সি. গোপীচাঁদজী কৃষণজীর ব্যাপারে খুব উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, সাহিত্য অকাদেমির হয়ে তিনি কৃষণজীর লেখার সংকলন প্রকাশ করেছেন। এটা সেই ব্যাপারে লেখা।

❑ ফিল্মের ব্যাপারে তিনি বম্বে কবে আসেন?

স.সি. তিনি বম্বে আসার আগে ছিলেন লক্ষ্ণৌ ১৯৪২/৪৩। তারপর এস ডব্লু জেড আহমদ সাহেব কৃষণজীকে বম্বের শালিমার স্টুডিয়োতে আনেন সম্ভবত ১৯৪৫। আমিও তখন তার সঙ্গে ছিলাম না। তাই ভুলও হতে পারে। বম্বে এসে তাঁর প্রথম তৈরী ছবি নিজেরই কাহিনী 'সরাই কে বাহর' অবলম্বনে। আরও একটা ছবি

করেছিলেন রাখ (ছাই)। বাংলায় যে উত্তর ফাল্গুনী হয়েছিলো যাতে সুচিত্রা সেন বিকাশ রায় অভিনয় করেছেন, তারই হিন্দী চিত্রায়ণ হয়। চিত্রনাট্য লেখেন কৃষণজী এবং নির্দেশনা করেছেন অসিত সেন। 'সরাই কে বাহর' সম্ভবত ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে তৈরী করেছেন।

❑ কৃষণজীর ফিল্ম জীবনের ব্যাপারে বিশেষ কোন ঘটনা।

স.সি. কৃষণজী পুণায় এলে শ্যামের মাধ্যমে তখনকার খ্যাতিসম্পন্না অভিনেত্রী স্নেহপ্রভা প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিতা, সাহিত্যরুচিসম্পন্না। ঐ সময়ে মিস প্রধান ফৌজের জন্য ইংরাজীতে নাটক তৈরীতে ব্যস্ত আর কৃষণজী নিজের নাটক 'সরাই কে বাহার' নিয়ে ব্যস্ত। এই অবসরে দুজনের দেখা ও আলোচনা হতো।

কৃষণজী শুরু করেছিলেন শালিমার স্টুডিওতে ফিল্ম জীবনের কাজ। একটা ঘটনার কথা উনি বলেছেন যে রামানন্দ সাগর, জোশ মালিয়াবাদী, নীনা ও আহমদ ও কৃষণজীর মধ্যে শালিমার স্টুডিওতে সমস্যা হয়।

শালিমার স্টুডিওতে কৃষণজী স্ক্রিন প্লে ডিপার্টমেন্ট-এ ছিলেন। সাগরজীও। আহমদ সাহেব নীনাকে ঐ ডিপার্টমেন্টের প্রধান করলে জোশ ও সাগর আহমদ-এর বিরুদ্ধে যায় এবং নীনার এই নিয়োগ মানতে পারে না। কিন্তু জোশ কৌশলে সাগরকে দিয়ে এমন এক ইস্তফা পত্র দেয় যাতে নীনার বিরুদ্ধে কটাক্ষ থাকে। ফলে সাগরের চাকুরী যায়, উনি পুণা থেকে দিল্লী চলে গেলেন। চেতন্ আনন্দ ও বলরাজ সাহনীকে ফিল্মে এনেছিলেন কৃষণজী। আহমদ সাহেব এই যুবক দুজনের সঙ্গে আলাপ করে খুসী হলেন এবং এক হাজার টাকা মাইনে দিতে চাইলেন, যেখানে কৃষণজী পান সাড়ে ছয়শো টাকা এবং শ্যামের থেকে বেশী ছিলো চেতন ও বলরাজের মাইনে। কথাটা আহমদ সাহেবের কানে গেলো, কৃষণজীর উপর অসন্তুষ্ট হলেন। কৃষণজীকে ডাকলেন। কামরায় আহমদ সাহেব বসে আর নীনাকে নিজের সোফার কাছে বসিয়ে কৃষণজীকে বলেন ঃ আপনি ওদের বলেছেন যে যদি নীনাকে রাজী করানো যায় তবে আহমদ সাহেব ওদের মাসিক বেতন বাড়াতে বাধ্য হবেন। কিছু চুপ করে থেকে বললেন ঃ ঠিক আছে আজ থেকে আপনার মাইনে আমি একশো টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছি। কৃষণজী বলেছেন এই দুটি ঘটনায় কেউ কৃষণজীকে যুক্ত করে দিয়ে যথেষ্ট অপমানিত হওয়ার কাজ করেছে। এগুলি ছিলো কৃষণজীর প্রতি অন্যের ঈর্ষার কারণ। তিনি বলেছেন ঃ মনে হলো কেউ আমার মুখের উপর ঝাঁটা মারলো। আমি ধন্যবাদ না জানিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এলাম। ঐ দিন আমি ভেবে নিয়েছি এখন আমাকে পুণা থেকে চলে যেতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ; যেভাবে আমি লক্ষ্ণৌতে ভেবেছি।

❑ এরপর উনি বম্বে এলেন কীভাবে?

স.সি. ঐ ঘটনার পর কৃষণজী পুণায় থাকতে চাইছিলেন না আদৌ। কৃষণজী বলেছেন যে একদিন ইন্দ্ররাজ আনন্দ কৃষণজীর কাছে এলেন। তিনি ছিলেন বম্বে টকিজের পাব্লিসিটি অফিসার। কৃষণজীকে বল্লেন যে দেবীকা রাণী তাঁকে বম্বে যেতে বলেছেন এবং নিয়ে যেতে আনন্দ সাহেব এসেছেন। দেবীকা রাণী ছিলেন প্রয়াত ডাইরেকটর হিমাংশু রায়ের স্ত্রী, বম্বে টকিজ-এর মালিক আর ঐ সময়ের হিন্দুস্থানী ফিল্ম-এর সব

থেকে বিখ্যাত হিরোইন। কৃষণজী জানতে চেয়েছেন যে কেন ডেকেছেন। আনন্দ বলেন যে দেবীকাজী ইন্টারভিউ-এর জন্য ডেকেছেন। প্রথমবার কৃষণজী যাননি। কৃষণজী বলেছিলেন যে শালিমার স্টুডিও-র সাহিত্যিক আর সুরুচিপূর্ণ বাতাবরন ছেড়ে যেতে উনি চান নি। দ্বিতীয়বার ইন্দ্ররাজ এসেছেন এবং অবশ্যই কৃষণজীকে নিয়ে যাবেনই ঠিক করে এসেছেন। কৃষণজী বম্বে গেলেন এবং দেবীকা রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কৃষণজী অদ্ভুত শর্ত রাখেন যে তিনি পুণাতে সাড়ে ছয়শো পান এখানে পনেরশো নেবেন। দেবীকা রাণী বল্লেন ঃ মঞ্জুর। এইভাবে কৃষণজী বম্বে চলে এসেছিলেন।

❑ কৃষণজীর নিজের উপর যে ডকুমেন্টারি তৈরী হয়েছিলো তার বিষয়ে কিছু বলুন।

স.সি. ফিল্ম ডিভিশন ঠিক করলো যে কৃষণ চন্দর-এর সাহিত্য ও জীবন নিয়ে কুড়ি মিনিটের একটা ডকুমেন্টারী তৈরী হবে। তাঁর ভাই মহেন্দ্রজীকে ডেকে এই কাজ সঁপে দেওয়া হলো। বম্বেতে সুটিং-এর কাজ চললো কদিন, পরে পুণায়। এরপর কাশ্মীর যাবার প্রোগ্রাম। ওখানে মহেন্দ্র ও কৃষণজীর ছোটবেলার ও যৌবনের অনেক স্মৃতি ছিলো। প্রথম দেওয়া তেরো হাজার টাকা খরচ হয়ে গেলে, কোন এক ব্যাঙ্ক থেকে এই ডকুমেন্টারীর জন্য মহেন্দ্রজী পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ নেন।

❑ এই ডকুমেন্টারী কী শেষ পর্যন্ত তৈরী হয়েছিলো, কেননা আত্মজীবনী-তে সেরকম স্পষ্ট কিছু নেই।

স.সি. এটা তৈরী হয়েছিলো, টেলিভিশনেও দেখানো হয়েছে। মহেন্দ্রজী দায়িত্ব পেয়েছিলেন আর মধুসূদনজী এটা পরিচালনা করেন। ফিল্ম ডিভিশনের কাছে এর স্ক্রিন প্লে থাকতে পারে অথবা মধুসূদনজীর কাছেও জিজ্ঞাসা করতে পারেন। দাদারে 'ফিল্ম রাইটার্স এ্যাসোসিয়েশন' এর অধিকর্তা তিনি। শ্রীসাউন্ড স্টুডিওর কাছে এর অফিস। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে এই ডকুমেন্টারী ব্যাপারে সব জানতে পারবেন। ফিল্ম ডিভিশনের কাছে এর প্লে-রাইট আছে।

❑ কাশ্মীর-এ সুটিং এর পর্ব সম্পর্কে বলুন।

স.সি. মহেন্দ্রজী যে টাকা ঋণ নিয়েছেন তা দিয়ে ডকুমেন্টারী শেষ হবার কথা। এই পর্বে মহেন্দ্রজী, আমি, সরলা, মধুসূদন, প্রীতম বেদী সহ ২৩ জনের এক দল নিয়ে যাবেন বলেন। কৃষণজী বলেন তুমি তো বরযাত্রী নিয়ে চলেছো। এসব ছাড়ো, স্রেফ ছ জন লোক নিয়ে চলো। এতে মহেন্দ্রজী দুঃখ পান। তিনি বলেন, ভাই সাহেব টাকা বাঁচিয়ে কী করবো, আমার ছেলে মেয়ে নেই। এই মত্তকায় পুরো পরিবার ও বন্ধু বান্ধব চলুক, আমার মনের খুসী পুরো করতে দিন। জম্মুতে যখন কাফিলা নামলো, তখন দেখা গেল বাইশ জনের দল।

❑ শিয়ালকোট যাবার সময় যে সব রিফিউজীর কথা আছে তা কী?

স.সি. ওটা ছিলো পুঞ্চ-এর দিকে 'ছাম্ব সেক্টরে'। দুই দেশের লড়াইয়ে যে সব মানুষজনের ঘরদোর শেষ হয়ে গেছে তারাই ছিলো ঐ রিফিউজি এলাকায়। আমি পুঞ্চ গিয়ে দেখেছি সারা এলাকায় মিলিটারীর লোকজন ছেয়ে গিয়েছিলো। তখনও কাশ্মীর সমস্যা হয়নি। বর্ডার এলাকা, তাই রাতভর ফায়ারিং হতো।

❑ কৃষণজীকে জেলে যেতে হয়েছিলো কি পারিবারিক কারনে?

স.সি. ভগৎ সিং সংক্রান্ত ব্যাপারে একবার জেলে যাবার উপক্রম হয়েছিলো, বলেছিলেন। কিন্তু পারিবারিক কোন কারণে জেলে যাবার ঘটনা আমার জানা নেই।

❑ জগদীশচন্দ্র ওয়ার্ধন এ কথার উল্লেখ করেছেন।

স.সি. করে থাকতে পারেন, কিন্তু আমাব জানা নেই, আর তাঁর প্রথমা স্ত্রীও আর বেঁচে নেই।

❑ আপনাদের বড় ছেলে এখন কোথায় থাকে?

স সি দেখুন বড় ছেলে বলতে কৃষণজীর দুই মেয়ে এক ছেলে। বড় মেয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলো। পুণায় থাকাকালীন মাবা যায়। ছেলে রঞ্জন চোপড়া বম্বের কোথাও থাকে, বোনের সঙ্গে অথবা নিজেব পরিবারের সঙ্গে। তাকে কৃষণজী একটা প্রেস কবে দিয়েছিলেন। বহু দিন ওর খবর আমাব জানা নেই কেননা আমাব সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই। কৃষণজীব এক ভাই উপেন্দ্রনাথ বেঁচে আছেন। ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকেন দিল্লীতে।

❑ কৃষণজী 'বচপন কী য়্যাদে' তে ভূগোল স্যারের বিরুদ্ধে ইস্তেহার লিখে হেড স্যারের অফিসের দেয়ালে সাঁটিয়ে ছিলেন। কৃষণজী নিজেই বলেছেন হাতে লেখা এই ইস্তেহাবই মনে হয় সাহিত্য জগতে প্রবেশেব প্রথম পদক্ষেপ, কী কী বলেছেন বচপন নিয়ে?

স.সি. অনেক লেখা আছে বচপন নিয়ে। 'মেরী য়্যাদোকে চিনার', 'মিট্টি কে সনম', 'কালু ভাঙ্গরি'। কৃষণজী তাঁর আত্মজীবনীতে ছেলেবেলার অনেক লেখা লিখেছেন। কাশ্মীর পর্বের অনেক কিছু আছে বচপন বিষয়ক লেখায়। আত্মজীবনী লেখার জন্য আমি কৃষণজীকে বলি। টলস্টয়-এর ঘর ইয়াসানা পলিয়ানা থেকে মস্কো ফেরার পথে কৃষণজী আমাকে বলেন, আত্মজীবনী লিখে ফেলা দরকার। আমি বললাম, অচানক এই রকম বিচার আপনার কেন এলো? তিনি বলেন, কি জানি কেন। এই খেয়াল আসছে যে এটা লেখার ওযাক্ত এসে গেছে। বললাম, ঠিক আছে এই কাজে দেরী করার দরকার নেই। বললেন, কাল সকাল থেকে লেখা শুরু করে দেবো। কিন্তু লেখা শুরু করতে পারলেন না পরদিন লেনিনগ্রাদ, ওখান থেকে বাকু, আসনাবাদ, তাসখন্দ, সমরখন্দ, বুগরা। মস্কো থেকে ফিরে পুর্ব জার্মানীর কর্মসূচী তৈরী হয়ে গেলো। ইজরায়েলের যুদ্ধ শুরু হলে তিনি সোভিয়েত প্রতিনিধিদের সঙ্গে কাহিরা চলে গেলেন। এইভাবে আত্মকথা শুধু কথা ও খেয়ালেই ছিলো। ভারতে ফিরে বিহারের আকালে অর্থসংগ্রহের কাজে লেগে গেলেন। বম্বে ফিরে এলে আমি কৃষণজীকে আত্মকথা লেখার অনুরোধ করি। কৃষণজী বললেন প্রথমে বিহার সফরের বৃত্তান্ত লিখবেন। তার শীর্ষক হবে 'বম্বই কে বঞ্জারে'। আমি বললাম, খুব ভালো হবে; কিন্তু অটোবায়োগ্রাফী। কৃষণজী কিছু সময় নিয়ে উত্তর দিলেন ওটাও হয়ে যাবে। কৃষণজীর আত্মজীবনী লেখার সম্পর্কে—বিষয়বস্তুর ধরণ, ভাষা, স্টাইল, আত্মকথা লেখার ব্যাপারে প্রচ্ছন্নতা কিংবা সরাসরি ঘটনাবর্ণনা, সাল তারিখ এর পরিবর্তে কাহিনীমালা ইত্যাদি, সত্য ঘটনা বর্ননে নৈতিকতা সম্পর্কে কৃষণজী অনেক কথা বলেছিলেন। এই সব কিছু 'আধে সফর কী পুরী কহানী'-র ভূমিকা অংশে আছে। তিনি যখন সত্যি

সত্যিই আত্মজীবনী লেখায় নিমগ্ন হলেন, আমি তাঁকে খুবই উৎসাহিত করি। কৃষণজী বলেন আত্মকথা লেখার আর আছে কী! আমি তো আমার সব কাহিনীতেই আছি। আমার কাছে আরো পুরো একটা জীবনের কাহিনী লেখাব মাল মশলা আছে। যদি সময় পাওয়া যায় আমি যেভাবে দেখেছি, শুনেছি তাতে একটা পুরো জীবনের কথা হয়ে যাবে। তবে আমার মনে হয় সেই সময় আমি পাবো না।

❑ আমাদের বাংলা ভাষায় কৃষণ চন্দর-এর লেখা পর্যাপ্ত ছিলো না। ছোট একটা সং কলন বেরিয়েছিলো কল্পনা প্রকাশনী-এর ৫৫মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রকাশক ঃ কে চট্টোপাধ্যায়, প্রথম ঃ প্রকাশ আগষ্ট ১৯৫৭, দাম ঃ চার টাকা)। অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছিলেন বোম্মানা বিশ্বনাথন্। দশটা ছোট গল্প ছিলো। একটা ছিলো 'খাঁটি দুধ'। ঐ বিহারের থেকে আসা শ্যাম বিহারী দুধ আনতে যায় মালিকের জন্য।

স.সি. হ্যাঁ ঐ সময় মালিকের স্ত্রী লক্ষ্মী গর্ভবতী ছিলো।

গল্পের মধ্যে আছে স্ত্রী স্বামীকে কেবলই অভিযোগ করছে যে শ্যাম বিহারী দুধে জল মেশাচ্ছে। দুধের আব তেমন স্বাদ থাকছে না। লক্ষ্মীর পোয়াতি হওয়ার চতুর্থ মাসে দেখে, তার আগামী শিশুর কাঁথা ফ্রক থেকে দুটো ফ্রক উধাও। যত্ন করে কাপড় দিয়ে তৈরী পুতুল, তাও চুরি হয়ে যায়। এরই মাস তিনেক পরে দুধে জল মেশানোর অভিযোগ। মালিক দুধেব জন্য নিজে গিয়ে দেখেন শ্যামবর্ণা রোগা বিটকেল চাকরাণী, ময়লা গা, নয়মাসের পোয়াতি মনে হলো এবং জানলেন এই চাকরাণী শ্যাম বিহারীর স্ত্রী। গল্পের দার্শনিক বিষয় এই, কেউ প্যালেসেই থাকুক বা ঝোপপট্টিতে থাকুক, দুই নারীর গর্ভে একই ধরনের প্রাণেব সৃষ্টি হচ্ছে। জন্মের আগে তার কোন দেশ নেই, কাল নেই, শ্রেণী চিহ্ন নেই, আছে শুধু অনন্ত প্রাণের সূচনা। ঐ পেটওয়ালী আউরৎ যখন দুধ খেতে চায় তা নিজের জন্য নয় বরং তার গর্ভে যে কচি প্রাণ আছে তা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছে অহরহ। সে পেট ভরে খেতে পায় না, আগন্তুক প্রাণের চাহিদা মেটাবে কী ক'রে। সে যে দুধটুকু পান করে তা গর্ভের সন্তানের জন্য। সৃষ্টির পর তার জন্য দরকার ওম। তাই লক্ষ্মীর তৈরী কাঁথা চুরি হয়ে যায়। আবার লক্ষ্মী যখন অভিযোগ করে দুধে জল মেশানো হচ্ছে তখনও তার অভিযোগ একই কারণে যুক্তিযুক্ত। তাই লক্ষ্মীর অভিযোগ শুনেও তার স্বামী বলে, বলতে পারো, লক্ষ্মী এই পৃথিবীতে বাচ্চাদের কাঁথা আর দুধের বোতল এত কম কেন?

❑ কৃষণ চন্দরের লেখার তরিকা কেমন ছিলো।

স.সি. চাইতেন তাঁর লেখার সময় যেন কেউ তাঁকে অমনোযোগী না করে। তিনি বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন খুবই ভালোবাসতেন কিন্তু লেখার সময় চাইতেন একদম একা বসে লিখতে। খুব ভোরে উঠে লিখতেন। কিন্তু এমন নয় যে উঠেই লিখতে বসতেন। তবে চেয়ার টেবিলে বসতেন না। খাটে বসে কোলের উপর লেখার প্যাড নিয়ে লিখতেন এবং তাও খুব পরিষ্কার হওয়া চাই। তা না হলে তিনি লিখতেন না। হাল্কা নীল রঙ-এর কাগজ হওয়া চাই এবং একটু দামী। তাঁর এই লেখার তরিকা সম্পর্কে খ্বাজা আহমদ আব্বাস লিখেছেন যে কৃষণ চন্দরের লেখার ধরন এমনই নওজোয়ান। কৃষণজীর সমস্ত লেখাই ছিলো তাঁর পাঠকদের জন্য প্রেমপত্র। সাদা রঙ না হয়ে তা হতো হাল্কা নীল রঙ-এর।

□ কৃষণ চন্দর-এর রিপোর্টাজ বিষয়ক লেখা এবং পার্টিশান এর সময়ের লেখাগুলি বাঙালী পাঠক-এর কাছে উল্লেখযোগ্যভাবে আদরনীয়। পৌঁদে আমরা প্রথম সংখ্যায় অনুবাদ করেছি।

স.সি. হ্যাঁ, রিপোর্টাজ কৃষণজীর উল্লেখযোগ্য লেখা। কৃষণজী রিপোর্টাজ-এ কাহিনীমূলক উপাদান সংযোজন করেন। তাঁর রিপোর্টাজ খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। অনেক লেখককে এই সাহিত্যকৃতির দিকে মনোযোগী করেন। 'পৌঁদে', 'সুবহ হোতী হৈ' এবং 'লাহোর সে বহরম গল্লহ তক' তাঁর তিনটি রিপোর্তাজ। পৌঁদে হায়দ্রাবাদে, সুবহ হোতী হৈ ত্রিচুরে অনুষ্ঠিত প্রগতিশীল লেখক সম্মেলনের বিবৃতি এবং 'লাহোর সে বহরম গল্লহ তক' ভারত বিভাগের সময় সাম্প্রদায়িক গোলযোগের মধ্যে লেখা।

□ কৃষণ চন্দর সম্পর্কে আপনি কি লিখেছেন?

স.সি. সেই সময় বেশ কিছু প্যাসেজ লিখেছি। অনেক আর্টিকেল লিখেছি তিন/চার পাতার। 'আধ ঘন্টে কী কহানী'তে সব কিছু নিয়ে লিখেছি। জগদীশ চন্দ্র ওয়াধর্ন এর বইতেও কিছু আছে। আর তা ছাড়া অন্যগুলি এখন পাওয়া মুস্কিল।

□ আমরা চাইছি বছর ভিত্তিক ঘটনাক্রমগুলি জানতে। তা থেকে কৃষণজী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। আপনার বিবাহ (কৃষণজীর সঙ্গে) কবে হয়? এই বছরের উল্লেখযোগ্য কাহিনী কী?

স.সি. কৃষণজীর সঙ্গে আমার বিবাহ হয় ৭ই জুলাই ১৯৫১ নৈনিতালে। এটাই সেই বছরের সব থেকে উল্লেখ্য ঘটনা, এ ছাড়া আর কী।

আমার বিয়ের আগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কৃষণ চন্দরের জীবনে— ১৯৫৫ সালে 'হিন্দী চীনী ভাই ভাই' পর্যায়ে তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে চীনে গিয়েছিলেন। এরপর ৫৭ সালে আমাদের বিবাহ হয়। এরপর দশ বছর অনেক ঘটনা বহুল সময় গেছে। আমি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতাম। ষাটের দশকের প্রথম দিকে কৃষণজী বম্বেতে ছিলেন। ৬০' সালে আমরা এক বছরের জন্য দিল্লীতে ছিলাম, তারপর ১৯৫৭ সালে বম্বে চলে এলাম। থাকতাম 'গুরু নিবাস' বাংলোয়। ঠিকানা ছিলো 15th Road, Khar, Bombay। ওটা এখনও আছ। তারপর ১৯৬০-এ আমরা চলে এলাম সান্টাক্রুজ। থাকতাম 'নিৎসে'-তে। ওখানে আমরা ত্রিশ বছর ছিলাম। ১৯০৭সালে প্রথম ইউরোপ যাই রাশিয়া হয়ে। ৯ই মে আমরা যাত্রা করি। মস্কোতে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত লেখক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর সঙ্গে যোগ দিই। সেই কৃষণজীর সঙ্গে আমার প্রথম বিদেশ সফর। মস্কোতে ছিলাম হোটেল ইউক্রাইনা মস্কবাতে। রাশিয়াতে থাকাকালীন টলস্টয়-এর বাসভবন এবং ম্যুজিয়ম দেখতে যাই। লেনিনগ্রাদ, তাসখন্দ, সমরখন্দ, আজারবাইজান-এর বাকুতে যাই। তারপর ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাই। বার্লিন, পটসডাম, লাইপজিগ, ড্রেস্টর, মহাকবি গ্যেটের বাসভবন ভাইমার, হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্ট, নীল জলের নদী দানিয়ুব, বালাটোনা হ্রদ— আরো অনেক স্থান পরিদর্শন করি কৃষণজীর সঙ্গে। এই সফরে আমাদের জন্য প্লেন-এর ব্যবস্থা ছিলো। কিন্তু আমি বলি যে মস্কো থেকে বার্লিন আমি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেন-এ যাওয়াই পছন্দ করছি। বার্লিন যাবার পথে চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড ভ্রমনও হয়। প্রাগ ও ওয়ারশ দেখে পৌঁছাই পূর্ব জার্মানী। তখন একে বলা হতো ডি.ডি.আর (ডয়েৎস ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক)। জার্মানীর বহু স্থান দেখি। এটা ছিলো জুন মাস।

আমরা জার্মানীতে দেখি বুখেনভাল্ড কনসেনেট্রেশন ক্যাম্প। কৃষণজীর প্রথম হার্ট অ্যাটাক হয় ১৯৫৭ নভেম্বর, জন্মদিনে।

❏ বুখেনভাল্ড দেখার পর তার কী কোন প্রভাব পড়েছিলো কৃষণজীর উপর?

স.সি. হ্যাঁ, বুখেনভাল্ড দেখে আসার পর তিনি খুব অসুস্থবোধ করেন এবং খুব বেদনার্ত হয়ে পড়েন। আমাদের দোভাষী ছিলেন রোজেনথাল, আমাদের সঙ্গে বুখেনভাল্ড গিয়েছিলেন। তারপর যখন আবাসস্থলে ফিরে এলাম সেই মহিলা দোভাষীকে দেখলাম একদম চুপচাপ আর স্থির হয়ে আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আরে ভাই কী ব্যাপার। তিনি বললেন যে বুখেনভাল্ড কন্‌সেন্ট্রশন ক্যাম্পে আমার মা বাবা পুরো পরিবার ও আমার প্রেমিক ছিলো। বললাম কী হলো তাদের। তিনি বললেন ঃ কৃষণজী, আমার পুরো পরিবার গ্যাস আর ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে গিয়েছিলো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। কৃষণজী কিছু খেলেন না; আর সারারাত দুঃখ-বেদনা আর অস্থিরভাব মধ্যে কাটালেন।

❏ বুখেনভাল্ড কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের উপর বই আছে 'নেকেড অ্যামঙ উলফস' ব্রুনো আপিৎস এর লেখা। ক্যাম্পে গিয়ে কারো সাথে দেখা হয়েছিলো?

স.সি. একজন অতিবৃদ্ধ, তার গভীর চোখ দুটি দুঃখ ভরা। তিনি ওখানকার সুপারভাইজার তখন, নাম মনে পড়ছে না। তাঁকে আমি বুখেনভাল্ড কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। ইনিই ছিলেন শেষ ব্যাচের কয়েদি। তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো গ্যাস চেম্বারে মারার জন্য। সেই সময় হিরোসিমা নাগাসাকির ঘটনা ঘটে। বুখেনভাল্ড কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের পতন ঘটে। এঁরা রক্ষা পেয়ে যান। কৃষণজী এই বৃদ্ধকে অনেক প্রশ্ন রেখেছিলেন। কেমন করে, কিভাবে এই কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, কী কী ঘটনা ঘটেছিলো।

❏ বিশ্ব শান্তি পরিষদ-এর ভারতীয় সদস্যের সঙ্গে বিজয় ভট্টাচার্য গিয়েছিলেন বার্লিন সম্মেলনে। তিনি বলেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে বুখেনভাল্ড কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ব্রুনো আপিৎস সহ উপন্যাসের নায়ক স্টিফেন সায়লক এর দেখা হয়েছিলো। যেখানে থালম্যানকে যেখানে পুড়িয়ে মারা হয় সেই ক্রিমেটোরিয়াম এর জায়গায় গোলাকৃতি স্মৃতি-স্মারক আছে। ক্যাম্প সিনিয়র ক্রেমার-এর স্মৃতিও আছে ওখানে।

স.সি. হ্যাঁ সব কিছু দেখেছি। বহু উঁচু স্মারক গৃহ। ঢুকেই মেঝেতে তৈরী পায়ের ছাপ, কাঁটা তার, অনেক কিছু লেখা জার্মান ভাষায়। ঘরের দেয়াল ঘিরে ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সেখানে একটা বড় ঘন্টা বসানো আছে, তার গায়ে কাঁটাতার বসানো।

❏ আপনারা উঠেছিলেন?

স.সি. না। কৃষণজী বলছিলেন, আমার শ্বাসবন্ধ হয়ে আসছে। আমি থাকতে পারছি না। আমাকে নিয়ে চলো।

❏ বুখেনভাল্ড কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প মহাকবি গ্যেটের বাড়ীর কাছেই। মহাকবির বাড়ীতে গিয়েছিলেন?

স.সি. হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

❏ ইউরোপের ব্যাপারে আপনার ইম্প্রেশন কী?

স.সি. ইউরোপের তিনটি দেশে গেছি। জার্মানীর সর্বত্র ঘুরে বিস্মিত হয়েছি যে এত

বড় যুদ্ধ বিপর্যয়-এর পরও কীভাবে নিজেদের সামলে নিয়েছে। পটসডামেও গিয়ে দেখেছি যুদ্ধোত্তর যুগের উন্নতি, স্মৃতিসৌধ নির্মান-এসব। বার্লিন প্রাচীর দেখেছি— কীভাবে পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনকে বিভক্ত করেছে, বাটোয়ারা করেছে। আমাদের দোভাষী ব্যাখ্যা করেছেন তাব আত্মীযরা অনেকেই রয়েছে পশ্চিম বার্লিনে। তিনি তাদের সঙ্গে মিলতে পারেন না। আপনাদের দেশে হিন্দুস্থান পাকিস্থান বাটোয়ারা হয়েছে। আত্মীয় বিচ্ছেদেব দুঃখ অনেকটাই বুঝতে পারি। ওখানেও তাই।

❑ কৃষণজীর উপর পোষ্টওযার ইউরোপের শিল্প-সাহিত্য, চলচ্চিত্র, ভাষ্কর্য-এব কি ইম্প্রেশন পড়েছিলো? এই প্রভাব বহু কাল ধবে চলেছে?

স.সি. কৃষণজী দেখেছিলেন যুদ্ধোত্তর ইউরোপেব শিল্প সাহিত্যে দেশভাগের প্রভাব বিশেষ করে প্রগতিশীল লেখকদের গভীর ধাক্কা দিয়েছে। ঐ সময় কৃষণজী লিখেছেন 'হম ওযহ্শি হৈঁ', রামানন্দ সাগব ফিল্ম করেছেন—'আউব ইনসান মর গয়া', আব্বাস, মণ্টো লিখেছেন,ফৈজ লিখেছেন 'দাগ দাগ উজালা'। এবপব প্রগতিশীল লেখক আন্দোলন আর প্রায ছিলোনা, প্রবল ধাক্কা খায়। কৃষণজী লেখার স্টাইলেও অনেক পরিবর্তন আনেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'শিকস্ত' এর পর অনেক উপন্যাসে তিনি রিয়ালিজম নিয়ে আসেন। কাশ্মীরের সৌন্দর্যে যেমন প্রভাবিত ছিলেন তেমনি সেখানকার সামাজিক জীবনের প্রভাব গভীরভাবে উপন্যাসে আছে। 'খুব সুরতি গরিবী'-কে সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করেছেন। পরবর্তী সময়ে 'পুরে চাঁদ কী রাত' 'কালু ভাঙ্গী', ইত্যাদি। এই সব করে তিনি, নুতন ধরনের দিকে বিষয়ের দিকে এসেছেন। 'এক গধে কী আত্মকথা' পাঠকের ভালো লাগে হিউমার আছে বলে, কিন্তু এর ভিতর এত শ্লেষ আছে যা ভোলার নয। শিশু সাহিত্যের আধারও লিখেছেন, ধরা যাক, 'চিড়িয়োঁ কী আলিফলায়লা'। কাহিনী শুরু হচ্ছে এক অজগর, ড্রাগন নিয়ে। এব বিপরীতে আছে এক ছোট চড়ুই। কিন্তু এ কোন ড্রাগনের কাহিনী নয়, না কোন চড়ুই এর। এখানে ড্রাগন হলো জুলুম্ এর প্রতিরূপ। যে সমাজ জুলুম্-এর মধ্যে থেকে হাসিল হচ্ছে, তৈরী হচ্ছে সেখানে কেবল জুলুম্-এর প্রচারই করা যায়। আমি মনে করি কৃষণজীব খেয়ালে সত্য ধবা ছিলো। নফরৎ থেকে মহব্বত প্যায়দা হয় না। নফরৎ থেকে জুল্ম্ই তৈবী হয়। কৃষণজী দেখিয়েছেন তার কাহিনীতে একদম সরাসরি যে কী করে এক ইনসান অন্য ইনসানের উপর নফরৎ করে জুলুম্ করে। তিনি মনে করতেন জুল্ম্ থেকেই জুলুম্-এর জন্ম হয়। আমি যদি ইনসাফ চাই তো খুদ্ আমাকেও ইনসাফ করতে হবে। কোন ইনসাফ একলা হয় না বা একলা থাকতে পারে না।

❑ কৃষণজীর উপর ইউরোপের ফর্ম ও স্টাইলের কোন প্রভাব পড়েছিলো? ইউরোপীয় লেখার প্রভাবে তার লেখায় কোন ম্যাচিওরিটি এসেছিলো বলে আপনি মনে করেন?

স.সি. দেখুন কৃষণজী উর্দু স্রেফ ছয় ক্লাস পর্যন্ত পড়েছেন পুঞ্ছ এর এক স্কুলে। উর্দু তাঁর কোন বিষয় ছিল না। তাঁর বিষয় ছিলো ইংরাজী। এম.এ করেছেন ইংরাজীতেই। লিখতেও শুরু করেছিলেন এই ভাষাতে। পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন। কিন্তু তিনি বুঝছিলেন যে সাহিত্য রচনা করতে গেলে ভাষা এক বড় প্রশ্ন। উর্দুর সঙ্গে তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিলো। বলতেন যে উর্দু এতো খুবসুরতী জবান, এত মিঠিভাষা যা কোন

ভাষায় নেই। কিন্তু কোন লেখার অথেনটিসিটি যদি বিষয় হতো তখন কৃষণজী ইংরাজীই বেশী পছন্দ করতেন। আপনাদের মনে থাকবে যে সাপ্তাহিক 'ধর্মযুগে' তাঁর একটা লেখা বেরিয়েছিলো ঃ 'মেকলে কি বেটে'। এর ভিতর তিনি দেখিয়েছেন মেকলে ইংরাজী ভাষা প্রচারের জন্য যাবতীয় উপায় নিয়েছিলেন। ভাষা প্রচার করা কোন অন্যায় নয়। কিন্তু নিজের ভাষা প্রচার করতে যদি অন্য ভাষাকে কোতল করা হয়, খতম করা হয় এটা দারুন অন্যায়। ভাষা কারো রাইভাল হয় না, হয় সাথী। ইংরাজী ভাষা দুনিয়াতে অনেক বড কাজ করেছে। আপনারা মহশুশ্ করবেন যে কৃষণজী তাঁর রচনায় জবান রেখেছেন উর্দু, কিন্তু সোচ ছিলো ইউরোপীয়ান। গোটা ইউরোপীয় সাহিত্য উনি পড়েছেন। ফরাসী ভাষার লেখা ছিলো প্রিয়। বালজাক্ ছিলো তাঁর প্রিয় লেখক। ইংরাজী সাহিত্যের স্যাটায়ার ছিলো তাঁর বড় প্রিয়। তিনি চেষ্টারটন, বার্নাড শ-এর স্যাটাযারেব দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। আর ছিলো রাশিয়ান লেখকরা।

□ রাশিয়ায় ও ইউরোপে কতদিন ছিলেন?

স সি. চারমাস ছিলাম। বেশীর ভাগ সময় ছিলাম সোভিয়েত ইউনিয়নে, বাকী সময় ইউরোপে। ১৯৬৭ সালে যখন ফিরে এলাম তখন বিহারে আকাল। কৃষণজী সাহির লুধিয়ানভি, সজ্জাদ জাহির এবং লক্ষ্ণৌ থেকে কিছু হিন্দী কবি গেলেন। ওখানে জাযগায় জায়গায় অফসানে, কবি সম্মেলন, গল্পেব সন্ধ্যা, মুশায়েবা করতেন। চাঁদা ও অনুদান জমা করতেন বিহার রিলিফ ফান্ডে। প্রায় পঞ্চাশ দিন বাইরে কাটিয়ে কৃষণজী বম্বে ফিবে এলেন। অক্টোবর ৬৭-তে হঠাৎই শরীর খারাপ হয়। 'গাউট'— চলা ফেরা কবা খুবই অসুবিধা হত। হার্ট অ্যাটাকের দুই মাস আগে গাউট-এর সমস্যা হয়। ডাক্তাব বলেন, চলাফেরা খাওযা-দাওযা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। খুবই সমস্যা কিন্তু কৃষণজী পরেজ করতেন না (সাবধানতা অবলম্বন করা), একটু মোটাও হয়ে পড়ছিলেন। ব্যায়াম যতটা করার করতেন না।

□ একটু কী ডেসপারেট ছিলেন?

স.সি. তেমন কিছু না। জার্মানীতে থাকতেই শরীর একটু খারাপ হয়ে পড়ে কিন্তু দেশে ফিরে এসে অনেক পরিশ্রমের মধ্যে জড়িয়ে গেলেন। ২৩শে নভেম্বর ছিলো কৃষণজীর জন্ম দিন। সেদিন রাত্রে পার্টি ছিলো। এই দিনই কৃষণজী বুকের ব্যথা অনুভব করতে শুরু করেন। বলেন এ আমার সাধারণ বুকের ব্যথা নয়। আমাদেব পারিবারিক ডাক্তার সিংহাল এসে বললেন, এটা হার্ট এ্যাটাক। সেটাই প্রথম বার। আর একজন ডাক্তার ছিলেন গোয়েল, হার্টের ডাক্তার, ডাক্তার ওয়াকিল, ডাক্তার দাতে সকলেই ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী সবকিছুর ইন্তেজাম করেন এখানে। রজনী প্যাটেল রিজিওনাল কংগ্রেস পার্টির প্রেসিডেন্ট অনেক সাহায্য করেন।

□ একটা সাদৃশ্য আমরা খুঁজে পাচ্ছি যে বুখেনভাল্ড কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প দেখার পর বুকের ব্যথা অনুভব করা আর বিহারে আকাল দেখে আসার পর হার্টের সমস্যা দেখা গেল।

স.সি. সম্পূর্ণভাবেই ঠিক। তাঁর হৃদয়তো খুবই সেন্‌সিটিভ ছিলো। তার পর এখানে মান্ডিতে রায়ট হয়। তিন শিশুকে মায়ের সামনেই জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এই খবর 'আখবার'-এ ছাপা হয়। কৃষণজী তিন দিন কিছু খেতে পারলেন না, শুতে পারলেন না। তিনি আব্বাস-এর সঙ্গে মান্ডির ঐ এলাকায় যান, বলেন ঐ মহিলাকে খুঁজে দেখো।

এই ঘটনা কৃষণজীর মনের উপর এতোই প্রভাব ফেলে যে সইতে পারেন নি। পড়োশীদের সাদী বিয়া হলে তিনি ঘরে বসেই খুসী হয়ে যেতেন এবং বলতেন, দেখো ওরা কেমন সুখী ; আবার কারো দুঃখের খবর শুনলে দুখী হয়ে যেতেন।

❑ বিহার থেকে উনি বম্বে চলে এলেন, এখান থেকে বলুন।

স.সি. বম্বে এসে ক্রমাগত মিটিং করতে থাকেন, তারপর অসুখে পড়েন। তিনমাস পর অসুখ থেকে উঠে আবার কাজে মেতে গেলেন। লিখতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে আবার তাঁর দ্বিতীয় বার হার্ট এ্যাটাক। সেই দিন তাঁকে পদ্মভূষণ দেওয়া হয় ; ঐ একই দিন তাঁর মায়ের মৃত্যুর খবর আসে। সকলে এসে অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু তিনি দারুনভাবে বিপন্নবোধ করছেন। আর ঐ রাত্রেই তাঁর দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাক হলো। কৃষণজীর জীবনের একটাই বিড়ম্বনা ছিলো যে কোন আনন্দ বা খুশীতে কোন না কোনভাবে একটা বাধা আসতোই। আমরা দিল্লীতে সবলার ওখানে ছিলাম। সরলা ভাই সাহাব-এর জন্য আম আনতে যাবে। আমি বলি কাজের লোককে দাও, না হয় ছেলেকে পাঠাও। সরলা বলে, না ভাই সাহাব কী আম খেতে ভালোবাসে আমি জানি। আমি নিজে গিয়ে আম নিয়ে আসি। ছেলের স্কুটারের পিছনে বসে আম আনতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। সরলা পড়ে গিয়ে মারা যান ১৯৫৫-এ। আম রাস্তাতেই পড়ে রইল। এরই এক বছর আগে ১৯৫৪-এ মহেন্দ্রনাথের হঠাৎই হার্ট অ্যাটাক হয় এবং আঠারো ঘন্টার পরে মহেন্দ্রনাথ মারা যান। সে বারও আমরা দিল্লীতে ছিলাম। কৃষণজীর সামনেই তাঁর প্রিয় ভাই বোনের মৃত্যুর অভিঘাত সহজেই অনুমান করা যায়। তারপর কৃষণজী মারা গেলেন ১৯৫৭এর ৮ই মার্চ।

❑ সত্তরের পর থেকে বলুন।

স.সি. এরপর ১৯৫১ সালে আমরা দ্বিতীয়বার রাশিয়া যাই কৃষণজীর ইলাজ (চিকিৎসা) করাতে। মস্কোর কাছে এক স্যানিটোরিয়ামে তিনি তিন মাস চিকিৎসাধীন ছিলেন। হার্টের চিকিৎসার কথা ডাক্তার কৃষণজীকে বলেন নি, আমি জানতাম।' ৭১এ বাংলা দেশের যুদ্ধ শুরু হয়। এই ব্যাপারেও তিনি খুবই বিচলিত ছিলেন। শরীর একটু ভালো হলে, ডাক্তার তাঁর কার্ডিয়োগ্রাম এর রিপোর্ট দেখে বলেন যে, আপনাদের রাশিয়ায় আসার দরকারই ছিলো না। আপনাদের দেশের ডাক্তাররা যোগ্যতার সঙ্গে এঁর চিকিৎসা করেছেন। অন্যান্য ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনা করে আমাকে বললেন, আশ্চর্যের ব্যাপার যে এঁর হার্ট এতটাই ড্যামেজ যে এই রুগী বেঁচে আছে কি করে! আর ডাক্তাররাই বা কিভাবে এর চিকিৎসা করেছেন! এরপর বললেন, আমাদের যথাসাধ্য চিকিৎসা করেছি, এঁকে আর চার বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারি। কৃষণজী যখন জিজ্ঞাসা করেন আমি বলি, আপনার অবস্থা একদম নর্মাল, ঠিক হয়ে গেছেন। কৃষণজী বলেন আমি আমার অবস্থার কথা জানি। তাকে আবার পেস মেকার বসিয়ে দেওয়া হলো। ওখানে থাকা অবস্থায় আমরা হাঙ্গেরী থেকে নিমন্ত্রণ পাই এবং বুদাপেষ্ট চলে যাই। ওখানে একমাস ছিলাম, ৭১-এর জুলাই মাসে। তারপর মস্কো ফিরে দিল্লী রওনা দিই।

❑ হাঙ্গেরীর কথা বলুন।

স.সি. দেখুন উপর উপরে তো দেখতে সবই সুন্দর ছিলো, সকলের সঙ্গে সকলের ভাব। যেমন ধরুন তাসখন্দ, সব থেকে বেশী মুসলিম কম্যুনিটির লোকের বাস। কিন্তু

ভিতরে ভিতরে প্রত্যেকে অসুখী ছিলেন রাশিয়ান বেজিম-এর জন্যে। কেননা এশিয়ার এক মেজাজ ছিলো যৌথ পবিবারের। কিন্তু বাশিয়াতে এই পবিবার ভাঙনের মুখে ছিলো। ওখানে যদিও ফার্ম, ডাচেস, কো-অপারেটিভ তৈরী হচ্ছিলো, আমি প্রত্যক্ষ কবেছি ওদেব সম্পর্ক ছিলো খুবই ফর্মাল। স্বাভাবিক দেখাতো বটে কিন্তু কেউ কারো সাথে মন খুলে কথা বলতো না। কিন্তু তাসখন্দ, সমরখন্দ এশিয়ান মেজাজের, তাই তাবা মুখেব উপব বলে দিতো। হাঙ্গেরীতে গিয়ে দেখেছি রাশিযান বিরোধী মেজাজ। সন্ধ্যেব সময় বেড আর্মি যখন বুদাপেস্টের রাস্তায় মার্চ করতো তখন এবা দাঁতে দাঁত পিষতো। বলতাম, কেন এমন ভাবছো। আমাদের দোভাষী বলতো, তোমবা জানো না এবা হিটলাবেব থেকেও বেশী পাজি। নিজেদের দেশেব জন্য কি-না কবেছে! স্তালিনেব জমানায এই হযেছে ঐ হযেছে। খুশির কথা এই আমরা জার্মানীব পটসডামে গিয়ে দেখি ওখানেও যেখানে চার্চিল রুজভেল্ট স্তালিনেব সাক্ষাৎকাব ঘটে সেখানে স্মাবক হিসাবে অনেক কিছু বক্ষণাবেক্ষণ কবছে। চার্চিলেব সিগাব, রুজভেল্ট স্তালিনেব ব্যবহৃত সামগ্রী, কোথায় আলোচনা হয়েছে কোথায় কোথায গেছেন এই সব। কৃষণজীব সঙ্গে কিছু ছাত্র যুবাব সাক্ষাৎকার ও আলোচনার অনুষ্ঠান ছিলো। পথে যেতে আমাদের জার্মান দোভাষী আস্তে আস্তে বললো, নাৎসি বিরোধী কথাবার্তা বলাব সময একটু বযে সযে বললে ভালো হয। কৃষণজী ও আমি বলি 'কিঁউ ভাই' এত বড় বিপর্যয়ের পবেও নাৎসি বিরোধী কথাবার্তাকে রেখে ঢেকে বলতে হবে কেন? দোভাষী বললো, ইয়েস্! জার্মানীর বুকে হিটলারের ছায়া এখনও প্রভাব ফেলে আছে। জার্মান, বিশেষ কবে যুবাবা এখনও হিটলারকে জাষ্টিফাই কবে কোন না কোন স্তবে।

□ এই ব্যাপাবে হাঙ্গেরীব লেখক শিল্পীদের অভিমত কি?

স সি লেখকদের স্বাধীনতাব প্রশ্ন যখন এলো তখন বলা ভালো ভাষার ব্যাপারে কেউ কাবো হুকুমত মেনে নিতে চায় না। কোন মানুষ চায় না যে তাদের নিজের দেশে অভ্যন্তবে ঢুকে কেউ তাদের ভাষা শিল্প-সাহিত্যের উপর খবরদারি করুক। উপরে উপবে চুপ ছিলো, কিন্তু মনের দিক থেকে কেউ খুসী ছিলো না। শাসন থেকে অনেক কিছুই করা যায় কিন্তু শোচ (চিন্তা) বদলানো যায় না। ওদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিলো।

□ এবার আমরা চীনের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দী-চীনী ভাই ভাই ব্যাপারে কৃষণজীর কী সোচ ছিলো এই প্রশ্নে যেতে পারি।

স সি. দেখুন কৃষণজীর সেই সোচ ছিলো যা দেশের সোচ ছিলো। '৫৫ সালে যখন তিনি চীনে গিয়েছিলেন, তখন খুব ভালো ইম্প্রেশন নিয়ে এসেছিলেন। এবং দেশের অভ্যান্তরেও হিন্দী চীনী ভাই-ভাই এর সম্পর্কে ভালো ধারনা ছিলো। সীমান্ত ঘটনার লেখক শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের উপর প্রভাব পড়লো অনেক বেশী। কৃষণজীর উপরও এর প্রভাব ছিলো গভীর। কিন্তু জওহরলাল নেহরু এবং পঞ্চশীল নীতির উপর চোটটা লাগলো সব থেকে বেশী। তাই তিনি বললেন এতো খোলাখুলি বিশ্বাসঘাতকতা, আমরা তা হলে কার উপর বিশ্বাস করবো। তাই হিন্দী চীনী ভাই-ভাই পর্যায়ে কৃষণজী অনেক লেখাই লিখেছেন। আজ আপনারা আমাকে যে প্রশ্ন করছেন আমিও কৃষণজীকে ঐ প্রশ্নই করেছিলাম ঃ দেখুন হিন্দী চীনী ভাই-ভাই সম্পর্ক, দেশবাসীর ধারনা আর আপনার লেখাপত্র সব কী মিথ্যা হয়ে গেছে। কৃষণজী

বলেছিলেন, দেখ দুটো জিনিষকে এক করে ফেলা ঠিক নয়। যে সম্পর্ক হিন্দী চীনী ভাই-ভাই পর্যায়ে ছিলো সেটা এখনও আছে। এইভাবে তা মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না। সীমানা নিয়ে? জায়গা জমি নিয়ে ভাই-ভাই ঝগড়া ঝামেলা হতেই পারে। এটা একদিন মিটেও যাবে। তার জন্য দীর্ঘ সময়ের রিস্তা (আত্মীয়তা) শেষ হয়ে যেতে পারে না। দুটো জিনিস দুটো দেশের তো একই ছিলো, আমরা গোলামী থেকে উঠে এসেছি। দুজনকেই লড়াই করতে হয়েছে। আজ আমি ভাবছি, একদিন তাদেরও ভাবতে হবে।

কৃষণজী আমাকে একটা ফটো দেখিয়েছিলেন তাতে মাও সে তুঙ ছিলেন ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে। মাও সে-তুঙ কৃষণজীকে একটা বই দিয়ে তাতে নিজের সই করে দিয়েছিলেন কৃষণজীর সামনে।

❑ সেটা কী বই, এটা ভাবতবাসীর কাছে খুবই আনন্দের।

স.সি বহুদিন আগের কথা। আমার মনে পড়ছেনা ওটা কী বই। কোন গল্পের বই হবে। ওটা আমার সংগ্রহে আছে তবে এখনই খুঁজে পাচ্ছিনা। বম্বে অথবা আলিগড়ে থাকতে পারে।

❑ চৌ এন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো?

স.সি. হ্যাঁ চৌ-এর সঙ্গে কৃষণজীর ছবি ছিলো, মাও-এর সঙ্গে ছবি দেখিয়েছেন। তবে কৃষণজী মাও-এর দ্বারা সব থেকে বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন। বলতেন মাওকে দেখতে পাহাড়ের মতো, তাঁর ব্যক্তিত্বও তাই।

❑ কৃষণজী কী কী পুরস্কার পেয়েছিলেন।

স.সি. ভারত থেকে পদ্মভূষণ, সোভিয়েত থেকে সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু অ্যাওয়ার্ড এবং পেয়েছেন মির্জা গালিব অ্যাওয়ার্ড।

❑ কৃষণজীর উপর এর কেমন প্রভাব পড়েছিলো?

স.সি. কিছুই না। কৃষণজী বলতেন আসল পুরস্কার তো আমার পাঠকের। তবে পুরস্কার পেলে আমাদের আনন্দে উনি আনন্দিত হতেন। পাঠকের কাছ থেকে নির্দিষ্টভাবে যখন আলোচনা করে চিঠি আসতো তিনি বলতেন এটা আমার জন্য বড় পুরস্কার। তবে কেবল মাত্র তারিফ-এর চিঠি তিনি গুরুত্ব দিতেন না। এখানে যখন পদ্মভূষণ সম্মান প্রদানের জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, ডঃ জাকেরিয়া তখন এর ব্যবস্থা করেছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে কৃষণজী পরিষ্কার করে বলেছিলেন, তাঁর এটা ভালো লাগেনি। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উপস্থিত। তিনি চমকে গেলেন। কৃষণজী বলেছিলেন এটা আমাদের পরম্পরা। আগের দিনে রাজা মহারাজারা সভাকবিদের মোতি দিয়ে ভরিয়ে দিতেন, আবার শূলেও চড়াতেন।

❑ 'কৃষণ চন্দর মার্গ'-এর বিষয়ে বলুন।

স.সি. বান্দ্রায় নতুন করে একটি রাস্তা তৈরী হয়। কৃষণজীর নামের বোর্ড লাগানো আছে। রামানন্দ সাগর রাস্তা উদ্বোধন করেন। আগের যুগে বড় মানুষের নামে রাস্তা-ঘাটের নাম রাখা হতো। তবু এখন লেখকদের নামেও রাস্তার নাম করা হচ্ছে। ভাবা হয়েছিলো যেহেতু আমরা দীর্ঘ বছর সান্টাক্রুজ-এর নিৎসে-তে ছিলাম ওখানকার কোন রাস্তার নাম রাখা হবে। ওখানে আমরা যেখানে ছিলাম ওটা ছিলো ক্যাথলিক কলোনী। অ-ক্যাথলিক কাউকে ওখানে বাড়ি দেওয়া হয় না, বাড়িওয়ালা একমাত্র

আমাদেরই থাকতে দেয়। আমাদের খুবই ভালোবাসতো। তবুও সান্তাক্রুজের কোন রাস্তার নাম কৃষণজীর নামে রাখা সম্ভব হয় নি।

❑ এবার অন্য প্রসঙ্গ, আপনার ছেলের জন্ম কবে?

স.সি. কৃষণজীর সঙ্গে বিবাহে আমার কোন সন্তান নেই। এই ছেলে (আর. কে. মুনির) আমার প্রথম স্বামীর। মুনিরের জন্ম তারিখ ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৫০। তখন ও খুব ছোট। কৃষণজীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিলো। পুণে ফিল্ম-ইনস্টিটিউটে পড়ানোর ব্যাপারে কৃষণজীর উৎসাহ ছিলো বেশী। এখন বম্বে ই টি ভি-এর সিনিয়র প্রডিউসার। পুণে ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করেছে।

❑ এমন কিছু কথা বলুন যা হয়তো কোথাও লেখা নেই অথচ যা দিয়ে কৃষণজীকে সহজে ছোঁয়া যায়।

স.সি. বন্ধুদের খুব করিব (কাছে) ছিলেন কৃষণজী। তবে বন্ধুদের দুটো ক্যাটাগরি ছিলো। কারো খুব কাছে, আবার কারো থেকে দূরে। করো কারো সম্পর্কে এও জানতেন যে এরা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। আমাকে বলতেন এরা এই রকম। সামনে এক ধরনের, পিছনে অন্য রকম। কিন্তু কৃষণজীর সেই গাট্‌স্‌ ছিলো না যে মুখের উপর কিছু বলতে পারেন। বন্ধুরাই কেবল নয় নিজের লোকজন কাকেও কিছু বলতে পারতেন না। আমি বলতাম, আপনি কাহিনীতে যত তাকত, হিম্মত দেখাতে পারেন, জীবনে আপনি ততদূরই কমজোরী। কৃষণজী বলতেন, আমি কী করতে পারি। ঘরের মধ্যে কাজের লোকজন হোক, কোন সমস্যা হোক, তিনি আমাকেই ডাকতেন—দেখ একী হতে যাচ্ছে, কী হবে, এইসব। হয়তো ল্যান্ড লর্ড আসবেন কিংবা অন্য কোন কিছু, তিনি আমাকেই সামনে ঠেলে দিতেন। আমি বলতাম, আপনি যে সব সমস্যা আমার মাথার উপর চাপিযে দিচ্ছেন এতে আমার সম্পর্কে অন্যদের কী ইম্প্রেশন হয়। বাড়ীর কাজে কেউ হয়তো কিছু করছে না, কিন্তু উনি একটি শব্দও খরচ করবেন না। আড়ালে আমাকে বলতেন, দেখ এটা কী করা যায়। তাঁর ৩/৪ জন সেক্রেটারী ছিলেন কিন্তু কাকেও কিছু বলতে পারতেন না। অনেক সময় এমন হয়েছে বন্ধু-বান্ধবরা আলোচনা প্রসঙ্গে এমন প্রশ্ন তুলেছেন যে কৃষণজী তার মনের মতো জবাব দিতে পারেন, কিন্তু উনি চুপ হয়ে যেতেন। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, তার মানে! আমি বলতাম, আপনি ভালো মানুষ থাকার জন্য যে উত্তর দিতে পারতেন, তা না করে, ভাবলেন অন্যে কী ভাবতে পারেন; তাই আপনি একটা শব্দও ব্যয় করলেন না। আমি বলতাম, আপনি খুব কঞ্জুষ। বলতেন এই সব শব্দ আমি আমার তেজরীতে রেখে দিচ্ছি ভবিষ্যতে লেখার জন্য। আমি বলতাম তেজরী কোথায়, আপনি ফিক্সড ডিপোজিট এ রেখে দিচ্ছেন। শুনে কিছুক্ষণ চুপ হয়ে যেতেন ; পরে বলতেন, সলমা, কোন লোককে বেশী জানা ভালো না। কোন কথা ভালো লাগলে নোট করে নিতেন। একবার এমন ঘটেছিলো আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে আপনি এই দুনিয়ায় কাকে সব থেকে বেশী ভালোবাসেন উনি বলেছেন, আমার মা-জীকে। তারপর? আমার ভাই মহেন্দ্র। আমি বললাম ছাড়ুন আপনার দিল্‌ হচ্ছে টিফিন ক্যারিয়ারের মতো। এই কথা শুনে ওটা নোট করে নিয়েছিলেন।

❑ কী ধরনের মানুষকে কৃষণজী পছন্দ করতেন।

স.সি. অনেস্ট। সে বন্ধু-বান্ধব হোক, রিস্তাদার হোক বা কেউ হোক, কৃষণজী অনেস্ট

মানুষকে পছন্দ করতেন। তিনি যদি কৃষণজীর মুখের উপর তারই বিরুদ্ধে কিছু বলতেন, তবুও কৃষণজী তাঁকেই পছন্দ করতেন। একজন লেখক ছিলেন বলরাজ মহেন্দ্রা। দুইজনের মধ্যে যোগাযোগ ছিলো। কিন্তু মজার ব্যাপার ছিলো এই যে কোথাও কৃষণজীর লেখার উপর কোন সেমিনার হলে মহেন্দ্রাজী কৃষণজীর বিরুদ্ধে বলবেনই বলবেন। সেই কৃষণজী আবার সেমিনার শেষে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ডেকে বলে দিতেন, এ আজ একটু বেশী খেয়ে ফেলেছে, তুমি ভাই একে বাড়ি অবশ্যই পৌঁছে দিও। আর একজন ছিলেন হংসরাজ বহ্‌রা। উনিও খানিকটা ঐ রকম ছিলেন। আমি বলতাম, এরা তোমার বিরুদ্ধে লাগে আর তুমি কিছু বলো না। কৃষণজী তাঁদের বিরুদ্ধে কিছুই বলতেন না। বরং বলতেন, দেখ এদেরও আমার প্রয়োজন আছে।

□ কৃষণজীর বিরুদ্ধে তাদের ঈর্ষা ছিলো?

স.সি. খুবই। একে অন্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেন। কিন্তু, আমি নিজে দেখেছি যে, যদি বাইরের কেউ এদের সমালোচনা করতেন তো এরা এক হয়ে গিয়ে প্রতিহত করতেন।

□ কৃষণজীর নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। কোনো গ্রুপ ছিলো?

স.সি. অনেক নাটকই হয়েছে। এর মধ্যে নাম করেছে 'দরওয়াজে খোল দো'। কমুনালিজম-এর উপর খাজা আহমদ আব্বাস লিখিয়ে ছিলেন। নির্দেশনা করেছিলেন। নিজেদের কোন গ্রুপ ছিলো না কিন্তু এঁদের যোগাযোগ ছিলো 'ইপটার' সঙ্গে (ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল্‌স থিয়েটার এ্যাসোসিয়েশন)। কৃষণজী অবশ্য নাটকে অংশ নেননি। কিন্তু তখন পৃথিরাজ কাপুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিলো। রেডিওতে কাজ করার জন্য অনেক রেডিও নাটক লিখেছিলেন,—'কাহরা কী এক শাম', 'সরাই কে বাহর'। তখনকার ঐ সব নাটকগুলি 'দরওয়াজা' নামের সংকলনে রয়েছে।

□ কৃষণজীর লেখা হিন্দীতে অনুবাদের কাজ করেছেন কারা?

স.সি. বিভিন্ন লেখকেরা করেছেন, একজন নয়। উল্লেখযোগ্য হলেন মুনিশ নারায়ন সাকসেনা। কৃষণজী চাইতেন অনুবাদ যিনি করবেন তাঁর ভালো উর্দু জানা থাকা চাই। আজব কথা, পণ্ডিত আবসিকে কৃষণজী দিয়েছিলেন অনুবাদের কাজ। কৃষণজী লোক রেখে পণ্ডিতজীকে উর্দু শিখিয়েছিলেন।

□ নাটকের সঙ্গে কৃষণজীর ভালোবাসার সম্পর্ক কি রকম ছিলো?

স.সি. নাটক তাঁর খুবই ভালোবাসার বিষয় ছিলো। ইবসেন-এর খুব অনুরাগী ছিলেন। ব্রেখট-এর 'ওয়েটিং ফর গোডোর' পুরা অনুবাদ করেছিলেন উর্দুতে, যখন অসুস্থ ছিলেন সেই সময় এবং এর মধ্যে তিনি স্থানীয় রং লাগিয়েছিলেন।

□ সেক্‌স্‌পিয়রের সম্পর্কে কী বক্তব্য ছিলো।

স.সি. সেক্‌স্‌পিয়রকে বলতেন নাটকের পিতা।

□ আপনার এখন বয়স কতো?

স.সি. ৬৯ বছর। ১৮ই জুন জন্ম। কৃষণজী আমার থেকে ১৮ বছরের বড়ো ছিলেন।

□ আপনার পড়াশুনোর ব্যাপারে দু'চার কথা।

স.সি. আমি এম.এ পাস করেছি উর্দু সাহিত্যে। এর আগে সাইকোলজিতে এম.এ পাস করেছি। আমি আলিগড়ের মেয়ে। তাই পড়াশোনা আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে আর ওখানেই উর্দু সাহিত্যে অধ্যাপনা করেছি। আমার বাবাও ছিলেন আলিগড় মুসলিম

ইউনিভার্সিটির নামী অধ্যাপক। তারপর এখানে এসে এস.এন.জি টি. ইউনিভার্সিটিতে সেনেটের মেম্বার ছিলাম। মহারাষ্ট্র স্টেট ওয়েল ফেয়ার মিনিষ্ট্রিতে চেয়ারপারস্‌ন্‌স ছিলাম। মহিলা আর্থিক বিকাশ মহামন্ডল-এ তিন বছর ছিলাম। বম্বেতে এসে আর পড়াই নি। কেবল লিখেছি। বম্বে ইউনিভার্সিটিতে কৃষণচন্দর চেয়ার তৈরী হয়। আবি তুলান হায়দার ও রাহী মাওম রেজার কাহিনী নিয়ে দুটি টিভি সিরিয়াল লিখেছি। আমার একটা ছোট নভেলেট নিয়ে কাজ করেছি। আমার ছেলে কৃষণচন্দর-এর উপন্যাস 'পাঁচ লোফার' এর উপর টিভি ফিল্ম তৈরী করেছে 'ইহাঁ সে শহর কো দেখো'। দু বছর আগে অনেকগুলি কাজ করেছি। কাল একটা লেখার কাজ ধরেছি। এখন আমি 'মেময়ার্স' লিখছি। এটা অবশ্য ঠিক কৃষণজীর উপর নয়, ববং আমাদের পরিবার এবং আমার বাবাকে কেন্দ্র করে। কৃষণজীকে নিয়ে আমি বইতেই সব কথা লিখবো।

❑ কৃষণজীব অন্য কোন ছোট গল্প, উপন্যাসেব উপব ফিল্ম, তৈবী হয়েছে?

স.সি. 'আধে ঘন্টেকা খুদা' এর উপর টেলিফিল্ম তৈরী হয়েছে, টিভিতে এসেছে।

❑ কৃষণ চন্দর-এর বই কত সংখ্যায় ছাপা হতো?

স সি. পাবলিশার জিজ্ঞাসা করলে বলে বই বিক্রি হয় না। গুদামে এসে দেখুন সব পড়ে আছে। এ সব কথা ছেড়ে দিন। কথায় কথা বাড়বে। ১৯৫৭ সালের পর আজ পর্যন্ত কত দিন হয়ে গেল, এক পয়সাও দেয় নি, খেয়েছে। কীই বা করতে পারি! দেখুন কোর্ট কাছারি করতে পারি কিন্তু আমার সময় কই। অনেকেই অবশ্য কোর্ট কাছারি করে রয়াল্‌টি আদায় করেছেন। কপি রাইটের সব কিছুই আমার কাছে আছে, কিন্তু তাতেইবা কী। কৃষণজীর সব থেকে বেশী রয়াল্‌টি আসে রাশিয়ার অনুবাদ প্রকাশনার বই থেকে। কিন্তু তাও কোথায়! কৃষণজীর ইলাজ (চিকিৎসা) করিয়ে দিয়েছে, ছোট মোট গিফ্‌ট, আর আমাকে দুই বার রাশিয়া সফর করিয়ে দিয়েছে ; ব্যস্‌ ঐ দিয়েই মিটিয়ে দিয়েছে হয়তো।

❑ আপনি কৃষণজীকে জীবনে কিভাবে নিয়েছেন?

স.সি. দেখুন আমি যে পরিবারে জন্মেছি—আমার চোখ খুলেছে আর্ট ও লিটারেচারে। আমার বাবা ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন এবং বড় লেখক ছিলেন—ইন্টারন্যাশনাল ফেমের। আমাদের বাড়ীতে এসেছেন—গোরখপুরী, জোস মালিয়াবাদী, ডঃ জাকির হোসেন। ওয়ার্ধা স্কিম আমাদের বাড়ীতে বসে তৈরী হয়েছে। আমি তখন খুব ছোট ছিলাম। আমাদের বাড়িতে যেতেন শান্তি স্বরূপ ভাটনগর, রফি আহমদ কিদওয়াই। তখন বুঝতাম না কিন্তু পরে জেনেছি এরা কত বড় মাপের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একটা ফসলের জন্য নরম মাটি দরকার, আমার শৈশবেই এই ধরনের জমি পেয়ে গিয়েছিলাম। আর তাই পরবর্তীকালে কৃষণচন্দর-এর সঙ্গে আমার রিস্তা তৈরী হতে পেরেছিলো। আমি যদি এই ধরনের পারিবারিক পরিবেশ না পেতাম তো কিছুই হতো না। কৃষণজী কোন লাখপতি ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন, দেখ বম্বেতে আমি তোমার ভালোভাবে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করতে পারবো না—তুমি ভেবে দেখ। আমার জীবন সংগ্রামের, আমার পরিবার আছে কিন্তু আমি সুখী না। এই হলো আমার জিন্দেগী। কিন্তু আমি মনে করি এটা এক আজিব রকমের সম্পর্ক। আমি কৃষণজী সম্পর্কে এতো কিছু জেনেছিলাম, এতো তাঁর বই পড়েছিলাম যে আমাদের এই রিস্তা

না হলেও কিছু এসে যেতো না। শুধু কৃষণজী কেন সেই জমানার যুবা যুবতীরা ততো বেশী ফিল্মের লোকদের নিয়ে মাতামাতি করতো না, যতটা করতো লেখকদের নিয়ে, তাঁদের লেখা নিয়ে। সর্দার আলি জাফরির কবিতা নিয়ে যখন মুশায়েরা হতো তখন তাতে টিকিট কেনার জন্য, হলে যাবার জন্য আমরা পাগল হতাম। চুগতাই, ফৈজ আমাদের কাছে হিরো ছিলেন, কৃষণজী আমাদের হিরো ছিলেন। এর ভিতর দিয়েই আমাদের চোখ খুলেছিলো। একটা গর্ব আমার ছিলো যে সর্দাব আলি জাফরি আমার বাবার ছাত্র ছিলেন। জানেসার আখতার, সর্দার জাফরী, রাজী মাসুম রেজা, কে.এ. আব্বাস আলিগড়েব লোক ছিলেন। একবাব সর্দার বলেছিলেন বয়সের ফারাকের কথা। অনেক সময় আমি কৃষণজীকে বলতাম, দেখুন এই সব কথা আমাকে বলবেন না। আমি মনে করি আমি আপনার থেকেও পবিণত। আপনি আমার থেকে অনেক অপরিণত।

এ কৃষণজীব হৃদয়ে আপনাব জন্য কী ধবনেব স্থান ছিলো, আপনাদের বয়সের তারতম্য হওয়া সত্ত্বেও?

স.সি. কৃষণজীর সঙ্গে মিলবার আগেও আমাদের এক রিস্তা ছিলো। আজও আছে, এখনও আছে। এই সম্পর্ক হলো—বোধের। এটাকে যদি ভাষতে না পারেন, মেহশুস না করেন তো কিছুই থাকে না। এরজন্য আমি কোন স্পিবিচুয়াল কথা বলছি না। কিন্তু হয় এক রিস্তা যা শেষ হয় না। আমি যাব দ্বাবা প্রভাবিত তাঁব সম্পর্কেই এই কথা বলা চলে। আমি যখন কোন লেখকেব বই পড়ি তখন তাঁর সঙ্গে এক আত্মীয়তা তৈরী হয়। যখন কোন লেখকের বই আমি পছন্দ করছি না তখন তার সঙ্গে আমার একটা কনফ্লিক্ট তৈরী হয় লেখকেব ভাবাদর্শ নিয়ে এবং এই সবই ঘটেছিলো।

রাজীব চৌধুরী

যে গল্প আজও হয়নি তার খোঁজে

"যেদিন মোহিনী তার গোড়ালি থেকে বিষ চুষে নিচ্ছিল, সেদিন সেই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল, মোহিনী সে বিষ তার শরীর থেকে নয়, তার আত্মা থেকে চুষে নিয়ে বাইরে ফেলে দিচ্ছে—সেই বিষ যা কৃষ্ণাঙ্গকে শ্বেতাঙ্গের কাছ থেকে, দরিদ্রকে ধনীর কাছ থেকে, মানুষকে মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। সেই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল, যে কোনো সুন্দর মানব-সমাজের প্রথমতম ও শেষতম শর্তই হল ভালোবাসা। আব ভালোবাসা ব্যতীত কোনো মানবসমাজই পৃথিবীতে বেশিদিন টিকে থাকতে পাবে না।" ('সেতুবন্ধ', অনু আশরফ চৌধুরী)

মৃত্যুর আগে এই উপলব্ধি আমেরিকার এক সৈনিক মুবি-র। আগে কিন্তু সে ভাবত অন্যরকম। তাদের দেশের বিড়ালগুলোও এদেশের মেয়েদের চেয়ে মোটাসোটা, বিশেষত এদেশেব মানুষের কালো রঙটাই ঘৃণা জাগিয়ে তুলত তাব মনে। এই ভেদচিন্তা যে তার মজ্জাগত, গল্পে মুবি-র নানা প্রতিক্রিয়ায় তার পরিচয় লেখক বেখে গেছেন। আর আকস্মিক মোড় পরিবর্তনের মতো পাহাড়ী বোবা মেয়ে মোহিনীর উপস্থিতি তার জীবনে। নির্দ্বিধায় সাপের দংশনে মৃতপ্রায় টমির ক্ষত থেকে সে শুষে নিয়েছে বিষ। ব্যক্তির জীবনের একটা ছোট অভিজ্ঞানকে আশ্রয় করে গল্পের লেখক কৃষণ চন্দর আমাদের পৌঁছে দেন শ্রেণীচরিত্রের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তির এমনই এক পাঠে। 'বিষ' শব্দটি রূপকের মতো সম্প্রসার পায়, গল্পের শরীরে মিশে যায় কবিতা। এ ভাবেই অসংখ্য অনু মানুষের জীবনের নানা কাহিনী শোনাতে বসলেও বারেবারে প্রেক্ষণবিন্দু সম্প্রসারিত হয়েছে কৃষণ চন্দবের গল্পে। এ তার গল্পের একটি বৈশিষ্ট্য, একটি নিজস্ব মুদ্রার মতো। মানুষকে তার শ্রেণীগত চারিত্র্যের আধারেই মূলত ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। বারেবারে বলেছেন রূপান্তরের কথা অথবা দেখিয়েছেন তার শ্রেণী বৈশিষ্ট্যের অভ্যেসগুলোতে, ক্ষয় আর পতনের অবশ্যম্ভাবী চিহ্নগুলিকে। ১৯৩৬-এ উর্দু পত্রিকা 'সাব-রং'-এ কৃষণ চন্দরের সর্বশেষ যে সাক্ষাতকারটি প্রকাশিত হয় তাতে তিনি বলেছিলেন, "যিনি বিষয়বস্তুর সূক্ষ্ম দিকগুলোর প্রতি বিশেষ সজাগ দৃষ্টি বেখে গল্পের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিবেশের প্রতি যিনি যতই উপযুক্ত রূপে সজাগ এবং সুন্দরভাবে তার প্রতিচ্ছবি আকর্ষণীয় ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তিনিই সবচেয়ে ভালো লেখক বা সাহিত্যিক।" (অনু. জাফর আলম) নিজের সাহিত্য রচনার সূচনালগ্নেই যিনি প্রগতি লেখক সংঘের শিবির আশ্রয় করেছেন, চার দশক পরেও লেখকজীবনের শেষ লগ্নে শেষ সাক্ষাৎকারটিতেও সেই বিশ্বাস আর আস্থায় অনস্থিরই রয়েছেন তিনি। কিন্তু "গল্পের মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্বপালন"—এই সচেতনতা শিল্পের ক্ষেত্রে যে কখনো বিড়ম্বনা হয়ে ওঠে, বিঘ্নিত হয় সাহিত্যের শিল্পসাফল্য তা-ও প্রমাণিত হয়েছে এই পর্বেই। ১৯৩৬-এর ১০ এপ্রিল লক্ষ্ণৌতে মুন্সি প্রেমচাঁদের সভাপতিত্বে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠার কালে বিশেষত উর্দু ছোটগল্পের পরিণত হয়ে

ওঠার এই দশকগুলিতে সাফল্য আর ব্যর্থতা—দুইয়েরই নিদর্শন রয়েছে যথেষ্ট। রাজিন্দর সিং বেদি, মুলকরাজ আনন্দ, আসমত চুগতাই, সাদাত হোসেন মান্টো, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, খাজা আহ্‌মদ আব্বাস—এদের গল্পে সহজ জীবনবোধের সঙ্গে প্রগতিশীল সমাজচেতনার আদর্শ যতটা স্বাভাবিক আর সম্পূরকভাবে মিশে রয়েছে তার পাশাপাশি আহ্‌মদ নদিম কাসমি, শওকত সিদ্দিকি, মুমতাজ মুফতি, হায়াতুল্লাহ্‌ আনসারি, মহেন্দ্রনাথ, ইব্রাহিম জালিস—এদের গল্প অনেক সময়ই প্রচারমুখী, তত্ত্বনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। হয়তো মনোবিশ্লেষণে, রোমান্টিকতায় বা অন্যান্য বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে এদের উজ্জ্বলতা, কিন্তু প্রগতি শিবিরের সচেতনার ফসল যে লেখাগুলি, সমকালে তাব কিছু প্রাসঙ্গিকতা থেকে থাকলেও, আজকের পাঠক বা আলোচকের চোখে সেগুলির দুর্বলতা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গেছে। অন্যদিকে কৃষণ চন্দরের গল্পে প্রেম, যৌনতা, দেশভাগ, দাঙ্গা, মন্বন্তর—বিষয় যা-ই হোক না কেন, ব্যক্তির জীবনকে যে আসলে তার সামাজিক অবস্থানের নিরিখ থেকেই তিনি দেখছেন, মূল্যায়নও করছেন কখনো, কখনো বা সমালোচনা করছেন—সেই সমস্ত আভাসগুলি তার কথাসাহিত্যে শিল্পবোধে জারিত এক একটি নিরিখ। আর এই বৈশিষ্ট্য কিছুটা উত্তরাধিকার সূত্রেই বর্তেছে তার গল্পে।

পূর্বসূরী মুনসি প্রেমচাঁদেব কথা বলতে গিয়ে কৃষণ চন্দরের মূল্যায়ন—"সর্বপ্রথম মুন্সী প্রেম চান্দের নাম উল্লেখ করতে হয়, কারণ তিনি আধুনিক উর্দু গল্পের জনক। উর্দু ছোটগল্পে সামাজিক চরিত্র-চিত্রণের তিনিই প্রথম উদ্‌গাতা।" (পূর্বোক্ত সাক্ষাতকার, অনু. জাফর আলম)। একই শিবিরের লেখক হলেও, সাহিত্যাদর্শ অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রেমচাঁদের সহজ সামতলিক বাস্তবমুখী উপস্থাপনা আর বর্ণনামূলক রচনাশৈলী থেকে সচেতনভাবেই নিজেকে স্বতন্ত্র করে নিয়েছেন কৃষণ চন্দর। প্রেমচাঁদের মতো মুখ্যত গ্রামীন ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ আর নিম্নবর্গের জীবনও কৃষণ চন্দরের অবলম্বন নয়। 'সম্মুখে পথ রুধি' দাঁড়াননি প্রেমচাঁদ, বা সমকালীন উর্দু গল্প লেখকদের মতো প্রেমচাঁদের রচনাকৌশলের অপরিহার্যতাও অনুভূত হতে দেখিনা তার গল্পে, বরং যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ঐতিহ্যে সংক্রামিত না হয়েও উত্তরাধিকারকে সফলভাবে আত্মস্থ করে—কৃষণ চন্দরের গল্পে প্রেমচাঁদের উপস্থিতি সেই ধরণেরই। "পুরনো আঙ্গিকে নতুন সমাজের বিষয়বস্তু তুলে ধরা আমাদের প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখন গল্পের আঙ্গিকের রূপান্তর ঘটানোও প্রয়োজন। ...আঙ্গিকের নানা বৈচিত্র্যের ওপরই এর বিস্তৃতি ও ক্ষমতা নির্ভর করে।" (অনু. আশরফ চৌধুরী)—এই মন্তব্যে 'পুরনো আঙ্গিক' প্রেমচাঁদের গল্পের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। কৃষণ চন্দরের গল্পে নানা ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষার দৃষ্টান্ত যেমন চোখে পড়ে, তেমনই উল্লেখনীয় তার বহু গল্পেরই কথনকৌশলে দ্বিবাচনিকতার আভাস। বাস্তবই অন্বিষ্ট, সমাজই অবলম্বন হলেও প্রেমচাঁদের গল্পের মতো বাস্তবনিষ্ঠ সংস্থাপন কৃষণ চন্দরের গল্পের মূল বৈশিষ্ট্য নয়। কখনো কখনো তার গল্প বাস্তব আর অবাস্তবের সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতার মধ্যে এক অদ্ভুত পেণ্ডুলামের মতো দুলতে থাকে। প্রায় যাদু-বাস্তবের মতো এক একটি ঘটনা তৈরি করে তার অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন জেগে ওঠার অবকাশ দেন না তিনি—কারণ গল্পের মগ্ন গঠনে তিনি অধিকতর বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে আসলে

উন্মোচন করে চলেন শ্রেণীকাঠামোর ওপর, সামাজিক অভ্যেসের ওপর ঢেকে রাখা নানান পর্দাগুলোকে। তার বেশ কিছু গল্পে আসে একটি লেখক চরিত্রের কথা। নানান পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে সে খুঁজছে নিজের সাহিত্য রচনার আদর্শকে। 'নয়ে আফসানে' গল্পগ্রন্থের এমনই একটি গল্পের সূচনা এক চিঠি দিয়ে। লেখক বন্ধুটিকে সাহিত্যের গুণগ্রাহী তার এক চোরাকারবারী বন্ধু চিঠিটিতে অভিযোগ করে লিখেছিল, "তোমার গল্পগুলো পড়তে পড়তে তোমার ওপর আমি ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়ছি। তুমি একজন বড় সাহিত্যিক হতে পারতে, তা না হয়ে তুমি একজন বড় প্যামফ্লেটবাজ হয়েই থেকে গেলে। তোমার গল্পের মধ্যে প্রোপাগাণ্ডা, উপদেশ আর লেকচারবাজী ছাড়া আর কিছুই নেই। তোমার গল্পের শেষ পরিণতি শুরুতেই বোঝা যায়। ফলে তাতে আর কোনো আকর্ষণ থাকে না ...।" ('আমার বন্ধুর ছেলে', অনু. আশরফ চৌধুরী) উর্দু গল্পে প্রগতি শিবিরের লেখকদের বিরুদ্ধেই যেন এই অভিযোগ। নিজের গল্পে কৃষণ চন্দর স্থান দিলেন এই বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে। উত্তরও দিলেন তার এ গল্পেই। ঐ লেখক চিঠিটি পাবার পর কিছুটা উদভ্রান্তের মতোই ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে হাজিব হয়েছে বন্ধুর ফেলে যাওয়া রক্ষিতার বাড়ি। এক খানসাহেবের আশ্রয়ে প্রথমে যে ছিল 'গুলবানু', বন্ধুটির আশ্রিতা হয়ে সে হয়েছিল 'রামপিয়ারী'। তাদের ছেলেও হল একটি। তাবপর বোম্বাই ছেড়ে দিল্লীতে চিনিব কারখানা খুলতে চলে গেল সে কাউকে না জানিয়ে। দীর্ঘ তিন বছরের যোগাযোগহীনতার পর হঠাৎই বন্ধুর সেই চিঠি এল। রামপিয়ারীর বাড়িতে লেখক গেল "সে বেচারীর একটু খোঁজ খবর নিতে। না জানি কি অবস্থায় আছে!" সেখানে অপেক্ষা করছিল অন্য বিস্ময়। 'রামপিয়ারী' এবার রূপান্তরিত হয়েছে 'মিস সোফিয়া'-য় ; বর্তমান আশ্রয়দাতা 'খৃশ্চান শেঠ বরগাঞ্জা'-র অভিপ্রায় অনুযায়ী। গুলবানু, রামপিয়ারী, সোফিয়া—ইসলামি, হিন্দু, ক্রিশ্চান—মেয়েটির রূপান্তরের তিন পর্যায়ে ধর্মগত সূক্ষ্ম ইঙ্গিতও রেখে যাওয়া হল এর মধ্যে, হয়তো ব্যঙ্গও কিছুটা। কিন্তু গল্পে এই অংশটির ভূমিকা গৌণ। মুখ্য হয়ে উঠেছে লেখকের বন্ধুর পরিত্যক্ত সেই ছেলেটির কথা। চার বছর বয়সের যে ছেলেটি জানে না তার পিতৃপরিচয়। সে লেখককে মনে করে 'মাম্মীর বন্ধু'। সে দেখে মাম্মী ব্রাণ্ডি খায়, সিগারেট খায়, "রাতে কক্ষনো ঘরে থাকে না", "কাজে যায়, সক্কালে আসে।" পড়শির কাছে তাকে শুনতে হয়, "চলে যা এখান থেকে, বেশ্যার ছেলে কোথাকার!" লেখকটিকে সে জিজ্ঞেস করে, "তুমি জানো—কাকে বেশ্যার ছেলে বলে?" চার বছরের ছেলেটি পত্রিকার পাতায় হাসিমুখের সুন্দর ছেলেদের ছবি দেখলে সহ্য করতে পারে না, চাকু চালিয়ে ফালাফালা করে ফেলে সে সব ছবি। তার মনে হয় ছবির মুখগুলো তার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে আর ব্যঙ্গ করছে তাকে। আগামী দিনের এক ঘাতকের চেহারাই লেখকটি প্রত্যক্ষ করেছে ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা শিশুটির মধ্যে। তার দায়িত্ব যে শায়িত হয়ে রয়েছে ঐ শিশুটির জীবনের জন্য, তার আগামী দিনগুলোর জন্য এটা বুঝতে পারে সে। বলে, "বন্ধু আমার, আমি কি তোমার রঙিন রাতের চিত্তগ্রাহী গল্প লিখব? না সেই ছেলেটির গল্প লিখব, যার গলায় আজ ফাঁসির দড়ি দেখতে পাচ্ছি, যে এখন চাকু হাতে নিয়ে বিজ্ঞাপনের ছবির সুন্দর ছেলেদের গলা কাটছে!

বন্ধু আমার, আমি জানি! যে আনন্দ রয়েছে মদের পেগে, বাজীকরণের বটিকায় আর বারবণিতার ঠুংরীর আসরে, সে আনন্দ আমার কাহিনীতে নেই। কিন্তু কি করব! আমি এখনো পর্যন্ত আমার গল্প কালো বাজারে বিক্রী করিনি, তুমি যেমন সেখানে আমাদের দেশের শাসন-শৃঙ্খলা, শহীদের মর্যাদা আর বোনেদের সতীত্ব বিক্রী করে চিনির কারখানা স্থাপন করেছ।

আমিও আমার প্রতিভা বিক্রী করে তোমার জীবনের ওপর চিনির প্রলেপ দিতে পারতাম। কিন্তু আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। কারণ, আমার সামনে তোমার ছেলে। আমার গল্প তার নতুন জীবনের জন্যে লড়াই করছে।" (পূর্বোক্ত) তার এই কথাগুলোতে সরাসবি বন্ধুটিব প্রতি সম্বোধন, হয়ে উঠতে পারতো তার জবাবী চিঠি। কিন্তু এই লেখা তো তার বুর্জোয়া প্যাট্রন বন্ধুটির জন্যে নয়। এই গল্প যেন লেখক চরিত্রটির আত্ম উপলব্ধি, নিজেরই মূল্যায়ন। সেই মূল্যাযনে মিশে নেই কি রচয়িতা কৃষণ চন্দরও?' এমন এক প্রতিমত তো আত্মপক্ষসমর্থনকারী প্রতিবাদপ্রবন্ধের আকারেও ব্যক্ত করতে পারতেন তিনি। কিন্তু গল্পের মধ্যেও যে এভাবে বলা যায়, উত্তর দেওয়া যায়, তার সফল দৃষ্টান্ত এ গল্পটি।

আরেকটি গল্পে তিনি এঁকেছেন এক কবির ছবি। গর্তে পড়ে যাওয়া একজন লোক তাকে যখন হাত বাড়িয়ে তুলে আনতে বলে, কবিটি তাকে বলেছে, "আমার দ্বারা ও কাজ হবে না। ও সব করলে আমার সাহিত্যে সংযমের অভাব ঘটতে পারে। এমন কি সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক হয়ে যেতেও পারে।" ('গর্ত', অনু. আশরফ চৌধুরী) বিপন্ন মানুষের কথা বললে, তাদের উত্তরণের কথা বললে প্রগতি লেখক শিবিরের তকমা এঁটে যাওয়ার এই ভয় সম্ভবত কৃষণ চন্দরের সমকালে উর্দু সাহিত্যের 'রুমানবি' ধারার উত্তরসূরীদের। যদিও অবাস্তব কল্পনালোক, আবেগমুখর 'রুমানবি' গল্পধারার লেখকগোষ্ঠীতে মজনূঁ গোরখপুরি, পণ্ডিত্ সুদর্শন, হজাব ইসমাইল-দের সঙ্গে এককালে প্রেমচাঁদও ছিলেন, কিন্তু নিজের গল্পে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে উর্দু গল্পের ক্ষেত্রেও যুগান্তর ঘটিয়েছিলেন তিনি। তবুও সেই পুরোনো ধারাটির পূর্বানুবৃত্তিও চলেছিল জনপ্রিয় উর্দু সাহিত্যে। সাধারণ মানুষের কথা বললেই যদি সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক হয়, যদি শিবির চিহ্নিত হয়ে যেতে হয়—সেক্ষেত্রে কৃষণ চন্দর উর্দু গল্পের অন্যতর মাত্রা সৃজন করেছেন পূর্বতন 'রুমানবি' ধারা আর প্রগতিশীল ধারার এক সংমিশ্রণের মধ্যে দিয়ে। তার গল্পে উপস্থাপিত জীবনচিত্রের সঙ্গে প্রেমচাঁদ-ধারার পার্থক্য রয়েছে। অনেক গল্পেই ঘটনা বা চরিত্রের বাস্তবতা সম্বন্ধে পাঠককে সন্দিহান করে তোলার সুযোগ দেন তিনি নিজেই। 'গর্ত' গল্পটিতেই কর্দমাক্ত, পোকা মাকড়ে পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর গর্তে পড়ে যাওয়া লোকটি বেঁচে থাকে দশ বছর। তার স্ত্রীও তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে পড়ে যায় সেই গর্তেই। তাদের দুটি বাচ্চাও হয় সেখানে। এই পরিস্থিতি, এই ঘটনা বাস্তব নয় নিঃসন্দেহে। সাহিত্য কেবল 'Probable impossibility'-কেই প্রশ্রয় দেবে 'improbable possibility'-কে নয়—দীর্ঘকাল মান্যতাপ্রাপ্ত এই জাতীয় খাঁচা থেকে বিশ শতকের সমকালীন সাহিত্যের মতো কৃষণ চন্দরের গল্পও বেরিয়ে আসে এসব ক্ষেত্রে। কিন্তু এমন অসম্ভব ঘটনাকে প্রশ্রয় দিয়ে গল্পের বাস্তবের বৃহত্তর কোনো স্বার্থসিদ্ধি ঘটানোই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য। একে একে

গর্তটির পাশ দিয়ে চলে গেছে বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ, কিন্তু কেউই বিপন্ন লোকটির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। কারো বক্তব্য, "আমাদের কাজ গর্তের মাপ-জোখ করা। গর্ত থেকে কাউকে তোলা নয়।" আবার কেউ তাড়া লাগায়, "স্টক-এক্সচেঞ্জের বাস এসে গেছে। এখন এই হতভাগাটিকে তুলতে গেলে কয়েক হাজার টাকা হাত ছাড়া হয়ে যাবে।" পুলিস সন্দেহ করে, ইচ্ছে করে গর্তে নেমে এ হল ভিড় জমিয়ে পয়সা রোজগারের কায়দা। অথবা আরো গুরুতর অভিযোগ আনে—বিদেশি গুপ্তচর খাবার জলের পাইপ নষ্ট করে কলেরা ছড়ানোর মতলবে গর্তে নেমেছে। মন্ত্রীর গাড়ি যাবার সময় কাঠের তক্তা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় গর্ত। মন্ত্রী বিবৃতি দেন, "রাস্তায় কোনো গর্ত নেই। যারা ওসব কথা বলে, তারা আসলে সরকারের কুৎসা রটনা করার জন্যেই বলে।" গর্তে পড়ে যাওয়া লোকটির খবর এমনকি এক 'ফরেন এক্সপার্ট'-এর কাছেও রয়েছে যার কাজ হল গর্তে পড়ে যাওয়া লোকের দুর্ভোগের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে রিপোর্ট তৈরি করা, যার ভিত্তিতে 'উন্নত সমৃদ্ধ দেশ', 'পেছিয়ে পড়া দেশ'গুলিকে উন্নতির জন্য সাহায্য ও পরামর্শ দেবে। বোঝা যায় গল্পে এই সব মানুষদের ছবি ক্রমশই শ্রেণীগত অবস্থানের এক একটা চিত্রকে তুলে ধরতে চাইছে। আপাতভাবে একটি লোকের গর্তে পড়ে যাওয়ার দুর্ঘটনা দিয়েই শুরু হয়েছিল গল্পের। কিন্তু গল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকের মনে হতে থাকে, লেখক এখানে ব্যক্তি চরিত্রগুলির নিজের নিজের চেহারা নয়, বরং তাদের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত শ্রেণীর চেহারা, এমনকি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রতি উন্নতিশীল দেশগুলির মনোভাবেরও পরিচয় দিচ্ছেন। এই গল্পের ক্লাইম্যাক্স বিন্দুটি দশ বছর পরের একটি দিন। সাম্যবাদীদের মিছিল চলেছে সেই রাস্তায়। মানুষের সমান অধিকার বিষয়ক শ্লোগান, ফেস্টুনের ছড়াছড়ি। অনেকগুলো হাত গর্তের লোকটিকে উঠে আসতে আহ্বান জানায়, "এস, একসঙ্গে মিলে আমরা আরও উন্নত জীবনের জন্যে সংগ্রাম করি।" যে লোকটি এতদিন উঠে আসতে চেয়েও কোনো সাহায্যের হাত পায় নি, আজকে দীর্ঘদিন পর এই মুক্তির ডাক শুনে তার চোখেও কি ভেসে উঠল পালাবদলের স্বপ্ন? সেও কি গর্ত থেকে উঠে এসে শরিক হল সাম্যবাদীদের মিছিলে? না, এমন কোনো ইউটোপীয় আশাবাদে শেষ হয় নি এ গল্প। যত অলীকই হোক এ গল্পের ঘটনা বা পরিস্থিতিগুলি, প্রগতিচেতনার আদর্শ প্রচারের জন্য বৃহত্তর সমাজবাস্তবতা থেকে কখনোই বিচ্যুত হয় নি তা। গল্পে প্রান্তিক চমকের পরিচিত রীতিটিকে এক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন কৃষণ চন্দর, লিখেছেন, "গর্তের লোকটা চীৎকার করে বলে উঠল, 'তোমরা যাও। আমার জন্যে এখন এই গর্তই যথেষ্ট। আমরা তোমাদের সঙ্গে যাব না। এই গর্তের মধ্যেই বেশ আছি।"

বার্নার্ড শ-র প্রসঙ্গে তার প্রবন্ধে ক্রিস্টোফার কডওয়েল যখন মন্তব্য করেন, "communism is the active creation of true liberty which cannot yet be given by anybody to anybody." (George Bernard Shaw ; Studies in a Dying Culture) আমরা তা মিলিয়ে নিতে পারি কৃষণ চন্দরের গল্পের শেষ বাক্যগুলির সঙ্গে। কডওয়েলের এই মন্তব্য বার্নার্ড শ-র ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করার জন্য অপরপক্ষে কৃষণ চন্দরের গল্পে এই সত্যটির প্রতি সচেতনতাই চোখে পড়ে। কারণ

কডওয়েলই বলেছিলেন, "The search for liberty only begins in the classless state, when society, being completely self-governing, can learn the difficult ways of freedom. But how can this be achieved when its destiny is planned by a class, or controlled by the higgling of a market, or even arranged by a company of elegant Samurai?" দশ বছর ধরে মাটির নীচে থেকে এই সত্যটাই বুঝেছে সেই লোকটা। তাই-তার নিজের অবস্থাটা সম্ভবত তার থেকে স্পষ্টভাবে আর কারোরই জানা নেই। নিম্নবর্গের চোখ দিয়ে সেখানে সহজেই পড়ে ফেলেছে সে এই ক্ষণস্থায়ী আবেগের আন্দোলনের আড়ালের বুজরুকিগুলোকে। গর্তের লোকটির মতোই অসংখ্য না-মানুষের ছবি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা গল্পে। 'জঞ্জাল-বুড়ো' গল্পের বুড়োটিও তেমনই এক 'গর্তে' পড়ে যাওয়া মানুষ। সেও বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন এক অস্তিত্বেই অভ্যস্ত। তার সামাজিক অবস্থান তাকে কতটা বিপন্ন করে, সে কথা ভাবতেও ভুলে গেছে সে। দীর্ঘকাল হাসপাতালে শয্যাশায়ী থাকাকালীন একটু একটু করে সে বুঝতে পারে, "মানুষ যন্ত্রের মতোই। যদি কোন যন্ত্র দীর্ঘকাল ধরে বিগড়ানো অবস্থায় থাকে, তাহলে তাকে এক ধারে ফেলে রেখে দেওয়া হয় আর তার জায়গায় নূতন যন্ত্র এসে যায়। কারণ কাজ থেমে থাকতে পারে না, ব্যবসা বন্ধ হতে পারে না আর সময় থেমে থাকতে পারে না।" ('জঞ্জাল-বুড়ো', অনু. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়)। গর্তের লোকটিরও যেমন প্রত্যাশাগুলি ভাঙতে ভাঙতে শূন্যে এসে ঠেকেছিল, সে নিজের চোখের সামনে নিজেই রূপান্তরিত হয়েছিল না-মানুষে ; এই গল্পেও দেখি কারখানার ভূতপূর্ব শ্রমিকটি একটু একটু করে রূপান্তরিত হল 'কাচ্‌রা বাবা'-য়। হাসপাতালের প্রাইভেট ওয়ার্ডে তার প্রথম অপারেশন হয়, আর তৃতীয় অপারেশনের সময় সে স্থানান্তরিত জেনারেল ওয়ার্ডে। ইতিমধ্যে শুধু চাকরিই যায় নি, সর্বস্বান্তও হয়েছে সে। স্ত্রী দুলারিও সরে গেছে তার জীবন থেকে। এইসব আঘাত একসময় আর তার মনে কোনো আলোড়নই তোলে না। "কারোকে দোষী ঠাওরানোর অবস্থা সে অনেকখানি পেরিয়ে এসেছে।" হাসপাতাল থেকে তাকে বিদেয় করে দিলেও সে কোনো অভিযোগ করে না, দুলারি তার ফার্মের বসের সঙ্গে দার্জিলিঙে গেলে সে ভাবে, "হাজার হলেও কে আর কতদিন ধৈর্য ধরে থাকতে পারে! জীবনটা তো ছোট, জীবনের বসন্তকাল আরও ছোট। যখন আবেগ প্রবল হয়ে ওঠে, চোখে চাঁদ নেমে আসে, যখন আঙুলে আঙুলে আগুনের মতো জ্বালা অনুভূত হতে থাকে, ... আর গ্রীবার ভাঁজে ভাঁজে প্রত্যাশা জেগে থাকে—কারোর নিশ্বাসের আরামদায়ক উষ্ণতার প্রত্যাশা, তখন সে অবস্থায় কে কতদিন ফিনায়েল আর পেচ্ছাবের গন্ধ শুঁকবে, থুতু-পুঁজ- রক্তের রঙ দেখবে, মৃত্যুর দরজার দিকে যেতে যেতে এবং সেখান থেকে ফিরে আসতে আসতে যে ফোঁপানো কান্না, তার আওয়াজ শুনবে?" ('পনেরো ফুট দুনিয়া', অনু. আশরফ চৌধুরী) এভাবেই জীবন থেকে, সমাজ থেকে তার বিযুক্তি সে নিজেই অনুভব করে। পনেরো ফুট এক আবর্জনার টবেই সে খুঁজে নেয় নিজের বাঁচার পৃথিবী। "সমগ্র জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে বেঁচে থাকার শেষ উপায় শিখে ফেলেছে।" কারণ জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় রসদ সেখান থেকেই দিব্যি সে পেয়ে যায়। যদিও "বাইরের জগতে এমন কোনো ঘটনা ঘটে না যার আভাস পাওয়া যায় না ঐ আবর্জনার টবে, গত মহাযুদ্ধ থেকে মেয়েদের

গোপন ব্যাধি পর্যন্ত", বাজারের ওঠা নামা থেকে ঝাড়ুদারদের ধর্মঘট—সবই কেমনভাবে ধরা পড়ে একটি আবর্জনার টবে কৃষণ চন্দর এ গল্পে তা দেখিয়েছেন। কিন্তু 'কাচ্‌রা বাবা' এসব বিষয়ে একেবারেই নিস্পৃহ। গর্তের লোকটির মতোই বেঁচে থাকার নিজস্ব সূত্র তারও আছে। সে তাই কথা বলে আবর্জনার টবের সঙ্গে কারণ, "এ জগতে যা কিছু কথাবার্তা হয়, মানুষের মাঝখানে হয় না, নিজেদের শ্রেণীর মধ্যেই হয় আর কোনো স্বার্থকে কেন্দ্র করেই হয়।" গল্পে এই মন্তব্য যদি লেখকের বলেই ধরে নিই, সেক্ষেত্রে কৃষণ চন্দরের অনেক গল্পেই এক ধ্রুবপদের মতো উচ্চারিত হতে পারত বাক্যটি। এই জঞ্জাল, আবর্জনার মতো অপ্রয়োজনীয় মানুষগুলো পড়ে থাকে 'গর্তে'ই। কিন্তু সদ্যজাত একটি পরিত্যক্ত শিশুকে ওই আবর্জনার টব থেকে হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে প্রতিরোধহীন শিরা উপশিরায় এক নতুন রক্তের স্রোত ফিরে আসে কাচ্‌রা বাবার। শিশুটিকে তারই মতো আবর্জনা করে তুলতে চায় না সে, আর যে শিশুর নতুন জীবনের জন্য 'আমার বন্ধুর ছেলে' গল্পের লেখকটির গল্প লড়াই করছিল, তেমনই আরেক শিশুর জন্য কাচ্‌রা বাবাও রাস্তার ওপারে নতুন নির্মীয়মান বাড়ির ইঁট বওয়ার কাজ শুরু করে। কডওয়েল যেমন বলেন যে, শুধু বার্ণার্ড শ নয়, যে কোনো 'well meaning intellectual'-কেই মনে রাখতে হবে, "he must first help to change the system of social relations to one in which all men and not a class have the reins of society in their hands. To achieve liberty a man must govern himself ; but since he lives in society, and society lives by and in its productive relations, this means that for men to achieve liberty society must govern its productive relations." কৃষণ চন্দর তার গল্পে শিল্পীর সেই অবস্থানেই রয়েছেন। মিথ্যে স্বপ্ন না দেখিয়েও যে বলিষ্ঠভাবে কিছু কথা বলা যায়, শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব সচেতনতার পরিচয় রাখা যায় সেই ভাবনা থেকে আবেগজনিত বিচ্যুতির পরিপন্থী তিনি। তাই 'কালু ভাঙ্গি'—এক ধাঙড়ের গল্প শোনাতে বসে তিনি গল্পের আঙ্গিকেও মিশিয়ে দেন ব্যক্তি-শ্রেণী-সমাজের পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে নিহিত দ্বিধাগুলিকে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কালু ভাঙ্গি ধাঙড়ের কাহিনী লেখার চেষ্টা করেও বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন লেখক, গল্প কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে ভেঙে যাচ্ছে প্লট, প্রথাগত গল্প লেখার ব্যাকরণসূত্রগুলির কোনোটিই মিলছে না এ গল্পে। এই ব্যর্থতাই আসলে গড়ে তুলেছে এ গল্পের অভিনব আঙ্গিক। কালুর আশপাশের ছোট বড় অপ্রয়োজনীয় অনেক চরিত্রের জীবনেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে রীতিমতো জমাটি গল্পের উপাদান ; কিন্তু কালু এসবের নীরব সাক্ষী থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারছে না এ গল্পে। এক অদ্ভুত প্রতিনির্মাণই 'কালু ভাঙ্গি' গল্পের উপজীব্য। মৃত্যুর পরেও যে কালু বারেবারে তার সেই অপরিবর্তিত ঝাড়ুগাছাটি নিয়ে লেখকের মনের কোনে এসে দাঁড়ায়, অনুরোধ করে, "ছোটে সাব, হমাকে লিয়ে একঠো কেচ্ছা লিখবেন না?" কিন্তু এমন এক রদ্দি, শাদামাটা জীবন নিয়ে কীভাবে, কোন গল্প লেখা যায়, সে প্রশ্নের উত্তর লেখক খুঁজে পান না। বারবার এসে দাঁড়ায় সে, অথচ লেখক বুঝতে পারেন, "ওকে নিয়ে আমি লিখতে চাই না তা তো নয়, বহু যুগ ধরে আমি লিখতে চাইছি ওকে নিয়ে, কিন্তু না, যত চেষ্টাই করি কিছু লিখতে পারি না।" বহু যুগ ধরে কেবল কৃষণ চন্দর নয়, কেউই লিখতে পারেন নি এ গল্প, অথবা ব্যর্থ হয়েছেন

বার্ণার্ড শ-দের মতো। তাই এই গল্পটিকেই আমরা রাখতে পারি কৃষণ চন্দরের কথাসাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে। যে গল্প না লিখতে পারার যন্ত্রণাই তাকে দিয়ে গল্প লিখিয়ে নিয়েছে, কডওয়েলের ইঙ্গিতগুলির সঙ্গে আমরা মিলিয়ে পড়ে নিতে পারি তার উপসংহারের বক্তব্যকে—

"যে গল্পটা হতে পারতো সেটা আমি জানি। কিন্তু সেটা তো হয়নি, কেননা আমি একজন লেখক, আমি নতুন গল্প বানাতে পারি—কিন্তু নতুন মানুষ বানাতে তো পারি না। একা আমাকে দিয়ে এ কাজ হবে না। ও-কাজের জন্যে একজন লেখক, তার পাঠক, ডাক্তার, কম্পাউন্ডার, বখতিয়ার, গ্রামের পাটোয়ারি, মোড়ল, দোকানদার, মহাজন, কর্তাব্যক্তি, রাজনীতিবিদ, মজুর, খেতচাষী সবাইকেই চাই। সকলের, হাজার লক্ষ কোটি মানুষের, প্রত্যেকের সমবেত চেষ্টা চাই। আমার একার কী ক্ষমতা? কিছুই করতে পারি না আমি। পরস্পর সাহায্যের হাত যদি আমরা না বাড়াই এই দায় উদ্ধার হবে না। তুমি অমনি করে আমার মনের ভিতর দরজায় দাঁড়িয়েই থাকবে সেই অপরিবর্তিত ঝাড়ুগাছাটি হাতে নিয়ে।" ('কালু ভাঙ্গি', অনু. মানসী দাশগুপ্ত)

এই সামাজিক দায়ের কথাই মনে করিয়ে দিতে চান কৃষণ চন্দর, খুব বৈপ্লবিকভাবে যুগবদলের গল্প লিখে বাস্তবকে অস্বীকার করতে চাননি তিনি, কারণ তার জানা আছে, "Communism is the active creation of true liberty which cannot yet be given by anybody to anybody."

পাঠপঞ্জি :

নয়া ইস্তেহার, নয়াজমানার গল্প, স্বপ্নমিছিল—অনু. আশরফ চৌধুরী (চিরায়ত প্রকাশন)
মিস নৈনিতাল—অনু. জাফর আলম (মুক্তধারা)
নির্বাচিত গল্প—অনু. এ.বি.এম. কামালউদ্দিন শামীম (মুক্তধারা)
উর্দু গল্প সঙ্কলন—অনু. ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট)
আধুনিক ভারতীয় গল্প (১/৪)—সম্পা. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূর্জপত্র)
স্মরণের রংধনু—অনু. আনোয়ারা বেগম (মুক্তধারা)
Studies in a Dying Culture—Christopher Caudwell (People's Publishing House)

উর্দু থেকে অনুবাদ : রুহিল আনোয়ার
স্বপন দাসাধিকারী

কৃষণ চন্দরের চিঠি

মজহর ইমামকে

Koover Lodge
Four Bungalows
Andheri
Bombay
10.8.1949

ইমাম সাহেব,

আপনার চিঠিগুলি পেয়েছি এবং পত্রিকা 'নঈ কিরণও'* কিন্তু শেষ দিনগুলিতে আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম। প্রথমে প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনের প্রস্তুতিতে লেগেছিলাম। তারপর শান্তি সম্মেলন হলো। এসব থেকে ছাড়া পাবার পর আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

এই লাইনগুলি আমি শুধু এই ভেবে লিখছি পাছে আপনি আমার নীরবতাকে ভুল ভাবেন। বিস্তারিত চিঠি সুযোগ পেলেই লিখবো।

শুভার্থী
কৃষণ চন্দর

14.7.50

পেয়ারে সাথী—'নঈ কিরণ' প্রকাশের জন্য সাধুবাদ জানাই, যদিও তা আমি এখনও পাইনি। তবু আশা করছি আপনি ও আপনার অন্যান্য বন্ধুরা যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। 'নঈ কিরণে'র জন্যে Freedom Road উপর কিছু টিপ্পনী লিখেছি। এর অনুবাদ আমার ভূপালের সঙ্গী আহেসান আলি খাঁ করেছেন। তরজমা সত্যিই ভালো।

নঈ কিরণের কপি পাঠান।

কৃষণ চন্দর

---

* ১৯৪৯ সালে নিজের দেশ দ্বারভাঙ্গা (বিহার) থেকে আমি একটি প্রগতিশীল পত্রিকা প্রকাশ করেছিলাম, সেটির তিনটি মাত্র সংকলন দীর্ঘ দীর্ঘ বিরতির পর প্রকাশিত হয়েছিলো। সাহিত্যিক মহল ঐ সংকলনগুলির খুব প্রশংসা করেছিলেন। —ইমাম

14.8.50

ব্রাদারম, পত্রিকা পেলাম। সুক্রিয়া—আপনার হুকুম অনুযায়ী সর্দার জাফরি (যিনি ছাড়া পেয়েছেন)-কে নই কিরণ পৌঁছাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তিনি লক্ষ্ণৌ গেছেন। এবার আপনি বলুন, বান্দা কি করতে পারে? যাই হোক, পত্রিকা আপনি সুন্দরই বের করেছেন। বাকি ফয়সালা আপনার উপর। এই পত্রিকা হয়তো বাজারে প্রগতিশীল জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আসবে ও ঘরে ঘরে যাবে। এই অভিজ্ঞতা আপনাকে বলবে যে আমাদের সীমিত গণ্ডির বাইরে এসে প্রকাশ্য পরিবেশে নিঃশ্বাস নেওয়া উচিত, যাতে আমরা সুস্থ থাকি এবং বেশিদিন জীবিত থাকতে পারি।

কৃষণ চন্দর

14.10.57 *

প্রিয়,

তসলিমোঁ নেয়াজ, যখন কলকাতা থেকে বেরোলাম, তখন ১০২° জ্বর ছিলো। এখানে পৌঁছে আবার ১০৪° হয়ে গেল, সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত বিছানায় পড়ে আছি। দু তিন দিন থেকে জ্বর নেই। কিন্তু দুর্বলতা খুবই। কলকাতা থেকে যে ফ্লু আমি নিয়ে এসেছিলাম এখানে তা সবাইকে বিলি করে দিয়েছি। তাই আমার স্ত্রী, আমার বাচ্চা আমার সেক্রেটারী এবং ঘরের অন্যান্য চাকর সব ফ্লুতে আক্রান্ত। পড়শীরা আমাদের দেখাশুনা করছে আর ওদের বাবুর্চি রান্না করে দিচ্ছে। মহেন্দরজী দেখতে আসতেন, তিনদিন হলো সেও নিজের ঘরে ফ্লুতে আক্রান্ত। বলুন, আমি চলে আসার পর আপনি ভালো ছিলেন তো?

এখন এই অবস্থা যে কলকাতার নাম শুনেই ভয় পাই। (এখন বেচারা ওয়াহসৎভি* কলকাতায় নেই) আপনার ভালবাসা এবং বন্ধুত্ব কলকাতায় অনেক সাহায্য করল। এই সুন্দর কথা চিরকাল মনে থাকবে। কিন্তু এই মাসে যেতে পারব না। সামনের মাসে যাবো। সূরী সাহেব তিন দিনের মধ্যে বম্বে আসবেন। ওঁকে বলে দেবো।

শাহীদ পরভেজী কি অবস্থায় আছে? ওঁকে আমার আদাব জানাবেন। আফশোস এই যে আমার অসুস্থতার জন্যে আপনার সঙ্গে ভালভাবে মেলামেশা করা হলো না এবং কোন মজা পেলাম না—উপাধ্যায়জী এবং অন্যান্য বন্ধুদের আমার আদাব পৌঁছে দেবেন। আপনি নিজের কুশল লিখে জানাবেন। আমার জন্যে কোন কাজ থাকলে জানাবেন। শাহীদ পরভেজীর ঠিকানা জানাবেন। আমি ভুলে গেছি।

আপনার কৃষণ চন্দর

---

* বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন 'কলকাতায় কৃষণ চন্দর' পৃষ্ঠা ১১৭, এবং জলার্ক, কৃষণ চন্দর সংখ্যা - ১, মজহর ইমামের।

* ওহেসৎ—আল্লামা রজা আলি খান ওহেসৎ। ওঁকে খানবাহাদুরও বলা হয়। উর্দু কবি ছিলেন। গালিবের রচনার অনুগামী।

বম্বে
26.4.58

পেয়ারে ইমাম,

আমার অসুস্থতার সময় তোমার অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ এবং শুভেচ্ছাকামী চিঠি পেলাম। আমার শরীর এখন পুরোপুরি ঠিক আছে এবং কোন ধরনের কষ্ট আর নেই। আজব কথা হলো যতবার কলকাতায় গেছি গরমের সময় গেছি এবং অসুস্থ হয়ে ফিরেছি। এই শহর 'আমার পক্ষে উপকারী হলো না।

'পরভেজ শাহেদী' সংখ্যা কবে বেরুবে? মাসিক শোহেলের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। জমিল মজহরী এবং পরভেজ শাহেদীর সম্পর্কে দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হলে আমাকে রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠিয়ে দেবেন। আমি নিজেও বিশেষ করে পরভেজ সম্পর্কে লিখতে চাইছিলাম। কিন্তু অসুস্থতা সব কিছু নষ্ট করে দিয়েছে। পরে কখনো লিখব। ইয়ারজিন্দা সোহবৎ।*

আবার আজকাল ফিল্মের জন্যে লেখা শুরু করেছি এবং সাহিত্যের কাজও আরম্ভ করেছি। যেহেতু ভালো কিছু লেখা হলো না, তাই মেজাজে অস্থিরতা আছে। সম্ভবত এই অস্থিরতা ভালো কিছু নিয়ে আসবে। তুমি আজকাল কি লিখছো? পারভেজকে ভালবাসার সেলাম জানিও।

তোমার কৃষণ চন্দর

22.11.57

ব্রাদারম—আদাব—আপনার চিঠি পেলাম। করুণা করার জন্যে ধন্যবাদ। শরীর এখনও সুস্থ হয়নি। বোম্বাই যাওয়া বারণ। ঘরের বাইরে একটু দূরে গিয়ে দু-চারপা হাঁটি। রাতে রোজ ৭৭" জ্বর আসে। কিন্তু দিনে পুরোপুরি ঠিক থাকি। দু তিন ঘন্টা বসে কাজ করে নিই। ডাক্তাররা অনুমতি দিয়েছেন। আর এমনিও তাদেরও তো পারিশ্রমিক চাই। যদি আমি একেবারে বিছানায় পড়ে থাকি তবে কিভাবে দেব। মজুরদের তো রোজ কাজ করতেই হবে। আমি এমন মজুর যে মহার্ঘ্য ভাতা, বোনাস, অসুস্থতার ছুটি কিছুই নেই।

ভাই, আপনার চিন্তা ভুল যে আমি আমার বিরুদ্ধে সমালোচনাতে রেগে উঠি। আমি আমার সম্পর্কে লেখা প্রত্যেক সমালোচনা ভালো বা খারাপ যে উদ্দেশ্যেই হোক, খুব মন দিয়ে পড়ি। উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি কিছু ভাবি না। ভাবি যে, লেখার বক্তব্য কি আর যা লিখেছে তাতে সত্যতা কতটা, আমি তা থেকে কতটা শিখতে পারি। আপনি দেখবেন যে আমি আজ পর্যন্ত নিজের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যক্তিগত সমালোচনার জবাব দিইনি। আসলে বক্তব্য এই যে, আমার মহলে যদি প্রশংসা করা হয়, তাহলে সাহিত্যিকরা খুব খুশী হন। আর যদি দু একটি বাক্য ওদের সাহিত্যিক দোষের উপর লেখা হয়, এরা চেঁচিয়ে আকাশ মাথায় তোলেন ; এই দেশের সাহিত্যিকদের এ একটা বড় দোষ, যে তারা তাদের লেখার বিরুদ্ধে কোন কথা

* বন্ধু যদি বেঁচে থাকে তার সঙ্গে মেলামেশা হবেই।

শুনতেই চায় না। তার পরিণামে একটি ভুল সমালোচনা লেখার প্রবণতা শক্তিশালী হয়ে উঠছে। অধিকাংশ সমালোচনাগুলি বন্ধুত্বের উপর ন্যস্ত এবং কিছু কিছু ঘৃণা এবং খারাপ উদ্দেশ্যের উপর নির্ভব করে। তাই সুস্থ সমালোচনা লেখা হয় না। আমার সম্পর্কে আমি এটাই চাই যে প্রকাশ্য সমালোচনা লেখা হোক এবং স্পষ্ট সমালোচনা হোক এবং সেজন্য বন্ধুত্বের সম্পর্কে কোন ফারাক না আসে। আপনি জানেন না যে আমার এবং হংসরাজ রহবর (যার কৃষণ বিরোধিতা জনগণেব মুখে মুখে)-এর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুবই ভালো। ওর ঘরে আমার চায়ের নেমন্তন্ন হয়। ও আমার ঘরে আসে। কয়েকটি সন্ধ্যা আমরা এক সঙ্গেই কাটাই। তখন এইসব বিরোধিতা কিছুই থাকেনা। যদি আমি সত্যিকারের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পরিবেশন করি, তবে এই সব বিরোধিতা ইতিহাসের চোখে অর্থহীন হয়ে যাবে এবং যদি আমি সত্যিকারের খারাপ সাহিত্য পরিবেশন করি, তবে আমার বন্ধুদের প্রশংসা আমাকে সাহিত্যিক মৃত্যুর হাত থেকে কখনো রক্ষা কবতে পারবে না। এটা ঠিক যে আমি সাহিত্যে ব্যক্তিবাদকে অত পছন্দ করিনা এবং ব্যক্তিগত হামলাতে আমি কষ্ট পাই। কিন্তু আমি চট করে অনুমান করে নিই যে এই লেখা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কষ্ট দেবার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে— তবে আমি এর থেকে কেন affected হব?

সংক্ষেপে এই যে সাহিত্যেব প্রসঙ্গে নিজেদেব মানসিকতা বড় কবা উচিত। এই বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া প্রথম শ্রেণীর, এমনকি দ্বিতীয় শ্রেণীব সাহিত্য রচনা করা যায় না।

শাহীদ পরভেজী—তওবা তওবা—পরভেজ শাহেদী—মেরী তরফ সে বহুৎ বহুৎ পেয়ার। যদি আমি আমার অসুস্থতার সময় নাম ভুল লিখে গিয়ে থাকি তাতে এমন কী। ওরও আমাকে কৃষণ চন্দরের জায়গায় 'কিরসন কেন্দ্র' লেখাব অধিকার আছে। সে এই অধিকার সব সময় প্রয়োগ করতে পারে।

যদি সুস্থ এবং স্বাস্থ্যবান হবার গতি এই রকম থাকে তবে আমি ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ায় কলকাতা যেতে পারব। শূরী সাহেব ১৫ই নভেম্বর ডেকে ছিলেন। কিন্তু ডাক্তাররা অনুমতি দিলেন না।

আরে হ্যা, একটা দরকারী কাজ তো ভুলেই গেছি। আমি একটা নিবন্ধ '৫৬ ভারতীয় সাহিত্যের উপর লিখছি। এই প্রসঙ্গে আমাকে ১৯৫৬-র বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি জানাতে হবে। কিছু বিখ্যাত সাহিত্যিক রচনার নাম এবং লেখকদের নাম, কোন নতুন পত্রিকা ভালো যদি প্রকাশিত হয়ে থাকে ওই বছর,কবিতাতে কোন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলে বা কোন বিশেষ কথা—এই সব তথ্য খুব বেশি হলে এক পৃষ্ঠায় বা অর্ধেক পৃষ্ঠায় চলে আসে—নিবন্ধ আমাকে ৩০ নভেম্বর প্রেসে দিতে হবে। তাই যদি আপনি তাড়াতাড়ি মনোযোগ দেন তাহলে ভালো হয়। বেশি কাজ নেই, কোন সাহিত্যপ্রেমী বাঙালীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমাকে লিখে জানান। আমি আপনার চিঠির অপেক্ষায় রইলাম।

আপনাদের কৃষণ চন্দর

16.11.58

ব্রাদারম, আদাব আপকা খত মিল গিয়া, এদিকে এমন শৃঙ্খলায় ছিলাম যে

একেবারে কয়েকটি জিনিস লেখা হল। আট দশটি গল্প এবং একটি উপন্যাসও সম্পূর্ণ হল। উপন্যাসের নাম 'এক-ঔরৎ হাজার দিওয়ানে' ; হিন্দীতে ছাপতে যাচ্ছে। উর্দুতে 'বিশবী সাদী'-র লোকজনের সঙ্গে কথা চলছে। ওরাও চাইছিল, আমিও কথা দিয়েছিলাম। এখন দেখুন কি হয়। এই উপন্যাস একটি ভবঘুরে মেয়ের জীবনের উপর লেখা। দলীয় রীতি থেকে বিদ্রোহ করে সে বিংশ শতাব্দীর জীবনে আসে। এখানে তার অভিজ্ঞতা কি? কি ধরণের লোকের সঙ্গে তার কাজ, তার উপর কি কি ঘটনা ঘটছে—শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার জীবনের কাহিনী। উপন্যাস যখন ছাপা হবে, ওর একটি কপি অবশ্যই আপনাকে পাঠাব।

যে কহিনীগুলি আপনি পড়েছেন তা ছাড়াও আরও গল্প আমি লিখেছি। 'গুলদান', 'এক কহানী', 'সবে রাতে' হয়তো ছাপা হবে। 'চিনী পাঙ্খা' বিশবী সাদী-র বার্ষিক সংকলনে আসবে। 'খাট্টে আনাব, মিঠে আনার' হয়তো 'সমা'-তে ছাপা হবে। কয়েকদিন হলো লাহোরের 'দস্তান গো' পত্রিকায় 'লাহোর কি গঁলিয়া' এই নামে হেজাব ইমতিয়াজ আলির একটি কাহিনী পড়ি। খুব রাগ হল। তাই আর একটি কাহিনী লিখলাম ; তার নাম আমি 'লাহোর কি গঁলি' দিয়েছি। যদি আপনি হেজাবের কাহিনী পড়ে থাকেন, তবে আমার গল্প অবশ্যই পড়বেন। এই গল্প 'শায়েরে' ছাপা হবে।

আপনি ঠিকই বললেন, কিছুদিন থেকে আমার নিজের লেখার ইচ্ছে হচ্ছে, ভেতর থেকে মনের ইচ্ছা যে শুধু কিছু লেখা যাক নয়, বরং ভালো কিছু লেখা যাক। দেখুন কখন লেখা হয়। কিন্তু এখন মনে উৎসাহ জন্ম নিয়েছে। শেষ কয়েকদিন আমার মন খারাপ ছিল। সংসারের অবহেলার জন্যে মন খারাপ নয়, এই অভিযোগ আমার আর রইল না। আমার ব্যক্তিগত অবস্থা এমন ছিল যে জীবনের সব শখ মিটিয়ে ফেলেছি। খোদা দোজখমে—এখন পর্যন্ত লেখা গেল না—হয়তো খোদার ইচ্ছা নেই। এতে আমরা ওর পাপী বান্দারা কি হস্তক্ষেপ করতে পারি?

আপনি বিয়ে করে ফেললেন? খোদা আপনাকে খুশী রাখুন এবং বিয়ের প্রত্যেক বিপদ থেকে নিরাপদ রাখুন। নারীদের সম্বন্ধে এখন আমার বিশ্বাস এই যে দূর থেকে তাদের খুব ভাল দেখায়।

শুভার্থী কৃষণ চন্দর

শাহ্‌বা লখনভিকে লেখা চিঠি

17.10.56

পেয়ারে শাহবা—ওঃ হোঃ—কত রাগ করেছ—চিঠি লেখা বন্ধ করে দিলে। ব্যস 'আফকার' এমন ভাবে পাঠিয়েছ যেন এই কমবখতকে এবার পত্রিকা পাঠাতেই হবে। বরং—আচ্ছা এসো—মিটমাট করে নিই—তুমি কি জানো—ইউরোপ থেকে ফিরে আমি কি ধরনের বিপদে পড়েছিলাম! তিনমাস ধরে একটি নার্সিং হোমে নিজের মেয়ের অসুস্থতার জন্য যাচ্ছি, এখনও ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকবে। তার উপর তোমার রাগ, নির্যাতনের উপর নির্যাতন। রাগ ছুঁড়ে ফেল। শোন, আমি তোমার জন্য একটি সুসংবাদ এনেছি। আমি তোমার জন্য উপন্যাস শেষ করেছি। পরশুই শেষ করেছি।

এবার তো খুশি হবে। দেখো এত কষ্টের দিনগুলিতেও তোমাকে ভুলতে পারিনি। কিন্তু উপন্যাস বড়ো নয়। 'যব খেত জাগে'-র মতো হবে। দেড়শো পৃষ্ঠার। এবার তুমি তাড়াতাড়ি ছেপে নাও। কাগজ একটু ভালো দিও ; ছাপা যেন আগের চেয়ে ভালো হয়। নাম হলো 'আসমান রওশন হ্যায়'। এখন আমি দু চারদিন পর্যন্ত একে দেখবই না। তারপর রিভিশন করব। দু চার দিনের কাজ হবে। তারপর তার নকল করিয়ে তোমাকে পাঠাব। এই সব কাজ দশ পনেরো দিনের ভেতর হয়ে যাবে। এবার তুমি নিজের কথা বিস্তারিত জানাও। দীর্ঘদিন তুমি চিঠি লেখনি।

কৃষণ চন্দর

বম্বে

5.1.57

অর্থাৎ বই পাবার পর এমন স্তব্ধতা—পাওয়ার খবরও জানালে না—আচ্ছা। এবার শোন, আফকারের জন্য একটি ধারাবাহিক উপন্যাস শুরু করার ইচ্ছে আছে ; তুমি কি বলো—বারো পনেরো কিস্তিতে শেষ হয়ে যাবে। একটু ভেবে লিখো। পাকিস্তান থেকে অনেক পত্র পত্রিকা ধারাবাহিক উপন্যাসের জন্যে তাগাদা করে এবং আমি চাই যে তুমি এই ব্যাপারে এগিয়ে যাও। হানিফেব সম্বন্ধে জানাও এবং কোথাও থেকে চেষ্টা করে টাকা পাঠাও, কেননা আজকাল আকাশ একেবারে পরিষ্কার—'আশমান রওশন হ্যায়'।

বম্বে

1.3.57

— এদিকের দুই দেশের মধ্যে ঘৃণা বেড়েই চলেছে, প্রেমের বা ভালবাসার এত অভাব অনুভব করা যাচ্ছে যে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিছু বুঝতে পারছি না, এই বিষ কবে দূর হবে? বইগুলি পড়ার স্বাদের এত অভাব যে নিজের গুরুত্বহীনতায় আফসোস হয়। আমরা কিছুই করতে পারি না। আমাদের সামনে যুদ্ধ হয়—লোকেরা মরে—তাদের মারা হয়—গরীবি দারিদ্র্য বেকারী—কষ্ট, অধঃপতন দিনরাত বৃদ্ধি ত থাকছে এবং আমরা কিছু করতে পারি না। কখনও কখনও আফশোস হয়। খোদা আমাকে কুকুরের মন কেন দিলো না—ব্যস বসে বসে লেজ নাড়াতে থাকতাম এবং আরামে খাবার খেতাম এবং শেষ পর্যন্ত কোথাও না কোথাও মন্ত্রী হতাম।

আচ্ছা খুশ রহো—তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে মনের উৎসাহ মিলিয়ে গেল। কথার কি আছে, আমাদের কাজ হলো নিজের কাজ করতে থাকা ব্যস—

বম্বে

13.3.57

তোমার চিঠি পেলাম। তুমি ঠিক বলেছ এই উপন্যাস এই রকম ভাবেই লেখা হবে যে তুমি আমাকে চিঠি লিখতে থাকবে, মনে করিয়ে দেবে, বিরক্ত করতে থাকবে এবং আমি কিস্তি লিখতে থাকব। তুমি মনে করিয়ে দিতে আলস্য করবে না আর, প্রয়োজনে

রাগ করবে। তাহলে ঠিক হয়ে যাবে। আমার মতে একমাস আগে থেকে আফকার-এর পাঠকদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে এই প্রচার শুরু কর—খবর্দার অর্থাৎ সুসংবাদ বা জান নেওয়া—যা তুমি ভালো মনে কর। তুমি সিনেমার জন্য গান লিখেছো—এ খুবই ভাল কথা অর্থাৎ 'আফকার' তো ফিকর-এর বহু বচন, দৌলতের নয়। এই জন্যই তো অন্য দরজায় ঠক ঠক করতে হয়। করবই বা কি!

বম্বে

15.5.57

বারো দিন পর বিছানা থেকে আজ উঠে বসেছি। ইনফ্লুয়েঞ্জা চেপে ধরেছিলো। চার ছ দিন কিন্তু লেখা যাবে না। এর পর তাড়াতাড়ি সবার আগে তোমার কাজ করব। মনের ইচ্ছে তোমাকে কষ্ট না দেওয়া এবং তোমার কিস্তিগুলো ঠিক সময়ে পাঠানো। কিন্তু অসুস্থ হলে করি কি!

প্রার্থনা করো এবার যেন তোমার দু-কিস্তি লেখার পর অসুস্থ হই ; তার আগে নয়। অর্থাৎ মাঝে মাঝে অসুস্থ হলেও মজা। নইলে ভয় আছে। 'নীলাম ঘর' লিখতে আমার স্বাস্থ্য নীলাম হয়ে যাবে। তোমার থেকে বেশি আফকারপ্রেমীদের কাছে লজ্জা অনুভব করছি।

বম্বে

8.12.59

এব আগে তোমাকে একটি চিঠি লিখেছি। তোমাকে এই সুসংবাদ দিয়েছিলাম যে উপন্যাস আমি সম্পূর্ণ করেছি, যার জবাবে তুমি এই সুসংবাদ দিয়েছো যে কোন প্রকাশক লাহোরে আমার অসম্পূর্ণ উপন্যাসই ছেপে দিয়েছে। তোমার খুশী হবার কথা যে তোমার লেখক এত বিখ্যাত যে লোকেরা তার অসম্পূর্ণ লেখাও ছাপতে দ্বিধা করে না বা ওর লেখা এতই দুর্লভ যে যেটুকু পায় ছেপে দেয়। ......সাহিত্যিক চুরি ভারতবর্ষে ও পাকিস্থানে বরাবরই হচ্ছে—সম্পূর্ণ বেহায়ার মতো—কিন্তু কোন একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস যা এখন লেখা হচ্ছে, যা এখন লেখকের মাথায় আছে, যা এখনও ছাপা হয়নি তাকে এভাবে ছেপে দিয়ে জনগণের সমক্ষে আনা সত্যিই অনেক হিম্মতের কথা। কি ভালোই না হয় যদি ভারতবর্ষের কোন প্রকাশক কুদরতুল্লা সাহেবের অর্ধেক ছোটগল্প, আহমদ নাদিম কাশ্মিরীর অর্ধেক কবিতা এবং জোস সাহেবের ৩/৪ রুবাই ছেপে দেয়। এতে যদি কিছু না হয় তবে এইটুকু নিশ্চয় হবে যে উর্দু সাহিত্যে নতুন আধুনিক পরীক্ষার রাস্তা খুলে যাবে। আমি কি দুই দেশের সরকারকে জিজ্ঞেস করতে পারি, যদি আপনারা খালের জলের সম্পর্কে সমঝোতায় রাজী হতে পারেন, তবে এই সম্বন্ধে কেন কোন সমঝোতা হতে পারে না!

বম্বে

10.5.60

তোমার আদেশ অনুযায়ী একটি ছোটগল্প 'সপেরণ' পাঠাচ্ছি তোমাকে। প্রাপ্তি

সংবাদ এবং তোমার কুশল জানিও। এও জানিও বই বাজারে কবে পাওয়া যাবে, আমিই বা কবে পাবো! আর কতোদিন অপেক্ষা করতে হবে?

জানা নেই রাইটার্স গিল্ডে কারা নির্বাচিত হয়েছে। জানিও আমাকে। জমিলুদ্দিন আলির ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি, আবার জানিও। তোমার মামলার কি হোল? আমি লেখা তোমাকে পাঠিয়েছিলাম, আশা করি পেয়েছো। রাইটার্স গিল্ড চোর পাবলিশার্সদের ব্যাপারে কি করছে? আজকাল এখানে ভীষণ গরম পড়েছে। এ বছরে এই শেষ ছোটগল্প—এরপর গরমকাল শেষ হলেই কিছু লেখা সম্ভব হবে বা যদি কোথাও পাহাড়ে যাওয়া যায়।

দীর্ঘদিন পরে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, তুমি কুশলও জানতে চাওনি। এর মধ্যে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি, অনেক অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছি। হঠাৎ মেয়ের শরীর খারাপ হয়ে গেল। দু মাস বম্বেতে ঘরের বাইরে বেরোতে পারিনি। কোনভাবে দুই চাকরের সাহায্যে তাকে দিল্লি আনলাম। কিন্তু এখানে দেড়মাস চিকিৎসাতে কোন লাভ হলো না এবং দিনের পর দিন অবস্থা খারাপ হতে লাগলো। নিরূপায় হয়ে তাকে রাঁচী নিয়ে গেলাম। সরলা বহীনকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। দুজন চাকরও সঙ্গে গিয়েছিলো, কেননা মেয়ে কথায় কথায় রেগে যায়, হিংস্র হয়ে যেতো, আয়ত্তের বাইরে চলে যেতো। ট্রেনে আলাদা কামরা বুক করতে হয়েছিলো, কত রকমের কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হলো। কোনরকমে রাঁচী পৌঁছলাম। মেয়েকে রাঁচী হাসপাতালে ভর্তি করলাম। দশ বারো দিন নিজেও সেখানে থাকলাম। কিন্তু ডাক্তাররা চিকিৎসা শুরু করল না। বলল, একমাস ওকে পর্যবেক্ষণ করবে। এক মাস পরে ওষুধ দেবে ; অপারেশনও হতে পারে। অন্য চিকিৎসাও হতে পারে। যাই হোক এক সপ্তাহ, দশ দিনের মধ্যে ডাক্তারদের রিপোর্ট পেয়ে যাবো। তারপর আমাকে ফের রাঁচী যেতে হবে এবং সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসা শুরু হবে। যদি অপারেশন হয়, দু তিন মাস আমাকে সেখানে থাকতে হবে। নইলে দ্রুত ফিরবো। যাই হোক, জানুয়ারী মাস আবার উত্তর ভারতে কাটবে। ফিল্মের কাজ বন্ধ আছে। সাহিত্যের কাজও বন্ধ, আর মাথার কাজও। শুধু মনের ঘর খোলা আছে। ভালোই লাগছে।

দীর্ঘদিন পর তোমার বিস্তারিত চিঠি পাওয়া গেল। ধন্যবাদ। আমি এখন ভালো আছি। গত বারো দিন ধরে ফ্লুতে ভুগছিলাম। ১০৪° পর্যন্ত জ্বর উঠেছিলো। এখন সুস্থ আছি। আশা করি 'এক খুশবু উড়ি উড়িসি' ছাপা হয়ে গেছে। ঐ বইয়ের অন্তত ছ' কপি পাঠাও। এর আগে 'সড়ক ওয়াপস যাতী হ্যায়' বইয়ের দু কপি পেয়েছিলাম, উপন্যাসের টাইটেল পেজের কাগজ ভালো, লেখাও সুন্দর ; কিন্তু ছাপা ভালো হয়নি। আমার কাছে যে দু কপি এসেছে তার অধিকাংশ পৃষ্ঠার অক্ষর স্পষ্ট নয়। যাই হোক, এই যান্ত্রিক সমস্যা সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বেশি নেই। তুমি তোমার কাজ

জানো।

নতুন বছরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেনো। তোমাকে, ভাবীকে, বাচ্চাদের খোদা বিপদ ও অসুস্থতা থেকে সুরক্ষিত রাখুন, এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। দীর্ঘদিন পর তোমাকে লিখছি রাঁচী থেকে ফেরার পরই আমাকে 'সবে আফসানা'-র* জন্যে উত্তরপ্রদেশের শহরগুলিতে যেতে হলো। পাঁচটি জায়গায় টিকিট বিক্রি করে মুশায়েরার মতো 'সবে আফসানা'-র বন্দোবস্ত করা হয়েছিলো। প্রথম 'সবে আফসানা' মৌনাথভঞ্জন-এ অনুষ্ঠিত হলো। দশ পয়সার টিকিট ছিলো এবং দশ হাজার লোকের জমায়েত হয়েছিলো, তারপর বেনারস, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রত্যেক জায়গায় এমনি মজলিস হযেছিলো। কম করে তিন হাজার আব বেশির দিকে পঞ্চাশ হাজাব মানুষ জমায়েতে এসেছিলো। এবাব তুমি এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের অনুমান কবতে পারো। 'সবে আফসানা'-তে অংশগ্রহণকাবীদের নাম হলো—আলি আব্বাস হুসেনী মসিহুর জামা, রজিয়া সাজ্জাদ জহির, প্রকাশ পান্ডে, খাজা আহমদ অব্বাস, উপেন্দ্র নাথ আস্ক, অমৃত রায়, মহেন্দ্রনাথ এবং কৃষণ চন্দর। দশ বারো দিনে হাজার হাজার মানুষকে ছোট গল্প পড়ে শোনানো এবং তাঁদের প্রশংসা পাওয়া এবং তাদেব সাহিত্যের একটি নতুন ধরনের সঙ্গে পরিচিত করা, আমার মতে, সাহিত্যের একটি নতুন মোড়। সবে আফসানার উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল দেখে আশা করা যায়, ভাবতের অন্য সাহিত্যপ্রেমী শহরগুলিতেও এই নতুন উদ্যোগ সাফল্য পাবে এবং আমাদের জনগণ একটি নতুন আর্টফর্মে উৎসাহিত হবে। আমরা এর পর পশ্চিম উত্তব প্রদেশ ও পাঞ্জাবের শহরগুলিতে এই ধরনের ম্যাযফিল অনুষ্ঠান করার প্রয়াস চালাব। আমার আশা যে ভালই সাফল্য লাভ কবা যাবে।

তোমার চিঠি? চার না ছয়ে পেলাম। যদি লেখো তাহলে পাওয়া যাবে, নইলে পাবো কি করে? ডাকপিয়ন কি এমনি আনতে পারবে? তোমার চিঠি এখানে পেলাম না কি বোম্বেতে? আমি ২৩শে মার্চ বম্বে থেকে ফিরেছি। তখন থেকে এখানেই আছি। ৪/৫ সম্মেলন একের পর এক নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। এখন অবসর পাওয়া গেল। এখন উপন্যাস লেখার মেজাজ গড়ে তোলার জন্যে কোন হিল স্টেশনে পালিয়ে যাবার কথা ভাবছি। কিন্তু এই মাসের শেষ পর্যন্ত এখানেই থাকব। তুমি সহজেই উপরের ঠিকানায় চিঠি পাঠাতে পারো। চারখানা না লিখে একটিই লিখো—পাওয়া যাবে। সবাই আশা করেছিলো তুমি ইন্দো পাক কালচারাল কনফারেন্সে আসবে। জানি না, তুমি কেন আসোনি। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করার ভালোই অবসর ছিলো। হাফিজ জলন্ধরী, জমির জাফরী, জমরা নিগা, শওকত থানভি, ইবনে ইনসা, মির্জা আদিব এবং অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে দীর্ঘদিন পর দেখা হলো। তোমার জন্যে আকাঙ্খা মনে রয়ে গেলো। নকুশ-এর সম্পাদক মহম্মদ তুফেলও এসেছিলেন। সম্মেলনের আগে কদিন ধরে ওঁর সঙ্গে

* ছোট গল্প পড়ার আসর।

নিয়মিত দেখা হয়েছে। জীবনে প্রথমবার ওঁকে দেখলাম। লোকটি ভালো, বিনয়ী। লোকটি শাহেবা সখনভির পাঞ্জাবী এডিশন। কিন্তু খুব জ্ঞানী এবং ভাবুক। কোন নেশায় আছে! চিঠি লিখো।

একটি আত্মচিত্র লিখেছি। যাকে পছন্দ উর্দুতে ছাপানোর জন্যে তাকে পাঠিয়ে দাও। উপন্যাস সম্পর্কে তোমার রায়ে সহমত আছি। মহৎ উপন্যাস চেষ্টা করে লেখা যায় না, নিজেই লেখা হয় এবং সম্ভবত ভুল করে, অর্থাৎ লেখকও জানে না যে সে কি লিখছে।

তোমার দুটো চিঠিই পেয়েছি। আমাকে দশবারো দিন ধরে ফ্লু খুব কষ্ট দিচ্ছিলো। বর্ষাকালের ভেজা ঋতুতে গা এবং আত্মা দুটোই স্যাতস্যাত করতে লাগল এবং শুধু তাই নয়, পুরো শরীরটাই আঠার শিশির মতো মনে হচ্ছিলো। খোদা করে, এখন এই অসুখ থেকে মুক্ত হয়েছি। ডাক পার্সেলে তোমাকে নতুন উপন্যাসের একটি অংশ পাঠাচ্ছি। ওর নাম 'এক ভায়োলিন সমুন্দর কে কিনারে'। দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশের রসিদ এলে পাঠাব। যাই হোক, তুমি এই উপন্যাস তাড়াতাড়ি ছেপে দাও। ... কৃষণ চন্দর সংখ্যা সম্বন্ধে কি লিখবো? এমনিতে আমি শুনেছি মাসিক পত্রিকার উৎসাহ শেষ হয়ে গেছে। (এটা কি সত্যি?)

আমাকে একদিন 'শায়ের', পত্রিকার সম্পাদক এজাজ সিদ্দিকী বলেছিলো, কিন্তু কৃষণ চন্দর সংখ্যা কি সে বের করবে? একটি কৃষণ চন্দর সংখ্যার প্রস্তুতি ভালোভাবে চলছিলো। যদি সে তার যোগাড় করা প্রবন্ধগুলি তোমার হাতে তুলে দেয়, তবে তোমার অনেক পরিশ্রম বাঁচতে পারে। চিঠি লিখে দেখো। কিন্তু আমার উল্লেখ কোরো না, কেননা 'খেয়াল'-এর সম্পাদকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো এবং সে দক্ষিণ ভারতে উর্দু ভাষা প্রচারের ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী। এখন যখন পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে, সংখ্যা বের করার প্রশ্নই ওঠে না। তুমি কায়দা করে কথা বলে দেখো।

কিছু বন্ধুর কথা হলো, কৃষণ চন্দর সংখ্যা 'শায়ের' এখন করবার দরকার নেই। যখন পরিস্থিতি আরো অনুকূল হবে তখন ছাপালে ক্ষতি নেই। আশপাশের পরিস্থিতি দেখে আমি মনে করি, এই রায়টিই ভালো। সবুর করো ভাই, বেশি সন্তান জন্ম দেওয়া আজকালের যুগে সত্যিই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমি তোমাকে লিখতাম, কিন্তু ভালোই হলো যে তুমি নিজে অনুভব করলে। আমারও তিনটি সন্তান। একজন পাগলা গারদে আছে। তার জন্যে মাসে আমাকে তিনশো টাকার ব্যবস্থা করতে হয় এবং বাকি দুজনের লালন পালনের খরচ যদি সঠিকভাবে হয়ে থাকে তাহলে তাতেও খরচ কম হয়নি। আমি এই মতের সমর্থক যে বাচ্চা কম হোক এবং তাদের সঠিকভাবে মানুষ করা হোক যাতে বড়ো হয়ে এই বাচ্চারা নিজের ভুলভ্রান্তির জন্য মা বাবার দারিদ্র্যকে

দায়ী না করতে পারে। এই মেয়ে পাগল হবার পর আমি—আমার এমন মনে হয় যে এই দুনিয়ায় আমার কেউ নেই। যাই হোক, যেতে দাও! খোদা তোমার বাচ্চাদের সুরক্ষিত রাখুন এবং তোমাকে বেশি সুযোগ দেন যাতে তুমি ওদের সেবা করতে পারো। তুমি নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখো আর আমার ভাবীর দিকেও। নিজের কাজ রীতিমত নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে করে যাও, যেমন এখন পর্যন্ত করে আসছো এবং কারো থেকে বেশি পাওয়ার আশা কোরো না। আর কি লিখব।

তোমার চিঠি পেলাম। আমার মেজাজ আজকাল খুবই খারাপ। তোমাদের ওদিকের দু একটি পত্রিকায় আমার সম্পর্কে এত নোংরা কথা বলা হচ্ছে এবং তোমরা চুপচাপ আছো। কম সে কম একটি সভ্য প্রতিবাদ হওয়া উচিত, চাও কি কারও নাম না করে। হাম কলম (সংস্থার নাম, সম্পাদকীয় কলম) বা কোন স্টান্ডার্ড সভ্য সংস্থার পত্রিকাব মাধ্যমে এই প্রতিবাদ রাখা উচিত, যাতে এই ধরনের গালাগালিকে সাহিত্য থেকে দূরে রাখা যায়। কিন্তু তোমরা সবাই চুপচাপ আছো—ঠিক আছে। চুপচাপই থাকো।

চাঁদি কে ঘাও (এর উৎসর্গ এমন)

ফণি মজুমদারের নামে

(PHANI MAJUMDAR)

তোমার সুবিধার জন্যে নাম ইংরেজীতে লিখে দিয়েছি। উৎসর্গের পৃষ্ঠায় শ্রেফ উর্দুতে লেখা যাবে। নতুন বছরের সুসংবাদ এটাই যে আজকাল মস্কোর মতো জায়গায় 'এক ঔরত হাজার দিওয়ানে'-কে স্টেজে পরিবেশন করা হচ্ছে। তাস (সোভিয়েত নিউজ এজেন্সী)-এর খবর আছে, যে এর প্রিমিয়ার আড়ম্বরে হয়েছে। এই উপলক্ষে উচ্চ পর্যায়ের রুশী এবং ভারতীয় আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। নাটক খুব সাফল্য লাভ করেছে। রুশী দর্শক একে খুবই পছন্দ করেছে। এই খবরের অন্যদিক হলো যে এই সময় ঘরে রেশন নেই।

তোমার কয়েকটা চিঠি পেয়েছি। এ দিকে এমন কিছু উদ্বেগ হয়েছিলো যে বাধ্য হয়ে দীর্ঘকালের জন্য চুপচাপ থাকতে হলো। সে কেটে গিয়েছে। তাই আবার লিখছি

১. ফৈজ সংখ্যার জন্যে দু তিন দিনের মধ্যে নিশ্চয় কোন প্রবন্ধ পাঠিয়ে দেবো। আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো।

২. কৃষণ চন্দর সংখ্যার জন্যে তুমি আমার থেকে কি ধরনের সাহায্য চাও? দ্যাখো, এত কাজ আমার ঘাড়ে চাপিও না যাতে আমি করতে না পারি; আমাকে ততটুকুই দিও যা আমি ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারি।

৩. সলমা ও কৃষণ চন্দরের প্রবন্ধ, ছোট গল্প তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেব। আসছে সপ্তাহে নকল হয়ে যাবে।

৪. একটা সংক্ষিপ্ত উপন্যাস লিখেছি। 'লন্দন কে সাতরংগ'। এর ভল্যুম 'আসমান

রৌশন হ্যায়'-র মতো হবে। সম্ভবত কিছু কমই হবে। যদি চাও, এর পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেব।

৫. একটি দীর্ঘ ব্যঙ্গ গদ্য লিখেছি—'ফিল্মি কায়দা' ; উর্দুর নতুন কায়দার স্টাইলে ফুলস্কেপের ৯৫ পৃষ্ঠার হবে। এতে কয়েকটি হাস্যরসের এবং অন্যান্য প্রবন্ধ যোগ করে একটি ভালো বই হতে পারে। চাইলে তার পাণ্ডুলিপিও পাঠিয়ে দেব।

আমি জানি, তুমি আজকাল খুব ব্যস্ত। কিন্তু সময় করে দ্রুত জবাব লিখে ফেলো যাতে আমি কাজ শেষ করতে পারি।' দুটো বইই তাড়াতাড়ি হস্তলিখনের জন্যে দিতে হবে, যাতে তোমার অসুবিধা না হয়। এখানকার প্রকাশক দু তিনজন হস্তলিপি লেখককে একসঙ্গে বসিয়ে পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করে নেয়—তোমারও এই রকমই করা উচিত।

সোহেল আজিমাবাদীকে লেখা চিঠি

Koover Lodge 4 Bunglow
Andheri - Bombay
20.12.53

বিহার ইউনিভার্সিটির এফ-এ উর্দু সিলেবাসের জন্য তুমি আমার যে কাহিনী পছন্দ করবে তাই অন্তর্ভুক্ত করতে পারো ; তাতে জিজ্ঞেস করার বা অন্য চিঠি লেখার প্রশ্নই ওঠে না। যাই হোক, এখন যে প্রশ্ন এসেছে তার জবাব লিখছি। আমার জন্মের তারিখ ১৯ নভেম্বর ১৯১৩। বয়স ৪০ বছর। জীবন কিছু বইতে এবং কিছু প্রেমিকার গলিতে কেটেছে, যার উল্লেখ ইউনিভার্সিটির ছাত্রের জন্য বিপজ্জনক হবে।

তোমার কৃষণ চন্দর

মনে হচ্ছে তোমার সময় ভালো যাচ্ছে না। সেইজন্য এসব কাজ করছ।

কৃষণ

7 কৃতি কুঞ্জ
14 রোড/খের
বম্বে - 52

পেয়ারে সোহেল—তোমার চিঠি—অর্থাৎ চিঠি আমি—প্রথমবার মহেন্দ্রজীর বাড়ি থেকে পেলাম। যদি তুমি সরাসরি ওখানে লিখতে অথবা মহেন্দ্রজীর কাছ থেকে আমার ঠিকানা নিতে তাহলে তোমাকে এত অসুবিধায় পড়তে হতো না। এর আগের কোন চিঠি আমি পাইনি।

আমি দিল্লি থেকে বোম্বে এসে গেছি এবং পার্মানেন্টলি বোম্বেতে থাকবো। এমনই আমার ইচ্ছে। যা হবে হবে।

'আফসানা'-র জন্যে কাহিনী অবশ্যই লিখবো। কবে চাই? মনে রেখো ; ফ্লু-র পনেরো দিনের হামলার পর আজ উঠে চিঠির জবাব লিখছি। গল্প লিখতে একটু দেরী হবেই। কিন্তু অনেক বেশি দেরীও হবে না। তাই একটু ভেবে আমার জন্য সময় রেখো, যাতে কষ্ট না হয়।

'আফসানা'-র কোন সংখ্যা আপাতত ছাপা হয়ে গিয়ে থাকলে, আমাকে পাঠিয়ে দাও। যাই হোক, তোমার রুচির কাছে এই আশা যে পত্রিকাটি সব দিক থেকে ভালো হবে।

তোমার কৃষণ চন্দর

ঠিকানা উপরে লিখে দিয়েছি। কোন ভালো বাড়ির সন্ধানে আছি। আপাতত কয়েক মাসের চিঠিপত্রের জন্যে এই ঠিকানাই নির্দিষ্ট থাকবে।

পেয়ারে সোহেল,—তুমি নিশ্চয় আমার উপর রেগে আছো। রাগাই উচিত। এবার এই ভদ্রলোকের ক্ষমাপ্রার্থনাও শুনে নাও। কাহিনী দীর্ঘদিন থেকে লেখা হয়ে পড়েছিলো। আমি রীতিমত, লেখার পর নকলনবিশকে দিয়ে দিয়েছি। সেই লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি তার বাড়ি জানতাম না—তাই গল্প ওর কাছ থেকে আনতে পারলাম না, পরশু সে নিজেই এলো। সত্যিকারই সে অসুস্থ ছিলো। গল্পও নকল করতে পারেনি। এবার এই কাহিনী যেমন ছিলো তেমনি পাঠাচ্ছি রেজিষ্টার্ড এ.ডি-তে। প্রাপ্তি সংবাদ জানিও, কেননা এর কোন নকল আমার কাছে নেই।

তোমার রাগ দূর করার জন্য একটি কাহিনী জানুয়ারীতে অবশ্যই পাঠাবো ; নইলে রাগ দূর হবে কি করে? যাই হোক, চিঠি দিয়ে ও প্রাপ্তি সংবাদ দিয়ে অর্ধেক রাগ দূর করে নাও।

তোমার কৃষণ চন্দর

5 Bhargara Lane
Tishazari, Delhi
2.12..60

পেয়ারে সোহেল, পাটনা থেকে এলাহাবাদ গিয়ে আট দিন অস্‌কের* অতিথি ছিলাম। এখন ১৪ই ডিসেম্বর আবার এলাহাবাদ যাচ্ছি। তার পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী ভাই। ভাবো তো, আমরা সবাই প্রায় অর্ধ শতকের দূরত্ব পেরিয়ে এলাম। প্রিয় জীবন শেষ হয়ে গেল। এবার এখান থেকে পরের দিকের দূরত্বই বা কত থাকল? অস্‌কের ৫০তম জন্মবার্ষিকীতে হঠাৎ দুঃখিত হলাম।

এলাহাবাদ প্রথমবার গেলাম। সেই জন্যে ওখানকার লোকেদের সঙ্গে প্রথমবার বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পাওয়া গেল। এলাহাবাদে সাহিত্য একটি গৃহ উদ্যোগের মতো ; প্রত্যেক গলি এবং পাড়ায় ছড়িয়ে আছে। এই দিক থেকে খুবই আকর্ষণীয় শহর।

অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে 'আওয়ামি দর'-এর চাঁদা সংগ্রহ করার জন্য দশ বা বারো দিনের জন্য ইউ.পি সফরে বেরোব। তারপর রাঁচী যাবো। এখনো রাঁচীর ডাক্তার কোন

---

* উপেন্দ্রনাথ অস্‌ক

* জীবনের অশ্ব ছুটে যাচ্ছে।

খবর পাঠায়নি, আমি চিঠি লিখেছি। আমি মনে করিয়ে দিয়ে আর একটি চিঠি লিখবো। তার উত্তর এলে ডিসেম্বরের শেষে বা জানুয়ারীর শুরুতে রাঁচী যাবার প্রোগ্রাম হতে পারে। তোমাকে ঠিক সময়ে খবর পাঠিয়ে দেব। রাঁচীতে কয়েক দিন থাকার জন্য তোমাকে পরিচ্ছন্ন জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে ...... নিজের উদ্বেগের কথা কি লিখবো? জীবন এত বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে যে কবে বোম্বাই ফেরা যাবে কিছুই বলতে পারছি না। 'রক্ত মে হ্যায়, রক্সে উমর'*—সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। আমি এখান থেকে ৯ তারিখ ইউ.পি সফরে বেরোব। এই চিঠির জবাব ঐ তারিখের আগে দিল্লির ঠিকানায় পাঠাও। আখতার ও রেনউই, জলিম মজহারী এবং অন্যান্য বন্ধুদের প্রতি আমার আদাব। পাটনাবাসীদের ভালবাসা এবং সৌজন্য আমাকে জয় করে নিয়েছে। এর সব কৃতিত্ব তোমারই।

তোমার কৃষণ চন্দর

Guru Niwas
15th Road. Khas
Bombay 52

পেয়ারে সোহেল—আদাব। তোমার অভিযোগ তোমার মতো ঠিকই আছে। আমি একটি আজব অবস্থায় ছিলাম। গত ছ' মাস আমি সব রকমের চিঠিপত্র লেখা বন্ধ রেখেছিলাম। আজব বেজার অবস্থা ছিলো। রেগে গিয়েছিলাম। কোন বন্ধুর উপর নিজের রাগ ব্যক্ত করা উচিত মনে করিনি। তাই চুপচাপ থাকা শ্রেয় মনে করেছিলাম। আস্তে আস্তে চেষ্টা করে যাচ্ছি এই অবস্থা কাটানোর।

এই চিঠির সঙ্গে তোমার ছেলের জন্যে একটি ফটো স্বাক্ষর করে পাঠাচ্ছি। এমন কাহিল অবস্থা যে মনে হয় বার্দ্ধক্য এগিয়ে আসছে। দীর্ঘদিন নিজের কোন ছবি তোলার সাহস পাইনি।

তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা। আমাদের বন্ধুত্ব শুধু চিঠিপত্রের উপর নির্ভরশীল নয়। এ কোনদিনই ভাঙবে না। নিউ জেনারেশন এর মতো বন্ধুত্ব জানেই না।

'কহানী কি কহানী', যে প্রবন্ধ আমি রেকর্ড করিয়ে এখান থেকে পাঠিয়েছিলাম, ওর এক কপি আমি চাই। আমি যে দিন এই প্রবন্ধ লিখলাম, সেদিনই রেকর্ড করিয়েছি, নকল তাড়াতাড়ি চাই। এর আগে বোম্বাই স্টেশন নিজেই তোমার রেডিও স্টেশনকে এই সম্পর্কে চিঠি লিখেছে? তাকে ভালোভাবে স্বাগত জানানো হয়নি। তুমি তাড়াতাড়ি তার নকল পাঠাও।

তোমার কৃষণ চন্দর

শিবরাজ

চলচ্চিত্রে কৃষণ চন্দরের ভাবনা

জলার্ক : কৃষণ চন্দর সম্পর্কে আপনার প্রাথমিক স্মৃতি কি?

শিবরাজ : কৃষণজীর সঙ্গে পরিচয় হয় তিনি যখন দিল্লীর অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ড্রামা ডাইরেক্টর ছিলেন তখন। অতি সুক্ষ্ম চিন্তার উন্নতমানের গল্প লেখক হওয়ার সুবাদে এ.আই.আর তাঁকে এই দায়িত্বে নিয়োগ করে। আমি ছিলাম ওখানকার শিল্পী। প্রতি সপ্তাহে একটি করে ড্রামা হতো, ফলে তাঁর সঙ্গে গভীরভাবে মেশবার সুযোগ হলো। তিনি ছিলেন মহৎ অন্তঃকরণের আশ্চর্য মানুষ। সকলের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিলো মধুর এবং হঠাৎ আমরা জানলাম যে তিনি পুনা থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন। ডব্লু. জেড. আহমদ ছিলেন ওখানে। আহমদ সাহেব চেয়েছিলেন সব সেরা লেখকেরা শালিমার স্টুডিওতে যুক্ত হোন। কৃষণজী বললেন, রেডিওতে আমার সীমাবদ্ধ সুযোগ। তাই ওখানে গিয়ে কিছু করার ইচ্ছে। আমরা সকলে খুব ভেঙে পড়লাম। তিনি বললেন, তোমরাও চলে এসো, একসাথে কাজ করা যাবে। ফলে অল ইন্ডিয়া রেডিও ছেড়ে দিয়ে পুনায় চলে গেলাম এবং শালিমার স্টুডিওতে তিনশ টাকার বেতনে চাকুরিতে যোগ দিলাম। এভাবে ওখানে কিছুকাল কাজকর্ম চলার পর শালিমার স্টুডিও অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়ে। কৃষণজী ন্যাশনাল স্টুডিও থেকে আমন্ত্রণ পান।

কৃষণজীর লেখা 'সরাএ কে বাহর' ছিলো এক মনোজ্ঞ নাটক। ন্যাশনাল স্টুডিওর অধিকর্তা কৃষণজীকে বলেন এত সুন্দর নাটক ফিল্ম করছেন না কেন! তিনি ছিলেন প্রযোজক। কৃষণজী বম্বে চলে গেলেন ন্যাশনাল স্টুডিওতে যোগ দিতে। তিনি ডাইরেক্টর নির্বাচিত হলেন। আমিও শালিমার-এ ইস্তফা দিয়ে বম্বে চলে গেলাম। তিন-চার মাস লেগেছিলো কাজ জোগাড় করতে। ফিল্ম-এর কাজ শুরু হয়। নয় মাস সময় লাগে এটা শেষ হতে। বক্স অফিসে এটা খুব কার্যকরী হতে পারেনি। তখন পার্টিশনের সময়। দাঙ্গা চলছিলো। তাই চলচ্চিত্রটি অর্থনৈতিক সাফল্য পেলো না। 'নভেলটি' সিনেমায় রিলিজ হয়। আমরা সকলে খুব ভেঙে পড়লাম। কৃষণজী বললেন কী আর করা যাবে, ঠিক আছে, আবার দেখা যাবে। এরপর উনি লেখেন 'রাখ'। এটা নাটক হলো না। ছবি শেষ হলো বটে কিন্তু সাফল্য এলো না। এর কোন স্টার ভ্যালু

ছিলো না। এরপর কৃষণজী 'চার আদমি' নির্দেশনা করেন, কিন্তু তাও মাঝ পথে পরিত্যক্ত হয়। কৃষণজী ছিলেন সফল চিত্রনাট্যকার, এবং একই সময়ে ঐ ছবিগুলি টেকনিক্যাল দিক থেকে কোন অংশেই অনুন্নত মানের ছিলো না; বরং শৈলী ছিলো। তাঁর কল্পনা ছিলো উন্নতমানের এবং তাঁর এই ধারণাও ছিলো কী করে লেখাকে ছবির ভাষায় রূপান্তর করা যায়। এসব গুনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পরিকল্পনা সফল হয়নি।

জলার্ক : 'সরাত্র কে বাহর' সম্পর্কে বলুন

শিবরাজ : দেখুন 'সরাত্র কে বাহর' ছিলো রেডিও ড্রামা। এটার ফিল্ম হয়েছিলো। সরাত্র অর্থ হলো ইংরাজীতে যাকে বলে ইন্ (INN)। ভ্রাম্যমান মানুষজন চলতে গিয়ে যেখানে রাত্রি যাপন করেন এবং ভোজন করেন। এই সরাই-এর অঙ্গনে গেটের বাইরে একজন ভিখারী থাকতো। তারা যত্রীদের কাছ থেকে খাদ্য ভিক্ষা করে খেতো। ভিখারীদের একটি অতি সুন্দরী মেয়ে ছিলো। একদিন একদল তাকে সরাই-এর মধ্যে টেনে নিয়ে যায় এবং ধর্ষণ করে। মেয়েটির খুব করুণ জীবন শুরু হয়। এই ছিলো ছবির গল্প। এ ছবির সাফল্য আসে নি।

জলার্ক : আপনি এই ছবিতে কোন ভূমিকায় অভিনয় করেন?

শিবরাজ : এতে আমি ল্যাংড়া ভিখারীর অভিনয় করি। একজন বিকৃত ভিখারী। আমার কাজ ছিলো কী ঘটনা ঘটছে তাকে বর্ণনা করে যাওয়া।

জলার্ক : একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে কৃষণ চন্দরকে কীভাবে নিতেন?

শিবরাজ : নিশ্চয়ই, তিনি ছিলেন অতি সুন্দর মানুষ। ফিল্ম নির্মাণেও অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি এবং একই সময়ে যাঁর উন্নত মানের কল্পনা ছিলো। বহু নবীন অভিনেতারা তাঁর কাছে এসে শিখেছেন। এদের কোন রকম পূর্ব অভিজ্ঞতাই ছিলো না। কৃষণজী এদেরকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিলেন। অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে এই ছবি নির্মিত হয়েছিলো অথচ অর্থনীতিক সাফল্য এলো না। দাঙ্গার সময়, কোন মানুষ নভেলটি থিয়েটারে গিয়ে ছবিটি দেখার সাহস করতো না।

জলার্ক : তাঁর নির্দেশিত অন্য কোন ছবিতে অভিনয় করেছেন?

শিবরাজ : 'রাখ'-এ অভিনয় করেছি লোহারশন-এর ভূমিকায়। সে নায়িকার সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কে জড়িয়েছিলো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে। রাখ-এর গল্প এখন ঠিক বলতে পারবো না। অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়েছিলো। 'চার আদমিতে, অভিনয় করেছি কার সার্পার ভূমিকায়। চারজন বিভিন্ন জীবিকার লোক। 'সরাত্র কে বাহর' নির্মাণ হয়েছিলো ১৯৪৫ সালে। এরপর ১৯৪৫/৪৬ এ নির্মাণ হয় 'রাখ', তারপরেই 'চার আদমি'। ১৯৪৭ সালে 'সরাত্র কে বাহর' মুক্তি পায়।

জলার্ক : কৃষণ চন্দর সম্পর্কে আপনার স্মৃতি থেকে টুকরো কিছু খবর দিন।

শিবরাজ : দেখুন, কৃষণ চন্দর ছিলেন আমাদের গডফাদার। আজ আমাদের যতটুকু প্রতিপত্তি হয়েছে, বেঁচে থাকার যেটুকু যতটুকু সংস্থান করতে পেরেছি সব তাঁরই জন্য। নতুবা কার এত সাহস ছিলো বম্বে এসে এই জীবিকার যুক্ত

হবার। তাঁকে সকলে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতো বলে অনেকেই এ.আই.আর ছেড়ে দিয়ে বম্বে চলে এসেছিলেন। আবার কৃষণজীও প্রত্যেকের যত্ন নিয়েছিলেন। রেম আগরওয়াল ছিলেন এ.আই.আর-এ, তিনিও চলে এলেন বম্বেতে। গোলাম হোসেন ছিলেন লক্ষ্ণৌ রেডিওতে। যখন শুনলেন কৃষণজী ফিল্ম ডিরেকশনে খুব নাম করেছেন, তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন এবং ছবিতে অভিনয় শুরু করলেন। রাধিকাও ছিলেন দিল্লীতে এ.আই.আর-এ। তাঁর ছিলো অত্যন্ত সুন্দর গলা এবং উচ্চারণ। তাঁকেও কৃষণজী ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ দেন। কৃষণজীর ইচ্ছা ছিলো সব দিক থেকে যোগ্যতা সম্পন্ন ফিল্ম ইউনিট গড়ে তোলার, কে.এ. আব্বাস-এর মতো। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলো না।

জলার্ক : এতগুলি বছরের যোগাযোগের সুবাদে কৃষণ চন্দর সম্পর্কে আপনার বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতাতো নিশ্চয়ই হয়েছে। কোন ক্ষোভ, বিক্ষোভ!

শিবরাজ : তিনি সেই ধরনের মানুষই ছিলেন না তো কী বলবো। শুধু একদিন আমার শুটিং-এ পৌঁছাতে দেরী হয়েছে। তিনি বললেন, দেরী হলো কেন। কারণ বললাম। তিনি বললেন ঠিক আছে, ঠিক আছে. তৈরী হয়ে নাও, আমার কাঁধে হাত রাখলেন। তিনি 'দিল কী আওয়াজ' তৈরী করেছিলেন। অনেক বছরের কথা। স্মৃতি অনেক ঝাপসা হয়ে গেছে। খুব সম্ভবত 'রাখ'-এর নাম পরিবর্তন করে 'দিল কী আওয়াজ' রাখা হয়েছিলো। 'রাখ' খুব শুভ নাম ছিলো না। কৃষণজীর এক উল্লেখযোগ্য কাজ হলো ফনি মজুমদার-এর স্বাধীনতা আন্দোলন ছবির জন্যে চিত্রনাট্য লেখা। এটা খুব অভিনন্দিত ও প্রশংসিত হয়েছিলো। তিনি চিত্রনাট্য লেখেন 'গরিবি হটাও'। এটি তারকা সমৃদ্ধ না করে নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী দ্বারা করা হয়েছিলো। তাই নাম করতে পারেনি। এই সব কাজকর্ম চলতে থাকার পর তাঁর হার্ট-এর সমস্যা দেখা দেয়। আমাদের দুই জনের একই— ডাক্তার সিংঘল। তাঁর মুখ থেকে কৃষণজীর স্বাস্থ্যের খবর পেতাম। পরে তিনি বেশী লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইতেন না। আমরাও কম যেতাম।

জলার্ক : চলচ্চিত্র নির্মাণে তাঁর প্রকৃত ইচ্ছা কি ছিলো? উপন্যাসের বক্তব্যকে এই অডিও ভিশুয়াল মাধ্যম দিয়ে তুলে ধরা?

শিবরাজ : নতুন ধরনের মুভি তৈরী করা। কিন্তু সফল হতে পারেন নি। কে.এ. আব্বাস, আর.কে, বি.পি.সাঠে— এঁদের সঙ্গে ভালো যোগাযোগ ছিলো; তবুও অনেক কিছুই তিনি করতে পারেন নি।

জলার্ক : কৃষণজী কি আর্ট ফিল্ম তৈরীর চেষ্টা করেছিলেন?

শিবরাজ : তখনকার দিনে কমার্শিয়াল ফিল্মের দারুণ প্রভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে কৃষণজী নতুন যে কাজটি করতে চেয়েছেন তা আজকের দিনের প্রকৃত আর্ট ফিল্ম ও কমার্শিয়াল ফিল্মের মাঝামাঝি মনোজ্ঞ এক ছবি করা।

জলার্ক : কিন্তু মানুষজন কেন তা গ্রহণ করলো না?

শিবরাজ : প্রথমত আমি মনে করি এর প্রচার হয়নি। মানুষ যদি ছবির খবরই জানতে না পারে তবে দেখবে কি করে। কৃষণজী ছিলেন প্রবলভাবে প্রচার বিমুখ

এবং লাজুক। মিডিয়ার সঙ্গে তাঁর তেমন বেশী যোগাযোগ না থাকাতেও প্রচারের সাহায্য পান নি। তবে 'ফিল্ম ইন্ডিয়াতে' এর পর্যালোচনা বেরিয়েছিলো। পর্যালোচনা কে করেছিলেন মনে করতে পারছি না।

জলার্ক : পুরানো সমাজের একজন অভিনেতা হিসাবে নতুন সময় পর্যন্ত হেঁটে এসে ফিল্ম মুভমেন্টের নতুন যে ধারা দেখছেন, তা আপনার কেমন মনে হচ্ছে?

শিবরাজ : দেখুন সময় পাল্টাচ্ছে। নতুন ধারা আসছে। ভালো ছবিও তৈরী হচ্ছে। 'লগন' খুব ভালো ছবি হয়েছে। বিষয় অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

জলার্ক : এটা কী মানুষের অতীতের তৃষ্ণা, অতীতের ভালোবাসা, অতীত মাধ্যমের প্রতি মমতা হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে?

শিবরাজ : আমি মনে করি অতীতের ঐতিহ্যের একটা বড় প্রভাব বর্তমান কালেও প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। পত্রিকাতে পড়েছি মহাভারত আবার নতুনভাবে নির্মাণের কথা ভাবা হচ্ছে, তিন খণ্ডে।

জলার্ক : কৃষণ চন্দরের সাহিত্যকৃতির একটা পর্যালোচনা শুনতে চাই আপনার কাছে।

শিবরাজ : কৃষণ চন্দর-এর সাহিত্যের পর্যালোচনা আমি করতে পারবো না। তাঁর সাহিত্য হলো গদ্যের মধ্যে কবিতা। প্রথম দিকে সব গল্পই লিখেছেন কাশ্মীর নিয়ে। এর পর উনি সমাজকে ব্যঙ্গ করে অনেক লেখা লিখেছেন 'তাস কে পত্তে', গধা ঐসব। এর মধ্যে সমাজের অসঙ্গতিকে তিনি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। তাঁর বেশীর ভাগ লেখা আমি পড়েছি। মান্টো ও কৃষণ চন্দরের লেখার খুব অনুরাগী ছিলাম। ইসমৎ চুগতাই, রাজেন্দ্র সিং বেদী— এরা প্রত্যেকেই নিজের লেখায় খ্যাত ও স্বতন্ত্র। একের সঙ্গে অন্যজনকে তুলনা করা যায় না। মান্টো ছিলেন খুবই স্মার্ট লেখক। তাঁর প্রত্যেকটি বাক্য ছিলো সুন্দর। তবুও আমি মনে করি উর্দু সাহিত্যে কৃষণ চন্দরের স্থান সর্বোচ্চে। কৃষণ চন্দর-এর লেখায় ছিলো জীবন ও জনগণ, সামাজিক শোষণের রূপ। আমি মনে করি তিনি ছিলেন আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম।

অনুলেখন : দিলীপন ভট্টাচার্য

আর. কে. মুনির
পিতৃপ্রতিম কৃষণ চন্দর

আব কে. মুনির : কৃষণ চন্দর প্রকৃত অর্থেই এক মহান অন্তঃকরণের মানুষ। আমি তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তিনি যতখানি পারা যায় মানুষের কল্যানের কথাই ভাবতেন। নিজের সাধ্যানুসারে অন্যকে সাহায্য করা পছন্দ করতেন। অন্যের ক্ষতি হয় এই রকম কোন কাজ চিন্তাও করতেন না। তাঁর কাছে অনেক জীবন ধারার মানুষজন আসতেন, আসতেন যেমন সাধারণ মানুষ তেমনি অসাধারণবাও। প্রত্যেকের জন্য তাঁরা ছিলো অকৃত্রিম ব্যবহার। নবীন লেখকেরা আসতেন তাঁদের মতামত জানাতে এবং তাঁদের সৃজন কৃষণজীকে দেখাতে। তিনি কারো জন্য চিঠি লিখে দিতেন, কারো জন্য অনুমোদন পত্র। ফিল্ম রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন-এব জন্য তিনি প্রভৃত কাজ করেছেন। এই জগতের লেখক কলাকুশলীদের সঙ্গে তাঁর গভীব যোগাযোগ ছিল। সামাজিক কাজ করার দিকে কৃষণজীর আগ্রহ ছিলো খুব বেশী। এ কথা অনেকেই জানেন দেশে খরা বন্যা ও ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে তিনি সকলের আগে এগিয়ে এসেছেন এবং সাংগঠনিকভাবে, অর্থনীতিকভাবে সাধাবণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

যদিও তিনি সাধারণ জীবন যাপনের অনুরাগী ছিলেন, তবু তিনি খুব একটা বাসে চড়তে চাইতেন না; বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ট্যাক্সিতে যেতেন এবং ট্রেন ব্যবহার করতেন। আর ছিলো তাঁর ভোজন রসিকতা। আমার মায়ের কাছে এই সব গল্প শুনেছি। তিনি পাঞ্জাবী হওয়ার কারণে তাঁর খাওয়া দাওয়ায় অনুরাগ ছিলো। মাঝে মধ্যে রাত্রে মদ্য পান করতেন কিন্তু তা ছিলো খুব পরিমিত।

লেখক হিসাবে আমি মনে করি তিনি ছিলেন খুবই অন্তঃমুখীন। তিনি নিজের লেখা গল্প উপন্যাস ইত্যাদি নিয়ে কারো সাথে কোন আলোচনা করতেন না। খুব কাছের মানুষ জনের কাছ থেকে এসব আমি শুনেছি। অন্যান্যরা যেমন নিজেদের লেখাপত্র নিয়ে আলোচনা করতেন, কৃষণজী কিন্তু তা করতেন না।

জলার্ক : কৃষণ চন্দব এর ব্যক্তিত্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য কী বলে মনে করেন?

মুনির : কলকাতায় আমি অনেক বার গেছি। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা করেছি। অত বিখ্যাত বড় মাপের মানুষ হলেও, তিনি ছিলেন খুবই সাধারণ। নিজেই এগিয়ে এসে সম্ভাষণ করেছেন। শেষবার যখন গেছি তিনি ছিলেন

খুবই অসুস্থ। সবে হাসপাতালে থেকে ফিরেছেন। তবুও প্রায় আধঘণ্টা কথা বলেছি। তিনি ওয়ার্ল্ড সিনেমা নিয়ে আমাকে বলেছিলেন। স্বভাবসিদ্ধভাবে তিনি একটু গম্ভীর প্রকৃতির কিন্তু তা সত্ত্বেও আলোচনা মেলামেশার ক্ষেত্রে খুবই স্বজন। আমার সাক্ষাৎকারের তিন মাস পরে তিনি মারা যান। কৃষণজীও ছিলেন তেমনি সাধারণ ও স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত একজন বড় মাপের লেখক নিরবচ্ছিন্নভাবে লিখে গেছেন এটা বড় কথা। তাঁকে কোন দিন কারো বিরুদ্ধে কটু কথা বলতে শুনিনি—এই মহৎ অন্তঃকরণের জন্য তাঁব মেধার থেকে কম মেধার মানুষকে যেমন অবজ্ঞা অথবা অবহেলা করতেন না তেমনি নবীন লেখকেরা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে এলে তাঁদের খুবই উৎসাহিত করতেন।

জলার্ক : কৃষণজীর সঙ্গে মেলামেশার জন্য কারা আসতেন?

মুনিব : এক কথাব বলতে গেলে ভাবতেব প্রায় বড মাপের সব মানুষবাই আসতেন। কবি শিল্পী সাহিত্যিক। আসতেন সায়ির লুধিয়ানভি, মজরুহ সুলতান পুরী, ফৈজ আহমদ ফৈজ, সর্দার আলি জাফরি, কমলেশ, মোহন রাকেশ, ধরমবীর ভারতী আবও নামী লেখকেরা। এরা এলে থাকতেন, খাওয়া দাওয়া করতেন। বাইরের দেশ যেমন রাশিয়া, চেকেশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড অন্যদেশ থেকে প্রতিনিধিরা তাঁর কাছে আসতেন। তিনিও বাইরের অনেক দেশে গেছেন। বিশ্বের বহু ভাষায় তাঁর লেখা অনূদিত হয়েছে; বিশেষ করে রাশিয়ান ব্লকে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিলো বেশী। সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ভারতের পদ্মভূষণ ছাড়াও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু দেখেছি এই সব খেতাব তাঁকে খুব একটা বিচলিত করতো না। খুশি হতেন। তিনি নিজের জগতে অনন্য থাকতেন। তাঁর মুখ থেকে একটি বাজে বাক্য কখনো শুনিনি। জীবনযাপনে ছিলেন সাদামাটা। তিনি মাটিতে একটা হালকা তোষক পেতে শুতেন। এই অভ্যাসটি আমারও। আমিও তাই করি। মনে হয় মাটিতে শোয়ার অভ্যাস হলো ধরিত্রীর বুকের কাছে থাকার ইচ্ছা। জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য তিনি পছন্দ করতেন কিন্তু আড়ম্বর পছন্দ করতেন না।

জলার্ক : আপনি কী তাঁর লেখা উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপ দেখেছেন, 'সরায় কে বাহর' ইত্যাদি।

মুনির : আমি তা দেখিনি। কিন্তু তার লেখা অনেক পড়েছি। টাকার প্রয়োজনে তিনি কমার্শিয়াল ফিল্মের স্ক্রিপ্টও লিখেছিলেন। মমতা (উত্তরফাল্গুনীর হিন্দী রূপান্তর) সরাফৎ, হামরাহি। কিন্তু তিনি কমার্শিয়াল ফিল্ম পছন্দ করতেন না। আমাকে বলেছিলেন। আমার প্রতি তাঁর মনোযোগ ছিলো সব সময়। ফিল্ম-এর কাজ করার আমার প্রবল ইচ্ছাও ছিলো। এটা যখন জানলেন তিনি আমাকে পুনে ফিল্ম-ইন্সটিটিউটে গিয়ে পড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। বলতে গেলে কৃষণজীর আনুকূল্যেই এখানে পড়া। এখানে আমি ফিল্ম ডাইরেকশন কোর্স পড়তে যাই। সেখানে বড় বড় সব শিল্পী সাহিত্যিক চিত্রনির্মাতাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিলো।

আমাকে পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিতেন। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় ঋত্বিক ঘটক, রাজকাপুর, হৃষিকেশ মুখার্জী, মৃনাল সেন, গুলজার। কৃষণজী আমার এই আর্টিষ্টিক ঝোঁক দেখে উৎসাহিত হলেন। আর্ট ফিল্মের প্রতি আমার প্রবল উৎসাহ দেখে আমাকে বলেছিলেন, বিলু (আমার বাড়ি ডাক নাম) তোমার হার্টের দুটো কম্পার্টমেন্ট, একটা হলো কমার্শিয়াল ফিল্ম যা তোমাকে অর্থ দেবে, অন্যটা আর্ট ফিল্মের যেটা তোমার মনের জগৎ, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। একথা বলে খুব হাসতেন।

জলার্ক : আপনার পড়াশুনার ব্যাপারে যত্ন নিতেন?

মুনির : বেশীর ভাগ যত্ন নিতেন আমার মা। কৃষণজীর এই সব ভাবার সময় কোথায়। কিন্তু পড়াশোনায় আমার বেশ অমনযোগ চলছিলো। বি.এ. পরীক্ষায় আমার ফল খুব খারাপ হয়, কৃষণ ভেঙে পড়লেন। আমাকে বললেন সব কিছু করো ঠিক আছে, কিন্তু পড়াশুনা করো। আমি কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিলাম। এই সব নানা কারণে পড়ার গণ্ডগোল হয়। পরে অবশ্য আমি অনার্স সহ বি.এ. পাশ করি। তিনি খুব খুশী হন।

জলার্ক : একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবো যদি কিছু মনে না করেন; কৃষণজী আপনার মাকে বিয়ে করায় আপনার কৈশোর হারিয়ে যায় কি?

মুনির : আমি তা মনে করি না। আমিও মায়ের সঙ্গে কৃষণজীর বাড়ী চলে আসি এবং তিনি আমাকে পিতার স্নেহ দিয়েছেন। আমি কিন্তু কৃষণজীর সন্তান নই। আমার নিজের বাবা খুরশিদ আলি মুনির। তাঁর সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিলো। দিল্লীতে গেলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম। তিনি সরকারী চাকরি করতেন। তিনি নিজে একজন শিল্পী ছিলেন। সেই অর্থে আমি তাঁকে হারাই নি। কিন্তু তিনি খুবই কম বয়সে মারা যান। আমি তখন যুবক, ২৬/২৭ বছর বয়স। সবে বিয়ে করেছি।

জলার্ক : আপনার বাবার সঙ্গে কৃষণজীর যোগাযোগ ছিল? বাবা মারা যাবার সময় তাঁর কী ভূমিকা ছিলো?

মুনির : বাবার মৃত্যুর পর কৃষণজীও শেষ যাত্রায় ছিলেন। আমার সঙ্গে তিনিও প্রচুর কেঁদেছেন। জড়িয়ে ধরেছিলেন। কৃষণজীর সঙ্গে তাঁর খুব স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক ছিলো। আমার ছোট বেলায় দুষ্টুমির জন্য মা মারলেও কৃষণজী কোনদিন তা করেননি। বড় হলে তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়েছিলো। আমাকে হাত খরচের জন্য টাকা দিতেন। তাঁকে ফিল্মের ব্যাপারে সাহায্য করতাম। তাঁর স্ক্রিপ্ট কপি করে দিতাম, সংলাপও লিখতাম, ছন্দ লেখাতেও মাঝেমধ্যে সাহায্য করতাম। তখন বম্বেতে থাকতাম। এই সব কাজের জন্য ২০/২৫ টাকা পেতাম। আসলে তিনি সরাসরি না দিয়ে এই সব কাজের জন্য পারিশ্রমিক হিসাবে দিতেন। এক ছাত্রের পক্ষে ২৫ টাকা তখন দারুণ ব্যাপার। তার স্ক্রিপ্ট করা ছক 'মনচলি', 'দুচোর', 'হামরাহি' দেখেছি।

জলার্ক : কৃষণ চন্দরের উপন্যাস, ছোট গল্পের বই নিয়ে কিছু ভাবছেন?

মুনির : অনেক কাজ করার আছে। তাঁর ৩০টি গল্প আমি নির্বাচন করেছি।

জলার্ক : রাজনীতির সঙ্গে কৃষণচন্দর-এর যোগাযোগ কতটা ছিলো?

মুনিব : দেখুন, রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিলো; কিন্তু একেবারে সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে নেমে পড়া, সময় দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে যে আলোচনা হতো, তাতে তিনি আমাকে বলতেন, দেখ আমার কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু আমার পক্ষে রাস্তায় নেমে বাজনীতি করা, পুলিশের লাঠি খাওয়া সম্ভব নয়। আর তাছাড়া আমি নিজেকে চল্লিশ শতাংশ নিজের স্বাধীন ভাবনার জন্য রেখে দিই।

জলার্ক : কৃষণ চন্দর জরুরী অবস্থাকে সমর্থন করেছেন বলে জগদীশ চন্দ্র ওয়ার্ধন লিখেছেন।

মুনির : দেখুন আমি তা মনে করি না। তিনি সক্রিয়ভাবে এর বিরোধিতা করেন নি, এর অর্থ এই নয় যে তিনি এমার্জেন্সিকে সমর্থন করেছেন। আমি মনে করি না। ইন্দিরা গান্ধী কৃষণজীর ট্যালেন্ট কে স্বীকৃতি দিতেন। কৃষণজীর জন্মদিনে তিনি এসেছিলেন। কিন্তু এমার্জেন্সি নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা আমি শুনিনি। এটুকু আমি খুব জোর দিয়ে বলতে পারি, যে কৃষণ চন্দর-কে আমি চিনি জানি, তিনি এমার্জেন্সিকে সমর্থন করেননি, এর আইডিয়াকেও ঠিক মনে করতেন না। একজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, সৃজনশীল সাহিত্যকার তা সমর্থন করতে পারেন না। তিনি হয়তো নীরব ছিলেন। একেই অনেকে সমর্থন ভেবেছেন।

তিনি হার্টের রুগী ছিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডঃ সিংঘল তাঁকে হাঁটতে উপদেশ দিয়েছিলেন। কৃষণজী সন্ধ্যার সময় প্রচুর হাঁটতেন। কৃষণজীকে নিয়ে সাক্ষাৎকার আমার এই প্রথম; তাই বেশী কিছু তথ্য দিতে পারলাম না।

জলার্ক : উর্দু সাহিত্যে তাঁর অবদান ও স্থান সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

মুনির : খুবই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু একটি জিনিষ আমি প্রত্যক্ষ করছি যে শুধু কৃষণ চন্দর নয় অন্যান্য লেখকদের অবস্থানের জনপ্রিয়তা ওঠা নামা করছে। এই স্ট্যাটিকাল ফোর্স কেন কাজ করে আমি জানি না। সাম্প্রতিক কালে আমি অনুভব করছি মান্টোর নাম ও অবস্থান খুবই উঠে এসেছে, সেখানে কৃষণজীর জনপ্রিয়তা নিম্নমুখী। আবার এই মুহূর্তে ইসমৎ চুগতাই খুবই জনপ্রিয়, কিন্তু রাজেন্দ্র সিং বেদী এখন নীচু অবস্থানে। আবার কিছু কাল আগে কৃষণজীর লেখার প্রকাশনা বা তথ্যচিত্র এবং টেলিভিশনে কিছু তথ্য, সিরিয়াল প্রচারিত হওয়ায় তাঁর জন্যপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে আমি কৃষণজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ আপনার এই সব সাহিত্যকৃতি, রচনা সম্ভার কতকাল বেঁচে থাকবে বলে আপনি মনে করেন। কৃষণজী নিজের এক অভিজ্ঞতার কথা আমাকে বলেছেন। কলকাতায় একবার সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছিলো। সত্যজিৎ রায় কৃষণজীকে বলেছিলেন, দেখুন আমার ছবির প্রাসঙ্গিকতা সাত বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আপনার ছোট গল্প একশো

বছর বেঁচে থাকবে। কৃষণজী আমাকে বলেছেন যে সত্যজিৎ রায় অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী বলে নিজের ছবির কথা ওভাবে বলেছেন, সেটা তাঁর ধরন। কিন্তু আমি মনে (কৃষণজী) করি, সত্যজিৎ-এর ছবি বেঁচে থাকবে। আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, আমার সাহিত্যকে যদি টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে উপস্থিত করা যায় তবে তা বহুকাল বেঁচে থাকবে। তিনি বোধহয় মনে করতেন নতুন এই মাধ্যমগুলির মাধ্যমে প্রচারিত হলে, এগুলি ভিন্ন মাত্রা পাবে।

জলার্ক : কৃষণজীর ধাবণা সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?

মুনির : আমি এটা মনে করি না যে কৃষণজী এক্ষেত্রে ঠিক কথা বলেছেন। এটা হতে পারে আরও পঁচিশ বছর আগে টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র মাধ্যমের প্রভাব ব্যাপক হয়ে পড়েছিলো। এর সর্বব্যাপী আগ্রাসন দেখে কৃষণজী হয়তো ভেবেছিলেন এই মাধ্যমটিব ব্যাপকতা। আমি মনে করি সারা পৃথিবীতে বই হচ্ছে বই; যত রকমের মাধ্যমই আসুক না কেন, বই-এর ক্ষমতা সর্বকালে একই থাকবে, যদি বই ভালোভাবে ছাপানো হয়, ভালোভাবে পরিবেশিত হয়।

জলার্ক : আপনাদের কোন পরিকল্পনা রয়েছে কী কৃষণ চন্দর-এর রচনাবলীকে ফিল্ম করা বা তাঁর রচনাবলী প্রকাশ করার?

মুনির : যদি ভালো প্রকাশক পাই তবে আমরা তা অবশ্যই করবো। তবে কৃষণজীর রচনাবলীর প্রকাশনা সময় নেবে।

অনুলেখন : দিলীপন ভট্টাচার্য

উর্দু থেকে অনুবাদ : কমলেশ সেন

কৃষণ চন্দর
যব খেত জাগে

আমি যদিও কৃষক নই, কিন্তু কৃষকদের মধ্যে থাকার সুযোগ আমার জীবনে অনেক ঘটেছে। আমার শৈশব এবং কৈশোর কৃষকদের মধ্যেই কেটেছে। কৃষকদের প্রতিদিনকার জীবনের সঙ্গে জড়িত যে-সব কাজ—যেমন হাল চালানো, নিড়াই করা ধান বোনা, ফসল তোলা, এসব তাদের কাছে থেকেই আমি জেনেছি। খেতে-খামারে যারা কাজ করে, তাদের প্রতি যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসা আমাকে ভারতীয় কৃষকরাই শিখিয়েছে। প্রকৃতির প্রতি যে ভালোবাসা এবং স্বতন্ত্র পরিবেশে থাকা এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার যে বাসনা আমার অধিকাংশ গল্পে আপনারা পেয়েছেন, তা আমি কৃষকদের কাছ থেকেই পেয়েছি। তাদের সঙ্গে থাকার জন্যেই, তাদের ওপর যে সমস্ত অত্যাচার চলে, তা আমি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছি। আর বর্তমান জীবন-ব্যবস্থা পুরোনো জীবন-ব্যবস্থার সঙ্গে গাঁটছাড়া বেঁধে যেন তাদের ওপর পাথরের মতো চেপে বসে আছে। একেক সময় মনে হয়, আমি নিজেই তাদের ঘাড়ের ওপর এই জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছি। কারণ গ্রামের যে শাসকশ্রেণী, সেই শাসক শ্রেণীরই আমি একজন সন্তান। আমার মনে হয়, বর্তমানে যা কিছু ঘটে চলেছে, এর জন্যে আমার বাবা-ই দায়ী। দায়ী আমার বাবার বন্ধুরা এবং তাদের বন্ধুরা। অন্যদিকে কৃষক এবং কৃষকের ছেলে-মেয়েরাই ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাদের বাড়ির দরজা আমার জন্যে ছিল সর্বদাই উন্মুক্ত। কিন্তু আমাকে থাকতে হত আমার উচ্চবর্গ বাবার কাছে। সে জন্যেই কৃষকদের জীবনকে আমি দু-দিকের দুটি দরজা দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি। পেরেছি, তার কারণ, আমি তাদের জীবন দেখতে চেয়েছিলাম। আর দেখতে বাধ্যও হয়েছি।

শোষণের এই যে ধারা, তা শুরু হয় এক দরজা থেকে আর শেষ হয় গিয়ে আর এক দরজায়। আর আমি এই শোষণের ধারার শুরু থেকে অন্ত পর্যন্ত চোখ মেলে দেখতাম। সে সময় যে-জিনিসটা আমি বুঝতে পারতাম না, তা হচ্ছে নৈতিকতার দুটি সাম্প্রতিক রূপ, যার একটি সৃষ্টি করেছে অভিজাত বর্গ আর অন্যটি কৃষকরা। অভিজাতদের দামী এবং ভালো কাপড়-জামার প্রয়োজন, আর কৃষকদের এসবের কোন প্রয়োজন নেই, কারণ ভালো জামাকাপড় পরলে তারা মর্যাদাশীল হয়ে উঠবে। আমাদের বাড়িতে এবং অন্যান্য অভিজাতবর্গের বাড়িতে প্রতিটি মানুষ দিনে দু-তিনবার ভর-পেট আহার করত, কিন্তু কৃষকরা যদি দিনে দু-তিনবার আহার করত, তবে তা অন্যায়-বেআদপী বলে মনে করা হত। কারণ তাতে তাদের স্বভাব খারাপ হয়ে যাবে এবং সেবা করার যে মনোবৃত্তি তা আর থাকবে না। কেউ শ্রম দিলে, সেই শ্রমের বিনিময়ে তার মজুরী পাওয়া অবশ্যই উচিত। কিন্তু আমরা তাদের বেগার খাটিয়ে নিতাম।

আমাদেব অভিজাতবর্গের ঘরে মা-বোনের ইজ্জত আছে। তাদের খুব সম্মান করা হয়। আমাদের এলাকার তহসিলদার হিন্দু। হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও সে তার স্ত্রীকে পর্দানশীন করে রেখেছিল। কিন্তু কৃষকদের মা বোন এবং স্ত্রীদের বেইজ্জত করা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

আমি আমার কিশোর বয়সে একজন রাজা সাহাবকে দেখেছি। সে যখন তার জমিদারী পরিদর্শনে বের হত, এবং যে-সব গ্রামে যেত, সেই সব গ্রামের কিসান আর তাদের মেয়ে বৌ এবং শিশুদের বেঁধে আনত। পুরুষ আর মেয়েদের পৃথক পৃথক সারিতে দাঁড় করাত। পুরুষদের জুতো দিয়ে পেটাত, আর মেয়েদের পাঠিয়ে দিতো সারা রাতের জন্যে তার কর্মচারীদের তাবুতে। এ দৃশ্য নিজের চোখে দেখেছি — একবার নয়, অজস্রবার। আর না জানি এ দৃশ্য কল্পনায় কতবার প্রত্যক্ষ করেছি।

এসব আমার শৈশবের ঘটনা। আমার এক কংগ্রেসী বন্ধু বলেন, চণ্ডিগড় ছাড়িয়ে সিমলা যাওয়ার পথে আজও এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে জলের প্রচণ্ড অভাব। এখানে দেহাতি মেয়েদের জলের জন্যে জঙ্গলের ঝরণায় যেতে হয়। আর এই জঙ্গল এক পাহাড়ি ঘাঁটির ওপর অবস্থিত। এই পাহাড় আর জঙ্গলের ভার যাঁর ওপর আছে তিনি একজন বিরাট উচ্চপদস্থ অফিসার। তাই ঝরণার জলে তেষ্টা মেটানোর জন্যে মেয়েদের উপঢৌকন দিতে হয় তাদের সতীত্ব—তাদের ইজ্জত। আর এই উচ্চপদস্থ অফিসার হচ্ছেন একজন কংগ্রেসী পত্রিকার এডিটরও। তাঁর পত্রিকাতেই এই খবর ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে। এই ঘটনা পড়ে মনে হয়, কৃষকদের ওপর যে অত্যাচার চলে আসছে, তা এতটুকু কম হয়নি। আর কৃষকদের এই যে সমস্যা, সেই সমস্যা সারা ভারতবর্ষে কমবেশী একই রকম। যুগ যুগ ধরে তাদের ওপর চলছে অত্যাচার। ইংরেজরা এ দেশে আসার আগেও ছিল, তাদের সময়েও ছিল, পরেও তেমনি চলছে। আমাদের কৃষকদের ওপর যারা অত্যাচার চালিয়ে আসছে, তাদের সঙ্গে কৃষকদের ঘনিষ্ঠতা খুবই কম। এই অত্যাচারীদের তারা জীবনভর ঘৃণা করে। কারণ যারা তাদের ওপর অত্যাচার করে আসছে, আগেও তাদের হৃদয় ছিল মূক;—আজও তেমনি দয়া-মায়াহীন। তাই তাদের যখন বলা হয়, ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ চলে গিয়েছে, এখন ফুর্তি কর, তখন কিন্তু তাদের চোখ আনন্দ আর খুশিতে জ্বলজ্বল করে ওঠে না। স্বাধীনতার যে আবেগ, সেই আবেগ তো আপনার থেকেই সৃষ্টি হয়।

কৃষকদের ওপর এই যে অত্যচার, সেই অত্যাচারের রূপ এত গভীরভাবে প্রোথিত দৃঢ় এবং সংগঠিত যে, এর শিকড়মূল হাজার হাজার বছর অতীত পর্যন্ত প্রসারিত। যাঁরা শহরে থাকেন, তাঁরাও কৃষকদের ওপর এই অত্যাচারকে আনন্দের সঙ্গেই সমর্থন করেন। নৈতিকতা সম্পর্কে এই যে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, তা শহরেও অগোচর নয়। এমন বহু মানুষ আছেন, যাঁরা এই অত্যাচারকে অন্যায় বলে মনে করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কৃষকদেরও দোষারোপ করেন। তাঁদের ধারণা কৃষকরা মুর্খ বেকুব পশু এবং নিষ্কর্মা। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এবং জাগরণের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই—নেই বলে তাদের এরকম ব্যবহার করা হয়। কারা তাদের মুর্খ করে রেখেছে, কারা তাদের বোকা আর বেকুব বানিয়ে রেখেছে, কারা তাদের সভ্যতার সমস্ত অগ্রগতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে? এসবের অনুসন্ধান করার সাহস তাঁদের মোটেই নেই।

যদি আমরা সত্যি সত্যি আমাদের জীবন এবং সমাজকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরপুর করতে চাই, তবে অবশ্যই আমাদের এসব কারণের অনুসন্ধান করার জন্যে সাহসী হতে হবে। অত্যাচারের সেইসব রূপকেও দেখতে হবে,—যা দু-এক বছর থেকে নয়, যুগ যুগ ধরে কৃষকদের ওপর চলে আসছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, আমরাও কৃষকদের ওপর এই অত্যাচারকে দেখতে চাই না। অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যে কোনরকম সৃজনশীল ভূমিকা নিই না, কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্যে কোমরকম মদতও দিই না। কিন্তু কৃষকরা যখন চারদিক থেকে তাদের ওপর সংগঠিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজেরাই উপায়হীন ভাবে নিজেদের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে,—'নিজেদের জমি ভিটেমাটি মা-বোন এবং স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষা করার জন্যে উঠে দাঁড়ায় এবং যখন এই অত্যাচারের হাত থেকে নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্যে পথ খুঁজে বের করে, তখন তাদের ওপর জুলুম কায়েম রাখার জন্যে তাদের গ্রামে পাঠিয়ে দিই পুলিস আর মিলিটারি। আমরা দাঁড়িয়ে থেকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাঁক করে দিই তাদের ঘর-বাড়ি আর ফসল। আর তাদের ওপবই দোষারোপ দিই, তারা হিংসাত্মক কার্যকলাপ করছে। যারা গুলি করছে আর গ্যাস ছাড়ছে, দিনরাত বল আর হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে, পুলিস আর ফৌজ পাঠাচ্ছে, তাদের মুখ থেকে এই দোষারোপ মোটেই শোভা পায় না।

'যব খেত জাগে'-তে কৃষকদের এই নতুন আন্দোলনকে আমি কাহিনীতে লিপিবদ্ধ করেছি—যে আন্দোলন অন্ধ্রের মাটিতে অঙ্কুরিত হয়েছে। এর আগেও কৃষকরা নিজেদের অধিকারের জন্যে লড়াই করেছে, কিন্তু সেই লড়াই-এ তারা শহরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোন সম্পর্ক তৈরি করতে পারেনি। কিন্তু এবার অন্ধ্রে এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন যেভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, তা শহরের মানুষের কাছে এবার সহানুভূতি পেয়েছে। এই সহানুভূতি পেয়েছে, তার সবচেয়ে বড় কারণ এবার সমাজের সবচেয়ে অগ্রণী অংশ শ্রমিক শ্রেণী এই আন্দোলনের ওপর স্থাপন করেছে তাদের রাজনৈতিক চেতনা ও নেতৃত্ব। তাই তেলেঙ্গানার এই মোর্চা আজ সারা ভারতবর্ষের কৃষকদের মোর্চাতে পরিণত হয়েছে। সারা ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে এই প্রথমবার কৃষকদের সমস্যা তার নিজস্ব তীব্র গতিময়তা এবং নির্ভিকতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই সমস্যা এমন তীব্রতা ও সত্যতা সামনে তুলে ধরেছে যে, বন্ধু এবং শত্রু—উভয়কেই স্বীকার করতে হচ্ছে, কৃষকরাই সঠিক। তাদের জমি তাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিছু কিছু মানুষ এই আন্দোলনকে রাজনীতির আবরণে ঢাকতে চাইছে। তারা জমির বদলে দশগুণ ক্ষতিপূরণের কথা বলছে—যে ক্ষতিপূরণ ভারতবর্ষের গরীব কৃষকরা দশ পুরুষ ধরেও আদায় করতে পারবে না। অন্যদিকে শ্রীবিনোবা ভাবে চালাচ্ছেন ভূদান আন্দোলন। তিনি বলছেন, কৃষকদের জমি দান কর। দানের মাধ্যমে যদি কৃষক এবং গরীবদের সমস্যার সমাধান হত, তবে তা এতদিনে সমাধান নিশ্চয়ই হয়ে যেত। দানের নিয়ম হচ্ছে, একজন ততটুকুই দান করবে, যা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কিন্তু যখনই দানের অংশে নিজের প্রয়োজন অনুভব করবে, তখনই সে হাত গুটিয়ে নেবে।

'যব খেত জাগে'—বিপ্লবী চেতনাসমৃদ্ধ কৃষকদের কাহিনী—যে-কৃষকরা তাদের জমির ওপর অধিকার রক্ষার জন্যে অত্যাচারীর হিংসার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

এ কাহিনী সেই সব কৃষকদের নিয়ে লেখা, যারা স্বয়ং মেহনত করে। তাই শহরের শ্রমবত শ্রমিকশ্রেণীর মদত এবং নেতৃত্বকে তারা খারাপ চোখে দেখেনি। শহর এবং গ্রামের যে ফারাক এবং বিদ্বেষ অধিকাংশ সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে দেখা যায়, তার লেশ মাত্র তাদের মধ্যে ছিল না।

এই কৃষক জাগ্রত এবং সংগঠিত। তারা শুধু হাল চালাতেই চায় না, বই পড়তে এবং প্রেম করতেও চায়। সভ্যতা এবং সংস্কৃতির যে খাজাঞ্চিখানা, সেই খাজাঞ্চিখানার সঙ্গে গভীবভাবে পরিচিতও হতে চায়। তারা অন্যের কাছ থেকে দান গ্রহণ করতে চায় না। তাদের বক্তব্য, এ জমির মালিক তো আমরা আজ থেকে নই। আমরা এ জমিতে শ্রম দিয়েছি—ফল ও ফুলে তা মঞ্জরিত করে তুলেছি। এই শ্রমের জন্যেই তো চলছে সারা দুনিয়া। কিন্তু আমাদের ঘাড়ের ওপব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে জায়গীরদারী প্রথার জোয়াল। আর আজ যখন আমরা আমাদের জমি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে সংগঠিত হয়েছি, তখন তোমরা বলছ, আমরা তোমাদের জমি তোমাদেরই দান করছি। একেই যদি ভূদান বল, তবে সমস্ত চোর আর ডাকাতকে দাতা বলে অভিনন্দিত করতে হবে। আর তোমরা বড় জোর আমাদেরই জমির একটা ছোট অংশই দান হিসাবে দিতে পার। খুব অল্প দিনের জন্যেই, এ জমি আমাদের হাতে থাকবে। কারণ মহাজনী ব্যবস্থায় জমি বেশীদিন কৃষকদের হাতে থাকতে পারে না। ঋণগ্রস্থ কৃষকদের হাত থেকে সে জমি আবার ধীরে ধীরে মহাজন আর জমিদারদের হাতে চলে যায়। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এটাই হচ্ছে নিয়ম।

'যব খেত জাগে'—জাগ্রত কৃষকদের কাহিনী। স্থান অন্ধ্রের মাটি। এই কাহিনীর অবয়ব সৃষ্টি করতে আমাকে সাহায্য করেছে কৃষক আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক ইউনিটের সঙ্গে জড়িত কর্মীরা। এই আন্দোলন সম্পর্কিত দলিল-দস্তাবেজ আমাকে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করতে হয়েছে, কারণ অবস্থা মোটেই অনুকূলে ছিল না। আন্দোলন সম্পর্কে বহু তথ্য পেয়েছি তেলেগু ভাষার প্রখ্যাত নাট্যকার এবং কবি ভাস্কর রাও-এর কাছ থেকে। এই উপন্যাসের নায়ক 'রাঘব রাও'—এই নাম আমি অত্যন্ত সচেতন ভাবেই দিয়েছি। সে হচ্ছে গোলাম বা বিট্রি। তাই তার এই নাম হতে পারে না—ভাস্কর রাও আমাকে সেরকমই বলেছিলেন। গোলামদের নাম—রামলু, থ্যায়ল, রঙড়ু ইত্যাদি রাখা হয়। রাঘব রাও নাম হতে পারে না। কারণ রাঘব রাও নাম হয় রাজপুতদের। রাঘবপতি তো আমাদের শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন।

সেজন্যে আমি স্থির করলাম, আমার নতুন নায়কের নাম নতুনই হবে। বদমাশরা কৃষকদের কাছ থেকে যে-ভাবে ভালো ভালো জমি ছিনিয়ে নেয়, ঠিক সে-ভাবে ভালো ভালো নামও তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। আর আজ যখন কৃষকরা তাদের হারানো জমি আবার ছিনিয়ে নিচ্ছে, তখন তারা তাদের হারানো নামও কেন ছিনিয়ে নেবে না। সেজন্যে আমার নায়কের নাম রাঘব রাও। কারণ আজ যে গোলাম, সেই একদিন রাজা রামচন্দ্র হবে।

বর্তমানের গর্ভে 'যব খেত জাগে' কাহিনীর জন্ম হলেও, তা আগামীকালের কাহিনীও। আমি শুধু এর একটা সামান্য অংশই দেখেছি। আরও অনেক—অনেক কিছু দেখে লেখার ইচ্ছে আছে।